প্রথম মুদ্রণ—ডিসেম্বর ১৯৬০
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে

প্রকাশক : সলিল কুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক : সমীর দাশগুপ্ত
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩ আলীমুদ্দীন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৬

গ্রন্থন : কৃষ্ণা বাইন্ডিং ওয়ার্কস,
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : শ্রীগণেশ বসু

উৎসর্গ

লাহোরের মীর আবদুল মজীদকে এবং ফিরোজুদ্দীন মনসুরের স্মৃতির উদ্দেশে "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" উৎসর্গ করলাম। তাঁরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সভ্যপদভুক্তদের মধ্যে ছিলেন ; তাঁরা মস্কোতে 'স্তালিন বিশ্ববিদ্যালয়ে' (প্রাচ্য শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে) পড়েছিলেন ; তাঁরা কমিউনিস্ট চিন্তাধারা বিস্তারের জন্যে দুর্লঙ্ঘ্য পামীর লঙ্ঘন করে ভারতে পৌঁছেছিলেন ; তারাই সেই প্রথম কমিউনিস্টদের দলে ছিলেন যাঁরা পেশোয়ারের আদালতে আসামী হয়ে (মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা, ১৯২২-২৩) প্রথম সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। মীর আবদুল মজীদ বিখ্যাত 'নওজওয়ান ভারত সভা'র প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তিনি মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় (১৯২৯-৩৩) অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডিত হয়েছিলেন। ফিরোজুদ্দীন মনসুর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে বহুমুখী কর্ম দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

সূচিপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

চিত্র সূচি

দ্বিতীয় মুদ্রণ সম্বন্ধে

আমার "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২০-১৯২৯" দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হলো। ১৯৪৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে আমি এর প্রথম মুদ্রণের ভূমিকা লিখেছিলেম, আর ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেডের কাউন্টার হতে এর প্রথম বিক্রয় আরম্ভ হয়েছিল ওই মাসের ১২ই তারিখে। গত সেপ্টেম্বর মাসে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির গুদামে বইখানি প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর হতে এর দ্বিতীয় মুদ্রণের তোড়জোড় আরম্ভ হয়। কিন্তু ছাপা শেষ হলো এই এখন। দশ মাসের ভিতরে ষোল টাকা দামের এই জাতীয় একখানি পুস্তকের দুহাজার কপি বিক্রয় হয়ে যাওয়া আমাদের দেশের পক্ষে কম কথা নয়। আমি জানি অনেকের প্রত্যাশা আমি পূর্ণ করতে পারিনি। তবুও আমাদের পার্টির সভ্যরা, পার্টির নিকটতর ও দূরের বন্ধুরা এবং পার্টির সঙ্গে সংস্রবশূন্য বুদ্ধিজীবীরাও এই পুস্তক কিনেছেন। আসলে তারা এই ধরনের একখানি পুস্তক চেয়েছিলেন। আমার পুস্তক তাঁদের আশানুরূপ না হলেও তাঁরা পুস্তকখানি না কিনে পারেননি।

আমি পুস্তকখানির ক্রেতা বিক্রেতা আর সমালোচকদের আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার এই পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ হলো তাতে আমি বড়ই আনন্দিত।

এবারে আগেকার ছাপার ভুলগুলি শুদ্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু নূতন ছাপার ভুল হয়তো অনেক হয়ে থাকবে। আমি চোখে ভাল দেখি না বলে এবারে একেবারেই প্রুফ পড়িনি। তথ্যকে যথার্থ করার জন্যে কয়েক জায়গায় সামান্য কিছু সংযোজনও করেছি। যেমন, ১৯১৫ সালে লাহোরের ১৫ জন ছাত্র সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের বাইরে যে পালিয়ে গিয়েছিলেন প্রথম মুদ্রণের সময়ে আমি তাঁদের দশজনের নাম মাত্র উল্লেখ করতে পেরেছিলেম। এবারে পুরো ১৫ জনের নামই আমি ছেপে দিয়েছি। এই ছাত্রদের কেউ কেউ কাবুলে স্থাপিত অস্থায়ী ভারত গবর্নমেন্টের সভ্য ছিলেন। এম এন রায় ও সি পি দত্ত সহ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ফরেন ব্যুরোর তিনজন সভ্যের অন্যতম মুহম্মদ আলী এই ছাত্রদেরই একজন ছিলেন।

বৈদ্যনাথ বিশ্বাসকে নিয়ে এম এন রায়ের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ চটাচটিই হয়ে গিয়েছিল, অবশ্য চিঠি-পত্রের মারফতে। রায় লিখেছিলেন বিশ্বাসকে তাঁর ইউরোপে চাই-ই চাই। আমি লিখেছিলেম বৈদ্যনাথ সন্দেহভাজন ব্যক্তি, তাঁকে ইউরোপে পাঠানোয় আমার একেবারেই সম্মতি নেই। তবে, রায় ইচ্ছা করলে তাঁকে ইউরোপে নিয়ে যেতে পারেন। আমি এত জোরের সঙ্গে বলেছিলেম এই জন্য যে রায়ের পুরানো পার্টির কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিশ্বাস সম্বন্ধে আমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন। এর পরে রায় বৈদ্যনাথ বিশ্বাসকে ইউরোপে আর নিয়ে যাননি, কিন্তু ভারতের ভিতরে আমাদের সমস্ত সংযোগস্থলের সহিত তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের যুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ন্যাশনাল কাউন্সিলের মিটিং যখন হচ্ছিল তখন ডাঙ্গের ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি সম্পর্কিত দলীল-পত্রের

কথা ওঠে। সেই সময়ে সে ক্রমাগত চারদিন বক্তৃতা দেয়। তাতে সে আমাকে এই বলে খোঁটা দেয় যে আমি সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক। অতি সন্দেহভাজন বলেই একজনকে মুজফ্ফর ইউরোপে পাঠাতে চায়নি। রায় বললেন তাকেই আমার চাই। ডাঙেগর এই খোঁটার পরে কলকাতায় ফিরে এসে রায়ের পুরানো পার্টির একজনকে আমি পত্র লিখলেম। তিনি উত্তর দিলেন "কই, বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমি কাউকে তো কিছু বলিনি।" সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতারা এখন মত বদলেছেন। যাঁদের বিরুদ্ধে তাঁদের সন্দেহ ও অভিযোগ ছিল মরবার আগে তাঁদের তাঁরা এখন জাতে তুলে দিয়ে যেতে চান। আমি কিন্তু অথৈ জলে পড়ে গেলাম। ভাবলাম সরকারী রিপোর্ট অনুসন্ধান করা ছাড়া আর আমার কোন উপায় নেই। তাই খুঁজছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ আমি যা চাইছিলাম তাই পেয়ে গেলাম ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের "হিস্টরি অফ দি ফ্রিডম মুভমেণ্ট ইন্ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে। তিনি বৈদ্যনাথ বিশ্বাস সম্বন্ধে বিহার সরকারের একটি গোপন রিপোর্ট হতে কিছুটা উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর ঋণ স্বীকার ক'রে আমি সেই উদ্ধৃতিটি এই পুস্তকের ২৪০ পৃষ্ঠায় ছেপে দিয়েছি। পাঠকগণ দয়া করে পড়বেন।

পুস্তকের প্রথম মুদ্রণের সময় আমি "গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তীর কথা" নামক যে শিরোনাম আছে তার ভিতরে মস্কো হতে লিলুয়ার ধর্মঘটকারী মজুরদের জন্য সাহায্য হিসাবে টাকা এসেছিল একথা লিখেছি, কিন্তু টাকার অংকটা কত ছিল তা লিখিনি। কারণ, তা আমার জানা ছিল না। পরে রাধারমণ মিত্রের মীরাট আদালতে দেওয়া বিবৃতি পড়ে জানতে পেলাম যে দশ হাজার টাকা এসেছিল। তাই আমি দ্বিতীয় মুদ্রণে (এ পুস্তকের ৩৮৪ পৃষ্ঠায়) দশ হাজার টাকা আসার কথা লিখে দিয়েছিলেম। কিন্তু এখন ভারত গবর্নমেন্টের একটি রিপোর্টে দেখতে পাচ্ছি যে টাকার অংকটা বিশ হাজার ছিল। লয়ড্স ব্যাঙ্কের মারফতে টাকা এসেছিল। হাওড়ার জিলা ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্তের সনাখ্তকরণে কিরণ মিত্র টাকাটা ব্যাংক হতে তুলতে পেরেছিলেন ; তা ছাড়া মস্কোর টাকার ওপরে ভারত গবর্নমেন্টের কড়া নজর তো থাকারই কথা। মস্কোতে সাহায্য চেয়ে যে টেলিগ্রামটি পাঠানো হয়েছিল তারও প্রতিলিপি আমি এখানে ছেপে দিলাম। কারণ পুস্তকের ভিতরে তা নেই।

[The Message telegraphed to Russia, reads :

SECRETARY, PROFINTERN, MOSCOW

30,000 STRIKERS ARE OUT FOR 51 DAYS, RELIEF URGENTLY NEEDED. PLEASE SEND THROUGH BANK TO MITRA, SECRETARY. E. I. RAILWAY UNION. LILLOOAH, BENGAL, MITRA, SPRATT, MUZAFFAR.

The Statsman, Tuesday, May 1, 1928]

প্রফিন্টার্নের (ট্রেড ইউনিয়নসমূহের আন্তর্জাতিক) সেক্রেটারি, মস্কো

৩০,০০০ মজুর ৫১ দিন ধরে ধর্মঘট ক'রে আছেন। সাহায্যের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন। মিত্র, সেক্রেটারি, ই, আই, রেলওয়ে ইউনিয়ন, লিলুয়া, বেঙ্গল ঠিকানায় দয়া করে ব্যাঙ্কের মারফতে সাহায্য পাঠান।

প্রেরকের নাম : মিত্র, স্প্রাট, মুজফ্ফর
দি স্টেটস্‌ম্যান, মঙ্গলবার, ১লা মে ১৯২৮

মুজফ্ফর আহ্‌মদ

কথা শুরুর আগে

এক

কিভাবে আমার রাজনীতিক জীবন আরম্ভ হয়েছিল, আরও খোলাসা করে বললে কি করেই বা আমি ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে নেমেছিলেম সেই সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা লেখার উদ্দেশ্যে আমি কলম হাতে নিয়েছি। কিন্তু আমি মানুষটি কোথা হতে ও কি পরিবেশের ভিতর দিয়ে সর্বস্ব পণ করে একদিন রাজনীতিক জীবনে প্রবেশ করেছিলেম খুব সংক্ষেপে সে সম্বন্ধেও কিছু বলবার দরকার আছে বলে আমি মনে করি।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র একত্র হয়ে নিজ নিজ নাম বর্জন করে পদ্মা নাম নিয়েছে। এই পদ্মা আবার কত কত নদীকে নিজের মধ্যে মিশিয়ে পূর্ববঙ্গের চাঁদপুরের কাছাকাছি সমুদ্র বিশেষে পরিণত হয়ে নিয়েছে মেঘনা নাম। মেঘনা পড়েছে বঙ্গোপসাগরে। চট্টগ্রাম হতে বরিশাল পর্যন্ত মেঘনার মোহনা বিস্তৃত। এই মোহনায় সাগরে ভাসমান একটি ছোট্ট দ্বীপের নাম সন্দ্বীপ। হাজার বছর আগে এই দ্বীপে মানুষের বসতি ছিল। সন্দ্বীপ বাদশাহী আমলের একটি পরগনা। নোয়াখালী জেলার স্থলভাগের বামনী প্রভৃতি জায়গা সন্দ্বীপ পরগনায় অবস্থিত। প্রশাসনিক ব্যাপারে দ্বীপটি আগে নোয়াখালী জিলায় ছিল। দেশ ভাগ হওয়ার ক'বছর পরে তা চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলা ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসের কোনও এক সোমবারে আমি এই দ্বীপের মুসাপুর গ্রামে জন্মেছি। খুব দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় আমার কখনও জন্মবার্ষিকী পালিত হয়নি। তাই আমার জন্মের সঠিক তারিখ আমার জানা নেই। মায়ের মুখে শুনে যতটা মনে আছে ততটাই শুধু আমি এখানে লিখলাম। তবে, পুরানো দিনের গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা হতে আমি জানতে পেরেছি যে বাংলা ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসের ৭, ১৪ই, ২১শে ও ২৮শে তারিখ সোমবার ছিল। খৃষ্টীয় সালের হিসাবে এই তারিখগুলি ছিল ১৮৮৯ সালের ২২শে জুলাই, ২৯শে জুলাই, ৫ই আগস্ট ও ১২ই আগস্ট। এই চারটি তারিখের ভিতরে কোন তারিখটি যে আমার প্রকৃত জন্মদিন তা জানার আর কোনও উপায় নেই। কিন্তু এই চারটি তারিখের কোনো একটি তারিখ যে আমার প্রকৃত জন্মদিন সে বিষয়ে এতটুকুও সন্দেহ নেই। আমি স্থির করেছি, ১৮৮৯ সালের ৫ই আগস্টকে আমি আমার জন্মদিন বলব। হয়তো কিঞ্চিৎ ভুল থেকে গেল। কিন্তু তাতে কী এমন আসে যায়?

আমার পিতার নাম মনসুর আলি, আর মায়ের নাম চুনাবিবী। আমার পিতামহের নাম মুহম্মদ কায়েম, আর মাতামহের নাম ইরশাদ আলী ঠাকুর। এই নামটি ইরশাদ আলী ছিল, না, আরশাদ আলী, তাই নিয়ে আমার মনে একটা খটকা বেধেছে। একই আরবী শব্দের উচ্চারণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মানে হয়।

মাতামহকে কোনোদিন চোখে দেখিনি। আমার জন্মের অনেক বছর আগে তিনি মারা গিয়েছিলেন। সন্দ্বীপ চট্টগ্রামে এবং সম্ভবত আরাকানেও মুসলমানদের ভিতরে ঠাকুর পদবীর চলন আছে। আলাওলের (আল্ আউয়াল?) কাব্যে সৈয়দ মাগন ঠাকুরের নামোল্লেখ আছে। মুসলিমদের ভিতরে ঠাকুর পদবী খানিকটা আভিজাত্যের চিহ্ন। মাতামহের পরিবারে কিঞ্চিৎ আভিজাত্যের দাবি ছিল। আমাদের সন্দ্বীপের মতো ছোট জায়গায় কোনো পরিবারের নামে একটি কিংবা দু'টি তৌজি থাকলেই সে-পরিবার অভিজাত ব'লে গণ্য হতেন।

১৮২৭ খৃস্টাব্দে (১২৩৪ বঙ্গাব্দ) আমার বাবা জন্মেছিলেন। সন্দ্বীপে সেই সময়ে কোনো ইংরেজি স্কুল তো থাকতেই পারে না, বাংলা স্কুলও ছিল না। বাবা এ'র ও'র নিকটে বাঙলা পড়েছিলেন, আর কিছু পারসী ভাষাও তিনি শিখেছিলেন। তবে. বাংলায় পরীক্ষা দিয়ে তিনি মুখ্তারী পাস করেছিলেন। সন্দ্বীপের আদালতেই তিনি আইনের ব্যবসায় করতেন। আমি মা-বাবার কনিষ্ঠ সন্তান। আমার শিশু বয়সে বার্ধক্যের কারণে বাবা আদালতে যাওয়া এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। তাঁর সমব্যবসায়ের লোকদের প্রায় প্রত্যেকেই ভালো ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। কেন জানিনে, বাবা তা হতে পারেননি। তাই আমার শিশু বয়সে পরিবারের দারিদ্র্য ছিল অবর্ণনীয়।

আমাদের ওই অঞ্চলে মুসলিম শিশুদের প্রথম পাঠ শুরু হতো আরবীতে। আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে দিয়েও কুর্আনের একটি বাক্য উচ্চারণ করিয়ে আমার পড়া শুরু করানো হয়েছিল। কিন্তু আরবী অক্ষর পরিচয় করিয়ে কেবলমাত্র স্বরচিহ্নের সাহায্যে শিশুদের কুর্আন পড়ানোর যে রীতি ছিল আমার বেলায় তা পালিত হয়নি। কাজেই অন্য শিশুদের মতো আমার বিপুল সময় নষ্ট হতে পায়নি। কুর্আনের বাক্যটি আমাকে দিয়ে একবার মাত্র উচ্চারণ করানোর পরেই আমার বাবা বাজার হতে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশু শিক্ষার প্রথম ভাগ একখানা কিনে এনে নিজেই আমাকে অ-আ-ক-খ পড়িয়েছিলেন। আজ বুঝতে পারছি এদিক থেকে আমার বাবা খানিকটা প্রগতিশীল ব্যক্তি ছিলেন। আমি যখন সন্দ্বীপ মধ্য ইংরেজি স্কুলে (১৯০২ সালে এই স্কুলের নাম সন্দ্বীপ কার্গিল হাই স্কুল হয়েছে) বাঙলা উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়ছিলেম তখন আমায় পড়া ছেড়ে দিতে হয়। আমি ছিলেম শিশু, আর স্কুল ছিল আমাদের বাড়ী হতে অনেক দূর। তা ছাড়া, স্কুলের সামান্য বেতন জোগানোর সামর্থ্যও আমার বাবার ছিল না। আমি যে পড়া ছেড়ে দিলেম তার জন্য বাড়ীতে কেউ তেমন কোনো হায় আফ্সোস করলেন না। বাড়ীতে বসে বসে আমার দিন বৃথা কেটে যাচ্ছিল। সেই সময়ে পরিবারে কোনো চাষবাসও হ'তো না যে তার কাজে আমি লেগে যাব।

ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হওয়ার বাসনা

মুস্লিম প্রধান সন্দ্বীপে মোল্লা-মৌলবীর অভাব নেই। গ্রামে গ্রামে পার্সী-আরবী পড়ানোর ছোট ছোট মাদ্রাসা। মাদ্রাসায় পড়ার খরচও আবার খুব কম। আমি বাল্যের সীমা ছাড়িয়ে কৈশোরে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছিলেম। এই সময়ে অন্যদের দেখাদেখি আমি একরকম নিজে হতেই মাদ্রাসায় পড়া শুরু করে দিলাম। ইরানের কবি সাআদীর 'গুলিস্তান' ও 'বুস্তান' অনেকখানি পড়েছিলেম, কবি জামীর কাব্য 'ইউসফ-ও-জুলায়খা' সবে পড়া আরম্ভ করেছিলেম, আর পড়েছিলেম

কিছু আরবী ব্যাকরণ। এটা ১৯০৫ সালের কথা। অশক্ত হয়ে, বড় কষ্ট পেয়ে ৭৮ বছর বয়সে এই বছর আমার বাবা মারা গেলেন। বঙ্গভঙ্গের জন্যে দেশে তখন প্রবল আন্দোলন। আমার মনে তখন জোর বাসনা জন্মালো যে মাদ্রাসার পড়া ছেড়ে দিয়ে আমি ইংরেজি স্কুলে পড়ব। আমার অগ্রজেরা ছিলেন তিন জন—মহব্বত আলী, মকবুল আহ্‌মদ ও খুরশীদ আলম। পেশায় তাঁরা ছিলেন, যথাক্রমে উকীলের ক্লার্ক, শিক্ষক ও জমীদারী ইস্টেটের কর্মচারী। কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত মকবুল আহ্‌মদ সাহেব খুলনা জিলার মোরেলগঞ্জ থানার এক গ্রামে শিক্ষকতা করতেন। তিনিই মাঝে মাঝে আমায় সামান্য অর্থ সাহায্য করতেন। তাঁকেই জানালেম আমার বাসনার কথা, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন আমি নোয়াখালী জিলার স্থলভাগে বামনীর আখ্‌তারীয়া মাদ্রাসায় পড়ছিলেম। কাউকে কিছু না জানিয়ে সেখান থেকে একদিন আমি বাকেরগঞ্জ জিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। মনে পড়ে পাতার হাট স্টীমার স্টেশনে একটি পয়সা কম পড়ে যাওয়ায় আমি বরিশালের টিকেট কিনতে পারছিলেম না। তখন একজন আদালতের হিন্দু চাপরাশি দয়াপরবশ হয়ে আমায় একটি পয়সা দিয়েছিলেন। মনে আছে পিরোজপুর (ফিরোজপুর) মহকুমার বামনা নামক স্থানে আমি গিয়েছিলেম। তার পর পায়ে হেঁটে আরও কত কত জায়গায় ঘুরছিলেম। বরগুনার কথা মনে আছে। শেষে পৌঁছেছিলেম আমতলী থানার অধীন বুড়ীরচর নামক গ্রামে। এসব জায়গায় ঘোরার সময়ে একটি খুব ভালো ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ইলাকাটি নদীময়। লোকেরা ছোট-বড় নৌকায়, বেশীর ভাগ নিজেদের নৌকায় যাতায়াত করতেন। নদী পার হওয়ার দরকার হলেই এই রকম পথিক নৌকাদের ডেকে অনুরোধ করলেই তাঁরা পয়সা না নিয়েই নদী পার করে দিতেন। ষাট বছর আগেকার কথা। আজ ১৯৬৬ সালে এই ক'ছত্র লিখতে গিয়ে ভাবছি আজও কি ওই অঞ্চলে এই চমৎকার ব্যবস্থাটির চলন আছে।

বুড়ীরচর গ্রামে এক লোকের বাড়ীতে থেকে আমি ছোট-বড় ছেলেদের অ-আ-ক-খ পড়ানো শুরু করে দিলাম। আলিফ গাজী নীল গাজী দুই ভাইয়ের নামে লোকে বাড়ীটিকে আলিফ-নীল গাজীর বাড়ী বলতেন। তারা কৃষক পরিবার।

বাকেরগঞ্জ জিলার নিরক্ষর গ্রামগুলিতে নোয়াখালী জিলা হতে অল্প শিক্ষিত লোকেরা এসে সেই সময়ে এইভাবে বিদ্যা ও অবিদ্যা দান করতেন। আমার ইচ্ছা ছিল এই কাজ করে কিছু পয়সা রোজগার হলে বাকেরগঞ্জ জিলারই কোনো হাই স্কুলে ভর্তি হয়ে যাব। আমি এখানে একরকম অজ্ঞাতবাসে ছিলেম। আমার অগ্রজ মৌলবী মকবুল আহ্‌মদ নানান সূত্রে খুঁজে খুঁজে একদিন ওই বুড়ীরচর গ্রামে আলিফ-নীল গাজীর বাড়ীতে উপস্থিত। বললেন, "বাড়ী চল, হাই স্কুলেই তোমায় পড়তে দেব।"

১৯০৬ সালে সন্দ্বীপ কার্গিল হাই স্কুলের নীচের ক্লাসে ভর্তি

১৯০৬ সালের মার্চ মাসে সন্দ্বীপ কার্গিল হাই স্কুলের নীচের ক্লাসে ভর্তি হলাম। আমার বয়স তখন ষোল সতেরো বছর হওয়া সত্ত্বেও স্কুল কর্তৃপক্ষ আমায় নীচের ক্লাসে ভর্তি করে নিলেন। আরও সৌভাগ্যের বিষয় এই হলো যে বাচ্চা ছেলেরা আমায় তাদের ক্লাসে বসতে দিল এবং আমার মাথায় চাটি মেরে তাদের ক্লাস হতে বা'র করে দিল না। আমি বাঙলা তাদের চেয়ে অনেক ভালো

জানতেম বলে তারা নিজেদের মধ্যে আমায় গ্রহণ করে নিয়েছিল। মাদ্রাসায় পড়ার সময়ে আমি বাঙলার চর্চা কখনও ছেড়ে দিইনি। তার মানে, বাঙলা বই পেলে আমি পড়তাম বাঙলা মাসিক বা সাপ্তাহিক কাগজ পেলে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত না পড়ে ছেড়ে দিতেম না। মাসিক কাগজে নানান রকম প্রবন্ধ পড়া হতেই আমার মনে ইংরেজি পড়ার ঝোঁক চেপেছিল। আমি তখন বিশেষ ভাবে পড়তে চাইতাম মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস। ইংরেজিতে তা পড়ার সুবিধা বেশী। আমাদের দ্বীপের এস এম আবদুল আহাদ তখন কলকাতায় এফ এ (পরেকার আই এ) পড়েন। বয়সে আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড় হবেন। তিনি নানান বিষয়ে পড়াশুনা করতেন এবং বাঙলা মাসিকে তাঁর লেখা ছাপা হতো। আমার হাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরে তিনি একদিন আমায় বললেন, "কমপক্ষে এতটা ইংরেজি ভাষা তো আয়ত্ত করুন যাতে সৈয়দ আমীর আলীর 'এ শর্ট হিস্টরি অফ দি সারাসিন্স'১ এবং 'দি স্পিরিট অফ ইসলাম'২ পড়ে অনায়াসে বুঝতে পারেন"। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে কলঙ্কিত বলে আমি কিছুতেই পড়তে চাইতাম না। আমার এই বন্ধুই আমাকে দিয়ে উপন্যাসগুলি পড়িয়ে ছেড়েছিলেন। দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে তিনি অকালে মারা গেছেন।

১৯১০ সালে আমি সন্দ্বীপ কার্গিল হাই স্কুল হতে নোয়াখালী জিলা স্কুলে চলে যাই। বাঙলা দেশে জিলার সদরে অবস্থিত গবর্নমেণ্ট স্কুলকে জিলা স্কুল বলা হতো, এখনও হয়তো তাই বলা হয়। ১৯১৩ সালে এই স্কুল হতে পরীক্ষা দিয়ে আমি মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করি।

আমার নোয়াখালী জিলা স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে গোপনে কে কোন্ আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন তা জানিনে, তবে অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ত্রাস-বাদী বিপ্লবী আন্দোলনের সংস্রবে গিরেফ্তার হয়ে ডেটেনিউ (পরে স্টেট প্রিজনার) হয়েছিলেন, অবশ্য তাঁর কলেজে পড়ার সময়ে। আমাদের শ্রেণীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন তিনি। মুক্তি পাওয়ার পরে তিনি আর রাজনীতিতে যোগ দেননি। পরে শুনেছিলাম ওকালতি করার জন্যে বর্মায় গিয়েছিলেন। খুরশীদ আলাম প্রথমে সব ডেপুটি, পরে প্রমোশন পেয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। খবীরউদ্দীন আহ্‌মদের সঙ্গে বন্ধু হিসাবে আমার ঘনিষ্ঠতা খুবই বেশী ছিল। বি এ পাস করার পরে তিনি স্কুল সব ইন্‌স্পেক্টরের চাকরী নিয়েছিলেন। আরও বড় চাকরী পাওয়ার মতো মুরুব্বি তাঁর ছিল না। কিন্তু এই চাকরীতেই ক্রমশঃ পদোন্নতি করে তিনি রিজিওনাল ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুলস্ পর্যন্ত হয়েছিলেন। দক্ষিণ হাতিয়া দ্বীপের লোক হলেও শুনেছি চাকরী হতে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি কুমিল্লা শহরেই স্থায়ী বাসা বেঁধেছেন। আমার রাজনীতি সরকারী চাকুরে বন্ধুদের সঙ্গে আমার পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল। তবুও শুনেছি খবীরউদ্দীনের অধীনে চাকরী করতে গিয়ে আমার আত্মীয় স্বজনেরা স্বজনের মতো ব্যবহার পেয়েছে। আমার মেয়ে যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছিল তখন খবীর তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছেন সব সময়ে। এসব হতে বোঝা যায় যে বিচ্ছেদ ঘটলেও খবীর আমায় ভোলেননি।

১৯১৩ সালে আমি প্রথমে হুগলী মোহ্‌সিন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেম।

1 A Short History of the Saracens

2 The Spirit of Islam (A History of the Evolution and the Ideals of Islam with a Life of the Prophet) by Syed Ameer Ali.

তখন কিন্তু কলেজটি পুরনো মোহ্সিন কলেজ (মহাত্মা মোহ্সিনের বিদ্যালয়) নামটি বর্জন করে শুধু হুগলী কলেজ হয়েছিল। সেখানে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেই বছরেই আমি কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে চলে আসি। সেই থেকে আমি কলকাতার একজন স্থায়ী বাশিন্দা। একটি কথা কিন্তু আমার বলা হয়নি। সেই যে আমি অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিলেম তার শাস্তিস্বরূপ ১৯০৭ সালে মুরব্বিরা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বিয়ে কোনো দিন আমায় ঘর-সংসারে বাঁধতে পারেনি।

আই. এ. পরীক্ষায় ফেল করে আমি পড়া ছেড়ে দিলেম। বিদ্যার্জন তেমন কিছু হলো না। তবুও একবার খতিয়ে দেখলেম আমি কতটা কি শিখেছি। দেখলেম বাঙলাটা আমি মোটামুটি লিখতে পারি, তবে তেমন উঁচু দরের কিছুই নয়। ইংরেজি বই ও খবরের কাগজ পড়লে একরকম বুঝে নিতে পারি। উর্দু বই পড়লে যদিও তা বোঝা যায়, কিন্তু পড়তে বড় বেশী সময় লাগে। অনেক চেষ্টায় ক্লাসিকাল পার্সী ভাষা আমি কিছু কিছু বুঝতে পারতেম। চর্চার অভাবে আমার সেই জ্ঞানটুকু আজ ভোঁতা হয়ে গেছে। স্কুলে ও কলেজে আমার দ্বিতীয় ভাষা আরবী ছিল। কিন্তু আমার ভিতরের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম যে আরবী আমি কিছুই শিখিনি।

১৯০৬ সালের মার্চ মাসে আমার ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই (১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে) ভারতের তখনকার গবর্নর জেনেরেল লর্ড কর্জনের হঠকারিতায় বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, তিনি গ্রেট ব্রিটেনের সেক্রেটারী অফ্ স্টেট্ ফর্ ইন্ডিয়ার সম্মতি নিয়েই কাজটি করেছিলেন। এই দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের সব কয়টি জিলা, দার্জিলিং জিলাকে বাদ দিয়ে সমস্ত উত্তরবঙ্গ এবং চীফ্ কমিশনার শাসিত আসামকে নিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়েছিল। আর, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ছোট নাগপুর ও ওড়িশাকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল বঙ্গদেশ। আসাম প্রদেশ যখন বহুপূর্বে গঠিত হচ্ছিল তখন তার লোকসংখ্যা বড় কম ছিল ব'লে বাঙলা দেশ হতে বাঙলাভাষী সীলেট, কাছাড় এবং রংপুর জিলার একটি অংশ কেটে নিয়ে আসামে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে যে-বঙ্গদেশ থেকে গেল তাতে বঙ্গভাষী লোকেরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়লেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ কার্যতঃ হয়ে দাঁড়াল বঙ্গ সংস্কৃতিরও ব্যবচ্ছেদ। তাই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এমন প্রচন্ড আন্দোলন শুরু হয়ে গেল যে তাতে সমস্ত ভারতবর্ষ কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনও জোরদার হয়ে উঠল উভয় বাঙলায়। পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানালেন। পূর্ববঙ্গে তাঁরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে পড়েছিলেন। চাকরীও তাঁরা বেশী বেশী পেতে লাগলেন। যুক্তবঙ্গে এত সব সুবিধা তাঁরা পেতেন না। অবশ্য, এসব সুযোগ-সুবিধার ভাগ যে পূর্ব-বঙ্গের বাশিন্দা হিন্দুরাও কিছু কিছু পাচ্ছিলেন না তা নয়। কিন্তু, আন্দোলনের একটা মস্ত বড় কারণ যে সংস্কৃতির ব্যবচ্ছেদ ও বঙ্গদেশে বঙ্গভাষীদের সংখ্যা-লঘুতে পরিণত হওয়া ছিল তাতে সন্দেহ নেই। পূর্ববঙ্গের বড় বড় হিন্দু জমীদাররা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধ-আন্দোলনে প্রচুর সাহায্য করছিলেন। আন্দোলন জোরদার হওয়ার এটাও একটি কারণ ছিল। জমীদাররা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে, মুস্‌লিম কৃষক-প্রজা প্রধান পূর্ববঙ্গে না জমিদারী প্রথা বিলোপ হয়ে যায়।

উভয়বঙ্গের অল্প সংখ্যক মুসলমানও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধ-আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার মিস্টার আবদুর রসুল, মিস্টার

আবদুল হালীম গজনবী, পরে সার আবদুল হালীম গজনবী, মৌলবী মনীরুজ্জমান ইস্‌লাম আবাদী, মৌলবী কাজিম আলী (চট্টগ্রামে তিনি কাজিম আলী মাস্টার নামে খ্যাত ছিলেন), সিরাজগঞ্জের সৈয়দ ইসমাইল হুসয়ন সিরাজী, বর্ধমানের মৌলবী আবুল কাসিম, মৌলবী মুজীবুর রহমান ("দি মুসলমান" নামক ইংরেজি সাপ্তাহিকের সম্পাদক), মৌলবী মুহম্মদ আকরম খান (বহু পরে পাকিস্তানের প্রবক্তা এবং এখন[১] ঢাকার 'দৈনিক আজাদ' নামক বাঙলা দৈনিকের মালিক), ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পাটনার সৈয়দ আলী ইমাম ও সৈয়দ হাস্‌সান ইমাম (ব্যারিস্টার ভ্রাতৃদ্বয়), মিস্টার মজাহারুল হক, প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার (পরে পাটনার বিখ্যাত সদাকত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা) ও মৌলবী লিয়াকত হুসয়ন প্রভৃতি।

আমি বঙ্গভঙ্গের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কোনো আন্দোলনে যোগ দিইনি। কোনো পক্ষে যোগ দিলে তা মোটেই বেমানান হতো না। আমার মতো ষোল-সতেরো বছরের ছেলেরাও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তবে, সাম্প্রদায়িক কোনো ব্যাপারে আমি একেবারেই থাকিনি একথা বললে অপলাপ করা হবে। মুসলমানদের বিশেষ দাবী-দাওয়ার সভা-সমিতিতে আমি তখন যোগ দিয়েছি। আমি সেই সময় ধার্মিক মুসলমানও ছিলেম। দিনে পাঁচবার নামাজ না পড়লেও রমজানের পুরো মাসটি দিনের বেলা উপোস করে কাটাতাম।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন ও স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের আন্দোলনও চলেছিল। এই আন্দোলন এতই প্রবল হয়েছিল যে উভয় বাঙলায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন সহ রাজনীতিক আন্দোলনের নামই হয়ে গিয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন। এই নামটি এখনও যে অচল হয়ে গেছে তা নয়। তবে, নামটির সঙ্গে আগেকার দিনের সেই ঝাঁজ আর নেই। ১৯২৪ সালে আমরা সংযুক্ত প্রদেশের (এখনকার উত্তর প্রদেশের জেলে গিয়ে দেখেছিলেম যে সাধারণ কয়েদীরা ও জেলের ওয়ার্ডাররা তো বটেই এবং জেল অফিসের কর্মচারীরাও রাজনীতিক বন্দীদের বলেন 'খিলাফৎওয়ালা'। ক'বছর আগেকার খিলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলন এ ভাবে তার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিল।

আমি আসল কথা হতে সরে যাচ্ছি। তবুও এখানে একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে স্বদেশী যুগের গোড়ায় বাঙলা দেশে (উভয় বাঙলায়) জাপানী পণ্যও স্বদেশী পণ্যরূপে পরিগণিত ছিল। সেই সময় আমি নোয়াখালীতে নিজের চোখে দেখেছি যে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্যে ছাত্ররা যে-সকল ছাপানো ইশ্‌তিহার দেওয়ালে মেরে দিতেন সে-সকল ইশ্‌তিহারে জাপানী দ্রব্যকেও স্বদেশী দ্রব্যরূপে গণ্য করার অনুরোধ থাকত। ইউরোপ হতে আমদানি করা দিয়াশলাই ব্রিটিশ পণ্য ছিল না। তবুও জাপানের হাতী মার্কা দিয়াশলায়ের পক্ষে জোর প্রচার চলত, যদিও এই দিয়াশলাই একেবারেই জ্বলতে চাইত না। প্রচারের ফলে অনেকে তো কিনতেন এবং পরম নিষ্ঠার সহিত তা জ্বালাবার চেষ্টাও করতেন। ১৯০৪ সনের রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের বিজয়লাভ ভারতের, বিশেষ করে বাঙলার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত লোকদের বিমুগ্ধ করেছিল। জাপানের দূতেরা কৃষ্টি দূতরূপে আগে হতেই ভারতে আনাগোনা শুরু করে দিয়েছিলেন তারা আমাদের

১ এ পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে আকরম খান সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ওপরে প্রভাব বিস্তারে সমর্থও হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ওপরে জাপানের নজর পড়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যে ভারত আক্রমণ করতে এসেছিল তা সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধে হঠাৎ-স্থিরকরা একটি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার মোটেই ছিল না। বহু বছর আগে হতে তার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছিল। আমাদের ওপরে জাপানের বোমা যখন পড়েছিল তখনও আমাদের বহু দেশবাসী জাপানকে বন্ধুরূপে গণ্য করেছেন।

সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ শুধু স্বদেশী যুগের একজন বড় নেতা যে ছিলেন তা নয়, একজন সাহসী নেতাও তিনি ছিলেন। মাওলানা মুহম্মদ আকরম খানের মুখে শুনেছি, ১৯০৬ সালের বরিশাল প্রাদেশিক কনফারেন্সের সময় ওখানকার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট নিজের বাংলোয় ডেকে নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বসতে না বলে যখন অপমানিত করেছিলেন তখন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ একখানা চেয়ার টেনে জোর করে তাঁকে (সুরেন্দ্রনাথকে) বসিয়ে দিয়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন সেই অল্পসংখ্যক রাজনীতিক নেতাদের একজন ছিলেন, যাঁরা ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা চাইতেন। ১৯৬০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে আমি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের হিতবাদীর সহকর্মী শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত দেখা করেছিলেম। আমার ইচ্ছা ছিল যে কাব্যবিশারদের জাপানে যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে তাঁর নিকট হতে কিছু জেনে নেব। ৯৭ বছরে পা বাড়ালেও শ্রীকেশবচন্দ্রের স্মৃতি তখনও প্রখর ছিল। কথাও তিনি বলছিলেন পরিষ্কার ভাষায়। এতটুকুও জড়তা তাতে আসেনি। তিনি আমায় জানালেন যে ১৯০৭ সালে কাব্যবিশারদের সহমতের বন্ধুরা তাঁকে জাপানে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যে কাব্যবিশারদ জাপানে গিয়ে ভারতের মুক্তিদূত হিসাবে কাজ করবেন। তাঁর কাজ হবে জাপান ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে কি ভাবে কতটা সাহায্য করতে পারবেন তা জেনে আসা। কাব্যবিশারদ সত্য সত্যই অসুস্থও ছিলেন। তিনি কিড্নীর পীড়ায় (Bright's disease) ভুগছিলেন। ভেবেছিলেন সমুদ্র ভ্রমণে উপকার হবে। যা'ক, জাপানে পৌঁছে কাব্যবিশারদ অনেক পদস্থ জাপানীর সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তা থেকে তিনি বুঝেছিলেন যে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে কোনো সাহায্যই জাপান ভারতকে করবে না। উপরন্তু, ইংরেজের দুর্বলতার সুযোগ বুঝে জাপান একদিন ভারতকে নিজ কবলে আনার প্রত্যাশী। কাব্যবিশারদ দারুণ হতাশ হন। তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল যে তিনি হয়তো অসুস্থতার কারণে দেশে আর পৌঁছতে নাও পারেন! সত্যই ফেরার পথে জাহাজে মারাও যান তিনি। তিনি তাঁর জাপানে লব্ধ অভিজ্ঞতার কথা একখানা পত্রে লিখে দেশের কোনো বিশেষ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই পত্র পৌঁছেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে পত্রখানার একটি বাক্য—"জাপান ভারতের বন্ধু নহে"—বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের অভ্যুদয়

আমি অত্যন্ত গরীব ছাত্র ছিলেম। যথাসাধ্য স্বদেশী দ্রব্য আমিও ব্যবহার করতাম। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের (বিখ্যাত উকীল কুমুদিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের ছেলে) নোয়াখালী বাজারস্থ "স্বদেশী স্টোর্স" (?) হতে মিলের তৈয়ারী ধুতি কিনে আমিও পরতাম।

বাঙলায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অভ্যুদয় একটি স্মরণীয় ঘটনা। এটা ছিল একটি গোপন আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের আগেই তাঁদের দল গড়ে উঠেছিল। অবশ্য,বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁদের বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছিল। এটা বিশেষ লক্ষণীয় যে বাঙলা দেশেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিশেষ দানা বেঁধে উঠেছিল। বাঙলার শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' সম্প্রদায়ের ভিতরই ছিল তার উর্বর ক্ষেত্র। বাঙলার বাহিরেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু বাঙলার মতো দীর্ঘস্থায়ী তা কোথাও হয়নি। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আমার মনের যে অবস্থা ছিল, আর যে-রোমাঞ্চ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ছিল তাতে আমার পক্ষে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তার পথে দুস্তর বাধা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "আনন্দ মঠ" হতে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা প্রেরণা লাভ করতেন। এই পুস্তকখানি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এর মূল মন্ত্র ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গান। তাতে আছে

> বাহুতে তুমি মা শক্তি
> হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
> তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
> ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী ইত্যাদি।

একেশ্বরবাদী কোনো মুস্‌লিম ছেলে কি করে এই মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারত? এই কথাটা কোনো হিন্দু কংগ্রেস নেতাও কোনো দিন বুঝতে পারেননি। বাঙলা দেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন ছিল। কিন্তু তা হিন্দু উত্থানের আন্দোলনও ছিল। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বারীন্দ্রকুমার ঘোষও আন্দামান হতে ফেরার পরে এই কথাই লিখেছিলেন। তাঁর সেই পুস্তকখানি এখন দুষ্প্রাপ্য। উনিশ শ' বিশের দশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে ধারণার পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। তবুও আমি ১৯২৩-২৪ সালে তাঁদের একজন বড় নেতাকে দেখেছি, যে-বিকালে তিনি জেলে এলেন তার পরের সকালেই জেল আফিসে একটি সম্ভ্রমাকর্ষক কালীর ছবির জন্য (an imposing picture of Goddess Kali) অর্ডার পাঠালেন। উনিশ শ' ত্রিশের দশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা জেলখানায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পড়েছিলেন এবং তাঁদের ভিতর হতে বহু সংখ্যক লোক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।

আমি কিন্তু ধর্মানুশাসিত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনকে দোষ দিই না এই কারণে যে তার আগে মুসলমানরাও তো এই রকমই করেছিলেন। তাঁরাও চেয়েছিলেন মুস্‌লিম রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মুস্‌লিম আন্দোলন আরও বেশী প্রসারিত ছিল। তাঁরা অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন শিখ রাজত্ব ও ইংরেজের বিরুদ্ধে এবং কৃষকেরাও যোগ দিয়েছিলেন তাতে। তাদের বলিদানও ছিল আরও অনেক বেশী।

বাঙলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কর্মপদ্ধতিকে আমরা সমালোচনা করি। কিন্তু তাঁদেরও বড় অবদান আছে। সেই অবদানকে ও তাঁদের বলিদানকে কে না শ্রদ্ধা ক'রে পারেন?

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন নিষ্ফল হয়নি। ইংল্যাণ্ডের রাজা ও ভারতের

সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাঁর অভিষেক উপলক্ষে ভারতে এসেছিলেন। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীর দরবার হতে তিনি বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন বিহার ও ওড়িশা প্রদেশও সৃষ্টি করলেন। নূতন ব্যবস্থায় পূর্ববঙ্গ, দার্জিলিংসহ উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ (প্রেসিডেন্সী আর বর্ধমান বিভাগ) বঙ্গ প্রদেশে পরিণত হলো। বিহার, ছোটনাগপুর ও ওড়িশাকে নিয়ে হলো বিহার ও ওড়িশা প্রদেশ। বঙ্গভঙ্গের আগে ওড়িশা, বিহার (ছোটনাগপুর সহ) ও বাঙলা একত্রে ছিল বঙ্গদেশ। আসাম আবারও চীফ্ কমিশনার শাসিত প্রদেশে পরিণত হলো। এই রাজকীয় ঘোষণায় কলকাতা হতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত করা হলো দিল্লীতে। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ছিল ঢাকাতে। পূর্ববঙ্গকে, সম্ভবত যাঁর বিশাল ভূসম্পত্তির ওপরে নূতন প্রাদেশিক রাজধানী নির্মিত হয়েছিল সেই নওয়াব খাজা সলীমুল্লাকেও, সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ঘোষিত হলো যে ঢাকায় নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে।

নূতন বাঁটোয়ারায় বঙ্গভাষী সীলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়ার একটি অংশ তো আসামে থেকে গেলই, বড় তাড়াহুড়ার ভিতর দিয়েই এই কাজটি হওয়ায় বিহার ও ছোটনাগপুরেও বাঙলাভাষী অঞ্চল রয়ে গেল। তবুও বাঙলাভাষীদের বিপুল সংখ্যাধিক্যে নূতন বঙ্গদেশ গঠিত হয়েছিল।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। মুস্‌লিম সাম্রাজ্য তুর্কি ইংরেজের বিরুদ্ধ পক্ষে, অর্থাৎ জার্মানদের পক্ষে যোগ দেওয়ায় ভারতের মুসলমানরা অন্ততঃ মনে মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু কাজের বেলায় ইংরেজের মুস্‌লিম সৈন্যরা তো যুদ্ধে গেলেনই,—হাজার হাজার অসামরিক মুসলমানও যুদ্ধের নানান ধরনের কাজ নিয়ে ইরাক প্রভৃতি স্থানে গেলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম বন্ধ করলেন না। তাঁদের তো ছিল ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর সহিত যোগ দিয়ে অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করে ভারতে একটি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাও তাঁদের ছিল। কিন্তু ইংরেজের কানে এ খবর পৌঁছে যাওয়ায় তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

ভারতে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট পাশ করে ভারতময় হাজার হাজার লোককে বিনাবিচারে বন্দী করলেন। যুদ্ধের শেষ দিকে ১৯১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশনও প্রযুক্ত হয়।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কিন্তু যুদ্ধের প্রতি তাঁদের সমর্থন ও আনুগত্য জানালেন। যে-চার বছর যুদ্ধ চলেছিল তার প্রতি বছরই কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের মঞ্চ হতে যুদ্ধের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ঘোষিত হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে দিল্লীতে ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হলো তাতে রাজানুগত্যের প্রস্তাব তো পাস হলোই, যুদ্ধের সফল সমাপ্তি হওয়ায় ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে অভিনন্দন জানাতেও ভুল হলো না। কংগ্রেস যে যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন তার প্রতিদানে কংগ্রেসকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে মাদ্রাজের গবর্নর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড যোগ দিলেন। ১৯১৫ সালে মিলিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বোম্বের গবর্নর লর্ড উইলিংডন যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে লখ্‌নৌতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন যুক্ত প্রদেশের (উত্তর প্রদেশ) গবর্নর সার জেম্‌স্ মেস্টন। তাঁর মণ্ডপে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের সমস্ত প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন।

১৯১৬ সালে দেশে নানান রকম আন্দোলন শুরু হয়। হাজার হাজার মানুষকে

বিনা বিচারে বন্দী করে রাখার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল তা খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে এখন যেখানে মহাজাতি সদন নির্মিত হয়েছে সে জায়গায় কিংবা তারই সংলগ্ন কোনো জায়গায় একটি বিরাট বন্দীমুক্তির সভা হয়েছিল। মুন্‌শী সদরুদ্দীন লেনের একটি ইলাকার বস্তী ও পাকা বাড়ীঘর ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাস্ট ভেঙে ফেলেছিল। এই খালি জায়গাতেই সভাটা হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ ও বিপিনচন্দ্র পাল এই সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। আমি এই সভায় উপস্থিত ছিলেম। ভারতের সম্রাজ্ঞী হয়ে রানী ভিকটোরিয়া যে ঘোষণা প্রচার করেছিলেন দাশ সাহেব সেই ঘোষণাটি হাতে নিয়েই বক্তৃতা করে-ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে থাকার সময় মুহম্মদ আলীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় হয়েছিল। সেই জন্য বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে বন্দীদের মধ্যে মুহম্মদ আলীর নাম তিনি বারে বারে উল্লেখ করছিলেন। তিনি ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর পুরো বক্তৃতা পরের দিনের 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলেন, চিত্তরঞ্জন দাশ নতুন ক'রে রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। তাঁর বড় মেয়ে অপর্ণা দেবী বলছেন এই মিটিংটি ১৯১৬ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল ১৯১১ সালে। কিন্তু ১৯১৭ সালে ভারতে এই আন্দোলন বিশেষ হয়ে উঠেছিল এবং তা প্রবল রূপ ধারণ করেছিল ১৯২০ সালে। নিরুপদ্রব প্রতিরোধের কথাও ১৯১৭ সাল হতে হাওয়ায় ভাসতে থাকে। সভা-সমিতির অধিবেশনের সংখ্যাও এই বছরে খুব বেড়ে যায়। ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের লখ্‌নৌ অধিবেশনে মুস্‌লিম লীগের সঙ্গে সম্‌ঝতার ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই সকল সভায় যোগ দিচ্ছিলেন। ১৯১৬ সাল হতেই আমি সকল প্রকার রাজনীতিক সভা ও মিছিলে যোগ দিতে আরম্ভ করি। ১৯১৭ সালে কলকাতায় কংগ্রেস ও মুস্‌লিম লীগের অধিবেশন হয়। সেবারেই আমি প্রথম কংগ্রেস ও মুস্‌লিম লীগের অধিবেশনে দর্শকরূপে যোগদান করি। এই দু'টি সংগঠনেরই তখন যে কায়দা-কানুন ছিল তাতে ইচ্ছা করলেই আমি প্রতিনিধি হতে পারতাম, কিন্তু দর্শকরূপে যোগদান করাই আমি শ্রেয়স্কর মনে করেছিলেম।

১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট তারিখে ইংল্যাণ্ডে ভারতের সেক্রেটারি অফ্‌ স্টেট, অর্থাৎ ব্রিটিশ মন্ত্রীদের ভিতরে ভারতের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, মিস্টার মণ্টেগু ঘোষণা করলেন যে ভারতবাসীকে দায়িত্বপূর্ণ শাসন ক্ষমতা দেওয়া হবে। এই ঘোষণার ফলে নিরুপদ্রব প্রতিরোধের যে সব কথাবার্তা চলছিল তা থেমে যায়। ১৯১৭-১৮ সালে মিস্টার মণ্টেগু ও ভারতের বড় লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ভারতে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে ভারতীয়দের মতামত সংগ্রহ করেন। তাঁদের যুক্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের জুন মাসে। কংগ্রেসের একটি বড় অংশ এই রিপোর্টে লিখিত প্রস্তাব মেনে নিতে চাইলেন এবং অপরাংশ বললেন, প্রস্তাব মোটেই আশানুরূপ নয়। এই নিয়ে আলোচনার জন্যে ১৯১৮ সালের ২৯শে আগস্ট তারিখে বোম্বেতে সৈয়দ হাস্‌সান ইমামের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। মাহ্‌মুদাবাদের মহারাজের সভাপতিত্বে একই সময় বোম্বেতে মুস্‌লিম লীগের এক অধিবেশন বসে। উভয় অধিবেশনের সিদ্ধান্ত একই রকম হয়েছিল। তার মোদ্দা কথা এই ছিল যে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টের প্রস্তাব-গুলি নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও অসন্তোষকর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে স্ব-শাসন ছাড়া অন্য কোনো প্রস্তাবই গ্রহণীয় হতে পারে না, ইত্যাদি।

১৯১৭ সালের মার্চ মাসে রাশিয়ায় যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয় তাতে জারের পতন ঘটে। তার পাঁচ মাসের ভিতরে যে মণ্টেগু ভারতকে দায়িত্বপূর্ণ শাসনক্ষমতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন তার পেছনে এই বিপ্লবেরও কিছু প্রভাব নিশ্চয় ছিল। ১৯১৭ সালের নবেম্বর মাসে রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লব সফল হয় এবং তার ফলে মজুর শ্রেণীর পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টির অধিনায়কত্বে মেহনতী জনগণের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট চেঁচাতে লাগল যে যুদ্ধ ফ্রণ্টে রাশিয়ায় ভাঙন ধরল। রাশিয়ার সর্বহারা বিপ্লবের প্রকৃত খবর যেন ভারতে আসতে না পায় তার জন্যে ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা করল। সেই সঙ্গে লেনিনের বিরুদ্ধে ও সোবিয়েত নেতাদের বিরুদ্ধে নানান ধরনের কুৎসারও প্রচার হতে থাকল। ইউরোপে তো যেতেন শুধু ভারতের ধনী লোকেরা কিংবা তাঁদের অনুগৃহীত লোকেরা। তাঁরা রুশ বিপ্লবের ওপরে সদয় ছিলেন না। তা সত্ত্বেও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে খবরগুলির ভিতর হতেও ভালো খবর বের হয়ে পড়ত। তাছাড়া ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের তরফ হতে যা কিছু মন্দ বলে প্রচারিত হতো দেশের সাধারণ মানুষ ধরে নিতেন যে তার ভিতরে নিশ্চয় কিছু ভালো আছে। আগেই বলেছি, ১৯১৮ সালে আমাদের দেশের মজুরদের ভিতরেও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ওই সালের ১১ই নবেম্বর তারিখে প্রথম মহাযুদ্ধের বিরতি ঘোষিত হয়। এই সময়ে নানাস্থানে মজুরদের ধর্মঘটও শুরু হয়ে যায়। ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে তা বেড়েই চলল। রুশ বিপ্লব আমাদের দেশের মজুরদের সামনেও আশার আলো তুলে ধরেছিল। মজুর সংগ্রামের ভিতর দিয়েই ১৯২০ সালে সারা ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুদ্ধের সময় ডিফেন্স অফ্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট যে পাস হয়েছিল সেকথা আগে বলেছি। এই আইনের মিয়াদ ছিল যুদ্ধবিরতির পরে ছয় মাস। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট বুঝতে পেরেছিল যে যুদ্ধের শেষে ভারতে আন্দোলন বাড়বে। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করার জন্যে ১৯১৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ভারত সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করল। এই কমিটির মেম্বর ছিলেন পাচজন।

(১) মিস্টার জাস্টিস এস. এ. টি. রওলাট (Mister Justice S. A. T. Rowlatt, King's Bench Division of His Majesty's High Court of Justice) সভাপতি ; ,

(২) সার ব্যাসিল স্কট (Sir Basil Scott, Chief Justice of Bombay) ;

(৩) দিওয়ান বাহাদুর সি. ভি. কুমারস্বামী শাস্ত্রী (Diwan Bahadur C. V. Kumaraswami Sastri, Judge, High Court of Madras) ;

(৪) সার ভের্নি লোভেট (Sir Verney Lovett, Member, Board of Revenue, United Provinces) এবং

(৫) মিস্টার প্রভাসচন্দ্র মিত্র কলকাতা হাইকোর্টের উকীল (Vakil)। এই কমিটির নাম ছিল সিডিশন কমিটি। কিন্তু সভাপতির নাম অনুসারে তা রওলাট কমিটি নামে খ্যাত হয়েছিল। ,

উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনগুলির সহিত সংসৃষ্ট অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রসমূহের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা এবং এইসব দমনের জন্যে কোন্ দমনকারী আইন প্রণয়ন করা যায় সেই বিষয়ে সুপারিশ করা। ১৯১৯ সালের ২৯শে জানুয়ারি তারিখে রওলাট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টের

সুপারিশ অনুযায়ী দু'টি আইনের খসড়া ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতেই তৈয়ার হয়ে যায়। সাধারণ ভাবে খসড়া দু'টি রওলাট বিল নামে খ্যাত হয়েছিল। আসলে খসড়া দু'টির নাম (১) দি ইণ্ডিয়ান ক্রিমিনাল ল এমেণ্ডমেণ্ট বিল নম্বর, ১, ১৯১৯; (২) দি ক্রিমিনাল ল এমার্জেন্সি পাওয়ার্স বিল নম্বর ২, ১৯১৯। ১৯১৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আইনের এই খসড়া দু'টি কেন্দ্রীয় আইন সভায় (সেন্ট্রাল লেজিস্লেটিব এসেম্ব্লি) উপস্থিত করা হয়। দ্বিতীয় খসড়াটি শেষ পর্যন্ত পাস করানো হয়নি, তবে প্রথম খসড়াটি ১৯১৯ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আইনে পরিণত হয়ে গেল। শুরু হতেই গান্ধীজী প্রস্তাব করলেন যে এই আইনকে প্রতিরোধ করতেই হবে। দেশের নানা স্থান হতে সাড়াও তিনি পেলেন। প্রথমে এর প্রতিবাদে ৩০শে মার্চ তারিখে দেশময় হড়তাল ঘোষিত হয়। পরে এই তারিখ পরিবর্তন করে ৬ই এপ্রিল করা হয়েছিল। কেন জানিনে, দিল্লীতে এই তারিখ পরিবর্তনের খবর পৌঁছয়নি। সেখানে ৩০শে মার্চ তারিখেই হড়তাল হয়। এই মিছিলের ওপর গবর্নমেণ্ট সেদিন গুলি চালাল। দেশের অন্য সব জায়গায় ৬ই এপ্রিল তারিখে হড়তাল পালিত হলো। কিন্তু ভারতের ব্রিটিশ সরকার গোলযোগ সৃষ্টি করল অমৃতসরে। ডক্টর সয়ফুদ্দীন কিচলু ও ডাক্টার সত্যপাল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। ১০ই এপ্রিল তারিখে অমৃতসরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট (পাঞ্জাবে ডেপুটি কমিশনার বলা হতো) তাঁদের দুজনকে নিজের বাড়ীতে ডেকে নিলেন। তারপরে তাঁদের কি করা হলো, কোথায় পাঠানো হলো তার কিছুই জনসাধারণকে জানতে দেওয়া হলো না। হতাশা ও ক্রোধে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। গুলি চলল অমৃতসরেও। এবারে জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তারা ক'জন ইংরেজকে খুন করলেন এবং একটি ব্রিটিশ ব্যাঙ্কের বাড়ী পুড়িয়ে দিলেন।

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল নববর্ষের দিন (বৈশাখী) ছিল। এই দিনে হাজার হাজার লোক অমৃতসরে জড়ো হয়ে থাকেন। বিশ হাজার লোক জড়ো হয়েছিলেন ওখানকার জালিয়ানওয়ালা বাগে। সেখানে বক্তৃতা চলছিল। অমৃতসরে সামরিক আইন জারি হওয়ার কোনো ঘোষণা তখনও ছিল না। এই বাগের চার দিকে পাকা প্রাচীর। যাতায়াতের পথ মাত্র একটি। হঠাৎ ব্রিটিশ সামরিক অফিসার জেনারেল ডায়ারের পরিচালনায় ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্যরা সমবেত জনমণ্ডলীর ওপরে গুলি চালাতে লাগল। ষোলো শ' রাউণ্ড গুলি চালানোর পরে গুলি ফুরিয়ে যায়। জেনারেল ডায়ার বুক ফুলিয়ে বলল, গুলি না ফুরিয়ে গেলে আরও গুলি চালানো হতো। লোকেদের বেরুবার কোনো পথ ছিল না। প্রায় চার শ' লোক হত হলেন, আর আহত হলেন বারো শ' লোক। এটা সরকারী হিসাব। আসলে আরো অনেক বেশী লোক হতাহত হয়েছিলেন। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হলো। অত্যাচার-অপমানের স্রোত বয়ে চলল অমৃতসর, লাহোর (লাহোরেই সর্বাপেক্ষা বেশী), শেখুপুরা, গুজরানওয়ালা, গুজরাত ও কসুর প্রভৃতি স্থানের ওপর দিয়ে। বহুলোক প্রাণ হারালেন, বহুলোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন, আর জেলের বাইরে যাঁরা থাকলেন তাঁরা যে-ভাবে নির্যাতিত ও অপমানিত হতে লাগলেন তা ভাষায় অবর্ণনীয়। পাঞ্জাবের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। তবু কিছু কিছু খবর বাইরে পৌঁছাল। পাঞ্জাবের লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের প্রতিবাদে নানা স্থানে মিছিল বার হলো, আবার এই প্রতিবাদ মিছিলগুলির ওপরেও গুলি চলল। কলকাতায় গুলি চলেছিল।

নিহত হয়েছিলেন ছয় জন, আর আহত বারো জন। ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা পাঞ্জাবের এই লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ রাজার দেওয়া নাইট খেতাব বর্জন করলেন। আমাদের মানবতার অবমাননায় কবির হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। সে-সময়ে যে-পত্র তিনি ভারতের ব্রিটিশ ভাইসরয়কে লিখেছিলেন তার ভাষা অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের খেতাব বর্জনে বিশ্বে যে-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। তা এই থেকে বোঝা গিয়েছিল যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট বছরের পর বছর কবির খেতাব বর্জন মেনে নিলেন না। ইংরাজেরা কবিকে স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই লিখে চললেন। পাঞ্জাবের লাঞ্ছনার প্রতিবাদে গবর্নর জেনারেলের এক্সেকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য স্যার শঙ্করণ নায়ার তাঁর বার্ষিক চৌষট্টি হাজার টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু ব্রিটিশ রাজার দেওয়া নাইট খেতাবটি ছাড়তে পারলেন না।

পাঞ্জাবে যা যা ঘটেছিল গান্ধীজী তাতে মনে দুঃখ পাননি এ কথা কেমন করে বলব? কিন্তু তিনি ঘোষণা করলেন যে সত্যাগ্রহের কথা বলে তিনি হিমালয়-প্রমাণ ভুল করেছিলেন। তিনি বললেন, তাঁর প্রস্তাবের ফলেই মন্দ লোকেরা স্থায়ী বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পেরেছে। তিনি তাঁর সত্যাগ্রহের প্রস্তাব তুলে নিলেন। পাঞ্জাবে কি ঘটে গেল, আর গান্ধীজী কি বললেন! তিনি জনসাধারণকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলেন।

সব কিছুর শেষ আছে। পাঞ্জাবের লাঞ্ছনারও একদিন শেষ হলো। যাঁরা জীবন বলি না দিয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, এমন কি সামরিক আদালতের বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেও দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলে মুক্তি পেলেন। কলকাতার জনসাধারণ পাঞ্জাবের নেতৃবৃন্দকে যে বিপুল সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন সে রকম সম্বর্ধনা আমি কম দেখেছি।

অনেক আগে নির্ধারিত হয়েছিল যে, কংগ্রেসের ১৯১৯ সালের বার্ষিক অধিবেশন অমৃতসরে হবে। পাঞ্জাবে যা কিছু ঘটেছিল তার পরেও অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়া উচিত, কি উচিত নয়, এই নিয়ে কথা উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তই বহাল থাকল। পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ইতোমধ্যে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত সংস্কার আইন পাস হয়ে গিয়েছিল। একটি রাজকীয় ক্ষমা ঘোষণার ফলে বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীরা এবং অনেক দণ্ডিত বন্দীও ছাড়া পেলেন। অনেকে বললেন, প্রদেশে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা কার্যে প্রয়োগ সম্ভব হবে না। আবার গান্ধীজীসহ অন্যরা ভাবলেন যতটুকু অধিকার পাওয়া গেছে ততটুকুই কাজে লাগাতে হবে। দ্বৈত শাসনের মণ্ডাটি খাওয়ার জন্য অনেক নেতারই মুখ দিয়ে লালা ঝরতে লাগল।

এই আবহাওয়ায় অমৃতসরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হলো। বাল গঙ্গাধর তিলক ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। সেখানে তিনি কথা দিয়ে এসেছিলেন, সংস্কার আইনের মারফতে যা কিছু পাওয়া গেছে সেটুকুই তিনি কাজে লাগাবার চেষ্টা করবেন এবং আরো বেশী পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকবেন। দেশের মাটিতে পা দিয়ে ভিন্ন রকম আবহাওয়া দেখে তিনি বলতে বাধ্য হলেন যে সংস্কার আইন মোটেই সন্তোষজনক নয়। কিন্তু অমৃতসর কংগ্রেসে যাওয়ার পথে তিনি এক কাণ্ড করে বসলেন। গঙ্গাপুর নামক রেলওয়ে স্টেশন হতে ভারত সংস্কার আইন পাস করার জন্যে অভিনন্দন জানিয়ে ব্রিটিশ রাজা বা মন্ত্রিসভাকে একটি টেলিগ্রাম তিনি পাঠিয়ে দিলেন। এই আত্মম্ভরী নেতার অমৃতসর পৌঁছানোর তরও সইল

না। টেলিগ্রামে তিনি একথাও জুড়ে দিলেন যে অভিনন্দন তিনি ভারতের জন-সাধারণের তরফ হতেই পাঠাচ্ছেন। জানিনে কোন্ জনসাধারণ তাঁকে এই অধিকার দিয়েছিলেন। টেলিগ্রামে একথারও উল্লেখ ছিল যে ব্রিটিশের তরফ হতে যতটা সাড়া পাওয়া যাবে ততটা সাড়া ভারতীয়েরাও দেবেন। এটাই ছিল তিলকের উদ্ভাবিত বিখ্যাত Responsive Co-operation বা পারস্পরিক সহযোগিতার প্রস্তাব।

এতকাল পরে আজও মনে হচ্ছে যে পাঞ্জাবের সামরিক আইনের লাঞ্ছনার পরে অমৃতসরে কংগ্রেসের যে-অধিবেশন হয়েছিল তা নিয়ে কোনোদিন কোনো ভারতবাসী আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করতে পারবেন না। এই অধিবেশন ভারতের মাথা বিশ্বের দরবারে হেঁট করে দিয়েছিল। পাঞ্জাবের বাইরে কোথাও কংগ্রেসের এই অধিবেশন হলে ভালো হতো। কিছু গরম বক্তৃতা যে কংগ্রেসে হয়নি তা নয়. কিন্তু আসল ব্যাপার ছিল ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনকে কি করে কাজে লাগানো যায় তার প্রচেষ্টা। মিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের (তখনো তিনি "দেশবন্ধু" হননি) পূর্ণ দায়িত্বসম্পন্ন গবর্নমেণ্ট স্থাপনের প্রস্তাব, যাতে সংস্কার আইনকে নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও অসন্তোষকর বলা হয়েছিল, সবজেক্ট কমিটিতে পাস হলেও প্রকাশ্য অধিবেশনে তাতে গান্ধীজীর সংশোধনী প্রস্তাব যোগ হয়ে প্রস্তাবটি আরো বেশী জলো হয়ে গেল। সংশোধনীর দ্বারা প্রস্তাবে যা যোগ হলো তাতে এই দাঁড়াল যে. পূর্ণ দায়িত্বসম্পন্ন সরকার স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে ত্বরান্বিত করার জন্যে জনসাধারণ সংস্কার আইনকে কাজে প্রয়োগ করবে।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে চাকরি ত্যাগ করার জন্যে স্যার শঙ্করণ নায়ারকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস হলো। কিন্তু নাইট খেতাব ত্যাগ করার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে নন্দিত করে যে প্রস্তাব পেশ হয়েছিল তা কংগ্রেসে তুলতেই দেওয়া হলো না। এটা ছিল কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনের আর একটি কলঙ্ক-জনক ঘটনা। কংগ্রেস তখনো ব্রিটিশের দেওয়া খেতাবের নেশায় বিভোর ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ নন্দিত হলেন না।

কথা শুরুর আগে

দুই

আমার "কাজী নজরুল ইস্‌লাম ঃ ঃ স্মৃতিকথা" নামক পুস্তকের বিভিন্ন জায়গায় আমি "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"র কথা অনেক বলেছি। এই পুস্তকে সে সম্বন্ধে আবার কিছু বললে আগে বলা কথাগুলির পুনরাবৃত্তি যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। তবুও "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি" সম্বন্ধে এখানে কিছু না বললেও নয়। কারণ, এ পুস্তক যাঁরা পড়বেন তাঁরা "কাজী নজরুল ইস্‌লাম ঃ ঃ স্মৃতিকথা" নাও পড়ে থাকতে পারেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ এই সমিতির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বলেছেন ঃ—

"আমরা কয়েকজন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য ছিলাম। সেখানে হিন্দু মুসলমান কোন ভেদ না থাকলেও আমরা বড় লোকের ঘরে গরীব আত্মীয়ের মতন মন-মরা হয়ে তার সভায় যোগদান করতাম। আমাদের মনে হলো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিলোপ না করেও আমাদের একটি নিজস্ব সাহিত্য-সমিতি থাকা উচিত। এই উদ্দেশ্যে কলকাতার ৯নং আন্তনিবাগান লেনে মৌলবী আবদুর রহমান খানের বাড়ীতে ১৯১১ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে এক সভা আহূত হয়।......আমি সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদক হই।"

(ডক্টর সুকুমার সেন কৃত "বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস",
চতুর্থ খণ্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা)

এই ভাবে ১৯১১ সালে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"র প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু ১৯১৩ সালে আমি যখন প্রথম কলকাতায় আসি তখন তার প্রাণের কোনো স্পন্দন ছিল না বললেও চলে। আমরা কয়েকজন সমিতিকে পুনর্জীবিত করে তোলার চেষ্টা করি। এই প্রচেষ্টাতেও প্রথম প্রতিষ্ঠাতারা যেমন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব, ভোলার মুহম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব প্রভৃতি ছিলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ ও সাহিত্যিক কাজী ইমদাদুল হক সাহেব তখন কলকাতা ট্রেনিং স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করছিলেন। "দি মুসলমান" নামক ইংরেজি সাপ্তাহিকের সম্পাদক মুজীবুর রহমান সাহেব, সাপ্তাহিক "মোহাম্মদী"র সম্পাদক মৌলবী মুহম্মদ আকরম খান সাহেব (তখনও তিনি মাওলানা নামে অভিহিত হননি) এবং আরও অনেকে সাহায্য করতেন। অনেকের নিকট হতে মাসিক অর্থ সাহায্য পাওয়া যেত। তাতেই সমিতির খরচ চলত। অবসরপ্রাপ্ত স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর মৌলবী আবদুল করীম সাহেব (আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ নন) ছিলেন সমিতির সভাপতি। তাঁরই জিদের বশে সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্রের নাম "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" করা হয়। আমরা বেশীরভাগ সভ্যরা শুধু "সাহিত্য পত্রিকা" নাম করতে চেয়েছিলেম। আবদুল করীম সাহেবের যুক্তি ছিল এই যে কাগজখানা হিন্দুরা কিনবেন না এবং

পড়বেনও না। কাজেই, মুসলমান শব্দটি নামের সঙ্গে থাকা ভালো। আমরা বহুমতের দ্বারা তাঁকে এমন চটাতে চাইনি যাতে তিনি পদত্যাগ করে বসতে পারেন। কিছু কিছু মুসলমানের মনে এরকম একটি ধারণা বদ্ধমূল ছিল। মিস্টার এ. কে. ফজলুল হকের সঙ্গে সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' বা'র করতে গিয়ে শুরুতে এই রকম একটি কথার সম্মুখীন আমরা হয়েছিলেম। তবে, সেটা আমরা কাটিয়ে উঠেছিলেম।

সমিতির আফিস ছিল ছাত্রদের কোনো না কোনো মেসে। ৪৭/১. মির্জাপুর স্ট্রীটের নীচের তলায় একখানা কামরা ভাড়া নিয়ে আমরা সর্বপ্রথম সমিতির আফিস স্থাপন করি। ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের দোতলার সামনের দিককার অংশে আমরা এখান হতেই উঠে যাই। চট্টগ্রামের লুঙ্গি মার্চেণ্ট সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী এই বাড়ী নেওয়ার সময়ে আমাদের পক্ষে জামিন হয়েছিলেন। আমীর হুসয়ন খান সাহেব একখানা লম্বা টেবিল কিনে দেওয়ায় এবং আরও কয়েকজন কয়েকটি আলমারী কিনে দেওয়ায় আমরা ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের বাড়ীতে এসে লাইব্রেরী ও রিডিং রুম স্থাপন করি। তখন ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীট শুধু যে একটি সাহিত্যিক আড্ডায় পরিণত হয়ে উঠেছিল তা নয়, এটি একটি রাজনীতিক আড্ডাতেও পরিণত হয়েছিল। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে ৪৯ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট পুরোপুরি ভেঙে যাওয়ার পরে যখন হাবিলদার কাজী নজরুল ইস্‌লাম 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র বাড়ীতে এসে উঠল তখন এখানকার সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আড্ডা আরও বেশী জমজমাট হয়ে উঠেছিল।

"বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির" নামটি সাম্প্রদায়িক হলেও আসলে তা সাম্প্রদায়িক সংগঠন ছিল না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানও তা ছিল না। আমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও সভ্য ছিলেম। হয়তো একবার তার কার্যনির্বাহক কমিটিরও সভ্য হয়েছিলেম। এখন ভালো মনে পড়ছে না। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মারফতে বাঙালীদের সামনে বিশেষ করে বাঙালী হিন্দুদের সামনে মুসলিম সভ্যতার নানান দিক বাঙলা ভাষায় তুলে ধরা হবে, এটাই ছিল সমিতির একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। মুসলমানদের নিকট হতে অনেক বাঙালী হিন্দু তাই চাইতেন। সাধারণতঃ শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুরা মুস্‌লিম সভ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না। বাঙালী মুসলমানরাও যে খুব বেশী কিছু জানতেন তাও নয়। বাঙলার মুসলমান পরিবারগুলির বিশেষ রীতিনীতি ও চালচলন সম্বন্ধে প্রতিবেশী হিন্দুদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ছিল। ডক্টর সার্‌ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী একদিন আমার নিকটে একথা স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মুসলিম লেখকরা এমন সব উপন্যাস রচনা করুন যে-সবের ভিতর দিয়ে মুসলমান পরিবারগুলির ছবি সকলের চোখের সামনে ফুটে উঠবে। কাজী ইমদাদুল হক "আবদুল্লা" নাম দিয়ে এমনই একখানা উপন্যাসের রচনায় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য যে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি তা শেষ করে যেতে পারেননি।

"বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় হিন্দু লেখকদের লেখাও ছাপা হ'ত। সাহিত্য সমিতির সভায় হিন্দু কবি ও লেখকরাও যোগ দিতেন। কবি শশাঙ্কমোহন সেন ও "হিতবাদী"র সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ডাক্তার হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা) এবং আরো অনেকে সমিতির সভায় বক্তৃতা দিতেন। হিন্দু গ্রন্থকাররা সমিতির লাইব্রেরিতে তাঁদের বই দান করতেন। নীতি হিসাবে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখা বই কোনো লাইব্রেরিতে দান

করতেন না। কিন্তু "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"র লাইব্রেরিতে তিনিও তাঁর সমস্ত পুস্তক দান করেছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রিকায় "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় প্রকাশিত লেখাগুলির সমালোচনা খুব আগ্রহ সহকারে করতেন।

আমি বৎসরাধিক কাল নানান জায়গায় চাকরীও করেছিলাম। সবচেয়ে বেশীদিন কাজ করেছিলেম বাঙলা সরকারের ছাপাখানায়। ছাপাখানাটি তখন রাইটার্স বিল্ডিং-এ ছিল। এখানে কাগজের গুদামে আমি কেরানীর কাজ করতাম। মাসিক বেতন ছিল ত্রিশ টাকা। বেঙ্গল গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের অধীন বেঙ্গলি ট্রানসেলেটারের আফিসেও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে এক মাস কাজ করেছিলেম। উর্দু হতে বাংলায় তরজমার কাজ। প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টরের আফিসেও কাজ করেছিলেম একমাস। এর পরে আমার চাকরীর জীবন শেষ হয়। কলেজে পড়ার সময়ে গরমের ছুটিতে একমাস খিদিরপুর জুনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছিলেম। আর এক গরমের ছুটিতে একমাস কাজ করেছিলেম কলকাতা কর্পোরেশনের ট্যাংরা স্লটার হাউসে। এখানে আমায় পশুবধ করতে হ'ত না। তবে পশুবধের টিকেট আমি ইস্যু করতাম।

১৯০৬ সাল হতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত আমি কোন না কোন লোকের বাড়ীতে থেকে গৃহশিক্ষকের কাজ করেছি। মাঝে মাঝে দু'চার মাস অবশ্য বাদ গিয়েছে। কলকাতার মুনশী আলীমুদ্দীন স্ট্রীটের নামকরণ (এখন শুধু আলীমুদ্দীন স্ট্রীট) যাঁর নামে হয়েছে চাঁদনীর ৩নং গুমঘর লেনে তাঁর বাড়ীতে এক সঙ্গে তিন বছর থেকেছি। মুন্শী আলীমুদ্দীন তখন জীবিত ছিলেন না। তাঁর দুই নাতি—(পৌত্র) মুন্শী ফখ্রুদ্দীন ও মুন্শী কমরুদ্দীন জীবিত ছিলেন। এ বাড়ীতে যে সদ্ব্যবহার পেয়েছি তা কখনো ভুলবার নয়।

আমি "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"র সহকারী সম্পাদক ছিলেম। "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" আমাকেই বার করতে হ'ত। যদিও শহীদুল্লাহ্ সাহেব ও মুহম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক ছিলেন তবুও কাগজের জন্যে খুব বেশী কাজ তাঁরা করতেন না। পত্রিকার লেখা সংগ্রহ, তা ছাপানো ও ডাকে দেওয়া ইত্যাদি সবই কাজ আমায় করতে হ'ত। এই সময়ের একটি কাজের কথা আজও মনে পড়লে আমার বড় অনুতাপ হয়। কবি কায়কোবাদের "মহাশ্মশান কাব্যের" সমালোচনায় (আসলে অপ-সমালোচনায়) দুটি প্রবন্ধ আমি "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় ছেপেছিলেম। আমি ইচ্ছা করলেই এই সমালোচনা বন্ধ করতে পারতাম। সমালোচক ছিলেন সৈয়দ এমদাদ আলী। এক সময়ে "নবনূর" নামক মাসিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন, পরে পুলিসে চাকরী গ্রহণ করেন। সমালোচনা যখন তিনি লিখেছিলেন তখন তিনি বেঙ্গল পুলিসের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ইনস্পেক্টর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে জীবনে কোনো দিন আমার দেখা হয়নি। লোক মারফতে কিংবা ডাকে তিনি লেখা দুটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লেখক হিসাবে তাঁর নাম ছিল বলে আমি তাঁর লেখা দুটি ছাপিয়ে দিই। পরে বুঝেছিলেম অন্যায় করেছি। সৈয়দ এমদাদ আলী "মহাশ্মশান কাব্যে"র কাব্যগুণ সম্বন্ধে এতটুকুও আলোচনা করেননি। সমালোচকের তা করাই উচিত। তিনি শুধু দেখিয়েছেন কোথায় এবং কিসে ইস্‌লাম ও মুস্‌লিমের অবমাননা হলো।

"বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"কে গড়ে তোলার জন্যে আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি। এখন আমাদের কমরেডরা কমিউনিস্ট পার্টির সব-সময়ের কর্মী

হন। তাঁরা শুনে আজ আশ্চর্য হবেন যে ১৯১৮ সালের শেষাশেষিতে আমি "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"র সব-সময়ের কর্মী হয়েছিলেম। পুরো ১৯১৯ সাল এবং ১৯২০ সালেরও মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত সমিতির সব-সময়ের কর্মী আমি ছিলেম। তারপরে "নবযুগ" কাগজ পরিচালনা করার সময়েও আমি সব-সময়ের কর্মীর মতোই কাজ করেছি, যদিও কোনও রাজনীতিক পার্টির সভ্য আমি তখন ছিলাম না। ১৯১৮ সালের শেষাশেষিতে আমার যে সব-সময়ের কর্মীর জীবন আরম্ভ হয়েছিল সেই জীবন আমার আজও, অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে এই কয় ছত্র লেখার সময়েও, চলেছে।

আমার জীবনের পেশা কি হবে,—সাহিত্য, না, রাজনীতি এই নিয়ে আমি পুরো ১৯১৯ সাল ভেবেছি। সত্য কথা বলতে, আমার মনের ভিতরে সাহিত্য ও রাজনীতির দ্বন্দ্ব চলেছিল। কবি আমি ছিলেম না। গল্প লেখক বা ঔপন্যাসিক হওয়ার স্বপ্ন আমি কোনো দিন দেখিনি। সেই ভাষা কোনো দিন আমার আয়ত্তে ছিল না। আমার প্রবল বাসনা ছিল যে আমি একজন প্রবন্ধকার হব। আমার পরবর্তী জীবনেও, অর্থাৎ রাজনীতিক জীবনে তা হওয়ার পথে কোনো প্রতিবন্ধক ছিল বলে আমার মনে হয় না। তবুও আমি প্রবন্ধকারও হতে পারিনি, যদিও আমি খবরের কাগজ চালিয়েছি।

আমার মনে যে সাহিত্য ও রাজনীতির দ্বন্দ্ব চলেছিল তাতে শেষ পর্যন্ত জয় হলো রাজনীতির। একটা কিছুতে নিজেকে যে বিলিয়ে দেব সে তো আগেই স্থির করেছিলেম। সেই জন্যই তো আমি "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"র সব-সময়ের কর্মী হতে পেরেছিলেম। ১৯২০ সালের শুরুতে আমি স্থির করে ফেললাম যে রাজনীতিই হবে আমার জীবনের পেশা। আমি রাজনীতিক সভা-সমিতি ও মিছিলে যোগ দেওয়া শুরু করেছিলেম তো ১৯১৬ সাল হতে।

কথারম্ভ

তাশকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ভিত্তিস্থাপন

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বর্তমান উজবেকিস্তান রিপাবলিকের রাজধানী তাশকন্দ শহরে ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল। এই কাজের সহিত আমার প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ না থাকলেও পরবর্তী সময়ে এর প্রভাব ভারতের ভিতরে আমার ও আমার সহকর্মীদের উপর পড়েছিল। আমার কথা তাই আমি এখান থেকেই শুরু করব। যে-ঘটনা আগে ঘটেছিল তার কথা আগেই বলা উচিত।

অনেকেই ভাবেন, কোনো কোনো ঘটনা না ঘটলেই বড় ভালো হতো। হয়তো তাই। কিন্তু ঘটনাগুলি ঘটে যাওয়ার পরে সে-সবের কথা লিখে রাখার কাজ যাঁরা নেন তাঁরা হয়ে পড়েন বড় নিরুপায়। সত্য সত্য যা ঘটেছে তাই শুধু তাঁরা লিখতে পারেন। ভালো লাগা-না-লাগার কথা এখানে ওঠে না, ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করেই তাঁদের কাজে এগিয়ে যেতে হয়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি প্রথম ১৯২০ সালে বিদেশে স্থাপিত হয়েছিল এবং এই ভিত্তিস্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। পরে ১৯২৯ সালে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের অন্যান্য সংগঠন হতে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। তাঁর এই বহিষ্কারের কথা আমরা পরে আলোচনা করব। তাঁর কাজে বিচ্যুতি না ঘটলে তিনি কখনও বহিষ্কৃত হতেন না। তা সত্ত্বেও, তিনি যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন একথা অস্বীকার করার উপায় আমাদের নেই।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পরিচয়

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর এই নাম এখন একেবারেই মুছে গেছে, যদিও এই নামেই তিনি এই শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বাঙলা দেশের অনুশীলন পার্টি নামক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির সভ্য ছিলেন। এই অনুশীলন পার্টি কিন্তু পরবর্তীকালে ঢাকার অনুশীলন পার্টি নয়। ব্যারিস্টার মিস্টার পি. মিত্রের নেতৃত্বে সারা বাঙলার জন্যে, (সারা ভারতের জন্যেও হয়তো বলা চলে) প্রথম যে অনুশীলন পার্টি গঠিত হয়েছিল তারই সভ্য ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বরাবর অস্ত্রাভাবে ভুগেছেন। তাঁর আত্মকথা হতে আমরা জানতে পারছি যে অস্ত্রের সন্ধানেই তিনি ১৯১৫ সালে তাঁর দলের নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হতে বিদায় নিয়ে বিদেশে

গিয়েছিলেন। জাপানে ও চীনে তিনি ঘুরেছিলেন, তারপরে পৌঁছেছিলেন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে। এই স্টেটের পালো আলটো নামক ছোট শহরে স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। তাঁর বিপ্লবী জীবনের সহকর্মী ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই, সুবিখ্যাত লেখক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। মনে হয় তাঁরই খোঁজে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এখানে এসেছিলেন। তাঁর আসার কথা কাগজে ছাপা হয়ে গিয়েছিল। তিনি ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবী তো ছিলেনই, সেই হিসাবেই তিনি ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত ছিলেন। আমেরিকায়ও পুলিস যে তাঁর খোঁজখবর নিবেন এটা তো জানা কথাই। এই কারণে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যামপাসেই তাঁর নূতন নামকরণ ক'রে দিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নামটি সেই থেকে চিরকালের জন্যে মুছে গেল।

এভেলিন ট্রেন্‌টের সহিত মানবেন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যামপাসেই কুমারী এভেলিন ট্রেন্ট (Evelyn Trent) নাম্নী একজন উচ্চশিক্ষিতা (স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গ্রেজুয়েট) আমেরিকান মেয়ের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় হয়। তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্টও হন। পালো আলটো হতে মানবেন্দ্রনাথ নিউ ইয়র্কের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এভেলিনও তাঁর সঙ্গে গেলেন। একটি কথা শুধু ডাক্তার চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীই[১] লিখেছেন এবং তাঁর লেখা আরও দু' একজন উদ্ধৃত করেছেন। কথাটা হচ্ছে এই। এভেলিনের পিতা যখন এভেলিনের মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে চলে যাওয়ার খবর পেলেন তখন তিনি অত্যন্ত চটে গিয়ে পুলিসকে এই বলে টেলিগ্রাম করে দিলেন যে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর মেয়ে এভেলিনকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছেন। তাতে আমেরিকান পুলিস তাঁদের পথে আটকিয়ে জেলে নিয়ে গেলেন। পিতার এই ব্যবহারে এভেলিন স্তম্ভিত ও মর্মাহত হলেন। তিনি বললেন, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার মতো যথেষ্ট বয়স তাঁর হয়েছে, মানবেন্দ্রনাথ রায়কে তিনি বিয়ে করবেন। এই অবস্থাতেই তাঁরা বিয়ে রেজিষ্ট্রি করলেন এবং পুলিস তাঁদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। নিউ ইয়র্কে গিয়েও রায় খুব স্বস্তিতে ছিলেন না। পুলিসের তাড়া খেয়ে নব বিবাহিতা পত্নী এভেলিনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মেক্সিকোতে চলে গেলেন। রায় বঙ্গদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে একজন বিখ্যাত কর্মী ছিলেন। ভারতের ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের সহিত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মান সাম্রাজ্যবাদী গবর্নমেণ্টের একটা সমঝতা হয়েছিল। তাতে স্থির হয়েছিল যে জার্মানী এই বিপ্লবীদের প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য করবেন এবং বিপ্লবীরা ভারতের ভিতরে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিরাট ও ব্যাপক অভ্যুত্থান করবেন। এই ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রের পূর্বদেশীয় কাজের সহিত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অর্থাৎ মানবেন্দ্রনাথ রায় বিশেষভাবে সংসৃষ্ট ছিলেন। তিনিই ব্যাটাভিয়ায় (এখনকার জাকার্তায়) গিয়ে তখনকার জার্মান দূতের সঙ্গে সব কিছু ব্যবস্থা ক'রে দেশে ফিরেছিলেন। ওপরে আমি যে তাঁর বিদেশে যাওয়ার কথা লিখেছি সেটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় যাত্রা।

১ ডাক্তার চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী স্যানফ্রানসিসকো ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আসামী ছিলেন (১৯১৭-১৮)। ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীরা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতেন।

বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের এই রকম বিশিষ্ট মর্যাদা ছিল বলেই মেক্শিকো যাওয়ার পরেও তিনি ওখানকার জার্মান দূতাবাস হতে একটা মোটা টাকা পেয়ে গিয়েছিলেন। এম. এন. রায় যদি মেক্শিকোতে পালিয়ে না যেতেন তবে তিনি সান্ফ্রান্সিসকোতে অনুষ্ঠিত ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আসামী হতেন। মেক্শিকোতে তিনি ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মকালে পৌঁছেছিলেন। তখনও রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লব ঘটেনি।

এম. এন. রায় সোশ্যালিস্ট চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হলেন

মেক্শিকোতে পৌঁছানোর পরে এম. এন. রায়ের চিন্তাধারায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে লাগল। বাঙলার বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী কর্মী সোশ্যালিস্ট চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকলেন। এর পেছনে তাঁর স্ত্রী এভেলিনের প্রভাব ছিল কিনা সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় কিছু বলেননি। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে এভেলিনের প্রভাবেই তিনি সোশ্যালিস্ট চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যাই হোক, সোশ্যালিস্ট পার্টিতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন এবং পরে তার সেক্রেটারীও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মাইকেল বরোদিনের সঙ্গে এম. এন. রায়ের পরিচয়

এম. এন. রায় সব নিয়ে আড়াই বছর মেক্শিকোতে ছিলেন। ১৯১৯ সালের এই মেক্শিকোতেই রুশ কমিউনিস্ট নেতা মাইকেল সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। এর আগে অন্য কোন কমিউনিস্ট নেতার সহিত তাঁর কখনও দেখা হয়নি। একটা বিপদে পড়ে বরোদিনকে মেক্শিকোতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সে সময়ে এম. এন. রায় তাঁকে নিজের বাড়ীতে থাকতে দিয়েছিলেন এবং আর্থিক সাহায্যও করেছিলেন তাঁকে। তা ছাড়া, ওয়াশিংটনে যে সোবিয়েৎ ট্রেড ডেলিগেশন ছিল সেই ডেলিগেশনকেও বরোদিন এম. এন. রায়ের কাছ থেকে নিয়ে মেক্শিকো হতে টাকা পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা দেশের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন, আর এম. এন. রায়ের হাতে ছিল জার্মানী হতে পাওয়া মোটা টাকা।

মেক্শিকোর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা

মাইকেল বরোদিনের কাছেই মানবেন্দ্রনাথ রায় মার্কসীয় দর্শনের প্রথম শিক্ষালাভ করেন। তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি একথা অকপটে স্বীকার করেছেন। ১৯১৯ সালেই বরোদিনের সম্মতিতে (উপদেশও বলা চলে) এবং রায়ের বিশেষ উদ্যোগে মেক্শিকোর কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হয়। আসলে একটি প্রস্তাব গ্রহণের ভিতর দিয়ে সোশ্যালিস্ট পার্টিই কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে গিয়েছিল। এম. এন. রায় দাবী করেন যে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বাইরে সমস্ত দুনিয়ায় তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মেক্শিকোর কমিউনিস্ট পার্টিই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি।

রায় কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রতিনিধি

মাইকেল বরোদিন মেক্‌শিকোতে আটকা পড়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মস্কোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্বন্ধে সমস্ত খবর মস্কোকে জানিয়েছিলেন। পরে মেক্‌শিকোর কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হওয়ার রিপোর্টও তিনি মস্কোতে পাঠিয়েছিলেন। ১৯২০ সালের ১৯শে জুলাই হতে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়া স্থির হয়েছিল। বরোদিন মস্কো হতে উপদেশ পেলেন যে মেক্‌শিকোর কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যেন তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। বরোদিনের মারফতে এম· এন· রায়ও এই দ্বিতীয় কংগ্রেসে নিমন্ত্রিত হন। তা সত্ত্বেও শুধু ব্যক্তি হিসাবে রায় মস্কোর পথে যাত্রা করেননি। যাওয়ার আগে মেক্‌শিকোর কমিউনিস্ট পার্টির তরফ হতে তিনি কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে, একটি কথা মনে রাখা ভালো। কেবল মেক্‌শিকোর কাজের জন্যেই যে এম· এন· রায় কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তা ভাবলে ভুল করা হবে। সেখানে যে তাঁর এত আদর ও কদর হয়েছিল তার আসল কারণ ছিল, তিনি একজন ভারতীয় এবং মার্কসবাদী। স্থির হয়েছিল যে দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের ঔপনিবেশিক নিবন্ধাবলী (Preliminary Draft of Some Theses on the National and Colonial Questions for the Second Congress of the Communist International by N. Lenin) উপস্থাপিত, আলোচিত ও গৃহীত হবে। কাজেই, তাতে একজন ভারতীয় মার্কসবাদীর উপস্থিতির মূল্য ছিল খুবই বেশী।

মানবেন্দ্রনাথ রায় সস্ত্রীক মস্কো রওয়ানা হয়েছিলেন স্পেন ও বার্লিনের পথে। বার্লিনে তাঁদের বেশ কয়েকদিন থাকতে হয়েছিল। তাতে তাঁর নির্বাসিত ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুবিধা ঘটে। তাছাড়া, জার্মান মার্কসবাদীদের সঙ্গে আলোচনা করে অনেক কিছু বোঝারও সুযোগ পান তিনি।

বার্লিনে অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত রায়ের পরিচয়

বার্লিনে অদ্ভুতভাবে অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত মানবেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। তিনি ইন্দোনেশিয়া হতে ডক্টর শাহীর নাম ধারণ করে ইউরোপে এসেছিলেন। হল্যাণ্ডের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ও বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার রুটগের্সের (Rutgers) নামে অবনী মুখার্জি ইন্দোনেশিয়া হতে পত্র নিয়ে এসেছিলেন। রুটগের্স কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের গোপন ওয়েস্ট ইউরোপীয়ান ব্যুরোর সভ্য ছিলেন। তিনিই আবার পত্র দিয়ে এম· এন· রায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যে মুখার্জিকে বার্লিনে পাঠিয়েছিলেন। আশ্চর্য হতে হয় এই কারণে যে মুখার্জি কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীটের লোক,—সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির সভ্য ছিলেন বলে দাবী করতেন তিনি, এম· এন· রায়ের সমসাময়িক লোকও ছিলেন তিনি--তবুও রায় ও তাঁর মধ্যে আগে হতে কোনও পরিচয় ছিল না!

এম· এন· রায়ের নিকটে অবনী মুখার্জি যে আত্ম-পরিচয় দিয়েছিলেন তা হচ্ছে এই। তাঁর নাম অবনী মুখার্জি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে তিনি

জার্মানীতে পড়তে গিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া মাত্রই তিনি সে দেশ ত্যাগ করতে সমর্থ হন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে ১৯১৬ সালে তিনি জাপানে পৌঁছান এবং পরের বছরের (অর্থাৎ ১৯১৭ সালের) মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি সে দেশে থেকে যান। এই সময়ে রাসবিহারী বসুর সাহায্যে তিনি বানারসের শিবপ্রসাদ গুপ্তের সঙ্গে দেশের দিকে রওয়ানা হওয়ার সুযোগ পেয়ে যান। অবনী মুখার্জির বর্ণিত কাহিনী অনুসারে রাসবিহারী বসুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিবপ্রসাদ গুপ্ত জাপানে এসেছিলেন এবং রাসবিহারীর নিকট হতে বিশেষ বার্তা ও গোপন বৈপ্লবিক কাজের জন্য টাকা নিয়ে দেশে ফিরছিলেন। তাঁরা উভয়ে গিরেফতার হয়ে সিঙ্গাপুরে বন্দী হলেন। অল্প দিনের ভিতরে শিবপ্রসাদ গুপ্তকে মুক্তি দিয়ে দেশে যেতে দেওয়া হলো, আর অবনী মুখার্জি ভয়াবহ প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে থাকলেন। মাঝে মাঝে তাঁর ওপরে মারধোরও চলতে লাগল। অবশেষে পুলিসের মনে প্রত্যয় জন্মাল যে অবনী মুখার্জির বিপ্লবী আন্দোলনের সহিত কোনো সংস্রব নেই। তার পরে তাঁকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে দেওয়া হয়। এভাবে খানিকটা স্বাধীনতা পাওয়ায় তিনি একটা জেলে নৌকার সাহায্যে একদিন সরে পড়লেন। এই নৌকা তাঁকে একখান চীনা জাহাজে (Chinese junk) চড়িয়ে দেয়। সেই জাহাজে তাঁকে জাকার্তায় পৌঁছিয়ে দিল। সেখানে তিনি মালয়রূপে পরিচিত হওয়ার জন্যে ডক্টর শাহীর নাম ধারণ করলেন। ওই দেশের কিছু সংখ্যক বিপ্লবীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হলো। তাঁরা রুশ বিপ্লবের কথা শুনেছিলেন এবং কমিউনিজমের বাণীব দ্বারা উদ্‌বুদ্ধও হয়েছিলেন। এই বাণী মুখার্জিকেও এত প্রভাবিত করল যে তিনি স্বদেশে ফেরার কথা ভুলে গেলেন এবং বিপ্লবের দেশে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে দুঃসাহসিক ভ্রমণের জন্যে প্রস্তুত হলেন একটি ডাচ্ জাহাজে স্টুয়ার্ডের চাকরী নিয়ে। হল্যাণ্ডে তিনি রুটগের্সের (Rutgers) সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর নামে তিনি জাবার তাঁদের উভয়ের এক বন্ধুর নিকট হতে পরিচয়পত্র এনেছিলেন।[১]

এম· এন· রায় নিজেই বলছেন, মুখার্জির কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার ভিতর যে ফাঁকগুলি ছিল সেগুলি ভর্তি ক'রে নেওয়া মোটেই সহজ ছিল না। তবুও..তবুও কিনা রায় এই প্রথম একজন ভারতীয় কমিউনিস্টকে দেখলেন, যাঁকে দলে টানার লোভ তিনি কিছুতেই সংবরণ করতে পারলেন না। এম· এন· রায় আর অবনী মুখার্জি সমসাময়িক লোক। রায় যদি মুখার্জিকে কঠোরভাবে প্রশ্ন করতেন তা হলেই ধরা পড়ে যেত কত অনর্গল মিথ্যা কথা মুখার্জি তাঁর নিকটে বলে গেলেন।

১৯২২-২৩ সালের ঘটনার বিবৃতিতে আমি যখন পৌঁছে যাব তখন আমি এই অবনী মুখার্জির সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করব।

রায় বলছেন প্রথম পরিচয়ের পরে তিনি অবনী মুখার্জিকে হল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে আপাততঃ সেখানেই থাকার উপদেশ দিলেন। হল্যাণ্ড হতে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা তিনি মুখার্জিকে করতে বললেন। কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হলে তার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি নিয়ে মুখার্জিকে ভারতবর্ষে যেতে হতে পারে একথাও রায় তাঁকে বলে রাখলেন। মুখার্জি অবশ্য মস্কো যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কাজেই, বড় হতাশ হয়ে তিনি হল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন।

১ M. N. Roy's MEMOIRS, Page 296

মস্কো পৌঁছানোর ক'দিন পরে মানবেন্দ্রনাথ একদিন অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেলেন যে অবনী মুখার্জি ভারতের 'ম্যান্‌ডেট' নিয়ে মস্কো এসে হাজির! এই 'ম্যান্‌ডেট' তিনি কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের ওয়েস্ট ইউরোপীয়ান ব্যুরো হতে এনেছিলেন। এবারেও তিনি রুটগের্সের নিকট হতে মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে একখানি পত্র নিয়ে এসেছিলেন। এই পত্রে তিনি লিখেছিলেন যে ডক্টর শাহীরের (অবনী মুখার্জির) মস্কো যাওয়ার অদম্য বাসনা। ব্যুরো তাঁকে নিরাশ করতে চায়নি। আর, কংগ্রেসে এশিয়ার প্রতিনিধির সংখ্যা যত বেশী হয় ততই তো ভালো।

অবস্থা এখন এই দাঁড়ালো যে দ্বিতীয় কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন মেক্‌শিকোর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি, আর অবনীনাথ মুখার্জি (ডক্টর শাহীর) ছিলেন ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি। তবে, মুখার্জির আলোচনায় যোগ দেওয়ার অধিকারই শুধু ছিল, ভোট দেওয়ার অধিকার তাঁর ছিল না।

অবনী মুখার্জি বিপদের সম্মুখীন

দ্বিতীয় কংগ্রেসের পূর্বক্ষণে মুখার্জি এক বিপদের সম্মুখীন হলেন। রাশিয়াতে যারাই আসতেন চেকা (গোয়েন্দা পুলিস) তাঁদের গতিবিধির ওপরে কড়া নজর রাখতেন। তাঁরা রিপোর্ট করলেন, জাহাজ হতে নামার পরে পেট্রোগ্রাডে এবং মস্কোতে আসার পরে মস্কোতেও অবনী মুখার্জি অভিজাত পরিবারে যাতায়াত করেছেন। এই অভিজাত পরিবারের লোকেরা বরাবর বিপ্লবের বিরুদ্ধে ছিলেন। একজন বিদেশী এসে যে অভিজাত পরিবারে যাতায়াত আরম্ভ করলেন এটা খুবই সন্দেহজনক ব্যাপার। মানবেন্দ্রনাথ এই ব'লে রেহাই পেয়ে গেলেন যে তিনি বার্লিনেই অবনী মুখার্জিকে প্রথম দেখেছেন, তার আগে তিনি মুখার্জির সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। অবনী মুখার্জি রায়কে জানালেন যে অভিজাতরা ভারতের সম্বন্ধে খুবই দরদী ব'লে তিনি তাঁদের বাড়ী গিয়েছেন। চেকা কিন্তু তাঁকে তখনই গিরেফ্‌তার করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু লেনিন বাধা দিলেন। বললেন, কংগ্রেসের পূর্বক্ষণে একজন ভারতীয়কে গিরেফ্‌তার করলে তার আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ভাল হবে না। অবনী মুখার্জি এবারের মতো বেঁচে গেলেন।

রায়ের তুর্কিস্তান যাত্রা

এখানে আমি শুধু মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি। রায়ের স্মৃতিকথা হতেই আমি এই পরিচয়ের উপাদান নিয়েছি। রায়ের স্মৃতিকথা হতে উপাদান না নিয়েও তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা যেত। কিন্তু আমাদের দেশের বৈপ্লবিক ঘটনাসমূহের বর্ণনায় ছাপার অক্ষরে অবনী মুখার্জির অভ্যুদয় এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কোথা থেকে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে, কিভাবে হয়েছে তা বাঙলার সে যুগের বিপ্লবীরা কিছুই জানেন না। আমার এই স্মৃতিকথায় তাঁর সম্বন্ধে যে পরে বিশদ আলোচনা হবে সে কথা আমি আগে বলেছি। মুখার্জি রায়কে যা বলেছেন, কিংবা মুখার্জি বলেছেন ব'লে রায় যা পেশ করেছেন আমি শুধু সেই কথাগুলিই তুলে দিয়েছি। একটা কথা শুধু আমি এখানে বলে রাখছি। মানবেন্দ্রনাথ রায়দের তুর্কিস্তান যাওয়ার পরে কোনও সময়ে অবনী মুখার্জি রোজা ফিটিংগোফ নাম্নী একজন রুশীয় মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। মনে হয় মস্কোতেই তাঁর সঙ্গে অবনী মুখার্জির প্রথম পরিচয় হয়েছিল। রোজা ফিটিংগোফ মানবেন্দ্রনাথদের একই ট্রেনে অনুবাদিকার কাজ নিয়ে তাশকন্দ গিয়েছিলেন।

১৯২০ সালের ১৯শে জুলাই হতে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। তার পরে ওই বছরেরই ১লা সেপ্টেম্বর হতে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাকুতে প্রাচ্য দেশীয় জনগণের কংগ্রেসের (The Baku Congress of the Peoples of the East) অধিবেশন হয়েছিল। এই কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথ রায় যোগ দেননি, তাতে যোগ দেওয়ার জন্য অবনী মুখার্জিকে পাঠানো হয়েছিল। বাকু হতেই মুখার্জি তাশকন্দে গিয়েছিলেন।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে এম. এন. রায় এক্সেকিউটিব কমিটির সভ্য নির্বাচিত হননি। এক্সেকিউটিব কমিটি তার প্রথম মিটিং-এ মিলিত হয়ে পাঁচ জনের একটি সাব্‌কমিটি গঠন করেন এবং এই সাব্‌-কমিটির নাম দেওয়া হয় "স্মল ব্যুরো"। এই কমিটির বৈঠক অবিরাম চলতে থাকবে। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নীতিনির্ধারণও এই কমিটিই করবে ব'লে স্থির হয়। এম. এন. রায় এই কমিটিরও সভ্য নির্বাচিত হননি। তিনি বলছেন তিনি ইচ্ছা করেই এক্সেকিউটিব সভ্য নির্বাচিত হননি। আর, সর্বক্ষমতাসম্পন্ন 'স্মল ব্যুরো'তে পরে তাঁকে কো-অপ্ট করা হয়েছিল। তিনি সেন্ট্রাল এসিয়াটিক ব্যুরোর তিনজন সভ্যের একজন নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই ব্যুরোকে সংক্ষেপে তুর্ক ব্যুরোও বলা হতো। এই ব্যুরোর অন্য দু'জন সভ্য ছিলেন যথাক্রমে সকোলনিকোব ও সফারোব। সকোলনিকোব সেণ্ট্রাল এশিয়ার তুর্ক ফ্রণ্টে রেড আর্মির কমাণ্ডার ছিলেন। তিনি সেণ্ট্রাল সোবিয়েৎ গবর্নমেণ্টের দ্বারা নিয়োজিত তুর্কিস্তান কমিশনের চেয়ারম্যানও ছিলেন। সফারোব বল্‌শেভিক পার্টির (সোবিয়েৎ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির) সেণ্ট্রাল কমিটির প্রতিনিধি ছিলেন। চেকার তরফ হতে পিটার সঙ্গে ছিলেন। অসামরিক প্রশাসনিক কাজের চার্জে ছিলেন কাগানোভিচ্‌।

তুর্কিস্তান সোবিয়েতের সেণ্ট্রাল এক্সেকিউটিব কমিটির প্রেসিডেণ্ট রহীম বাবায়েফ্ও সংগে ছিলেন।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের শেষ হওয়ার সংগে সংগেই সকোলনিকোব ও সফারোব তুর্কিস্তানে চলে গেলেন। এম· এন· রায়ের রওয়ানা হতে কিছু বিলম্ব হলো। কারণ, তাঁর সোবিয়েৎ দূত (ambassador) হিসাবে আফগানিস্তানে যাওয়ার প্রশ্নের তখনও চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি ; ভারতের বিপ্লব আন্দোলনকে কিভাবে সাহায্য করতে হবে তার উপায়ও তখন নির্ধারিত হয়নি। রায় বলছেন ঃ

["I had no intention of leaving MOSCOW without being amply provided with the sinews of war—material to make a revolution. I had failed in a similar attempt in the Far East. Then the Germans duped us. This time I wanted to succeed. The Russian Bolshevics were reliable allies."১

(M. N. Roy's Memoirs, Page 395)]

অনুবাদ। "যথেষ্ট পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ না নিয়ে অর্থাৎ যে সব উপাদানের দ্বারা বিপ্লব করা যায় সে সব না নিয়ে আমার মস্কো ত্যাগ করার কোনো ইচ্ছা ছিল না। দূর প্রাচ্যে ওইরকম প্রচেষ্টা করতে গিয়ে আমি অকৃতকার্য হয়েছিলেম। তখন জার্মানরা আমাদের প্রতারণা করেছিলেন। এবারে আমি কৃতকার্য হতে চেয়েছিলেম। রাশিয়ার বলশেভিকরা ছিলেন বিশ্বস্ত বন্ধু।"

(এম· এন· রায়ের "স্মৃতিকথা" ৩৯৫ পৃষ্ঠা)

শেষ পর্যন্ত আফগান সরকার মানবেন্দ্রনাথ রায়কে আফগানিস্তানের সোবিয়েৎ দূত (Ambassador) নিযুক্তকরণে রাজী হলেন না। অতএব, রায় দু'খানা ট্রেনভর্তি অস্ত্রশস্ত্র, সাঁজোয়া গাড়ী, এয়ারোপ্লেনের খোলা অংশসমূহ রসদ, ধন-ভাণ্ডার, সৈন্য, বিভিন্ন বিষয়ে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষাদাতা প্রভৃতি সংগে নিয়ে তুর্কিস্তানের পথে রওয়ানা হলেন। কোন্ তারিখে তিনি রওয়ানা হয়েছিলেন এবং তাশকন্দ পেঁছিতে তাঁর কদিন লেগেছিল তার কোনো উল্লেখ তাঁর স্মৃতিকথায় নেই। সন-তারিখ সম্বন্ধে তিনি একেবারেই নির্বিকার। তবে, তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর জন্যে ট্রেনে যে স্যালুনের ব্যবস্থা হয়েছিল সে-কথার উল্লেখ করতে তিনি ভুলেননি। স্ত্রীর কথা অবশ্য তিনি বলেননি। কিন্তু আমরা জানি যে তাঁর প্রথমা স্ত্রী এভেলিন ট্রেণ্ট্ তাঁর সংগে ছিলেন। তাঁদের ট্রেন কিছু বিলম্বে তাশকন্দে পেঁছেছিল। মনে হয় তাঁদের সাত হতে দশ দিন লেগে গিয়েছিল।

এম· এন· রায় লিখেছেন, যে-সকল মুহাজির (আত্ম নির্বাসিত) যুবক ভারতবর্ষ হতে আসছিলেন তাঁদের নিয়ে তুর্কিস্তানে তিনি একটি ভারতীয় মুক্তিফৌজ (Liberation Army) গঠন করতে চেয়েছিলেন। আফগান সরকারের নিকট হতে এই অনুমতি চাওয়া হয়েছিল যে অস্ত্রশস্ত্র সহ ভারতীয় মুক্তিফৌজকে আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে ভারত সীমান্তে যেতে দেওয়া হোক। সেখানে পেঁছে তাঁরা ভারতের ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন।

১ এম· এন· রায়ের মতে ভারতে অস্ত্র পাঠানোর ব্যাপারে জার্মানরা duped অর্থাৎ, প্রতারণা করেছিলেন। আসলে অস্ত্র তাঁরা পাঠাননি। (লেখক)

আফগানিস্তানের সরকার জানালেন, আপনাদের প্রস্তাব অতি উত্তম। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই একান্তই করা উচিত। তবে, আপনারা আপনাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলি আমাদের নিকটে রেখে দিয়ে আগে খালি হাতে ভারত সীমান্তে পোঁছে যান। আপনারা সীমান্তে পোঁছে গিয়েছেন এ খবর আমাদের নিকটে পোঁছানোর পরে আমরাই অস্ত্রশস্ত্রগুলি আপনাদের নিকটে পোঁছিয়ে দেব। এখানেই এম· এন· রায়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে ভাবছি কি ক'রে এমন একটি প্রস্তাব আফ্‌গানিস্তানের গবর্নমেণ্টের নিকটে করা হয়েছিল। কোনো স্বাধীন দেশ কি এই রকম একটি প্রস্তাবে কখনও রাজী হতে পারেন? নিশ্চয়ই যে-সব জায়গা হতে মঞ্জুরী পাওয়ার কথা সে সব জায়গার মঞ্জুরী না পেলে এম· এন· রায় এ-কাজে অগ্রসর হতে পারতেন না। কিন্তু লেনিন সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। রায় বলছেন, লেনিন বলেছিলেন, "they (British) would bombard Amanullah's citadel with silver and gold bullets" অর্থাৎ "সোনা-চাঁদির গুলিবর্ষণ করে ব্রিটিশ আমানুল্লার দুর্গ চূর্ণ ক'রে দেবে।"

মোট কথা, এত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এম· এন· রায় বৃথাই তাশকন্দে গিয়েছিলেন। ভারতের মুক্তিফৌজ তো গঠিত হলোই না, মুহাজির (আত্মনির্বাসিত) যুবকদের সৈনিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাশকন্দে যে মিলিটারি স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল তাও তুলে দিতে হলো। ভারতের এক সময়কার গবর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড কর্জন তখন ব্রিটেনের বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বললেন তাশকন্দের এই মিলিটারি স্কুলটি ভারতের বিরুদ্ধে একটা গভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই, স্কুলটি এখনই তুলে দিতে হবে। না দিলে ব্রিটেনের সঙ্গে সোবিয়েতের যে বাণিজ্যচুক্তি হয়েছে তা এখনই বাতিল হয়ে যাবে। চারদিক হতে দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ হয়ে থাকা সোবিয়েতের পক্ষে এই রকম একটি বাণিজ্য চুক্তির প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া, ভারতীয় মুক্তিফৌজ যখন গঠিত হলো না, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ভারত সীমান্তে যাওয়ার আশাই যখন বিলীন হয়ে গেল, তখন তাশকন্দের মিলিটারী স্কুলের সার্থকতাও আর থাকল না। স্কুলটি তুলে দেওয়াই স্থির হলো।

মিলিটারি স্কুলে রাজনৈতিক শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছিল। মুহাজিরদের ভিতরে যাঁরা শিক্ষিত ছিলেন তাঁরা জটিল অস্ত্রশস্ত্রের শিক্ষায় এত দ্রুত সুদক্ষ হয়ে উঠেছিলেন যে তাতে রুশ-শিক্ষকেরা পর্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। শিক্ষিতদের মধ্যে ক'জন এয়ারোপ্লেনের শিক্ষাও লাভ করেছিলেন। এয়ারোপ্লেনের যুদ্ধের রেওয়াজ তখনও ভালোভাবে চালু হয়নি। তবুও তাঁদের মধ্যে ক'জন এয়ারোপ্লেনের শিক্ষাও লাভ করেছিলেন। এম· এন· রায় বলছেন তাঁদের দু'জন সুদক্ষ হয়ে রেড আর্মি ইউনিটে চলে গিয়েছিলেন।

"প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন" নামে আমার একখানি পুস্তক আছে। এই পুস্তকের ইংরেজি তর্জমার নাম "The Communist Party of India And Its Formation Abroad"। ১৯২২-২৩ সালের মস্কো কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় দণ্ডিত আসামী, ভোপালের কমরেড রফীক আহ্‌মদের জবানিতে আমি একদল মুহাজির যুবকের কঠোর অভিজ্ঞতার কথা এই পুস্তকে বর্ণনা করেছি। তুর্কমেন প্রতিবিপ্লবীদের দ্বারা গিরেফ্‌তার হয়ে এই যুবকেরা প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। লাল-ফৌজের আগমনে তাঁরা বেঁচে যান। তুর্কমেনিস্তানে কির্কির দুর্গে থাকাকালে মুহাজিরদের ভিতরে একমাত্র এই যুবকেরাই অস্ত্রধারণ ক'রে মুস্‌লিম প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

পরে ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টিতেও এঁদের মধ্য হতেই যুবকেরা বেশী সংখ্যায় যোগ দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে তাশকন্দে যে সকল ভারতীয় মুহাজির (আত্ম-নির্বাসিত) যুবক জড়ো হয়েছিলেন তাঁদের ভিতরে ওপরে বর্ণিত যুবকেরাও ছিলেন। বুখারার আমীরের একটি মস্ত বড় বাড়ীতে তাঁদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল। এই বাড়ীটির নাম দেওয়া হয়েছিল "ইণ্ডিয়া হাউস"। তখন তাশকন্দের বাজারেও অনেক ভারতীয় ছিলেন। তাঁদের ভিতরে ব্রিটিশের চরেরাও ছিল। "ইণ্ডিয়া হাউসে"র মুহাজিরদের ভিতরেও দু'-চারজন, হয়তো আরও বেশী, ব্রিটিশ চর না থাকার কথা নয়। এই "ইণ্ডিয়া হাউসে"ই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সূচনা হয়েছিল।

পার্টির সূচনা

এম. এন. রায়ের কথা

এম. এন. রায় বলেছেন মুহাজিরদের ভিতরে শিক্ষিতরা সংখ্যাল্প ছিলেন। তাঁদের নিয়েই তাঁর কাজ শুরু হয়েছিল। তিনি লিখেছেন ঃ

"My preliminary efforts with the educated minority produced greater results than I expected and wanted. Most of them transferred their fanatical allegiance from Islam to Communism. I had not spoken to them at all about Communism. I only told them that driving the British out of India would be no revolution, if it was succeeded by replacing foreign exploiters by native ones. I had to explain the social significance of a revolution : that, to be worthwhile, a revolution should liberate the toiling masses of India from their present economic position. Instinctively idealists, they readily agreed with my opinion and jumped to the conclusion that, if the revolution was to liberate the toiling masses, it would have to be a communist revolution. I was surprised when some of them approached me with the proposal that they wanted to join the Communist party. Others enquired why we should not found the Communist Party of India there and then. Their enthusiasm was very well meant. Although some of them had a utilitarian motive, I could not discourage them.

"Presently, they were reinforced by the arrival of a small group which called itself Communists already at Kabul. It was led by an old grey-bearded Maulana, Abdur Rab, and a South Indian Hindu named Acharya. On their arrival, they were accommodated in the emigrants' house and expected to have special attention and privileges owing to their professed political faith. I would have welcomed the advent of even a few clever and convinced

Communists to help me deal with a rather difficult situation. But after some conversation I discovered that Abdur Rab was an impostor, and Acharya was an anarchist, if he was anything. But the educated minority of the earlier emigrants were easily influenced by Abdur Rab and Acharya, who fanned their Communist fanaticism.

"The result of a new crisis in the emigrants' house was that some of the inmates began talking about Communism openly and went to the extent of making disparaging remarks about their fanatical past, which was still a present with most of the others. Occasionally, it came to fierce altercations and even exchange of blows. To maintain order and to protect the minority, we had to post some armed guards near the house. On the other hand, the minority, which proposed the formation of an Indian Communist party, was reinforced by the the Abdur Rab-Acharya group and on the latter's instigation, sent a delegation to the Turk-Bureau of the Communist International to plead their case. I tried to argue with them that there was no hurry. They should wait until they returned to India. There was no sense in a few emigrant individuals calling themselves the Communist Party. They were evidently disappointed, and I apprehended that the experience might dishearten them. I needed their help to manage the refractory majority of emigrants. The idea of turning them out with the offer of employment was not practical. So I agreed with the proposal of the formation of a Communist party, knowing fully well that it would be a nominal thing, although it could function as a nucleus of a real Communist Party to be organised eventually. An intelligent and fairly educated young man named Mohammad Safiq [Shafiq], who had come from Kabul with the Acharya group, was elected secretary of the party."

(M. N. Roy's Memoirs, Allied Publishers, Pp 464-65)

"এই অল্প সংখ্যক মুহাজির যুবকের ভিতরে ইস্‌লাম সম্বন্ধে যতটা উন্মাদনা ছিল ঠিক ততটাই উন্মাদনা তাঁদের ভিতরে এসে গেল কমিউনিজম্‌ সম্বন্ধেও। আমি তাঁদের সঙ্গে কমিউনিজম্‌ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলিনি। আমি তাঁদের শুধু বলেছিলেম যে ব্রিটিশকে ভারতবর্ষ হতে তাড়াবার পরে যদি ব্রিটিশের জায়গায় দেশীয় শোষকেরা ক্ষমতা দখল করে নেয় তবে তা বিপ্লব বলে পরিগণিত হবে না। বিপ্লবের সামাজিক অর্থ আমি তাঁদের বুঝিয়েছিলেম। অর্থাৎ, বলেছিলেম, শ্রমজীবী জনগণকে তাঁদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা হতে মুক্ত করতে পারলেই শুধু বিপ্লব সার্থক হবে। এই যুবকেরা স্বতঃই আদর্শবাদী তো ছিলেনই, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই আমার কথা মেনে নিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্তে পেঁছোলেন যে যদি শ্রমজীবী জনগণকে মুক্ত করাই বিপ্লবের মানে হয় তবে তো তাকে কমিউনিস্ট বিপ্লবই হতে হবে। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম তখন যখন এই যুবকদের ভিতর হতে ক'জন এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা আমায় জানালেন। অন্যরা জানতে চাইলেন, "কেন আমরা এখনই এখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপন করব না?" তাঁদের এই উৎসাহের পেছনে কোনো মন্দ অভিপ্রায় ছিল না, যদিও কেউ কেউ সুযোগসন্ধানী ছিলেন। আমি তাঁদের নিরুৎসাহ করতে পারিনি।

"সেই সময়ে কাবুল হতে একটি ছোট্ট দল এসে পড়ায় যুবকদের পার্টি গঠনের দাবী আরও জোরদার হয়ে পড়ল। এই ছোট্ট দলের লোকেরা কাবুলেই নিজেদের কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁদের নেতা একজন সাদা দাড়িওয়ালা মাওলানা ছিলেন। তাঁর নাম আবদুর রব। আর একজন দক্ষিণ ভারতের হিন্দু, নাম আচার্য। তাঁদের মুহাজিরদের জন্যে নির্দিষ্ট বাড়ীতেই থাকতে দেওয়া হলো। আগে হতে তাঁরা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করার কারণে তাঁদের সুখ-সুবিধার প্রতি বিশেষ নজরও দেওয়া হলো। সামান্য ক'জন হলেও, দৃঢ়বিশ্বাসী বিচক্ষণ কমিউনিস্টদের আগমন আমার নিকটে সুস্বাগত ছিল। তা হলে যে-সকল অসুবিধার ভিতর দিয়ে আমায় কাজ করতে হচ্ছিল সে কাজে আমি অনেক সাহায্য পেতে পারতাম। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে বুঝলাম, আবদুর রব একজন প্রতারক (impostor) আর, আচার্য ছিলেন একজন এনার্কিস্ট (নৈরাজ্যবাদী)। এর বেশী তাঁকে আর কিছু বলা যায় না। সংখ্যাল্প মুহাজির যুবকদের আবদুর রব আর আচার্য সহজেই আকর্ষণ করতে পারলেন। এই দুই ব্যক্তি যুবকদের ভিতরকার কমিউনিস্ট উন্মাদনাকে উস্‌কাতে লাগলেন।

"ফল এই দাঁড়াল যে মুহাজিরদের বাড়ীতে কেউ কেউ কমিউনিজম নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা শুরু ক'রে দিলেন। তাঁরা তাঁদের ধর্মোন্মাদনায় অতীত সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্যও প্রকাশ করতে লাগলেন। ধর্মোন্মাদনা সংখ্যাল্পদের ভিতরে 'অতীত' হয়ে গেলেও অন্যদের ভিতরে তা ছিল 'বর্তমান'। সময় সময় কঠোর ভাষায় তর্কাতর্কি তো হতোই, মারামারিও হয়ে যেত। সংখ্যাল্পদের বাঁচাবার জন্যে ও শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়া হাউসের সম্মুখে সশস্ত্র প্রহরী পর্যন্ত মোতায়েন করতে হলো। পক্ষান্তরে, সংখ্যাল্প মুহাজিররা, যাঁরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আবদুর রব-আচার্য গ্রুপের দ্বারা তাঁরা শক্তিশালী হলেন। এই গ্রুপেরই উস্‌কানিতে তাঁদের একদল প্রতিনিধি কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের তুর্কিস্তান ব্যুরোর নিকটে হাজির হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপন করার দাবী পেশ করলেন। আমি তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা

করলাম যে এত তাড়াহুড়ো করার কি দরকার আছে? ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করা উচিত। ক'জন মাত্র মুহাজির এগিয়ে এসে নিজেদের কমিউনিস্ট পার্টি বলে ঘোষণা করে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। এ কথা শুনে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়লেন। আমি ভয় পেলাম যে এই অভিজ্ঞতা তাঁদের মন ভেঙে দিতে পারে। সংখ্যাধিক মুহাজিরদের পরিচালনা করার জন্যে আমার সংখ্যাল্পদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। তাঁদের চাকরী দেওয়া হবে এই কথা জানিয়ে তাঁদের অনুরোধ নাকচ করলেও তা কার্যকরী হতো না। কাজেই, আমি কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপন করার প্রস্তাবে সম্মত হলাম। আমি জানতাম এই পার্টি নামেই শুধু পার্টি হবে, যদিও আমি এও জানতাম যে ভারতের ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট পার্টির অংকুরের কাজ এই পার্টি করতে পারবে। মুহম্মদ শফীক পার্টির সেক্রেটারি নির্বাচিত হলেন। তিনি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান যুবক ছিলেন, আচার্য গ্রুপের সংগে কাবুল হতে এসেছিলেন।"

("এম. এন. রায়ের স্মৃতিকথা", ইংরেজি, এলাইড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৬৮ ও ৪৬৫ পৃষ্ঠা)

তাশকন্দে পার্টির গোড়া পত্তনে রায় আসলে যা করেছিলেন

এম. এন. রায়ের মূল ইংরেজি লেখা আমি ওপরে তুলে দিয়েছি। সংগে সংগে তার বাঙলা তরজমা দিতেও আমি ভুলে যাইনি। তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ১৯২০ সালে তাশকন্দে-আসা মুহাজির (আত্ম-নির্বাসিত) যুবকেরা তাশকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপনে এম. এন. রায়কে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিকথা পড়ে এই ধারণাই আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকত। যে সকল মুহাজির তাশকন্দে ও মস্কোতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সকলে বেঁচে নেই। যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের মধ্যে চেষ্টা করলে আমরা এখন শুধু ভোপালের কমরেড রফীক আহ্‌মদকে পেতে পারি। তাঁরও বয়স আজ (১৯৬৭) সত্তর বছর। অন্য যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা পাকিস্তানের অধিবাসী। পাকিস্তান আজ আমাদের নিকট শুধু বিদেশ নয়—দূর বিদেশ।

একথা আমি কখনও বলব না যে তাশকন্দে মুহাজির যুবকেরা মানবেন্দ্রনাথ রায়কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপন করার কথা কোন দিন বলেননি। কিন্তু এখন আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে তাশকন্দে পার্টি স্থাপন করা সম্বন্ধে রায় যা লিখেছেন, কাজে কিন্তু তিনি তা করেননি। তার বিপরীত কাজই তিনি সেখানে করেছিলেন। তাশকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপন করার প্রকৃত উদ্যোগ এম. এন. রায় নিজেই গ্রহণ করেছিলেন, মুহাজির যুবকেরা নয়।

তাশকন্দে ডক্টর দেবেন্দ্র কৌশিকের আবিষ্কার

ডক্টর দেবেন্দ্র কৌশিক (এম. এ. পি. এইচ-ডি) কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শাস্ত্রের রীডার। তিনি ভারতের আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইতিহাসে ডক্টরেট লাভ করার পরে সোবিয়েৎ দেশের উজবেকিস্তানের লেনিন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেনিনের জাতিসত্তা বিষয়ক প্রশ্ন নিয়ে ("The Leninist Nationalist Policy in Central Asia") গবেষণা করে লেনিন বিশ্ববিদ্যালয় হতেও ডক্টরেট পেয়েছেন। এই উপলক্ষে তাঁকে তিন বছর কাল তাশকন্দে থাকতে

হয়েছিল। তিনি আমায় বলেছেন যে তাশকন্দেই তিনি প্রথম আমার পুস্তক "প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন"১ পড়েন। তা থেকে তাঁর মনে মুহাজিরদের থাকার জায়গাগুলি দেখার বাসনা জাগে। ভারতীয় মুহাজিরদের সময়ের কোনো কাগজ-পত্র পাওয়া যায় কিনা তারও অনুসন্ধান তিনি করতে থাকেন। এই অনুসন্ধানের ফলে তিনি উজবেকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মুহাফিজ-খানায় (Archives) একটি নথি পেয়ে যান (F. 60, ed. No 724, L. 1-4)। এফ ৬০, এড নম্বর ৭২৪, এল, ১-৪ নম্বরের এই নথিটি মুহাফিজ সাহেব নিজেই ডক্টর কৌশিককে খুঁজে বা'র করে দিয়েছিলেন। এই নথির ভিতরে ডক্টর কৌশিক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকটি মূল্যবান দলীল আবিষ্কার করেন। আমার মনে হয় এত মূল্যবান দলীল যে তিনি পেয়ে যাবেন সে কথা আগে তিনি চিন্তাও করতে পারেননি। নিম্নলিখিত দলীলগুলি ওপরে উল্লেখ করা নথিতে ছিল ঃ

(১) তাশকন্দের যে সভায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম স্থাপিত হয়েছিল তার অতি সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী (minutes) ;

(২) নব গঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পরবর্তী একটি সভার সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী (minutes) ;

(৩) তাশকন্দে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হয়েছে তার খবর দিয়ে তুর্কিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিকে লেখা একখানা পত্র।

[১৯২০ সালে এই পার্টির নাম তুর্কিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল। তখনও ভিন্ন ভিন্ন নামের রিপাবলিকগুলি তুর্কিস্তানে গঠিত হয়নি।]

ডক্টর কৌশিকের পাওয়া তিনটি দলীলই আমি নীচে তুলে দিলাম ঃ

(1)

• •"Formed the Indian Communist Party in Tashkent on Oct 17, 1920 with the following members :

1. M. N. Roy
2. Evelina Trent Roy
3. A. Mukherjee
4. Rosa Fitingof
5. Mohd Ali (Ahmed Hasan)
6. Mohd Shafiq Siddiqui and
7. Acharya, M. Prativadi Bayankar

The period of probation for candidate members would be three months.

Mohd Shafiq is elected Secretary.

The Indian Communist Party adopts the principles proclaimed by the Third International and undertakes to work out a programme adapted to the Indian condition.

(Sd.) President : M. Acharya
(Sd.) M. N. Roy, Secretary"

1. The Communist Party of India and its Formation Abroad, National Book Agency Private Limited, Calcutta 12, Bengali, 1961, English 1962.

(2)

Further, in the Party Archives, Tashkent, are given the minutes of a subsequent meeting held on December 15, 1920. It reads as follows :

"Resolved to admit Abdul Qadir Sehrai, Masud Ali Shah Kazi and Akbar Shah as candidate members.

An Executive Committee of Roy, Shafiq and Acharya is elected."

(3)

Also preserved among the documents is a communication sent by Roy to the Central Committee of the Communist Party of Turkestan. It has been signed by Roy as the Secretary concerned. (The Russian term is 'otvestvenny secretar'). There is another signature also thereupon which is illegible. Roy signed in bold letters in Russian in red ink. It reads as under :

> "This is to state that the Communist Party of India has been organized here. It is working in conformity with the principles of the Third International under the political guidance of the Turkestan Bureau of the Comintern."

বাঙলা অনুবাদ

(১)

"নিম্নলিখিত সভ্যগণকে নিয়ে [আজ] ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে তাশকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হলো ঃ

(১) এম. এন. রায়
(২) এভেলিনা ট্রেণ্ট রায়
(৩) এ. মুখার্জি
(৪) রোজা ফিটিংগোফ
(৫) মুহম্মদ আলী (আহ্‌মদ হাসান)
(৬) মুহম্মদ শফীক সিদ্দিকী এবং
(৭) এন. প্রতিবাদী বায়াঙ্কর আচার্য

প্রার্থী সভ্য থাকার মেয়াদ হবে তিন মাস।
মুহম্মদ শফীক সেক্রেটারী নির্বাচিত হলেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি থার্ড ইন্‌টারন্যাশনালের বিঘোষিত নীতির অনুসরণ করবে এবং ভারতের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটা প্রোগ্রামও রচনা করবে।

(স্বাক্ষর) সভাপতি ঃ এম· আচার্য

(স্বাক্ষর) এম· এন· রায়, সেক্রেটারী।"

(২)

তাশকন্দে উজবেকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মুহাফিজখানায় (Archives) একই নথিতে (ফাইলে) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পরবর্তী একটি সভার অতি সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণীও পাওয়া গিয়েছে। এই সভা মিলিত হয়েছিল ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৫ই তারিখে। তাতে দু'টি প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ

"সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে আবদুল কাদির সেহ্‌রাই, মস্‌উদ আলি শাহ্‌ কাজী ও আকবর শাহ্‌ পার্টির প্রার্থী সভ্য হলেন।

"রায়, শফীক ও আচার্যকে নিয়ে পার্টির একটি কার্যকরী কমিটি (Executive Committee) নির্বাচিত হলো।"

(৩)

উজ্‌বেকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির মুহাফিজখানায় (Archives) তুর্কিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সেন্‌ট্রাল কমিটিকে লেখা রায়ের একখানা পত্রও পাওয়া গিয়েছে। এই পত্রে কোনও তারিখ নেই। রায় তাতে বড় রুশ হরফে লাল কালিতে নিজের নাম সই করেছেন। তিনি নিজেকে বলেছেন সংসৃষ্ট সেক্রেটারী (Otvestvenny Secretar)। এই পত্রে আরও একটি দস্তখৎ আছে। কিন্তু তা অস্পষ্ট। এতে লেখা আছে ঃ

"এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে এখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা হয়েছে। থার্ড ইন্‌টারন্যাশনালের নীতি মেনে এবং কমিন্‌টার্নের তুর্কিস্তান ব্যুরোর রাজনীতিক পরিচালনায় পার্টি কাজ করছে।"

১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে যে সাতজন সভ্যকে নিয়ে তাশকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম স্থাপিত হয়েছিল তাঁদের ভিতরে একজনও ১৯২০ সালে তুর্কিস্তানে-আসা ভারতের মুহাজির যুবক ছিলেন না। অথচ, মানবেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে তাঁদেরই জেদাজেদির বশে তিনি একাজে এগিয়ে এসেছিলেন। এই সাতজন সভ্যের ভিতরে এভেলিনা ট্রেণ্ট রায় মানবেন্দ্রনাথের আমেরিকান স্ত্রী এবং প্রথমা স্ত্রী। রোজা ফিটিংগোফ অবনী মুখার্জির রুশীয় স্ত্রী। মুহম্মদ আলী লাহোরের মেডিকেল কলেজে ছাত্র ছিলেন। সেই অবস্থায় ১৯১৫ সালে তিনি ভারত ত্যাগ করেছিলেন। তা ছাড়া অনেক আগে হতেই তিনি, নিজেকে কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন। মুহম্মদ শফীকও ১৯২০ সালের মুহাজির ছিলেন না। তিনি ১৯১৯ সালে ভারত ছেড়েছিলেন এবং রাজনীতিক কারণে ছেড়েছিলেন। আচার্য ১৯০৮ সালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওর্ফে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জি ভারতবর্ষ ছেড়েছিলেন ১৯১৫ সালে।

রায় যখন তাঁর স্মৃতিকথা লিখছিলেন তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে তাশকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপন বিষয়ক সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী-

গুলি (minutes) উজবেকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মুহাফিজখানায় লুকিয়ে আছে এবং ডক্টর দেবেন্দ্র কৌশিক নামক এক ব্যক্তি সেগুলি একদিন আবিষ্কার করবেন। গরজ বড় বালাই। তারই তাগিদে এম. এন. রায়কে তাশকন্দে পার্টি প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হতে হয়েছিল। মেক্‌শিকোর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরূপে তিনি কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি একজন ভারতীয় ছিলেন বলেই কংগ্রেসে তাঁর সব রকমের আদর-কদর হয়েছিল। কংগ্রেসের পরেও তিনি প্রাচ্য দেশের, বিশেষ ক'রে ভারতের কাজের ভার পেয়েছিলেন। অদূর ভবিষ্যতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও তখন ছিল না। আর মেক্‌শিকো তো তিনি চিরদিনের জন্যে ছেড়ে এসেছিলেন। তিনি নানা জায়গায় লিখেছেন যে কমিউনিস্ট ইন্‌টার-ন্যাশনালের ভিতরে তিনি নিজেই নিজের প্রতিনিধি ছিলেন। কারণ, লেনিন তাঁকে নিমন্ত্রণ করে মস্কো আনিয়েছিলেন। রায়ের এসব কথা শূন্যগর্ভ আত্মম্ভরিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মাইকেল বরোদিনের রিপোর্টের ভিত্তিতে লেনিন তাঁকে মস্কোতে ডেকেছিলেন একথা সত্য। কিন্তু তিনি শূন্য হাতে মস্কো আসেননি। তাঁর মুরুব্বি বরোদিনের পরামর্শে তিনি মেক্‌শিকোর সদ্যগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। এ সব কথা তাঁর স্মৃতিকথায় লেখা আছে। কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের ভিতরে কোনো না কোনো কমিউনিস্ট পার্টির (নাম কমিউনিস্ট পার্টি নাও হতে পারে) প্রতিনিধিরাই শুধু পদ-মর্যাদার কাজে নিয়োজিত হতে পারতেন। একথা বরোদিন তাঁকে মেক্‌শিকোতেই বুঝিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন ঘনিয়ে আসছিল। তাই এম. এন. রায়কে বাধ্য হয়েই তাশকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপন করতে হয়েছিল। তা না হলে তৃতীয় কংগ্রেসের সময়ে কোথায় দাঁড়াতেন তিনি? কার প্রতিনিধি হতেন?

কিন্তু একথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনে যে কেন প্রথম সাতজন সভ্যের ভিতরে একজনও ১৯২০ সালের মুহাজির থাকলেন না? এই মুহাজিররাই তো তাশকন্দে কিংবা পরে মস্কোতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হওয়ার সম্ভাব্য লোক ছিলেন। সেই সময়ে তাঁরাই ছিলেন রায়ের নিকটে অভাবনীয় সৌভাগ্যস্বরূপ একথা বললে অত্যুক্তি করা হয় না। ১৯২০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখের একটি পার্টি সভায় ১৯২০ সালের মুহাজিরদের ভিতর হতে তিনজনকে প্রার্থী সভ্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই তিনজনের দুজন, আবদুল কাদির সেহরাই [খান] ও মসঊদ আলী শাহ্ আবার ছিল সন্দেহভাজন ব্যক্তি।

আবদুর রব ও আচার্য কে?

তাশকন্দেই মৌলবী আবদুর রব ও এম. প্রতিবাদী বায়াংকর আচার্যের সঙ্গে এম. এন. রায়ের সম্পর্ক খারাব হয়েছিল। রায় তাঁর স্মৃতিকথায় মৌলবী আবদুর রবকে "প্রতারক" (Impostor) ও আচার্যকে "এনার্কিস্ট" ব'লে বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁদের যৎসামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া দরকার। মৌলবী আবদুর রব সম্ভবতঃ পেশোয়ার জিলার লোক। কারণ তাঁকে আবদুর রব পেশোয়ারীও বলা হয়। যতটা জানতে পেরেছি, তিনি একজন বহু ভাষাবিৎ, সুবক্তা, পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অধীনে উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর এই চাকরী হয়তো কূটনৈতিক বিভাগে ছিল। তাঁরই সংগৃহীত মাল-মসলা একত্র

করে মাক্‌রান গেজেটিয়ার রচিত হয়েছিল। বেলুচিস্তানের কালাত বিভাগে মাক্‌রান একটি দুরধিগম্য স্থান ছিল। একবার যিনি মাক্‌রানে গিয়েছেন তার কষ্টকর অভিজ্ঞতা তাঁর মনে দুঃস্বপ্নের মতো বরাবর জাগরূক থেকেছে। এই গেজেটিয়ারের ভূমিকায় লেখা হয়েছে ঃ

"In the present work an endeavour has been made to collate whatever published information is available and to supplement it with material gleaned from the country itself. For the purpose one of our Gazetteer assistants Maulavi Abdur Rab, was deputed to Makran, where he spent 14 months investigating actual conditions *in situ* during 1903-4, and I am indebtd to him for the local material included in this work."

(Beluchistan District Gazetteer Series, Vol VII ***MAKRAN*** by R. Hughes-Buller, I. C. S. (Bombay 1906, p iv)

১৯০৩-৪ সালে মৌলবী আবদুর রব যে চৌদ্দ মাস মাকরানে থেকে মাকরান গেজেটীয়ারের জন্যে স্থানীয়ভাবে মাল-মসলা জোগাড় করেছেন তার জন্যে গেজেটীয়ারের সম্পাদক মিস্টার আর হিউজেস্‌ বুলার, আই· সি· এস· তাঁর নিকটে ঋণ স্বীকার করেছেন।

এর পরের ক'বছর কোথায় কোথায় কি কি কাজে মৌলবী আবদুর রব নিযুক্ত ছিলেন তা আমি জানিনে। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস (১৯৫৩)" হতে জানা যায় যে ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়ে তিনি বাগ্দাদের ব্রিটিশ দূতাবাসে উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। তুর্কিরা জার্মানীর পক্ষে এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যোগ দেওয়ায় ইংরেজরা বাগ্দাদের দূতাবাস তুলে দিয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার সময়ে কিন্তু তাঁরা মৌলবী আবদুর রবকে এই ভরোসায় পেছনে রেখে গেলেন যে মুসলমান হওয়ার সুযোগ নিয়ে তিনি পেছন হতে ইংরেজদের সংবাদ সরবরাহ্‌ করবেন। আবদুর রব অবশ্য তা করলেন না। তিনি সোজাসুজি তুর্কির পক্ষে অতএব জার্মানীর পক্ষেও যোগ দিলেন। আমার মনে হয় জীবনে এই প্রথম আবদুর রব ব্রিটিশ-বিরোধী রাজ-নীতিতে নিজেকে জড়ালেন। যুদ্ধের পরে তাঁকে আঙ্গোরায়, আফগানিস্তানে এবং ১৯১৯ সালে সোবিয়েৎ দেশেও দেখা যায়।

এখন আমি দক্ষিণ ভারতের **আচার্যের কথা** কিছু বলি। আমাদের দেশের পুলিশ রিপোর্টে তাঁর নাম লেখা আছে মাণ্ডায়াম পার্থসারথি তিরুমালাই আচার্য (Mandayam Parthasarathi Tirumalai Acharya)। কিন্তু ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে পার্টির সভায় তিনি নিজের হাতে নাম সই করেছেন এম· প্রতিবাদী বায়াংকার আচার্য (M. Prativadi Bayankar Acharya)। আচার্যরা আসলে মহীশূরের বাশিন্দা ছিলেন। তবে, তাঁর পরিবারের লোকেরা বহু বৎসর হতে মাদ্রাজে বাস ইখ্‌তিয়ার করেছিলেন। দেশে ছাত্রজীবনে তিনি কোনো বৈপ্লবিক দলের সংস্রবে এসেছিলেন কিনা তা আমি জানিনে। ১৯০৮ সালে সম্ভবত পড়াশুনা করার উদ্দেশ্যে লণ্ডনে গিয়ে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তখন তিনি বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহকর্মী হয়েছিলেন। ফরাসী

দেশেও তিনি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে এনার্কো-কমিউনিস্ট পার্টির সংস্রবে এসেছিলেন। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় ঘুরেছেন। আবদুর রবের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ও বন্ধুত্ব যতটা আন্দাজ করা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে হয়েছিল। তাঁদের একত্রে আফগানিস্তানে দেখা গেছে। এম. এন. রায় রুশ দেশে যাওয়ার অনেক আগে ১৯১৯ সালে তাঁরা সে দেশে গিয়েছেন। ১৯১৯ সালেই তাঁরা লেনিনের সঙ্গে দেখাও করেছেন।

এম. এন. রায় কেন আচার্যকে এনার্কিস্ট বলেছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময়ে মস্কোতে আচার্য হয়তো নিজেই রায়কে বলে থাকবেন যে ইউরোপে তিনি এনার্কিস্টদের সংস্রবে এসেছিলেন। কিংবা অন্য কেউ রায়কে এ খবর দিয়ে থাকবেন। কিন্তু তিনি আবদুর রবকে কেন প্রতারক বলেই বাতিল করে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে কোনো কথাই তিনি তাঁর লেখায় প্রকাশ করেননি। একজন লোককে প্রতারক বলার আগে তিনি কোথায় কি প্রতারণা করেছেন তার কিছু আভাস অন্তত দেওয়া উচিত ছিল। শুনেছি আচার্য সোবিয়েৎ দেশে হতমান হয়েও একজন রুশ বিবী সঙ্গে নিয়ে জার্মানীতে ফিরেছিলেন। তখন আবার তিনি তাঁর পুরনো নৈরাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। 'এনার্কো সিণ্ডিকালিস্ট' ও 'ফোর্থ ইণ্টারন্যাশনালের সভ্য' বলে তিনি তখন নিজের পরিচয় দিতেন। এ জন্যেই কি মহীশুরে ও দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো স্থানে 'ফোর্থ ইন্টারন্যাশনালে'র নাম শোনা যায়? শেষ জীবনে আচার্য দেশে ফিরেছিলেন, বোম্বেতে থাকতেন, এবং শুনেছি এখন (১৯৬৭) তিনি আর বেঁচে নেই।

১৯২০ সালে তাশকন্দে ও পরে সম্ভবত মস্কোতেও মুহাজিরদের ভিতরে আচার্য ও আবদুর রবের নাম একত্রে উচ্চারিত হতো। দেখা যাচ্ছে যে তাঁদের এই বন্ধুত্বে চিড় ধরেছিল। মানবেন্দ্রনাথ রায় এনার্কিস্ট ব'লে আচার্যকে বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন। আবার দেখা গেল, আচার্যকে সঙ্গে নিয়েই তিনি তাশকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ভিত্তি স্থাপন করলেন। তাতে আবদুর রব নেই। তার মানে, আবদুর রবের বন্ধন হতে রায় অন্তত সাময়িকভাবে আচার্যকে মুক্ত করেছিলেন। রায়ের চরিত্র সত্য সত্যই অধীত হওয়ার দাবি রাখে।

আবদুর রবের চরিত্রও অধীত হওয়া প্রয়োজন। কাগজ-পত্র পড়ে আমি যতটা বুঝেছি তাতে তিনি ধর্মোন্মাদ ছিলেন না। একজন ঝানু খিলাফৎ ওয়ালাও ছিলেন না তিনি। ভোপালের রফীক আহ্মদের জবানিতে শোনা তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আমি আমার "প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন" নামক পুস্তকে লিখেছি। তাঁর মুখে যত কথা শুনেছি তার সব কথাই লিখে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাতে লেখাটা অনেক বড় হয়ে যেত। সেই সময়ে তিনি আবদুর রব সম্বন্ধেও অনেক কথা বলেছিলেন। সে সব কথা আমি খুব কম লিখেছি, লিখিনি বললেও চলে। তা ছাড়া, আবদুর রব সম্বন্ধে অনেক কথা তিনিও জানতেন না। হালে (১৯৬৭) রফীক আহ্মদ ভোপাল হতে আবার আমায় আবদুর রবের কথা লিখেছেন। এখন ভাবছি রফীক আহ্মদের দেওয়া আবদুর রবের বিষয়ে কিছু বৃত্তান্ত এখানে দেওয়া দরকার। রফীক আহ্মদরা ১৯২০ সালের ১লা মে কিংবা তার কাছাকাছি সময়ে কাবুলে পৌঁছেছিলেন। সেই সময়ে মৌলবী আবদুর রব ও আচার্য সেখানে ছিলেন। রফীক আহ্মদ বলছেন ঃ

"রুশ দূতাবাসের একটি হলঘরে দক্ষিণ ভারতের আচার্য ও মৌলবী আবদুর রবের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। চা ও কেক খাওয়ার পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের

কথা শুরু হয়। মৌলবী আবদুর রব বললেন তিন-চার মাস আগে তাঁরা রুশ হতে কাবুলে এসেছেন। কাবুলের অবস্থা হচ্ছে এই যে বাদ্‌শাহ্‌ আমানুল্লাহ যে-কোনো মূল্যের পরিবর্তে ব্রিটিশের সঙ্গে সন্ধি করতে চান। এই কারণে নিরাশ হয়েই তার সঙ্গীদের নিয়ে তিনি রুশে চলে যাচ্ছেন। এই সঙ্গীরা ছিলেন কিছু সংখ্যক ভারতীয়। তিনি বললেন, সে দেশে বিপ্লব হয়ে গেছে। বিপ্লবী সরকার আমাদের সব রকমের কাজে সাহায্য করবেন ও সুযোগ দিবেন। তখন একথাও আবদুর রব বলেছিলেন যে রুশ হতে কেউ যদি আনাতোলিয়ায় যেতে চান তারও ব্যবস্থা করা হবে। পরে দেখা গেছে যে এ সুযোগ সোবিয়েৎ গবর্নমেণ্ট বরাবর ভারতীয় মুহাজিরদের দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা আনাতোলিয়ায় প্রবেশ করার অনুমতি কখনও পাননি। আমাদের মধ্য হতে যাঁরা আবদুর রবের সঙ্গে রুশে যেতে চান তিনি তাঁদের নাম চাইলেন। বললেন, পরের দিন তিনি আবার বাদ্‌শাহের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। তখন তাঁর কাছ হতে তিনি অনুমতি নিয়ে নিবেন। রফীক আহ্‌মদ সহ ক'জন ওখানেই তাঁদের নাম লিখে দিয়েছিলেন। পরের দিন মুহম্মদ আকবর খান (?), মুহম্মদ আকবর শাহ্‌, সুলতান মুহম্মদ ও গওহর রহমান খানের সঙ্গে যখন মৌলবী আবদুর রবের দেখা হয়েছিল তখন তিনি তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে বাদ্‌শাহ্‌ আমানুল্লাহ্‌ মুহাজিরদের রুশে যাওয়ার অনুমতি দিবেন না। এর মধ্যে তিনি বোধ হয় বাদ্‌শাহের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আবদুর রব ভারতীয় মুহাজিরদের তখন এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে তাঁদের সকলে আনাতোলিয়া যাওয়ার প্রার্থনা করে বাদ্‌শাহের নিকটে দরখাস্ত করুন। মুহাজিররা তাই করেছিলেন, আবদুর রব মুহাজিরদের বলেছিলেন, 'আপনারা ধীরেসুস্থে পরে আসুন। আমি আপনাদের জন্যে তাশকন্দে অপেক্ষা করতে থাকব।' এর পরে আবদুর রব ধরলেন তাশকন্দের পথ, আর আমরা গেলাম জেবলুস্‌ সিরাজে। পোশাক তৈয়ার করাবার জন্যে তিনি কয়েকজনকে তিন পাউণ্ড হিসাবে সাহায্য করেছিলেন।"

এই থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আবদুর রব গোঁড়া খিলাফৎওয়ালা একেবারেই ছিলেন না। তিনি মুহাজিরদের আনাতোলিয়া যাওয়ার উৎসাহ না দিয়ে বিপ্লবের দেশ রুশে যাওয়ার জন্যেই উৎসাহিত করেছেন। তাঁর মত ও পথ কি ছিল? তিনি নিজেকে কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করতেন। তাই যদি তিনি ছিলেন তবে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন না কেন? তাঁর মতে তাশকন্দে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টি যদি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি না হয়ে থাকে তবে তাতে যোগ দিয়ে তিনি তাকে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টিরূপে গড়ে তুলতে পারতেন। তাঁরও অনুগামীর সংখ্যা কম ছিল না। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনেক আগে হতে তিনি রুশ দেশে যাতায়াত করেছেন। রায়ের ওদেশে আসার অনেক আগে তিনি লেনিনের সঙ্গে দেখা করেছেন। কিন্তু তাঁর কাজের কি প্রভাব ভারতের রাজনীতিতে পড়েছিল তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিনে।

ডক্টর দেবেন্দ্র কৌশিক উজ্‌বেকিস্তানে থাকার সময়ে পুরনো দিনের স্থানীয় খবরের কাগজগুলি হতে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন১ তাতে আছে যে কাবুল হতে ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি ছোট দল ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে তাশকন্দে পেৌঁছেছিলেন। ডক্টর কৌশিকের সংগৃহীত তথ্য হতে তিনি বলছেন যে এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুর রব। কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দা অফিসার কর্নেল

১ LINK (English Weekly) Delhi, January 26, 1966, P. 72.

বেইলী (Col. Bailey) তখন তাশকন্দে ছিলেন। তাঁর "মিশন টু তাশকেণ্ট" ("Mission to Tashkent") নামক পুস্তকে তিনি লিখেছেন যে এই দলের নেতা বরাকাতুল্লাহ্ ছিলেন। ডক্টর কৌশিক অবশ্য একথাও তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের আনুষ্ঠানিক প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল ১৯১৯ সালের ২রা মার্চ হতে ৬ই মার্চ পর্যন্ত। কাজেই এটা বোঝা যাচ্ছে যে বরাকাতুল্লাহ্ আর আবদুর রবেরা সোবিয়েৎ গবর্নমেণ্টেরই অতিথি তখন হতেন, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নয়। আবদুর রব খুব সুবক্তা ছিলেন। তার ওপরে, তিনি তুর্কি ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারতেন। এই জন্য তিনি তাশকন্দের বাশিন্দাদের নিকটে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। ডক্টর কৌশিকের লেখা পড়ে বোঝা যাচ্ছে যে তাশকন্দের পুরানো লোকেরা এখনও আবদুর রবকে স্মরণ করেন।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা ক'রে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আবদুর রব কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বপ্রিয় লোক ছিলেন। তাশকন্দে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে দেখে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। নেতৃত্ব যে রায়ের হাতেই চলে গেছে এটা তিনি সংগে সংগেই বুঝে নিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত নেতৃত্ব অপেক্ষা যে বিপ্লবী পার্টি বড় এই সাংগঠনিক তত্ত্ব তাঁর মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। মুহাজিরদের নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দল গড়তে লাগলেন। যদিও তিনি নিজেকে কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন তবুও তাঁর পকেটে "ভারতীয় বিপ্লবীদের সমিতি" (Association of Indian Revolutionaries) নামে অপর একটি সংগঠনও ছিল। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যে এই সংগঠনকে "ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট সমিতি" নামে উল্লেখ করেছেন তা সম্পূর্ণ ভুল। মস্কোতে আবদুর রব মুহাজিরদের নিয়ে তার আলাদা পার্টি গড়ছিলেন। পরে পেশোয়ারে ফিরে এসে কিছু সংখ্যক মুহাজির যুবক পুলিসের নিকটে নানান রকম বিবৃতিতে বলেছেন, তাদের মধ্যে কে কে আবদুর রবের দলে ছিলেন, আর কে কে ছিলেন রায়ের দলে, অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে। তাশকন্দে থাকতে থাকতেই দক্ষিণ ভারতীয় আচার্যের সংগে রায়ের ঝগড়া আরম্ভ হয়েছিল। তিনি (রায়) প্রস্তাব করেছিলেন যে আচার্য দেশে ফিরে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে তুলতে থাকুন। ১৯০৮ সালে যিনি ভারত ত্যাগ ক'রে বিদেশে নির্বাসিতদের দলভুক্ত হয়েছিলেন তাঁর পক্ষে এভাবে দেশে ফিরে কাজ করা সম্ভব ছিল না। আচার্য ভাবলেন তাঁকে অপদস্থ করার জন্যেই রায় এ ধরনের প্রস্তাব তুলেছেন। আচার্য পাল্টা প্রস্তাব করলেন যে রায় কমিউনিস্ট পার্টিতে থাকার উপযুক্ত নন। তাঁর নাম পার্টি হতে কেটে দেওয়া হোক। তুর্কিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি এ ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তারা দু'পক্ষকে মস্কো গিয়ে বিবাদ মেটাবার চেষ্টা করার কথা বলে দিলেন। মস্কোর সিদ্ধান্ত আচার্যের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। তার পরে আচার্য আবার আবদুর রবের দলে ভিড়েছিলেন। পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত "মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা"র (১৯২২-২৩) কাগজ-পত্রে পাওয়া যাচ্ছে যে আবদুর রব শেষ পর্যন্ত আমেরিকান রিলিফ মিশনের হয়ে কাজ করছিলেন।[১] সোবিয়েৎ গবর্নমেণ্ট ও কমিউনিস্ট

১ ১৯২১ সালের জুলাই মাসে ম্যাক্‌সিম গোর্কি আমেরিকান রিলিফ এড্‌মিনিস্ট্রেশনের (A. R. A) চেয়ারম্যান হার্বার্ট হুবারকে অনুরোধ জানালে

ইন্‌টারন্যাশনাল তাঁর এ কাজের সমর্থন করেননি। সুতরাং সোবিয়েৎ দেশে হতমান হয়ে তিনিও জার্মানী গিয়েছিলেন। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ৩০-৮-১৯৬৭ তারিখে আমায় লিখেছেন, মৌলবী রবের তুর্কি স্ত্রী ছিলেন। তাই কোনো তুর্কি অফিশিয়েলের অনুরোধে তাঁকে স্তাম্বুল যেতে দেওয়া হয়েছিল। তিনি নিশ্চয় তুর্কিতেই মরেছেন। রাজা শুধু শুনেছেন যে মৌলবী রব আর বেঁচে নেই।

মুহম্মদ আকবর খান তাঁর এক মুলাকতকারীকে বলেছেন যে তাশকন্দে "ইণ্ডিয়া হাউসে" বাস করার সময়ে আবদুর রব পেশাওয়ারীর সহিত তাঁর দিনের পর দিন আলোচনা হয়েছে। তাতে তিনি বুঝেছিলেন :

(১) ইস্‌লামে তাঁর বিশ্বাস তখনও রয়েছে ;

(২) তিনি আনওয়ার পাশার লোক।

তিনি সাহায্য করতে রাজী হন। সোবিয়েৎ কর্তৃপক্ষ এবং আমেরিকান রিলিফ এড্‌মিনিস্ট্রেশনের মধ্যে কাজ চালাবার একটি পদ্ধতি স্থির হয়ে যায়। অন্যান্য ইউরোপীয় দাতব্য সংগঠনও সাহায্য করেছিলেন। সবচেয়ে বেশী সাহায্য এ. আর. এ যখন বিতরণ করেছিলেন (মার্চ, ১৯২১) তখন দৈনিক প্রাপকের সংখ্যা শিশু ও বয়স্কতে মিলিয়ে এক কোটিতে উঠেছিল।

(এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ঊনবিংশ খন্ড, পৃষ্ঠা ৭১৪, কলম ২)

ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রেরণায় একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে যে-সব মুহাজির যুবক মস্কো এসেছিলেন তাঁরা নবগঠিত "শ্রমজীবী প্রাচ্যের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়" ("Communist University of the Toiling East") স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাতে ভর্তি হয়েছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল ১৯২১ সালের ২১শে এপ্রিল তারিখে। মস্কো আসার পরে এই যুবকদের ভিতর হতে অনেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। এই সময়ে (১৯২১) ভারতের এই প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বারা স্বীকৃতও হয়। খুব অল্প সংখ্যক সভ্য নিয়ে অন্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিও যে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রায় পঞ্চাশজন সভ্যের বারোজন প্রতিনিধি নিয়ে ১৯২১ সালের ১লা জুলাই তারিখে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। কমিউ-নিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধিও তার স্বীকৃত এই পার্টির কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে এমন সভ্যরাও ছিলেন (হয়তো এখনও আছেন) যাঁরা প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার কথা বিশ্বাস করতেন না। আর, যাঁরা পার্টি গঠিত হওয়ার কথাই মানবেন না, তাঁরা প্রবাসী পার্টির কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সহিত সংযুক্ত হওয়ার কথা মানবেন কি করে? ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই সকল সভ্যের মন হতে তখনও জাতীয়তা-বাদের ঘোর কাটেনি। ঊনিশ শ' বিশের দশকের পার্টির প্রথম সভ্যদের মধ্যে শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে বিদেশে পার্টি গঠিত হওয়ার কথা স্বীকার করত বটে, কিন্তু সেই পার্টি যে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অঙ্গীভূত ছিল এই কথা সেও মানত না। আমার "প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন" নামক পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পরে সে আমাকে তার এই লিখিত অভিমত জানিয়েছিল।

ভারতে প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি যে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সহিত সংযুক্ত হয়েছিল এবং ১৯২১ সালেই হয়েছিল সেই সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু তথ্য ও প্রমাণ এখানে উপস্থিত করছি ঃ

[এক]

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অনুরোধে পশ্চিম ইউরোপ হতে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কয়েকজন জাতীয়তাবাদী ভারতীয় বিপ্লবী মস্কো এসে-ছিলেন। তাঁদের নাম ঃ

(১) বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(২) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (তখনও ডক্টর হননি)

(৩) বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(৪) সৈয়দ আবদুল ওয়াহিদ

(৫) অধ্যাপক পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে

(৬) হেরম্বলাল গুপ্ত

(৭) গুলাম আম্বিয়া খান লুহানী

(৮) আগ্নেশ স্মেডলি

(৯) নলিনী গুপ্ত

শেষোক্ত তিনজন ছাড়া আর সকলে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর সহিত একটা সমঝতা করেছিলেন। তার শর্ত ছিল এই যে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানী ভারতীয় বিপ্লবীদিগকে প্রচুর অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করবেন, আর তাই দিয়ে ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মানীর শত্রু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে ব্যাপক অভ্যুত্থান ঘটাবেন। সাম্রাজ্যবাদী জার্মান ভারতীয় বিপ্লবীদিগকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু সেই সাহায্য সুপ্রচুর ছিল কিনা তা আমার জানা নেই। তবে, অস্ত্র সাহায্য যে জার্মানী দিতে পারেনি এটা সত্য কথা। ভারতীয় বিপ্লবীরা বিদেশে যে জার্মানীর নিকট হতে অর্থ সাহায্য পেয়েছিলেন তার জন্যে তাঁরা জার্মানীর নিকটে কৃতজ্ঞ ছিলেন। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের আত্মকথা হতে জানা যায় যে কাইজারের গবর্নমেন্টের পতনের পরও ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মান গবর্নমেন্টের নিকট হতে সাহায্য পেয়েছেন।

যাই হোক, এই ভারতীয় বিপ্লবীরা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সহিত কথাবার্তা চালাবার জন্যে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মস্কো গেলেন। ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবী হিসাবে চট্টোপাধ্যায় চাইতেন না যে ভারতে তখন কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হোক। আশ্চর্য এই, নিজে কিন্তু তিনি তখন এনার্কিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বারা নিয়োজিত একটি কমিশনের সামনে তিনি এই প্রস্তাব তুলে ধরলেন যে একটা 'রেভোলিউশনারী বোর্ড' গঠন ক'রে তার মারফতে ভারতের কাজ চালানো হোক। কমিউনিস্ট পার্টি গড়তে হয় তো ইংরেজকে তাড়ানোর পরে গড়া হবে। চট্টোপাধ্যায় সুশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু মনে হচ্ছে তিনি খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারতেন না। তাই, তিনি তাঁর কথা কমিশনের নিকটে গুলাম আম্বিয়া খান লুহানীকে দিয়ে পেশ করিয়েছিলেন। লুহানী ছিলেন একজন সিদ্ধ বক্তা ও সুলেখক।

সকলকে ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যে এতক্ষণ আমি শুধু একটা ভূমিকা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এবারে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় আমি আসল কথাটা বলি।

"এই স্থলে বক্তব্য যে কিছুদিন পূর্বেই হঠাৎ প্রাতঃকালে মস্কোর একটি কাগজে প্রকাশিত হইল যে, একটি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হইয়াছে এবং তাহা আন্তর্জাতিক দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে (affiliated)। এই কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য কাহারা? সস্ত্রীক রায়, সস্ত্রীক মুখোপাধ্যায় এবং মুহাজিরিন তরুণেরা। দ্বিতীয় কমিশন বসিবার পূর্বেই কোন এক মিটিং-এ লুহানী এই পার্টিকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'It is a bogus party.' (ইহা একটি মেকি দল)। পুনরায় কমিশনের দ্বিতীয় অধিবেশনে তাঁহাদের থিসিস্ পাঠ

করিবার কালে লুহানী বলিয়াছিলেন, **'তৃতীয় আন্তর্জাতিক হইতে এই পার্টির নাম খারিজ করা হউক'** এবং তাহাদের পরিকল্পিত রেভোলিউশনারী বোর্ড-এর মধ্য দিয়া ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনে সাহায্য করা হউক।"১ (মোটা হরফ আমার)।

এই উদ্ধৃতি হতে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে ওই সময়ে 'ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি' কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সহিত সংযুক্ত হয়েছিল। লক্ষ্য করবার বিষয় যে গুলাম আম্বিয়া খান লুহানী কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের আয়োজিত একটি কমিশনের সামনে দাঁড়িয়েই বার্লিন হতে আসা ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের দাবী পেশ করেছিলেন।

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় সন ও তারিখের কোনো বালাই নেই। ১৯২১ সালের প্রথম দিকে তাঁরা মস্কো এসেছিলেন একথা বোঝা যায়। অধ্যাপক খান-খোজেকে ধন্যবাদ, তিনি অন্ততঃ লিখেছেন যে মস্কোতে তাঁরা তিন মাস ছিলেন। সব মিলিয়ে এটা বোঝা যায় যে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার আগেই তাঁরা সোবিয়েৎ দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এই তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন ১৯২১ সালের ২২শে জুন তারিখে আরম্ভ হয়েছিল, আর শেষ হয়েছিল ১২ই জুলাই তারিখে।

ডক্টর দত্ত আরও একটি কথা বলছেন যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা সম্বন্ধে সৈয়দ আবদুল ওয়াহিদ, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও তিনি তাদের দলের নেতা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সহমত ছিলেন না। তার মত ছিল এই যে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার অধিকারও একমাত্র তাঁদেরই। এই বিষয়ে দেশে তারা চিঠি-পত্র লিখেছেন। মুহাজির তরুণেরা আবার কোথাকার কে যে বিদেশে এসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করবেন? কিন্তু দেশের ভিতরে অনেক অনুসন্ধান করেও আমরা জানতে পারিনি যে তিনি কাদের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার জন্যে পত্র লিখেছিলেন। তিনি নিজে এই সম্বন্ধে আমাদের কোনোদিন কিছু বলেননি, কিছু লিখেও যাননি তাঁর পুস্তকে। ১৯২৫ সালে তিনি দেশে ফিরেছিলেন, আর মৃত্যুবরণ করেছেন ১৯৬৯ সালে। দীর্ঘ সময়।

আগনেশ স্মেডলি একজন ভারত বন্ধু আমেরিকান নারী ছিলেন। মতে তিনিও ছিলেন এনার্কিস্ট। কিছুদিনের জন্যে তিনি বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বিয়েও করেছিলেন। নলিনী গুপ্তের পরিচয় এখানে দেওয়ার দরকার নেই। পরে তার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমি করব।

[দুই]

ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির কাজ জার্মানীতেও প্রসারিত হয়েছিল। জার্মানী হতেই ১৯২২ সালের ১৫ই মে তারিখে পার্টির প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তার নাম ছিল "দি ভ্যানগার্ড অফ দি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স" (ভারতীয় স্বাধীনতার অগ্রসেনা)। বলা বাহুল্য, আমাদের পার্টির এই প্রথম পাক্ষিক পত্রিকা-খানি ইংরেজি ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরিচালনায় মূলতঃ মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর আমেরিকান প্রথমা স্ত্রী এভেলিনা ট্রেণ্ট রায় ছিলেন। ভারতের কাগজে প্রবন্ধ লেখার সময়ে এভেলিন রায় কোনো কোনো সময়ে নিজের শান্তি

১ অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস, নূতন সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৫৩

দেবী নামও ব্যবহার করতেন। আমাদের দেওয়া বিভিন্ন ঠিকানায় কাগজের প্যাকেটগুলি ডাকে আসত। আমরা কাগজগুলি বিভিন্ন লোকের মধ্যে বেঁটে দিতাম। কলকাতায় কোনো কোনো লোকের চিঠির বাক্সেও আমরা তা ঢুকিয়ে দিয়ে আসতাম। কোনো কোনো ঠিকানায় আবার শুধু একখানা কাগজ আসত। এগুলির আসা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল। কাগজে লেখা থাকত না যে তা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র এবং এই পার্টি কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের অংশ বিশেষ। যখন আমরা দেখতে পেলাম যে "ভ্যানগার্ড অব দি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স" পুলিসের নিকটে বড় বেশী জানাজানি হয়ে গেছে এবং কোনো কোনো ঠিকানার প্যাকেটগুলি পুলিস আটকাতেও আরম্ভ করেছে, তখন আমি মানবেন্দ্রনাথ রায়কে পত্র লিখে জানালাম যে "এবারে কাগজের নাম পরিবর্তন করুন। তাতে হয় তো কিছু সুবিধা হতে পারে।" অন্য প্রদেশ হতে আরও কেউ এ কথা লিখেছিলেন কিনা তা আমি জানিনে, কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ আমার পত্রোত্তরে জানিয়েছিলেন যে কাগজের নামের পরিবর্তন তিনি করবেন। তার পরেই কাগজের নাম হলো "এড্‌ভান্স গার্ড" ("অগ্রসর সেনা")। "এড্‌ভান্স গার্ডে"ও লেখা থাকত না যে তা "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র", ইত্যাদি। কিছুকাল পরে দেখা গেল যে "এড্‌ভান্স গার্ডের"ও আগেকার অবস্থা হয়েছে। তখন স্থির করা হলো যে আগেকার নামে ফিরে যাওয়া হোক। কিন্তু দেখা গেল যে ইতোমধ্যে ডক্টর দত্তরা, অর্থাৎ মস্কো হতে জার্মানীতে ফিরে-আসা ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীরা আমাদের প্রথম নামের অর্ধেক অধিকার করে বসেছেন। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সম্পাদনায় তাঁরা "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স" ("ভারতীয় স্বাধীনতা") নামে একখানা কাগজ বার করে দিয়েছেন।

"ভ্যানগার্ড অফ দি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স" ও "এড্‌ভান্স গার্ড" পরিচালনা করার ভিতর দিয়ে এক বছর কেটে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা শুধু "দি ভ্যানগার্ড" নামেই ১৯২৩ সালের ১৫ই মে তারিখে প্রকাশিত হলো। এবার আর কোনো ঘোরপ্যাঁচের ব্যাপার থাকল না,—পরিষ্কার ভাষায় লিখে দেওয়া হলো যে "দি ভ্যানগার্ড" ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের অংগীভূত। এই সম্বন্ধে কারুর মনে যেন কোনও সন্দেহ না থাকতে পারে তার জন্যে "ভ্যানগার্ডের" দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যার (১৫ই মে, ১৯২৩) প্রথম পৃষ্ঠায় ফটোস্টাট কপি গ্রহণ করে তার ব্লক আমি এখানে ছেপে দিলাম। কাগজখানির দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করা উপলক্ষে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের এক্‌জেকিউটিব কমিটির তরফ হতে তার প্রেসিডিয়াম যে বাণী পাঠিয়েছিলেন সেই বাণীও এই প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। এর চেয়েও অকাট্য প্রমাণ আর কি থাকতে পারে?

"ভ্যানগার্ডে"র এই সংখ্যাটি ও তার পরবর্তী সংখ্যাগুলি আমি কখনও দেখিনি। কারণ, ১৯২৩ সালের ১৭ই মে তারিখে গিরেফ্‌তার হয়ে আমি জেলে চলে গিয়েছিলেম। কিন্তু শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে ও সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘাটে তখন বাইরে ছিল। তারা ১৯২৩ সালের ১৫ই মে তারিখের "ভ্যানগার্ড" ও তার পরবর্তী সংখ্যাগুলি দেখেছে ও পড়েছে। ডাঙ্গে ১৯২৪ সালের মার্চ মাসের আগে গিরেফ্‌তার হয়নি। ১৯২৪ সাল হতেই অর্থাৎ, ডাঙ্গের গিরেফ্‌তারের পর হতে ঘাটে পার্টিতে সক্রিয় হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা ভুল তথ্য সরবরাহ করেছে এবং সেই তথ্যের ওপরে নির্ভর করেই ভারতের দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পার্টির চত্বারিংশ বার্ষিকী পালন করেছেন। তাঁরা ১৯২৫

FIRST ANNIVERSARY NUMBER

THE

Subscription
Year Rs 4
6 months Rs 2.8

Published
twice
a month

VANGUARD

CENTRAL ORGAN COMMUNIST PARTY OF INDIA
(SEC. COMMUNIST INTERNATIONAL)

Price
single copy
Two Annas

Address
P.O. Box 433a
Zurich 13
Switzerland

Vol. II No. 7 | BOMBAY CALCUTTA MADRAS | May 15th, 1923

ONE YEAR

Today the *Vanguard* completes the first year of its existence. In this short period of twelve months its usefulness has been unquestionably demonstrated. It has faithfully and courageously stood at its post through thick and thin. But above all it has been proved by the relentless logic of history that the *Vanguard* is destined to play a decisive rôle in the Indian Revolution because it is the standard bearer of the class which is objectively the most revolutionary element in our society. In a most critical period of the national life, when the movement for national liberation was led into a blind alley and proved to be utterly incapable of finding the only way out, the *Vanguard* appeared on the scene as the herald of a new phase of the anti-imperialist struggle. From the very beginning we did not hesitate to point out the weakness of the nationalist movement. Our object in doing so was not mere barren criticism, it was on the one hand to awaken the consciousness of the revolutionary social forces and on the other to stimulate the vascillating middle classes to action. A retrospective analysis of the past year leaves no doubt whatsoever that the path indicated by us was the only path to national liberation. If today the Indian people do not stand any nearer to the goal than a year ago, it is because of the refusal of the [illegible] leaders to travel on the only way which leads to national freedom. We have never had any illusion [illegible] score. Therefore we are not in the least disheartened by the apparent depression in the movement. In fact we predicted this period of depression as the [illegible] consequence of the reactionary philosophy and faulty tactics of Non cooperation.

Now that the deadlock which followed the crisis is breaking down before the rise of new political parties with clear social character and unmistakable economic significance, conscious revolutionary factors of our society can no longer defer a serious consideration of the programme advocated in the columns of the *Vanguard* during the last twelve months. We came out with the demand for the organization of a mass-party which should lead the workers and peasants in the anti-imperialist struggle independent of the treacherous bourgeoisie and the timid lower middle class. Never has this demand of ours been more imperative than today. The national movement is floundering like a rudderless ship on the ocean of political confusion and dangerous inaction. Taking advantage of this depression, the bourgeoisie is coming out with its doctrine of compromise and gradual evolution through constitutional means. It is needless to say that the organization of the revolutionary social forces of those who have nothing to lose but a world to gain—of those who therefore must denounce the tactics of compromise—cannot be delayed without great detriment to the freedom of the Indian people.

The nationalist movement has turned the corner. It is no longer the same half-utopian half-reactionary movement called Non-cooperation which was led by Gandhi. Today it is a decidedly bourgeois movement which seeks such modification of the imperialist domination as will permit the development of Indian capitalism. This programme certainly sounds like that of the good old Moderates. But there is a fundamental difference which is very dangerous. The post-war restiveness of the masses and the utilization of this mass upheaval by the Non-cooperators have taught the bourgeoisie a valuable lesson. This lesson constitutes the essential difference between the programme of old Moderatism and that of the new bourgeois nationalism. While the former believed sublimely in the doctrines of constitutional democracy preached by the British Liberals and, therefore, prayed and petitioned year after year, the latter takes the field with the same programme but with the knowledge of a very powerful weapon and with the determination to make use of it. This weapon is the pressure of a mass movement. What they want is not a revolutionary change but a readjustment of relations between the imperialist overlord and the Indian bourgeoisie. If need be the discontent of the masses will be exploited in order to force upon Imperialism the necessity of this readjustment. Hence, so much talk about the masses. Hence the determination of the liberal intellectuals to organize the workers and peasants!

What does this new tendency signify? It signifies that the workers and peasants are to be used in order to conquer concessions for the upper- and middle-classes. In other words, the workers and peasants should bear the brunt of the anti-British struggle, should go to jail, should shed their blood if perchance, it is necessary—for what? To forge the chain of their own bondage. Their reward will be the gilt on the chain. This is what bourgeois nationalism, which has been born out of the ruins of Non-cooperation really means. This is what has been foretold by us during the last twelve months. This is what calls for the organization of a revolutionary party of the masses totally independent of the bourgeoisie.

There are two reasons why a revolutionary mass party based upon the class interests of the workers and pauperized peasantry, should be immediately organized. First such a party is alone capable of leading the anti-imperialist struggle further, and second such a party must come into existence in order to prevent the fruits of national freedom conquered by the workers and peasants from being totally misappropriated by the bourgeoisie.

The inner contradictions of capitalist production today force Imperialism to mend its ways. Curiously enough, the latest phase of bourgeois nationalism in India sets out to end or mend the British domination. To end is but a threat to expedite the process of mending—the necessity of which is already recognized by Imperialism, not under the pressure of the nationalism of the colonial bourgeoisie, but before the threatening collapse of the world capitalist structure. So it is clear that the day may not be very remote when the ways of Imperialism will be mended. Indian capitalism will come into its own. And for what purpose? To what effect? To expropriate the poor peasantry, herd them into the great industrial centres and suck their life-blood with the help of the monster of the Machine. This will be done by the joint efforts of the foreign and native bourgeoisie—the brothers in spirit. This in broad outlines is the picture of national freedom which will be bestowed upon the Indian people if the working and peasant masses fail to assert themselves through their conscious vanguard—an organized class party—on the political situation.

A year ago today the *Vanguard* appeared on the political stage of India with the standard of this political party. We did not come too early nor were we too late. But our path has not been strewn with flowers. Various have been the obstacles that we have had to overcome. From the very beginning Imperialism recognized its mortal foe in the *Vanguard* which however was still looked upon with inertness and even with suspicion by many of those whose interests and sentiments it objectively reflected. We were not cordially welcomed by the upper class nationalists; the Non-cooperators could not relish our dispassionate criticism of their social philosophy and political impotency. This was not unexpected by us. Through such variegated circumstances, the *Vanguard* has marched boldly on with a firm conviction that the d[ay] will come when the historic necessity of the miss[ion] undertaken by us will be recognized by a considerab[le] section of the revolutionary elements in the moveme[nt].

If the life of the *Vanguard* has not been witho[ut] success in the national sphere it has been more so [in] the international sphere. Through its medium and th[at] of the Communist Party for the first time an orga[nic] and active relation has been established between t[he] struggling Indian people and the world proletariat [led] by the victorious workers and peasants of Russia. T[he] significance of this international relation may not y[et] be fully realised by our nationalists who vainly se[ek] the sympathy and support of the bourgeois world. [But] it will be the greatest asset for the Indian workers a[nd] peasants who today stand on the eve of a bitter a[nd] protracted political struggle. The telegram recei[ved] by us from the Presidium of the Communist Inte[r]national on the first anniversary of the *Vangua[rd]* [pro]ves that the Indian working class which ent[ers] the struggle under the rage of Imperialism and fro[m] of the national bourgeoisie has the backing and co[m]radeship of the organized Proletarian Army mi[ght]ily battering down the social system which ensla[ves] nations and makes machines out of men to swell t[he] pockets of a few.

The *Vanguard* enters the second year of its ex[ist]ence with something accomplished and with a grea[t] [illegible] the banner of the army which [is] destined [illegible] India an era of real freed[om] [illegible] to progress and prosperity [of] those who toil.

TELEGRAM

To the Editor, "VANGUARD".

The Executive Committee of the Communist International greets the first organ of Indian communist thought on the occasion of its first anniversary. The Communist International and its sections follow the activities of the Vanguard with the closest interest, and observe with pleasure its growing [illegible] among the Indian working class. [illegible] that the Vanguard will play a great part in the history of the Communist Movement in India. We wish further success to the herald of the Indian Social Revolution.

Long live Free India!
Long live the Communist Party of India!
Long live the Vanguard!

Presidium of the
Communist International

THE TRADE UNION CONGRES[S]

The long-postponed third annual session of the A[ll] India Trade Union Congress at last met. Those w[ho] expected a new leadership from this quarter ha[ve] been disappointed. The gathering at Lahore was [a] working-class affair only in name. The spirit t[hat] reigned there was one of pure nationalism [and] humanitarian idealism. Nationalist leaders repre[sent]ing practically all the classes of our society ex[cept] the working-class arrogated to themselves the rôle [of] labour delegates. Their monopoly was broken o[nly] by a few intelligent labourites who vehemently oppo[sed] any political action on the part of the trade unio[ns]. The gathering as a whole however acted from [the] beginning to the end as an adjunct to the Natio[nal] Congress actuated partly by the pious desire [to] "uplift" the downtrodden masses and partly by [the] anxiety to find ways and means of enlisting [the] services of the working-class for the cause of bourge[ois] nationalism whose triumph will signify the increa[sed] exploitation of the masses.

The following quotation from the *Nation* wh[ich] breathes the spirit of the All India Trade Un[ion] Congress, is a graphic picture of what the Lah[ore] gathering was and what could be expected of it. [On] March 27th the *Nation* writes: "A huge fleet of mot[or] cars drove up to the gate of the Bradlaugh Hall. Vociferous cheers greeted the arrival of the leade[rs]. The hall was gaily decorated with wreaths of flowe[rs]. Several parties of musicians were present who [sang] national songs until the arrival of the President el[ect]. As soon as the Deshbandhu's car drove up shouts [of] Bande Mataram and Deshbandhu Das ki jai w[ent] up from all quarters ...... Many other ladies a[nd] gentlemen were present ...... And so on and so [on] went the description of the gathering which [was] supposed to be composed of the representatives [of] Indian workers living on starvation wages or at le[ast] of sincere reformers moved by the misery of the p[oor]. To such an élite of intellect and opulence did [the] naive Deshbandhu preach his doctrine of Swaraj [for] the 98 per cent!"

The president, whose Utopianism seems to be [in] struggling against the pragmatic politics of [his] rationalist associates, could not but feel a bit un[easy] in the midst of this mockery and in his conclu[ding] speech observed: "One criticism that has been lev[elled] against us is that we have a Trade Union Congress [in] which there are not many workers." Let us hope [in a] few years "the delegates will be the labou[rers] themselves." A pious hope indeed. But do the pre[sent] self-appointed labourites permit us to share the h[ope] of Mr Das? If the Lahore gathering was unsoll[ied by] the shadow of a dirty cooly or rayat it is ne[...]

Read: **THE BOLSHEVIKS AND BOLSHEVISM** *by G. Zinovieff*

সালের ডিসেম্বর মাসের কানপুর কমিউনিস্ট কনফারেন্সকেই পার্টি প্রতিষ্ঠার সময় ব'লে গণ্য করেছেন।

শুরু হতেই "ভ্যানগার্ড" প্রভৃতি জার্মানীতে ছাপা হয়েছে। তবুও ভারতের নানা শহরের নাম তাতে ছাপা হতো। এই সঙ্গে মুদ্রিত ব্লকে বোম্বে, কলকাতা ও মাদ্রাজের নাম ছাপা হয়েছে। লাহোরের নাম তো ছাপা হতোই, যতটা মনে পড়ছে কানপুরের নামও কোনো না কোনো সময়ে ছাপা হয়ে থাকবে। এই সকল শহরের সহিত আমাদের অল্প-বিস্তর সংযোগ ছিল।

[তিন]

১৯২৬ সালের ২২শে নবেম্বর হতে ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মস্কোতে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের বিখ্যাত সপ্তম প্লেনামের অধিবেশন হয়েছিল। ১৯২৭ সালে এই প্লেনামের শর্টহ্যাণ্ড রিপোর্ট রুশ ভাষায় রাশিয়াতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তার রুশ ভাষায় নাম দেওয়া হয়েছে Puti mirovoi revoliutsii, অর্থাৎ বিশ্ববিপ্লব। বিশ্ববিপ্লবের প্রথম খণ্ডের অষ্টম পৃষ্ঠা হতে বিবরণ সংগ্রহ করে আমেরিকার স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট সি· নর্থ ও জেনিয়া জে· ইউদিন[১] তাঁদের সম্পাদিত M. N. Roy's MISSION TO CHINA : Communist Kuomintang Split of 1927 (এম· এন· রায়ের চীনের মিশন : কমিউনিস্ট কুওমিন্‌টাঙের মধ্যে ১৯২৭ সালের ভাঙাভাঙি) নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

"During the first Session of the Seventh Plenum, November 22, 1926, Roy as the representative of the Communist Party of India had been elected to the Presidium of the Comintern and to the Chinese Commission." P 43

"সপ্তম প্লেনামের প্রথম দিনের বৈঠকেই রায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ হতে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের প্রেসিডিয়ামের সভ্য ও চীন সম্পর্কিত কমিশনের সভ্য নির্বাচিত হলেন।" পৃষ্ঠা ৪৩

এখানে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় লিখিত হয়েছে যে রায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ হতেই কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের প্রেসিডিয়ামের ও চাইনীজ কমিশনের সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি। ভারতের ভিতর হতে ১৯২৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সংযুক্তকরণের জন্যে কোন দরখাস্ত কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের দফ্‌তরে পাঠানো হয়নি।

[চার]

১৯২৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে এম· এন· রায় কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের প্রেসিডিয়ামের তরফ হতে যে-দীর্ঘ পত্রখানা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এবং ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্টস্‌ পার্টির দুই বিভিন্ন সেন্‌ট্রাল কমিটিকে মস্কো হতে লিখেছিলেন এবং যে-পত্রখানা ভারতে 'এসেম্‌ব্লি লেটার' নামে খ্যাত

১ Robert C. North and Xenia J. Eudin

হয়েছিল, তাতে লেখা ছিল যে প্রত্যেক কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সহিত সংযুক্ত হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু ভারত হতে কমিউনিস্ট পার্টি কখনও কমিনটার্নের সহিত সংযুক্ত হওয়ার জন্যে আবেদন করেনি। কাজেই, "এতদিন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির সংযুক্তিকরণকে ভিত্তি করে কাজ চালিয়েছে"। "Up till now Communist International has acted upon the affiliation of the Emigrant Section of the Communist Party of India.")

এখন প্রমাণিত হয়ে গেল যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বর্তমান উজ্বেকিস্তান রিপাবলিকের রাজধানী তাশকন্দ নগরে স্থাপিত হয়েছিল।

অখণ্ডনীয়রূপে এও প্রমাণ হয়ে গেল যে ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সহিত সংযুক্ত হয়েছিল।

মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর "স্মৃতিকথা"য় লিখেছেন (৩০১ পৃষ্ঠা) "To challenge my representativeness was pointless. I did not claim to represent anybody but myself, and held my position in the International as an individual" অর্থাৎ "আমার প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে কথা তোলার কোনো মানে হয় না। নিজের ছাড়া অন্য কারুর প্রতিনিধিত্ব আমি দাবী করিনি এবং ইন্টারন্যাশনালের ভিতরে আমার পদাধিকার ব্যক্তি হিসাবেই।" উপরে যে-সব প্রমাণ আমি উপস্থিত করেছি, আর "এম. এন. রায়স্ মিশন টু চায়না" গ্রন্থ ও রায়ের পত্র হতে যে উদ্ধৃতি আমি তুলে দিয়েছি এই সব মিলিয়ে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে তাঁর দম্ভোক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি মেক্শিকোর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তারপরে বরাবর তিনি ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বিভিন্ন দেশের পার্টিসমূহের প্রতিনিধিরাই শুধু কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ভিতরে পদাধিকারী হতে পারতেন। সেভেন্থ্ প্লেনামের অধিবেশনে এম. এন. রায় যেমন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরূপেই ইন্টারন্যাশনালের এক্জেকিউটিবের প্রেসিডিয়ামের সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ঠিক সেই রকমই স্তালিন, বুখারিন ও ম্যানুইল্স্কিও (Manuilsky) সোবিয়েৎ ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ হতে প্রেসিডিয়ামের সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেদিন যদি লেনিন বেঁচে থাকতেন তাঁকেও ওই ভাবেই নির্বাচিত হতে হতো।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভ্য কারা?

আশা করি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনার পক্ষে আমি কতকগুলি কথা পরিষ্কার করতে পেরেছি। কিন্তু এই তথ্যগুলি খোলাসা হওয়ায় আমাদের কয়েকজনকে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভ্য বলা হয়, আমার মতে আমাদের সেই দাবীর তেমন কোনো জোর আর থাকছে না। তাশকন্দে ও মস্কোতে ১৯২০-২১ সালে যাঁরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাই পার্টির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। একথা আমরা কিছুতেই ভুলে যেতে পারি না যে ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল। প্রবাসী পার্টির কিছু সংখ্যক সভ্য অনেক দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে ভারতে এসে জেল খাটার পরেও পার্টির কাজ ছেড়ে

ПУТИ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

СЕДЬМОЙ РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

★

22 НОЯБРЯ — 16 ДЕКАБРЯ
1926

СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ТОМ I

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.—АНГЛИЙСКИЙ ВОПРОС.—ПУТИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.—ТРЕСТИФИКАЦИЯ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И НАШИ ЗАДАЧИ В ПРОФДВИЖЕНИИ

1 9 2 7
ОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ★ МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

বিশ্ব বিপ্লবের পথ

কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের কার্য-নির্বাহক কমিটির
সপ্তম বর্ধিত প্লেনাম

২২শে নবেম্বর হতে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৬
শর্টহ্যান্ডে লিখিত বিবরণী

প্রথম খণ্ড

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও প্রোলেতারিয়ান (সর্বহারা), বিপ্লব—ইংল্যান্ড সম্পর্কিত প্রশ্ন—চীন বিপ্লবের বিকাশের পথ—ট্রাস্টিকরণ, পুনর্বিন্যাস ও ট্রেড্‌ ইউনিয়ন আন্দোলনে আমাদের সমস্যা

১৯২৭
স্টেট পব্‌লিশিং হাউস * মস্কো—লেনিনগ্রাদ

Да здравствует Коммунистический Интернационал! Да здравствует наша истинная цель — мировая пролетарская революция! (Аплодисменты.)

Заслушав приветствия, пленум приступает к выборам президиума.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДИУМА

В президиум единогласно избираются следующие тт.:

Бухарин, Сталин и Мануильский (ВКП(б)), Тан-Пин-Сян (кит. компартия), Клара Цеткин (КПГ), Катаяма (КП Японии), Рой (КП Индии), Куусинен (КП Финляндии), Бернард (КП Франции), Маджи (КП Италии), Илек (КП Чехо-Словакии), Богуцкий (КП Польши), Бирч, Биттельман (КП Америки), Фуруботен (КП Норвегии), Ломинадзе (КИМ), Тельман, Ремеле (КП Германии), Галлахер (КП Англии), Коларов (КП Болгарии), Семаун (КП Индонезии) и Бошкович (КП Югославии).

Секретариат избран в следующем составе:

Эмбер-Дро, Мерфи, Эрколи, Геш ке, Кремэ, Шмераль, Пятницкий, Петров, Корнблюм, Неппер и Димитров.

Затем единогласно избираются: политическая комиссия, комиссия по профсоюзным вопросам, английская комиссия, китайская комиссия и комиссия по аграрному вопросу.

Об'является порядок дня работы пленума.

ПОРЯДОК ДНЯ ПЛЕНУМА

1. Международное положение и ближайшие задачи Коминтерна. (Докладчики тт. Бухарин и Куусинен.)
2. Вопросы ВКП (б). (Докладчик тов. Сталин.)
3. Уроки английской забастовки. (Докладчик тов. Мерфи.)
4. Китайский вопрос. (Докладчик тов. Тан-Пин-Сян.)
5. Работа коммунистов в профдвижении. (Намечено обсуждение вопросов в комиссии. Докладчики в комиссии тов. Лозовский и по одному представителю от чешской и французской делегации.)
6. Работа коммунистов в крестьянском движении. (Намечено обсуждение вопроса в комиссии. Докладчики в комиссии: представитель крестьянской комиссии и по одному представителю от итальянской, германской и китайской делегаций.)
7. Вопросы отдельных секций.

После утверждения порядка дня и регламента принимаются следующие воззвания:

К АНГЛИЙСКИМ ГОРНЯКАМ

VII расширенный пленум Коммунистического Интернационала, открывая свои работы, шлет горячий братский привет мужественным горнякам Англии и их семьям. Скоро исполнится 7 месяцев, как длится героическая борьба горняков. Семь долгих месяцев горняки вели борьбу не только против шахтовладель-

কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনাল দীর্ঘজীবী হো'ক!
আমাদের বাস্তব লক্ষ্য—বিশ্ব সর্বহারা
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হো'ক!! (করতালি)

সংবর্ধনা শেষে প্লেনাম সভাপতিমণ্ডলী (প্রেসিডিয়াম)
নির্বাচন আরম্ভ করেন।

প্রেসিডিয়াম নির্বাচন

সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডিয়ামে নিম্নলিখিত কমরেডগণ নির্বাচিত হলেন ঃ

বুখারিন, স্তালিন ও মানুইল্‌স্কি (সোভিয়েৎ ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক), তান্‌-ৎসিন-সিয়ান (চীনের কমিউনিস্ট পার্টি), ক্লারা ৎসেৎকিন (জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টি), কাতাইয়ামা (জাপানের কমিউনিস্ট পার্টি), রায় (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি), কুশিনেন (ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি), বেয়ারনার (ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি), মার্দাঝি (ইটালীর কমিউনিস্ট পার্টি), ইলেক (চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি), বগুৎস্কি (পোলাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি), বার্চ বিটেলম্যান (আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টি), ফুরুবোটেন (নরওয়ের কমিউনিস্ট পার্টি), লমি নাদ্‌জে (কে আই এম্‌), থেলমান, রেমেলে (জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টি), গ্যালাকার (গ্রেট্‌ ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি), কলারভ (বুলগারিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি), সিমাউন (ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি), বশ্‌কভিচ্‌ (যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি)।

নিম্নলিখিত সভ্যদের নিয়ে সেক্রেটারিয়েট গঠিত হলো ঃ

এম্বের-দ্রো, মর্ফি, এরকলি, গেশ্‌কে, ক্রেমে, শ্‌মেরাল, পিয়াৎনিস্‌কি, পেত্রভ, কন্‌ব্রুম, পেপের, দিমিত্রভ্‌।

* * * *

দেননি। তাঁরা আমাদের সঙ্গেই কাজ করেছেন। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরে ইচ্ছা করলেই আমরা আমাদের পার্টিকে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের সহিত সংযুক্ত পার্টি বলে ধরে নিতে পারতেম, কিন্তু সেদিন এ কথা আমাদের মনে আসেনি।

১৯২১ সালের শেষের দিকে কিছু কিছু নড়াচড়া আমরাও আরম্ভ করেছিলেম। ১৯২২ সালে তো আমরা যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠেছি, আর ১৯২৩ সালে আমাদের বন্দীজীবনও আরম্ভ হয়ে গেছে। সকলেই জানেন ভারতের বিপ্লবী কর্মীদের পক্ষে বন্দীজীবনের সম্মুখীন হওয়া ছিল একটা অবধারিত ব্যাপার। এ সব সত্ত্বেও আমরা কি দাবী করতে পারি যে আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভ্য? আমি কিন্তু এ দাবী করার পক্ষে মনে খুব জোর পাইনে। তবে, আমরা যে পার্টি গড়ে তোলার পথ পরিষ্কারক সে দাবী অবশ্য আমরা করতে পারি।

মুহম্মদ শফীকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আগেই আমি বলেছি যে মুহম্মদ শফীক ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার মানে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিরই প্রথম সেক্রেটারী হয়েছিলেন। কারণ, ১৯২০-২১ সালে ভারতের ভিতরে কোনো কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়নি। এটা খুবই স্বাভাবিক যে সকলেই জানতে চাইবেন এই মুহম্মদ শফীক কে? তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছুও যদি আমি এখানে বলি তবে আমায় পুলিসের গোপন রিপোর্টের ও আদালতের নথিপথের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। শফীকের সঙ্গে কখনও আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। কাজেই, আমার বিবরণ মূলতঃ আমি পুলিসের রিপোর্ট ও আদালতের কাগজ-পত্র হতেই সংগ্রহ করেছি।

মুহম্মদ শফীক পেশোয়ার জিলার নৌশহরা তহ্‌সীলের অন্তর্গত আকোরার বাশিন্দা। ১৯১৯ সালে তিনি পেশোয়ারের ইরিগেশন অফিসে ক্লার্কের কাজ করতেন। ১৯২৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে পেশোয়ারের দায়রা জজ মিস্টার জর্জ কনোর (Mr. George Connor) শফীকের বিরুদ্ধে চালিত মোকদ্দমার যে রায় শুনিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছেন, ১৯১৯ সালের মে মাসে ভারতের রাওলাট এক্ট বিরোধী আন্দোলনের সময়ে শফীক তাঁর চাকরীস্থলে কোনো খবর না দিয়েই কাবুলে চলে যান। ১৯১৯ সালের এই মে মাসেই আবার আফগানিস্তান ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছিল। এই যুদ্ধের (তৃতীয় আফগান যুদ্ধের) ফলেই আফগানিস্তান পরিপূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। কাবুলে তিনি নিশ্চয়ই একজন মুহাজির (আত্মনির্বাসিত ব্যক্তি) ছিলেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তিনি ১৯২০ সালের মুহাজির ছিলেন না। তাঁর যাওয়ার সময়ে ভারতে হিজ্‌রৎ (নির্বাসন) আন্দোলন শুরুই হয়নি। ১৯২০ সালের হিজ্‌রৎ আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলন হতে উদ্ভূত হয়েছিল, শুধু মুসলমানরাই এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, আর রাওলাট এক্ট বিরোধী আন্দোলন ছিল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই রাজনীতিক আন্দোলন। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে যে হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছিল তারও কারণ উদ্ভূত হয়েছিল রাওলাট এক্ট বিরোধী আন্দোলন হতেই। ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেন্‌ট নির্মমভাবে এই আন্দোলনকে দমন করতে চেয়েছিল।

দায়রা জজ তাঁর রায়ে বলেছেন, "শফীক কাবুলে যাওয়া মাত্রই বোঝা গেল যে কেন তিনি সেখানে গেছেন, কেননা কাবুলে যে বলশেভিক চরেরা ছিলেন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সঙ্গে তাঁদের সংযোগ স্থাপিত হয়ে গেল" ("His intention in going there [Kabul] was soon made apparent for he at once got into touch with Bolshevik agents who were then at Kabul"). জজের কথা যদি সত্য হয় তবে হয় তো শফীক কাবুলে যাওয়ার আগেই বল্‌শেভিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন।

গিরেফ্‌তার হওয়ার পরে শফীক পেশোয়ারের এডিশন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট খান মুহম্মদ খানের নিকটে ১৯২৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। টর নিকটে এইরূপ বিবৃতি দেওয়া খুবই পরিচায়ক। কিন্তু শফীক তা দিয়েছিলেন। এ জাতীয় বিবৃতিতে কেউ পুরোপুরি সত্য কথা বলেন না, অনেক কথা আবার বানিয়েও বলেন। বিবৃত কথাগুলির ভিতর হতে আসল কথাগুলিকে চেষ্টা করে বুঝে নিতে হয়। শফীক বলেছেন, কাবুলেই তাঁর সঙ্গে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, আবদুর রব ও আচার্যের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁরা সবে রাশিয়া হতে ফিরেছিলেন। কাবুলে তখন যে সকল মুহাজির ছিলেন তাঁদের লক্ষ্য করে আবদুর রব কিংবা আবদুর রব ও আচার্য বললেন যে রুশ সরকার ভারতীয় মুহাজিরদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং তাঁদের সাহায্যও করেন। শোনা মাত্রই শফীক মজার-ই শরীফের পথে রুশ দেশে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে চলেছিলেন আহ্‌মদ হাস্‌সান, কোহাটের আবদুল মজীদ ও মুহম্মদ সাদিক। আহ্‌মদ হাস্‌সান সম্ভবত মুহম্মদ আলী ওর্ফে খুশী মুহম্মদ। শফীকের বিবৃতি হতে এটা বোঝা যায় যে কাবুলে ভারতীয় মুহাজিরদের ভিতরে দলাদলি ছিল। শফীক নিজে ছিলেন মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্‌ সিন্ধীর দলে। তিনি যখন রুশে রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন তিনি দেখে গিয়েছিলেন যে মৌলবী আবদুর রব অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে মাওলানা ওবায়দুল্লার সঙ্গে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। আবদুর রবের পরেকার কাজকর্ম হতেও বোঝা গেছে যে দলাদলিপ্রিয় ঝগড়াটে ব্যক্তিই ছিলেন তিনি। শফীকেরা নিরাপদে তাশকন্দে পৌঁছেছিলেন। মনে হয় ১৯১৯ সালের শেষাশেষিতে কোনো এক সময়ে তিনি তাশকন্দে পৌঁছেছিলেন। সেখানে কাজ না করে তো শুধু শুধু বসে থাকা যায় না। তাই তাঁরা "জমীনদার" নাম দিয়ে উর্দু ও পার্সী ভাষায় একখানি কাগজ বা'র করলেন। (পাঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে "জমীনদার" মানে কৃষক।) এই কাগজের এক সংখ্যাই শুধু বা'র হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে বিবৃতি দেওয়ার সময়ে শফীক হয় তো ভেবেছিলেন যে "জমীনদারে"র ওই একটি মাত্র সংখ্যা নিশ্চয় ভারতে পৌঁছয়নি। তাই তিনি বলেছিলেন যে ইস্‌লামীয় ভিত্তির উপরেই "জমীনদার" বা'র করা হয়েছিল। কিন্তু কাগজখানি শফীকের মোকদ্দমায় শুধু আদালতের এক্‌জিবিট ছিল না, এক্‌জিবিট নম্বর দুই ছিল। জজ তাঁর রায়ে এই কাগজ হতে বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে ইসলামীয় ভিত্তির কোনো পরিচয় নেই। শফীক সম্ভবত নিজের অপরাধ কমাবার জন্যে এই ইস্‌লামীয় ভিত্তির কথা ব'লে থাকবেন। শফীকের তাশকন্দে আসার কয়েক মাস পরে, (শফীক তিন মাস বলেছেন, কিন্তু সেটা হিসাবে মিলছে না) আবদুর রব ও প্রতিবাদী আচার্য ত্রিশজন মুহাজিরকে সঙ্গে নিয়ে তাশকন্দে আসেন। তখন ১৯২০ সালের সাধারণ হিজ্‌রৎ আন্দোলন ভারতে শুরু হয়ে গিয়েছিল।

কিছু দিন পরে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯২০

সালের ১৯শে জুলাই হতে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত) যোগ দেওয়ার জন্যে নিমন্ত্রণ আসে। অপরাধের ভার লাঘব হবে ভেবে শফীক বলেছেন যে সোবিয়েৎ গবর্ন-মেন্টের তরফ হতে তাঁদের মস্কো যাওয়ার জন্যে হুকুম জারী হয়। তাশকন্দেও দলাদলি শুরু হয়ে গিয়েছিল। শফীক বলেছেন, "আবদুর রবের বিপ্লবী সমিতির তরফ হতে এই উপলক্ষে মস্কো গেলেন আচার্য, আর আমাদের গ্রুপের তরফ হতে গেলাম আমি"। এই "আমাদের গ্রুপ" কথার অর্থ বোধ হয় আবদুর রবের বিরুদ্ধপক্ষ। মস্কোতে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জির সঙ্গে শফীকের প্রথম পরিচয় হয়। কংগ্রেসে রায়, মুখার্জি ও আচার্য ছিলেন প্রতিনিধি, আর শফীক পেয়েছিলেন একখানি দর্শকের টিকেট। দর্শকের টিকেটের কথাটা শফীক নিজের অপরাধ লাঘব করার জন্যে বলেছিলেন, না, সত্য সত্যই তিনি দর্শক হয়েছিলেন তা আমার পক্ষে বলা শক্ত। তবে, শুধু রায়েরই আলোচনায় যোগ দেওয়া ও ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল। অন্য ভারতীয় প্রতিনিধিরা কেবল আলোচনায় যোগ দিতে পারতেন।

একটি কথা আমার নিকটে বড়ই আশ্চর্য ঠেকছে। মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর স্মৃতিকথায় প্রতিবাদী আচার্য ও শফীকের কথা গোপন ক'রে গেলেন কেন? কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রতিবাদী আচার্য ও মুহম্মদ শফীকও যে যোগ দিয়েছিলেন একথা রায় কি করে ভুলে যেতে পারেন? বৈপ্লবিক জীবনে এমন একটি যোগাযোগের ব্যাপারে কেউ কখনও ভুলে যেতে পারেন ব'লে আমার বিশ্বাস নেই। রায় লিখেছেন, এটাকে অদ্ভুত ঘটনাই বলতে হবে যে কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি ছিলেন মেকশিকোর প্রতিনিধি, আর অবনী মুখার্জি ছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধি, যদিও মুখার্জির ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না। এখানে প্রতিবাদী আচার্য ও শফীকের নাম একান্তভাবে উল্লেখ্য ছিল। রায় তা করেননি।

মস্কোতে "প্রাচ্য শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে" যে সকল ভারতীয় মুহাজির যুবক ভর্তি হয়েছিলেন তাঁদের দেশে ফেরৎ পাঠানোর কথা যখন ওঠে তখন প্রথমে নানাভাবে পাসপোর্জ সংগ্রহের চেষ্টা চলে। এই চেষ্টায় যাঁরা সফল হলেন না তাঁরা দুর্গম-দুর্লঙ্ঘ্য পামির ও হিন্দুকুশ অতিক্রম ক'রে ভারতে পৌঁছেছিলেন। পেশোয়ারের **মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার** কাগজপত্র হতে জানা যায় যে এই ব্যাপারে মুহম্মদ শফীক বড় ভাগ্যবান ছিলেন। (আমরা এতদিন যে মোকদ্দমাকে **পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা** [১৯২২-২৩] বলে এসেছি এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে সেই মোকদ্দমারই রেকর্ডে তাকে মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা বলা হয়েছে।) শফীকের জন্যে ভুয়ো ব্রিটিশ পাসপোর্ট সংগৃহীত হয়েছিল। সেই পাসপোর্টের সাহায্যে তিনি হল্যান্ডের কোনো একটি পোর্ট হতে সমুদ্র পথে ভারতে এসেছিলেন। মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার রাজসাক্ষী ফিদা আলী জাহিদ বলছে, সে তার মিলিটারি স্কুলের রুশ শিক্ষকের কাছে শুনেছে যে শফীক ইউরোপ হতে লাহোরে গিয়েছিল। কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে কাবুল চলে গেছেন। আবদুল কাদির সেহরাই (খান) বলছেন, শফীক গোপনে কয়েকবার ভারত যাতায়াত করেছেন। আরও একটি মন্তব্য আছে যে ১৯২১ সালের নবেম্বর মাসে ভুয়ো ব্রিটিশ পাসপোর্টের সাহায্যে হল্যান্ডের একটি পোর্ট হতে সমুদ্রপথে শফীক ভারতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে কাবুলে চলে যান। মনে হয় এই খবরটাই সঠিক। ১৯২২ সালের আগস্ট মাসের ২৯শে তারিখে কাবুল হতে এম. এন. রায়কে লেখা এক পত্রে "এস্" ("S")

নামক এক ব্যক্তির নামোল্লেখ আছে। এই "এস্" সম্ভবত শফীক। পত্রে লেখা হয়েছে, "এস্" পত্রলেখককে এ· জি·'র (আফগান গবর্নমেণ্টের) হাতে সঁপে দিতে চাইছে। এই পত্রলেখক কি মুহম্মদ আলী ছিলেন? সব কথা সত্য হলে বলতে হবে যে শফীকের পতন ঘটেছিল।

পরের খবর এই যে ১৯২২ সালের শেষাশেষিতে আফগান গবর্নমেণ্ট যখন ভারতীয় বিপ্লবীদের আফ্গানিস্তান ছেড়ে চলে যেতে বললেন তখন শফীককেও আফ্গানিস্তান ছাড়তে হলো। অন্য অনেকে মস্কো চলে গেলেন, কিন্তু শফীকের মস্কো ফেরার মুখ আর ছিল না। তিনি সীস্তানে গিয়ে ব্রিটিশ কন্সালের নিকটে এই আবেদন জানিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন যে তাঁকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। বুঝতে পারছিনে শফীক কেন সীস্তানে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। আজকার সীস্তান একটা বড় প্রদেশ নয়। তার তিন ভাগের দু' ভাগ আবার আফ্গানিস্তানে, আর বাকী এক ভাগ ইরানে। যাই হোক, ভারতীয় সীমান্তে পেঁৗছানো মাত্রই শফীককে গিরেফ্তার করা হলো। পেশোয়ারে তাঁর বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে আর একটি কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হলো। ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসের ৪ঠা তারিখে পেশোয়ারের দায়রা জজ মিস্টার জর্জ কনোর (George Connor) শফীককে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

শওকত উস্মানীর সংস্রবে মুহম্মদ শফীকের কথা আমাকে আরও একবার বলতে হবে।

শ্রমজীবী প্রাচ্যের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি নাম স্তালিন বিশ্ববিদ্যালয়।

"As the Commissar of Nationalities and recognised authority on the problems of revolution in the Eastern Countries, Stalin, was to be something like the Chancellor of the projected University, which was actually named after him" অর্থাৎ, "জাতিসত্তাসমূহের কমিসার এবং প্রাচ্য দেশগুলির বৈপ্লবিক সমস্যাসমূহের সর্বস্বীকৃত বিশেষজ্ঞরূপে স্তালিন পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালযের চান্সেলার বা এমন কিছু একটা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কার্যত তাঁর নামেই বিশ্ববিদ্যালয়টির নামকরণ হলো।"

(M.N. Roy's Memoirs, Page 536)

লেনিন ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে জীবিত ও কর্মক্ষম ছিলেন। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে এই সময়েই "শ্রমজীবী প্রাচ্যের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে"র নামের সঙ্গে স্তালিনের নামও জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। আরও বিশেষভাবে দেখা প্রয়োজন যে ওই সময়ে স্তালিন সোবিয়েৎ ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির জেনেরেল সেক্রেটারিও নির্বাচিত হননি। এই কথাগুলি আমি এই কারণে বলছি যে ক্রুশ্চেব যখন সোবিয়েৎ ইউনিয়নে হঠাৎ ক্ষমতায় আসীন হলেন তখন স্তালিনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারের ঝড় বইতে লাগল। তাতে বেসামাল হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দু' একজন নেতৃস্থানীয় সভ্য বলে উঠলেন,—"তাইতো! এখন তো দেখতে পাচ্ছি, লেনিন স্তালিনকে বিশ্বাসই করতেন না।" অথচ, তখনকার সোবিয়েৎ দেশের ইতিহাসে স্তালিনের দৃঢ় স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। বহু দলীল-পত্রে দেখতে পাওয়া যায় স্তালিনের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে প্রাচ্য সম্বন্ধে লেনিন কিছুই করতেন না। "শ্রমজীবী প্রাচ্যের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে"র নামকরণ যে স্তালিনের নামে করা হয়েছিল এটা তারই প্রমাণ।

শ্রমজীবী প্রাচ্যের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান সোবিয়েৎ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রাচ্যের ছাত্ররা তো কমিউনিজমের অ-আ-ক-খ শিখেছেনই, সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বাইরের অনেক দেশের ছাত্ররাও সেখানে কমিউনিজম শিখেছেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতাদের ভিতরেও অনেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কিন্তু তাঁদের নাম আমি এখানে সঠিকভাবে লিখতে পারব না। "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় প্রকাশিত এম. এন. রায়ের একটি লেখায় আমি পড়েছি যে "ডেমক্রাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনাম"-এর প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিনও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

পেশোয়ারে ফিরে আসার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্ররা তাঁদের প্রিন্সিপালের নাম বলেছেন বরিদা। কিন্তু বরিদা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ছিলেন, না, ডিরেক্টর তা বোঝা মুশকিল। আমরা ডিরেক্টর পদের নাম পেয়েছি, প্রিন্সিপাল পদের নাম কোথাও পাইনি।

রাশিয়ার "প্রাচ্য কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়" ("Russia's University of Oriental Communism") শীর্ষক এ. সি. ফ্রিম্যান (A. C. Freeman) লিখিত একটি প্রবন্ধ ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসের "সোবিয়েৎ রাশিয়া পিকটোরিয়াল" (Soviet Russia Pictorial) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এটা "ফ্রেন্ড্স্ অফ সোবিয়েৎ রাশিয়া" সমিতির মাসিক মুখপত্র। ২০১, ওয়েস্ট থার্টিন্থ স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক হতে সম্পাদিত হতো। ফ্রিম্যান লিখেছেন ঃ

"শ্রমজীবী প্রাচ্যের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়" ("Communist University of the Toiling East.") একটি বৃহৎ সাদা বাড়ীর প্রবেশ পথে (entrance) এই লেখাটি বড় বড় হরফে লেখা হয়েছে। স্থানটি মস্কোর পুশকিন মনুমেণ্টের সন্নিকটে। নয়ন তৃপ্তিকর পোশাক পরিহিত লোকেরা এই বাড়ীর ভিতরে ঢুকছিলেন ও বাড়ী হতে বার হচ্ছিলেন। উঁচু কালো পশমী হ্যাট পরিহিত তুর্কমেনরা তাঁদের ভিতরে ছিলেন, কারুকার্য খচিত টুপি পরা বুখারার দর্জিরা, ভোল্গা আর ক্রিমিয়ার বাদামচোখো তাতারেরাও ছিলেন, ছিলেন ককেসাসের পার্বত্য মুসলমানেরা, আরও ছিলেন ভারত, চীন, জাপান ও কোরিয়ার রাজনীতিক আশ্রিতরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হতে অনেকে ভাবতে পারেন যে মূলতঃ সমগ্র এশিয়ায় বৈপ্লবিক অসন্তোষ ছড়ানোই তার কাজ। তা কিন্তু নয়। বৈপ্লবিক অসন্তোষ ছড়ানো নিশ্চয় তার কাজের একটি দিক হলেও,—চীন, জাপান, ভারত, পারস্য ও তুর্কির মতো দেশগুলির বিদেশী ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সুপারিশেই ভর্তি করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই আশা পোষণ করা হয়েছে যে এই ছাত্ররা তাঁদের আপন আপন দেশে ফিরে যাবেন এবং কমিউনিস্ট ভাবধারার বিজয়ের জন্যে কাজ করতে থাকবেন।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি-হওয়া ছাত্রদের ভিতরে বিদেশী ছাত্রদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। যে-সকল প্রাচ্য ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের ভিড়ে যোগ দেন এবং তাঁদের শয়নাগারের জন্য যে সব বাড়ী নেওয়া হয়েছে সেই সব বাড়ীতে বাস করেন, তাঁদের খুব বেশীর ভাগই হচ্ছেন সোবিয়েৎ রিপাবলিকগুলির বিশাল ফেডারেশনের পূর্ব ও দক্ষিণ প্রদেশসমূহের বাশিন্দা। সোবিয়েৎ গবর্নমেণ্ট যে এই বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছেন তার প্রধান উদ্দেশ্য পেশাদার বিপ্লবী সৃষ্টি করা নয়, পশ্চাদপদ ও আদিম ধ্যান-ধারণাযুক্ত রিপাবলিকগুলির জন্যে এর ভিতর দিয়ে গবর্নমেণ্ট অনেক সব রাজনীতিক ও অর্থনীতিক নেতা গড়ে তুলতে চাইছেন। খুব বেশীর ভাগ ছাত্র মুস্লিম দেশসমূহ হতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্যান-ইস্লামিজম (মুস্লিম বিশ্বভ্রাত্রীয়তা) কিংবা অন্য কোনো ধার্মিক বা জাতীয়তাবাদী প্রবণতা বাড়াবার চেষ্টা হয় না। কেন না, জাতিগত (racial) ও ধার্মিক উৎকটতার ভিতর দিয়ে ইউরোপ ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ ইলাকাগুলিতে ছড়ানো মুস্লিম ট্রাইবগুলিকে একত্র করলে তা থেকে রুশরাই দুঃখ পাবেন অনেক বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার চরিত্র যেন আন্তর্জাতিক হয় তার ওপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডিরেক্টর বিশেষভাবে জোর দিতে থাকেন।

এই ডিরেক্টর বললেন, "আমরা মনে করি, জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তির প্রদর্শন আমাদের ছাত্রদের পক্ষে মারাত্মক ধরনের অনুপযুক্ততার পরিচায়ক। অবশ্য সোবিয়েৎ রাশিয়ার সীমানার বাইরে থেকে যে ছাত্ররা আসেন তাঁদের আমরা শিক্ষা দিই যে তাঁদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয় সংগ্রাম করতে হবে—সে সাম্রাজ্যবাদ দেশের

ভিতরের বা বাইরের যাই হোক না কেন। কিন্তু, এই সংগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের নামে লড়তে হবে। এই বিশ্বাস নিয়ে লড়তে হবে যে প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে, তবে জাতিগত (racial) আবেদন আর ধর্মীয় কুসংস্কার ও উন্মাদনার ভিতর দিয়ে নয়"।

ডিরেক্টরকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "পঠন-পাঠনের কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?"

তিনি বললেন "প্রবেশিকা ও গ্রেজুয়েট স্তরের পাঠ্য বিষয় স্থির করার সময়ে আমাদের খুবই নমনীয় হতে হয়েছে। আমার সন্দেহ আছে যে দুনিয়ার অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের পূর্ব শিক্ষার স্তরে এত বিভেদ আছে কিনা। আমাদের এখানে প্রায়ই ককেসাস কিংবা ক্রিমিয়ার গ্রাম হতে মুসলিম কৃষকেরা আসেন। তাঁরা জীবনে না দেখেছেন কোনো কারখানা, না দেখেছেন কোনো বৃহৎ নগর। কোনো রকমে তাঁরা পড়তে ও লিখতে পারেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের এতটুকুও ধারণা নেই। এর সংগে সংগে চীন ভারত ও জাপান হতে আসা আমাদের এমন রাজনীতিক আশ্রয় প্রার্থীরাও (refugees) আছেন যাঁরা অক্সফোর্ড ও হাইডেলবের্গের ডিগ্রী ধারণ করেন। ছাত্রদের নানা স্তরের মানসিক প্রস্তুতির প্রতি নজর রেখে আমাদের নানা রকম পাঠ্যক্রম স্থির করতে হয়েছে। রাশিয়ার ইউরোপীয় ও এশীয় অংশসমূহের আদিম ও পশ্চাৎপদ ইলাকাগুলি হতে যে-সকল ছাত্র এসেছেন তাঁদের আমরা ইতিহাস বিজ্ঞান ও সাহিত্যে ভালো সাধারণ শিক্ষা দেওয়া চেষ্টা করি এবং তার সংগে সংগে মার্কসীয় সোশ্যালিজমের মূল নীতিগুলিরও শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের শিক্ষকেরা অনেক স্থানীয় বুলিতে কথা বলতে পারেন। তার উপরে, ছাত্ররা খুব তাড়াতাড়ি রুশ ভাষাও শিক্ষা ক'রে নেন।"

"বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য কি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ডিরেক্টর উত্তর দিলেন, "সোবিয়েৎ রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলি প্রাচ্য জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। আমাদের উদ্দেশ্য দু'রকমে তার পথ খুঁজে পায়। আমরা সাম্রাজ্যবাদী নয়। কিপলিং অর্থে শ্বেত জাতির বোঝার কথা আমরা বলি না। এই কারণে সোবিয়েৎ রিপাবলিকের ভিতরকার প্রাচ্য জনসাধারণকে শাসন করার জন্যে আমরা রুশীয়দের শিক্ষা দিই না। আমরা বিশ্বাস করি যে এই সকল লোক নিজেরা নিজেদের শাসন করবেন। এই জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্যে আমরা তাঁদের যুবকদের উৎসাহ দিয়ে থাকি। এখানে এসে তাঁরা নিজেদের আপন আপন সম্প্রদায়ের (Communities) নেতৃত্বে বরিত হওয়ার উপযুক্ত ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক শিক্ষা দু-ই লাভ করেন। আমাদের ছাত্র সংগ্রহের ইলাকাগুলি ক্রিমিয়া, ককেসাস, তুর্কিস্তান, বুখারা, ভোল্গার তীরবর্তী তাতার রিপাবলিক সর্বদাই সংস্কৃতিগতভাবে পশ্চাৎপদ থেকেছে; অল্প সংখ্যক শিক্ষিত লোকও এসব ইলাকার সংস্কৃতিকে উচ্চতর স্তরে পরিণত করার জন্যে খামিরের কাজ করতে পারেন।

"আমরা নিজেরা যখন সাম্রাজ্যবাদী নয়, স্বভাবতঃই আমরা চাইতে পারি না যে অন্য কোনো দেশেও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা হোক। বিদেশী প্রাচ্য ছাত্ররা যাঁরা আমাদের বিদ্যালয়ে আসেন, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম করতে শেখানো হয়,—তা সেই প্রতিক্রিয়া বিদেশী নিষ্ঠুর শাসন কিংবা দেশীয় স্থিতিশীলতা যাই হোক না কেন।"

আমাকে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতে দেওয়া হয়েছিল। আমি যেমন ক্লাস-রুমগুলি দেখেছি, তেমনই দেখেছি ছাত্রদের শয়নাগারগুলিও। সর্বত্র একই

বৈষম্য—একদিকে উৎসাহী বুদ্ধিজীবী, উচ্চাশা, অন্যদিকে সাজসরঞ্জামের অল্পতা—যা প্রায়ই আজকের রাশিয়াতে পরিলক্ষিত হয়। ক্লাস-রুমগুলি সরঞ্জামশূন্য, আবার সেগুলিতে ভিড়ের বাড়াবাড়ি। ফিজিক্স্ ও কেমিস্ট্রী শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে যন্ত্রপাতি করুণভাবে কম। কিন্তু মনে হলো যে ছাত্ররা, যাঁদের ভিতরে এশিয়ার প্রায় সব দেশেরই প্রতিনিধিরা রয়েছেন, সকল অসুবিধা সত্ত্বেও শেখার জন্যে আগ্রহশীল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভিতরে মেয়েদের সংখ্যা দেখে আমি সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হয়েছি। তাঁরা তাঁদের প্রাচ্যের অভ্যাস ও চিন্তাই শুধু ছাড়েননি, খুলেছেন তাঁদের অবগুণ্ঠনও।

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান শিখিয়ে এবং মার্কসীয় রাজনীতিক ও অর্থনীতিক থিয়োরীতে পারদর্শী ক'রে হাজার হাজার ছাত্রকে আদিম পিতৃপ্রধান জাতিগুলির যাঁদের জীবন প্রধানতঃ কুর্আনের অনুশাসনে শাসিত, মধ্যে ছেড়ে দিলে তার পরিণাম কি দাঁড়াবে? এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন, কিন্তু যে-পরীক্ষা চলেছে তার ভিতরে অনেক সব চিত্তাকর্ষক সম্ভাবনাও লুকিয়ে রয়েছে। যদি সব কিছু বিফল না হয়ে যায়, তবে শ্রমজীবী প্রাচ্যের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্তকারী ছাত্ররা (গ্রেজুয়েটেরা) এশিয়াটিক রাশিয়ার, ককেসাসের, নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের প্রতিবেশী দেশসমূহের ভবিষ্যৎ রাজনীতিক জীবনে যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবেন তার সম্ভাবনা আছে।

(Soviet Russia Pictorial : New York, April, 1923)

এ· সি· ফ্রিম্যানের প্রবন্ধটি আমি এখানে এই কারণে তুলে দিলাম যে তা থেকে সকলে "শ্রমজীবী প্রাচ্যের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়" সম্বন্ধে মনে একটা ধারণা করে নিতে পারবেন। ফ্রিম্যানের পরিচয় আমরা জানিনে। তবে, তিনি আমেরিকান। সোবিয়েৎ সুহৃদ সমিতির আন্দোলনের সঙ্গে যে তিনি যুক্ত ছিলেন তা বোঝা যায়। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন কিনা তা বোঝা মুশকিল। খুব সম্ভবত ছিলেন না।

এম· এন· রায়ের ভুল বিবৃতির সংশোধন

বিদেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কথা শেষ করার সময়ে এখানে তেমন প্রাসঙ্গিক না হলেও আমি একটি কথা পরিষ্কার করে দিতে চাই। একথা আমি আগেও বলেছি। তবুও আরও একবার বলে দিচ্ছি। রায় তাঁর স্মৃতিকথার ৪৬৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন তাঁর তাশকন্দে যাওয়ার অনেক পরে আবদুর রব ও আচার্য কাবুল হতে তাশকন্দে এসেছিলেন। ৪৬৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন মুহম্মদ শফীক আচার্যদের সঙ্গে কাবুল হতে তাশকন্দ এসেছিলেন। এই বিবরণ ভুল। আবদুর রব ও আচার্য রাশিয়া হতে কাবুলে ফিরে গিয়েছিলেন। আবার কাবুল হতে তাঁরা তাশকন্দ ফিরেছিলেন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে। শফীক আরও কয়েকমাস আগে তাশকন্দে এসেছিলেন। তাশকন্দ হতেই প্রতিবাদী আচার্য ও শফীক কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগদান করার জন্যে মস্কো গিয়েছিলেন। তাঁদের দু'জনই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। এম· এন· রায় নিজেই লিখেছেন যে কংগ্রেস শেষ হওয়ার বেশ কয়েকদিন পরে স্পেশাল ট্রেন যোগে সদলে তাঁরা তাশকন্দের পথে যাত্রা করেছিলেন। তাঁর একই ট্রেনে আচার্য আর শফীকও তাশকন্দ গিয়েছিলেন।

দেশের ভিতরে

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশকে আমার জীবনে কি কি ঘটেছে সে-সব কথা শুরুতেই আমি খুব সংক্ষেপে বলেছি। তখনকার দিনের রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধেও সামান্য কিছু বলার চেষ্টা আমি করেছি। তার পরে বিদেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম স্থাপনা ও কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের সহিত বিদেশে স্থাপিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সংযুক্ত হওয়া ইত্যাদিকে উপলক্ষ্য করে আমি অনেক কিছু বলেছি। এই উপলক্ষ্যে আরও অনেক কথা আমায় পরে বলতে হবে। এখন আমি বলার চেষ্টা করব দেশের ভিতরে কি কি ঘটেছিল।

আগেই আমি বলেছি যে ১৯২০ সাল আসতেই আমি স্থির করে ফেলেছিলেম, আমার জীবনের পেশা হবে রাজনীতি, সাহিত্যচর্চা নয়। ঊনপঞ্চাশতম বেঙ্গলী ব্যাটালিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে ১৯২০ সালের মার্চ মাসে কাজী নজরুল ইস্‌লাম পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে কলকাতায় আমার সঙ্গে থাকতে আসে। ফৌজে সে কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার ছিল। কথা হয়েছিল যে নজরুল ইস্‌লাম কলকাতায় কাব্য ও সাহিত্যচর্চা করবে এবং রাজনীতিতেও যোগ দিবে। তখন তার বয়স একুশ-বাইশ বছর মাত্র। কলকাতা আসার অল্প কয়েক মাসের ভিতরেই নজরুল ইস্‌লাম কবিপ্রসিদ্ধি লাভ করে।

সান্ধ্য দৈনিক "নবযুগ"

তিন-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে নজরুল আর আমি একখানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা বা'র করেছিলেম। কাগজের নাম ছিল "নবযুগ"। লম্বায় ২৬ ইঞ্চি ও চৌড়ায় ২০ ইঞ্চি মাপের এক শীট কাগজ ছিল "নবযুগ"। ১৯২০ সালের ১২ই জুলাই তারিখে কাগজখানা প্রথম বা'র হয়েছিল। কাগজের প্রকৃত মালিক ছিলেন মিস্টার এ. কে. ফজলুল হক, কলকাতা হাইকোর্টের উকীল, এখন আমরা এড-ভোকেট বলি। কাগজে আমাদের লেখার স্বাধীনতা ছিল। তাতে গরম গরম লেখা ছাপা হতো আর জনগণের, বিশেষ ক'রে মজুরদের কথাও তাতে লেখা হতো। কাগজখানি কয়েক মাস মাত্র চলেছিল। "নবযুগ" বন্ধ হয়ে যাওয়ার কয়েক মাস পরে আমরা (আমরা মানে কুতুবুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব, নজরুল ইস্‌লাম ও আমি) অন্য একটি প্রচেষ্টায় লিপ্ত হই। স্থির করি যে একটি জয়েণ্ট স্টক কোম্পানী রেজিস্ট্রী ক'রে তার টাকায় একখানি বাঙলা দৈনিক বা'র করব। এই প্রচেষ্টায় আমরা বিফল হয়েছিলেম।[১]

১ এই সম্বন্ধে আমার "কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ঃ স্মৃতিকথা" (ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-১২ কর্তৃক প্রকাশিত) নামক পুস্তকে সবিস্তারে লিখেছি। এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করলাম না।

দেশের ভিতরে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম প্রচেষ্টা

আগে পরে চার জায়গায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। উদ্যোক্তারা একত্র মিলিত হয়ে আলোচনা ক'রে যে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা নয়, প্রত্যেক জায়গায় পৃথক পৃথক ভাবে প্রথম উদ্যোক্তারা কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁদের একজনের সঙ্গে আর একজনের পরিচয়ও ছিল না। ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। প্রথম চারটি জায়গার—কলকাতা, বোম্বে, লাহোর ও মাদ্রাজের, এক জায়গা হতে অন্য জায়গার দূরত্ব এক হাজার মাইলেরও অনেক বেশী। এত দূরে দূরে থেকেও আমরা সারা ভারতের পার্টি গড়ার কাজে নেমেছিলেম। কারণ, কমিউনিস্ট আন্দোলন আন্তর্জাতিক। আমাদের সকলের মধ্যবিন্দু ছিল কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল। তার কেন্দ্র (হেড্ কোয়ার্টার্স) ছিল বহু হাজার মাইল দূরে, মস্কোতে। এই চারটি জায়গার প্রত্যেকটির সঙ্গে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের স্বাধীনভাবে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালই কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের একজনের সঙ্গে অপরের (যেমন ডাঙ্গের সঙ্গে আমার) পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন।

আমাদের প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাজ আরম্ভ করেছিলেন ১৯২১ সালে যেমন শওকৎ উস্‌মানী, (ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য) আর কেউ কেউ করেছিলেন ১৯২২ সালের শুরুতে। ১৯২৪ সালে ভারত গবর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ভারতের হোম ডিপার্টমেন্টের অন্তর্ভুক্ত সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল সি. কে. (Kaye) যখন কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার বাদী হিসাবে আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করছিলেন তখন তিনি তাঁর দরখাস্তে বলেছিলেন যে আসামী শ্রীপাট (দরখাস্তে শ্রীপাটই লেখা ছিল, শ্রীপাদ নয়) অমৃত ডাঙ্গে, মাওলা বখ্‌শ্ ওর্ফে শওকত উস্‌মানী ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভারতের রাজ-সম্রাটকে শাসন ক্ষমতা হতে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। কাজেই, এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না যে কানপুরের আসামীরা যে অপরাধ করার জন্যে আদালতে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন তার সূত্রপাত ১৯২১ সালে হয়েছিল। আর, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সহিত যোগ স্থাপন করাটাই ছিল তাঁদের আসল অপরাধ।

বাঙলা দেশে পার্টির সূত্রপাত

আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বাঙলা দেশের। সেই জন্যে আমি বাঙলা দেশ হতেই কথা শুরু করব। বাঙলাদেশে যে মজুরদের ধর্মঘট ইত্যাদি হচ্ছিল তার কোনো প্রভাব আমার উপরে পড়েনি একথা বলা যায় না। 'নবযুগ' কাগজ পরিচালনার

মধ্য দিয়েও আমার মন খানিকটা মজুরদের সমস্যার প্রতি উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় নাবিকদের ভিতরে ঘোরাফেরা করার অভ্যাস আমার ছিল। কিন্তু এটা যে তাদের ভিতরে আন্দোলন করার জন্যে আমি করতাম তা বলা যায় না। আমার জন্মস্থান সন্দ্বীপের লোকেরা তখনকার দিনে খুব বেশী সংখ্যায় জাহাজে চাকরী করতেন। তাঁদের ভিতরে আমার ঘোরাফেরা করার এটাই ছিল আসল কারণ। কিন্তু আমি তাঁদের ভিতরে যে যাতায়াত করতাম তাতে তাঁদের নানা সমস্যার প্রতিও আমার মন আকৃষ্ট হয়েছিল। জাহাজীদের দাবী-দাওয়া নিয়ে আমি 'নবযুগ' কাগজে অনেক লিখেছি।

আমার প্রথম মার্কসবাদ বিষয়ে সাহিত্য কেনা

এই অবস্থায় সাধারণভাবে মজুর আন্দোলন সম্বন্ধে সামান্য পড়াশুনা করার বাসনা আমার মনে জেগেছিল। সেই সময় আমাদের বন্ধু মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে একদিন কথায় কথায় আমায় জানালেন যে কলেজ স্কোয়ারের চক্রবর্তী, চাটার্জী এন্ড কোম্পানী লিমিটেডের দোকানে মজুর সমস্যা সম্পর্কিত কিছু পুস্তক ইংল্যান্ড হতে এসেছে। মাখন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মারফতে হয়েছিল। ইংরেজী ও বাঙলা ভালো লিখতেন। সাহিত্য বিষয়ে তিনি খুব পড়াশুনা করতেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিতে আসতেন। পরে সমিতির অনেক কাজের ভারও তিনি নিয়েছিলেন। যাক আসল কথা এখন বলি। মাখন গঙ্গোপাধ্যায় যখন আমায় পুস্তক আমদানীর খবর দিলেন তখন আমি অতি কষ্টে দশটি টাকা জোগাড় করলেম। তখনকার দিনে আমার পক্ষে দশ টাকা জোগাড় করা কঠিন কাজ ছিল। এই টাকা নিয়ে আমি চক্রবর্তী, চাটার্জির দোকানে গেলাম। আমার সেদিন ধুতি-শার্ট পরা ছিল। মজুর সমস্যা সংক্রান্ত পুস্তকের কথা জিজ্ঞাসা করতেই দোকানের লোকেরা কেমন যেন চমকে উঠলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কোথা থেকে এসেছেন"। আমি তখনই বুঝে নিলাম যে ওঁরা ভয়ে ভয়ে এই সকল পুস্তক আমদানী করেছেন, আর আমাকে পুলিসের লোক বলে সন্দেহ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমি উত্তর দিলাম যে, "আমি মোহম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেবের নিকট হতে এসেছি। তিনি আমার বন্ধু"। তাঁদের মুখের ভাবটা তখনই বদলে গেল। আমায় যত্ন ক'রে তাঁরা শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের দোতলায় তাঁদের গুদামে নিয়ে গেলেন। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে।

আজকাল অলবার্ট হলের যে বাড়ী সকলে দেখতে পাচ্ছেন, যাতে অনেক পুস্তকের দোকান আছে ও কফি হাউস ইত্যাদি আছে, এটা হচ্ছে নূতন বাড়ী। জীর্ণাবস্থার সাবেক বাড়ীটি ভেঙে দিয়ে অলবার্ট ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ বর্তমান বাড়ীটি তুলেছিলেন। পুরানো বাড়ীটি ভাঙার কারণে অনেক দোকান-পাট বাস্তুহারা হয়ে যায়। চক্রবর্তী, চাটার্জি এন্ড কোম্পানীরও সেই অবস্থা হয়। সমস্যা হয়েছিল যে কোথায় তাঁরা যাবেন। এই কোম্পানী যখন জয়েন্ট স্টক কোম্পানীরূপে রেজিস্ট্রী হয়েছিল তখন আমার বন্ধু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব তার কয়েকটি শেয়ার কিনেছিলেন। এই সূত্রে চক্রবর্তী, চাটার্জির সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এই বাস্তুহারা অবস্থায় তাঁরই আনুকূল্যে কোম্পানী অকূলে কুল পেয়ে গেলেন। পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার তফজ্জুল

আহ্‌মদের চার্জে প্রেসিডেন্সী কলেজ, হেয়ার স্কুল, সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু স্কুল প্রভৃতির বিল্ডিংগুলি ছিল। তিনি ও মোজাম্মেল হক সাহেব আবার ছিলেন একই পীরের মুরিদ (শিষ্য)। এই সূত্রে মোজাম্মেল হক সাহেব ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে এই বলে একান্তভাবে ধরে পড়লেন যে "ভাই সাহেব, চক্রবর্তী, চাটার্জি এণ্ড কোম্পানীর জন্যে সংস্কৃত কলেজের আউট হাউসে একটা দোকানের ব্যবস্থা আপনাকে করেই দিতে হবে"। এই আউট হাউসগুলি খালিই পড়ে থাকত। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব রাজী হয়ে গেলেন। তিনি কলেজ স্কোয়ার (বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট) ও কলেজ স্ট্রীটের মিলন স্থলে দুই রাস্তাতেই দরজাওয়ালা একটি চমৎকার দোকান ঘর তৈয়ার করে দিলেন। তাঁকে এখানে ওখানে কিছু কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছিল। এই কারণে চক্রবর্তী, চাটার্জি এণ্ড কোম্পানীতে মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেবের খুব কদর ছিল। মিস্টার তফজ্জুল আহ্‌মদ সুবিখ্যাত আই-সার্জন ডাক্তার টি· আহ্‌মদের বড় ভাই ছিলেন।

আমি ১৯২১ সালের নবেম্বর মাসের কথা বলছি। তখনকার দিনে পুস্তকের দাম খুব সস্তা ছিল। দশ টাকার ভিতরে আমি কয়েকখানা পুস্তক কিনেছিলেম। তার মধ্যে ছিল লেনিনের পুস্তকাকারে মুদ্রিত একটি প্রবন্ধ—(১)"বলশেভিকেরা কি ক্ষমতা দখলে রাখতে পারবেন?" (২) লেনিনের "বামপন্থী কমিউনিজম্—শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা" (৩) "পিপল্‌স্ মার্কস" (People's Marx : Abridged popular edition of 'Capital', Edited by Julian Borchardt, Translated in English by Stephen L. Trask, pp VII+284, printed 1921.)। ভূমিকায় সম্পাদক লিখেছেন যে কার্ল মার্কসের ক্যাপিটালের এই সংক্ষিপ্তসার রচনার জন্যে তিনি ত্রিশ বৎসর কাল ক্যাপিটাল অধ্যয়ন করেছেন। আরও ক'খানা পুস্তক ছিল। এখন নাম মনে করতে পারছিনে। একখানা ছিল কার্ল মার্কসের ওপরে প্রশ্নোত্তরছলে লেখা। কভারের ওপরে মার্কসের ফটো ছাপানো হয়েছিল। এখানা ছিল বিরুদ্ধ পুস্তক, কোনো পাদ্রীর লেখা। একখানাও প্রাথমিক পুস্তক ছিল না। তখন ফিলিপ্‌স্ প্রাইসের স্মৃতিকথাখানি (My Reminiscences of the Russian Revolution) পেলে অন্তত পার্টির সংগঠন সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারতাম। এই পুস্তকখানা হাতে পেয়েছিলেম ১৯২২ সালের শেষার্ধে।

খিলাফৎ আন্দোলন ও তার প্রভাবে সৃষ্ট অসহযোগ আন্দোলন দেশকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। আমি এ দু'টি আন্দোলনের কোনোটিতেই যোগ দিইনি। তার মানে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের (The Criminal Procedure Code of India) ১৪৪ ধারার হুকুম অমান্য করে কিংবা অন্য কোনো কিছু ক'রে জেলে যাইনি। নজরুল ইস্‌লাম অবশ্য কুমিল্লায় এই আন্দোলন সংসৃষ্ট মিছিলে যোগ দিয়েছে এবং সেই সম্বন্ধে একাধিক সঙ্গীতও রচনা করেছে। পুরো ১৯২১ সাল আন্দোলনের কোনো রাজনীতিক সমালোচনাও আমরা করিনি, তার বিরুদ্ধেও আমরা লিখিনি। বরঞ্চ আন্দোলনকারীদের প্রতি কোনো অত্যাচার হলে তার তীব্র সমালোচনা আমরা করেছি। ১৯২০ সালে হিজরৎকারীদের ওপরে গুলি চালানোর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় লেখার কারণে 'নবযুগে'র জামিনের টাকা বাজেয়াফ্‌ৎ হয়েছিল। ১৯২০ সালে আমাকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফৎ কমিটির সভ্য মনোনীত করা হয়েছিল। আমি সে পদ গ্রহণ করিনি। কিন্তু আমি যুক্ত খিলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলনের মিটিংগুলিতে যোগ দিতেম, রাত্রের মিটিংগুলিতেও। শ্রমজীবী

মানুষেরা দিনের বেলা নানা জায়গায় কাজ করতেন। তাঁদের জন্যে মিটিং হতো রাত্রে।

১৯২১ সালের শেষের ক'মাস এভাবেই কার্টছিল। আমার মার্কসবাদী সাহিত্য কেনার কথা আমি ওপরে লিখেছি। কিন্তু কিভাবে কি করব বুঝতে পারছিলেম না। এর আগে কোনো মার্কসবাদী সাহিত্য আমি পড়িনি। তখন আমরা ৩/৪সি, তালতলা লেনের বাড়ীতে রয়েছি। এ বাড়ীতেই নজরুল ইস্‌লাম তার বিখ্যাত "বিদ্রোহী" কবিতা রচনা করেছিল। এই সময়ে আমাদের একটা অদ্ভুত যোগা-যোগ ঘটে গেল। এই যোগাযোগ যাঁর মারফতে ঘটল তিনি খুব কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না। অনেক পরে বুঝেছিলেম যে যাঁর সঙ্গে যোগাযোগটা ঘটেছিল তিনিও ছিলেন অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি।

আবদুর হাফিজ শরীফাবাদীর সঙ্গে আমার পরিচয়

আমি যখন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিতে কাজ করতাম তখন আবদুর হাফিজ শরীফাবাদীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। বর্ধমান জিলার লোক। প্রথম পরিচয়ের সময়ে বলেছিলেন যে তিনি কলকাতা ট্রেনিং (নর্মাল) স্কুলের ছাত্র। তখনকার দিনে নর্মাল স্কুলে বাঙলা ভাষার শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়া হতো। পরে দেখেছিলেম, আবদুল হাফিজ নর্মাল স্কুলে আর পড়েন না, কিংবা কখনও পড়তেন না। তিনি খদ্দরের পায়জামা, শিরওয়ানী ও টুপি পরে বেড়াতেন এবং কলকাতার বাড়ী বেচা-কেনার দালালী করতেন। বাকেরগঞ্জ জিলার হারানচন্দ্র দাস নামে একজনও এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ঘোরাফেরা করতেন।

নলিনী গুপ্তের আগমন

একদিন সকাল বেলা কাজী নজরুল ইস্‌লাম ও আমি আমাদের ৩/৪সি, তালতলা লেনের বাড়ীতে বসে আছি এমন সময়ে আবদুল হাফিজ শরীফাবাদী আমাদের নিকটে এসে প্রায় কেঁদে ফেললেন। তাঁর এই কান্না আনন্দের হতে পারে, কারণ এই সংযোগ হতে টাকা পাওয়ার আশা করেছিলেন তিনি, কিংবা ভয়েরও হতে পারে, কেননা, বোমার ভয় ছিল তাতে। আমার বিশ্বাস, কান্নাটা ভয়েরই ছিল। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বললেন, "আপনারা তলে তলে কি করেন, না করেন, তা আমি জানিনে, তবে আমার বিশ্বাস যে আপনারা বিপ্লবী। সেই জন্যেই আপনাদের নিকটে ছুটে এলাম। কথা হচ্ছে এই যে রাশিয়া হতে একজন মস্ত বড় বিপ্লবী এসেছেন। তিনি জমাট দুধের খালি টিনের ভিতরেও বোমা তৈয়ার করতে পারেন। আর, অনেক টাকা আছে তাঁর নিকটে। তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চান। আপনারা দু'জন তাঁর সঙ্গে দেখা করুন"। আমরা পরের দিন এই বিপ্লবীর সঙ্গে দেখা করতে যাব বলার পরে আবদুল হাফিজ চলে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর আমি নজরুল ইস্‌লামকে বললাম, "এ কোন্ ধরনের বিপ্লবী যিনি যাঁকে-তাঁকে ব'লে বেড়াচ্ছেন যে তিনি বোমা তৈয়ার করতে জানেন; আবার একথাও সকলকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে তাঁর জিম্মায় প্রচুর টাকা আছে"। নজরুল বলল, "কাল বোঝা যাবে ব্যাপারটি কি?"

নলিনী গুপ্তের আত্মপরিচয়

পরের দিন সকাল বেলা আটটার পরে আবদুল হাফিজ এসে আমাদের আপার সার্কুলার রোডের (এখনকার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) একটি বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। আমরা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেম। খবর পেয়ে দোতালা হতে ট্রাউজার, জ্যাকেট ও হ্যাট পরিহিত একজন কালো খোঁড়া লোক নেমে এসে আমাদের অপেক্ষিত গাড়ীতে চড়লেন। একজন হারানচন্দ্র দাসের কথা আমি আগে বলেছি যিনি আবদুল হাফিজের সঙ্গে দালালী করতেন। তিনি আবার এই খোঁড়া ভদ্রলোকের গ্রামের লোক। দেখলাম তিনিও মরিয়া হয়ে গাড়ীতে চড়তে চাইছেন। তাঁর ভয় ছিল টাকার আণ্ডিল খোঁড়া মানুষটি পাছে তাঁর সব টাকা অন্য কোথাও না রেখে আসেন। আবদুল হাফিজ অতিকষ্টে হারান দাসকে নিবৃত্ত করলেন। নিজে তিনি গাড়ীখানা আমাদের বাসায় পোঁছিয়ে দিয়ে নেমে চলে গেলেন। পথে আমরা কারুর সঙ্গে কেউ কোনো কথা বলিনি।

আমাদের বাসায় পোঁছানোর পরে ভদ্রলোক আত্মপরিচয় দিলেন, বললেন, তাঁর নাম নলিনী গুপ্ত। বাকেরগঞ্জ জিলার ঝালকাটির নিকটবর্তী বেলদাখান গ্রামে তাঁর বাড়ী। নিজের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বললেন তিনি। জানালেন, ১৯১৪ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডে চলে গিয়েছিলেন।১ তখনও প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়নি। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে তিনি নানান কারখানায় কাজ করেছেন। সব কারখানাতেই যুদ্ধ-সামগ্রী প্রস্তুত হতো। প্রথম যুদ্ধে যে হ্যাণ্ডগ্রেনেড্ বোমা ব্যবহৃত হয়েছে সেই বোমা প্রস্তুতকরণে তিনি পারদর্শী। তিনি যে যুদ্ধের জন্যে ভালো কাজ করেছেন তার জন্যে গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়ড্ জর্জের সই করা সার্টিফিকেট তাঁর নিকটে আছে। (আমরা অবশ্য এই সার্টিফিকেট দেখতে চাইনি)। যুদ্ধের পুরো সময় তিনি কারখানার কাজ করেছেন, যুদ্ধের পরেও অনেক দিন তিনি কাজ করেছেন। কাজ করার সময়ে তিনি বেলদাখান গ্রামে তাঁর আত্মীয়দের নিকটে মনিঅর্ডার যোগে ইংল্যাণ্ড হতে টাকা পাঠাতেন। ঝালকাটি পোস্ট অফিসে সেই টাকা যখন আসত তখন তা দেখে স্থানীয় লোকেরা অবাক হয়ে যেতেন। তাঁরা বরাবর জেনে এসেছেন ভারতের টাকা ব্রিটেনে চলে যায়। ব্রিটেন হতেও যে ভারতে টাকা আসতে পারে এটা তাঁদের ধারণার বাইরে ছিল।২ ইত্যাদি অনেক কথা। নলিনী গুপ্ত আরও বললেন, অবশেষে একদিন ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট জানতে পারলেন তিনি একজন বিপ্লবী। তখন গবর্নমেণ্টের লোকেরা চমকে উঠলেন। তাঁরা ভাবলেন বড় ক্ষতি হলো। একজন ভারতীয় বিপ্লবীকে কিনা বিস্ফোরক পদার্থ তৈয়ার করতে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর পরে নলিনীকে আর ইংল্যাণ্ডে থাকতে দেওয়া হলো না। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছিল কিনা। কারণ, নলিনী যখন ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন (১৯১৪ সালে) তখন পাসপোর্ট বাধ্যতামূলক ছিল না। যুদ্ধের ভিতরেই তা আন্তর্জাতিক ভাবে

১ পুলিসের নিকট ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে বিবৃতি দেওয়ার সময় নলিনী বলেছেন তিনি ১৯১৫ সালে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছেছিলেন।

২ পুলিসের নিকটে বিবৃতিতে নলিনী বলেছেন দেশ হতে তাঁর এক দাদা মাঝে মাঝে তাঁকে লণ্ডনে টাকা পাঠাতেন।

বাধ্যতামূলক হয়েছিল। নলিনী জানালেন, পাসপোর্ট তাঁকে দেওয়া হয়নি। একটা অস্থায়ী পরিচয় পত্র (Identification Certificate, শুধু একবার ব্যবহারের জন্যে) তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

তারপরে তিনি বার্লিন গেলেন। বার্লিন হতে অন্য ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের সহিত গিয়েছিলেন মস্কো। কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত (১৯২১ সালের ২২শে জুন হতে ১২ই জুলাই) তিনি মস্কো ছিলেন। আমাদের তিনি বললেন, "এখন আমি মস্কো হতে আসছি। উদ্দেশ্য, ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের বৈপ্লবিক সংযোগ স্থাপন করা। সেই যে ১৯১৪ সালে আমি ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেম তারপরে এই সবে দেশে ফিরলাম। জাহাজে চাকরী করে কলম্বো হয়ে ফিরেছি। অসুস্থ হয়ে কলম্বোতে আমায় ছয় সপ্তাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল"। অঢেল টাকা-কড়ি নিয়ে আসার কথা নলিনী গুপ্ত কিন্তু আমাদের কিছু বলেননি।

আমরা আমাদের কথা তাঁকে জানালাম। আমরা যে ছোট্ট দৈনিক কাগজ খানা সম্পাদনা করতাম তার ফাইলও তিনি আমাদের টেবিলের ওপর হতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখলেন, হেডিংগুলিও পড়লেন। আমি যে বই ক'খানা কিনেছিলেম সেগুলিও তাঁকে আমি দেখিয়েছিলেম। নলিনী গুপ্ত বললেন, "আমার তো মনে হয় আমি ঠিক জায়গাতেই এসেছি"।

আমরা নলিনী গুপ্তের সঙ্গে কোন রকম তাত্ত্বিক আলোচনা করতে চাইনি। কথাবার্তায় মনে হয়নি যে তিনি সেই আলোচনা করতে পারতেন। আমরা তাঁর নিকট হতে কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের সাংগঠনিক রূপ সম্বন্ধেই শুধু ওয়াকিফ্‌হাল হতে চেয়েছিলেম। তিনি নিজের সম্বন্ধে অনেক অতিরঞ্জিত কথা যাঁকে-তাঁকে বলেছেন। তিনি রুশ দেশের বলশেভিকদের তরফ হতে এদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ করতে এসেছেন একথাও রটিত হয়েছিল এবং এই রটনার জন্যে তিনিই দায়ী। আমাদের মনে ভয় হয়েছিল যে নলিনী গুপ্তকে পেলে পুলিস গ্রেপ্তার করবে। তাই, নজরুল ইস্‌লাম আর আমি তাঁকে একটা নিভৃত স্থানে নিয়ে গেলাম। তাঁকে আমরা অনুরোধ করলাম যে "আপনি কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালেরও সাংগঠনিক চেহারাটা আমাদের ভালো করে বুঝিয়ে দিন"। তিনি কিন্তু আমাদের একেবারেই হতাশ করলেন। সংগঠন সম্বন্ধে কিছুই তিনি আমাদের বললেন না। আমাদের নিকটে তিনি ঝাড়া এক ঘণ্টা বোমা ও বিস্ফোরক সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। আমরা বুঝে নিলাম যে বোমা ও বিস্ফোরকের ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন, কিন্তু কমিউনিস্ট মতবাদ ও কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন না।

আমি আগেই বলেছি যে নলিনী গুপ্ত জার্মানি হতে ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের সঙ্গে মস্কো গিয়েছিলেন। তাঁদের ভিতর কেউ আগে কখনও নলিনীকে চিনতেন না। তবুও তাঁরা মস্কো যাওয়ার সময়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের ভিতর হতে একজন, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত তাঁর "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসে"র নূতন সংস্করণে লিখেছেন যে নলিনী গুপ্তকে মস্কো রেখে আসার জন্যেই তাঁরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

মস্কোতে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে একটা জবর রকমের ধাপ্পা দিয়ে নলিনী গুপ্ত তাঁর (রায়ের) প্রিয়পাত্র হয়ে গিয়েছিলেন। রায়কে নলিনী গুপ্ত বলেছিলেন যে তিনি সবে মাত্র ভারতবর্ষ হতে ফিরেছেন। যুদ্ধের পরে তিনি একবার ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন। সেখানে রায়ের পুরনো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর (নলিনীর) দেখা হয়েছিল। তাঁরাই রায়ের সঙ্গে সংযোগ সাধনের জন্যে তাঁকে মস্কো পাঠিয়েছেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর বিচক্ষণতা সত্ত্বেও নলিনী গুপ্তের মতো লোকের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি নলিনী গুপ্তকে তাঁর বার্তাবহরূপে ভারতে পাঠিয়েছিলেন এবং পাঠিয়েছিলেন মূলত তাঁর পুরনো সন্ত্রাসবাদী পার্টির বন্ধুদের নিকটে। কেউ যদি ইচ্ছা করেন তবে নলিনী গুপ্তকে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের বার্তাবহও বলতে পারেন। কারণ, এম. এন. রায় কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের হয়েই কাজ করছিলেন। রায় তাঁর ‘স্মৃতিকথা’র লেখা তাঁর জীবদ্দশায় শেষ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেও অনেক দিন তা ‘র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট’ নামক ইংরেজি সাপ্তাহিকে ছাপা হয়ে চলেছিল। ১৯৫৪ সালের ১৩ই জুন তারিখের ‘র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্টে’ ছাপা হয়েছে ঃ

> "In the next few days there was a great flutter in the Indian delegation. Lenin had agreed to grant an interview. The Indian revolutionaries had been informed that Lenin would receive three of their representatives chosen by themselves. There were differences as regards the choice. Everybody considered himself to be more entitled to the honour and privilege than the others. I could get all this information through Nalini Gupta, the only one who did not share the general hostile attitude against me. **He was also the only one among the Indian revolutionaries in Europe who maintained some connection with the revolutionary organisations in India by frequently travelling back and forth secretly. He had met some of my friends in India and learned from them about my mission with which I had gone abroad in the beginning of war. During his last visit to India shortly before he came to Moscow, he was instructed to contact me. So, from the very beginning my relation with him was of mutual trust and confidence"** (The Radical Humanist, June 13th, 1954.)

বঙ্গানুবাদ ঃ "পরের ক'দিন ভারতীয় ডেলিগেটদের মধ্যে বেশ নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। লেনিন তাঁদের সঙ্গে মুলাকত করতে রাজী হয়েছেন। ভারতীয় বিপ্লবীদের জানানো হয়েছে যে তাঁদের মধ্য হতে তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত তিনজন প্রতিনিধির সঙ্গে লেনিন দেখা করবেন। এই তিনজনের নির্বাচন সম্বন্ধে

তাঁদের মতভেদ ছিল। বিপ্লবীদের ভিতরে প্রত্যেকেই ভাবতে লাগলেন যে এই সম্মান ও বিশেষ অধিকার পাওয়ার দাবী তাঁরই আর সকলের চেয়ে বেশী। আমি এ সকল খবর নলিনী গুপ্তের মারফতে পেতাম। **নলিনী গুপ্তই বিপ্লবীদের ভিতর একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি সাধারণত আমার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন না। ইউরোপে অবস্থানকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের ভিতরে নলিনী গুপ্তই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি গোপনে ঘন ঘন ভারতে যাতায়াত করে ভারতীয় বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সম্পর্ক রেখেছেন। তিনি ভারতে আমার কোনো কোনো বন্ধুর সহিত দেখা করেছেন এবং তাঁদের মুখে শুনেছেন কি কাজের ভার নিয়ে আমি যুদ্ধের শুরুতে বিদেশে গিয়েছিলেম। মস্কো আসার অল্পকাল আগে তিনি শেষবার ভারতে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে [আমার বন্ধুরা] উপদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন আমার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। এই কারণে তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক ছিল তা ছিল উভয়ের প্রতি উভয়ের বিশ্বাস ও ভরোসার সম্পর্ক।"**

("এম. এন. রায়ের স্মৃতিকথা", র‍্যাডিক্যাল হিউমানিস্ট, ১৩ই জুন ১৯৫৪)

"র‍্যাডিক্যাল হিউমানিস্ট" পত্রিকায় মুদ্রিত এম. এন. রায়ের স্মৃতিকথা তাঁর বন্ধুদের সম্পাদনায় ১৯৬৪ সালে এলাইড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ডিমাই অক্টাভো সাইজের ৬২৭ পৃষ্ঠার পুস্তক। বোধ হয় আরও অনেক বড় হয়ে যাওয়ার ভয়ে সম্পাদকরা রায়ের মূল লেখার অনেক অংশ বাদ দিয়েছেন। লেখার যে অংশটা আমি এখানে তুলে দিয়েছি, তাও তাঁরা বাদ দিয়েছেন। কিন্তু লেখার এই অংশটা তাঁরা বাদ না দিলেও পারতেন। তা হলে দুনিয়ার মানুষ, কম পক্ষে রায়ের গুণগ্রাহীরা জানতে পারতেন যে কি ভাবে তিনি নলিনী গুপ্তের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। আমি আমার "প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন" (ইংরেজি তর্জমা The Communist Party of India and its Formation Abroad)[১] পুস্তকে একথার উল্লেখ করেছি। রায়ের গুণগ্রাহীরা দিল্লীর 'Thought' (থট্) নামক ইংরেজি পত্রিকার পরিচালনা করেন। তাতে আমার পুস্তকের সমালোচনা (June 16, 1962) হয়েছে।

সত্য কথাটা এই যে নলিনী গুপ্ত ১৯১৪ সালে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। আর, এম. এন. রায় শেষ ভারত ত্যাগ করেছিলেন ১৯১৫ সালে, অর্থাৎ নলিনী গুপ্তের ভারত ত্যাগ করার এক বছর পরে। নলিনী গুপ্ত নিজ মুখে আমাদের নিকটে স্বীকার করেছেন যে ১৯১৪ সালে তাঁর ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার পরে ও ১৯২১ সালে এম. এন. রায়ের দ্বারা ভারতে প্রেরিত হওয়ার আগে আর কখনও তিনি ভারতে আসেননি। নলিনী গুপ্তের লম্বা দাঁড়িওয়ালা দুই খুড়তুতো কিংবা জেঠতুতো দাদা ছিলেন। তাঁদের নাম ছিল উমেশ দাশগুপ্ত ও যোগেশ দাশগুপ্ত। নলিনী গুপ্ত যখন ১৯২১-২২ সালে কলকাতায় ছিলেন তখন তাঁর এই দুই দাদার একজনের সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনিও তখন বলেছিলেন যে "নলিনী ছয়-সাত বছর পরে দেশে ফিরেছে"। আরও ক'বছর পরে নলিনীর সহোদর দাদা মান্দালয়ের শশী গুপ্তও আমায় এই একই কথা বলেছিলেন। এখানে একটি কথা বলে রাখি। নলিনীদের পারিবারিক পদবী "দাশগুপ্ত"। তাঁদের গ্রামের লোকেরা এই দাশগুপ্তদের শুধু 'দাশ' বলেন। গ্রামে নলিনীর ডাকনাম ঝড়ু দাশ। তিনি নিজেকে নলিনী গুপ্ত করেছেন। আর, তাঁর দাদা

[১] National Book Agency Private Ltd., Calcutta-12

শশী গুপ্ত শুধু 'গুপ্ত'তে সন্তুষ্ট না থেকে নিজেকে 'গুপ্তু' করেছিলেন। যুদ্ধের ক'বছর কি করে নলিনী গুপ্ত ঘন ঘন ভারতে যাতায়াত করতে পারলেন? জাহাজে স্থান পাওয়া কি এতই সহজ ব্যাপার ছিল? তা ছাড়া, নলিনী গুপ্ত তো যুদ্ধের চাকরী করছিলেন।

মানবেন্দ্রনাথ রায় কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের তরফ হতে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের ভার পেয়েছিলেন। কিন্তু কাবুল হতে পাঞ্জাবের সঙ্গে সামান্য সংযোগ মাত্র তিনি স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তাই নলিনী গুপ্তের মুখে তিনি যখন প্রথম শুনলেন যে তার পুরনো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির বন্ধুরা নলিনীকে তাঁর নিকটে পাঠিয়েছেন তখনই তিনি আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন। বহু বৎসর পূর্বে ভারত-ছাড়া ও জার্মানী হতে আসা ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীরা মস্কো এসে দর-কষাকষি করছিলেন। এমন সময়ে যদি সম্ভাবনা দেখা দেয় যে ভারতে অবস্থিত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে পারেন তবে তো আনন্দে অভিভূত হওয়ারই কথা। জার্মানী হতে আসা ভারতীয় বিপ্লবীদের ভিতরেও পুরানো সন্ত্রাসবাদীরা ছিলেন। তবে তাঁদের ভারতে ফেরার সম্ভাবনা কম ছিল। আর নলিনী যাঁদের তরফ হতে এসেছেন তাঁরা ভারতেই রয়েছেন, সংখ্যায়ও অনেক বেশী। ব্যাপারটি ছিল খুবই সম্ভাবনাময়। কিন্তু ভারতবর্ষ হতে ওই সময়ে ওই ভাবে কাউকে মস্কো পাঠানো সম্ভব ছিল কিনা তা তিনি একবারও ভেবে দেখলেন না। মানবেন্দ্রনাথ বাঙলা দেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের ভিতরে অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী সংগঠনগুলির কথা তিনি জানতেন, এসব সংগঠনের নেতাদেরও তিনি চিনতেন। তিনি যদি কষে নলিনী গুপ্তকে জেরা করতেন তবে তাঁর নিকটে ধরা পড়ে যেত যে নলিনী একজন ভুইফোঁড় ব্যক্তি।

১৯২১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে
নলিনী গুপ্তের কলকাতা আগমন

নলিনী গুপ্ত ১৯২১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে কলকাতা পৌঁছেছিলেন। পুলিসের নিকটে দেওয়া বিবৃতিতে তিনি একথা বলেছেন। কলম্বো হতে ধানুষ্কোড়ি হয়ে তিনি সোজা কলকাতা এসেছিলেন। ধানুষ্কোড়ি হতে সেণ্ট্রাল ইণ্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর যে খবর পেয়েছিলেন তার দ্বারাও নলিনী গুপ্তের দেওয়া তারিখটি সমর্থিত হচ্ছে। আমি যে স্মৃতি হতে ১৯২১ সালের নবেম্বর মাসের কোন সপ্তাহে নজরুল ইসলাম ও আমার সঙ্গে নলিনীর প্রথম দেখা হওয়ার কথা আগে কোনো কোনো জায়গায় লিখেছি তা ভুল। সাক্ষাৎ ওই বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে হয়েছিল।

কলম্বোতে নলিনীর ছয় সপ্তাহ সময় নষ্ট হয়েছিল। সেইজন্য তিনি কলকাতায় পৌঁছা মাত্রই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন। অমর চট্টোপাধ্যায়ের সহিত দেখা করার চেষ্টা তিনি সবচেয়ে বেশী করেছেন। কিন্তু যতবার চেষ্টা করেছেন ততবারই প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। অথচ, দীর্ঘ মিয়াদী কয়েকজন দণ্ডিত বন্দী ছাড়া সন্ত্রাসবাদী নেতারা সকলেই তখন জেলের বাইরে ছিলেন। প্রথম দিন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরেই নলিনী আমার ও নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন এবং ডিসেম্বর (১৯২১) মাসের ভিতরেই আমাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তিনি আমাদের নিকটে স্বীকার করেছেন যে তিনি সন্ত্রাসবাদী নেতাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন। এই

সব দেখা-সাক্ষাতের পরেই নলিনী তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করার জন্যে বাকেরগঞ্জ জিলার বেলদাখান গ্রামে ও ভোলায় গিয়েছিলেন। মাত্র ১৩ দিন কলকাতা হতে তিনি তখন অনুপস্থিত ছিলেন। পুলিসের নিকটে বিবৃতি দিতে গিয়ে এসব কথা নলিনী বলেছেন।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতারা নলিনী গুপ্তের সহিত দেখা করার ব্যাপারে যে এমন কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন তার কারণ আছে। প্রথমত, নলিনী গুপ্ত পূর্বে কোনো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির সভ্য ছিলেন না। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হওয়ার পরে আমি তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেম। তিনি এক মৃত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী যুবকের নামোল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন যে সুশীলকুমার সেন তাঁর বন্ধু ছিলেন। ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে নদীয়া জিলায় একটি ডাকাতি করতে গিয়ে সুশীল সেন মারা যান। নলিনী গুহ লিখিত "বাংলার বিপ্লববাদ" নামক গ্রন্থের পরিবর্ধিত সংস্করণে (বৈশাখ, ১৩৬১) লেখা হয়েছে যে পুলিসকে লক্ষ্য করে তাঁর দলের লোকেরা গুলি ছুঁড়েছিলেন। সেই গুলিতেই সুশীল সেন মারা যান। যা'ক, মৃত ব্যক্তি কাউকে কিছু বলতে আসেন না। নলিনী গুপ্তের সঙ্গে যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতাদের কেউ দেখা করতে চাইলেন না তার একটা বিশেষ কারণ আছে।

১৯১৩ সালে বর্ধমানে একটা খুব বড় রকমের বন্যা হয়েছিল। বন্যার্তদের সেবা করার জন্যে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী দলের লোকেরা বর্ধমানে গিয়েছিলেন। সেবার উদ্দেশ্য তাঁদের তো ছিলই, তাঁদের অন্য উদ্দেশ্য ছিল, আর্তের সেবার ভিতর দিয়ে তাঁদের পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যাবে, হয়তো তাঁরা নিজেদের বৈপ্লবিক কাজ-কর্মের প্রোগ্রামও খানিকটা ঝালিয়ে নিবেন। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ছাড়াও ছোট-বড়ো নানা দলে ভাগ হয়ে আরও অনেকে বর্ধমানের বন্যাত্রাণে গিয়েছিলেন। নলিনী গুপ্তও 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে এই কাজে বর্ধমানে গিয়েছিলেন। সেখানে সকলের সঙ্গে সকলের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতাদের নলিনী গুপ্ত বন্যাত্রাণের কর্মক্ষেত্রে দেখেছিলেন। তাঁরাও দেখেছিলেন নলিনী গুপ্তকে এবং চিনেছিলেনও। মিথ্যা কথা বলে একজনের সঙ্গে অপরের ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া নলিনী গুপ্তের একটা সহজাত দোষ ছিল। পরবর্তী সময়ে আমরাও তা উপলব্ধি করেছি। কোনো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতা যে নলিনী গুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হলেন না এটাই ছিল তার দ্বিতীয় কারণ। ১৯২৪ সালে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে আমি যখন কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে একত্রে বন্দী ছিলেম তখন তিনি তাঁর বর্ধমানের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে আমায় বলেছিলেন যে "নলিনী একটি Scoundrel (পাজী)"।

এই অবস্থার সম্মুখীন হয়ে নলিনী গুপ্ত একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যখন ভারতে আসছিলেন তখন এম. এন. রায় দরকার হলে তাঁকে ন্যাশনালিস্ট খিলাফৎ আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গেও দেখা করতে বলেছিলেন। তাঁর আসল কাজ অবশ্য ছিল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে এম. এন. রায়ের সংযোগ স্থাপন করা। কারণ, নলিনী গুপ্ত তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতাদের তরফ হতে মস্কো গিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের নিকট হতে টাকা পাওয়ার সম্ভাবনার কথা শুনেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতারা তাঁদেরই একজন পুরানো বন্ধু মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে এগিয়ে আসবেন না এটা নলিনী গুপ্তের ধারণার বাইরে ছিল। যাই হোক, হতাশগ্রস্ত নলিনী গুপ্ত তাঁর

গ্রামের লোক হারানচন্দ্র দাসকে (তাঁর নাম আমি আগে উল্লেখ করেছি) জিজ্ঞাসা করলেন—

"তোমরা তো কলকাতায় এত ঘোরাঘুরি কর, খিলাফৎ আন্দোলনের কোনো নেতাকে চেন না?"

হারানচন্দ্র দাস সঙ্গে সঙ্গেই জওয়াব দিলেন, "কেন চিনব না? আমাদের মৌলবী সাহেব রয়েছেন যে"।

হারানচন্দ্র দাসের এই মৌলবী সাহেব ছিলেন আমাদের আগে উল্লেখ করা আবদুল হাফিজ শরীফাবাদী। তাঁর খদ্দরের পোশাক দেখে কেউ তাঁকে কংগ্রেস-খিলাফতের নেতা মনে না ক'রে পারতেন না। এর পরের ঘটনাগুলির কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি।

নলিনী গুপ্ত যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির নেতাদের দ্বারা অবজ্ঞাত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন এই কথা আমি তাঁর মুখে শুনেছিলেম। আমাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরেও নলিনী গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এটা তাঁর পক্ষে একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার হয়ে পড়েছিল। বিখ্যাত আমেরিকান ডেন্টাল সার্জন ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্তের এক খুড়তুতো ভাই কলকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে চাকরী করতেন। তাঁর নাম ছিল অজয় সেনগুপ্ত। অবশেষে তিনি (অজয় সেনগুপ্ত) একদিন সত্য সত্যই নলিনী গুপ্তের সঙ্গে একজন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিলেন। তাঁর নাম ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। তাঁকে কেউ যেন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে ভুল ক'রে বসবেন না। এটা ১৯২২ সালের মার্চ মাসের কথা। ডক্টর দত্ত দেশে ফিরেছিলেন ১৯২৫ সালে। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী মহলে সুখ্যাত ও সম্মানিত ব্যক্তি, আজও (১৯৬৭) বেঁচে আছেন। নলিনীর সঙ্গে ভূপেন্দ্রকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ওয়েলিংটন স্ট্রীটে ডাক্তার টি· এন· রায়ের চেম্বারে। কিছুক্ষণ কথা হওয়ার পরে নলিনী তাঁকে সঙ্গে করে আমাদের তালতলা লেনের বাসায় নিয়ে আসেন। সেখানে আমার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ও কথাবার্তা হয়। যতটা মনে পড়ে সময়টা ১৯২২ সালের মার্চ মাসের শুরু ছিল। তার একদিন কিংবা দু'দিন পরে নলিনী দেশ ছেড়ে চলে যায়।

প্রথম যেদিনী নলিনী গুপ্তের সহিত নজরুল ইস্‌লাম ও আমার দেখা হয়েছিল সেদিন তিনি আমাদের নিকটে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আসল নাম উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম· এন· রায়ের আসল নাম) এক সময়ে নামকরা বিপ্লবী কর্মী ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি টাকা-পয়সার ব্যাপারে অসদ্‌-বৃত্তি অবলম্বন করেছেন। তিনি ভারতে আসার পথে বার্লিনে খবর পেয়ে এসেছেন কোন্ সুইস ব্যাঙ্কে নরেন্দ্রনাথের টাকা গচ্ছিত আছে। এবার ফিরে গেলে এই সম্বন্ধে নলিনী গুপ্ত নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বুঝাপড়া করে নিবেন। পরিষ্কার ভাষায় বলছিলেন না বটে, কিন্তু আকার-ইঙ্গিতে আমাদের এই বোঝাতে চাইছিলেন যে এবার ফিরে গিয়ে তিনিই হবেন কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের ভারত সম্পর্কিত প্রতিনিধি। এখানে আমি ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত লিখিত তাঁর **"বিপ্লবের পদচিহ্ন"** নামক স্মৃতিকথা হতে কিঞ্চিৎ তুলে দিচ্ছি ঃ

"বোধহয় ১৯২২ সালের গোড়ায় জার্মানী থেকে এম· এন· রায় এক ব্যক্তিকে পাঠান এখানে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে অথবা তা সম্ভব না হ'লে অন্য যে কোনো উপায়ে এদেশে একটি কৃষক শ্রমিকের বিপ্লবী দল গড়তে। এই ব্যক্তি বোম্বেতে পুরানো পরিচিত এক বাঙালী বন্ধুর মারফত কয়েক জনের

সহিত যোগাযোগ ক'রে কলকাতায় আসেন, **কিন্তু এখানে এম· এন· রায়ের পুরানো বন্ধুরা এই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে রাজী হন নাই**—একথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আমি তখন কুন্তল ও চারুকে নিয়ে যশিদিতে। কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছি, সাতুদা (সাতকড়ি ব্যানার্জি) বলেন, এত বছর বাদে নরেন (এম· এন· রায়) এত বিপদ আপদের ভিতর একজন লোক পাঠাল, তার সঙ্গে কেউ দেখাও করবে না? যাদুদার অনুমোদন নিয়ে আমি ডাঃ টি· এন· রায়ের বাড়ীতে এই লোকটির সঙ্গে দেখা করি।

"ডাঃ টি· এন· রায় ও ডাঃ এস· সি· সেনগুপ্ত (দন্ত চিকিৎসক) তখন এক বাড়ীতেই থাকতেন। ওঁদের সামনেই প্রথম কথা হলো। **লোকটি তো চাল দিতে সুরু করলো। বলে এম· এন· রায় কে? কে তাকে চেনে?** লেনিনের কাছে যাতায়াত আমারই...ইত্যাদি।

"বুঝলাম ধাপ্পা। ধমক দিয়ে বলি, আপনি কে মশাই? আপনার credentials কি? কে আপনাকে চেনে?

"ব'লে উঠে আসছি—বাইরে এসে হাত ধরলো ঃ কিছু মনে করবেন না—রায়ই আমায় এই রকম বলতে বলেছে।"

(বিপ্লবের পদচিহ্ন, ৩৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা)

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির নেতারা কেউ যে নলিনী গুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হননি, আর তিনিই যে নিজেকে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রকৃত প্রতিনিধি বলে ধাপ্পা দিতে চেয়েছিলেন তা উদ্ধৃত লেখা হতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। নলিনী আমাদের শুধু আকার-ইঙ্গিতে বলেছিলেন যে তিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রকৃত প্রতিনিধি। কারণ, আমরা তাঁর নিকট হতে এই বিশ্ব সংগঠনের সাংগঠনিক রূপটা বুঝতে চেয়েছিলেম। তিনি তা আমাদের বোঝাতে পারেননি।

কিন্তু ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে তিনি খোলাখুলি বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিলেন যে তাঁরই সঙ্গে লেনিনের যোগাযোগ। "ধমক" খেয়ে পরে স্বীকার করেছিলেন যে মানবেন্দ্রনাথ রায়ই তাঁকে পাঠিয়েছেন। নলিনী চলে যাওয়ার পরে ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে আমার প্রথম যে দিন দেখা হলো সেদিন তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে নলিনী কোনো সন্ত্রাসবাদী পার্টির সভ্য ছিলেন কিনা সেকথা কি তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন যে জিজ্ঞাসা তিনি করেছিলেন। নলিনী যে কোনো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির সভ্য ছিলেন একথা তিনি ভূপেন্দ্রকুমারকে বলেননি। তবে, বলেছেন যে রাজাবাজার বোমার মামলার আসামী শশাঙ্ক হাজরাকে (প্রকৃত নাম অমৃতলাল হাজরা) তিনি চিনতেন। হাজরা তখন জেলের বাশিন্দা। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির এমন দু'জন ব্যক্তির নাম নলিনী করলেন যার একজন মৃত, আর একজন কারারুদ্ধ। যাচাই করার উপায় ছিল না। কিন্তু অমৃতলাল হাজরাকে নলিনী চিনতেন। কারণ, ন্যাশনাল আরকাইবের কাগজপত্র হতে জানতে পারা যাচ্ছে যে রাজাবাজার বোমার মামলার সংস্রবে ১৯১৪ সালের জুন মাসে নলিনী অমৃতলাল হাজরার বিরুদ্ধে পুলিসের নিকটে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে ৭১/১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের মেসে থাকার সময়ে শশাঙ্ক ওর্ফে অমৃতলাল হাজরার সহিত তাঁর পরিচয় হয়। একবার রাজাবাজারে শশাঙ্কের ঘরে গিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন একটি চামড়ার ব্যাগের ভিতরে প্রায় বিশটি রিভলবার রয়েছে। **নলিনীর এই আজগুবী বিবৃতি হতে বোঝা**

যায় যে তিনি কোনো দিন কোন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির সভ্য ছিলেন না।[১] পরে নলিনীদের ওই অঞ্চলের অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় ও যোগাযোগ হয়েছিল। ওদিককার বেশ কয়েকজন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যও হয়েছিলেন অবশ্য নলিনী গুপ্তের মারফতে নয়। গ্রামের একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট হতে খবর নিয়ে জানা গেছে যে ঘুরে বেড়ানো বেকার যুবক ঝড়ু দাশ (নলিনী গুপ্তের ডাক নাম) গ্রামে বাস করার সময়ে কখনও কোনো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির সংস্রবে আসেনি, আর লেখাপড়ার দিক থেকে স্কুলের শেষ পরীক্ষাও সে পাস করেনি।

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত বিবৃত কোনো কোনো উক্তির সম্পর্কে আমি পরে এই পুস্তকের অন্য জায়গায় আলোচনা করব। শুধু একটি কথা আমি এখানে বলে রাখতে চাই যে প্রথম বারে নলিনী গুপ্তকে মানবেন্দ্রনাথ রায় বাঙলা দেশে মজুর কৃষক দল গড়ে তুলতে পাঠাননি। রায়ের আগেকার পার্টির অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির নেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্যেই শুধু তিনি নলিনীকে বাঙলা দেশে পাঠিয়েছিলেন, সেবারে নলিনী অন্য কোনো প্রদেশেও যাননি। তিনি উপদিষ্ট হয়েছিলেন যে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া যদি নলিনী কংগ্রেস-ওয়ালা ও খিলাফৎপন্থীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করে আসতে পারেন সেটা অধিকন্তু। নলিনী একান্তই বার্তাবহরূপে এদেশে এসেছিলেন। প্রথম বারে তো বটেই, দ্বিতীয় বারেও।

এই নলিনী গুপ্তকে নিয়ে আমায় কম জ্বালা পোয়াতে হয়নি। তিনি যে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের একজন বিশিষ্ট কেউ নন, লেখাপড়াও তেমন কিছু জানেন না, এটা আমি বুঝেছিলেম। টাকা কড়িও যে তাঁর নিকটে ছিল না এটাও বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না। জানুয়ারী (১৯২২) মাসের শেষাশেষিতে কিংবা ফেব্রুয়ারীর শুরুতে নজরুল ইস্‌লাম কুমিল্লা চলে গেল। নলিনীর বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আমি একাই থাকলাম। তিনি একদিন এক মুস্‌লিম ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে এলেন। পরিচয় দিলেন যে তিনিও তাঁর সঙ্গে ইউরোপ হতে এসেছেন। কেন এসেছেন, কি করছেন তিনি কিছুই বললেন না। তবে, এটা শুনলাম যে দক্ষিণ ভারতের কোনো পোর্টে তিনি যাবেন। নলিনী তাঁকে বাঙলায় একখানা পত্র লিখে দিলেন, বললেন সেই পোর্টে যেন পোস্ট করে দেওয়া হয়। পাঁচ-সাত দিন পরে তাঁর সঙ্গে আমার কলকাতার রাস্তায় দেখা হলো। জিজ্ঞাসা করলাম আপনি যে এখনও এখানে? তখন তিনি আমার নিকটে তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন। তাঁর বাড়ী কলকাতায়, বালু হাক্কাক লেন কিংবা এমন কোনো রাস্তায়। নাম আবদুল

---

১ ১৯১৪ সালের জুন মাসে অমৃতলাল হাজরার বিরুদ্ধে দেওয়া নলিনীর বিবৃতিকে আমি আজগুবী বলেছি এই কারণে যে কোনো একজন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতার নিকটে একসঙ্গে বিশটি রিভলবার থাকা সেকালে একেবারেই সম্ভব ছিল না। আমার বিশ্বাস যে পুলিসও নলিনীর বিবৃতি বিশ্বাস করেনি। এত বড় যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ—তার জন্যে উদ্যোক্তারা সংগ্রহ করতে পেরে-ছিলেন মাত্র ষোলটি রিভলবার। তার মধ্যে চারটি জোগাড় করে দিয়েছিলেন একা আবদুর রেজ্জাক খান। এই তথ্য "সাপ্তাহিক বসুমতী"তে প্রকাশিত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের নেতা অনন্তলাল সিংহের লেখা হতে নিয়েছি। অমৃতলাল হাজরা ১৯১৩ সালে গিরেফ্‌তার হয়েছিলেন।

লতীফ। তিনি জাহাজের বাটলার। ইউরোপের কোনো পোর্টে তাঁর সঙ্গে নলিনীর পরিচয়। ফিরে এসে নলিনীকে এই কথা বলতে তিনি বললেন আবদুল লতীফের সঙ্গে চাকরী করেই তো ইউরোপ হতে এসেছি। নলিনী চলে যাওয়ার পরে আবদুল লতীফ আমায় বলেছিলেন যে নলিনী ঠিক কথা বলেননি।

আবদুল লতীফকে দেখিয়ে নলিনী আমায় বোঝাতে চাইলেন, তিনি জাহাজে চাকরী করে এসেছেন। প্রথমটায় আমি অবিশ্বাস করিনি।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির নেতাদের সঙ্গে তো তাঁর দেখা হলো না। নলিনী এবার ফিরে যেতে প্রস্তুত।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করে যাচ্ছেন?"

"জাহাজে চাকরী করে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "পেয়েছেন জাহাজ"?

নলিনী উত্তর দিলেন, "দাউদ সাহেবকে ধরেছি"।১

একথা শোনার পরের দিন আমি দাউদ সাহেবের বাড়ীতে গেলাম। আগে হতে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করার পরে তিনি আমায় বললেন নলিনী গুপ্ত নামে একজন বিপ্লবী এরকম সাহায্য চাইছিলেন বটে। মনে মনে আমি আশ্চর্য হলাম। এরকম খোলাখুলি বললে কে সাহায্য করতে আসবেন? আমাদের দ্বীপের লাস্তিলয়ালারা (নাবিকদের বোর্ডিং কীপার্স) কলকাতায় আছেন। তাঁদের একজনের কাছে যেতে তিনি বললেন, "আমার তো ডেকের লোকের সঙ্গে কারবার। আপনার লোকটি ডেকে কাজ করে যেতে রাজী হলে আমি সাহায্য করতে পারি। নলিনীকে জিজ্ঞাসা করায় বললেন, তিনি নিশ্চয় ডেকে যাবেন। যে সেরাং নলিনীকে নিয়ে যাবেন তাঁর সঙ্গে বোর্ডিং মাস্টার আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি সেরাংকে সঙ্গে করে নলিনীর নিকটে নিয়ে এলাম। নলিনী বললেন ইউরোপের যে কোনো পোর্টে তাঁকে নামিয়ে দিলে তিনি যেতে পারবেন। সেরাং বললেন, তাঁর বোটের গন্তব্যস্থল আমেরিকা। কলম্বো ও একটি ফরাসী পোর্টে জাহাজ থামবে। ফরাসী পোর্টটির নাম বললেন, ওরান। ওটা আলজিরিয়ার পোর্ট। নলিনী বললেন, তাইতেই হবে। ব্যবস্থা হয়েছিল এই যে যেদিন জাহাজ কলকাতা ছাড়বে সেদিন সেরাং-এর একজন লোক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়বে। তার জায়গায় সেরাং যে কোনো লোককে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। আমরা সেরাংকে একশ' টাকা দিলাম। নলিনীর তথাকথিত বন্ধুরা পরে রটিয়েছেন যে সেরাংকে তিনশ' টাকা দেওয়া হয়েছিল। নলিনী কিন্তু পুলিসের নিকটে বিবৃতিতে বলেছেন যে সেরাংকে একশ' টাকাই দেওয়া হয়েছিল। মোট কথা, এক দিন রাত্রে আমি নলিনীকে খিদিরপুর ডকের কোনো একটি বার্থে জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে এলাম। এর একদিন কিংবা দুদিন আগে নলিনী গুপ্তের সঙ্গে ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের দেখা হয়েছিল।

নলিনী চলে যাওয়ার পরে আমি ৩/৪সি তালতলা লেনের বাসা ছেড়ে দিয়ে ১০/১, ব্রাইট্ স্ট্রীটে উঠে গেলাম।

১ মুহম্মদ দাউদ ইণ্ডিয়ান সি-মেন্স্ ইউনিয়নের জেনেরেল সেক্রেটারি, তখন আলীপুর কোর্টের উকীল, পরে হাইকোর্টের ব্যারিস্টার। এখন বেঁচে নেই।

নলিনীর কাণ্ড-কারখানার অনেক কথা এখনও বলা হয়নি। তিনি দু'জন লোককে রিক্রুট করেছিলেন। তাঁদের নিয়ে এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। একজনের নাম যতীন্দ্রনাথ মিত্র। ঢাকা শহরের ফরাসী (তখনকার দিনে ছিল) ইলাকায় বাড়ী। খুলনা জিলার কুখ্যাত ঘুসখোর পুলিসের দারোগা কামিনীকুমার মিত্রের ছেলে। তখন তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন। যতীন্দ্রনাথ মিত্র বি· এ· পাস। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। তাঁর বাড়ী ছিল নলিনীদের বেলদাখান গ্রামে। কিন্তু তাঁর পিতা সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করায় তিনি বানরীপাড়ার দিকে মাতামহের নিকটে মানুষ হয়েছিলেন। মাতামহ ছিলেন একজন দেশবিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। যতীন মিত্র ছিলেন একজন স্বার্থ-পর, অরাজনৈতিক ব্যক্তি, আর রমেশ দাশগুপ্তের নেশা ছিল রাজনীতি। সঙ্গে সঙ্গে উদরান্নের জন্যে কিছু রোজগারও করতে চাইতেন। সুশিক্ষিত যুবক। যতটা মনে করতে পারছি গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন হতে বি· এ· পাস করেছিলেন। ত্যাগের দৃঢ়তা তাঁর মধ্যে ছিল। স্থির হয়েছিল দু'জনই পাসপোর্ট নিয়ে জার্মানী যাবেন। যতীন মিত্র আগেই পাসপোর্ট পেয়েছিলেন। রমেশ দাশগুপ্ত পেয়েছিলেন কিনা তা আমার মনে নেই। আমি নলিনীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এঁদের কি জন্যে জার্মানী নিয়ে যাচ্ছেন? নলিনী গুপ্ত বললেন, এঁরা কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের খরচে কিছু বিদ্যা শিখবেন, আর কাজ-কর্মে আমাদের সাহায্য করবেন। বললেন, জানেন তো আমি প্রায়ই অসুস্থ থাকি, কমপক্ষে চিঠি-পত্রগুলি ডাকে দেওয়ার কাজ এঁরা করতে পারবেন। যতীন মিত্রের নিকটে পাসপোর্ট তো ছিলই, রাহা খরচও ছিল। তিনি বাড়ীতে ব'লে ক'য়ে এসেছিলেন। কথা ছিল নলিনী গুপ্ত জার্মানীতে পৌঁছেছেন খবর পেলে যতীন মিত্র এখান থেকে রওয়ানা হবেন। রমেশ দাশগুপ্ত যাবেন তার পরে। এঁদের দু'জনের জার্মানী যাওয়া সম্বন্ধে নলিনী আমায় যা বলেছিলেন তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে নলিনীই হবেন ভারত ও কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের মধ্যে যোগসূত্র। সে বিদ্যাবুদ্ধি ও যোগ্যতা যে তাঁর ছিল না সে-কথা তিনি একবারও ভাবেননি।

নলিনী গুপ্তকে আমি খিদিরপুর ডকে জাহাজে চড়িয়ে দিয়েছি, তিনি ইউরোপে পৌঁছে যাবেন এবং তাঁর পৌঁছাবার খবর কিছুকাল পরে পেয়ে যাব এই আশায় আমি রয়েছি, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন কলম্বো হতে নলিনীর এক সুদীর্ঘ পত্র এলো। পত্রে তিনি যা লিখেছেন তা পড়ে আমি হতভম্ব হয়ে পড়ি। নলিনী গুপ্ত লিখেছেন ঃ সেরাং আমাদের মিথ্যা কথা বলেছেন। এই জাহাজ ইউরোপের কোনো পোর্টে থামবে না, কলম্বো হতে সোজা চলে যাবে আমেরিকায়। নলিনীকে দিয়ে সেরাং কঠিন কাজ করিয়েছেন। কাছি টেনে টেনে তাঁর হাতে ফোস্‌কা পড়ে গেছে, ইত্যাদি। জাহাজ কলম্বো পৌঁছানোর আগেই নলিনী সব কথা ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দেন। ক্যাপ্টেন বলেন তিনি কলম্বো পোর্টে নলিনীকে নামিয়ে দিবেন, তবে তাঁকে নিরাপদে গেটের বাইরে পৌঁছিয়ে দিতে তিনি পারবেন না। রাত্রি বেলা নিজ দায়িত্বে নলিনী জাহাজ হতে নেমে পড়েন। গেটে দরওয়ান খানিকটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। নলিনী লিখেছেন তিনি সেই সুযোগে গেটের বাইরে চলে আসেন। তারপরে, তিনি লিখেছেন, যা হবার হয়েছে, টাকা পেলে তিনি কলম্বো হতেই ইউরোপে চলে যেতে পারবেন। চার শ' টাকা তিনি চেয়েছেন

আমার কাছ থেকে। আর লিখেছেন যতীন মিত্রকে আমি যেন সঙ্গে সঙ্গেই কলম্বো পাঠিয়ে দিই।

এখন কথা হচ্ছে যে টাকা আমি কোথায় পাই? আমার নিকটে কোনো টাকা ছিল না, নলিনী কোনও টাকা আমাকে দিয়েও যাননি। আমি যতীন মিত্র ও রমেশ দাশগুপ্তকে খবর দিলাম। যতীন মিত্র কলম্বো, অর্থাৎ জার্মানী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। তাঁর অন্য কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। তাঁর ধারণা যে আমাকেই টাকা বার করে দিতে হবে। রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত অন্য ধরনের লোক। তিনি আমার অবস্থা গভীর সহানুভূতির সহিত বিচার করার চেষ্টা করলেন। বললেন, "টাকার জন্যে আমায় যেখানেই আপনি পাঠাবেন, আমি যাব"। কিন্তু, কোথায়া পাঠাব আমি তাঁকে? রামচন্দ্র ভট্টাচার্য (পরে ডক্টর রামচন্দ্র ভট্টাচার্য) বার্লিনে নলিনীর ছাত্রবন্ধু ছিলেন তাঁকে ভরোসা করেই নলিনী বার্লিনে এম· এন· রায়ের স্থলাভিষিক্ত হতে চেয়েছিলেন। কলকাতায় নলিনী যখন আমার নিকটে ছিলেন তখন তিনি রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের এক বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি ছিলেন বর্ধমানের বিশিষ্ট উকীল নলিনাক্ষ বসুর নাতি (পৌত্র)। তাঁব নাম বিজয় বসু। রমেশ দাশগুপ্তকে আমি তাঁর নিকটে পাঠালাম। সব খবব শুনে বসু কলকাতা এলেন এবং আমার হাতে একশত টাকার একখান নোট দিলেন। এই নোটখানাও আমি যতীন মিত্রকে দিয়ে তাঁকে কলম্বোব পথে রওয়ানা কবে দিলাম।

কিন্তু নলিনীকে পাঠাবার জন্যে আমি টাকার চেষ্টা করতে থাকলাম। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে আমি খুঁজিনি। কারণ, তিনি টি· বি· রোগী নিয়ে কলকাতার বাইরে ছিলেন। তাঁদের অন্য কোনো লোকের সঙ্গে তখনও আমার পরিচয় ছিল না। অনেক চিন্তা করার পরে আমি একদিন রাত্রে আবদুর রজ্জাক খানের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ১৯১৩ সাল হতে আমি কলকাতার বাশিন্দা। মৌলবী মুহম্মদ আকরম খানের সাপ্তাহিক "মোহাম্মদী" পত্রিকার অফিসে আমি যাতায়াত করতাম। এই সূত্রে আবদুর রজ্জাক খানের সহিত আমার পরিচয়। তিনি তখন কলকাতা মাদ্রাসার আরবী বিভাগে পড়তেন। মৌলবী মুহম্মদ আকরম খানের তিনি নিকট আত্মীয়,—মাসতুত ভাই ছিলেন, পরে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেছেন। রাজনীতির দিকে তাঁর খুবই টান ছিল। ভাবী সংগ্রামে কাজে লাগতে পারে ভেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্সে ভর্তি হয়ে সৈনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু এই শিক্ষার জোরেই ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে জেনেরেল অফিসার কমাণ্ডিং হয়েছিলেন। যাক সে কথা। ওই সময়ে আবদুর রজ্জাক খান হাকীম মসীহুর রহমানের ছেলে সাম্‌সুজ্জমানের সহিত ভাগে উর্দু ভাষায় একখানা দৈনিক নিউজ শীট্ বার করেছিলেন। আপার চীৎপুর রোডে হাকীম সাহেবের দাওয়াইখানার তেতলায় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি এবং নলিনী সংক্রান্ত সব কথা তাঁকে বলি। কলম্বোতে নলিনীকে পাঠাবার জন্যে তাঁর নিকট হতে আমি টাকাও চাই। তিনি বললেন পরের দিন তিনি কথাটা তাঁর দলের নিকটে তুলবেন। বুঝলাম তিনি একটি গোপন দলের সহিত সংসৃষ্ট। আমি তখন বালীগঞ্জে ১০/১, ব্রাইট স্ট্রীটে থাকি। পরের দিন রাত্রে খান সাহেব একজন বাঙালী ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়ীতে এলেন। তাঁদের দলের তহবীল ও অন্য বিশেষ কাজের জিম্মায় ভদ্রলোকটি রয়েছেন ব'লে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং বললেন যে তাঁকে আমার কথাগুলি জানানো হয়েছে। আমার কথাগুলি মানে নলিনীকে পাঠানোর

জন্যে টাকার কথা। ভদ্রলোকটি আমায় বললেন যে টাকা জোগাড়ের জন্যে তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করবেন। কি চেষ্টা তিনি করেছিলেন তা আমি জানিনে, পরে তিনি আমায় বলেছিলেন যে অনেক চেষ্টা করেও তিনি টাকা জোগাড় করতে পারেননি। তবে, আমাদের প্রদর্শিত রাজনীতিক পথে তিনি চলবেন ব'লে ওয়াদা করলেন। আবদুর রজ্জাক খানও সেই ওয়াদা আগে করেছিলেন।

আগেই আমি বলেছি, যতীন্দ্রনাথ মিত্র কলম্বো চলে গিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস ছিল সেখান থেকে তিনি জার্মানী চলে যাবেন। কিন্তু একদিন সন্ধ্যার পরে হঠাৎ তিনি আমার বাসস্থানে এসে হাজির। বললেন নলিনী গুপ্ত কলম্বোতে গিরেফ্‌তার হয়ে গেছেন। তবে, টাকা পেলে তিনি চলে যেতে পারবেন, অর্থাৎ তিনি যদি ইউরোপে চলে যেতে চান তবে সিংহলের ব্রিটিশ পুলিস তাঁকে পশ্চিম ইউরোপে চলে যেতে দিবেন। এই কথা বলে তিনি আমার অতি দুর্বল ঘাড়ে চেপে বসে পড়লেন, আর টাকা সংগ্রহের জন্যে আমায় অতিষ্ঠ করে তুলতে লাগলেন। বোঝেন না আমি টাকা পাব কোথায়। রমেশ দাশগুপ্ত আর আমি ভাবি যতীন মিত্র কেন কলকাতায় এসে আমার ঘাড়ের ওপর বসে পড়লেন? কী তাঁর মনের বাসনা? শেষে একদিন রমেশ দাশগুপ্ত আসল ঘটনা আবিষ্কার করলেন। যতীন মিত্রের লেখা কিছু হিসাব তাঁর কাগজপত্র হতে বা'র হয়ে পড়ল। তাতে দেখা গেল যে নলিনী গুপ্ত তাঁর টাকায় জাহাজে টিকেট কিনে প্যাসেঞ্জার হয়ে ইউরোপে চলে গেছেন। তিনি যতীন মিত্রকে বলে গেছেন যে ইউরোপে পেঁ'ছে তাঁকে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে। সেই টাকা এলে তিনি যাবেন। এ কথাটাই ঠিক তা এইজন্যে বোঝা গেল যে নলিনীর জার্মানী পেঁ'ছানোর কিছুদিন পরে আমার নামে সুইস্‌ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের লন্ডন শাখার বরাবরে একত্রিশ পাউন্ডের একখানা চেক এল। সেই চেকখানা ডেণ্টাল সার্জন ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্তের হিসাবে জমা দিয়ে ক্যাশ করানো হয়েছিল। সব টাকাই যতীন মিত্রকে দেওয়া হয়েছিল। যতীন মিত্র প্রায় খোলাখুলি ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্তকে বলছিলেন যে টাকাটা আমি মেরে দিতে পারি।

জার্মানীতে গিয়ে এই যতীন মিত্র আমাদের পার্টির ওপরে বোঝা স্বরূপ হয়েছিলেন। এম· এন· রায় দুঃখ করে আমায় লিখেছিলেন, যতীন মিত্রকে এদেশে এনে 'কুমার' (নলিনী গুপ্তের দ্বিতীয় নাম) কি ভুলই না করেছে। লোকটি অপদার্থ ও অ-রাজনীতিক। তার নিকটে বৈধ পাসপোর্ট আছে। তাকে খবর নিয়ে দেশে যেতে বললাম। সে কিছুতেই যেতে রাজী নয়। যতীন মিত্র ওদেশে কিছু কাজ শিখতে চেয়েছিলেন। দেশে ফেরার পরে দেখা গেল যে জার্মান ভাষা ছাড়া আর কিছুই তিনি শিখেননি। কি একটা কাঠ চেরার মেশিন বসাবার কাজ নাকি তিনি শিখেছিলেন। কিন্তু তা থেকে তাঁর কোনো চাকরী কোনো দিন হয়নি। যতীন মিত্র আর বেঁ'চে নেই।

কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা (ভারত গবর্নমেন্‌টের দেওয়া নাম) সংক্রান্ত ন্যাশনাল আরকাইবের কাগজ-পত্র পড়ে দেখা যাচ্ছে যে যতীন মিত্রের নাম বারে বারে উল্লিখিত হয়েছে। সেক্রেটারী অফ্‌ স্টেট ফর্‌ ইণ্ডিয়া দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত যতীন মিত্রের সম্বন্ধে ভারত গবর্নমেণ্টকে শুধু পত্র লিখে মনে সান্ত্বনা পাচ্ছে না, তারও পাঠাচ্ছেন। আমার মনে হয় ভারতের সেন্‌ট্রাল ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর জার্মানীতে অবস্থিত এজেণ্ট অকারণে স্টেট সেক্রেটারি ও ভারত গবর্নমেণ্টকে উত্তেজিত ক'রে তুলেছিলেন। অনেকে আমার নিকটে জানতেও চান যে এই যতীন মিত্র কে? রমেশ দাশগুপ্ত আর বেঁ'চে নেই। আমি

মরে গেলে যতীন মিত্রের এই ব্যাপারের বিষয়ে সত্য কথা বলবার আর কেউ থাকবেন না। এই কারণে এখানে তাঁর বিষয়ে আমায় কিছু লিখতে হলো।

মিথ্যা বলতেই নলিনী গুপ্ত অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর মিথ্যা কথাগুলি ধরাও পড়তে লাগল। তিনি আমাদের বলেছিলেন, জাহাজে চাকরী করে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। কলম্বোর ব্যাপারে ধরা পড়ে গেল যে তাঁর নিকটে ব্রিটিশ পাসপোর্ট ছিল। কলম্বো হতে টিকেট কিনে জাহাজের যাত্রী হয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে তিনি পশ্চিম ইউরোপে চলে গেলেন। আবার তিনি জাহাজের যাত্রীরূপে যে কলম্বো হয়ে দেশে ফিরেছিলেন সেটাও তাঁরই কারণে জানাজানি হয়ে গেল। নলিনী যখন জাহাজে দেশে ফিরছিলেন তখন তিনি তাঁর এক সহযাত্রীকে ৫ পাউন্ড ধার দেন। এই সহযাত্রী ছিলেন জাকার্তার লোক। জাকার্তার লোকের ঠিকানা আবার নোট বুকে লিখে রেখেছিলেন নলিনীর একজন ইউরোপীয় সহযাত্রী (নলিনীর মতে আইরিশম্যান)। তিনি কলকাতা আসছিলেন। কলম্বো হতে লিখিত পত্রে নলিনী আমায় অনুরোধ করেন যে আমি যেন কত নম্বর গঙ্গাধর বানার্জি লেনে গিয়ে সেই আইরিশম্যানের নিকট হতে জাকার্তার লোকের ঠিকানা নিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিই। ঠিকানা আনতে গিয়ে আইরিশম্যানের নিকট হতে আমি জানতে পাই যে নলিনী তাঁর টিকেট-কেনা সহযাত্রী ছিলেন। ১৯২৩ সালে কলকাতা পুলিসের নিকট বিবৃতি দিতে গিয়ে নলিনী বলেছেন যে তিনি ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী ছিলেন এবং প্রথমবারে মার্সাই (Marseilles) হতে ফরাসী জাহাজ Aukor-এর যাত্রীরূপে কলম্বো পৌঁছেছিলেন।

* *

যে সেরাং নলিনী গুপ্তকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সফর (Voyage) হতে ফিরে আসার পরে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমায় বললেন নলিনী গুপ্ত (জাহাজে অন্য নাম ছিল) তাঁকে বিপদে ফেলেছিল। তাতে তাঁর চাকরী তো চলে যেতই, বোর্ডিং মাস্টারেরও লাইসেন্স বাতিল হয়ে যেত। সেরাং বললেন নলিনীকে একেবারে কাজ না করিয়ে নিয়ে গেলে তিনি ক্যাপ্টেনের নিকটে ধরা পড়ে যেতেন। কিছু কাজ না করিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। নলিনী কাজ করতে চাইছিলেন না। কলম্বো পৌঁছাতে তখনো দেরী আছে, নলিনী সেরাংকে বলেন যে তিনি বিপ্লবী. ক্ষুদিরামের দলের লোক, ইত্যাদি। এখানেও তিনি থামেনান, সোজা ক্যাপ্টেনের নিকটে চলে গিয়ে সব কথা বলে দেন। সেকেন্ড অফিসার সুপারিশ করে সেরাং ও বোর্ডিং মাস্টারকে বাঁচিয়ে দিলেন। অর্থাৎ ক্যাপ্টেন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো রিপোর্ট করলেন না। নলিনী গুপ্তকে কলম্বো পোর্টে নামিয়ে দেওয়া হয়। সেরাং একথাও আমায় বললেন যে জাহাজ সত্যই একটি ফরাসী পোর্টে থেমেছিল। আমাকে তিনি শিপিং আফিসে গিয়ে কাগজ-পত্র অনুসন্ধান করতে বললেন, কোম্পানীর কলকাতা আফিসেও অনুসন্ধান করতে বললেন। আমি সে-সব কিছু করিনি। পরে আমার অনুতাপ হয়েছিল এই জন্য যে আমার স্যালুনে চেষ্টা করা উচিত ছিল। স্যালুন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট সামাদ খানের সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল। স্যালুনের কাজ ডেকের মতো কষ্টকর নয়। নলিনী নিজেই দাউদ সাহেবকে ধরেছিলেন বলে আমি ডেক-ওয়ালাদের নিকটে যাই। ইন্ডিয়ান সিমেন্স ইউনিয়ন ডেক ও ইঞ্জিন রুমের ক্রুদের নিয়ে গঠিত ছিল।

আসলে জাহাজে চাকরী করতে গিয়ে নলিনী আমাদের নিকটে মিথ্যা অভিনয়

করেছিলেন। পাসপোর্ট যাঁর নিকটে ছিল, প্যাসেঞ্জার হয়ে যাওয়ার পক্ষে যাঁর পথে কোনো বাধা ছিল না, তাঁর পক্ষে জাহাজে চাকরী করার কি প্রয়োজন?

*　　　　*　　　　*

তারপরে, ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলের গেট হতে কানপুর পর্যন্ত পুলিসের হেফাজতে নলিনী আর আমি এক সঙ্গে যাই। কানপুর জেলেও একত্রে থাকি। ১৯২২ সালের মার্চ মাসে নলিনীকে আমি যে কলকাতার খিদিরপুর ডকে জাহাজে তুলে দিয়েছিলেম তারপরে তাঁর সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখা। জেলে গিয়ে নলিনীর সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয় তা এইরূপ ঃ

আমি। কলম্বোতে কি ঘটেছিল?

নলিনী। চিঠিতে আমি সত্যই লিখেছিলেম যে জাহাজ কলম্বো হতে সোজা-সুজি আমেরিকা চলে যেত। তাই কলম্বো নেমে যেতে বাধ্য হই।

আমি। আপনি তো যতীন মিত্রের টাকায় টিকেট কিনে ইউরোপে চলে গেলেন, তবে কেন আমার নিকটে খবর পাঠালেন যে আপনি কলম্বোতে গিরেফ্তার হয়ে আছেন?

নলিনী। যতীন মিত্র মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছে। আমি সত্য কথা আপনাকে জানাতে বলেছিলেম। আমি তাকে বলেছিলেম যে আপনার নিকটে টাকা পাঠানো হবে। সেই টাকায় সে জার্মানী চলে যাবে।

আমি। আপনার নিকটে তো পাসপোর্ট ছিল। তবে আপনি জাহাজে চাকরী করে যাওয়ার কেলেংকারিটা করতে গেলেন কেন? পাসপোর্ট না থাকলে আপনি কলম্বোতে জাহাজের টিকেট কিনতে পারতেন না।

নলিনী। আমার নিকটে কোনো পাসপোর্ট ছিল না। ওই সময়ে ভারতীয় ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোকেরা কলম্বোতে গিজগিজ করছিলেন। তাঁদের ভিতরে বাঙলার অফিসাররাও অনেকে ছিলেন। কারণ, প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌ সিংহল হয়ে দেশে ফিরছিলেন। আমার সঙ্গে এই ইন্‌টেলিজেন্স অফিসারদের দেখা হয়। তাঁরা আমায় বলেন, "আপনি একজন বিপজ্জনক বিপ্লবী। আপনি আবার ভারতবর্ষে ফিরে যান এটা আমরা চাইনে"। তাঁদের এই কথায় সিংহল গবর্নমেণ্ট একজন ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজা ব'লে আমাকে একটা পরিচয়পত্র (Identification Certificate) দিলেন। তার বলেই আমি যাত্রীরূপে জাহাজে চড়ার টিকেট কিনতে পেরেছিলেম।

নলিনী গুপ্তের পুলিসের নিকটে দেওয়া বিবৃতি হতে এখন বুঝতে পেরেছি যে তিনি আগাগোড়া মিথ্যা কথা বলেছিলেন।

নলিনী গুপ্তের বিষয়ে দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরে আমায় আরও অনেক লিখতে হবে। তার হাতে মানবেন্দ্রনাথ রায় তো বোকা বনেছিলেনই, আমরাও তার দ্বারা দীর্ঘকাল প্রতারিত হয়েছি। তার কাজকর্ম হতে বারে বারে মনে সন্দেহ জেগেছে বটে, তবে সেই সন্দেহকে আমরা মন হতে বারবার মুছে ফেলার চেষ্টা করেছি। ১৯২৭ সালে সে যে এদেশ হতে চলে গেল তার পরে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। জার্মানীতে হিটলার ক্ষমতা দখল করার পরে তার সঙ্গে আমাদের পার্টির কোথাও কোনো সম্পর্ক ছিল বলে আমার মনে হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নলিনী দেশে ফিরেছিল। কি করে ফিরেছিল এবং দেশে এসে কি করে জীবিকা নির্বাহ করত তা আমরা জানিনে। আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা সে করেনি। তার ভাইপোদের উপরে তার নিষেধাজ্ঞা ছিল

যে তারা যেন কখনও কমরেড আবদুল হালীমের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না করে। হালীমের সঙ্গেই তাদের পরিচয় ছিল।

১৯২১ সালে নলিনী গুপ্ত যে এম. এন. রায়কে ধাপ্পা দিয়েছিল তার উল্লেখ আমি আগে করেছি। কিন্তু রায়ের স্মৃতিকথা পড়ার আগে আমরা জানতে পারিনি যে কি কি মিথ্যা কথা বলে নলিনী গুপ্ত রায়ের বিশ্বাস অর্জন করেছিল। আমাদের যদি তা জানা থাকত তবে ১৯২২ সালেই আমরা রায়কে সাবধান করে দিতে পারতাম। ১৯১৪ সালের পরে (পুলিসের নিকটে নলিনী ১৯১৫ বলেছে) যে ১৯২১ সালেই নলিনী গুপ্ত দেশে ফিরেছিল এবং ১৯২২ সালের মার্চ মাসে তার দেশ ছাড়ার পূর্বক্ষণে একমাত্র ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ছাড়া অন্য কোনো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতা যে তার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হননি, এই সত্য খবরগুলি আমি অন্তত ১৯২২ সালেই তাঁকে জানাতে পারতেম। নলিনীর কথাবার্তা হতেও তাঁর মনে কোনো দিন কোনো প্রশ্নোদয় হলো না এটা বড় আশ্চর্য কথা। জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতা দখলের পরেও সেদেশে নলিনী তার রেস্তোরাঁ চালিয়ে গেল, অথচ অন্য কোনো ভারতীয় কমিউনিস্ট জার্মানীতে থাকতে পারলেন না,—এই থেকেও মানবেন্দ্রনাথের মনে কোনো প্রশ্ন জাগেনি। নলিনীর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখেই শেষ জীবনে তিনি তাঁর স্মৃতিকথা লিখে গেছেন।

*   *   *

নলিনী গুপ্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে ধাপ্পাবাজী করেছে। আমাদেরও সে অনেক ধাপ্পা দিয়েছে। তবুও আমাদের নাম-ধাম মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নিকটে, অতএব কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের নিকটেও সে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এটা তাকে করতেই হতো। কিন্তু আন্দোলনের কাজ শুরু করতে না করতেই আমার যে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের সহিত সংযোগ স্থাপিত হয়ে গেল তার জন্যে আমি নলিনীর নিকটে কৃতজ্ঞ।

বোম্বেতে পার্টি গঠন

বোম্বেতে কমিউনিস্ট পার্টির শুরু কিভাবে হয়েছিল এখন আমি সে কথা বলব। বোম্বের উইলসন কলেজ খ্রীস্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত। বাইবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত না হলেও এই কলেজের কর্তৃপক্ষ বাইবলের ক্লাসে যোগ দেওয়া ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে ছাত্ররা তীব্র আন্দোলন করেন। কলেজের জুনিয়ার বি. এ. ক্লাসের ছাত্র শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে এই আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে ছিল। এই জন্যে তাকে কলেজ হতে বহিষ্কৃত (rusticated) করা হয়। অন্য ছাত্ররাও বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। তাঁদের সকলের নাম আমি জানিনে, তবে ইন্টারমেডিয়েট ক্লাসের ছাত্র রঘুনাথ শিবরাম নিম্বকারও যে বহিষ্কৃত হয়েছিল এটা আমি জানি। এদের দু'জনাই পরস্পরের বন্ধু ছিল, উভয়ই সুবক্তা। এটা ১৯১৯ বা ১৯২০ সালের কথা। কলেজ হতে বহিষ্কৃত হয়ে নিম্বকার একটা দোকান খুলেছিল। এই দোকানের তরফ হতে সে কোনো কাগজের ব্যবসায়ীকে একখানি চেক দেয়। ব্যাংক টাকা ফুরিয়ে যাওয়ায় চেকের গ্রহীতা টাকা পেলেন না। চেকের লেন-দেনের ব্যাপারে মাঝে মাঝে এই রকম ঘটতে আমরা অনেক দেখেছি। কিন্তু নিম্বকারেব বিরুদ্ধে তার জন্যে ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দমা হলো এবং তার ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডও হয়ে গেল। জেল হতে মুক্তি পেয়ে নিম্বকার দোকান তুলে দিয়ে মুলসিপেটা (মুলসিপেটা জায়গার নাম) সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে (১৯২১-২২) আবার সে জেল খাটল।

"গান্ধী বনাম লেনিন" রচনা

কলেজ হতে বহিষ্কৃত হয়ে ডাঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। এই আন্দোলন অকৃতকার্য হওয়ার পরে ডাঙ্গে ও তার বন্ধুদের উদ্যোগে বোম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভিতর একটি 'র‍্যাডিকাল গ্রুপ' গঠিত হয়েছিল। কিন্তু আমার আসল বক্তব্য তা নয়। ইতোমধ্যে ডাঙ্গে কিছু কিছু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পড়াশুনা করেছিল। তার ফলে সে রচনা করল তার ছোট ইংরেজি পুস্তক "গান্ধী বনাম লেনিন"১। ডাঙ্গে আমায় বলেছিল যে ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে এই পুস্তকখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা অবশ্য ১৯২২ সালের শেষার্ধের আগে এই পুস্তক দেখিনি। এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে ডাঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দিকে ঝুঁকেছিল। ১৯২২ সালে ভারতের কমিউনিস্টরা বার্লিনে আফিস স্থাপন করেন। তখন থেকে আমাদের ডাকে পাঠাবার সব কিছু বার্লিনে পাঠানো হতো।

"গান্ধী বনাম লেনিন" এখন দুষ্প্রাপ্য। এই পুস্তকের লেখার বিষয়ে এখন

১ Gandhi versus Lenin

আমি জোরের সঙ্গে কিছুই বলতে পারব না। আমার স্মৃতি হতে পুস্তকখানির বিষয়বস্তু মুছে গেছে বললেও তেমন অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু পুস্তকের এক জায়গায় সংক্ষেপে মুদ্রিত গান্ধী ও লেনিনের তুলনা "গণবাণী"তে উদ্ধৃত হয়েছিল। সেই উদ্ধৃতি আমি এখানেও ছেপে দিলাম। তা থেকে "গান্ধী বনাম লেনিন" সম্বন্ধে সকলে একটা ধারণা করে নিতে পারবেন।

সম উদ্দেশ্যে

বর্তমান সামাজিক গ্লানিগুলিকে নষ্ট করা, বিশেষ করে গরীবদের দুঃখ-কষ্ট দূর করা এবং যথেচ্ছাচারকে ধ্বংস করা।

গান্ধীর মতে মানুষের দুঃখ-কষ্টের কারণ ঃ	লেনিনের মতে মানুষের দুঃখ-কষ্টের কারণ ঃ
বর্তমান সভ্যতা, বিশেষ করে আধুনিক শিল্পানুষ্ঠানসমূহ এবং তদ্দ্বারা সঞ্জাত মানুষের দুষ্কর্মসমূহ।	ধনিকদের দ্বারা উৎপাদনের উপায়সমূহ ও ভূমি ইত্যাদি অধিকার, আর্থিক বৈষম্য এবং তার দ্বারা আত্মোৎপন্ন সম্পদে বঞ্চিত সম্প্রদায়ের দারিদ্র্যে অবনমন, অথচ এ সম্প্রদায়েরই দ্বারা মানবসমাজের বেশীরভাগ গঠিত।

প্রতিকার

আধুনিক সভ্যতার সত্তা ও কলকব্জার বিনাশ সাধন।	বর্তমানের অর্জিত বস্তুগুলিকে রেখে দেওয়া এবং সেগুলিকে সর্ব-সাধারণের হিতের জন্য ব্যবহার করা, অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়সমূহকে সর্ব সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করে যে অতিরিক্ত মূল্য (surplus value) এখন ধনীর পকেটে যাচ্ছে সেটাকে কাজে লাগানো।

ক্রমসমূহ

১। ধনিকের যথেচ্ছাচার ও অন্য সকল প্রকারের যথেচ্ছাচারকে অবশ্যই বিদূরিত করা।	১। ধনিকের যথেচ্ছাচার ও অন্য সকল প্রকারের যথেচ্ছাচারকে অবশ্যই বিদূরিত করা।
২। যথেচ্ছাচার শক্তির উপরে বিন্যস্ত রয়েছে।	২। যথেচ্ছাচার শক্তির উপরে বিন্যস্ত রয়েছে।
৩। সৈন্যদলে, খাজনা আদায়ের কাজে ও যথেচ্ছাচারীদের আইন প্রয়োগের কাজে যোগ দিয়ে বা সহ-যোগিতা ক'রে এ শক্তিকে সম্ভবপর ও রক্ষা করেছেন তাঁরাই যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন।	৩। নির্যাতিতেরা স্বেচ্ছায় যোগ দেননি, জোর ক'রে তাঁদের যোগ দেওয়ানো হয়েছে. আর এ জোর নির্যাতিতদের মধ্য হতে সরবরাহ করা হয়েছে এমন কোনো কথা নেই।

৪। সকলেই অসহযোগ করুক, সৌধ আপনা হতেই ভেঙে পড়বে।

৫। ধর্ম ও নিরুপদ্রবতাই কেবলমাত্র একাজ সফল করতে পারে। কেন না ধর্ম আধুনিক অর্জিত অবদানসমূহের শূন্যতা কোথায় তার শিক্ষা দিবে। উপদ্রবের দ্বারা উপদ্রবই পাওয়া যাবে, আর নিরুপদ্রব অনুসৃত হবে নিরুপদ্রবেরই দ্বারা। ইতিহাসে বিপ্লবসমূহের যে অবস্থা দেখা গিয়েছে তাতে যথেচ্ছতন্ত্রের মূলোৎপাটনের সঙ্গে সঙ্গেই একটা ব্যবস্থাহীনতা দেখা দিয়ে থাকে। নিরুপদ্রবতা এ ব্যবস্থাহীনতা নিবারণ করবে।

৬। ধর্ম ও নিরুপদ্রবতার হাতে যখন যথেচ্ছতন্ত্রের পতন হবে, তখন তার ফলে সমাজে একটা ধর্ম-শৃঙ্খলা স্থাপিত হবে। কাজেই, নবকরণের শূন্যতায় সচেতন ধর্ম-সত্তা সর্বসাধারণের ভালোর জন্য নবকরণকে ধ্বংস করবে। মানুষ ও মানবতার বিবেক বিধিই তখন সমাজ-বিধিতে পরিণত হবে। বিবেক তার স্বভাব অনুসারে সামাজিক মঙ্গলের জন্যে কাজ করবে। ধনিক-মজুরের গ্লানি, শ্রেণীসংগ্রামের গ্লানি, এরূপ সমাজ হতে দূর হবে। অতএব, মানুষকে পবিত্র কর।

৪। সকলে কখনো তা করবেন না, কেন না বর্তমান নির্যাতনের সহিত সমাজের অল্প সংখ্যক লোকের স্বার্থ বিজড়িত রয়েছে। অধিকাংশ লোকই কেবল এ সৌধ ভাঙার জন্য কাজ করবেন এবং এ কাজের অনুসরণও করবেন অধিকাংশ লোক।

৫। ধর্ম, নিরুপদ্রবতা এবং মানুষের এই শ্রেণীর অন্য কোনো ইচ্ছার দ্বারা অত্যাচার দূর হবে না। যথেচ্ছতন্ত্র মুক্তিদাতৃগণের বংশসমূহকে নির্মূল করা পর্যন্ত অগ্রসর হবে। কাজেই, এর মূলোৎপাটন ও নিবারণ নিতান্তই করা উচিত এরই উদ্ভাবিত উপায়সমূহের দ্বারা। যথেচ্ছতন্ত্রের পতনের পরে যে ব্যবস্থাহীনতা আসবে সেটা স্থায়ী জিনিস হবে না। ব্যবস্থাহীনতায় বিরক্ত মানুষ শীঘ্রই আবার একটা শৃঙ্খলায় বিবর্তিত হবে। ইতিহাস এরূপই বরাবর দেখিয়েছে।

৬। খুব বেশী রকম অগ্রসর হতে না পারলে, অনেকগুলি বাইরের শক্তির দ্বারা বিবেকের অনুজ্ঞাগুলি ঘোষিত হয়ে যায়। উন্নতবিবেক সাধারণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না এবং এর বিবর্তনের জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী আরশ্যক হয়। এ কারণে সর্বধারণের হিতের জন্য সকল মানুষকে কাজ করতে বাধ্য করা একান্ত আবশ্যক। ধনিকেরা এরূপ করতে রাজী হবেন না। তাই সর্বহারাদের উচিত তাদের একনায়কত্ব (dictatorship) প্রতিষ্ঠিত করে এই কাজটি করা। বাধ্যতার দ্বারা সর্বসাধারণের ভালোর জন্যে কাজ করতে ও সকল জিনিসকে রক্ষা করতে একটা অভ্যাস গঠিত হবে। তার পরে এ অভ্যাস অর্জিত প্রবৃত্তিতে পরিণত হবে। আর যখন প্রবৃত্তি অর্জিত হয়ে যাবে তখন স্বভাবতই একনায়কত্ব (dictatorship) বিলোপ পেয়ে

	যাবে, যেহেতু এটা একটা পরিবর্তনীয় আকার ও যন্ত্র মাত্র।
৭। এ সকলের চরম পরিণতিতে ঈশ্বর ও ধর্মের উপাসকবৃন্দের একটা সমাজ গঠিত হবে এবং সে সমাজ বিবেকের অনুজ্ঞা অনুসারে জীবন ধারণ করবে।	৭। এর পরিণতিতে হবে একটা কর্মীর সমাজ, অলসদের সমাজ নয়। এ সমাজ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সমষ্টির ভালোর জন্যে কাজ করতে থাকবে।

মূল

টলস্টয়	কার্ল মার্কস্
গান্ধীবাদ	বলশেভিকবাদ ও লেনিনবাদ

কর্মস্থান

ভারতবর্ষ	রাশিয়া

(গণবাণী, ২৬শে আগস্ট, ১৯২৬)

রণছোড়দাস ভবন লোটবালা

ডাঙ্গের "গান্ধী বনাম লেনিন" পুস্তকখানি তাকে একটি সৌভাগ্য এনে দিয়েছিল। সেটা রণছোড়দাস ভবন লোটবালার১ সঙ্গে তার পরিচয়। রণছোড় দাসের পিতা ভবনের আটা-ময়দার দোকান ছিল। তাই থেকে তাঁদের পারিবারিক পদবী লোটবালা হয়ে যায়। গুজরাতি ভাষায় আটা-ময়দাকে 'লোট' বলা হয়। রণছোড়দাস তাঁর বাবার আটা-ময়দার দোকান তুলে দিয়ে নিজে একটি বড় ময়দার মিলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সেই মিলে আজও (১৯৬৭) কাজ চলেছে।

বাবার মৃত্যুর পর কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে রণছোড়দাস বাবার ব্যবসায়ে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে নিজে নিজে পড়াশুনা করা তিনি কখনও ছেড়ে দেননি। জীবনে তিনি অনেক কিছু হয়েছেন, জ্ঞান সমুদ্রে পাড়ি দিতে গিয়ে অনেক বন্দরেই তিনি তাঁর তরী ভিড়িয়েছেন। সনাতন সমাজের বর্ণভেদ ও গুরু পূজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে তিনি আর্য সমাজে যোগ দিয়েছিলেন। আর্য সমাজের স্বামী নিত্যানন্দের নামে তিনি 'নিত্যানন্দ লাইব্রেরী' নাম দিয়ে বোম্বেতে তাঁর বাড়ীর নীচের তলায় বেশ বড় পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করেছেন। গান্ধী যখন আহ্মদাবাদে সবরমতীতে আশ্রম স্থাপন করছিলেন তখন তার জন্যে তিনি এক হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। আবার ১৯২১ সালে অসহযোগ-খিলাফতের প্রোগ্রাম নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর মতভেদ, ঝগড়া ও ছাড়া-ছাড়ি হয়ে যায়। সেই সময় যাঁদের মন নূতনের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল তাদের ওপরে রুশ দেশের অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। গান্ধীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পরে লোটবালা মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রতি ঝুঁকে পড়লেন। নিষ্ঠার সহিত মার্কসবাদের অধ্যয়ন করতে লাগলেন। দু' একখানি ছোট বই পড়ে তিনি থামলেন না, গভীর অভিনিবেশ সহকারে কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল'ও তিনি

১ Ranchoddas Bhavan Lotvala

পড়লেন। মনের এই অবস্থায় ১৯২১ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি পার্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাস মহাবালেশ্বরে ছিলেন। সেই সময়ে কেউ তাঁকে ডাঙ্গের "গান্ধী বনাম লেনিন" পড়তে দিলেন। বোম্বেতে ফিরে এসে তিনি ডাঙ্গেকে খুঁজে বা'র করলেন। তিনি ডাঙ্গের জন্যে একটা মাসহারা ধার্য করলেন এবং ডাঙ্গে যেন তাঁর লাইব্রেরীতে মার্কসবাদের আরও অধ্যয়ন করতে পারে তার ব্যবস্থাও করে দিলেন। ইতোমধ্যে তাঁর লাইব্রেরী মার্কসীয় সাহিত্যের সংগ্রহে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ইন্দুলাল যাজ্ঞিক তাঁর লিখিত রণছোড়দাস ভবন লোটবালার ছোট জীবনীতে এতটা লিখেছেন। কিন্তু ১৯২৪ সালে কানপুর জেলে ডাঙ্গে আমাদের বলেছিল যে লোটবালার সঙ্গে দেখা করতে আসা মাত্রই তিনি বললেন, "তুমি লিখেছ এ বই? তোমার বয়স অল্প, এত তাড়াতাড়ি তুমি বই লিখতে গেলে কেন? তোমার জ্ঞান এখনও কাঁচা। তুমি আমার লাইব্রেরীতে আরও পড়াশুনা কর"। এ সব বলার পরেই লোটবালা ডাঙ্গের ভাতা স্থির করে দিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন ওই ভাবে পড়ার পরে ডাঙ্গে হাঁফিয়ে উঠেছিল। সে লোটবালার নিকটে গিয়ে প্রস্তাব করল যে একখানি কাগজ সে বার করতে চায়। ডাঙ্গের 'সোশ্যালিস্ট' বা'র করার ব্যবস্থা লোটবালাই করে দিয়েছিলেন। ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে 'সোশ্যালিস্ট' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' সহ ছোট ছোট কয়েকখানা পুস্তিকাও পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল সে সময়ে লোটবালার টাকায়।

লোটবালা শুধু ময়দার কলের মালিক ছিলেন না। কয়েকখানি সংবাদপত্রেরও তিনি মালিক ছিলেন। কাজেই বড় প্রেসেরও মালিক ছিলেন তিনি। তবে, ব্যবসায়ী লোক হিসাবে সব কিছুর ওপরে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। 'সোশ্যালিস্ট' হতে তাঁর বিরাট প্রেসের ওপরে বিপদ আসতে পারে ভেবে তিনি তাঁর প্রেসের বাড়ীর এক কোণে 'লেবর প্রেস' নাম দিয়ে একটি আলাদা প্রেস করে দিয়েছিলেন। শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, কেশব নীলকণ্ঠ জোগলেকার ও লোটবালার বিশ্বস্ত কর্মচারী চিতলিয়াকে ক'রে দেওয়া হয়েছিল এই প্রেসের যুক্ত মালিক। জোগলেকার বোম্বের ছাত্র নয়, পুনাতে পড়াশুনা করেছিল এবং পুনা হতেই বি. এ. পাশ করেছিল। কি ক'রে ডাঙ্গের সঙ্গে সে যুক্ত হয়েছিল তা জানিনে। কানপুরের মোকদ্দমার সংস্রবে গিরেফ্‌তার হওয়ার আগে ডাঙ্গে ঠাকুরদ্বারের যে বাড়ীতে ছিল সেই বাড়ীতে পরে জোগলেকারকে আমরা থাকতে দেখেছি। পার্বতে কোথাকার ছাত্র ছিলেন তা জানিনে, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রাথমিক যুগে তিনিও ডাঙ্গের সঙ্গে ছিলেন। ১৯২৭ সালের শুরুতে বোম্বেতে যখন ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্টস্‌ পার্টি প্রথম গঠিত হয়েছিল তখন পার্বতেও তার একজেকিউটিব কমিটির সভ্য হয়েছিলেন। তারপরে আর কখনও পার্বতেকে কমিউনিস্ট পার্টির কোনো কিছুতে দেখা যায় নি। মাঝে কোনো সময় তিনি গবর্নমেন্‌টের চাকুরীও গ্রহণ করেছিলেন।

আমি লোটবালার কথা বলছিলাম। বোম্বেতে প্রথম আমাদের যুগের কমিউনিস্টরা তার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। অবশ্য এই সাহায্য ডাঙ্গেই পেয়েছিল সবচেয়ে বেশী এবং দীর্ঘ দিন ধরে। ১৯২৭ সালের মে মাসের ২৪শে তারিখে জেল হতে মুক্তি পেয়ে আসার পরেও ডাঙ্গে লোটবালার নিকট হতে আর্থিক সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু লোটবালার মধ্যে ক্রমশই পরিবর্তন আসতে থাকে। আমি তো বলেছি তিনি বহু বন্দরে তরী ভিড়াবার লোক ছিলেন। উনিশ শ' ত্রিশের যুগে ট্রট্‌স্কি সোবিয়েৎ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি হতে বহিষ্কৃত হওয়ার পরে তিনি গভীরভাবে ট্রট্‌স্কির লেখা পড়েন এবং ট্রট্‌স্কিপন্থী হয়ে পড়েন,

যদিও নিজেকে ট্রট্স্কিপন্থী বলে তিনি কখনও ঘোষণা করেননি। উনিশ শ' ত্রিশের যুগেই আচার্যের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। এই সেই আচার্য যিনি তাশকন্দে আবদুর রবের ভারতীয় বিপ্লবী সমিতির সভ্য ছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় যখন ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে তাশকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন তখন আবদুর রবকে বাদ দিয়ে আগে হতে এনার্কিস্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। সোবিয়েৎ দেশ হতে পশ্চিম ইউরোপে ফিরে গিয়ে তিনি আবার এনার্কিস্ট হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি ভারতে ফিরেছিলেন। কার চেষ্টায়, কি ভাবে তিনি ভারতে আসার নিষেধাজ্ঞার বেড়া পার হয়েছিলেন, তার রুশীয় স্ত্রীই বা কোথায় গেলেন, তা জানিনে। বোম্বেতেই থাকতেন তিনি। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে লোটবালা এনার্কিস্টদের নানান সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। এই সব কিছুর পরে লোটবালা Libertarian Socialist হয়েছেন। এটা কি বস্তু তা আমি জানিনে। লোটবালা এখনও বেঁচে আছেন। তাঁর বয়স এখন ৯২ বছর। কালা তিনি আগেও ছিলেন, এখন তিনি বদ্ধ কালা হয়েছেন। আজ তাঁর শরীর একটা মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঘাটে

নিম্বকারের নাম আমি আগে উল্লেখ করেছি। মুলসিপেটা সত্যাগ্রহের পরে সে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে এস. এ. ডাঙ্গে গিরেফ্‌তার হয়ে কানপুরে যাওয়ার পরে ঘাটে অন্যান্য কমিউনিস্টদের সঙ্গে কাজে সক্রিয় হয়ে উঠে। ঘাটের পুরো নাম সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘাটে। তার বাবা বিষ্ণু ঘাটে পুরোহিত ছিলেন। ঘাটে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবারের লোক। তার বাবাই প্রথম ম্যাঙ্গালোরে বাস ইখ্‌তিয়ার করেছিলেন। ১৮৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঘাটে ম্যাঙ্গালোরে জন্মগ্রহণ করেছিল। ১৯১৪ সালে ম্যাঙ্গালোরের জার্মান মিশন হাইস্কুল হতে সে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাস করে, আর ১৯১৭ সালে ম্যাঙ্গালোরের সেন্ট্ এলয়সিয়াস কলেজ১ হতে পাস করে সে আই. এ. পরীক্ষা। ১৯১৭ সালেই বোম্বে গিয়ে সিডেনহাম কলেজ অফ কমার্সে সে ভর্তি হয়। কমার্স পড়ায় সচ্চিদানন্দ ঘাটের রুচি ছিল না, কিন্তু তার একসাইস্ অফিসার অগ্রজ (পরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়েছিলেন) তাকে কমার্স পড়াবেনই। এই নিয়ে অগ্রজের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়ে গেল। আরও কিছু কিছু প্রতিবন্ধক তার পথে দাঁড়াল। সে পড়াশুনা ছেড়ে দিল। তারপরে দু'-এক ঘাটের জল খেয়ে ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ লজ্ নামক একটি হোটেলে চাকরী নিল। হোটেল মালিক গোপাল ভট্ট তাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতে লাগলেন। তিনিই ঘাটেকে আবার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়তে পাঠালেন (১৯২১)। ১৯২৩ সালে ঘাটে ইতিহাস ও অর্থ-নীতিতে২ অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করল।

ঘাটের মতে শ্রীকৃষ্ণ লজ সোশ্যালিজ্‌মের বিষয়ে আলোচনার একটি আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। সি. জি. সাহের (সুশিক্ষিত যুবক, লেখক, আলোচক ও

১ St. Aloysius College
২ Economics

রণছোড়দাস লোটবালার সেক্রেটারি) সঙ্গে ঘাটের বন্ধুত্ব হয়েছিল। ঘাটে লোটবালার নিত্যানন্দ লাইব্রেরীতে সোশ্যালিজম্ সম্বন্ধে পড়াশুনা করত। ১৯২২ সালের শেষ ভাগে ডাঙ্গের 'সোশ্যালিস্ট' নামক কাগজ বা'র হওয়ার পরে পিত্রে নামক একজনের মারফতে ডাঙ্গের সঙ্গে ঘাটের পরিচয় হয়। কিন্তু ঘাটে কমিউনিস্ট আন্দোলনে সক্রিয় হয়েছিল ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে ডাঙ্গের গিরেফ্তারের পরে। ঘাটের সঙ্গে ডাঙ্গের পরিচয় হওয়ার পরে ডাঙ্গে বিদেশ হতে আসা আমাদের পত্র-পত্রিকাগুলি শ্রীকৃষ্ণ লজের টেবিলে ছড়িয়ে রাখত। ১৯২৩ সালে নলিনী গুপ্ত তাই দেখে এসেছিল এবং আমাদের সামনেই কানপুর জেলে ডাঙ্গেকে সে এ কথা বলেছিল।

মিরাজকর

শান্তারাম এস· মিরাজকারের নাম হতেই বোঝা যায় যে তার পরিবার মিরাজের বাশিন্দা ছিল। মহারাষ্ট্রের একটি ছোট দেশীয় রাজ্যের নাম মিরাজ। মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার আগেই শান্তারাম মিরাজকারকে চাকরী গ্রহণ করতে হয়েছিল। সে ইংরেজি লিখতে পারত, ইংরেজিতে কথা বলতে পারত, সর্বোপরি স্কুলে তার দ্বিতীয় ভাষা ফ্রেঞ্চ ছিল। তাই ফরাসী ব্যাঙ্কে তার চাকরী সহজেই হয়ে গিয়েছিল। ব্যাঙ্কে চাকরীতে ঢোকার সময়েও রাজনীতির প্রতি মিরাজকারের আকর্ষণ ছিল। চাকরী করতে করতেই সে বোম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিল। ডাঙ্গেও একটা র‍্যাডিকাল গ্রুপ নিয়ে ওই কমিটিতে ছিল। তখনই ডাঙ্গের সঙ্গে তার পরিচয়। 'সোশ্যালিস্ট' বা'র হওয়ার পরে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিতে মিরাজকার যোগ দিয়েছিল ১৯২৭ সালে। ডাঙ্গে তখনও জেল হতে মুক্তি পায়নি। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী কিংবা ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বেতেও বাঙলা দেশকে অনুসরণ ক'রে 'ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্টস পার্টি' গঠিত হয়। মিরাজকার নির্বাচিত হয় তার প্রথম সেক্রেটারি। এই পার্টির মুখপত্ররূপে 'ক্রান্তি' নাম দিয়ে মারাঠি ভাষায় একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বা'র হয়। তারও সম্পাদক হলো মিরাজকার। এই সময়ে মিরাজকার একটি দুঃসাহসিক কাজও ক'রে বসল। সে ১২৫ টাকা বেতনের ফরাসী ব্যাঙ্কের চাকরীটি ছেড়ে দিয়ে সামান্য ভাতা নিয়ে পার্টির সব সময়ের কর্মী হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের এই চাকরীটি তার পরিবারের একমাত্র সম্বল ছিল। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী-মাসের যুগে একটি গরীব কেরানী পরিবারের পক্ষে ১২৫ টাকা বেতনের একটি চাকরী ছিল পরম সৌভাগ্যস্বরূপ। সব কিছুর ওপরে মিরাজকরের বড় ছেলেটি তখন তার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে।

বোম্বেতে পার্টি গড়ার প্রথম অবস্থার কথাটাই শুধু আমি এখানে বললাম।

পাঞ্জাবে পার্টি গঠন

১৯২০-২১ সালে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে তাশকন্দ ও মস্কোতে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল তাতে পাঞ্জাবের কমরেডরাও ছিলেন। দেশে ফেরার সময়ে সীমান্তে কিংবা দেশে ফেরার পরে নানাস্থানে তাঁরা গিরেফ্‌তার হয়েছিলেন। ১৯২১-২২ সালে তাঁদের বিরুদ্ধে হয়েছিল তাশকন্দ ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা। আর ১৯২২-২৩ সালে চলেছিল মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা। এই দুটি মোকদ্দমার বিচার পরে পরে পেশোয়ারে একই জজের দ্বারা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের বাদ দিয়েও পাঞ্জাবের সঙ্গে পৃথকভাবে একটা সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। যাঁকে নিয়ে এই কাজটা আরম্ভ হয়েছিল তাঁর নাম ছিল গুলাম হুসায়ন। পেশোয়ারের এডওয়ার্ড্‌স্‌ চার্চ মিশন কলেজে তিনি অর্থশাস্ত্র (ইকনমিক্‌স্‌) পড়াতেন। আমি আমার আগেকার কোনো লেখায় পেশোয়ার ইস্‌লামিয়া কলেজের নামোল্লেখ ক'রে ভুল করেছি। গুলাম হুসায়ন যে এডওয়ার্ড্‌স্‌ চার্চ মিশন কলেজে পড়াতেন এটাই সঠিক কথা। ১৯২২ সালের শুরুর দিকে কোনো সময়ে গুলাম হুসায়নের পরম বন্ধু মুহম্মদ আলী তাঁকে পেশোয়ার হতে কাবুলে ডেকে নিয়ে যান। আগেও আমি মুহম্মদ আলীর নামোল্লেখ করেছি। তিনি যখন লাহোরে মেডিকাল কলেজে পড়ছিলেন তখন আরও চৌদ্দজন ছাত্রের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে আফগানিস্তানে চলে যান। মুহম্মদ আলীর আসল নাম ছিল খুশী মুহম্মদ। বিদেশে তিনি মুহম্মদ আলী, সিপাসসি ও আহম্মদ হাস্‌সান নাম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই নামগুলির মধ্যে মুহম্মদ আলী নামটিই ছিল সবচেয়ে বেশী পরিচিত। কাবুলে যখন অস্থায়ী ভারত গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন মুহম্মদ আলী সেই গবর্নমেণ্টের একজন মন্ত্রী ছিলেন। ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে তাশকন্দে যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মুহম্মদ আলীও ছিলেন তার প্রবর্তক সভ্যদের একজন। কিন্তু তার আগে কাবুলেই মুহম্মদ আলী নিজেকে কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাশকন্দে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল তারপরে মুহম্মদ আলী কাবুলে চলে যান। তখনই তিনি তাঁর ছাত্রজীবনের পরম বন্ধু গুলাম হুসায়নকে কাবুলে ডেকে পাঠালেন। সেখানে তাঁদের ভিতরে কয়েক দিন ধরে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো। শেষ পর্যন্ত গুলাম হুসায়ন মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে মেনে নিলেন এবং কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের প্রদর্শিত পথে ভারতের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে কাজে এগিয়ে যেতে রাজী হলেন। পেশোয়ারে ফিরে এসে কিছু দিনের ভিতরে তিনি পেশোয়ার মিশন কলেজের চাকরী ছেড়ে দিয়ে লাহোরে চলে গেলেন। লাহোরে তিনি রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে ঢুকেছিলেন, আর 'ইন্‌কিলাব' (বিপ্লব) নামীয় একখানি উর্দু কাগজ চালিয়েছিলেন। ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বিনা বিচারে বন্দী (State Prisoner) হওয়ার পরে

গ্লাম হ্সায়নের রাজনীতিক জীবন শেষ হয়ে যায়। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সংস্রবে তাঁর সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত আলোচনা করব। কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবার পরে আমরা লাহোরে শামস্দ্দীন হাসানকে ছাড়া আর কিছুই পাইনি। তাঁর ওপরেও বিশ্বাস স্থাপন করতে না পারায় পার্টি তাঁকে এড়িয়ে চলেছে। এইভাবে গ্লাম হ্সায়ন পর্ব শেষ হয়ে যায়। তার পরে পাঞ্জাবে সত্যকার কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে পেশোয়ারের বন্দীরা ফিরে আসার পরে।

মাদ্রাজে পার্টি গঠন

মাদ্রাজে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কথা বলতে হলে সব কিছুর আগে উল্লেখ করতে হবে মায়লাপুরম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের নাম। ১৯২২ সালে তাঁর বয়স ৪৭ বছরের মতো ছিল, অন্তত পুলিসের লোকেরা তাই মনে করতেন। আমার মনে হয় পুলিসের অনুমান সত্য নয়। তাঁর বয়স তখন আরও বেশী ছিল। তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি ওকালতি ছেড়ে দেন। ১৯২২ সালে তিনি মজুর আন্দোলন করতেন। পুলিসের ভাষায় তিনি মজুর আন্দোলনের একজন 'কুখ্যাত' 'এজিটেটর' ছিলেন। তার মানে তাঁর আন্দোলন কিছু শক্তি সঞ্চয় করেছিল। ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, সিঙ্গারাভেলু আর হাইকোর্টে ফিরে গেলেন না, ট্রেড ইউনিয়নের কাজ তো তিনি করছিলেনই,—কাজেই অক্টোবর বিপ্লব যে মশাল জ্বালিয়েছিল তার দ্বারা তাঁর আকৃষ্ট হওয়া ছিল একান্ত স্বাভাবিক। বিদেশে ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হয়েছিল। ইতোমধ্যে মানবেন্দ্রনাথ রায় লিখিত 'পরিবর্তনের মুখে ভারত' (India In Transition) নামক বইখানাও তিনি পড়ে ফেলেছিলেন। এই পুস্তকও তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। এ সম্বন্ধে এম· এন· রায় আমাকে এক পত্রে লিখেছিলেন যে দক্ষিণ ভারতে একজন নেতা (সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার) পুস্তকখানি পড়ে তাঁকে জানিয়েছেন যে তিনি (সিঙ্গারাভেলু) তামিল ভাষায় তার তর্জমা করবেন। কিন্তু শুধু বলাই সার হয়েছিল। তামিল ভাষায় তর্জমা কখনও হয়নি।

গয়া কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তিনি বিদেশ হতে আসা আমাদের প্রোগ্রামের সমর্থনে বক্তৃতা করেছিলেন,—বলেছিলেন তিনিও একজন কমিউনিস্ট। কিন্তু হাজার হোক, তিনি উকিল মানুষ ছিলেন। তাই নিরুপদ্রব সংগ্রামের কথাই তিনি বলেছিলেন। এই কথাটা খুঁচিয়ে তুলে গান্ধী ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে অহেতুক সচেতন করে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভ্যরূপেই তিনি গয়া কংগ্রেসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার বুদ্ধিজীবী লোককে তেমন সঙ্গে টানতে পারেননি। বেলায়ুধন নামীয় একজন উকিল তার সঙ্গে এসেছিলেন। তাঁর নামে মোকদ্দমা করার কথাও উঠেছিল। কিন্তু পরে তাঁকে আমরা আর দেখিনি। পুলিস রিপোর্টে আছে যে বেলায়ুধনের সঙ্গে পুলিসের যোগাযোগ ছিল। তামিল দেশের একটি বিশিষ্ট পরিবারের একজন যুবক তাঁর সঙ্গে এসে জুটেছিলেন। কিছু দিনের ভিতরেই যুবকটির চালচলনে তাঁর মনে সন্দেহ জাগে। এই যুবকটি তামিল দেশের বাইরের কমিউনিস্টদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন। কিন্তু তার অসাধুতা প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে পার্টি হতে বহিষ্কার করা হয়েছিল। সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আমি পরে বলব।

১৯২২ সালের শেষার্ধ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা দরকার। এই সময়ে কমরেড আবদুল হালীমের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। শেষার্ধ হলেও জুলাই মাসের পরে নয়। এই পরিচয়ের ভিতর দিয়েই সে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে পথিকৃৎ হয়। সেই যে পার্টি গড়ার কাজে সে যোগ দিল তার পরে সুদীর্ঘ প'য়তাল্লিশ বছর কাল, অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাকে কেউ তার কাজ হতে বিচ্যুত হতে দেখেনি। গ্লাডস্টন ওয়েলী কোম্পানীর হাতে সিটি লাইনের জাহাজগুলির কলকাতার এজেন্সী ছিল। হালীম এই কোম্পানীর দ্বারা নিযুক্ত হয়ে কলকাতার পোর্টে আসার পরে এই সকল জাহাজে টালি ক্লার্কের কাজ করত। ১৯২১ সালে যুক্ত খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন যখন প্রবল আকার ধারণ করল তখন হালীম চাকরীতে ইস্তাফা দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে পিকেটিং করতে গিয়ে সে গিরেফ্‌তার হয়ে জেলে গেল। ১০ই ডিসেম্বর (১৯২১) তারিখে অনেক স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে সে গিরেফ্‌তার হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ বড় বড় নেতারাও গিরেফ্‌তার হয়েছিলেন সেই দিনই। আদালতের বিচারে আবদুল হালীম ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। তার বয়স তখন বিশ বছর মাত্র। সে তার দণ্ডকাল কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে ও খিদিরপুর ডক জেলে কাটিয়েছিল। গান্ধীজী দেশবাসীর নিকটে ওয়াদা করেছিলেন যে ১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি 'স্বরাজ' পাইয়ে দিবেন। এমন 'ভালো' মানুষও সেদিন কিছু কিছু দেশে ছিলেন, যাঁরা সত্যই বিশ্বাস করেছিলেন যে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই তাঁরা স্বরাজ পেয়ে যাবেন। অধিকাংশ লোক অবশ্য গান্ধীজীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেননি। হালীমেরা (সমস্ত ভারতবর্ষে সংখ্যায় তাঁরা হাজার হাজার ছিলেন) জেলে বসে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে স্বরাজ তো পেলই না, প্রস্তাবিত গণ-আইন অমান্য আন্দোলনও ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯২২) তারিখে গান্ধীজী বারদোলিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডেকে স্থগিত রাখলেন। কারণ, ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯২২) তারিখে কংগ্রেসের একটি বড় মিছিল (কৃষকদের মিছিল) পুলিসের ২১ জন কনেস্টবল ও একজন সাব ইন্‌স্পেক্টরকে জোর তাড়া করলে তারা থানার ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে। বাইরে থেকে সেই ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে ২২ জন পুলিসের লোকই পুড়ে মরে যায়। যে দেশে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ঘটেছিল সে দেশে চৌরি-চৌরাও ঘটতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের একনায়কের (গান্ধীর) কোমল হৃদয় তা সইতে পারল না। তিনি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ ক'রে দিলেন।

১৯২২ সালের বসন্ত কালে হালীমেরা যখন বাইরে এলেন তখন সব কিছু জুড়িয়ে গেছে। দেশে কোনো আন্দোলন নেই, এখানে ওখানে সামান্য মজুর আন্দোলন ছাড়া। যে-সকল ভলানটিয়ার জেলে গিয়েছিলেন দেশে কোনো আন্দোলন না থাকার কারণে তাঁদের একটা অংশ বাড়ী ফিরে গেলেন, আর একটি অংশ স্কুল কলেজে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করতে লাগলেন। তৃতীয় অংশ না পারলেন ঘরে ফিরতে, না পারলেন স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে। তাঁরা হাতকাটা জামা (তখন তাই রেওয়াজ ছিল) পরে কলকাতার পথে পথে ঘুরতে লাগলেন। তাঁরা স্বাধীনতার ব্রত নিয়ে ঘরের বা'র হয়েছিলেন। আবদুল হালীম এই

শেষোক্ত দলে ছিল। তবে, তার স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়ার কোনো কথাই ছিল না। সে নিজে নিজে পড়াশুনা করে বাঙলা ও ইংরেজি লিখতে শিখেছিল। মোটের ওপরে ভালোই লিখত সে। আসলে মেট্রিকুলেশন পাস করা তো দূরের কথা, মেট্রিকুলেশন ক্লাসেও সে কোনোদিন ওঠেনি।

হালীমের এই ঘুরে বেড়ানো অবস্থায় তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রিডিং রুমে, ৩২, কলেজ স্ট্রীটে। সেখানে সে মাসিক পত্রিকা পড়তে আসত। বাঙলা ও ইংরেজি বহু মাসিক পত্রিকা আসত সেখানে। অসহযোগ আন্দোলনে সে জেল খেটে এসেছে। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের কথা সে জানে, কিন্তু কখনও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির সভ্য সে হয়নি, হওয়ার পথে বাধাও ছিল। আমাদের পথ ছিল সম্পূর্ণ নূতন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিষয়ে আমি তার সঙ্গে কথা বললাম। আমি নিজেও তখন খুব বেশী কিছু জানতাম না। যা বুঝেছি তাই নিয়ে কাজে এগোব, সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনা ক'রে আরও বেশী বুঝব, হালীমের সঙ্গে এই হলো আমার কথা। এটা বুঝেছিলেম যে কমিউনিস্টদের জীবনভোর ছাত্র থাকতে হয়। এই সময়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একদিন আবদুর রজ্জাক খানের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল, তখন ওই পথ দিয়ে হালীম যাচ্ছিল। খান সাহেব আমায় বলেন, এই ছেলেটি খিদিরপুর ডক জেলে আমার সঙ্গে ছিল, বড় ভালো ছেলে। আপনি তার সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। আমি খান সাহেবকে জানালাম যে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রিডিং রুমে হালীমের সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং কথাও হয়।

দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন সৃষ্টি করব ও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলব এই অসাধ্য সাধনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমি সবে পথে বা'র হয়েছি। নিজের অযোগ্যতার কথা প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ মর্মে মর্মে অনুভব করছি। তবুও ভাবছি পথে যখন বা'র হয়ে পড়েছি তখন ফেরার পথ আর নেই। নলিনী গুপ্ত চলে যাওয়ার পূর্বক্ষণে ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে যে তাঁর দেখা হয়েছিল সেকথা পূর্বে বলেছি। তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির লোক। অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কাজ-কর্ম বন্ধ থাকলেও ভূপেন্দ্রকুমারের পেছনে তখনও যুবকেরা রয়েছেন। তিনি যখন আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন এবং আমাদের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলবেন, এমনকি কাজও করবেন বলে ওয়াদা করলেন তখন আমি সত্যিই বড় খুশী হয়েছিলেম। নিজের মনে অনেকটা বলও পেয়েছিলেম।

এখানে আমি ব'লে রাখতে চাই যে কমিউনিস্ট আন্দোলনে নেমে আমার **প্রথম** সংযোগ হয়েছিল **ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে**। অবশ্য, পরে তিনি তাঁর পুরনো পথে ফিরে গিয়েছিলেন।

আবদুর রজ্জাক খানের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। কিন্তু যে উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার মার্কস-লেনিনবাদী চিন্তাধারার ওপরে ভিত্তি করে কাজ করার ও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল সে কথা আমি আগেই বলেছি। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের পরেই তাঁর সঙ্গে আমার **দ্বিতীয়** সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তার সঙ্গে আমার সংযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। একসঙ্গে চলাফেরা ও উঠাবসা।

আবদুল হালীমকে আমি আমার রাজনীতিক কর্মক্ষেত্রে **তৃতীয়** সাথীরূপে

পেয়েছিলেম। এক সংগে পঁয়তাল্লিশ বছর আমরা কাজ করেছি। তার পরে হালীমের আকস্মিক মৃত্যু আমাদের একত্রে চলার পথে ছেদ টেনে দিয়েছে।

১৯২২ সালের প্রথমার্ধে এবং তার লাগালাগি সময়ে আমার এই ক'টি বিশেষ রাজনীতিক সংযোগ হয়েছিল। অল্প কিছু দিনের ভিতরে এই যোগাযোগগুলি হলেও তার ক্রমটা আমি এখানে লিখে রাখলাম। কোনো দিন কারুর রেফারেন্সের জন্য এটা হয়তো কাজে লেগে যেতে পারে।

শিশিরকুমার ঘোষ ও আবদুর রজ্জাক খান

আবদুর রজ্জাক খান শিশিরকুমার ঘোষকে আমার ১০/১, ব্রাইট স্ট্রীটের আস্তানায় একদিন রাত্রে নিয়ে গিয়েছিলেন সে কথা আমি আগে বলেছি। খান সাহেব সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের যে ছোট দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তারই একজন নেতারূপে তিনি শিশিরের সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর দিক হতে আন্তরিকতায় ভরা ছিল সেই পরিচয়। শিশিরের ভিতরে কোন দুর্বলতা ছিল কিনা এবং খান সাহেব তার কথা কিছু জানতেন কিনা, আমায় আভাসে-ইংগিতেও তিনি কিছু জানাননি। আমি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে শিশিরের সংগে মেলামেশা করে যাচ্ছিলেম। ক্রমে আমি দেখতে পেলাম যে শিশিরের সংগে আমারই পরিচয় খান সাহেব শুধু করিয়ে দেননি, তাঁর বয়সে বড় আপন মামাত ভাই আবদুস্ সত্তার খানের সংগেও দেখলাম শিশিরের খুব দহরম-মহরম। এই আবদুস্ সত্তার খান বিপ্লবী রাজনীতি ভালোবাসতেন। আবদুর রজ্জাক খান যে বিপ্লবীদের সংগে মেলামেশা করতেন সেটা তিনি খুব ভালো চোখে দেখতেন। শিশির তাঁর কাছে যেতেন এই ভেবে যে হয়তো তিনি কিছু অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে দিতে পারবেন। নানান ধরনের লোকের সংগে আবদুর সত্তার খানের বিস্তৃত পরিচয় ছিল।

আবদুর রজ্জাক খান বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বলেই আমি অন্য কোন সূত্র হতে আলাদাভাবে শিশিরকুমার ঘোষের পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা কখনও করিনি। তিনি আমায় বলেছিলেন যে তাঁদের ছোট টেরোরিস্ট পার্টির প্রোগ্রাম বদলে যাবে, কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের প্রোগ্রাম মেনে নিয়েই তাঁরা কাজে এগিয়ে যাবেন। শিশির ঘোষও আমায় এই একই কথা বলেছিলেন। কিন্তু শিশিরকুমার ঘোষের সংগে যাঁদের পরিচয় এবং খান সাহেবের সংগেও, তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ, যেমন ধীরেন বাগচী, বলেছিলেন জনগণ আবার কে? তারা তো গড্ডালিকা। তারা আমাদের অনুসরণ করবে।

নলিনী গুপ্ত বার্লিনে ফিরে গিয়ে দেখতে পেল যে সেখানে আমাদের প্রবাসী পার্টির কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে। একজন আমেরিকান লেখক, ডক্টর ডেভিড এন ড্রুহে লিখেছেন যে নলিনী গুপ্তের পরামর্শে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির হেড কোয়ার্টার্স বার্লিনে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এটা সঠিক তথ্য নয়। গুপ্ত তখন ভারতবর্ষে ছিল। ১৫ই মে (১৯২২) হতে ইংরেজি ভাষায় পার্টির মুখপত্র "দি ভ্যানগার্ড অফ দি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" (The Vanguard of the Indian Independence) প্রকাশিত হয়েছে। এম· এন· রায়ের ইংরেজী পুস্তক 'পরিবর্তনের মুখে ভারত'ও (India in Transition) বা'র হয়ে গেছে। শিশিরকুমার ঘোষকেও আমি সব কাগজ-পত্র পড়তে দিয়েছি।

২৫, মির্জাপুর স্ট্রীটে (এখনকার সূর্য সেন স্ট্রীটে) শিশির ঘোষের 'স্বদেশী এজেন্সী' নামে একটি খদ্দরের দোকান ছিল। এই দোকানে অনেক যুবকের

আনাগোনা ছিল। এই সময়ে একদিন আমি কলেজ স্কোয়ারের পুকুরের ধারে পায়চারি করছিলেম। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে। রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক সব কথা আমি বলেছিলেম। তখন শিশির ঘোষের দোকান হতে একজন লোক এসে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "শিশিরদাকে দেখেছিলেন এদিকে কোথাও? তাঁর মামা এসেছেন"। আমি "দেখিনি" বলার পর লোকটি চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই ভূপেন দত্ত আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "এই লোকটি কোন্ শিশির ঘোষের কথা জিজ্ঞাসা ক'রে গেল? মির্জাপুর স্ট্রীটে যার খদ্দরের দোকান আছে তার কথা কি?" আমি বললাম, "হ্যাঁ"। ভূপেন দত্ত বললেন, "শিশির ঘোষ ভালো লোক নয়। তার সঙ্গে পরিচয় ক'রে আপনি ভুল করেছেন"। তারপর তিনি শিশির ঘোষের দীর্ঘ পরিচয় আমায় দিলেন। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরে আমার নিজের সংগ্রহ করা বিবরণ হলো এই যে শিশিরকুমার ঘোষ অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিল। পুলিসের ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হত্যায় লিপ্ত ছিল সন্দেহে ধরা প'ড়ে সে পুলিসের নিকটে দীর্ঘ স্বীকৃতি দেয়। তখন সমিতির অনেক তথ্য পুলিস তার নিকট হতে পেয়ে যায়। তা ছাড়া, সমিতির আণ্ডা-বাচ্চা যে যেখানে ধরা পড়তে বাকী ছিল তাদের সকলের নাম শিশির পুলিসকে ব'লে দেওয়ায় তারা ধরা পড়ে গেল। বিপ্লবী শিশিরকুমার ঘোষ হয়ে পড়ল গোয়েন্দা পুলিসের এজেণ্ট।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়কে হত্যার অপরাধে শিশির ঘোষের বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা হয়নি। (এই হত্যার অপরাধে মোকদ্দমা আসলে কারুর বিরুদ্ধে হয়নি।) কিন্তু শিশিরকুমার ঘোষকে বাঁচাবার দায়িত্ব পড়ল পুলিসের ঘাড়ে। কারণ, অনুশীলন সমিতির লোকেরা তাকে পেলে মেরে ফেলতে পারেন। এই কারণে আসামের সদিয়া সীমান্তে জঙ্গল বিভাগে শিশিরকে একটা চাকরী দেওয়ার ব্যবস্থা পুলিসই করেছিল। সেখানে সবার অলক্ষ্যে সে চাকরী করে যাচ্ছিল। পুরনো ঘটনার কথা লোকেরা ধীরে ধীরে ভুলে গিয়ে থাকেন। পাঞ্জাবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন. এই তিনেতেই মিলে দেশে একটা প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিল। এ ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে পুলিস শিশিরকে সদিয়া হতে ফিরিয়ে এনে কলকাতা ছেড়ে দেয়। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ভাবলাম এসবের কিছুই কি আবদুর রজ্জাক খান জানতেন না? আর. এসব কথা তাঁর জানাই যদি থাকবে তবে তিনি কি করে শিশিরকুমার ঘোষের সহিত আমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারলেন?

সারারাত আমার ছটফট করে কাটল। পরের দিন আবদুর রজ্জাক খানের সহিত আমার দেখা হওয়া মাত্রই আমি ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের কথাগুলি সবই একে একে তাঁকে জানালাম। অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এসব কথার কিছুই কি আপনি জানতেন না?" আমি আশা করেছিলেম, খান সাহেব বলবেন যে তিনি কিছুই জানতেন না। কিন্তু তিনি তা করলেন না। বললেন, সব কথা না শুনলেও এর কিছু কিছু কথা তিনি শুনেছিলেন। ক্ষোভ ভরা মন নিয়ে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, "এই রকমই যখন ব্যাপার ছিল তখন আপনিই বা কেন শিশিরের সঙ্গে এত বেশী মিশতে গেলেন. আর আমার সঙ্গেই বা কেন তাকে এমনভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন?" কোন উত্তর দিলেন না তিনি। খান সাহেবের কোনো বড় ভুল ধরা পড়ার পরে এমনই চুপ করে থাকা তাঁর অভ্যাস। এর পরে শিশিরের সঙ্গে আমি সকল প্রকার সংস্রব ত্যাগ করলাম। খান

সাহেবও আমায় জানিয়েছিলেন যে তিনিও শিশিরের সঙ্গে আর মেলামেশা করেন না।

শিশির সংক্রান্ত ব্যাপারের পেছনে একটা ইতিহাস আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সারা-ভারতে ব্যয়-সঙ্কোচের সুপারিশ করার জন্যে একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছিল। লর্ড ইঞ্চকেপ ছিলেন এই কমিটির সভাপতি। এই জন্যে কমিটিকে বলা হতো ইঞ্চকেপ কমিটি। বাঙলা দেশের প্রাদেশিক গবর্নমেন্ট্ও শুধু বাঙলার জন্যেই এই রকমই একটি ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই কমিটিকে মল্লিক কমিটি বলা হতো।

মল্লিক কমিটি দেখতে পেলেন, কলকাতায় রাজনীতিক গোয়েন্দা পুলিসের দুটি বড় বড় দফ্তর রয়েছে। তাদের নাম যথাক্রমে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের আফিস (বেঙ্গল পুলিস) ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের আফিস (কলকাতা পুলিস)। বেঙ্গল পুলিসের মাথা ছিলেন ইন্স্পেক্টর জেনেরেল অফ পুলিস এবং কমিশনার অফ পুলিস ছিলেন কলকাতা পুলিসের মাথা। তাঁদের কেউ কারুর অধীন ছিলেন না, কিন্তু দু'জনাই ছিলেন বেঙ্গল গবর্নমেন্টের চীফ সেক্রেটারির অধীনে। এই অবস্থায় রাজনীতিক পুলিসের দু'টি বড় বড় আফিস কলকাতায় রাখার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের আফিসটি সমস্ত বাঙলা দেশের জন্য কলকাতাতে রাখতেই হচ্ছে। কলকাতার রাজনীতিক গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে কলকাতা পুলিস অনায়াসেই বেঙ্গল পুলিসের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সহযোগে কাজ চালাতে পারে। মল্লিক কমিটি সুপারিশ করলেন যে, ব্যয় সঙ্কোচের জন্যে কলকাতার স্পেশাল ব্রাঞ্চের আফিসটি তুলে দেওয়া হোক। কমিটি আরও যুক্তি দিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে রাজনীতিক গুপ্তহত্যা ও ডাকাতি ইত্যাদি যখন দেশে নেই তখন স্পেশাল ব্রাঞ্চের আফিসটি অনায়াসে তুলে দেওয়া যায়। কিন্তু মল্লিক কমিটি সুপারিশ করলেও কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চ কিছুতেই নিজেদের বিলোপ করতে রাজী ছিলেন না। তাঁরা তাই উস্কানী-দাতাদের নিযুক্ত করেছিলেন। যাঁরা শিশিরকুমার ঘোষকে জানতেন তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে উস্কানীদাতারূপেই শিশিরের পুনরাগমন ঘটেছে। এবং তা সত্যও ছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কলকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূবপাশে 'ফরবেস ম্যানশনস্' নামক বিরাট বাড়ীটি ছিল কংগ্রেস আফিস। 'গৌড়ীয় সর্ব-বিদ্যায়তন' নামক ন্যাশনাল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল এই বাড়ীটিতে। ছাত্র ও ভলান্টিয়ারদের আনাগোনায় বাড়ীটি সরগরম হয়ে থাকত। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন তখন স্থগিত ছিল। কিন্তু তার কোনো কোনো নেতা ভাবলেন ঘর ছেয়ে নেওয়ার, অর্থাৎ দলে নূতন নূতন ছেলে রিক্রুট করা এটাই প্রকৃষ্ট সময়। তাঁদের মধ্যে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ছিলেন অগ্রণী। তিনি তাঁর দলে ছেলেদের রিক্রুট করতে লাগলেন। সন্তোষকুমার মিত্র ইউনিভারসিটিতে ইকনমিক্স্-এ এম. এ. পড়তেন। তিনি পড়া ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। ফরবেশ ম্যানশনে বিপিন গাঙ্গুলী তাকেও দলে টানলেন। কয়েকদিন যেতে না যেতে সন্তোষকুমার মিত্র নিজেও একটি দল গড়তে লাগলেন। পরে কেউ কেউ এ দলটিকে সন্তোষ মিত্রের দল বলেছেন। আবদুর রজ্জাক খান এই বিপ্লবী দলে ছিলেন। শিশিরকুমার ঘোষকেও সন্তোষ মিত্র তাঁর দলে নিলেন। সন্ত্রাসবাদী নেতারা সন্তোষ মিত্রের এই কাজটি একেবারেই সমর্থন করলেন না। কিন্তু সন্তোষ

মিত্র হুগলী গিয়ে অসুস্থ বিপ্লবী নেতা অধ্যাপক জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের বিশেষ আশীর্বাদ লাভ ক'রে ফিরে এলেন।

হ্যাঁ, যখন শিশির ঘোষের কথা আবদুর রজ্জাক খানের নিকটে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলেম তখন তিনি একটি কথা আমায় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কংগ্রেস আফিস হতে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তাঁরা যখন প্রচারে বার হচ্ছিলেন তখন শিশির ঘোষকে কোন দলই সঙ্গে নিতে চাইছিলেন না, তা দেখে খান সাহেবেরাই তাকে সঙ্গে নিলেন।

শিশির কুমার ঘোষের মির্জাপুর স্ট্রীটের দোকানের ওপর কেউ বোমা মেরেছিলেন। তাতে শিশিরের দোকানের শরীক মারা যান, কিন্তু শিশির বেঁচে গিয়েছিল। কোনো কোনো স্মৃতিকথাতে পড়েছি যে শিশির ঘোষের সমপর্যায়ের অন্য একজন উস্কানীদাতা রেষারেষির কারণে শিশির ঘোষকেই পৃথিবী হতে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। মির্জাপুরের বোমার ঘটনার পরে পুলিস শিশির ঘোষকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে। তার পরে শিশির ঘোষের আর কোনো পাত্তা কেউ পাননি।

কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চওয়ালাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। ১৯২৩ সালের মে মাসে কলকাতায় কয়েকটি ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে উল্টাডাঙ্গা ও শাঁখারীটোলা পোস্ট আফিস আক্রমণ উল্লেখযোগ্য। আক্রমণকারীরা উল্টাডাঙ্গা পোস্ট অফিস হতে সামান্য টাকা লুট করতে পেরেছিলেন। শাঁখারীটোলা পোস্ট আফিসে তাঁরা কিছুই লুট করতে পারেননি। তবে, পোস্ট মাস্টারকে তাঁরা গুলি ক'রে মেরে ফেলেছিলেন। সেই সময়ে কোথাও একটি বধূর কানের মার্কাড় তাঁরা খুলে নিয়েছিলেন। এই ঘটনাকে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পলিটিক্যাল মুরগি চুরি' ব'লে প্রচার করেছিলেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ইশ্‌তিহার বণ্টন

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। পার্টির প্রথম মুদ্রিত ইশ্‌তিহার এই সময়ে বিতরিত হয়েছিল। গুজারাতের আহ্‌মদাবাদ শহরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ছত্রিশ বারের (ষট্‌ত্রিংশতম) অধিবেশন তখন চলেছিল। তার প্রতিনিধিগণকে সম্বোধন ক'রে আমাদের পার্টির প্রথম ইশ্‌তিহারখানি (Manifesto to the Delegates of The XXXVI Indian National Congress) রচিত হয়েছিল এবং তাঁদের ভিতরে তা বিতরিতও হয়েছিল।

এই ইশ্‌তিহার মস্কোতে রচিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। রচয়িতা ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে আন্তর্জাতিক পোস্টাল কন্‌ফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্যে বরোদিন মাদ্রিদে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার সময়ে ইয়োরোপের বাজার হতে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের একটি বিরাট বাণ্ডিল তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জন্যে নিয়ে আসেন। অনেক বছর পরে অনেক ভারতীয় সংবাদপত্র হাতে পেয়ে রায় সে-সবের ভিতরে ডুবে গেলেন, তন্ন তন্ন ক'রে সে সব পড়লেন এবং এ-সবের পড়া হতে তাঁর মনে হলো যে কংগ্রেসের আহ্‌মদাবাদ অধিবেশনের প্রতিনিধিদের সম্বোধন করে একখানি ইশ্‌তিহার বা'র করা উচিত। তিনি এই প্রস্তাবটি লেনিন ও স্তালিনের নিকটে পেশ করলেন। তাঁরা পরম উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবের সমর্থন জানালেন। তারপরে রায় ইশ্‌তিহারটি লিখে লেনিন ও স্তালিনের নিকট দাখিল করলেন। স্তালিন তাতে একটা সংশোধনের কথা তুললেন। রায় বলছেন স্তালিনের সংশোধনের কথায় ভারতীয় বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁর নিজের জ্ঞান সত্যই বেড়েছিল। রায় তাঁর প্রোগ্রামে লিখেছিলেন যে সুদখোরী প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হোক। কৃষক সাধারণের জীবনে এ প্রথা অভিশাপস্বরূপ। স্তালিন মন্তব্য প্রকাশ করলেন যে যদি সমস্ত সুদখোরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তা হলে চাষের সময় কৃষকদের যে টাকার প্রয়োজন হয় সে টাকা তাঁরা কোথায় পাবেন? তাঁরা তো কোনো রকমে অতি কষ্টে দিন গুজরান করেন। তাঁদের চাষের সময়ে কম সুদে টাকা ধার পাওয়া প্রয়োজন। সুদখোরেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে কৃষির পক্ষেই ক্ষতিকর হবে। রায় বলছেন, "আমি ভেবেছিলাম যে সুদখোরী প্রথা তুলে দেওয়া হবে কৃষকদের পক্ষে একটা দারুণ বিপ্লবী কাজ। তা কৃষকদের উৎসাহিত করবে"। কিন্তু স্তালিনের মন্তব্য তাঁর চোখ খুলে দিয়েছিল। স্তালিন বলেছিলেন, প্রোগ্রামে থাকা উচিত যে "সুদের প্রথাকে বাগে আনতে হবে; সুদের হার ৬ শতাংশে ধার্য করতে হবে"।

এম· এন· রায়ের লিখিত এই ইশ্‌তিহারখানি লেনিন ও স্তালিনের দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পরে মস্কোতেই মুদ্রিত হয়েছিল। কোনো স্থানে উল্লেখ

করা হয়নি যে তা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ হতে প্রচারিত। তলায় মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জির নাম মুদ্রিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্তত ধরে নিয়েছিলেন যে এখানা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তিহার। ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

"১৯২১ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসে গিয়ে দেখি কমিউনিস্ট প্রচারপত্র গুপ্তভাবে বিলি হচ্ছে। এম· এন· রায়ের পরিচালনায় এদেশে তাঁর গুপ্ত কর্মীরা মতবাদ ছড়াচ্ছিলেন।"

(বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, প্রথম সংস্করণ, ৪৮৩ পৃষ্ঠা)

কমরেড রজনী পাম দত্ত এই ইশ্‌তিহার হতে উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"The Manifesto of the Young Communist Party of India to the Ahmedabad Congress [1921] declared :

"If the Congress would lead the revolution, which is shaking India to the very foundation, let it not put faith in mere demonstrations and temporary wild enthusiasm. Let it make the immediate demands of the Trade Unions its own demands ; let it make the programme of the Kisan Sabhas (Peasant Unions) its own programme ; and the time will soon come when the Congress will not stop before any obstacle ; it will be backed by the irresistable strength of the entire population consciously fighting for their material interests."[১] (INDIA TODAY : 2nd revised Indian edition, 1949, p 323).

নলিনী গুপ্তের দ্বিতীয় ধাপ্পা

ইশ্‌তিহারটি ছাপা তো হয়ে গেল এখন কথা হলো কি ক'রে তা ভারতবর্ষে পাঠানো যায়? মস্কো হতে ডাকে বিভিন্ন ঠিকানায় পাঠালে পোস্ট আফিসের মোহর দেখেই তা আর প্রাপককে দেওয়া হবে না। ইউরোপের বিভিন্ন স্থান হতে বিভিন্ন নামে পাঠানো যায়। কিন্তু তা আঁধারে ঢিল ছোঁড়ার মতো। কোথাও পোঁছাবে, কোথাও পোঁছাবে না। এমন সময় নলিনী গুপ্ত এগিয়ে এলো। বল্‌ল সে-ই নিয়ে যাবে ইশ্‌তিহারের বাণ্ডিল ভারতবর্ষে। আহ্‌মদাবাদ কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত তার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে, (বৈদ্যের সঙ্গে বৈদ্যের পরিচয় থাকতেই হবে!) ইশ্‌তিহারখানি একেবারে তাঁর হাতেই পোঁছিয়ে দেয়া হবে। এম· এন· রায় বলছেন "নলিনী গুপ্তের যেই কথা সেই কাজ" (He was as good as his word)। আসলে স্মৃতিকথা লেখার সময়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতি-বিভ্রম ঘটেছিল। নলিনী গুপ্ত ইশ্‌তিহারের বাণ্ডিল মস্কো হতে সঙ্গে নিয়েই আসেনি। আর, যদি এনেই থাকে তবে মার্সাই বন্দরে জাহাজে চড়ার সময়ে সে বাণ্ডিলটি সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল। সে যখন কলম্বো হতে

১ পুরো ইশ্‌তিহারটির বাঙলা অনুবাদ অন্যত্র দেওয়া হলো।

ধনুষ্কোডি হয়ে কলকাতা পৌঁছেছিল তখন কংগ্রেসের আহ্‌মদাবাদ অধিবেশন চলেছে। এই অধিবেশনের সময়ে তার সঙ্গে আমার প্রায় প্রতিদিনই দেখা হতো। কলকাতা হতে আহ্‌মদাবাদে লোক পাঠানোর সময়ও টাকা হাতে ছিল না। বেশীর ভাগ রিপোর্টে আছে যে নলিনী ২০০ পাউণ্ড হাতে নিয়ে মস্কো ছেড়েছিল সে নিজেও পুলিসের নিকটে তাই বলেছে। একটি রিপোর্টে শুধু আছে যে সে ২৯০ পাউণ্ড পেয়েছিল। বার্লিনে লোভে পড়ে সে অবনমিত মূল্যের জার্মান মার্ক কিনে পাউণ্ড খুইয়েছিল। তা ছাড়া পুলিসের নিকটে স্বীকারোক্তি করতে গিয়ে সে সব কথাই বলেছে, এই ইশ্‌তিহারখানির কথা সে কোথাও উল্লেখ করেনি। কলকাতার জন্য কমপক্ষে ৫০ খানি ইশ্‌তিহারও তো সে সঙ্গে আনতে পারত। কিন্তু একখানিও আনেনি।

মস্কোতে মুদ্রিত এবং মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জি স্বাক্ষরিত ইশ্‌তিহার কিন্তু আহ্‌মদাবাদ কংগ্রেসের অধিবেশনে গোপনে বিতরিত হয়েছিল। যাঁরা বিতরণ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন আজমীঢ়ের লোক। নলিনী গুপ্ত যে ইশ্‌তিহারখানি ভারতে আনবেন বলেছিলেন সে কথা শুধু এম· এন· রায়ের মনে আছে। কাজে কিন্তু তিনি প্রথমে যা ভেবেছিলেন তাই করেছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন স্থান হতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ইশ্‌তিহারগুলি ডাকে পাঠানো হয়েছিল। আমি তখন কলকাতায় এই ইশ্‌তিহার পাইনি। ৪৬ বছর পরে এই ইশ্‌তিহারেরই একখানি এখন কলকাতায় পেলাম। এখানা ডাকে এসেছিল। তারই বাঙলা তর্‌জমা এখানে ছাপা হচ্ছে। আহ্‌মদাবাদ কংগ্রেস হতে গয়া কংগ্রেস পর্যন্ত লেখা এম· এন· রায় ও তাঁর প্রথমা স্ত্রী এভেলিন রায় লিখিত প্রবন্ধগুলি একখানি পুস্তকে মুদ্রিত হয়েছে। পুস্তকের নাম "অসহযোগের এক বছর—আহ্‌মদাবাদ হতে গয়া" (One year of Non-co-operation from Ahmedabad to Gaya, by Manabendra Nath Roy and Evelyn Roy) এই পুস্তকে আহ্‌মদাবাদ কংগ্রেসে বিতরিত ইশ্‌তিহারও আছে। কার মারফতে জানিনে, আজমীঢ়ে ইশ্‌তিহারখানি বেশী সংখ্যা পৌঁছেছিল।

১৯৬৭ **সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে** কুমারানন্দ রাজস্থানের বেওয়ার হতে আমায় লিখেছেন ঃ

"আপনি যে বিষয়ের উত্তর চাহিয়াছেন তাহা লিখিতেছি।

"১। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি মৌলানা হস্‌রৎ মোহানীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলাম। আমার অন্য একটা প্রস্তাব ছিল।......মহাত্মা গান্ধী ঐ প্রস্তাবটা যাহাতে আমি move না করি সেই জন্য আমাকে অনেক বোঝান। কিন্তু আমি তাঁহার কথায় রাজী না হওয়াতে সেই কংগ্রেসের Acting president হাকিম আজমল খাঁ ঐ প্রস্তাবটি move করিতে অনুমতি না দেওয়াতে আমি মৌলানা হস্‌রৎ মোহানীর প্রস্তাব সমর্থন করি।

২। 'আহ্‌মদাবাদ কংগ্রেসে M. N. Roy (এম· এন· রায়) এবং অবনী মুখার্জী দস্তখত সহ যে ইশ্‌তিহার বিতরিত হইয়াছিল তাহার কয়েকখানা অনেক-দিন আমার কাছে ছিল। কিন্তু বার বার পুলিসের তল্লাশীতে সেই ইশ্‌তিহার পুলিসের হস্তগত হইয়াছে, ফিরাইয়া দেয় নাই। আজমীঢ়ের বাঙ্গালী কালীচরণ দত্ত (পরলোকে) এবং গোপীনাথ (এখন স্বামী কৃষ্ণানন্দ, ৮৫ বৎসর) এই দুইজনে এবং আরও ৫/৭ জন লোক আমাকে টানিয়া লইয়া (গিয়া) ইশ্‌তিহার বিতরণ করিয়াছিল। অবশ্য ইহাদের পিছনে অন্য আরও লোক ছিল যাহাদের

আমি পূর্বে দেখি নাই। আমার, যতদূর মনে আছে আজমীঢ়ের মহারাষ্ট্র নিবাসী পাণ্ডে১ (revolutionary, 1939-এ underground অবস্থায় ওয়ার্ধাতে মারা যান) নিজে দস্তখত করিয়া ঐ ইশ্‌তিহার বিতরণ করিয়াছিলেন।......

"১৯২১ সালে রাজস্থান সেবা সঙ্ঘের তরফ হইতে "রাজস্থান পত্রিকা" নামে এক weekly paper কিছুদিন প্রকাশ হইয়াছিল। তাহাতেও M. N. Roy ও অবনী মুখাজীর দস্তখতের ইশ্‌তিহার ছাপা হইয়াছিল।......

"আশা করি আপনি ভাল আছেন। পত্র দুইখানা পাইয়া খুবই খুসী হইয়াছি। ক্রান্তিকারী অভিনন্দন সহ

কুমারানন্দ"

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আহ্‌মদাবাদে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ছত্রিশ বারের অধিবেশনে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জী স্বাক্ষরিত যে ইশ্‌তিহার বিতরিত হয়েছিল তা ছিল **ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রকাশিত ইশ্‌তিহার**। এই ইশ্‌তিহার যাঁরা সংগোপনে আহ্‌মদাবাদ কংগ্রেসে বিতরিত হতে দেখেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকে এখনও বেঁচে আছেন। বেওয়ারে বেঁচে আছেন কুমারানন্দ। তাঁর পত্র আমি এখানে ছেপে দিলাম। রাঁচিতে বেঁচে আছেন ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়,—এম· এন· রায়ের পুরনো পার্টির একজন বিশিষ্ট নেতা। ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের লেখাও আমি তুলে দিয়েছি। রায় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, দু'জন ব্যক্তি ইশ্‌তিহারখানি নিজেদের নামে ছেপে বিতরণ করেছিলেন এবং কংগ্রেসের সভায় প্রস্তাব হিসাবে উত্থাপনও করেছিলেন। ইশ্‌তিহারখানি প্রস্তাবরূপে উত্থাপন হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কুমারানন্দ বলেছেন যে দত্তাত্রেয় পরশুরাম পাণ্ডে নিজের নামে ইশ্‌তিহারখানি ছেপে বিতরণ করে-ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয় ছিলেন, কিন্তু থাকতেন আজমীঢ়ে।

১ দত্তাত্রেয় পরশুরাম পাণ্ডে

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মুদ্রিত ইশ্‌তিহার

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৩৬তম অধিবেশনে প্রতিনিধিগণের প্রতি ইশ্‌তিহার

সহযাত্রী দেশবাসীগণ,

আমাদের দেশের ইতিহাসে এক অত্যন্ত সংকটের মুহূর্তে আমাদের জাতীয় জীবন ও প্রগতির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন প্রশ্ন সমাধানের জন্য আজ আপনারা মিলিত হয়েছেন। ভারতবর্ষ আজ এক বিরাট বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে—শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও এই বিপ্লব ঘটবে। এই বিরাট ভূখণ্ডের অধিবাসী বিশাল জনস্রোত এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে। বহু শতাব্দীব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নির্যাতন থেকে উদ্ভূত সামাজিক জড়তা থেকে এই জনসংঘ মুক্তি পাচ্ছে। জাতীয় কংগ্রেস এই গণ-জাগরণের নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করেছে। অত্যন্ত কঠিন আপনাদের দায়িত্ব। আপনাদের সামনে যে পথ সেখানে নানা দুরতিক্রম্য বাধা এবং কষ্টের ও প্রতারণার ফাঁদ পাতা আছে। ভারতবর্ষের মানুষকে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে পরিচালিত করার দায়িত্ব অতি পবিত্র ও মহান। আপনারা স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব বরণ করেছেন। জাতীয় কংগ্রেস আর অলস বিতর্ক বা অনাবশ্যক প্রস্তাব পাসের ছুটির দিনের মিলন বাসর নয়। কংগ্রেস আজ রাজনৈতিক সংস্থায় পরিণত হয়েছে—সে আজ জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের আসনে।

সম্প্রতি অর্জিত রাজনৈতিক গুরুত্বের ফলে কংগ্রেসের তত্ত্বগত ভিত্তির পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের আর চলা সঙ্গত নয়। এর কার্যসূচী ও সিদ্ধান্তসমূহ কোনো নেতার খেয়ালখুশি সংস্কার বা ধারণার দ্বারা নির্ধারিত না হয়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। কংগ্রেস যখন নামেই 'জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল কার্যত মুষ্টিমেয় কয়েকজন খেয়ালখুশির' আসর ছিল, তখন এইভাবেই কাজ চলত। মেহতা-গোখলে-বোস-ব্যানার্জি গোষ্ঠী অধ্যুষিত পুরনো কংগ্রেস আজ মৃত। সক্রিয় রাজনীতির আসর থেকে সে গোষ্ঠী বিতাড়িত হয়ে গেছে—কারণ তাঁদের মতলব ছিল তাঁদের গোষ্ঠীর স্বার্থে সমগ্র জাতিকে ব্যবহার করা। যে মানুষ নিয়ে তাঁদের কাজ করার কথা, তাদের কথা তাঁরা ভাবেনওনি, ভাববার সাধ্যও তাঁদের ছিল না। সাধারণ মানুষের মনোভাব বুঝতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা নিজেরা কী ভাবতেন বা চাইতেন তা তাঁরা বেশ ভালোভাবেই জানতেন কিন্তু সাধারণ মানুষ তাঁর মঙ্গল ও প্রগতির জন্য কী চায় সেকথা তাঁরা জানতেনও না, জানতে চাইতেনও না। অথচ এই জনগণ নিয়েই জাতি এবং কংগ্রেস দাবি করত যে তারাই জাতির প্রতিনিধি! পুরনো কংগ্রেস রাজনীতির ক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে গেছে, কারণ

সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তারা নিজেদের বলে মনে করতে পারেনি। তারা ধরে নিয়েছিল যে প্রশাসনিক এবং কর সম্বন্ধীয় সংস্কারের দাবি বুঝি সাধারণ মানুষের স্বার্থেরই অনুকূল এবং সে দাবি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন। নরমপন্থী প্রবীণ নেতারা মনে করতেন যে তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি বুঝি স্বতঃই তাঁদের জাতির নিরঙ্কুশ নেতৃত্বে স্থাপন করেছে। এই শোচনীয় আত্মম্ভরিতার ফলেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শ্রদ্ধেয় জনকগণ তাঁদের আপন সন্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এই আত্মম্ভরিতার জন্ম হয় সমাজ-শক্তির সম্বন্ধে ভ্রান্ত বা বিকৃত উপলব্ধি থেকে। বস্তুতপক্ষে এই সমাজ-শক্তিই সকল আন্দোলনের মূলে থেকে যথার্থ বল সঞ্চার করছে। নেতৃবৃন্দের ভ্রান্ত বা বিকৃত চিন্তাই তাঁদের নিজেদের অবমাননা, রাজনৈতিক মৃত্যু ও সর্বনাশ ডেকে এনেছে। আপনারা কংগ্রেসের নবীন নেতৃবৃন্দ, একই ভুল আবার করবেন না। মনে রাখবেন একই ভুল একই বিপর্যয় ডেকে আনবে।

নতুন নেতৃত্বে কংগ্রেসের কার্যসূচী হল ন্যূনতম সময়ের মধ্যে স্বরাজলাভ করা। সাংবিধানিক বাদানুবাদের পথে সামান্য মামুলী সংস্কারের দুর্বল কৌশল পরিহার করা হয়েছে। কংগ্রেস এবার গর্বের সঙ্গে তার 'যে-কোনো উপায়ে স্বরাজ'-এর দৃপ্ত পতাকা উঁচুতে তুলে ধরেছে। এই পতাকার নীচে ভারতের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানানো হয়েছে। আপনাদের অনুপ্রেরণায় সাধারণ মানুষ লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত এ পতাকা উঁচুতে তুলে ধরে থাকবে। এই লক্ষ্য বাস্তবিকই মহান। ভারতীয় জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে এ তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু জাতির নেতা হিসাবে শুধু লক্ষ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশেই কংগ্রেসের কর্তব্য শেষ হবে না, প্রত্যেকটি স্তর অতিক্রম করে অন্তিম লক্ষ্যে এই সংগ্রামকে পরিচালিত করাই তার দায়িত্ব। গত এক বছরে কাজ দেখে মনে হয় কংগ্রেস তার দায়িত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল এবং সেই দায়িত্ব পালনের সর্বোত্তম উপায় উদ্ভাবনে তারা সচেষ্ট। জনগণকে স্বরাজের জন্য সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ সংগ্রামে তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, কারণ একতা ভিন্ন কিছুতেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না।

পুরনো কংগ্রেসের এই বিপর্যয়ের কারণ কী? সে জনগণের সামনে জাতীয় প্রশ্নকে জীবন-সমস্যা হিসাবে তুলে ধরতে পারেনি। পুরনো নেতৃত্বের অধীনে কংগ্রেস রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর আর মামুলী সংস্কারবাদের বদ্ধ জলায় আটকে পড়েছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক কচকচি আর সংস্কারবাদের পরিবর্তে কতকগুলি ভাববাদী আদর্শ আর রাজনৈতিক বিভ্রান্তির মধ্যে গিয়ে পড়লেও বিশেষ কোনো সুবিধা হবে না। তার নামের যোগ্য হতে গেলে এবং সামনের কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য জাতীয় কংগ্রেসকে কিছুতেই মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ভাববাদী আদর্শের পথে ভেসে গেলে চলবে না—সেই কতিপয় ব্যক্তি যতই না মহৎ দেশপ্রেমিক হোন। রূঢ় বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করতে হবে, নিষ্ঠার সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের অভাব ও অত্যাচারের খবর পর্যালোচনা করতে হবে। আমাদের সামনে তো কেবল রাজনীতির কূট খেলা নয়, সামনে এক কঠিন সামাজিক সংগ্রাম।

৩৬তম কংগ্রেসের সামনে আজ সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা জাতীয় সংগ্রামে জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা জাগিয়ে তোলা। সমস্যা হল অশিক্ষিত জনসাধারণকে কীভাবে স্বরাজের পতাকাতলে নিয়ে আসা যায়। এর জন্য সবচেয়ে প্রথমে জানতে হবে জনগণের প্রকৃত দুঃখ-কষ্ট কোথায়? তারা কী চায়? পার্থিব জীবনধারণের জন্য কী তাদের প্রয়োজন? জনগণের আজকের দুঃখদুর্দশা মোচনের কার্যক্রমকে

কংগ্রেসের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেই জনগণের যথার্থ সক্রিয় নেতৃত্ব গ্রহণ করা যাবে।

কয়েক হাজার উচ্ছৃঙ্খল, দায়িত্বহীন ছাত্র, কিছু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী আর তাদের পিছনে হঠাৎ-ক্ষেপে-ওঠা উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত জনতা—এরা কখনোই একটি জাতির রাজনৈতিক সংগঠনের সামাজিক ভিত্তি হতে পারে না। শহরের মেহনতী মানুষ আর গ্রামের অগণিত নিরক্ষর জনসাধারণকে আন্দোলনে টেনে আনতে পারলেই সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হবে। কেমন করে একে সম্ভব করে তোলা যাবে সেটাই আজ কংগ্রেসের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। কারখানার মেহনতী মজুর আর মাঠের খেটে-খাওয়া কৃষককে একথা ঠিকমতো বুঝিয়ে দিতে হবে যে জাতীয় স্বাধীনতাই তার দুর্দশার অবসান ঘটাবে। এটা কি সত্য নয় যে ধনী ভারতীয়দের কলে-কারখানায় যে-লক্ষ লক্ষ মজুর প্রাণান্তকর পরিশ্রম করছে তারা অসহনীয় অবস্থায় দিনযাপন করছে? সেখানে তারা যে-ব্যবহার পায় তাতে যে কোনো মুহূর্তে বিক্ষোভে ফেটে পড়া উচিত। এই ধনী ভারতীয়দের মধ্যেই অনেকে রয়েছেন যাঁরা আবার আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়। অনেক অতি বিবেচক ব্যক্তি এজাতীয় অস্বস্তিকর প্রশ্নকে যদিও জাতীয় স্বার্থের দোহাই পেড়ে ধামাচাপা দিতে চাইবেন। এঁদের যুক্তি হল, 'আগে আমরা বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি পাই'। এ জাতের হিসেবী রাজনৈতিক বিচক্ষণ উক্তি উচ্চশ্রেণীর মানুষের কাছে প্রশংসা পেতে পাবে, কিন্তু দরিদ্র কৃষক-মজুর আজ ক্ষুধায় জর্জরিত। তাদের যদি লড়াইয়ের ময়দানে টেনে আনতে হয়—সে-লড়াইকে তাদের নিত্য জীবন-ধারণের লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। 'চাষীর হাতে জমি আর মজুরের মুখে রুটি'--এই স্লোগানেই বৃহত্তর জনসাধারণ সচেতনভাবে তাদের আপন স্বার্থ-রক্ষার তাগিদে লড়াইয়ে নেমে আসতে উদ্বুদ্ধ হবে। জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের ধোঁয়াটে আদর্শ তাদের জড়ত্বকে ভাঙতে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে কোনো নেতার প্রতি মোহ সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু সে হবে অত্যন্ত শিথিল ও ক্ষণস্থায়ী।

কংগ্রেস কি করে ভাবে যে খিলাফতের নামে বা সেভের্সের চুক্তির সংশোধনের দাবিতে তারা স্থায়ী চেতনা ও প্রেরণা সঞ্চার করতে পারবে? শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী-দের পক্ষে এসব দাবীর পিছনকার উন্মার্গী রাজনীতি বোঝা হয়তো সম্ভব, কিন্তু যে-ভারতীয় জনসাধারণ কেবল বিদেশী শাসনের চাপেই নয়, আপন দেশের ধর্ম ও সমাজের হাজার কুসংস্কারের নাগপাশে অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে ডুবে রয়েছে তাদের পক্ষে এ রাজনীতি বুঝে ওঠা একেবারেই অসাধ্য। জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস যদি তাদের নিজেদের মতলব হাসিলের অপচেষ্টা করে, তবে তা থেকে কখনোই অভিপ্রেত ফল প্রত্যাশা করা যাবে না। যদি ভারতের বৃহত্তর জনসাধারণকে জাতীয় সংগ্রামে টেনে আনতে হয়, তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তা করা যাবে না। তাদের চেতনাকে সর্বপ্রথম জাগ্রত করতে হবে। কিসের জন্য তারা লড়ছে সেটা তাদের বুঝতে দিতে হবে। এবং তাদের এই লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে নিত্য জীবনের অভাব দুঃখদুর্দশা নিরসন সম্ভব হবে—এ উপলব্ধি তাদের মধ্যে আনতে হবে। সাধারণ মানুষ কী চায়? তাদের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন দুবেলা পেটভরে খেতে পাওয়া—সে তো তারা প্রায় কখনোই পায় না। এ রকম মানুষের সংখ্যাই শতকরা নব্বই। সুতরাং এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে এই সাধারণ মানুষের স্বার্থানুকূল নয় এমন কোনো আন্দোলনই স্থায়ী গুরুত্ব বা প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি করতে পারবে না। কংগ্রেসের কার্যসূচী থেকে ভাবালুতাকে সম্পূর্ণ-

ভাবে ছেঁটে ফেলতে হবে। ধোঁয়াটে ভাববাদের স্বপ্নচূড়া থেকে তাকে নামিয়ে আনতে হবে। কংগ্রেসকে সাধারণ মানুষের জীবনধারণের অপরিহার্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। মেহনতী মানুষের ন্যূনতম আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখা দিক কংগ্রেসের মধ্যে। ভারতবর্ষের জনগণ মেসোপটেমিয়া বা আরব বা কনস্টান্টিনোপলের মতো অজানা অচেনা দেশের জন্য লড়বে কেন, তাদের সংগ্রামের লক্ষ্য হবে তাদেরই জীবন ও পরিবেশ—তাদেরই ঘরবাড়ী জমি আর কলকারখানা। ক্ষুধার্ত মানুষ একটা ভাববাদী অবাস্তব আদর্শ সামনে রেখে লড়াই করে যাবে এটা আশা করা যায় না। কংগ্রেস কি চিরকালই জনগণকে আরও নির্যাতন সহ্য করতে, আরও ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়ে যাবে? ভারতীয় জনগণ তো সহনশীলতা এবং ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। তাদের যুগসঞ্চিত এই দুঃখ-কষ্টের অবসানের স্পষ্ট সম্ভাবনাকে তাদের দৃষ্টির সামনে আনতে হবে। তাদের অর্থনৈতিক সংগ্রামে সাহায্য করতে হবে। কংগ্রেসের পক্ষে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের সুস্পষ্ট কার্যসূচী প্রণয়নের কাজ আর ফেলে রাখা উচিত হবে না। ৩৬তম কংগ্রেসের সামনে প্রধান কাজ—অত্যাচারক্লিষ্ট জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের উদ্দেশ্যে এবং তাদের বর্তমানের শোচনীয় অবস্থার উন্নতির দাবীতে একটি গঠনমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করা।

মিঃ গান্ধী ঠিকই বলেছেন যে, 'কংগ্রেসকে কতকগুলি সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যবহারজীবীর বিতর্ক সভা করে আর রাখা চলে না'। কিন্তু ওই একই বিবৃতিতে তিনি চেয়েছেন যে কংগ্রেস 'ব্যবসায়ী আর শিল্পপতিদের সংস্থা হয়ে উঠুক'। তা যদি হয় তবে বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে এর কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে না। এই কংগ্রেসও তার পূর্বগামীর চেয়ে বেশী জাতীয় চরিত্রসম্পন্ন হয়ে উঠবে না। এর পরিণতিও খুব সম্মানজনক হবে না। কংগ্রেস যদি 'ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি' শ্রেণীর স্বার্থই দেখে, তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করে তবে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় কংগ্রেস ব্যর্থ হবে। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে কংগ্রেস বৃহত্তর জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি গোষ্ঠীর পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে এই জাতীয় সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব নয়। এমনকি বুদ্ধিজীবী এবং দোকানদার শ্রেণীও এ লড়াইয়ে তেমন কিছু শক্তি সঞ্চার করতে পারবে না। জনসাধারণের শক্তি অপরিহার্য। সাধারণ মানুষের সচেতন সংগ্রামেই দেশ স্বাধীন হবে, স্বরাজ সম্ভব হবে। কংগ্রেসের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবার জন্য কী করে জনসাধারণের শক্তিকে প্রয়োগ করা যায় সেটাই বিচার্য। কঠিন লড়াইয়ের ময়দানে জনগণকে টেনে আনতে হবে। কিন্তু কংগ্রেসের কার্যসূচীতে দেখা যায় জনগণের স্বার্থের প্রতি অপরিসীম ঔদাসীন্য এবং সেই স্বার্থ উপলব্ধির বোধশক্তির শোচনীয় অভাব। উপরন্তু দেখা যায় যে কংগ্রেস জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ পুরামাত্রায় নিতে চায় এবং তার পরেও আশা করে যে জনসাধারণ অন্ধভাবে কংগ্রেসকে মেনে চলবে। তা কখনোই হতে পারে না। নেতা যদি তাঁর অনুগামীর স্বার্থের প্রতি উদাসীন হন, তবে দুই পক্ষের বিরোধ ও ব্যবধান অচিরেই দেখা দেবে। জনগণ জাগছে। তাদের প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য লড়াইয়ের প্রস্তুতি গড়ে উঠছে, তাদের অবস্থার কোনো উন্নতি না ঘটিয়ে, তাদের নীচে ফেলে রেখে তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কৌশল শীঘ্রই ব্যর্থ হবে। কংগ্রেস যদি ভুল ক'রে বিত্তশালী শ্রেণীর রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়, সে অবস্থায় তাকে জাতির নেতৃত্বের দাবী ছাড়তে হবে। অভ্রান্ত সমাজশক্তি কাজ করে যাচ্ছে। তার ফলে শ্রমিক-কৃষক তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে অচিরেই

সজাগ হবে। অচিরেই তারা নিজেদের রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তুলে উচ্চ শ্রেণীর রাজনীতিবিদদের দ্বারা বিপথে চালিত হতে অস্বীকার করবে।

অসহযোগ আন্দোলন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে অক্ষম। বাস্তব ঘটনাকে স্বীকার করার যদি আমাদের সাহস থাকে, তবে স্বীকার করতেই হবে যে অসহযোগ ব্যর্থ হয়েছে। এ আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য কারণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর কোনো বক্তব্য ছিল না। যাদের হাতে অসহযোগ সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হতে পারত সেই শ্রমিকশ্রেণীকে আন্দোলনের কর্মসূচী থেকে শুধু বাদই দেওয়া হয়নি—অসহযোগের উদ্গাতা ঘোষণা করেছেন, 'কারখানার মজুরকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা বিপজ্জনক'। সুতরাং যে-শ্রমিকশ্রেণী তার অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থার সুযোগে অসহযোগকে সফল করতে পারত তাকেই বাদ দেওয়া হল। তার কারণ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন নয়। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রহরীর কাজ যারা নিয়েছে তারা মনে মনে ভয় পাচ্ছে, পাছে দিনমজুর শ্রমিকশ্রেণী আবার বিত্তশালী সম্প্রদায়ের শোষণের অধিকার—যা তারা সকল সভ্য সমাজে পেয়েছে, সেই অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে বসে। অন্যান্য শ্রেণী যাদের কাছে অসহযোগের আহ্বান রাখা হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই অর্থনৈতিক কারণে এই সমাজব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত তাদের পক্ষে এই সমাজব্যবস্থাকেই অস্বীকার করা অসম্ভব। নেতারা 'শয়তানের সমাজ' বলে যতই না নিন্দা করুন।

অসহযোগ হযতো লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে চলতে পারে—তার চেয়ে বলা সঙ্গত যে বিদেশী আমলাতন্ত্রকে ব্যতিব্যস্ত করবার উপযোগী। কিন্তু আসলে এ তো ধ্বংসাত্মক। কারণ বিদেশী শাসকের অবসানের কথাতেই সাধারণ মানুষের মনে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি হবে না। তাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে হবে যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ফলে তাদের কি কি সুবিধা হবে। তাদের মনে এই উপলব্ধি জাগাতে হবে যে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য তাদের জীবনধারণের নানা সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে। কতকগুলি ফাঁকা বুলি আর অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিতে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। কংগ্রেসকে কাজ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে তারা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে আগ্রহী এবং প্রমাণ করতে হবে যে তারা দরিদ্রের প্রতিদিনের অভাব অভিযোগকে অবহেলা করে সুদূর ভবিষ্যতে একটা অলীক আজাদীর সন্ধানে ছুটছে না।

দেশীয় শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষা এবং তাদের শিল্প প্রসারের স্বার্থেই স্বদেশী ও বয়কটের কার্যসূচী গৃহীত। হয়তো এ ইংরেজ ধনিকগোষ্ঠীকে আঘাত করতে সক্ষম হবে এবং তার ফলে হয়তো ইংরেজ সরকারের উপর পরোক্ষ চাপও সৃষ্টি করবে। কিন্তু ভ্রান্ত অর্থনীতির ভিত্তিতে রচিত এই কার্যসূচীর চূড়ান্ত সাফল্য সম্বন্ধে স্বাভাবিক ভাবেই সংশয় জাগে। কংগ্রেসের পতাকাতলে জনগণকে সমবেত করার স্লোগান হিসেবে বয়কট ব্যর্থ হবেই। কেননা বৃহত্তর জনসাধারণের অর্থ-নৈতিক অবস্থার সঙ্গে এর কিছুমাত্র যোগ নেই বরং বয়কট কার্যত তাদের প্রতিকূল। কংগ্রেস যদি স্বপ্ন দেখে থাকে যে বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে উন্মত্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করে তার ভিত্তিকে দৃঢ় করবে, তবে সে চোরাবালির উপর সৌধ নির্মাণের চেষ্টা করছে। এই উত্তেজনা বেশীকাল টিঁকতে পারে না। কিছুদিনের মধ্যেই জনগণের বস্ত্রের অভাব ঘটবে এবং যতদিন বাজারে বিদেশী বস্ত্র সস্তা থাকবে ততদিন গরীব মানুষকে কিছুতেই এ প্রতিজ্ঞা করানো যাবে না যে তারা সেই বিলিতি কাপড় কেনার চেয়ে বস্ত্রহীন হয়ে থাকবে। চরখা যথাযথভাবেই যাদুঘরে নির্বাসিত হয়েছে। এই যন্ত্রযুগে চরখা আবার ফিরে আসবে এবং ৩২

কোটি লোকের প্রয়োজন মেটাবে এ চিন্তা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। বয়কট শিল্পপতিদের সমর্থন পাবে, কিন্তু ক্রেতাদের পূর্ণ সমর্থন কখনোই পাবে না। সুতরাং আত্মার বিশুদ্ধীকরণ জাতীয় উদ্ভট মতবাদ বিত্তশালী বুদ্ধিজীবীদের কাছে ভালো লাগতে পারে, কিন্তু ক্ষুধিত মানুষের কাছে এর মোহ চিরস্থায়ী হতে পারে না। বাঁচার তাগিদ কোনো বাধাই মানে না। এবং রাজনৈতিক আন্দোলনকে বাস্তব যুক্তি আর প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে যাওয়া যায় না। অনেকে আবার মনে করেন যে ভারতীয় সভ্যতা হল আধ্যাত্মিক আর ভারতীয় জনগণ বাইরের জগতের মানুষের মতো বাস্তব যুক্তি ও অনুশাসনের অধীন নয়—এ ধারণা সর্বৈব ভ্রান্ত।

যখন প্রমাণ হয়ে গেছে যে অসহযোগ তেমন কিছু আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, ৩৬তম কংগ্রেস তা সত্ত্বেও অসহযোগের পথেই আরো এক পা এগোতে চায়। কংগ্রেস নেতারা বেশ বুঝতে পারছেন যে জনসাধারণের মধ্যে খিলাফৎ ও অসহযোগের উৎসাহে দিনে দিনে ভাঁটা পড়ছে। কয়েক লক্ষ সদস্য বৃদ্ধি বা তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারের চাঁদা ওঠাকে কংগ্রেসের পিছনে জনসমর্থনের লক্ষণ বলে ধরা চলে না। সদস্য খাতায় নাম লেখালে বা স্বরাজ ভাণ্ডারে এক টাকা চাঁদা দিলেই মনে করার কারণ নেই যে সেই সদস্য সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। সম্প্রতিকালে দায়িত্বশীল কংগ্রেস নেতারা বার বার সভায় সংবাদপত্রে দলগত ঐক্য বা আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধে নৈরাশ্য প্রকাশ করছেন। কৃত্রিম উপায়ে ফাঁপানো উদ্দীপনাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁরা নতুন কোনো উত্তেজনার ফিকিরে আছেন। কিন্তু সচেতনভাবেই হোক আর অজ্ঞতাবশেই হোক তাঁরা কিছুতেই গণ-অসন্তোষের মূল কারণে হাত দেবেন না বা জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই অসন্তোষকে বৃহত্তর সংগ্রামে পরিচালিত করবেন না। অন্যদিকে আরেকটি দায়িত্বজ্ঞানহীন পথ নেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের অপেক্ষায় না থেকে সর্বভারতীয় কমিটি আইন অমান্যের সুপারিশ করে বসে আছেন। কিন্তু সে প্রস্তাবের ভাষা থেকেই দেখা যায় যে এই নতুন আন্দোলন অধিকতর সার্থকভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে কিনা প্রস্তাবকদের নিজেদের মনেই তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। প্রস্তাবের ভাষায় আছে—'যাঁরা সরকারী চাকরি ছাড়তে সক্ষম'—সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯০ জন এই অকিঞ্চিৎকর বেতনে যেখানে দুবেলা দুমুঠো ভাতের সংস্থান করতে পারেন না সেখানে এই হুকুমনামার সাড়া যে মোটেই চমকপ্রদ হবে না সে তো সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

কার্যত আইন অমান্য হবে জাতীয় ধর্মঘটের শামিল। যদি প্রত্যেকে কাজ বন্ধ করে তবে সরকার অচল হয়ে পড়তে বাধ্য। কিন্তু কংগ্রেস কি নিশ্চিত যে সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের ডাকে সাড়া দেবে? তাই যদি হয় তবে বলতে হবে যে তারা জনসাধারণের বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে শোচনীয়ভাবে অজ্ঞ এবং যে অর্থ-নীতির চাপ সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে সে সম্বন্ধেও তাদের কোনো ধারণা নেই। সামরিক ও বেসামরিক চাকরি ছেড়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হবে—কংগ্রেস কি তাদের কাজের সংস্থান করে দিতে পারবে? একটা কথা মনে রাখা দরকার যে সরকারী দফতরের নিম্নমধ্যবিত্ত চাকুরিয়ারা কিছুতেই কায়িক শ্রমে রাজী হবে না। কংগ্রেসী নেতারা যে এই জটিলতা বোঝেন না তা নয়। মিঃ গান্ধীর ভাষায়, 'যে-সব সৈনিক সেনাবাহিনীর কাজ ছেড়ে আসবে তাদের কাজ দিতে তারা প্রস্তুত নয়'। আসামের চা-বাগান থেকে চলে-আসা মজুরদের শোচনীয় অবস্থার কথা এখনও কেউ ভোলেননি। কি করে ভরসা রাখা যায় যে

আবার একই কৌশল অনুসরণ করা হবে না? জাতির রাজনৈতিক সংস্থা কেবল সভা করেই তার দায়িত্ব পালন শেষ করতে পারে না। আমাদের লক্ষ্য তো শুধু সরকারকে উত্যক্ত করা নয়, আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়ছি। যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস একটা গঠনমূলক কার্যসূচীর ভিত্তিতে তাদের আন্দোলন না চালাচ্ছে, যতদিন না তারা আরও দায়িত্বশীল এবং আরও কম আত্মকেন্দ্রিক হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত স্বাধীনতার লড়াই কিছুতেই সফল হবে না।

লঘুচিত্তে আইন অমান্যের প্রস্তাব গ্রহণ করলে কংগ্রেসকে হাস্যাস্পদ হতে হবে। কারণ যত আশাবাদ যত উত্তেজনাই থাক না কেন কংগ্রেস জাতির সকল শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না। আর যে অগণিত শ্রমিক-কৃষক জাতির সবচেয়ে বড় শরীক তাদের বাস্তব উন্নতি ও কল্যাণের কথা কংগ্রেস সামান্যই বলে। যখন লম্বা লম্বা বক্তৃতার পিছনে কোনো স্থায়ী কার্যসূচী নেই, সেখানে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে কী লাভ? জনগণের জীবনীশক্তিকে ওইসব ফাঁকা কথায় উজ্জীবিত করা যাবে না, সরকারকেও সন্ত্রস্ত করা যাবে না। অবশেষে তা শুধু বক্তাকেই বেইজ্জত করবে। খিলাফৎ উদ্ধার না হলে জেহাদ ঘোষণা করা হবে এ হুমকি তো বস্তাপচা হয়ে গেছে। মাসের পর মাস স্বরাজ লাভের তারিখ পিছিয়ে দিলে বুদ্ধিমান মানুষের মনে আর বিশ্বাস জাগানো যাবে না। কংগ্রেসের লম্বা লম্বা প্রস্তাবগুলি কিছুতেই ভাষার ফুলঝুরির বাইরে আসতে পারে না কেন? কারণ কংগ্রেস সমাজশক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কখনোই তাদের কার্যসূচী নির্ধারণ করে না।

সমস্ত দেশজুড়ে শহরের ধর্মঘট আর গ্রামের জমির লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে জনশক্তির যে-বিপুল আলোড়ন দেখা দিয়েছে তা কংগ্রেসেরই আন্দোলন—বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলনেরই ফল এরকম ধারণা একেবারেই মিথ্যাচার। 'শয়তানী বিলিতি সভ্যতার বিরুদ্ধে' তীব্র ঘৃণা বা পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে লম্বা লম্বা গরম বক্তৃতা বা খিলাফতের প্রস্তাব কোনোটিই নির্যাতিত মানুষের অসন্তোষের জন্য দায়ী নয়। মারখাওয়া মানুষ আজ নিষ্ক্রিয়তার হাতে আত্ম-সমর্পণের পথ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেছে। এই গণ-জাগরণই জাতীয় সংগ্রামের যথার্থ শক্তি ও মর্যাদা সঞ্চার করেছে। এই গণ-জাগরণের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে বহু যুগসঞ্চিত অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামাজিক দাসত্বের ইতিহাসের মধ্যে। গণ-বিদ্রোহ আজ বিত্তশালী শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, সে-শ্রেণী ইংরেজ কি ভারতীয় সে বিচার আজ নিরর্থক। এই শোষণ দীর্ঘকাল ধরেই বেড়ে চলেছিল, তবে যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক সংকট একে তীব্রতর করে তুলেছে। জনগণের তীব্র অসন্তোষ যুদ্ধের অব্যবহিত পরে প্রকাশ্য বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে। কংগ্রেস বলছে এ বিক্ষোভের কারণ সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। তা ঠিক নয়। আসলে যুদ্ধের অব্যবহিত পরে যে অস্বাভাবিক বাণিজ্য স্ফীতি ঘটেছে তার ফলে অর্থনৈতিক শোষণ এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে যে মানুষ আজ ক্ষেপে উঠেছে—ধৈর্যের সমস্ত বাঁধ আজ ভেঙ্গে গিয়েছে।

নতুন নতুন শিল্প প্রসারের ফলে হাজার হাজার শ্রমিক জনাকীর্ণ শহরে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে এবং সেখানে তাদের বীভৎস অবস্থার মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণীর আকস্মিক ঐশ্বর্যস্ফীতি স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা বাড়িয়ে দিয়েছে। শহরের জীবন শ্রমিকের কাছে নতুন চিন্তা খুলে দিয়েছে। এতকাল তারা তাদের শোচনীয় অবস্থাকে ঈশ্বরের বিধান বলে মেনে নিয়ে মুখ বুজে বসেছিল। ধর্ম-বৈষম্য ও সুযোগ-সুবিধার

তারতম্য আরও প্রকট হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণী আজ গতানুগতিক ভারতীয় কৃষক জীবনের জড়তা থেকে মুক্তিলাভ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এ বিদ্রোহ কোনো বিশেষ সরকারের বিরুদ্ধে নয়, এ বিদ্রোহ সেই নৃশংস সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে-সমাজব্যবস্থা প্রতিদিন তাকে ধুলোয় গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে। গণ-বিদ্রোহ দ্রুত প্রসারমুখী। এই ভাবনা অতিদ্রুত নানা সূত্রে গ্রামাঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। সেখানেও জমির লড়াই শুরু হয়ে গেছে। এ লড়াই আগুনের মতো দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এই হল বাস্তব ঘটনার অপ্রতিরোধ্য চাপে সমাজশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ। তথাকথিত রাজনৈতিক আন্দোলন এই জাগরণ ঘটিয়েছে এ ধাপ্পা প্রচার করা অর্থহীন। তার চেয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনওয়ালাদের উচিত এই মহান জাগ্রত শক্তির কাছে মাথা নীচু করে তারই প্রেরণায় নিজেদের আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করা। এই সমাজশক্তিই রাজনৈতিক আন্দোলনকে যথার্থ শক্তি ও সম্ভাবনা সঞ্চার করতে পারে। বস্তুতপক্ষে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক আন্দোলনই কতকগুলি সমাজশক্তির অপরিহার্য বহিঃপ্রকাশ।

শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর অর্থনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে কংগ্রেস এ যাবৎ কী করেছে? কংগ্রেস গণ-আন্দোলনকে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করেছে মাত্র। প্রত্যেক ধর্মঘট বা কৃষক বিক্ষোভে অসহযোগীরা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মঘটীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে। বুদ্ধিজীবী কংগ্রেস তার আদর্শবাদের চূড়ায় বসে জনগণের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে স্বরাজ দাবী করে আর আশা করে যে জনগণ তাকে অন্ধের মতো মেনে চলবে। কংগ্রেস দারিদ্র্যক্লিষ্ট শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীকে সর্বপ্রকার ত্যাগের আহ্বান জানাতে দ্বিধাবোধ করে না। এই ত্যাগ করতে বলা হয় আবার জাতীয় কল্যাণের দোহাই পেড়ে, যদিও এই ত্যাগের ফলে বিদেশী শাসকের ক্ষতির চেয়ে দেশীয় ধনিকদেরই লাভ হয় বেশী। কংগ্রেস সমগ্র জাতির রাজনৈতিক নেতৃত্ব দাবী করে। কিন্তু এর প্রত্যেকটি কাজ প্রমাণ করে যে কংগ্রেস বৃহত্তর জনসাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধে নিদারুণ ভাবে অজ্ঞ ও উদাসীন। এযাবৎ কংগ্রেস জনগণের প্রতিদিনের লড়াইকে তার নিজের লড়াই হিসেবে দেখতে পারেওনি, দেখতে চায়ওনি। তার ফলে জনগণের সচেতন ও বলিষ্ঠ সমর্থনও তারা আশা করতে পারে না। যদিও এটা মনে রাখা দরকার শ্রমিক-কৃষকশ্রেণী যে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক লড়াই চালিয়ে যাবেই এবং তারা যা চায় তা শেষ পর্যন্ত তারা অর্জনও করবে—সে লড়াইয়ে তারা কংগ্রেসের নেতৃত্ব পাক আর না পাক। কংগ্রেসের নেতৃত্ব তাদের যে খুব বেশী প্রয়োজন তা নয়, কিন্তু অপরপক্ষে কংগ্রেসের রাজনৈতিক সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে জনগণের সচেতন সমর্থনের উপর। কংগ্রেস যেন মনে না করে যে জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য কিছু না করেও জনগণের নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব তারা অর্জন করেছে।

মহাত্মাজীর ব্যক্তিগত চরিত্রের জন্য তিনি মানুষের পূজা পেতে পারেন। ধর্মঘটী মানুষেরা তাদের কয়েক পয়সার মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনে 'মহাত্মাজী কি জয়' স্লোগানও তুলতে পারে। বিক্ষোভের প্রথম উত্তেজনায় তারা এমন সব পথে পরিচালিত হতে পারে, যে পথে তাদের প্রকৃত সংগ্রামের যোগ নেই। তাদের নবার্জিত উদ্দীপনা যা বহুযুগের ক্ষুধার যন্ত্রণায় ভাষা পায়নি, তা হয়তো তাদের শেষ কৌপীনটুকু পুড়িয়ে ফেলতে উত্তেজিত করতে পারে। কিন্তু তাদের ধীর চিন্তার মুহূর্তে তারা কী চায়? নিশ্চয়ই রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বা খিলাফত

উদ্ধার নয়। তারা চায় জীবনধারণের আপাত সামান্য কিছু অপরিহার্য উপকরণ-সমূহ—এরই জন্য তারা লড়াইয়ে নেমেছে। শহরের শ্রমিকেরা মজুরী বৃদ্ধি দাবী করে, খাটুনির ঘণ্টা কমাতে চায়, জীবনধারণোপযোগী উন্নততর পরিবেশ দাবী করে। গরীব কৃষক জমির মালিকানা দাবী করে, অতিরিক্ত কর ও খাজনা থেকে রেহাই চায় এবং জমিদারের দুঃসহ শোষণ থেকে মুক্তি চায়। তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। শোষকের জাতি নির্ণয়ে তাদের দুঃখের কোনো তারতম্য ঘটে না। এই হলো যথার্থ বৈপ্লবাত্মক শক্তির স্বরূপ। এই শক্তিই রাষ্ট্রনৈতিক শাসনের পরিবর্তন আনতে পারে এ সত্য কংগ্রেস যত শীঘ্র উপলব্ধি করতে পারে ততই মঙ্গল।

কংগ্রেস যদি এই গণ-জাগরণের সঙ্গে কোনো যোগ না রেখেই জাতীয় নেতৃত্বের আশা করে তবে এই কংগ্রেসকেও তার পূর্বসূরীর মতো মৃত অতীতের অন্ধকারে অখ্যাতির মাঝে নির্বাসন ভোগ করতে হবে। জনগণের সক্রিয় সমর্থন অর্জন করতে গেলে কেবল লম্বা লম্বা রাজনীতি আর আদর্শবাদের বুলি নিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ালে চলবে না। তাদের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ মোচনের জন্য তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে প্রস্তুত থাকতে হবে। তারপর সেই বেঁচে থাকার লড়াইকে ধাপে ধাপে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। খিলাফতের দাবি, বয়কট প্রস্তাব, "চরখা হাতে বেদের যুগে ফিরে যাবার" উদ্ভট আদর্শ অথবা বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত এবং দোকানদারদের সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বানের পথে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমগ্র জাতকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না। বক্তৃতায় মানুষকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না। বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে তাদের লড়াইয়ে উদ্দীপ্ত করতে হবে। দারিদ্র্যপীড়িত নির্যাতিত নিঃস্ব শ্রমিক আর কৃষক লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়তে বাধ্য। কারণ অন্য কোথায়ও তাদের কোনো উপায় নেই, আশা নেই। এই শ্রমিক-কৃষককে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব কংগ্রেসের। কংগ্রেস তখনই জনগণের আস্থাভাজন হতে পারবে যখন আর সে তাদের কাছে লোক-দেখানো জাতীয় স্বার্থ নামক একটি তথাকথিত উচ্চ আদর্শের নামে (যা আসলে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির অবলম্বন) তাদের স্বার্থ বিসর্জন দেবে না। আজ ভারতবর্ষ বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। কংগ্রেস যদি সেই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে চায়, তবে সে যেন কেবল কতকগুলি বাইরের লোক-দেখানো সভা বা ক্ষণস্থায়ী উন্মত্ত উত্তেজনার উপর ভরসা না রাখে। কানপুরের শ্রমিকেরা যে-দাবী রেখেছে সেই ট্রেড ইউনিয়ন দাবীগুলিকে কংগ্রেস নিজের দাবী বলে ঘোষণা করুক। কিসান সভার কার্যসূচীকে কংগ্রেস তার নিজের কার্যসূচী বলে স্বীকার করুক—তবেই দেখা যাবে যে কোনো বাধাই কংগ্রেসকে থামাতে পারছে না। তখন আর কংগ্রেসকে একথা বলে অনুশোচনা করতে হবে না যে দেশের মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করেনি বলে কোনো নির্দিষ্ট তারিখে স্বরাজ অর্জন করা গেল না, কংগ্রেসের পিছনে তখন সমগ্র দেশের অপ্রতিরোধ্য জনশক্তি এসে দাঁড়াবে। এ পথে না গেলে অসহযোগের সমস্ত নিষ্ঠা, সেভেরস চুক্তি সংশোধনের সমস্ত দৃঢ়তা, আত্মশক্তির সমস্ত আদর্শ সত্ত্বেও কংগ্রেসকে সরে দাঁড়াতে হবে এবং সেখানে সাধারণ মানুষের স্বার্থ নিয়ে লড়বে এমন নতুন সংগঠন সাধারণ মানুষের ভিতর থেকেই গর্জে উঠবে। কংগ্রেস যদি সমগ্র জাতিকে তার সঙ্গে চায়, তবে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী বা শ্রেণীর স্বার্থে সে যেন নিজেকে আবদ্ধ না রাখে। কংগ্রেসে আজ 'তীক্ষ্ণধী ব্যবহারজীবী'র স্থান নিয়েছে 'ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি'র গোষ্ঠী। কংগ্রেস যেন তাদের অদৃশ্য অঙ্গুলি নির্দেশে না চলে। তাদের আসল মতলব হল ইংরেজের জায়গায় তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

কংগ্রেস যখন অসহযোগের পতাকাতলে বিপ্লবী শক্তির অপব্যয় ঘটাচ্ছে, তখন প্রতিবিপ্লবী শক্তি মানুষকে বিপথে পরিচালিত করবার জন্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী চেতনা ঝিমিয়ে পড়েছে—ধর্মঘটের ক্ষেত্রে শৈথিল্যই তার প্রমাণ। ট্রেড ইউনিয়নগুলি সংস্কারবাদী বা হঠকারী বা সরকারী দালালের হাতে চলে যাচ্ছে। 'আমন সভা'গুলি কৃষকদের গ্রাস করছে। সরকার জানে কোথায় আন্দোলনের প্রকৃত উৎস। সরকার জনগণকে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এই সব চতুর আমলাদের ধূর্ত ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করতে গেলে কেবল ফাঁপা বুলি আর আবেগপূর্ণ আবেদনে কাজ হবে না। সমান চতুর নীতি অনুসরণ করতে হবে। জনতার চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে—এই হল লড়াইয়ে তাদের টেনে আনার একমাত্র পথ।

সহযাত্রী দেশবাসীগণ,

কংগ্রেসের কার্যসূচীতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সমস্যাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ভারতের মানুষ অগণিত জাতি, ধর্ম মত ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই ব্যবধানকে দূর করতে কতকগুলি কৃত্রিম ও আবেগভরা প্রচারে কোন কাজ হবে না। সৌভাগ্যক্রমে এই অসংখ্য দল ও সম্প্রদায় একটি প্রবল শক্তির চাপে দুটি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সেই শক্তি হল অর্থনীতি। এই অর্থনীতির অমোঘ বিধানে বিত্তশালী শ্রেণী সম্পদহীন নিঃস্ব মানুষকে শোষণ করে চলেছে। এই শ্রেণীবিভাগে কিছু কিছু 'উগ্র দেশপ্রেমিক' বড় অস্বস্তি বোধ করেন। তাঁরা প্রচার করে বেড়ান যে এই ভারতবর্ষ ঈশ্বরের এক বিশেষ সৃষ্টি। কিন্তু একথা অস্বীকার করা চলে না যে অর্থনীতির অমোঘ বিধান ভারতবর্ষেও সক্রিয়—তারই প্রভাবে সহস্র সামাজিক ব্যবধানকে দূর করে ভারতবর্ষ দুটি বিরাট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। এই অমোঘ বিধানেই হিন্দু শ্রমিক তার মুসলমান সহকর্মীর ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এই একমাত্র পথ। যারা স্পষ্টভাবে এই সমাজ-অর্থনীতির অভ্রান্ত নীতি অনুধাবন করবে, তারা আর উদ্‌ভ্রান্তের মতো সন্ধান করতে যাবে না যে কীভাবে মুসলমানের মনে গোজাতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাগানো যায় বা হিন্দু কৃষককে বোঝাতে হবে না যে তাঁর আত্মার মুক্তি ও ইহকালের সকল যন্ত্রণা মোচনের একমাত্র উপায় হলো খিলাফৎ উদ্ধার বা তুর্কীদের হাতে আর্মেনিয়ানদের বশ্যতা স্বীকার। ফাঁকা ভাবালুতার পথে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আসবে না। অর্থনৈতিক শক্তির বাস্তব পথেই তা সম্ভব হবে। আমাদের কর্তব্য সে বাস্তব যুক্তির উপর জোর দেওয়া এবং সেই পথে আস্থা রাখা।

সহযাত্রী দেশবাসীগণ,

আপনারা একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে সমগ্র জাতির অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। রাজনৈতিক জুয়াখেলা ছেড়ে সমাজ-শক্তির সমর্থনে কংগ্রেস উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক। আপনারা কাজের দ্বারা প্রমাণ করুন যে কংগ্রেস দেশীয় ধনিকশ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার অর্জনের জন্য নয়, সমগ্র ভারতীয় জনগণকে—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক—সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দেবার জন্য বিদেশী শোষণের অবসান চায়। আপনারা প্রমাণ করুন যে

কংগ্রেস সত্যই জনগণের যথার্থ প্রতিনিধি এবং জনগণের সংগ্রামে প্রতি স্তরে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা কংগ্রেসের আছে। তবেই কংগ্রেস যথার্থ জাতীয় নেতৃত্ব অর্জন করবে। এবং কোনো ব্যক্তি বিশেষের খামখেয়ালে নির্ধারিত কোনো নির্দিষ্ট তারিখে স্বরাজ আসবে না, স্বরাজ অর্জিত হবে সর্বস্তরের মানুষের সচেতন ও সম্মিলিত চেষ্টায়।[১]

১লা ডিসেম্বর,
১৯২১

মানবেন্দ্রনাথ রায়
অবনী মুখার্জি

---

১ এই ইশ্‌তিহারখানি শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় মূল ইংরেজি হতে বাঙলায় তরজমা করে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। (লেখক)

পেশোয়ারের মোকদ্দমাগুলি

কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সূত্রপাত

১৯২১ সাল হতে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত পেশোয়ারে পরে পরে চারটি কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হয়েছিল। ১৯২৭ সালে হয়েছিল আরও একটি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা। সব ক'টি মোকদ্দমাই ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের (ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের) ১২১-এ ধারা অনুসারে দায়ের হয়েছিল। ভারতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সূত্রপাত পেশোয়ারেই হয়েছিল। সকলেই জানেন পেশোয়ার তখন ভারতবর্ষে ছিল।

এই মোকদ্দমাগুলি সম্বন্ধে কোনো কথা বলার আগে সংক্ষেপে সেগুলির পিছনকার কিছু বিবরণ এখানে দেওয়া দরকার। ভারতবর্ষে গত শতাব্দীতে কিংবা এই শতাব্দীর শুরুর দিকে যাঁরা রাজনীতিক বিপ্লব ঘটাবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ধার্মিক সাধনার ভিতর দিয়েই এগুবার চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই, বিপ্লবের পথে যে-ধর্মাবলম্বীরাই এগিয়েছেন তাঁরা আপন আপন ধর্মাবলম্বীদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। মুস্লিম ওয়াহাবীরা বিদ্রোহ করেছিলেন শিখ ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। তাঁরা মুস্লিম রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের যুদ্ধকে তাঁরা জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ বলেছেন। পাঞ্জাবের নামোহারী শিখেরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে বলেছেন ঃ—"রাজ করেগা খাল্সা ঔর না রাহেগা কোই"। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত মুস্লিম বিদ্বেষপূর্ণ 'আনন্দমঠ'ই বাঙলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রেরণা জুগিয়েছে। 'আনন্দমঠে'র দর্শনই তাঁদের বিপ্লবের দর্শন। হিন্দু ধর্মের পথের সকল কাঁটা দূর করাই ছিল পুনার চাপেকার ভ্রাতৃগণের উদ্দেশ্য। তাঁদের গঠিত বিপ্লবী সমিতির নাম "Society for the removal of obstacles to the Hindu Religion." তাঁরা ইংরেজ আমলাও খুন করেছিলেন। 'ভবানী মন্দির' স্থাপন ক'রে সাধনার ভিতর দিয়েই অরবিন্দ ঘোষ বৈপ্লবিক সাফল্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক আয়োজনও আমাদের দেশে ধার্মিক প্রেরণাকে বাদ দিয়ে হয়নি। মুস্লিম ধর্মাবলম্বীদের বাস আবার শুধু ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাই, তাঁদের ভিতরে একটা আন্তর্জাতিক ভ্রাত্রীয় বোধ ছিল। এর অবশ্য কোনো শ্রেণী-ভিত্তি ছিল না। ছিল ধর্মীয় ভিত্তি।

লাহোরের পলাতক ছাত্রগণ

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরের বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়নরত ১৫ জন বিপ্লবী মুস্লিম ছাত্র ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পার হয়ে প্রথমে স্বাধীন জাতির ইলাকায় চলে যান, সেখান থেকে যান কাবুলে। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ছিল। আমাদের দেশের সীমান্তগুলি বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম

সীমান্ত ছিল কঠোরভাবে সুরক্ষিত। তা সত্ত্বেও তাঁরা সীমান্ত পার হতে পেরেছিলেন। তাঁরাই শুধু যে সীমান্ত পার হয়েছিলেন তা নয়, মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীও সীমান্ত পার হয়েছিলেন। তিনি এই ছাত্রদের আগে সীমান্ত পার হয়েছিলেন, না, পরে তা আমার জানা নেই। তবে একটি কথা এখানে বলে রাখা ভালো যে লাহোরের ছাত্রদের দেশত্যাগ করার বৈপ্লবিক প্রেরণা জুগিয়েছিলেন মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ সাহেব। এই কাজটি হয়তো তিনি সোজা-সুজি করেছিলেন, কিংবা করে থাকবেন তাঁর প্রিয় ছাত্র খাজা আবদুল হাইয়ের মারফতে। খাজা সাহেব একজন বিপ্লবী ছিলেন। বাহ্য দৃষ্টিতে তিনি সাংবাদিকতা ও অধ্যাপনার কাজ করতেন।

উল্লিখিত ১৫ জন ছাত্র পরে 'পলাতক ছাত্র' বা 'মুজাহিদ ছাত্র' নামে অভিহিত হয়েছেন। 'জিহাদ' শব্দের অর্থ ধর্মযুদ্ধ। যাঁরা ধর্মযুদ্ধ করেন তাঁদের বলা হয় 'মুজাহিদ'। পলাতক ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। যদি সীমান্তে সম্ভব না হয় তবে তুর্কির পক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করা। তুর্কিরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো করছিলেনই, তাছাড়া তুর্কির সুলতান ছিলেন মুস্‌লিম জগতের খলীফা। কিন্তু কাবুলে পৌঁছানো মাত্রই মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্-সহ এই ছাত্ররা বন্দী হলেন,—শিকল পরানো বন্দী নয়, নজরবন্দী।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মানী ও তুর্কি আফ্‌গানিস্তানে একটি 'মিশন' পাঠিয়েছিলেন। ভারত সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আফ্‌গানিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করা ছিল এই মিশনের উদ্দেশ্য। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও মৌলবী বারাকতুল্লাহ্ এই মিশনের সভ্য ছিলেন। ১৯২৫ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে তুর্কি-জার্মান মিশন কাবুলে পৌঁছেছিলেন। মহেন্দ্র প্রতাপের আত্মকথা হতে জানা যায় যে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের সঙ্গে যখন এই মিশনের মুলাকত হচ্ছিল তখন মহেন্দ্র প্রতাপ, মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্, সিন্ধী ও লাহোরের 'পলাতক' ছাত্রদের নজরবন্দী হয়ে থাকার কথা আমীরকে বলেন। দু'জন শিখকে শিকল পরিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাঁরা ভারতের কোনো বোমার মামলার সংস্রবে অভিযুক্ত হয়ে আফ্‌গানিস্তানে পালিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের কথাও মহেন্দ্র প্রতাপ আমীরের গোচরে আনেন। আমীর সঙ্গে সঙ্গেই মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ ও ছাত্রদের মুক্তি দিয়ে রাজ-অতিথি করার হুকুম দেন। শিখ বন্দী দু'জনকেও জেল হতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

লাহোরের বিভিন্ন কলেজ হতে ১৯১৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে-পনের জন ছাত্র পালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের নাম নীচে দিলাম:

(১) আবদুল বারী
(২) আবদুল কাদির
} এম. এ. অধ্যয়নরত ছাত্র

(৩) আবদুল মজীদ খান
(৪) আল্লাহ্ নওয়াজ খান
(৫) আবদুল্লাহ্
(৬) আবদুর্ রশীদ
(৭) গুলাম হুসায়ন
(৮) জাফর হাস্‌সান এবক
} বি. এ. ক্লাসের ছাত্র

(৯) আবদুল খালিক—বি. এ. ক্লাসের ছাত্র, চীফ্ কলেজ
(১০) মুহম্মদ হাস্‌সান—বি. এ. ক্লাসের ছাত্র, ইসলামীয়া কলেজ

(১১) খুশী মুহম্মদ ওর্ফে মুহম্মদ আলী
(১২) আবদুল হামীদ
(১৩) রহমত আলী
(১৪) সুজা উল্লা

} মেডিকাল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র

(১৫) আল্লাহ্ নওয়াজ খান—নীচের ক্লাসের ছাত্র শাহ্‌নওয়াজ খানের ভাই। এটা জানা গেছে যে বিদেশে গিয়ে এই ছাত্ররা ধর্মযুদ্ধ (জিহাদ) করেননি, তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামেই লিপ্ত হয়েছিলেন।

কাবুলে অস্থায়ী ভারত গবর্নমেণ্ট

১৯১৫ সালে ১লা ডিসেম্বর তারিখে কাবুলে ভারতের একটি অস্থায়ী সরকার স্থাপিত হয়। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ হন তার সভাপতি, আর মৌলবী বারাকতুল্লাহ্ প্রধানমন্ত্রী। মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী তার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে বরিত হয়েছিলেন। লাহোরের পলাতক ছাত্ররাও এই অস্থায়ী গবর্নমেণ্টে যোগ দিয়ে নানা পদ গ্রহণ করেছিলেন। মহেন্দ্র প্রতাপ তাঁর পঞ্চান্ন বছরের জীবন কাহিনীতে (My Life Story Of Fifty Five Years) লিখেছেন যে তিনি একটি কাজ, আমাদের মতে অসংগত কাজ, করেছিলেন। এটাকে তিনি একটি মৌলিক ধারণা (Original idea) নামে আখ্যাত করেছেন। অস্থায়ী ভারত সরকারের সভাপতি হিসাবে পুরু সোনার চাদরে একখানি পত্র খোদাই করে তিনি তা রাশিয়ার জারের নিকটে পাঠান। এই পত্র রচনায় মৌলবী বারাকতুল্লাহ্ ও মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। পত্রে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে জারের সাহায্যভিক্ষা যে করা হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। যুদ্ধে কিন্তু রুশ ব্রিটেনের বন্ধু ছিল, আর রাজা মহেন্দ্র প্রতাপেরা জার্মানীর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। জার্মান মিশনের ডক্টর ফন হেন্‌টিগ (Dr. Von Hentig) এই পত্র না পাঠাতে মহেন্দ্র প্রতাপকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা শোনেননি। যুদ্ধের সময়ে পত্রখানি জারের রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবুর্গ পর্যন্ত পাঠানো সম্ভব হয়নি। তা পাঠানো হয়েছিল তাশকন্দে জারের গবর্নর জেনেরেলের নিকটে। পত্র বহন করে তাশকন্দে নিয়ে গিয়েছিলেন মুহম্মদ আলী ও শম্‌শের সিং। মুহম্মদ আলী ছিলেন লাহোর মেডিকাল কলেজের পলাতক ছাত্র খুশী মুহম্মদ, আর শম্‌সের সিংহের আসল নাম ছিল ডাক্তার মথুরা সিং। এত সোনা খরচ করেও পত্রের কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তবে, পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই ছিল যে বাহক দু'জন প্রাণ নিয়ে কাবুলে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। মহেন্দ্র প্রতাপ এতেও থামলেন না। আবারও তিনি জারের নামে এক পত্র লিখে তাশকন্দে জারের গবর্নর জেনেরেলের নিকটে দু'জনকে পাঠালেন। এই দু'জন আর কাবুলে ফিরে আসেননি। জারের গবর্নমেণ্ট তাঁদের গিরেফ্‌তার ক'রে ইরানে দখলকার ব্রিটিশ ফৌজের নিকটে পাঠিয়ে দিল। সেখানে তাদের গুলি করে মারা হয়। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ শুধু সোনার চাদরে খোদাই করা পত্র পাঠানোর কথা তাঁর পুস্তকে লিখেছেন। অন্য খবরগুলি আমি ডক্টর দেবেন্দ্র কৌশিকের "সোবিয়েৎ এশিয়ায় ভারতীয় বিপ্লবী" (Indian Revolutionaries in Soviet Asia)

লাহোরের পলাতক ছাত্রদের মধ্য হতে আল্লা নওয়াজ বোধ হয় আফগান নাগরিক হয়েছিলেন। তাঁকে বার্লিনে আফগানিস্তানের মিনিস্টার নিযুক্ত করা হয়েছিল। মহেন্দ্র প্রতাপ তাঁর পুস্তকে (১৯৪৩ সালে প্রকাশিত) লিখেছেন "Mr. Allah Nawaz is Afghanisthan's Minister in Berlin". তাঁদের মধ্য হতে ক'জন কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তা আমি সঠিক বলতে পারব না। লাহোর মেডিকাল কলেজের ছাত্র আবদুল হামীদ "শ্রমজীবী প্রাচ্যের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে" ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি অন্যদের সঙ্গে দেশেও ফিরছিলেন, কিন্তু পামীর পর্যন্ত এসে আর এগুতে পারেননি। পুরনো পুলিস রিপোর্ট হতে জানা যায় যে ১৯২৬ সালে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। পেশোয়ারে তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমাও হয়েছিল। তাতে তিনি যে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা পান উচ্চ আদালতের আপিলে সেই সাজা বাতিল হয়ে যায়। তারপরে তিনি বোধ হয় আর রাজনীতিতে যোগ দেননি, কিংবা কোনো নিরাপদ রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। আমরা তাঁর নাম এর পর আর শুনিনি। পলাতক ছাত্রদের মধ্যে খুশী মুহম্মদ ও রহমত আলী বিদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনে অনেক নাম করেছিলেন। তাঁদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আমি এখানে দেব।

মুহম্মদ আলীর পরিচয়

পুলিসের খাতায় খুশী মুহম্মদের অনেকগুলি নাম। যেমন খুশী মুহম্মদ ওর্ফে মুহম্মদ আলী, ওর্ফে সিপাস্‌সি, ওর্ফে ইব্‌রাহীম ও ওর্ফে ডাক্তার নায়ার। তাঁর বাড়ী পাঞ্জাবের জলন্ধর জিলার নওয়ান শহরে। তাঁর পিতার নাম জান মুহম্মদ। খুশী মুহম্মদের মুহম্মদ আলী নামটিই বেশী প্রচারিত হয়েছিল। আমিও তার এই নামটি ব্যবহার করব। ১৯১৩ সালে তিনি লাহোর গবর্নমেণ্ট কলেজ হতে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এফ. এস. সি. পরীক্ষা পাশ করে লাহোর মেডিকাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এখানে পড়ার সময়েই তিনি ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আরও ১৪ জন ছাত্রের সঙ্গে দেশত্যাগ করেন। পুলিসের রিপোর্টে যে তাঁদের পলাতক ও মুজাহিদ ছাত্র নামে অভিহিত করা হয়েছে সে কথার উল্লেখ আমি আগেই করেছি। প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরেজ রাশিয়ার মিত্রপক্ষ ছিল। সেই রাশিয়ার সম্রাটকে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আহ্বান করা এবং প্রতি পদে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে মুহম্মদ আলী ও শম্‌শের সিংকে (ডাক্তার মথুরা সিং) তাশকন্দ পর্যন্ত পাঠানো চরম হঠকারী কাজ ছিল। তবুও মুহম্মদ আলী ও শম্‌শের সিং সাহসের সহিত সে কাজে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে তৃতীয় আফগান যুদ্ধের সময় মুহম্মদ আলীকে ভারত সীমান্তে স্বাধীন জাতির ইলাকায় গিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রচার করতে দেখা গেছে। ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের পরে যে তিনি কমিউনিস্ট মতবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সঠিক সময়টা আমার জানা নাই।

আফগানিস্তান হতে আরম্ভ ক'রে পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ও কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের কাজে ঘুরেছেন। তিনজন কমরেডকে নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটি ফরেন (বৈদেশিক) ব্যুরো স্থাপিত হয়েছিল। তার হেড কোয়ার্টার্স ছিল পারিসে। মুহম্মদ আলী এই ব্যুরোর একজন সভ্য ছিলেন। অন্য দু'জন সভ্য ছিলেন যথাক্রমে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও

ক্লেমেন্স্ পাম দত্ত। হেড্কোয়ার্টার্সে থাকতেন বলে মূলত মুহম্মদ আলীই ফরেন্ ব্যুরোর কাজের পরিচালনা করতেন।

দেশে ফিরে গোপনে সাংগঠনিক কাজ করার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। কিছুতেই ফিরতে পারেননি। ১৯২৪ সালে একটা ফরাসী জাহাজে চড়ে তিনি পণ্ডিচেরি পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু ফরাসী গবর্নমেণ্ট তাঁকে সেখানে তিষ্ঠতে দিলে না। ফরাসী পুলিস তাঁকে চব্বিশ ঘণ্টা এমনভাবে ঘেরাও করে রেখেছিল যে তিনি কিছুতেই ভারতে প্রবেশ করতে পারলেন না। ফরাসী গবর্নমেণ্টেরই হুকুমে তাঁকে পরবর্তী জাহাজে চড়ে আণ্টোয়ার্প যাত্রা করতে হয়েছিল। মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর সঙ্গে আমানুল্লার আফগান গবর্নমেণ্ট তাঁকে ও আরও অনেককে আফ্গানিস্তান হতে বার করে দিয়েছিলেন। তার পরে তিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের হেডকোয়ার্টার্সে কাজ করেছেন। পার্টির কাজে তিনি পশ্চিম ইউরোপেই বেশী সময় থেকেছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ফরেন্ ব্যুরোর সভ্য হিসাবে যে তিনি পারিসেই থেকেছেন তার উল্লেখ আমি আগে করেছি। হিটলারের সৈন্যরা যখন পারিস দখল করেছিল (জুন, ১৯৪০) তখন মুহম্মদ আলী পারিসে ছিলেন। সেই সময়ে কমিউনিস্ট নামধারী কোনো কোনো দুর্বলচেতা ভারতীয় পারিসে উপস্থিত ছিলেন। তারা তখনই হিটলারের প্রচারক হয়ে পড়ল এবং তাই করে নিজেদের জীবন বাঁচালো। কিন্তু মুহম্মদ আলী কিছুতেই হিটলারের প্রচারক হতে রাজী হলেন না। এই জন্যে হিটলারের সৈন্যরা তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলে। এই খবর তখন ভারতের সংবাদ-পত্রসমূহে প্রকাশিত হয়েছিল। মুহম্মদ আলীর কথা জানতেম বলে তা আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। অযোধ্যাপ্রসাদের সঙ্গে মুহম্মদ আলীর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। ভারতের অন্য এক শহরে এই খবর তারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মুহম্মদ আলীর রুমানিয়া দেশীয়া স্ত্রী ছিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর একটি মেয়েও জন্মেছিল। তাঁরা যে কোথায় গেলেন এ খবর আমরা জানতে পারিনি। আশ্চর্য এই যে মুহম্মদ আলীর সহকর্মী ক্লেমেন্স পাম দত্তও তাঁর সম্বন্ধে কোনো খবর রাখেন না।

রহমত আলী ওর্ফে জাকারিয়া

পলাতক ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনে মুহম্মদ আলীর পরেই রহমত আলী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পুলিস রিপোর্টে তার নাম রহমত আলী ওর্ফে জাকারিয়া, ওর্ফে ইব্রাহীম ইয়াহিয়া ওর্ফে গুরলাক (Goorlack), ইত্যাদি। বিদেশে আমাদের কমরেডদের নিকটে তিনি জাকারিয়া নামেই বিশেষ খ্যাত ছিলেন। পাঞ্জাবের গুজরান্ওয়ালা জিলায় তাঁর বাড়ী ছিল।

কাবুলে যে অস্থায়ী ভারত গবর্নমেণ্ট স্থাপিত হয়েছিল জাকারিয়াও তাতে ছিলেন। আবার আমানুল্লাহ্ যাঁদের আফ্গানিস্তান হতে বা'র করে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও ছিলেন জাকারিয়া। তিনি কখন কমিউনিজ্মের দিকে প্রথম ঝুঁকেছিলেন তা আমি জানিনে, তবে ডক্টর দেবেন্দ্র কৌশিক তাঁর 'লিঙ্ক'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ লেখার জন্য তুর্কিস্তানে পুরনো সোবিয়েৎ পত্রিকা পড়েছিলেন। সে সব থেকে তিনি জেনেছেন যে "১৯১৯ সালের ৯ই জুন তারিখে তাশকন্দে অনুষ্ঠিত তুর্কিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে জাকারিয়া বক্তৃতা দিয়েছিলেন"। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের তরফ হতে "ভারতবর্ষ দীর্ঘজীবী হোক"

আওয়াজের দ্বারা তাঁর বক্তৃতা অভিনন্দিত হয়েছিল। এই ঘটনা ঘটেছিল মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রথম মস্কো পেঁছানোর এক বছর আগে। ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে রায়ের উদ্যোগে তাশকন্দে যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন জাকারিয়া নিশ্চয় তাশকন্দে ছিলেন না। থাকলে তিনিও মুহম্মদ আলীর মতো পার্টির প্রবর্তক সভ্যদের একজন হতেন। অবশ্য, মুহম্মদ আলীর মতো তিনিও অনেক আগেই নিজেকে কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন। ১৯২৩ সালে জাকারিয়া ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কাজে ইরানের নানা স্থানে ছিলেন। সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে মস্কোতে কমিউনিস্ট ইন্টার-ন্যাশনালের প্রাচ্য বিভাগে কাজ করতে দেখা গেছে। বার্লিনেও তিনি আমাদের পার্টির কাজে নিযুক্ত থেকেছেন। তার পরে কখন যে তিনি পারিসের সর্বন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করেছিলেন তা আমি ভালো করে জানিনে। তবে, উনিশ শ' ত্রিশের দশকের শুরুতে কোনো এক বছর তিনি সর্বন ইউনিভার্সিটির ডক্টরেটে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর থিসিস্ "মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতের হিন্দু-মুসলিম সমস্যা" নাম দিয়ে ফরাসী ভাষায় পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে।

ডক্টর রহমত আলী ওর্ফে জাকারিয়ার বয়স এখন (১৯৬৮) আটষট্টি-উনসত্তর বছর হয়েছে। এস. এ. ডাঙ্গে আমাকে এক পত্রে লিখেছিল যে ১৯৪৬ সালে পারিসে এক হোটেলে ডক্টর রহমত আলী তার সঙ্গে দেখা ক'রে তার বাড়ীতে গিয়ে তাঁর ছেলেমেয়েদের দেখে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। ডাঙ্গে সেই পত্রেই লিখেছিল, সে তাঁকে কিছু আর্থিক সাহায্য করেছিল, কিন্তু যতটা করা উচিত ছিল ততটা করতে পারেনি। তার মানে, ১৯৪৬ সালে ডক্টর রহমত আলী অত্যন্ত দুরবস্থায় ছিল। ফাসিস্ট অধিকৃত ফরাসী দেশে ডক্টর রহমত আলী কি করছিলেন, কোথায় ছিলেন তার কোন খবর আমরা জানিনে। তিনি ফরাসী দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন কিনা তাও আমরা জানিনে। শুনেছি ডক্টর রহমত আলী এখনও (১৯৭০) পারিসে রয়েছেন।

হিজরাৎ ও মুহাজির

খিলাফৎ আন্দোলন হতে হিজরাৎ আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী ভারতের মুসলমানদের সাহায্য একান্ত-ভাবেই পেতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁদের নিকটে একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

The pledges given by Lloyd George declared unequivocally in these words : "Nor are we fighting to deprive Turkey of the rich and renowned lands of Asia Minor and Thrace which are predominantly Turkis in race". অর্থাৎ লয়ড জর্জ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই কথাগুলি ঘোষণা করেছিলেন : "এসিয়া মাইনর ও থ্রেসের তুর্কি জাতি অধ্যুষিত প্রাচুর্যময় প্রসিদ্ধ ভূমি হতে তুর্কিকে বঞ্চিত করার জন্যে আমরা এই লড়াই করছি না।"

(The History of the Indian National Congress, Vol. 1. Padma Publications Ltd. Bombay, p 189)

মুসলমানেরা অবশ্য পুরো আরব উপদ্বীপ চাইছিলেন। মাওলানা মুহম্মদ আলীর ('কমরেড', সম্পাদক) নেতৃত্বে ১৯২০ সালের মার্চ মাসের শুরুর দিকে একটি খিলাফৎ ডেপুটেশন লণ্ডনে গেল। কিন্তু লয়ড জর্জ তাঁর ওয়াদা পালন

করলেন না। এই খবর দেশে পৌঁছামাত্রই ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসেই একটা প্রবল হিজরাৎ আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল। খিলাফৎ ডেপুটেশনের সভ্যরা তখনও লণ্ডনে রয়ে গেছেন।

স্বাধীন আফ্‌গানিস্তানের ঘোষণা

হিজরাৎ একটি আরবী ভাষার শব্দ। তার অর্থ অত্যাচারের হাত হতে বাঁচার জন্যে আত্ম-নির্বাসন। যে-ব্যক্তি হিজরাৎ (আত্ম-নির্বাসন) করেছেন তাঁকে বলা হয় 'মুহাজির'। 'মুহাজির' শব্দ বহুবচনে 'মুহাজিরীন্' হয়। একটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে যখন এই শব্দগুলি জড়িত তখন এগুলির বানান ও উচ্চারণ মনে রাখা উচিত। আমার মনে হয় না যে এটা তেমন কিছু কঠিন কাজ। আশ্চর্য এই যে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো লোকও 'মুহাজির'কে 'মুজাহির' লিখেছেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ওয়াদা খিলাপ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচার হতে লাগল যে ভারতবর্ষ আর মুসলমানদের পক্ষে থাকার উপযুক্ত জায়গা নয়। এখন দেশত্যাগ ক'রে চলে যেতে হবে। এই সময়ে আফ্‌গানিস্তানের বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্ খান ঘোষণা করলেন যে ভারতীয় মুহাজিরদের তিনি আফ্‌গানিস্তানে থাকার জায়গা দিবেন। বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্ খান তার মর্যাদার আসন হতে এই ঘোষণা করেছিলেন। আগে তিনি ব্রিটিশের বৃত্তিভোগী ছিলেন। রাশিয়ার সোবিয়েৎ গবর্নমেণ্ট সর্বপ্রথম মেনে নেন যে আফ্‌গানিস্তান পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন দেশ। ১৯১৯ সালের এপ্রিল-মে মাসে তৃতীয় ব্রিটিশ-আফগান যুদ্ধ (Third Anglo-Afghan War) হয়। আফ্‌গানিস্তানের অনুরোধে ১৯১৯ সালের ১৪ই মে তারিখে এই যুদ্ধের বিরতি ঘোষিত হলেও ১৯১৯ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে রাবলপিণ্ডিতে ইংরেজের সঙ্গে আফ্‌গানিস্তানের যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে ইংরেজরা আফ্‌গানিস্তানকে পরিপূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করে নিয়েছিল। এবং আরও স্বীকার করে নিয়েছিল যে আফ্‌গানিস্তানের বৈদেশিক নীতিতে ইংরেজরা কোনও রূপ হস্তক্ষেপ আর করবে না। ১৯২১ সালের ২২শে নভেম্বর তারিখে মসৌরিতে পাকাপাকি ভাবে এই চুক্তি অনুমোদিত হয়।

কাবুলে প্রথম মুহাজিরগণ

এপ্রিল মাসেই (১৯২০) মুসলমানদের দেশ ত্যাগ শুরু হয়ে যায়। জায়গা-জমীন ও বাড়ী-ঘর বিক্রয় করে সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানেরাই গেলেন সর্বাপেক্ষা বেশী। তার পরে বোধহয় পাঞ্জাবের মুসলমানদের স্থান, অন্যান্য প্রদেশ হতেও অল্প সংখ্যক লোক গেছেন। ডাক্তার পট্টভি সীতারামাইয়া তাঁর কংগ্রেসের ইতিহাসে (The History of the Indian National Congress, Vol. 1, page 199) লিখেছেন যে আঠারো হাজার মুসলমান এই সময়ে দেশত্যাগ করেছিলেন। ভোপালের রফীক আহ্মদের কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি (৫৮ পৃষ্ঠা) তিনি বলেছেন যে আরও ক'জন মুহাজির সহ তাঁর দলই ১৯২০ সালের ১লা মে তারিখে কিংবা এমনই সময়ে প্রথমে কাবুলে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু রফীক আহ্মদ যে বলেছেন তাঁর কাবুলে পৌঁছানোর পরের দিন মুহম্মদ আকবর খানও কাবুলে পৌঁছেছিলেন এটা সঠিক

তথ্য বলে মনে হচ্ছে না। কারণ, আকবর খানের মোকদ্দমার রায়ে (৩১·৫·১৯২২) লিখিত হয়েছে যে ঃ

"He [Muhammad Akbar Khan] was at home in Haripur in June, 1920, when the Hijrat movement was at its height." অর্থাৎ, "১৯২০ সালের জুন মাসে যখন হিজরাৎ আন্দোলন তার চূড়ায় পৌঁছেছিল, সে (মুহম্মদ আকবর খান) তখন হরিপুরে তার বাড়ীতে ছিল।"

আমাদের যথাসম্ভব সঠিক তথ্য লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা উচিত। সেই জন্যেই মুহম্মদ আকবর খানের মোকদ্দমার রায় হতে ক্ষুদ্র উদ্ধৃতি এখানে দিলাম। কিন্তু মুহম্মদ আকবর খান তাঁর এক মুলাকাতকারীকে বলেছেন যে মুহাজিরদের দেশত্যাগ পুরোপুরি আরম্ভ হওয়ার পনের দিন আগে তাঁরা কাবুলে পৌঁছেছিলেন।

মুহাজিরদের ভিতর হতে কিছু লোক সত্যই ব্রিটিশ ও খৃস্টান শাসিত ভারতবর্ষ ত্যাগ করে মুস্‌লিম রাষ্ট্র আফ্‌গানিস্তানে বসবাস ইখ্‌তিয়ার করতে গিয়েছিলেন। যাঁরা বয়সে যুবক ও শিক্ষিত ছিলেন তাঁদের ভিতরে অনেকে, হয়তো বেশীর ভাগই চেয়েছিলেন যে আনাতোলিয়ায় গিয়ে তাঁরা তুর্কির হয়ে লড়াই করবেন। এই ধরনের যুবকদের ভিতরেও পরে অনেকে মতের পরিবর্তন করে-ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা শওকৎ উস্‌মানীর নাম করতে পারি। তাঁর আসল নাম ছিল মাওলা বখ্‌শ্‌। মাওলা বখ্‌শের অর্থ আল্লার দান। কিন্তু দেশ ত্যাগ ক'রে যাওয়ার সময়ে শওকৎ উস্‌মানী যে নাম নিয়েছিল তার অর্থ হচ্ছে উস্‌মানীয় মহিমা। সকলে জানেন পূর্ব পুরুষ উসমানের নাম হতে তুর্কি সাম্রাজ্যকে উস্‌মানীয় সাম্রাজ্য বলা হতো। মুহাজিরদের ভিতরে খুব অল্প সংখ্যক শিক্ষিত যুবকের ইচ্ছা ছিল কোন রকমে দেশের বাইরে যাওয়া এবং দেখা বাইরে থেকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কি করা যায়। কাবুলে পৌঁছেই কিছু শিক্ষিত যুবক যে মৌলবী আবদুর রবের অনুরোধে বিপ্লবের দেশ সোবিয়েৎ ভূমিতে যেতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন তা আমি অন্যত্র লিখেছি। তা থেকেই স্পষ্টই বোঝা যায় যে আনাতোলিয়া যাওয়ার একটা বিশেষ উন্মাদনা নিয়ে সকল যুবক দেশ ত্যাগ করেননি। এই যুবকেরা মৌলবী আবদুর রবের মারফতে বাদশাহের নিকট হতে সোবিয়েৎ দেশে যাওয়ার অনুমতিও প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু বাদশাহ্‌ সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেননি।

এর পরে শিক্ষিত মুহাজির যুবকগণ দলবদ্ধভাবে আনাতোলিয়া যাওয়ার অনুমতি চেয়ে বাদশাহ্‌ আমানুল্লাহ্‌ খানের নিকটে দরখাস্ত পেশ করেন। প্রথমে সিদ্ধান্ত জানাতে আমানুল্লাহ্‌ খান গড়িমসি করছিলেন। কিন্তু মুহাজিররা যখন জানালেন যে বাদশাহের ছাড়পত্র না এলে তাঁরা ছাড়পত্র ছাড়াই রওয়ানা হয়ে যাবেন তখন অনুমতি পাওয়া গেল। জবলুস সিরাজে যে-সকল শিক্ষিত মুহাজির ছিলেন তাঁরা দু'দলে ভাগ হয়ে গেলেন এবং যথাক্রমে মুহম্মদ আকবর খান ও মুহম্মদ জান নেতা নির্বাচিত হলেন। মুহম্মদ আকবর খান হাজারা জিলার হরিপুরের বাশিন্দা। ইংরেজি ও পারসী ভাষা তিনি খুব ভালো জানতেন। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ছিল তাঁর বয়স। মুহম্মদ জান ছিলেন পেশাওয়ারের লোক। প্রথমে মুহম্মদ আকবর খানের নেতৃত্বে আশি জনের একটি কাফিলা মজার-ই-শরীফ হয়ে রওয়ানা হলেন। শওকৎ উস্‌মানী লিখেছে প্রায় ৩০০ মাইলের হিন্দুকুশের অতি কষ্টসাধ্য পথ তিন সপ্তাহের কিছু কম সময়ে অতিক্রম করে তাঁরা পাতাকেসর

পৌঁছেছিলেন। ওখানে আমুদরিয়া (অক্সাস) সমতল ভূমিতে নেমেছে। মুহম্মদ আকবর খানদের মোকদ্দমার বিচারক, পেশাওয়ারের সেশন জজ জে· এইচ· আর· ফ্রেজার (J. H. R. Fraser I. C. S) তাঁর রায়ে লিখেছেন পাতাকেসর 'বলশেভিক'দের জায়গা। শওকৎ উস্মানী লিখেছে পাতাকেসর আফগান সীমায় অবস্থিত। ওখান থেকে নদী পার হলেই তিরমিজ,—সোবিয়েৎ ভূমির একটি শহর। উস্মানীর কথাই ঠিক। সেই সময়ে তিরমিজ তুর্কিস্তান রিপাব্লিকের একটি শহর ছিল। এখন তা উজ্বেকিস্তান রিপাব্লিকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

একটি কথা রফীক আহ্মদ বলেননি, শওকৎ উস্মানীও তার লেখায় উল্লেখ করেনি। কিন্তু জজ্ ফ্রেজার তাঁর রায়ে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন পাতাকেসরে পৌঁছে মুহাজিররা মুহম্মদ আকবর খান ও পেশাওয়ারের আবদুল কাইয়ুমের বিষয়ে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। তাঁরা ভাবলেন, এই দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে সোবিয়েৎ ইলাকায় প্রবেশ করলে তাঁদের বিপদ ঘটতে পারে। জজের মতে পাতাকেসরেই মুহম্মদ আকবর খানের নেতৃত্বের প্রায় অবসান ঘটেছিল।

আকবর খান একটি রিসালদার পরিবারের লোক। তাঁদের পরিবার তখনকার সমাজব্যবস্থায়, হয়তো এখনও, সম্ভ্রান্ত ও বিত্তবান ছিল। আকবর খানের পিতা হাফীজুল্লাহ্ একসময়ে সি· আই· ডি··র লোক ছিলেন। তাঁর কর্তব্য ছিল মুসলিম বিদ্রোহী উপনিবেশ চমরকন্দ (উজবেকিস্তানের সমরকন্দ নয়) ও সমস্তার খবর সংগ্রহ করা। এই দু'টি জায়গা ভারত ও আফ্গানিস্তানের মধ্যখানে স্বাধীন জাতির ইলাকায় অবস্থিত। সরকারী রেকর্ডে আছে যে এক সময়ে তাঁকে সমস্তায় গিয়ে একটি বোমা সংগ্রহ ক'রে আনতে বলা হয়েছিল এবং তিনি এই রকম একটি বোমা জোগাড় ক'রে এনেওছিলেন। এটা ছিল সেই রকমেরই চমরকন্দ বোমা যে রকম বোমা রাবলপিণ্ডি স্টেশনে ছোঁড়া হয়েছিল। বোঝা মুশ্কিল যে হাফীজুল্লাহ কোন্ পক্ষের আসল লোক ছিলেন। বিদ্রোহীরা তাঁকে বোমাটি দিয়েছিলেন কেন? কে জানে তিনিই রাবলপিণ্ডির বোমা এনে দিয়েছিলেন কিনা? মোটের ওপরে, মুহম্মদ আকবর খানের মুহাজির কাফিলার নেতৃত্ব পাতাকেসরে শেষ হয়ে যায়নি। তাঁর সেই নেতৃত্ব তাশকন্দে কাফিলা পৌঁছা পর্যন্ত ছিল। আর, জজ্ যে লিখেছেন আবদুল কাইয়ুম লাহোরে নিযুক্ত পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন তা ঠিক নয়। এটা অবশ্য ঠিক যে তাঁর পিতা খান বাহাদুর আবদুল হাকীম খান লাহোরের সি· আই· ডি, পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। আবদুল কাইয়ুমকে তাঁর পিতৃ-সংযোগের জন্যে সন্দেহের চোখে দেখা হতো। তিনি কিন্তু আর দেশে ফিরে না এসে সোবিয়েৎ দেশের নাগরিক হয়েছিলেন। তিনি রুশ মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, সে দেশেই চাকরী করেছেন, আজ আর তিনি বেঁচে নেই। কিছুকাল আগে রফীক আহ্মদ যখন সোবিয়েৎ দেশে গিয়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে তাঁর নিকটে আবদুল কাইয়ুমের মেয়েকে আনা হয়েছিল।

মোটের ওপরে, পাতাকেসর হতে আমুদরিয়া পার হয়ে আশি-বিরাশি জন মুহাজির তিরমিজ পৌঁছেছিলেন। সেখানে তাঁদের সোবিয়েৎ কর্তৃপক্ষ বিরাটভাবে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করেন। হিন্দুকুশ অতিক্রম-কারী শ্রান্ত-ক্লান্ত মুহাজিরগণ তিরমিজে সত্যিকার বিশ্রামলাভ করলেন। সেই সময়ে ওই অঞ্চলে তুর্কমেনরা বাসমাচিদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছিল। তারা কোনো কোনো জায়গায় রেলের লাইন তুলে ফেলেছিল। বাসমাচিরা ছিল ওই দেশের ধনী কৃষক ও ফিউডাল ভূম্যধিকারী। তারা লুঠতরাজও করত। বাসমাচি উজবেক

ভাষার শব্দ। তার অর্থ দস্যু। পেছন হতে ব্রিটিশ তাদের অস্ত্র ও অর্থ জোগাচ্ছিল। সাময়িকভাবে তিরমিজ অন্য সোবিয়েৎ ইলাকা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। পথে বিপদ আছে বলে সোবিয়েৎ কর্তৃপক্ষ মুহাজিরদের তিরমিজে থেকে যেতে অনুরোধ করলেন। বললেন, তাঁরা যেন স্টীমার আসলে তাতেই যান। প্রথম কাফিলার মুহাজিরদের ভিতরে অর্ধেকেরও বেশী লোক আনাতোলিয়ায় গিয়ে তুর্কিদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করার জন্যে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের আর কিছুতেই বিলম্ব সইছিল না। তাঁরা প্রস্তাব করলেন তাঁদের দু'খানা দেশীয় নৌকার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হোক। তাতেই তাঁরা চার্দজও রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত যাবেন। সেখান থেকে রেলপথে যাবেন ক্রাসনোবোদ্‌স্ক, তার পরে জলপথে বাকু। সেই ব্যবস্থাই হয়েছিল। নৌকাযোগে কির্কির দিকে মুহাজিররা যাচ্ছিলেন। নদীর কূল হতে তুর্কমেনদের নিমন্ত্রণ এলো। তারা বললো, "তোমরা মুসলমান ভাই, শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে এসেছো। আমাদের এখানে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে যাও"। নৌকার কিছু সংখ্যক মুহাজির বললেন, "কূলে নৌকা ভিড়ানো উচিত নয়। তাতে বিপদ ঘটতে পারে"। অন্যরা বললেন, "নিমন্ত্রণ যখন করছে তখন কেন ভিড়াব না নৌকা?" কিন্তু মুহাজিররা কূলে যখন নামলেন তখন চার দিক হতে তাঁদের ঘিরে ফেলা হলো। তল্লাশী ক'রে দেখা হলো তাঁদের নিকটে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র আছে কিনা। যখন দেখা গেল যে তাঁদের নিকটে কোনো অস্ত্রই নেই তখন শুরু হলো তাঁদের ছোটানো, আর সঙ্গে সঙ্গে মারও পড়তে লাগল তাঁদের ওপরে। মাজার-ই-শরীফ হতে একজন তুর্কি মুহাজিরদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্য হতে সরফরাজ নামক একজন পথে পালিয়ে গিয়েছিল। তাই এই তুর্কিকে সরফরাজ নাম দিয়েই মুহাজিররা সঙ্গে নিয়েছিলেন। কারণ, এই নামেই আফগান গবর্নমেণ্টের ছাড়পত্র তাঁদের নিকটে ছিল। তাঁকে সঙ্গে আনাতে মুহাজিরদের উপকার হয়েছিল। তিনি তাঁদের কথা তুর্কমেনদের বোঝাতে পারছিলেন, আবার তুর্কমেনদের কথাও বোঝাচ্ছিলেন তাঁদের। শেষ পর্যন্ত মুহাজিরদের সম্বন্ধে তুর্কমেন বৃদ্ধদের সভা বসল। তাতে তাঁদের সকলের প্রতি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হলো। তাঁদের গুলি করে মারার জন্যে প্রথম হুকুম দেওয়াও হয়ে গিয়েছিল এমন সময়ে এক বৃদ্ধ সেখানে ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন। তিনি বললেন, "বন্দীদের নিকটে আফগান গবর্নমেণ্টের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। যদি তাদের মেরে ফেলা হয় তবে আফগান গবর্নমেণ্ট আমাদের দায়ী করবেন, চাই কি আমাদের ইলাকা তাঁরা আক্রমণও করতে পারেন। অতএব, বন্দীদের মেরে না ফেলে কয়েদ করে রাখা হোক।" রফীক আহ্‌মদের বিবৃতি হতে বোঝা যায় যে সেদিন আফগান গবর্নমেণ্টের ছাড়পত্রের দৌলতে মুহাজিররা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। তারপরে একদিন লালফৌজের কামান গর্জন শুনে বন্দীদের ছেড়ে দিয়ে তুর্কমেনরা পালিয়ে যায়। মুহাজিরেরা আশ্রয় পেলেন কির্কির দুর্গে। সেখানে তাঁদের জন্যে সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আর তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন চার্দজও যাওয়ার স্টীমারের জন্যে। ইতোমধ্যে তুর্কমেনরা বিরাট সশস্ত্র শক্তি সঞ্চয় ক'রে ফিরে এলো। কির্কির দুর্গ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। লালফৌজ যখন তুর্কমেনদের প্রতি-আক্রমণ করতে যাচ্ছিলেন তখন ভারতের মুহাজিরগণও অধ্যক্ষের নিকটে গিয়ে অস্ত্র চাইলেন। বললেন, তাঁরাও যুদ্ধ করবেন তুর্কমেন প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে। অস্ত্র তাঁদের দেওয়া হয়েছিল এবং ট্রেঞ্চ হতে নদীর কূল তাঁরা রক্ষা করেছিলেন। আমাদের দেশের মুহাজিররা যে লালফৌজের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন সেটা ইতিহাসে আমাদের

পক্ষে গৌরবের বিষয় হয়ে থাকবে। এতকাল পরে রুশ বিপ্লবের পঞ্চাশতম বার্ষিকী পালন উপলক্ষে সর্বোচ্চ সোবিয়েৎ তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁরা কির্কি দুর্গে অস্ত্রধারণকারী মুহাজিরদের একজন, ভোপালের রফীক আহ্‌মদকে "Medal for 'Combatment' for his valour in fighting against the Counter-revolutionries in Central Asia in the latter half of 1920" দিয়ে ভূষিত করেছেন। সেন্‌ট্রাল এশিয়ায় ১৯২০ সালের শেষার্ধে প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সম্মাননায় রফীক আহ্‌মদ যে পদক পেলেন সেটা তিনি তাঁর কমরেডদের প্রতিনিধিরূপেই পেয়েছেন। তাঁদের অনেকে আজ বেঁচে নেই। কেন জানিনে, তুর্কমেন দ্বারা গিরেফ্‌তার ইত্যাদির বিবরণ মুহম্মদ আকবর খান তাঁর মুলাকতকারীকে বলেননি।

তুর্কমেন প্রতিবিপ্লবীরা পর্যুদস্ত হওয়ার পরে ভারতীয় মুহাজিররা কির্কি হতে স্টীমার যোগে চার্দজুও যান এবং সেখানে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। কেউ কেউ ভেবেছিলেন যে তুর্কমেনদের দ্বারা গিরেফ্‌তার হয়ে যে-ভাবে তাঁরা প্রাণ হারাতে বসেছিলেন এবং কির্কিতে যে-ভাবে মুহাজিররা অস্ত্রধারণ করেছিলেন তারপরে তাঁদের মধ্য হতে কোনো মুহাজির আর আনাতোলিয়ায় যেতে চাইবেন না। বিশেষভাবে, তুর্কমেনদের দ্বারা গিরেফ্‌তার হওয়া মুহাজিরদের কয়েকজনকে যখন আর পাওয়াই যায়নি। কিন্তু চার্দজুওতে দেখা গেল যে প্রায় অর্ধেকের মতো মুহাজির আনাতোলিয়া যাওয়ার জন্যে তখনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁরা রেলপথে ক্রাসনোবস্ক হয়ে বাকু যাত্রা করলেন। তখন বাকুতেও তুর্কি অফিসাররা তুর্কি সৈন্য রিক্রুট্ করছিলেন। সোবিয়েৎ তাঁদের সব সুবিধা দিচ্ছিলেন। কির্কির বাকী মুহাজিররা তাশকন্দে গেলেন। এই মুহাজিররা তাশকন্দের মিলিটারি স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন। মিলিটারি স্কুল উঠে যাওয়ার পরে তাঁরাই আবার মস্কোতে গিয়ে "শ্রমজীবী প্রাচ্যের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে" (Communist University of the Toiling East) ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করেছেন। তাশকন্দে ও মস্কোতে তারাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। অন্য কাফিলার লোকেরাও কিছু কিছু এসব কাজে এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মুহম্মদ আকবর খানের নেতৃত্বে আসা লোকেরাই এগিয়েছিলেন বেশী। এই কাফিলার লোকেদের মধ্য হতে যাঁরা বাকু গিয়েছিলেন তাঁদেরও বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। তুর্কিরা তাঁদের বিশ্বাস করেননি, সৈন্যদলে ভর্তিও করেননি। আরও বহু ভারতীয় মুহাজিরের সঙ্গে তাঁরা এই ব্যবহার করেছেন।

কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোর্সটি খুব বড় ছিল না। এই কোর্স শেষ হওয়ার পরে কথা ওঠে যে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা দেশে ফিরে এসে পার্টি গড়ার কাজ আরম্ভ করবেন। নানান পথে তাঁদের দেশে পাঠানোর চেষ্টা হয়। ব্যবস্থা এই হয় যে কমপক্ষে দু'জন একসঙ্গে যাবেন। তাই প্রত্যেককে একজন ক'রে সঙ্গী বেছে নিতে বলা হলো। শওকৎ উস্‌মানী মস্‌উদ আলী শাহ্‌কে সঙ্গী বেছে নিল, মীর আবদুল মজীদ ফিরোজুদ্দীন মন্‌সুরকে সঙ্গী বেছে নিল, আর রফীক আহ্‌মদ সঙ্গী বেছে নিলেন হাবীব আহ্‌মদ নসীমকে। গওহর রহমান খান ও মুহম্মদ আকবর শাহ্ পরস্পরের সঙ্গী হলেন। শওকৎ উস্‌মানী ও মস্‌উদ আলী শাহ্ পারস্যের পাসপোর্ট পেয়ে গিয়েছিল, আকবর শাহ্ আর গওহর রহমানও তাই পেয়েছিলেন। পারস্যের ভিতর দিয়েই একসঙ্গে দু'জন করে তাঁদের চারজন দেশে পৌঁছেছিলেন। আকবর শাহ্ কিন্তু তেহ্‌রানে গওহর

রহমান খান হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। অন্যদের জন্যে আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে দেশে আসার ব্যবস্থা তো আগেই হয়নি, এখন পারস্যের ভিতর দিয়েও আর হ'লো না। এই রকম দশজন ঠিক করলেন যে পামীর পার হয়ে তাঁরা দেশে ফিরবেন। প্রায় অসাধ্য সাধনের কাজ। কিন্তু কোনও উপায় ছিল না। এই দশ জনের নাম ঃ

(১) মীর আবদুল মজীদ (লাহোর)
(২) ফিরোজুদ্দীন মনসুর (শেখুপুরা)
(৩) রফীক আহ্‌মদ (ভোপাল)
(৪) হাবীব আহ্‌মদ (শাহ্‌জাহানপুর)

* * *

(৫) আবদুল কাদির সেহ্‌রাই (খান) (পেশাওয়ার)
(৬) ফিদা আলী (পেশাওয়ার)
(৭) সুলতান মাহ্‌মুদ (হাজারা)

* * *

(৮) সঈদ আহ্‌মদ রাজ (দিল্লী)
(৯) আবদুল হামীদ (লুধিয়ানা জিলা, ১৯১৫ সালের লাহোর মেডিকেল কলেজ হতে পলাতক ছাত্র)
(১০) নিজামুদ্দীন (কোয়েটার ফৌজ হতে পলাতক)

তাশকন্দ হতে রেলপথে রওয়ানা হয়ে শেষ রেলওয়ে স্টেশন হচ্ছে ওশ। ফরগনা উপত্যকার উপর দিয়ে এই রেলওয়ে গেছে। সমরকন্দ, কোকন্দ ও আন্দিজান প্রভৃতি স্থান পথে পড়ে। ফিরোজুদ্দীন বলেছে যে আন্দিজান পার হয়ে ওশ পৌঁছাতে ২০ মাইল বাকী থাকতে একটি রেলওয়ে স্টেশন তাঁদের শেষ স্টেশন ছিল। তারপরে অন্য যান-বাহনের ব্যবস্থা তাঁদের করতে হয়েছিল। এই শেষ রেলওয়ে স্টেশন হতে তাঁরা গিয়েছিলেন গুলচা, গুলচা হতে মুরগাব এবং মুরগাব হতে খরোগ। তাজিকস্তান রিপাবলিকের গোর্নি-বদখ্‌শান স্বতন্ত্র ইলাকার (Autonomous Region) প্রধান স্থান হচ্ছে এই খরোগ। পামীর এই ইলাকার অন্তর্ভুক্ত। ওশ হতে ৩৫০ মাইল পথ তাঁরা ২০টি 'স্টেজে' অতিক্রম করেছিলেন। আলতাই পার হওয়ার সময়ে তুষারপাত হওয়ায় তাঁরা অশেষ কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁরা যখন কারাকুল স্তেপে ডেরা পেতেছিলেন তখন হয়েছিল আরও প্রচন্ড তুষারপাত। তাঁদের ভাগ্য ভালো ছিল যে খরোগে কোনো তুষারপাত হয়নি। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝিতে তাঁরা খরোগে পৌঁছেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ২৫০ হতে ৩০০ জন রুশ সৈন্য ছিলেন। যে-সব সৈন্য ছুটিতে যাবেন তাঁদের জায়গায় এ সকল সৈন্যকে পোস্ট করা হচ্ছিল। ওপরে যে দশজন মুহাজিরকে তিন ভাগে বিভক্ত দেখানো হয়েছে তা কাজের সুবিধার জন্যে খরোগে আসার পরে করা হয়েছিল। প্রথম দলের চারজন, অর্থাৎ মীর আবদুল মজীদ, ফিরোজুদ্দীন মনসুর, রফীক আহ্‌মদ ও হাবীব আহ্‌মদ প্রথমে রওয়ানা হলেন। তাঁরা ইশকাশিম হয়ে এসেছিলেন। একজন শিগনানী তাঁদের ইশকাশিম পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। ইশকাশিম হতে একজন স্থানীয় লোক তাঁদের নুগ্‌সানী পাস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে চলে যান। সেখান থেকে তাঁরা চিত্রলে যান। পামীর হতে চিত্রল পর্যন্ত হিন্দুকুশের অংশটা অত্যন্ত দুর্গম। চিত্রলও হিন্দুকুশের অংশ বিশেষ। তারপরে আরম্ভ হয়েছে হিমালয় পর্বত। আফ্‌গানিস্তানের এই অংশটা

আমাদের কমরেডদের গোপনে রাত্রি বেলা পার হতে হয়েছে। তা না হলে তাঁরা ধরা পড়ে যেতেন।

আমাদের কমরেডদের প্ল্যান ছিল যে ভারতে পেঁৗছে যতদিন সম্ভব তাঁরা আত্মগোপন করে পার্টির কাজ করবেন। চিত্রল রাজ্যে পেঁৗছে তাঁরা কোনো সীমান্ত প্রহরীর চোখে পড়েননি। তাঁরা যখন চিত্রল শহরের পথে এগুচ্ছিলেন তখন একদল লোকের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়ে যায়। এই দলটি কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞসা করতে তাঁরা জানালেন যে তাঁরা হজ্জ্ করতে যাচ্ছেন। এদিকে কোথায় হজ্জ্ করবেন জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল যে "মজার-ই-শরীফে"। মজার-ই-শরীফ আমাদের কমরেডদের চেনা জায়গা। তাঁরা মনে মনে ভাবলেন, ভালোই হলো। তারাও বলবেন, তাঁরা মজার-ই-শরীফ হতে হজ্জ্ ক'রে ফিরেছেন। তাঁরা ফকীর-দরবেশের পোশাক-পরিহিত ছিলেন। চিত্রল শহরে যখন তাঁরা ঢুকছেন তখন তাঁদের পোশাক দেখে লোকেরা তাঁদের ভিক্ষাও দিয়েছিলেন। চিত্রল রাজ্যের শাসককে মেহ্‌তর বলা হয়। মেহ্‌তর পারসী ভাষার শব্দ। তার মানে প্রধান। যারা আমাদের ময়লা ও আবর্জনা পরিস্কার করে তাদেরও আমরা মেহ্‌তর (মেথর) বলি। মানুষের একটা জমকালো নাম দিয়ে তাদের দ্বারা আমরা ময়লা পরিষ্কারের কাজ করিয়ে নিই। এটাও পুরনো দিনের সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তিত একটা শোষণ। যাক, যা বলছিলাম। আমাদের চারজন কমরেড মেহ্‌তরের প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করে জানালেন যে তাঁরা মজার-ই-শরীফ হতে হজ্জ্ করে ফিরছেন। মজার-ই-শরীফ হয়ে মুহাজিররা তুর্কিস্তানে গিয়েছিলেন। তখন এই স্থান সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করিনি। এখন যখন চারজন কমরেড মজার-ই-শরীফে হজ্জ্ করে আসার কথা জানালেন তখন এই স্থান সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। **মজার-ই-শরীফ আফ্‌গান তুর্কিস্তানের রাজধানী। এক শ্রেণীর মুসলমানদের নিকটে, বিশেষ করে শিয়া জমাআতের মুসলমানদের নিকটে স্থানটি পবিত্র। মজার-ই-শরীফ দর্শন করে আসা মানে তাঁদের নিকটে হজ্জ্ ক'রে আসা, যেমন মক্কা হতে লোকেরা হজ্জ্ করে আসেন।** বৎসরের একটা নির্দিষ্ট দিনে কা'বার মস্‌জিদ প্রদক্ষিণ করা ও একটা বিরাট ময়দানে সমবেত হয়ে বিশ্বের সকল দেশের মুসলমানদের সাথে একত্রে ঈদের নামাজ পড়াকে হজ্জ্ বলা হয়। কথিত আছে যে মুহম্মদের জামাতা ও পিতৃব্য পুত্র এবং মুস্‌লিম জগতের চতুর্থ খলীফা আলীর কবর ওখানে "আবিষ্কৃত" হয়েছে। তাই থেকে জায়গাটার নাম মজার-ই-শরীফ হয়েছে। 'মজার'-এর অর্থও কবর। কি করে যে আলীর কবর ওখানে এলো তা বলা কঠিন। ১৪২০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে সুলতান আলী মির্জা তাঁর বিখ্যাত মস্‌জিদ ওখানে নির্মাণ করেছেন। মুসলিম-দের ভিতরে শিয়া জমাআতের লোকেরা এই মস্‌জিদকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে থাকেন। তাঁরা মনে করেন মস্‌জিদটি আলীর কবর। এ জায়গাটা প্রথমে একটি গ্রাম ছিল। তার নাম 'খায়র'। পরে এর নাম হয় খোজা খায়রান। তার পরে দ্বাদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর ভিতরে এখানে আলীর কবর "আবিষ্কার" হয়ে যায় এবং এটা যে প্রকৃতই আলীর কবর তাও নাকি প্রমাণিত হয়ে যায়। মৃত্যুর কয়েকশ' বছর পরে কি করে যে এমন প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে তা বোঝা আমার পক্ষে অবশ্য খুবই কঠিন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ স্থানকে ভ্রমণকারীরা শুধুই 'মজার' নামে অভিহিত করেছেন। গত একশ' বছরের কিছু বেশীকাল হতে এর নাম 'মজার-ই-শরীফ হয়ে গেছে।

আগের কথায় আসছি। মেহ্‌তরের প্রাইভেট সেক্রেটারি তাঁর নিকটে লিখিত

রিপোর্ট পাঠালেন যে চারজন লোক মজার-ই-শরীফের হজ্জ্ করে ফিরেছেন। তার ওপরে মেহ্‌তর হুকুম পাশ করলেন যে তাঁদের প্রত্যেককে একটি করে জুব্বা দেওয়া হোক, আর খাওয়ার জন্যে দেওয়া হোক পঞ্চাশ টাকা। ঘটনাগুলি একের পর এক আমাদের কমরেডদের অনুকূলে ঘটে যাচ্ছিল। আর কিছুক্ষণ পরেই তাঁরা উধাও হয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু হাবীব আহ্‌মদের সংযমের অভাবে মুহূর্তের ভিতর সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে গেল। প্রাইভেট সেক্রেটারির টেবিলের উপরে ইংরেজি খবরের কাগজ পড়েছিল। তার জন্যে হাবীব আহ্‌মদের দুর্দমনীয় লোভ হচ্ছিল। অনেক কষ্টে তিনি নিজেকে সামলে রাখছিলেন। শেষ মুহূর্তে তিনি আর থাকতে না পেরে প্রাইভেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করলেন, খবরের কাগজের ওপরে তিনি একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন কিনা? প্রাইভেট সেক্রেটারি যেন হঠাৎ আকাশ হতে পড়ে গেলেন। এঁরা যে দরবেশ নন তা তিনি বুঝলেন, মনে মনে হয়তো ভাবলেনও, "কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলেম আমি"। আমাদের চারজন কমরেডকে তিনি বললেন, "আপনারা এখন চলে যেতে পারেন। তবে, চিত্রল ত্যাগ করার আগে ভারত গবর্নমেন্টের এজেন্টের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন"। তাঁরা বাইরে এসে দেখলেন যে অনেক দূর থেকে সাদা পোশাক পরা লোকেরা তাঁদের ওপরে নজর রাখছেন। তাঁদের বুঝতে একটুকুও অসুবিধা হলো না যে গিরেফ্‌তারই হয়ে গেছেন তাঁরা। তাঁরা চার জন :—মীর আবদুল মজীদ, রফীক আহ্‌মদ, হাবীব আহ্‌মদ ও ফিরোজুদ্দীন মনসুর।

প্রহরাধীনে তাঁদের পেশোয়ারে পাঠানো হয়েছিল।

যে দশজন মুহাজির খরোগ পৌঁছেছিলেন তাঁদের মধ্যে চারজনের কথা এখানে বলা হলো। দ্বিতীয় দলে ছিলেন তিনজন :—আবদুল কাদির সেহ্‌রাই (খান), সুলতান মাহ্‌মুদ ও ফিদা আলী। ইতোমধ্যে আগের দল যে ইশকাশিম পাস হয়ে এসেছিলেন, সে পথ তখন সম্পূর্ণরূপে বরফে ঢেকে গিয়েছিল। তাই স্থির হলো তাঁদের ওয়াখানের পথে পাঠানো হবে। এই পথে সোভিয়েতের শেষ আউট পোস্ট কালাপাঞ্জা পৌঁছুতেই তাঁদের চার দিন লেগে যায়। আফ্‌গান সীমানায় পৌঁছে দুরাত্রি কঠোর চড়াইয়ের পথ অতিক্রম করে তাঁরা সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ১২৫০০ ফিট উচ্চ বরোগিল গিরিসংকটে পৌঁছেছিলেন। এখানে পাসের বরফ-ঢাকা পথ দেখিয়ে দিয়ে গাইড বিদায় নিলেন। যথাসময়ে বরোগিল পাসের দক্ষিণ সীমায় তারা চিত্রল রাজ্যের ভূমি স্পর্শ করলেন। ভোরবেলা ছিল। চিত্রলে প্রবেশ করার সময়ে কারুর নজরে তারা পড়লেন না। নিজেদের প্রেরণাতে মেহ্‌তরের বর্ডার অফিসারের বাড়ীতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। এই তিনজনকেও প্রহরাধীনে পেশোয়ারে পাঠানো হলো।

দশজনের বাকী তিনজন :—আবদুল হামীদ, সঈদ আহ্‌মদ রাজ ও নিজামুদ্দিন আর সেবারে আসতে পারেননি। তাঁরা মস্কো ফিরে গিয়েছিলেন।

পেশোয়ারের প্রথম ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

এটা কিন্তু মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা নয়। কেউ কেউ এই মোকদ্দমাকে তাশকন্দ ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা বলেছেন। এই মোকদ্দমাটিই পেশোয়ারের প্রথম ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা, অবশ্য কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংস্রবে অনুষ্ঠিত ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা-গুলির মধ্যে। মুহম্মদ আকবর খানের কথা আমরা বারে বারে বলেছি। ৮০ জন মুহাজিরের একটি কাফিলার নেতা হয়ে আফ্‌গানিস্তানের জবলুস্‌সিরাজ হতে

তিনি সোভিয়েত তুর্কিস্তান অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন। পথের কষ্ট ও বিপদের কথা আমি আগেই বর্ণনা করেছি। তাশকন্দেও তাঁকে সম্মানের চোখে দেখা হতো। তিনি মিলিটারি স্কুলেও যোগ দিয়েছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতিকথায় যদিও তাঁর নামোল্লেখ দেখেছি বলে মনে পড়ে না তবুও মুহম্মদ আকবর খানের মোকদ্দমার সাক্ষ্য হতে প্রমাণিত হয়েছে যে তাশকন্দে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নিকটে তাঁর অবারিত দ্বার ছিল। রায় তাঁকে সম্মান করতেন।

মুহম্মদ আকবর খান মস্কো যাননি, তাশকন্দ হতেই ফিরে এসেছিলেন তিনি। তাশকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার পরে বেশ কিছু কাল সেখানে থাকা সত্ত্বেও তিনি পার্টিতে যোগ দেননি। কিন্তু পার্টির প্রোগ্রাম তিনি মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সাক্ষ্য প্রমাণ হতে তা প্রমাণিত হয়েছে। দেশে ফেরার পথে ১৯২১ সালের ১৩ই মে তারিখে আকবর খানকে কাবুলে দেখা গেছে। তখন সঙ্গে সঙ্গেই যে তিনি ভারতে ফিরেছিলেন তা নয়। তাঁকে স্বাধীন জাতির ইলাকায় বিদ্রোহীদের উপনিবেশ চমরকন্দেও দেখা গেছে।

যে সকল মুহাজির ফিরে আসছিলেন তাঁদের প্রথম দল ৩রা জুন (১৯২১) তারিখে পেশোয়ারে পৌঁছেছিলেন। এই ফিরে আসা মুহাজিররা পেশোয়ারের ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের নিকটে ক্রমাগত বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যে মুহম্মদ আকবর খান বলশেভিকদের পক্ষপাতী লোক। এই কারণে পুলিস ও পেশোয়ারের ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর লোকেরা মুহম্মদ আকবর খান সম্বন্ধে খুবই সজাগ হয়ে উঠেন। তাঁরা তাক ক'রে থাকেন যে পেলেই আকবর খানকে ধরতে হবে। কিন্তু এর মধ্যে তিনি কখন কোন্ পথে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন তা টের পাওয়া যায়নি। তিনি স্থির করেছিলেন, একটা প্রেস কিনে স্বাধীন জাতির ইলাকায় বসাবেন এবং সেখান হতে আমাদের রাজনীতিক সাহিত্য ছাপিয়ে তা ভারতে প্রচার করবেন। প্রেস তিনি কিনে স্বাধীন ইলাকায় পাঠিয়েও দিয়েছিলেন। তার কিছু সরঞ্জাম পাঠানো তখনও বাকী ছিল। মনে হয় এই প্রেসের কারণেই তিনি লাহোরে গিয়ে থাকবেন। তাঁর মোকদ্দমার কাগজপত্র হতে বোঝা যায় যে লাহোরে তিনি কোনো কোনো মজুর ইউনিয়নের, বিশেষ করে প্রেস মজুর ইউনিয়নের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরূপে তখন মুহম্মদ আলী কাবুলে ছিলেন। দেশে ফেরার সময়ে মুহম্মদ আকবর খান কিভাবে কি করবেন, না করবেন, তার সব ব্যবস্থা মুহম্মদ আলীর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করে এসেছিলেন। তাঁর দেশে ফেরার পরে সব কাজ ভালোয় ভালোয় এগিয়েও যাচ্ছিল।

বাহাদুরের পরিচয়

এদিকে পুলিস খবর পেয়ে গিয়েছিল যে মুহম্মদ আকবর খান দেশে ফিরেছেন এবং লাহোরে তাঁর পিতা হাফীজুল্লাহ্ খানের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। এর পরে ১৯২১ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে মুহম্মদ আকবর খান এবং তাঁর চাকর বলে কথিত বাহাদুর শবে কদরের দূরের দিকে, কিন্তু পেশোয়ার জিলার সীমানার ভিতরে গিরেফ্‌তার হয়ে গেলেন। তাঁরা সীমানা পার হয়ে স্বাধীন ইলাকায় যাচ্ছিলেন। এখানে বাহাদুরের কিছু পরিচয়ের দরকার। বাহাদুর নিজেকে তিব্বতী বলে পরিচয় দিয়েছিল। কাশগরকে বিশেষ পর্যবেক্ষণের

উদ্দেশ্যে একটি দল পুরোগামী হয়ে গিলজিটে গিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে বাহাদুরকে পাচকের কাজে নিযুক্ত করেন। এই দলের সঙ্গে সে ভারতবর্ষে আসে। ১৯১৯ সালে এই দলের সঙ্গেই আবার সে পারস্যে যায়। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে বাজ্‌গারানে এই পর্যবেক্ষক দলকে ত্যাগ ক'রে সে বলশেভিকদের পক্ষে চলে যায়। এটা অবশ্য মুহম্মদ আকবর খানের মোকদ্দমায় গবর্নমেণ্টের পক্ষের বিবৃতি। তারপরে বাহাদুরকে বুখারা ও তাশকন্দে দেখা গেছে। তার সঙ্গে মুহম্মদ আকবর খানের কোথায় প্রথম দেখা হয়েছিল তা বলা মুশ্‌কিল। একজন সাক্ষী বলেছেন আকবর খানের ফেরার সময়ে কাবুলে তার সঙ্গে বাহাদুরকেও তিনি দেখেছেন। অন্য একজন সাক্ষী বলেছেন যে চমরকন্দে মুহম্মদ আকবর খানের সঙ্গে বাহাদুরের প্রথম পরিচয় হয়েছে। তবে, পরিচয় যেখানেই হোক না কেন, ১৯২১ সালের ৩রা জুন তারিখে মুহাজিরদের যে দল পেশোয়ারে প্রথম ফিরে এসেছিল তার সঙ্গে বাহাদুরও এসেছিল। সে পুলিসের চোখ এড়িয়ে হরিপুরে মুহম্মদ আকবর খানদের বাড়ী চলে গিয়েছিল। সে হাফীজুল্লাহ্‌ খানের নামে মুহম্মদ আকবর খানের চিঠি এনেছিল।

আগেই বলেছি মুহম্মদ আকবর খান ও বাহাদুর ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯২১) তারিখে গিরেফ্‌তার হয়েছিলেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯২১) তারিখে হাফীজুল্লাহ্‌ খান গিরেফ্‌তার হলেন হরিপুরে তাঁর নিজের বাড়ীতে।

১৯২১ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চীফ্‌ কমিশনার ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে (১) মুহম্মদ আকবর খান (বয়স ২৬ বছর), (২) বাহাদুর (বয়স ১৮ বছর) ও (৩) মুহম্মদ আকবর খানের পিতা হাফীজুল্লাহ্‌ খানকে (বয়স ৫২ বছর) পেশোয়ারের আদালতে অভিযুক্ত করার জন্যে মঞ্জুরী প্রদান করলেন। তিনজন আসামীই তখন পেশোয়ার জেলে বন্দী ছিলেন। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা এই প্রথম আরম্ভ হলো।

এই মোকদ্দমার প্রধান আসামী মুহম্মদ আকবর খান তাশকন্দে থাকার সময়ে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হননি সে কথা আমি আগেই বলেছি। কিন্তু ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির করণীয় কাজকে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতে প্রবেশ করে যে ক'দিন তিনি আত্মগোপন করে ঘোরা-ফেরা করতে পেরেছিলেন তার ভিতরেই তিনি অনেকগুলি সাংগঠনিক কাজ করে ফেলতে পেরেছিলেন। তবে, তিনি যে ধরা পড়লেন সেটা তাঁর অসতর্কতার ফল ছিল, না, কেউ তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল, তা জানিনে।

মুহম্মদ আকবর খান গিরেফ্‌তার হওয়ার পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্নমেণ্ট ও ভারত গবর্নমেণ্টের মধ্যে কি ধরনের মত বিনিময় হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো কাগজ-পত্র আমাদের হাতে আসেনি।

ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১-এ ধারার (রাজা ও সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্র করার) মোকদ্দমার বিচার শুধু সেশনস্‌ (দায়রা) আদালতেই হতে পারে। এই মোকদ্দমার বিচারও সেশনস্‌ আদালতেই হয়েছিল। জজের নাম ছিল জে. এইচ. আর. ফ্রেজার, আই সি এস (J. H. R. Fraser, I.C.S.)। ১৯২২ সালের ৩১শে মে তারিখে তিনি মোকদ্দমার রায় শুনিয়েছিলেন। তিনি স্থির করেছিলেন যে মুহম্মদ আকবর খান ও বাহাদুরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হয়েছে। এই জন্যে মুহম্মদ আকবরকে তিন বছরের ও বাহাদুরকে এক বছরের

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। জজের মতে হাফীজুল্লাহ্ খানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হয়নি। এই জন্যে তাঁকে খালাস দেওয়া হয়।

এই ভাবে পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু পরিসমাপ্তি ঘটেও ঘটল না। সে কথা নীচে বলছি।

পেশোয়ারের দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

যে-মোকদ্দমার কথা এখন লিখতে যাচ্ছি সেটা সময়ের বিবেচনায় তৃতীয় মোকদ্দমা। তবে, প্রথম ও তৃতীয় মোকদ্দমার মূল আসামী একই ব্যক্তি,—মুহম্মদ আকবর খান। তা ছাড়া, এই তৃতীয় মোকদ্দমাটি আলাদা কোনো মোকদ্দমাই নয়, প্রথম মোকদ্দমা হতেই তার উদ্ভব হয়েছে। এটা জেলের শৃঙ্খলাভঙ্গের একটি মোকদ্দমা মাত্র।

মুহম্মদ আকবর খান হাজারা জিলার হরিপুরের শিক্ষিত ও রিসালদার পরিবারের ছেলে। তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিল। এ কথা আগে বলেছি। বড় বড় খানদের ছেলেদের ব্রিটিশ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিলে তারা ব্রিটিশ ভক্ত হয়ে উঠবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট পেশোয়ারে ইস্‌লামিয়া কলেজ স্থাপন করেছিলেন। কারণ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্ধর্ষ পাঠানদের বাগ মানাতে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সর্বদা হিমশিম খেয়ে যেতেন। তাই তাঁরা বিশেষ বিশেষ পরিবারকেও তুলে ধরতেন। যেমন আকবর খানদের রিসালদার পরিবার। নাম শুনলেই মনে হবে যে একটি রাজভক্ত পরিবার। এই পরিবারের ছেলে মুহম্মদ আকবর খান পড়েছেন পেশোয়ারের ইস্‌লামিয়া কলেজে। তাঁর মোকদ্দমার কাগজ-পত্র হতে আমরা জানতে পারি যে তিনি একবার বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন। আবার যখন পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে তাঁর কলেজের ক্লাসে উপস্থিতির শতকরা হার কম। তাই, তিনি দ্বিতীয় বার আর পরীক্ষা দিতে পারেননি। এ সব সত্ত্বেও মুহম্মদ আকবর খান একজন সুশিক্ষিত যুবক ছিলেন। তাঁর মোকদ্দমার ইংরেজ জজও বলেছেন আকবর খান ইংরেজি খুব ভালো জানতেন। তাঁর পারসী ভাষার জ্ঞানেরও তারিফ করা হয়েছে।

রিসালদার পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রে এবং পেশোয়ারের ইস্‌লামিয়া কলেজে বিদ্যার্জন করেও মুহম্মদ আকবর খান ব্রিটিশভক্ত হননি। মুহম্মদ আকবর খানের পিতা হাফীজুল্লাহ্ খান সমস্তা ও চমরকন্দের বিপ্লবী উপনিবেশ সম্বন্ধে পেশোয়ারের ব্রিটিশ ইন্‌টেলিজেন্সকে বরাবর খবর দিতেন। তা সত্ত্বেও মুহম্মদ আকবর খান একজন পাকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীরূপে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। কখন যে তার সঙ্গে সমস্তা ও চমরকন্দের বিপ্লবী কলোনীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল তা আমি জানিনে, তবে যোগসূত্র স্থাপিত যে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

স্বাধীন জাতির ইলাকায় যে বিপ্লবী কেন্দ্র ওয়াহাবী বিদ্রোহের সময়ে স্থাপিত হয়েছিল তাই চলে আসছিল মুহম্মদ আকবর খানের যৌবনেও। তাঁর প্রথম মোকদ্দমার আপীলের মীমাংসা করতে গিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জুডিশিয়েল কমিশনার ১৯২২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর নিকটে দায়ের করা মুহম্মদ আকবর খানের মোকদ্দমার আপীলের রায়ে লিখেছেন ঃ

"………that the Chamarkand colony has been created artificially by a number of persons who have no other bond except the

conspiracy (a revolutionary movement against the British Government and some of the members of it personally) itself. Its continuance and existence depends solely upon that conspiracy. No person could voluntarily become a member of that community unless he definitely intended to be a member of that conspiracy."

অর্থাৎ, "......চমরকন্দের উপনিবেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা কৃত্রিমরূপে গঠিত। এই ব্যক্তিদের নিজেদের ভিতরে ষড়যন্ত্র করার বন্ধন ছাড়া অন্য কোন বন্ধন নেই। (এটা হলো ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিগতভাবে তার কিছু সংখ্যক মেম্বরের বিরুদ্ধে একটা বিপ্লবী আন্দোলন।) এর বর্তে থাকা ও অস্তিত্ব সর্বতোভাবে ষড়যন্ত্র করার ওপরেই নির্ভর করে। চাইলেই কেউ এ সম্প্রদায়ের সভ্য হতে পারে না যদি না সে নিশ্চিত ইচ্ছা প্রকাশ করে যে সে ষড়যন্ত্রকারীও হবে।"

চমরকন্দের বিপ্লবী উপনিবেশ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের ধারণা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জুডিশিয়েল কমিশনারের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। ষড়যন্ত্রের এই ভীতি হতেই সমস্ত জগতের বিচারকার্যের ইতিহাসে ১৯২৩ সালে পেশোয়ারে একটি কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটেছিল।

পেশোয়ারের প্রথম ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ১৯২২ সালের ৩১শে মে তারিখে মুহম্মদ আকবর খান তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনি পেশোয়ারের ডিস্ট্রিক্ট জেলেই ছিলেন। ১৯২৩ সালের ৭ই মার্চ তারিখে পেশোয়ারের এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জে. আমণ্ড, আই. সি. এস. (J. Almond, I.C.S.) ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে বিচারের জন্যে আবার মুহম্মদ আকবর খানকে দায়রায় সোপর্দ করলেন। তাঁর সঙ্গে আরও দুজন দায়রায় সোপর্দ হয়েছিলেন। তাঁদের নাম ঃ

(১) মুহম্মদ হাস্‌সান ও

(২) গুলাম মাহ্‌বুব।

মুহম্মদ আকবর খানের বিরুদ্ধে নূতন অভিযোগ এই ছিল যে তিনি পেশোয়ার ডিস্ট্রিক্ট জেলের ভিতর হতে গোপন পথে সাত-আটখানা পত্র বাইরে পাঠিয়েছিলেন। পত্রগুলির প্রাপকেরা সীমানার বাইরের লোক ছিলেন এবং চমরকন্দের বিপ্লবী উপনিবেশের লোকেরাও ছিলেন। আসল পত্রগুলি যথাস্থানে পৌঁছেছিল কিনা তা জানা নেই। কিন্তু নৌশহরার রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে গুলাম মাহ্‌বুবের শরীর তল্লাশী ক'রে উল্লিখিত পত্রগুলির প্রতিলিপি পাওয়া যায়। মুহম্মদ হাস্‌সান স্বীকার করেছিলেন যে প্রতিলিপিগুলি তাঁর হাতের লেখা। মুহম্মদ আকবর খানের হাতের লেখা তিনি চিনেন না, মুহম্মদ আকবর খানের সঙ্গেও তাঁর কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় কখনও ছিল না। পয়সা নিয়ে তিনি প্রতিলিপি তৈয়ার করেছেন। পত্রগুলিতে মুহম্মদ আকবর খান তাঁর বন্ধুদের খবর দিয়েছেন যে তিনি তিন বৎসরের ও বাহাদুর এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। আকবর খান তাঁর বন্ধুদের লিখেছেন, এ কটি দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে (একজন ছাব্বিশ বছরের যুবক এমন কথা বলতে পারেন বই কি), তারপরে তিনি বাইরে গিয়ে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে একত্র হয়ে আবার কাজে লেগে যাবেন। কাবুলে তাঁর বন্ধুদের খবর দিতে বলেছেন। তাঁদের মধ্যে সোনার দাঁতওয়ালার উল্লেখ আছে। 'কমরেড' ও 'তওয়ারিশ' এই দুটি শব্দেরও উল্লেখ আছে পত্রে। 'তওয়ারিশ' রুশ ভাষার শব্দ। তার মানেও কমরেড।

গবর্নমেণ্টের অভিযোগের প্রতিটি অক্ষর সত্য ধ'রে নিলেও মোকদ্দমা করার পক্ষে এটা একটা কারা-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অতি সাধারণ অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের জন্যে বন্দীর বিরুদ্ধে সাধারণত কোনো মোকদ্দমাই হয় না। কারণ, তাতে কর্তৃপক্ষের মুখ রক্ষার ব্যাপার আছে। আর যদি মোকদ্দমা হয়ও তাতে দু'চার মাসের সাজা হয় মাত্র। কিন্তু মুহম্মদ আকবর খানের বিরুদ্ধে এর জন্যে রাজা ও সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্র করার মোকদ্দমা হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্নমেণ্ট এই মোকদ্দমা চালাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রেসের জন্যে মাল পাঠাবার কথা পত্রে আছে। সরকারপক্ষ বুঝতেই পারলেন না মালটা কিসের? সোনার দাঁতওয়ালার কথা পত্রে উল্লেখ আছে। সরকারপক্ষ বুঝলেনই না এই সোনার দাঁতওয়ালা কে? ডাক্তার নূর মুহম্মদ, না মুহম্মদ আলী? মুহম্মদ আকবর খানের হাতের লেখা কোন পত্রই আদালতে দাখিল করা হলো না। তবুও আদালতে বিচারের প্রহসন হলো। আগের মোকদ্দমার বিচারক জজ ফ্রেজার এই মোকদ্দমায় মুহম্মদ আকবর খানকে ১৯২৩ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। তার মধ্যে তিন মাস হবে নির্জন কারাবাস। আগেকার তিন বছর শেষ হলে সাত বছরের সাজা আরম্ভ হবে। মুহম্মদ হাস্‌সান ও গুলাম মাহ্‌বুব প্রত্যেকে ৫ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। তাঁদেরও প্রত্যেকের ওপরে তিন মাস নির্জন কারাবাসে থাকার আদেশ হলো।

পেশোয়ারের বিচারের এই অরাজকতার বিরুদ্ধে ভারতের অন্য কোথাও কেউ কিছু বলেছেন এমন কথা শুনিনি। বাঙলার সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র কেন্দ্রীয় আইন সভার সভ্য ছিলেন। ১৯২৬ সালে আমি তাঁকে দিয়ে কেন্দ্রীয় আইন সভায় একটি প্রশ্ন করিয়েছিলেম মাত্র। তা দেখে পেশোয়ারের সার আবদুল কাইয়ুম আশ্চর্য হলেন। তিনি শ্রীমিত্রের নিকটে এসে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন "এটা তো আমারই কাজ ছিল"। ওই পর্যন্তই। ব্রিটিশের একজন বশংবদ 'নাইট' এর বেশী আর কি করতে পারতেন?

মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা
(১৯২২-২৩)

"মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা" নামটি আমার দেওয়া নয়। এই মোকদ্দমার নথিপত্রেই এই নামটি রয়েছে। এটা যখন আমার জানা ছিল না তখন আমি অন্যত্র "পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা (১৯২২-২৩)" নাম ব্যবহার করেছি। আসলে ব্যাপারটি কিন্তু তাই। মোকদ্দমাটি আরম্ভ হওয়ার আগেকার কথাগুলি আমি আগেই বলেছি। তা থেকে সকলেই বুঝতে পারবেন কেন মামলাটি দায়ের হলো।

একটি কথা আমি আগে বলিনি। আমি লক্ষ্য করেছি যে এই মামলাটি নিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্নমেণ্ট ও ভারত গবর্নমেণ্টের মধ্যে বিস্তর লেখা-লেখি হয়েছে। মুহম্মদ আকবর খানের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা শুরু করার আগে এমন কোনো লেখালেখি হয়েছিল বলে মনে হয় না। অন্তত সেই রকম কোনো কাগজপত্র আমার চোখে পড়েনি। আকবর খানের মোকদ্দমা যখন হতে পারল এবং তাতে তাঁর কঠোর সাজাও হয়ে গেল তখন ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্ট-মেণ্টের এই সন্দেহ কোথা হতে ও কেন জাগল যে শুধু মস্কো ইউনিভার্সিটিতে

পড়ার জন্যে কি করে ধৃত বন্দীদের আদালতের বিচারে সাজা হতে পারে। গবর্নর জেনেরেলের এক্‌জেকিউটিব কাউন্সিলের সভ্য সার মালকম হেইলি স্বয়ং এ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ধৃত বন্দীদের ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বিনা বিচারে নজরবন্দী করে রাখার কথা। একটি কথা আমি এখানে আজকার দিনের তরুণ পাঠকদের জন্য পরিষ্কার করে দিতে চাই যে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনের (The Regulation III of 1818) আসল নাম ছিল বেঙ্গল স্টেট প্রিজনার্স এক্ট, ১৮১৮ (The Bengal State Prisoners Act of 1818)। সকলেই জানেন বাঙলা দেশেই প্রথম ব্রিটিশ রাজত্ব শুরু হয়েছিল। তথাকথিত রাষ্ট্র রক্ষার ব্যাপারে এই আইন রাজ্য বিস্তারের সংগে সংগে সর্বত্র প্রয়োগ করা হতো। বোম্বে ও মাদ্রাজের জন্যে অবশ্য আলাদা রেগুলেশন ছিল। রাজারাজড়া হতে আরম্ভ ক'রে পেশোয়ার মোকদ্দমার বন্দীদের মতো লোকদেরও এই আইন অনুসারে নজরবন্দী করে রাখা হতো।

আদালতে বন্দীদের বিচার করার কথা উঠতেই সংগে সংগে কথা উঠল যে রফীক আহ্‌মদ ভোপাল রাজ্যের প্রজা। ভারতের ভিতরে তিনি কোনো রাষ্ট্র-বিরোধী কাজ করেননি। তাঁকে কি ক'রে এই মামলার আসামী করা যায়? তখন আবার কথা উঠল যে শওকৎ উস্‌মানী দেশে ফিরে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে ধ'রে এই মামলায় জুড়ে দিতে পারলে আইনের দিক থেকে (legal procedure) অনেক বাধা কেটে যায়। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে উস্‌মানীকে? (১৯২৩ সালের ৯ই মে তারিখে উস্‌মানি অবশ্য কানপুরে গিরেফ্‌তার হয়েছিলেন, আর দায়রা আদালতে জজ্‌ মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার রায় শুনিয়েছিলেন ১৯২৩ সালের ১৮ই মে তারিখে)। শওকৎ উস্‌মানীকে বাদ দিয়েই মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার মীমাংসা হয়েছিল।

আগে মুহম্মদ আকবর খানের মোকদ্দমা হওয়া সত্ত্বেও সীমান্ত প্রদেশের গবর্নমেণ্ট বারে বারে ভারত গবর্নমেণ্টের সংগে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা চালাবার বিষয়ে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। অথচ তাঁদের মনে ছিল পেনাল কোডের ১২১-এ ধারার কথা। শেষে ভারত গবর্নমেণ্টই ভুলটি ধরিয়ে দিলেন। তাঁরা বললেন, আপনারা বলতে তো চাইছেন ১২১-এ ধারার কথা, তবে বারে বারে ১২১ ধারা বলছেন কেন? ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১ ধারা হচ্ছে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, তার ন্যূনতম দণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। আর ১২১-এ ধারা হচ্ছে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্র করা কিংবা সম্রাটকে ভারত সাম্রাজ্য হতে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করা। এর ঊর্ধ্বতম দণ্ড হচ্ছে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আর নিম্নতম দণ্ড যা কিছু হতে পারে।

মোকদ্দমা করার অনুমতি কে দিবেন তা নিয়েও সীমান্ত প্রদেশের গবর্নমেণ্টের ভাবনার অন্ত ছিল না। ভারত গবর্নমেণ্ট তাঁদের জানালেন যে অনুমতি আপনাদের চীফ্‌ কমিশনারও দিতে পারেন। আকবর খানের মোকদ্দমায় এর আগে চীফ্‌ কমিশনারই অনুমতি দিয়েছিলেন।

আসল কথা হচ্ছে এই যে ভারত গবর্নমেণ্ট বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে আদালতে বিচার ক'রে বন্দীদের সাজা দেওয়া যায়। তাই তাঁরা ধৃত বন্দীদের ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে নজরবন্দী করে রাখার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চীফ্‌ কমিশনার সার জন মাফে (Sir John Maffey) জানালেন যে মোকদ্দমা চালালে আসামীদের সাজা হয়ে যাবে, যদিও তিন নম্বর রেগুলেশনের প্রয়োগে তাঁর অমত নেই। সেক্রেটারি অফ্‌

স্টেট ফর ইণ্ডিয়া ও ভারত গবর্নমেণ্টের নীতি ছিল প্রথমে সাজা দেওয়াবার চেষ্টা করা। তা না হতে পারলে রেগুলেশন থ্রি'র প্রয়োগ করা। শেষ পর্যন্ত সেন্‌ট্রাল ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টরও মত দিলেন যে বিচারে আসামীদের সাজা হয়ে যাবে। তবে, দায়রার বিচার ও তার আপিল পেশোয়ারেই হতে হবে। কারণ, মুহম্মদ আকবর খানের আপিলে জুডিশিয়েল কমিশনার যে রায় দিয়েছেন এ মোকদ্দমার আপিলে তিনি তাঁর সেই রায়ের বিরুদ্ধে যেতে পারবেন না।

পেশোয়ারে মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা শুরু হলো

অতএব পেশোয়ারে মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা আরম্ভ হয়ে গেল। পেশোয়ার জিলার একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট—জে· আমণ্ড, আই· সি· এস· যথারীতি মোকদ্দমার প্রথম পর্ব (enquiry) শেষ করে ১৯২৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে বিচারের জন্যে মোকদ্দমাটি দায়রায় সোপর্দ করলেন। মুহম্মদ আকবর খানের বিচারক বিখ্যাত দায়রা জজ ফ্রেজার তো প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। মোকদ্দমাটি তিনি লুফে নিলেন। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহসূচক ধারাগুলি যে অধ্যায়ে আছে সেই অধ্যায়ের কোনো ধারা অনুসারে কাউকে অভিযুক্ত করতে হলে প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট কিংবা কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্টের নিকট হতে আগে অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। এই মোকদ্দমায় সীমান্ত প্রদেশের চীফ্ কমিশনার অনুমতি দিয়েছিলেন। আসামীরা ছিলেন ঃ

(১) মুহম্মদ আকবর শাহ্
পেশোয়ার জিলার নৌশহরা তহসীলের বদরাশি গ্রাম,
বয়স ২৩ বৎসর ;

(২) গওহর রহমান খান
হাজারা জিলার হরিপুরের সংলগ্ন দরবেশ গ্রাম,
বয়স ২৭ বৎসর ;

(৩) মীর আবদুল মজীদ
লাহোর শহরের মোচি দরওয়াজার ভিতরে ধল মহল্লা,
বয়স ২১ বৎসর ;

(৪) ফিরোজুদ্দীন মন্‌সুর
শেখুপুরা শহর,
বয়স ২১ বৎসর ;

(৫) হাবীব আহ্‌মদ
শাহ্‌জাহানপুর শহর,
বর্তমান উত্তর প্রদেশ ;

(৬) রফীক আহ্‌মদ
ভোপাল শহর, ভোপাল স্টেট,
বয়স ২৪ বৎসর ;

(৭) সুলতান মাহ্‌মুদ
হরিপুর, হাজারা জিলা,
বয়স ২৪ বৎসর ;

(৮) আবদুল কাদির খান (সেহ্‌রাই)
পেশোয়ার।

এই মোকদ্দমায় দু'জন রাজসাক্ষী হয়েছিল। তাদের নাম (১) ফিদা আলী

ও (২) গুলাম মুহম্মদ। ফিদা আলী পেশোয়ারের লোক, আবদুল কাদির খানের তিনজনের গ্রুপের সঙ্গে পামীর, ওয়াখান ও বরোগিব পাস হয়ে চিত্রলে পৌঁছেছিল। সে মস্কোতে শ্রমজীবী প্রাচ্যের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে এবং মস্কোতে সে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতেও ছিল। আর, গুলাম মুহম্মদ বিদেশে কখনও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতেও যোগ দেয়নি। সে তাশকন্দ হতেই দেশে ফিরে এসেছিল। তাকে শুধু সাক্ষ্য দেওয়ানোর জন্যেই পুলিস পেশোয়ার জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। তাকে রাখাও হয়েছিল এই মোকদ্দমার আসামীদের সঙ্গে, কিন্তু তাঁরা কেন যে তাকে সঙ্গে থাকতে দিলেন তা বোঝা মুশ্‌কিল। সে তাঁদের কথাবার্তা শুনে শুনে নিজের মনে একটা গল্প খাড়া ক'রে নিচ্ছিল। রফীক আহ্‌মদের বিবৃতি হতে জানা যায় যে গুলাম মুহম্মদ নিম্ন আদালতে আসামীদের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই বলেনি। কিন্তু মোকদ্দমা সেশন্স কোর্টে যাওয়ার পরে সে তাঁদের বিরুদ্ধে চুটিয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিল। আর ফিদা আলী নাকি নিম্ন আদালতেই চুটিয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিল। সেশন্সে যাওয়ার পরে উল্টো কথা বলেছিল। অর্থাৎ আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়নি। শুরু হতেই ফিদা আলীকে জেলে আলাদা জায়গায় রাখা হয়েছিল। মোটের উপরে, ফিদা আলী ও গুলাম মুহম্মদ দু'জনেই রাজসাক্ষীরূপে মুক্তি পেয়েছিল।

নিম্ন আদালতে আসামীরা একজন উকীল নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর কাজ ছিল অন্যায়ভাবে কোনো দলীল পত্র যেন মোকদ্দমায় ঢুকিয়ে না দেওয়া হয় তা পর্যবেক্ষণ করা। আসল বিচার যখন দায়রা আদালতেই হবে তখন নিম্ন আদালতে অর্থ ব্যয় করে কী লাভ?

দায়রা আদালতে আসামীদের পক্ষে মামলার তদবীর ভালোই হয়েছিল। তাঁদের আত্মীয়রা লাহোর হাইকোর্টের নামজাদা ব্যারিস্টার, বিখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক মিস্টার আবদুল কাদিরকে (পরে সার আবদুল কাদির, লাহোর হাইকোর্টের জজ) নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর পরিচালনার ফলেই বোধ হয় জজ আসামীদের কঠোর সাজা দিতে সাহস পাননি। আমি আগেই বলেছি যে ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা বিশ্বাসই করতে পারেননি যে আদালতের বিচারে আসামীদের সাজা দেওয়া যায়। এই জন্যে তাঁরা ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বিনা বিচারে আসামীদের বন্দী করে রাখার পক্ষে ছিলেন। স্থানটা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বলেই শেষ পর্যন্ত তাঁরা মোকদ্দমা চালাবার অনুমতি দেন।

১৯২৩ সালের ১৮ই মে তারিখে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের (ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের) ১২১-এ ধারা অনুসারে পেশোয়ারের সেশন্স জজ জে· এইচ· আর· ফ্রেজার, আই· সি· এস· আসামীদের নিম্নরূপ সাজা দিলেন ঃ

(১) মুহম্মদ আকবর শাহ্‌ ও
(২) গওহর রহমান খান,
প্রত্যেকের দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ;
(৩) মীর আবদুল মজীদ,
(৪) ফিরোজুদ্দীন মন্‌সুর,
(৫) হাবীব আহ্‌মদ,
(৬) রফীক আহ্‌মদ ও
(৭) সুলতান মাহ্‌মুদ
প্রত্যেকের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

আবদুল কাদির খান (সেহরাই) বে-কসুর খালাস পেল।

যে কোনো রাজনীতিক ও বিপ্লবী আন্দোলনে পুলিস সর্বদা আপন লোক ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এই রকমটা সর্বদেশে ঘটে থাকে, জারের রাশিয়াতেও ঘটত। আগের ও পরের সব কিছু বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কিছুমাত্র অন্যায় হবে না যে আবদুল কাদির খানকে চর্ হিসাবে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট হিজরাৎ যাত্রীদের সঙ্গে পাঠিয়েছিল। মুহাজিরদের সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁদের চরদের না পাঠিয়েই পারেন না। তারপরে অক্টোবর বিপ্লবের পরে সোবিয়েৎ দেশেরও খবর সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল। আবদুল কাদির খান একজন পাশকরা পুষ্তু ও উর্দু মুন্শী ছিল। ভারত গবর্নমেণ্টের নিযুক্ত পরীক্ষক বোর্ড (The Board of Examiners) এই রকম পরীক্ষা নিতেন। এই মুন্শীরা (সংস্কৃত ও বাংলা ইত্যাদি পড়াবার জন্যে পণ্ডিতেরাও ছিলেন) ব্রিটিশ সিবিল ও মিলিটারি অফিসারদের ভাষা শিক্ষা দিতেন। হিজরাতে যাওয়ার সময়ে আবদুল কাদির খান মধ্য ভারতের মৌতে (Mhow) অবস্থিত মিলিটারি স্টাফ্ কলেজে আর. এ. এফ. অফিসারদের পুষ্তু ও হিন্দুস্তানী পড়াত। তার নিজের ভাষায় "I was lecturer in Pushtu and Hindustani to the R. A. F. Officers stationed at the Military Staff College, Mhow, Central India." ('The Times', London). এটা ধারণা করা কিছুমাত্র অন্যায় হবে না যে এখানেই চরের কাজ করার জন্যে আবদুল কাদিরকে তৈয়ার করা হইয়াছিল। এখানেই তাকে রুশ ভাষাও শেখানো হয়েছিল। প্রাচ্য শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ের কথা বলতে গিয়ে আবদুল কাদির অভিযোগ করেছে যে "...though some of us had learned Russian, the Indian Section was always taught through the medium of English." ('The Times', London). অর্থাৎ, "যদিও আমরা কিছু লোক রুশ ভাষা শিখেছিলেম তবুও ভারতীয় ছাত্রদের সর্বদা ইংরেজি ভাষার মারফতে পড়ানো হতো।" ('টাইম্স্' লণ্ডন)। মাত্র কয়েকমাস সোবিয়েৎ দেশে বাস করে কেউ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ও মার্কসীয় তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা বোঝার মতো রুশ ভাষা আয়ত্ত করতে পারেন না।

আবদুল কাদির খানের বিবৃতি হতে বোঝা যায় যে সে অনেক মিথ্যা বলেছে। পেশোয়ারে পুলিসের নিকটে বিবৃতি দিয়ে সে বলেছে, "I went to Jablus Siraj and from there to Tashkent under Muhammad Akbar Khan of Haripur." অর্থাৎ "আমি জবলুস সিরাজে গিয়েছিলেম এবং সেখান হতে হরিপুরের মুহম্মদ আকবর খানের নেতৃত্বে তাশকন্দ।" এটা মিথ্যা কথা। লণ্ডনের 'টাইম্স্' পত্রিকায় আবদুল কাদির নিজেই লিখেছে, সে অক্সাসের (আমু দরিয়ার) পথে যায়নি। (মুহম্মদ আকবর খান কিন্তু এই পথেই গিয়েছিলেন)। 'টাইম্স্'-এর প্রবন্ধে আবদুল কাদির লিখেছে যে সে তখ্তা বাজারের পথে সোবিয়েৎ দেশে প্রবেশ করেছিল এবং রেলপথে মার্ব্ (Merv) ও বুখারা হয়ে তাশকন্দ পেঁছেছিল। আকবর খানের নেতৃত্বে যাওয়া লোকদের মধ্য হতেই বেশী লোক কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। সেই জন্যে আকবর খানের সঙ্গে গিয়েছিলেন বললে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নিকটে তাঁর রিপোর্ট বেশী মূল্যবান বিবেচিত হবে, এই কথাই হয়তো আবদুল কাদির খান ভেবেছিল।

তাশকন্দে আবদুল কাদিরের পায়ে গুলি লেগেছিল রফীক আহ্মদ এই কথাটা আমায় পরিষ্কার ক'রে বলতে পারেননি বলে এই সম্বন্ধে "প্রবাসে ভারতের

কমিউনিস্ট পার্টি গঠন" (The Communist Party of India and Its Formation Abroad) নামক পুস্তকে আমার লেখাও পরিষ্কার হয়নি। এখন আবদুর কাদিরের বিবৃতি ও লণ্ডন 'টাইম্স্' পত্রিকার প্রবন্ধ পড়ে যা বুঝেছি তা হচ্ছে এই।

কাদিরেরা কয়েকজন ইণ্ডিয়া হাউস হতে রেলওয়ে স্টেশনে যান। সেখানে তাঁরা প্রথমে প্রচার-অভিযানে যে ট্রেনটি এসেছিল সেটা পর্যবেক্ষণ করেন। ট্রেনটি চলে যাওয়ার পরে তাঁরা দেখতে পান যে নিকটবর্তী একটা গুদামে আগুন লেগে গেছে। তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে থাকেন। হঠাৎ সমস্ত জায়গা সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যায়। আবদুল কাদিরের পকেটে কিছু সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা ছিল। তখন কথাটা সে তার অনুবাদককে (Interpreter) জানাল। অনুবাদক বললেন স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণরূপে বে-আইনী কাজ। গেট দিয়ে বের হলে তলাশি হওয়ার ও ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে ব'লে আবদুল কাদির দেওয়াল টপকে চলে যেতে চেয়েছিল। সেই সময়ে কর্তব্যরত সান্ত্রী তার পায়ে গুলি করেন। এইরূপ গুলি করার জন্যে আবদুল কাদির সোবিয়েৎ গবর্নমেণ্টকে নিষ্ঠুর (ruthless) গবর্নমেণ্ট বলেছেন। আমি যানিনে কোন্ দেশের গবর্নমেণ্ট এই রকম অবস্থায় গুলি না ক'রে পারতেন।

মস্কোতে আবদুল কাদির ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা তেমন কিছু করেনি,—হস্পিটালে থেকেছে, মস্কো হতে দশ মাইল দূরে এক স্যানাটোরিয়ামেও ছিল। কোনো কোনো মুহাজির বলেছেন যে আবদুল কাদির পাগলা গারদেও ছিল। খুব সম্ভবত আবদুল কাদির অসুখের ভান করেছিল বেশী। এই ভাবে আলাদা থেকে সোবিয়েৎ দেশ সম্বন্ধে সে তার ব্রিটিশ প্রভুদের জন্যে রিপোর্ট সংগ্রহ করে থাকবে। মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় সরকার পক্ষ তেমন কোনো প্রমাণ আবদুল কাদিরের বিরুদ্ধে উপস্থিত করেনি। আবদুল কাদির নিজেই লিখেছে যে আদালতে সরকারী উকীল (পাব্লিক প্রসেকিউটর) তার সাজা দাবী করেননি। তাই সে বে-কসুর খালাস পেয়েছিল।

খালাস হওয়ার পরে আবদুল কাদির যে পুলিসের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সংস্রব রেখেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে গওহর রহমান খান দিল্লীতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটি সভায় আমাদের নিকটে আবদুল কাদির সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন স্বাধীন উপজাতি ইলাকায় যাওয়ার একটা পথের মাথায় আবদুল কাদিরকে একবার ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। সে ওখানে কেন, এই কথা তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে খোলাখুলিভাবে গওহর খানকে জানালেন যে ওই পথে একজনের যাওয়ার কথা আছে। আবদুল কাদির যে পুলিসের কাজ করে, একথা গওহর রহমানের জানা ছিল। তাই তাঁকে কথাটা জানাতে আবদুল কাদিরেব কোথাও বাধেনি।

আশ্ফাকুল্লাহ্ খান কাকোরি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পলাতক আসামী ছিলেন। তিনি ছিলেন উত্তর প্রদেশের শাহ্জাহানপুর শহরের বাশিন্দা। মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার হাবীব আহ্মদও ছিলেন ওই শহরের লোক। এই হাবীব আহ্মদের মারফতেই স্থির হয় যে আশ্ফাকুল্লাহ্‌কে প্রথমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের স্বাধীন উপজাতির ইলাকায়, সেখান থেকে কাবুলে এবং কাবুল হতে মস্কোতে পাঠানো হবে। প্রাচ্য শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন আশ্ফাকুল্লাহ্ খান। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার যুগ্ম সম্পাদক ছিল জানকীপ্রসাদ, সে নিজের নাম লিখত জানকীপ্রসাদ বাগেরহাট্টা। অন্য

সেক্রেটারি ছিল সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘাটে। জানকীপ্রসাদকে পুলিস কিনে নিতে সমর্থ হয়েছিল। সম্ভবত তারই মারফতে আশ্ফাকুল্লাহ্ খানের দেশের বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টার খবরটি পুলিসের কানে চলে যায়। তারই জন্যে পথে পাহারায় বসেছিল আবদুল কাদির খান। তার পুলিসের কাজের জন্যে সে ব্রিটিশের দ্বারা পুরস্কৃতও হয়েছিল। ১৯৩০ সালে দেখা গেছে যে আবদুল কাদির খান লণ্ডন স্কুল অফ্ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে পুষ্তু ভাষার লেকচারার। সেই সময়েই সে লণ্ডনের 'টাইম্স্' পত্রিকায় "সোবিয়েতের ছাত্র" (A Pupil of the Soviet) নাম দিয়ে পরে পরে তিনটি প্রবন্ধ লেখে। আবদুল কাদির খানের এই লেখাটি ১৯৩০ সালের ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'টাইম্স্' (লণ্ডন) পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। ২৫শে ও ২৬শে তারিখে 'টাইম্স্'-এর ১৫ পৃষ্ঠায় ও তৃতীয় দিন ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে।

একটি কথা এখানে বলা দরকার। মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় আসামীরা আদালতের কাঠগড়াকে তাঁদের মতবাদ প্রচারের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করতে পারেননি। রাজনীতিক মতবাদ প্রচারের জন্যে পেশোয়ার কোর্টের মঞ্চকে ব্যবহারের কথা শুধু স্বপ্নলোকের বাশিন্দারা তুলতে পারেন, বাস্তবে তা একেবারেই সম্ভব ছিল না। আসামীরা সাধারণভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন। তাঁরা বলেছেন একটা কিছু না করলে সোবিয়েৎ দেশে তাঁদের শুধু শুধু খেতে দেবে কেন? তাই তাঁরা মিলিটারি স্কুলে ভর্তি হয়েছেন এবং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছেন এই একই কারণে। গবর্নর জেনারেলের একজেকিউটিব কাউন্সিলের হোম মেম্বর সার মালকম হেইলী পর্যন্ত আসামীদের সাজা হওয়া সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। তিনি বলেছেন মস্কো ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে বলে কোনো লোকের বিরুদ্ধে কি করে মোকদ্দমা চলতে পারে! কিন্তু মোকদ্দমা চলেছিল এবং আসামীদের সাজাও হয়েছিল। পুলিসের নিকটে বিবৃতিতে আসামীরা খারাপ কিছু বলেনি। আসল কথা, জেল হতে বার হওয়ার পরে তাদের বেশীর ভাগই পার্টির কাজ করেছেন।

ভারতবর্ষে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তাতে দেখেছি যে বিপ্লবীরা দীর্ঘকাল জেলে কিংবা অন্যভাবে বন্দী হয়ে থেকে মুক্ত হওয়ার পরে তাঁদের মধ্য হতে অনেকেই রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করেন। মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় দণ্ডিত সাতজন আসামীর ভিতরে মীর আবদুল মজীদ, ফিরোজুদ্দিন মন্সুর, গওহর রহমান খান দেশের ভিতরেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে কাজ করেছেন। শুরুর দিকে হাবীব আহ্মদও কিছুকাল দিল্লীতে পার্টির কাজ করেছিলেন এবং ভোপালের রফীক আহ্মদও তখন তাঁর সঙ্গে দিল্লীতে কিছুকাল ছিলেন। হিজরাৎ করার সময়েই মুহম্মদ আকবর শাহ্ বোধ হয় ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে পড়তেন। ১৯২৫ সালের কোনও মাসে তিনি জেল হতে ছাড়া পেয়ে আসার পরে পেশোয়ারে কলেজে ভর্তি হয়ে যথাক্রমে ইন্টারমিডিয়েট ও বি. এ. পরীক্ষা পাস করেন। তাঁর বাবা তাঁকে আইন পড়িয়ে উকীল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পেশোয়ারে তখন আইন পড়ানো হতো না। আকবর শাহের পিতা পুত্রকে লাহোর পাঠাতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কারণ, মীর আবদুল মজীদ রয়েছে সেখানে। শেষ পর্যন্ত আকবর শাহ্ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে আইনের পরীক্ষা পাস করেছিলেন। নৌশহরাতে তিনি ওকালতি করতেন। পার্টির কোনও কাজই তিনি করতেন না, হয় তো তাঁর মনে পার্টির প্রতি কিছু সহানুভূতি ছিল। হঠাৎ ১৯৩৯ সালে আমরা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম যে মুহম্মদ আকবর শাহ্

সুভাষচন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়েছেন। এত কাল পরে তিনি সক্রিয় (?) রাজনীতিতে এলেন, সে রাজনীতি আবার সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনীতি! কোনও কমিউনিস্টের পক্ষে ভাবা মুশকিল। শুনেছি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে বসুর দেশের বাইরে চলে যাওয়ার ব্যাপারেও মুহম্মদ আকবর শাহ্ সহায়ক ছিলেন। বসু কিন্তু জার্মান একনায়ক হিটলারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে দেশত্যাগ করেছিলেন।

সুলতান মাহ্মুদ জেল হতে বা'র হয়ে এসে কোনো রাজনীতিতে যোগ দেননি।

মীর আবদুল মজীদ মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমারও (১৯২৯-৩৩) আসামী ছিলেন।

মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আবদুল কাদির খান সহ সাতজন আসামী পামীর অতিক্রম করে চিত্রল রাজ্যে এসেছিলেন। চারজন এসেছিলেন নুগ্সানী পাস হয়ে, আর তিনজনে এসেছিলেন বরোগিল পাসের ভিতর দিয়ে। মুহম্মদ আকবর শাহ্ ও গওহর রহমান খান ইরানী পাসপোর্ট নিয়ে সমুদ্রপথে এসেছিলেন। এই নয়জনের, একজন ফিদা আলী রাজসাক্ষী হয়েছিল।

কিছু কিছু কাগজপত্র নিজে প'ড়ে, আবার কিছু কিছু কথা যাঁরা পড়েছেন তাঁদের মুখে শুনে আমি বুঝেছি যে 'আফ্জল' নামক ব্যক্তিটি কে তা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারেননি। চিঠিপত্রে নামটি উল্লেখ হতে দেখে তাঁরা যাঁকে-তাঁকে আফ্জল বলে সন্দেহ করেছেন। নাম ও কোড আবিষ্কারের ব্যাপারে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অদ্ভুত ধৈর্য ও ক্ষমতার পরিচয় বরাবর পাওয়া গিয়েছে। আমি ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই যে আফ্জলের ব্যাপারে তাঁরা কেন অকৃতকার্য হলেন! আজ এতকাল পরে বলতে কোনো আপত্তি উঠতে পারে না। সেই সব পুরানো দিনের অফিসাররাও আর বেঁচে নেই। আফ্জল ছিলেন গওহর রহমান খান। খবর পেয়েছি যে গওহর রহমান খানও বেঁচে নেই। ১৯৫৪ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

ব্রিটিশ আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তিব্বতের মতো নিষিদ্ধ দেশ না হলেও প্রায় নিষিদ্ধ দেশই ছিল। সে প্রদেশ হতে ভিতরের খবর বাইরে যাওয়া এক রকম অসাধ্য ব্যাপার ছিল বললেও চলে। জেল হতে পত্র বাইরে পাঠানোর অপরাধে পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে মুহম্মদ আকবর খানের সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। এ খবর যদি দেশে-বিদেশে প্রকাশিত হতো এবং সংবাদপত্রে তা সমালোচিত হতো এমন সাজা কখনও হতে পারত না। ব্যাপারটি এই রকম ছিল যে মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ধৃত বন্দীদের বিচার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বাইরে হলে তাঁদের সাজাই হতো না। এই জন্যেই ভারত গবর্নমেন্টের কঠোর ব্যবস্থা ছিল যে পেশোয়ারের মোকদ্দমাগুলির খবর যেন বাইরের সংবাদপত্রগুলিতে ছাপা না হয়, আর হলেও যেন খুব সামান্য পরিমাণে হয়। ১৯২৩ সালের ১৮ই মে তারিখে পেশোয়ারের দায়রা জজ মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার রায় দিয়েছিলেন। সেদিনই তো খবরটি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। ডক্টর রাশব্রুক উইলিয়াম্স্ (Rushbrook Williams) তখন ভারত গবর্নমেন্টের প্রচার বিভাগে ছিলেন। তিনি পরম কৌশলে মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা সম্বন্ধে ১২৯ শব্দের একটি বিবৃতির মুসাবিদা করেন। এই বিবৃতিটি সংবাদ হিসাবে ৬ই জুন তারিখে (মোকদ্দমার রায় দেওয়ার ১৯ দিন পরে) এলাহাবাদের ইংরেজ মালিকের ইংরেজি দৈনিক 'পাইওনীয়ারে'র

রাবলপিণ্ডিস্থিত সংবাদদাতাকে দেওয়া হয়। তিনি বোধ হয় ডাকে খবরটি পাঠিয়েছিলেন। 'পাইওনীয়ারে' তা ছাপা হয়েছিল ৯ই জুন (১৯২৩) তারিখে। এই বিবৃতি এসোসিয়েটেড প্রেসকেও নাকি দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা কি ভাবে তা প্রচার করেছিলেন তা জানিনে। মনে হয় না যে তা কোথাও ছাপা হয়েছিল।

কাগজে না ছাপালেও রটনা হয়েছিল যে বলশেভিক চর'দের নানান জায়গায় গিরেফ্‌তার করে পেশোয়ারে পাঠানো হয়েছে। সেখানে গোপন কক্ষে তাঁদের বিচার চলেছে। কোনো দিক হতে কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। ব্রিটিশের পরম সমর্থক ব্রিটিশ মালিকদের বড় বড় কাগজগুলিও নিজেদের বড় অসহায় বোধ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটল কলকাতার 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার। তখন যিনি সম্পাদক ছিলেন তাঁর নাম বোধ হয় ছিল মিস্টার নিউম্যান।

৫ই আগস্ট (১৯২৩) তারিখের 'স্টেটস্‌ম্যান' লিখল ঃ

* * * *

"Some weeks have elapsed since the last of a series of arrests of Bolshevik agents in different parts of India was effected. These arrests were carried out, we believe at the instance of the Government of Frontier Province, which had become possessed of a list of names. At any rate, none of the prisoners was placed before the local magistracy, all being set up for trial to Peshawar. But no word has yet come of any trial. Presumably the cases are being heard in camera, and there may be good reasons why the names of witnesses should not be divulged. But the Government will be making a grave mistake if it suppresses the evidence and the result of the trial. The only effect of such a policy will be to lend colour to the suspicion that Government is shielding not only the witnesses but others who ought to be in the same dock with the prisoners."

এর সার কথা ঃ "কয় সপ্তাহ হয়ে গেল ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে 'বলশেভিক চরদের গিরেফ্‌তার করা হয়েছে। আমাদের মনে হয় এ সব গিরেফ্‌তার সীমান্ত প্রদেশের গবর্নমেণ্টের কথামতো করা হয়েছে। এ গবর্নমেণ্টের নিকটে নামের একটি তালিকা আছে। যাই হোক না কেন, ধৃত ব্যক্তিদের কাউকে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেও হাজির করানো হয়নি, সকলকেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পেশোয়ারে বিচারের জন্যে। সম্ভবত, মোকদ্দমাগুলির বিচার গোপন কক্ষে হচ্ছে। কারণ থাকতে পারে যে সাক্ষীদের নাম প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু যদি প্রমাণ আর বিচারের ফলাফল চেপে রাখা হয় তবে গবর্নমেণ্ট দারুণ ভুল করে বসবেন। এই নীতির ফলে সন্দেহ কেবল বাড়তেই থাকবে যে গবর্নমেণ্ট শুধু সাক্ষীদের বাঁচাচ্ছেন না, বাঁচাচ্ছেন তাঁদেরও যাঁদের স্থান হওয়া উচিত ছিল বন্দীদের সঙ্গে কাঠগড়ায়।"

এ ব্যাপারে ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে রটনাও চলেছিল। কথা উঠেছিল উস্‌মানী আর আমাকেও পেশোয়ারের মস্কো মোকদ্দমায় জড়ানো হবে। সীমান্ত প্রদেশের ওয়ারেণ্টের বলে ধৃত হয়ে উস্‌মানী পেশোয়ারে নীতও হয়েছিল। আমাকে কিন্তু ও প্রদেশের গবর্নমেণ্ট নিতে রাজী হলেন না।

সেন্‌ট্রাল ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর সি. কে. (C. Kaye) 'স্টেট্‌স্‌-ম্যানে'র শেষ বাক্যটির উচ্চারণে বড়ই ব্যথিত হয়েছিলেন; তিনি হোম ডিপার্টমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, এ যদি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র কথা হতো তবে তিনি কিছুই মনে করতেন না। কিন্তু 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' বলল এমন কথা! মনে হয় সেন্‌ট্রাল ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টরদের মতো লোকদের কথা মনে করেই 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' তাঁদের বন্দীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর কথা বলেছিল।

এইবারে কিন্তু গবর্নর জেনেরেলের একজেকিউটিব কাউন্সিলের সভ্য সার ডাব্লিউ মালকম হেইলীর টনক নড়ল। তিনি 'স্টেট্‌স্‌ম্যানে'র (সম্পাদক?) মিস্টার নিউম্যানকে একখানি "ব্যক্তিগত" ও "গোপনীয়" (Private and Confidential) পত্র লিখলেন। তাতে খুব যে সঠিক তথ্যের সমাবেশ করলেন তা নয়। পত্রে বললেন, পেশোয়ারের 'বলশেভিক এজেণ্ট'দের সকলের সাজা হয়ে গেছে। একজন শুধু বে-কসুর খালাস পেয়েছেন। তাঁরা ছাত্র জাতীয় লোক। তাঁদের সাজার খবর খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। এম. এন. রায়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন ব'লে লাহোরে, যুক্ত প্রদেশে (এখনকার উত্তর প্রদেশ) এবং বাঙলায় সব নিয়ে তিনজনকে গিরেফ্‌তার করা হয়েছে। তাঁরা ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে নজরবন্দী হয়ে আছেন। ষড়যন্ত্রের অপরাধে তাঁদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলতে পারে কিনা গবর্নমেণ্ট তা বিবেচনা করে দেখছেন। চিঠি-পত্রের মারফতে ষড়যন্ত্র হলে এই সকল চিঠি-পত্রের লেখককে তা আদালতে প্রমাণ করা বড় মুশকিল। এই তিনজন লোককে বিচারের জন্যে পেশোয়ারে পাঠানো হয়নি। মালকম হেইলীর কথা সত্য নয়। শওকৎ উস্‌মানীকে পুলিস প্রহরায় পেশোয়ার জেলে পাঠানো হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তার বিচার সেখানে হয়নি। সার মালকম হেইলী তাঁর পত্রে তিনজন নজরবন্দীর নামোল্লেখ করেননি। লাহোরে গিরেফ্‌তার হয়েছিলেন গুলাম হুসায়ন, যুক্ত প্রদেশের কানপুরে শওকৎ উস্‌মানী এবং বাঙলার কলকাতায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ (অর্থাৎ লেখক নিজে)। পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা বা মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কথা আপাতত আমি এখানেই শেষ করলাম।

জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়

১৯২২ সালের কথা শেষ করার আগে আমাকে আরও দুই জনের সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে। তার প্রথম নাম জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, আর দ্বিতীয় নামটি হলো অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়। অবনী মুখার্জি নামেই এই ব্যক্তিটি সমধিক পরিচিত। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে যে আমার সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল, সে কথা আগেই বলেছি। ১৯২২ সালের কোন্‌ মাসে তা মনে করতে পারছি না, একদিন ভূপেন্দ্রকুমার এসে আমায় জানালেন যে চারুচন্দ্র ঘোষকে (যক্ষ্মা রোগী) সঙ্গে নিয়ে কিছুকাল তিনি হরিদ্বারে গিয়ে থাকবেন। সেই সময়ে তাঁর বন্ধু মুন্‌শীগঞ্জের জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় আমার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবেন। তাঁকে কলকাতা আসার জন্যে পত্র লেখা হয়েছে। পরে শোনা গেল যে হরিদ্বারে বড় ম্যালেরিয়া হয়। তাই তাঁরা আর হরিদ্বারে গেলেন না। অনেক পরে তাঁরা ডেহরী-অন-শোন গিয়েছিলেন। জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় কিন্তু একদিন কলকাতা এলেন এবং আমার সঙ্গে দেখা করলেন। প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছিলেম। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের রোগীর সেবা তো ছিলই, তা-ছাড়া

তিনি এদিকে-ওদিকে যাওয়া-আসা করতেন। এখন বুঝতে পারছি, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন তিনি তখনও ছেড়ে দেননি। জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার দেখা হতো বেশী, কাজে কাজেই কথাও হতো বেশী। আর, আমার মনে হতো তিনি ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের চেয়েও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দিকে ঝুঁকে-ছিলেন বেশী। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির পুরানো সভ্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়) তখন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের একজন নেতা হয়েছিলেন ব'লে যে জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেই সময়ে আমার তা মনে হয়নি। মতবাদটা খুব গভীরভাবে তিনি গ্রহণ না করতে পারেন, কিন্তু গ্রহণ তিনি করেছিলেন। শুনেছি পরে তাঁকে এর জন্যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টিতে কিছু মূল্য দিতে হয়েছিল।

ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'তে লিখেছেন, আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল বটে, তবে তার কলকাঠি আমার হাতে ছিল। এই কথাটা অর্ধ সত্য। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তই আমায় বলেছিলেন, বিদেশে চিঠি-পত্র আমিই পাঠাব। তাঁরা যদি কোনো চিঠি পাঠাতে চান তাও আমায় তাঁরা দিবেন, আমি তা পাঠিয়ে দেব। আবার তাঁদের ব্যক্তিগত নামের চিঠিপত্রও আমার দেওয়া ঠিকানাতেই আসবে, আমি সে-সব চিঠি তাঁদের পৌঁছিয়ে দেব। আমার মনে হয়েছিল, হয়তো আমি ভুল বুঝেছিলেম, তারা তখন বিপদের ঝুঁকি নিতে চাননি। অল্পদিন এভাবে কাজ চলেছিল। পরে তাঁরাও সোজাসুজি পত্রাদি লিখেছেন এবং পত্রাদি পেয়েছেনও। সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল সেসিল কে (Cecil Kaye) লিখেছেন, "মুজফ্ফর আহ্মদ গিরেফ্তার হয়ে যাওয়ার পরে রায় তাঁর কাজে জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করেছিলেন"।

এম· এন· রায় সেই সময়ে যে জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়কে পত্রাদি লিখেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর একখানি বা দুখানি চিঠির (ঠিক মনে নেই ক'খানা) ফটোস্টাট কপি কানপুর 'বলশেভিক' ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে দাখিল করা হয়েছিল। হয়তো জীবনলালের হাতে আসল চিঠি পৌঁছেছিল। তা না হলে আদালতে গবর্নমেণ্ট ফটোস্টাট কপি দাখিল করতেন না। এই চিঠিতে আমার গিরেফ্তার হওয়ার জন্যে এম· এন· রায় (তাঁকে ধন্যবাদ!) কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন।

১৯২২ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে নজরুল ইস্লামের সপ্তাহের দুবার প্রকাশিত 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমে ৩২, কলেজ স্ট্রীটের দোতলায় 'ধূমকেতু'র আফিস ছিল। পরে সেই আফিস ৭, প্রতাপ চাটুজ্যে লেনের দোতলায় উঠে যায়। আমার ধারণা, থেমে থাকা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন 'ধূমকেতু'র লেখার ভিতর দিয়ে আবার মাথা তুলেছিল। ৭, প্রতাপ চাটুজ্যে লেনস্থিত 'ধূমকেতু' আফিসে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতারা যাতায়াত করেছেন। আমি দেখেছি বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় এসেও নজরুল ইস্লামকে আলিঙ্গন করে গেছেন। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় তো হামিশা আসতেনই। ভূপেন্দ্রকুমারের রোগী চারুচন্দ্র ঘোষ তখন শ্যামবাজারের একটি বাড়ীতে ছিলেন। নজরুল ইস্লাম আর আমি তাঁকে সেখানে দেখতেও গিয়েছি।

'ভ্যানগার্ড' ইত্যাদি কাগজ পাঠাবার জন্যে আমি বহু ঠিকানা জার্মানীতে পাঠিয়েছিলেম। যাঁদের ঠিকানা পাঠিয়েছিলেম তাঁদের সম্মতি আমি আগে গ্রহণ করিনি। শুধু দেখেছি তাঁরা যে কোন ধরনের রাজনীতির লোক কিনা। এইভাবে

আমি অনুশীলন সমিতির নেতা প্রতুল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঢাকার সূত্রাপুরস্থিত বাড়ীর ঠিকানাও দিয়েছিলেম। সেই সময়ে তার সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল না। পত্রিকা কিন্তু তাঁর বাড়ীর ঠিকানায় নিয়মিত আসছিল। অনুশীলন সমিতির তরুণেরা তখন জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়দের (যুগান্তরের) তরুণদের ঠেস দিয়ে বলতে লাগলেন—"আমাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট ইনটার-ন্যাশনালের সংযোগ রয়েছে। তাই এই পত্রিকাগুলি আমাদের নিকটে আসছে। কই, তোমাদের নিকটে তো আসছে না"। জীবনলাল আমায় একথা জানালেন। তাঁদের ঠিকানা কেউ আমায় আগে দেননি ব'লে আমি তা জার্মানীতে পাঠাতে পারিনি। তবে তখনই জীবনলালের নিকট হতে তাঁদের ঠিকানা নিয়ে আমি জার্মানীতে পাঠিয়ে দিলাম। তাছাড়া, তখন পর্যন্ত যত কাগজ বা'র হয়েছিল সে সবের পুরনো কপি সংগ্রহ করেও মুন্‌শীগঞ্জ ও ঢাকায় পাঠানোর জন্যে তাঁর হাতে আমি দিলাম।

১৯২৩ সালের ১৭ই মে তারিখে আমি কলকাতায় গিরেফ্‌তার হয়ে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন (The Regulation III of 1818) অনুসারে জেলে বন্দী হয়ে থাকি। আমার গিরেফ্‌তার সংক্রান্ত দীর্ঘ কাহিনী আমি কানপুর 'বলশেভিক' ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সংস্রবে বলব। এখানে শুধু এতটুকুই বলব যে আমার এই গিরেফ্‌তার হতেই ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক বিচ্ছেদেরও সূত্রপাত হলো।

আমি কয়েকমাস (প্রায় চার মাস) বাঙলা দেশে একাই ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনের বন্দী ছিলেম এবং প্রথমে ছিলেম কলকাতার আলীপুর সেন্‌ট্রাল জেলে। এর পরে ১৯২৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও আরও ক'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি 'রেগুলেশন থ্রি'র বন্দী হয়ে আলীপুর সেন্‌ট্রাল জেলেই এলেন। তবে, আমার সঙ্গে এক ওয়ার্ডে নয়। আমি একটি ওয়ার্ডে একা ছিলেম। জেলের ওয়ার্ডার ও কয়েদীরা তাকে খারাব ভাষায় "রেণ্ডি ফাটক" বলতেন। আসলে এটা এক সময়ে মেয়ে কয়েদীদের ফাটক ছিল। কিছুকাল আগে হতে আলীপুর সেন্‌ট্রাল জেলে মেয়ে কয়েদীর রাখা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে জেলে ঢুকে 'রেণ্ডি ফাটকে' আমায় রাখা হবে শুনে মনটা খারাব হয়েছিল। তারপর যখন শুনলাম চিত্তরঞ্জন দাশ ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদও ওই ওয়ার্ডেই ছিলেন তখন আমি মনে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করলাম।

ভূপেন্দ্রকুমার দত্তরা আট-দশজন যে এলেন তাদের ভিতরে জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন না। তিনি কংগ্রেসের মিটিং-এ দিল্লী গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বোম্বে হয়ে কলকাতা ফিরতে তাঁর দেরী হয়েছিল। অবশ্য কলকাতায় ফিরে এসে তিনিও ধরা পড়েছিলেন। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের কয় মাসের বাইরের কাজ-কর্ম হতে মনে হয়েছিল যে তিনি মতের পরিবর্তন করেছিলেন। অর্থাৎ, মনে হয় ঠিক করেছিলেন যে কমিউনিস্ট আন্দোলনে আর তিনি এগুবেন না। তবুও বুঝলাম না কেন যে তিনি আলীপুর সেন্‌ট্রাল জেলে এসে ওয়ার্ডারের মারফতে আমায় বলে পাঠালেন, আমি যেন চেষ্টা ক'রে তাঁদের সঙ্গে থাকতে যাই। সেই চেষ্টা আর আমায় করতে হয়নি। তাঁরা মেদিনীপুর সেন্‌ট্রাল জেলে আর আমি ঢাকা সেন্‌ট্রাল জেলে বদলী হয়ে গেলাম।

১৯২৩ সালের মে মাসে আমি গিরেফ্‌তার হয়েছি। তখন পর্যন্ত আমি জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়দের অকপটে বিশ্বাস করেছি। আমার মনে তাঁদের সম্বন্ধে এতটুকুও দ্বিধাবোধ ছিল না। আমি ভাবতাম তাঁরাও আমায় সেইভাবেই বিশ্বাস

করেছেন। কিন্তু এতকাল পরে ভারত গবর্নমেণ্টের মহাফিজখানার (National Archives of India) কল্যাণে জানতে পারছি যে তাঁরা একটি বিষয়ে অন্তত আমার নিকটে অকপট হননি। বিষয়টি আমার নিকটে তাঁরা গোপন করেছেন। এটা যদি আমি একেবারেই জানতে না পেতাম তা হলে বরঞ্চ ভালো হতো। জানার ফলে চার-পাঁচ বছর কম অর্ধ শতাব্দী পরেও মনটা কি রকম খচখচ করছে।

সেই যে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভূপেন্দ্রকুমার দত্তরা গিরেফ্তার হয়েছিলেন তার পরে তাঁরা বা'র হয়ে এসেছিলেন ১৯২৮ সালের শুরুর দিকে। ভূপেন্দ্রকুমার সম্পূর্ণরূপে তাঁদের পুরানো পথে ফিরে গেলেন। কোনোদিন আমার সঙ্গে আর দেখাও করলেন না। জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ও আমাদের সঙ্গে এলেন না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তখন কমিউনিস্ট বর্জনের যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন সেটাও তিনি এড়িয়ে চলেননি। কিন্তু মনে হয়েছিল তাঁর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী মনে মার্কসবাদের ছোঁয়া লেগে কিঞ্চিৎ যেন ভাঙন ধরেছিল। দেখা হলে জীবনলাল আমার সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশতেন। চা খাওয়ানোর জন্যে রেস্তোরাঁয় টেনে নিয়ে যেতেন। যতটা মনে পড়ে ১৯৩১ সালে তিনি বক্সা দুর্গে বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন, আর আমি ছিলেম মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার (১৯২৯-৩৩) আসামী। সেই সময়ে তিনি বক্সা দুর্গ হতে আমায় পত্র লিখে জানিয়েছিলেন যে "মোকদ্দমায় দেওয়া আপনাদের বিবৃতিগুলি এখানকার বন্দীদের মনে দাগ কাটছে"।

যদি অমার্জিত ভাষায় বলি তবে বলতে হবে যে জীবন চাটুজ্যে একজন ভালো 'ছেলেধরা'। অর্থাৎ তিনি তরুণদের তাঁর দলে খুব টানতে পারেন। এ বিষয়ে চমৎকার গুণ আছে তাঁর, অন্তত, এক সময়ে ছিল। তাঁর এই তরুণ দল হতে ১৯৩৯-৪০ সালে বহু যুবক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে চলে আসেন। জীবনলাল আমায় তার জন্যে তাঁর একখানা কাগজে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। কমরেডরা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমি তা পড়িনি। কারণ, তাঁর দলের যুবকদের কমিউনিস্ট পার্টিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদই এনেছিল, আমি আনিনি। আমি পুরানো বন্ধুদের স্মৃতি মনে রাখতে চেয়েছিলেম।

পার্টি গড়ার পুরানো দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে আমি কখনও কাউকে বলিনি যে সেই শুরুর দিনগুলিতে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত আর জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিও আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন। কারণ, তাঁরা এসে আবার ফিরে গিয়েছিলেন। আমি কিছু বললে তাঁরা তা অস্বীকার করতে পারতেন। ১৯২০-এর দশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নিকট হতে আমরা কম বাধা পাইনি। এখন ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তাঁর স্মৃতিকথা "বিপ্লবের পদচিহ্ন"তে সে-সব কথা কিছু কিছু লিখেছেন। জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ও সে-সব কথা অন্যদের কিছু কিছু বলেন শুনেছি। বিশেষ করে আমার চতুঃসপ্ততিতম জন্মদিনে তিনি নিম্নলিখিত পত্রখানাও লিখেছিলেন :

JIBANLAL CHATTERJEE

সাথী মুজফ্ফর আহ্মদের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হবে। এক কালের খুব নিকট বন্ধু ছিলেন তিনি। বর্তমানে মতাদর্শ ও কর্মপন্থায় আমরা

ভিন্নমত পোষণ করলেও অতীতের বন্ধুত্বের স্মৃতি আজও অম্লান রয়েছে। এই স্মৃতি আজ আরও বড় হয়ে উঠেছে এই জন্যে যে এই বন্ধুটি আজ বিনাবিচারে আটক হয়ে আছেন। যে কংগ্রেস বিনাবিচারে আটক রাখার আইনকে জঙ্গলী আইন বলে বলতো সে কংগ্রেসী আমলে অতীতের একজন মুক্তিযোদ্ধা বৃদ্ধ বয়সে আটক হয়ে আছেন।

আশা করবো, সাথী মুজফ্ফর আহ্মদের ৭৪তম জন্ম-বার্ষিকী পালনের উপলক্ষে আমাদের দেশবাসী বিনাবিচারে আটক রাখার নীতির প্রতিবাদ করে তাঁর মুক্তির দাবী করবেন।

জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়

অবনী মুখার্জির কথা এবং আরও কথা

১৯২৩-২৪ সাল হতে বাঙলা দেশে "বিপ্লবী অবনী মুখার্জি" নামটি প্রচলিত হয়েছে। আর, বর্তমান সময়ে যাঁরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পুরানো দিনের কথা নিয়ে চর্চা করেন কিংবা চর্চা করার কিছু কিছু চেষ্টা করেন তাঁদের লেখায় মাঝে মাঝে "বিপ্লবী নলিনী গুপ্তে"র নামও পাওয়া যায়। নলিনী গুপ্তের কথা আমি কিছু কিছু বলেছি, কানপুর মোকদ্দমার সংস্রবে তাঁর বিষয়ে আরও অনেক কথা বলব। অবনী মুখার্জি ও নলিনী গুপ্তের নাম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে বিপ্লবী হিসাবে তাঁদের দু'জনই ভুঁইফোঁড়। আগে তাঁরা যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টিতে ছিলেন এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে না। নলিনী গুপ্তের তবুও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির বহু সভ্যের সঙ্গে পরিচয় ছিল, এমন কি ১৯১৪ সালে রাজাবাজার বোমার মামলার আসামী অমৃতলাল হাজরার বিরুদ্ধে পুলিসের নিকটে তিনি একটি বিবৃতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু অবনী মুখার্জির জমার খাতায় এমন কোনো কিছুও লেখা নেই। তাঁর ওই স্থানে শূন্য আছে বলা চলে।

অবনী মুখার্জি অল্প বয়সেই বখে গিয়েছিল। হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে সে তখনকার দিনের ফোর্থ ক্লাসের বেশী পড়তে পারেননি। এই কথা অবনী মুখার্জি নিজেই তাঁর সিঙ্গাপুরে স্বীকারোক্তিতে স্বীকার করেছেন। কোনো একটি শিক্ষিত পরিবারে এই শতাব্দীর প্রথম দশকেও এই রকমটা ঘটতে খুব কমই দেখা গেছে।

আমি অবনী মুখার্জি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তাতে এই জেনেছি যে ১৮৯২ সালের ১২ই জুন তারিখে জবলপুরে তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর পিতা রায় সাহেব ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় জবলপুরে একজেকিউটিব ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। ১৯০২ সালে তিনি চাকরী হতে অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় আসেন এবং পরের বছর ২৭ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ী কেনেন।

অবনী মুখার্জির সিঙ্গাপুরের জবানবন্দী হতে জানা যায় যে **তিনি আহ্‌মদাবাদের কাপড়ের কলে তাঁতের কাজ শিখেছিলেন।** তাঁর ছোট ভাই তপতীনাথ মুখোপাধ্যায় আমার এক বন্ধুকে বলেছেন যে অবনী মুখার্জির আহ্‌মদাবাদ যাওয়ার ব্যাপারে সখারাম গণেশ দেউস্কর তাকে সাহায্য করেছিলেন। দেউস্কর নাকি অবনীদের বাড়ীর ভাড়াটে ছিলেন। তিনি বাঙলার বাশিন্দা মারাঠী। খুব জোরালো বাঙলা লিখতে পারতেন। এই শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের শক্তিশালী বাঙলা সাপ্তাহিক "হিতবাদী"র সম্পাদনাও তিনি করেছেন। তপতী মুখার্জি আমার বন্ধুকে আরও বলেছেন যে 'ছাত্র জীবনেই অবনী মুখার্জি অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯০৫ সালে জিতেন চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে সার এন্‌ড্রু ফ্রেজারকে (বাঙলার লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্নর) গুলি ক'রে মারার জন্যে নিয়োজিত দলে তিনি ছিলেন।' ১৯০৫ সালে অবনীর বয়স মাত্র তেরো বছর ছিল। তাঁর সিঙ্গাপুরের স্বীকারোক্তিতে আছে যে ১৯০৪ কিংবা ১৯০৫ সালে

অবনী স্কুল ছেড়েছিল। তাছাড়া, কলকাতা কলেজ স্ট্রীটের ওভারটুন হলে সার এন্ড্রুফ্রেজারকে গুলি করার চেষ্টা হয়েছিল ১৯০৮ সালের নবেম্বর মাসে, ১৯০৫ সালে নয়। চেষ্টাকারী জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী তখনই ধরা পড়েন, বিচারে তাঁর দশ বছরের সাজা হয়েছিল। মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি মারা গিয়েছেন। একটি কথা মনে রাখা ভালো যে জিতেন চৌধুরীদের অনুশীলন সমিতি কিন্তু ঢাকার অনুশীলন সমিতি নয়। তাঁদের অনুশীলন সমিতি পরে 'যুগান্তর দল' নামে পরিচিত হয়েছে।

আহ্‌মদাবাদে কাজ শিখে অবনী মুখার্জি নানান সুতাকলে ও চটকলে তাঁতীর কাজ করেছেন। ১৯১০ সালের জুলাই মাসে কাজে আরও দক্ষতা লাভের জন্যে অবনী মুখার্জি জাপানে যান। ১৯১১ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে তিনি জার্মানীতে যান। ওই দেশে তিনি তেরো মাস ছিলেন। বার্লিনে লাইপ্‌জিগে ও প্রুশিয়ার নিদের্‌গেব্‌রাতে কারখানায় এপ্রেন্‌টিস হয়ে কাজ শিখেছেন। ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে এন্ড্রুইউল্‌ কোম্পানীতে একটি চাকরী পান। চার মাস সে কাজ করেছিলেন। **১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে তিনি বৃন্দাবনের প্রেম মহাবিদ্যালয়ে ভাইস্‌প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন এবং ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সেখানে ছিলেন।** এ সবই অবনী মুখার্জির সিঙ্গাপুরের বিবৃতি হতে নেওয়া হয়েছে। আমি নিজে প্রেম মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে পত্র লিখেছিলেম। তিনি নিম্নলিখিত উত্তর দিয়েছেন ঃ

Raja Mahendra Pratap
Aryan Peshwa
Master of Religion of Love
Founder of World Federation

Dear Mr. Muzaffar Ahmad.
Your letter of the 20th inst. is received here today.
I am glad, you are interested in the doings of all those workers who did right or wrong in the service of the Country.

Exact dates can only be found in the old records of Prem Mahavidyalaya, Vrindaban but as far as I can recollect Mr. Abani Mukherjee was at P. M. V. in 1911-1912.

He was supposed to be the director of textile department, but the department could not be opened. He said he learned textile industry in Germany. Headmaster did not like him. I took him as my Secretary. He left me saying he was going to Tibet. I met him at Moscow in December, 1921 when he came with Mr. M. N Roy to see me. I was sick and staying at Afghan Embassy.

Yours Sincerely
M. Pratap

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ
আর্য পেশোয়া
প্রেম ধর্মের প্রধান
বিশ্ব ফেডারেশনের স্থাপয়িতা

কুলরি, মুসৌরি
ভারত

প্রিয় মিস্টার মুজফ্ফর আহ্মদ,

আপনার এ মাসের ২০শে তারিখের পত্রখানা আজ পেঁছেছে। দেশের সেবায় যাঁরা ভালো কাজ বা মন্দ কাজ যা কিছুই করুন না কেন আপনাকে তাঁদের কাজ সম্বন্ধে জানতে আগ্রহান্বিত দেখে আমি খুশী।

প্রেম মহাবিদ্যালয়ের পুরানো কাগজপত্র পরীক্ষা করলেই শুধু মিস্টার অবনী মুখার্জির সেখানে আসার সঠিক তারিখ পাওয়া সম্ভব। আমি যতটা মনে করতে পারছি তাতে মিস্টার অবনী মুখার্জি ১৯১১-১৯১২ সালে প্রেম মহাবিদ্যালয়ে এসেছিলেন।১

কথা হয়েছিল যে তিনি তাঁতের বিভাগটি পরিচালনা করবেন, কিন্তু বিভাগটি খুলতে পারা যায়নি। তিনি জানিয়েছিলেন যে তিনি জার্মানীতে তাঁতশিল্প শিখেছিলেন। আমাদের হেডমাস্টার তাঁকে পসন্দ করেননি। আমি তাঁকে আমার সেক্রেটারীর কাজ দিয়েছিলেম। তিনি তিব্বতে যাবেন বলে আমার নিকট হতে চলে যান। তারপরে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি অসুস্থ অবস্থায় আফ্গান দূতাবাসে ছিলাম। সেখানে তিনি মিস্টার এম· এন· রায়ের সঙ্গে আমায় দেখতে এসেছিলেন।

আপনার বিশ্বস্ত
এম· প্রতাপ

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের এই পত্র হতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে অবনী মুখার্জি বৃন্দাবনের প্রেম মহাবিদ্যালয়ের ভাইস্ প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হননি। সেই বিদ্যালয়ে প্রিন্সিপালের পদ ছিল না, ছিল হেডমাস্টারের পদ। ভাইস্ প্রিন্সিপাল তিনি কি করে হতে পারেন? মুলাকাতের সময়ে তিনি এই হেডমাস্টারকেও বিশ্বাস করাতে পারেননি যে তাঁর পক্ষে বয়ন বিভাগ খোলা ও পরিচালনা করা সম্ভব। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ভদ্র ভাষায় লিখেছেন যে "আমাদের হেডমাস্টার তাঁকে পসন্দ করেননি"। একজন লোককে কাজ দেওয়ার জন্যে ডেকে আনা হলো, অথচ কাজ দিতে পারা গেল না, এই বোধ হতে রাজা তাঁকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করলেন। কিন্তু সেক্রেটারীর কাজ চালাবার মতো ইংরেজি ভাষাজ্ঞানও কি অবনী মুখার্জির ছিল? দেখা গেল যে ক'দিন যেতে না যেতেই তিনি তিব্বতে যাওয়ার নাম করে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। অথচ তিব্বতে অবনী মুখার্জি কখনও যাননি। তার এগারো বছর পরেও আমরা অবনী মুখার্জিকে ইংরেজিতে লিখতে দেখছি—"...is nothing more than an attempt to exploit them in

১ এ সম্বন্ধে অবনী মুখার্জি নিজে যে সময়ের কথা লিখেছেন আমি সেটাই ঠিক মনে করি। (লেখক)

a new way for certain **Vested interested.**"১ অবনী মুখার্জি'র সিঙ্গাপুরের বিবৃতি বা স্বীকারোক্তিতে আছে যে ১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে তিনি বৃন্দাবনের প্রেম মহাবিদ্যালয়ে ভাইস্-প্রিন্সিপালরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি আগস্ট মাস হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ছিলেন। নানান জায়গায় ঘোরাঘুরি করে ও হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়েতে চাকরী ক'রে অবনী মুখার্জি'র ১৯১৪ সাল কেটেছে। ১৯১৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর কোনো কাজ ছিল না। এপ্রিল মাসে এইচ· এইচ· বিষ্ণুই এন্ড কোং অবনী মুখার্জি'কে তাঁদের দূর প্রাচ্যের ও আমেরিকার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। জাপানী সাকে ও বীয়ারের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার পাওয়ার চেষ্টা করার জন্যে বিষ্ণুইরা প্রথমে অবনীকে জাপানে পাঠালেন। তিনি ১৯১৫ সালের ১৭ই মে তারিখে জাপানে পেঁাছেছিলেন এবং চারমাস জাপানে ছিলেন।

অবনী মুখার্জি তাঁর সিঙ্গাপুরের স্বীকারোক্তিতে না বললেও, এমনকি জাপানে রাসবিহারী বসুকে যতীন মুখার্জি'র সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয় ছিল না একথা বলা সত্ত্বেও, আমাদের দেশে তাঁর চেষ্টায় একটি কথা রটিত হয়েছিল যে অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্যে বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯১৫ সালে তাঁকে জাপানে পাঠিয়েছিলেন। ওই সময়ে আরও কয়েকজনকে অস্ত্রের সন্ধানে যতীন্দ্রনাথ দেশের বাইরে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ (দক্ষিণ হস্ত স্বরূপও বলা যায়) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পরে তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে খ্যাত হয়েছিলেন। ভূপতি মজুমদার ও আরও কয়েকজনও গিয়েছিলেন। তাঁদের সকলেই যতীন মুখার্জি'র সঙ্গে বিপ্লবী কাজে লিপ্ত বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। তাঁরা বিশেষভাবে জার্মান জাহাজ মাবারিকের খোঁজে গিয়েছিলেন। এই জাহাজের অস্ত্র নিয়ে আসার কথা ছিল। মোটের ওপরে, জার্মান অস্ত্রের প্রচেষ্টায় তাঁরা অকৃতকার্য হন। ভবিষ্যৎ মানবেন্দ্রনাথ রায় কোনো রকমে গিরেফ্‌তার হওয়াব হাত থেকে বেঁচে গিয়ে জাপানে ও পরে চীনে চলে যান। ভূপতি মজুমদারদের গিরেফ্‌তার করে সিঙ্গাপুরের ফোর্ট ক্যানিং দুর্গে বন্দী করা হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে অবনী মুখার্জি যদি যতীন মুখার্জি'র দলের সভ্য হবেন এবং এমন ঘনিষ্ঠ সভ্য যে যাঁকে তিনি অস্ত্র সংগ্রহের জন্যে জাপানে পাঠাতে পারেন তবে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও ভূপতি মজুমদার প্রভৃতির কেউ তাঁকে চিনতেন না কেন? এটা কি করে সম্ভব হতে পারে? ১৯২০ সালে যখন জার্মানীতে তিনি এম· এন· রায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করেছিলেন তখন এটা পরিষ্কার হয়েছিল যে আগে তাঁরা পরস্পর পরিচিত ছিলেন না। অবনী মুখার্জি রায়কে যে নিজের দীর্ঘ পরিচয় দিয়েছিলেন সেই সময়ে তিনি বলেননি যে যতীন মুখার্জি তাঁকে জাপানে অস্ত্র সংগ্রহের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। অবনী মুখার্জি যে আত্মপরিচয় রায়ের নিকটে দিয়েছিলেন তিনি তা তাঁর স্মৃতিকথায় প্রকাশ করেছেন। তা থেকে নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি এই পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় ছেপেছি। তাতে যতীন মুখার্জি'র কোনো নামোল্লেখ নেই। ওই

১ ১৯২৪ সালের জুন মাসের ২৬শে তারিখে বার্লিন হতে ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে যে দরখাস্ত অবনী মুখার্জি পাঠিয়েছিলেন তার সঙ্গে এই বিবৃতিও দাখিল করা হয়েছিল। (K 9624/218, National Archives of India.)

নামের উল্লেখ এম· এন· রায়ের নিকটে করলেই মুখার্জি ধরা পড়ে যেতেন। কিন্তু আত্মপ্রচারে অবনী মুখার্জির জুড়ি মেলা ভার। যতীন মুখার্জি তাঁকে অস্ত্র সংগ্রহে জাপানে পাঠিয়েছিলেন, এ কথার এত জোর প্রচার অবনী মুখার্জি নিজে করেছিলেন ও করিয়েছিলেন যে রওলাট কমিটির রিপোর্টে পর্যন্ত তা উল্লিখিত হয়েছে। "In the same month another Bengalee, Abani Mukherji, sent by the conspirators to Japan, while the leader, Jatin Mukherji, went into hiding at Balasore owing to the police investigation in connection with the Garden Reach and Beliaghata dacoities." (Page 121)

তর্জমা ঃ "সেই একই মাসে (অর্থাৎ যে মাসে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য গিয়েছিলেন সেই মাসে) ষড়যন্ত্রকারীরা অবনী মুখার্জি নামক আর একজন বাঙালীকে জাপানে পাঠালেন। গার্ডেন রীচ ও বেলিয়াঘাটা ডাকাইতির লোকদের অনুসন্ধানের কারণে তাঁদের নেতা যতীন মুখার্জি বালেশ্বরে গিয়ে গা ঢাকা দিলেন।" (১২১ পৃষ্ঠা)

অথচ, এই কমিটির সামনে মুখার্জির সিঙ্গাপুরের স্বীকারোক্তিও নিঃসন্দেহে ছিল। তাতে তিনি বলেননি যে যতীন মুখার্জি তাঁকে জাপানে অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি সব রকমের তথ্য সরকারের আয়ত্তে থাকা সত্ত্বেও সরকারী রিপোর্ট ভ্রান্তিতে ভরা। সন-তারিখও তাঁরা ভুল লেখেন।

অবনী মুখার্জির নিজের বিবৃতি অনুসারে সে যাত্রা তিনি চার মাস জাপানে ছিলেন। সেই সময়ে ভগবান সিং ও রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁদের সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন। এইচ· এইচ· বিষ্ণুই এণ্ড কোম্পানী অবনী মুখার্জিকে কোনো টাকা পাঠাচ্ছিলেন না। তাই তিনি খুবই অর্থ-কষ্টে ছিলেন। রাসবিহারী বসুর লোকেরা তাঁকে সাহায্য করছিলেন। এই সময়ে জাপানে লালা লাজপৎ রায়ের সঙ্গেও অবনী মুখার্জির পরিচয় হয়। তাঁব কিছু কাজ করে দিয়েও অবনী মুখার্জি কিছু টাকা পান।

বার্সবিহারী বসুদের একজন লোককে দেশে পাঠানোর প্রয়োজন ছিল। এস· কে· মজুমদার নামে একজন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁকেই প্রথমে দেশে পাঠানোর প্রস্তাব হয়। তিনি কিন্তু দেশে আসতে কিছুতেই রাজী হলেন না। তখন অবনী মুখার্জিকে বাজিয়ে দেখা শুরু হয়। রাসবিহারী বসু নিজেই অবনীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর নিকটে কোনো পরিচয় পত্র (credentials) আছে কিনা। তারপরে জিজ্ঞাসা কবলেন যতীন মুখার্জিকে তিনি চেনেন কিনা। দু'টি প্রশ্নের উত্তরেই অবনী 'না' বলেছিলেন। এইভাবে তাঁদের কথাবার্তা এগিয়ে যায়। শেষে অবনীকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে কিছু খবর নিয়ে তিনি দেশে ফিরে যেতে পারেন কিনা। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অবনী বললেন, তাই তো তিনি চান। এইসব কথাবার্তা হওয়ার পরে স্থির হলো যে অবনী মুখার্জিকে শাংহাইতে যেতে হবে। সেখানেই তিনি জানতে পাবেন কি বার্তা তাঁকে বহন করে ভারতবর্ষে নিয়ে যেতে হবে। তাঁকে জানানো হলো যে তাঁকে নাগাসাকি হতে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে চিকুগো মারু জাহাজে রওয়ানা হতে হবে। তাঁকে আরও জানানো হলো যে ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে জাহাজ শাংহাই পৌঁছুবে। সেদিনই অপরাহ্ন পাঁচটার সময়ে শাংহাই পার্কে গেলে সাদা পোশাক পরিহিত, বেঁটে, সরু মতো ফরসা রং-এর একজন যুবকের সঙ্গে অবনী মুখার্জির দেখা হবে এবং সেই ফরসা যুবকই অবনীর পরের সব ব্যবস্থা করবেন। ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯১৫) শাংহাই পার্কে

গিয়ে যাঁর সঙ্গে অবনী মুখার্জির দেখা হয়েছিল তাঁর নাম ছিল অবিনাশচন্দ্র রায়, বাঙালী, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স। পূর্ববঙ্গের লোক হলেও কলকাতায় আছেন দীর্ঘকাল, ইংরেজি বলেন শিক্ষিত লোকের মতো। অবিনাশচন্দ্র রায়ও নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অবনীর পরিচয় নিলেন। নানান রকম কথাও হলো তাঁর সঙ্গে। অবনীর দুটি স্বীকারোক্তি পড়ে যা বোঝা গেছে তা থেকে এটা বা'র হয়ে আসছে যে গাড়ীতে চড়ে অবনী (গাড়ী অবিনাশচন্দ্র রায়ই পাঠিয়েছিলেন) ৩২, ইয়াংস পু'তে (32, Yangze Poo) অবিনাশচন্দ্র রায়ের বাড়ী গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি অবিনাশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে রাসবিহারী বসুকে দেখতে পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান। জাপানে অবনী রাসবিহারী বসুর বাড়ী গিয়ে শুনেছিলেন যে তিনি কোনো কাজে ওসাকা গেছেন। যাই হোক, শাংহাইতে অবনী মুখার্জি সাত দিন ছিলেন। এই সময়ে রাসবিহারী বসু ও অবিনাশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ কথাবার্তা হয়। শেষে রায় তাঁকে নিম্নলিখিত বার্তা ও 'কোর্ড্ওয়ার্ড' দিয়েছিলেন।

'কোর্ডওয়ার্ড'টি ছিল ঃ

"আমি রাম বাবুর নিকট হ'তে আসছি"।

বার্তাটি ছিল ঃ

"সব খবর ভালো। এমন উপায় বা'র করুন যাতে অবিনাশচন্দ্র রায় নিরাপদে ভারতে ফিরতে পারেন"। (that "everything is all right and that they must devise some means by which A. C. Roy could safely get to India.")

যাঁদের নিকটে বার্তা পৌঁছাতে হবে পরে পরে তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছিল। ব্যবস্থাটি এই রকম ছিল যে প্রথম ব্যক্তিকে না পেলেই শুধু দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকটে যেতে হবে ঃ

চন্দননগরে

(১) মতিলাল রায়
(২) মণীন্দ্র নায়েক
(৩) ননিলচন্দ্র দত্ত
(৪) জ্যোতিশচন্দ্র সিংহ
(গোরা ফাটক)

(৫) যতীন্দ্রমোহন রক্ষিত
(কলকাতার নিউ মার্কেটে স্ট্যাম্প ও স্টেশনারি স্টল ছিল)।
চন্দননগরে ব্যর্থ হলে ঢাকা যেতে হবে।

ঢাকায়

ঢাকা পটুয়াটুলির অলকচন্দ্র হোমিওপ্যাথিক হলে গিয়ে ডাক্তার গোরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের নিকটে গিরিজা বা চন্দ্রচূড়ের কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে। তাঁদের দু'জনের একজনকে পাওয়া গেলেও বার্তাটি পৌঁছিয়ে দিতে হবে। হোমিও হলে খবর না পাওয়া গেলে ডাক্তার এস. সি. দাশগুপ্তকে গিরিজা ও চন্দ্রচূড়ের কথা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

কুমিল্লায়

গিরিজা ও চন্দ্রচূড়ের খবর ঢাকায় না পাওয়া গেলে কুমিল্লায় যেতে হবে। সেখানে কান্দিরপাড়ে গগনচন্দ্র সেনের বাসায় গিরীনচন্দ্র সেনকে গিরিজা ও চন্দ্রচূড়েব কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে। যদি খোঁজ না পাওয়া যায় তবে ফিরে আসতে হবে।

কলকাতায়

কলকাতার ন্যাশনাল কলেজে গিয়ে খবরটি কুলচন্দ্র সিংহ রায়কে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। এই খবরের সঙ্গে আরও জানিয়ে দিতে হবে যে অমর সিং (পুকোহ্, সায়ামের ডিভিশনাল ইঞ্জিনীয়ার) আমাদের লোক, অর্থাৎ অবিনাশচন্দ্র রায়ের পার্টির লোক।

সকলের মনে রাখার পক্ষে সুবিধা হবে বলে আমি আবার বলছি। অবনী মুখার্জি তাঁর প্রথম বিবৃতি দিয়েছিলেন **১৯১৫ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে সিঙ্গাপুরে**। এই বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেছিলেন এইচ. আর. কোঠাওয়ালা (H. R. Kothawala.) তাঁর পদের নাম হচ্ছে স্পেশাল সার্বিস অফিসার, জেনারেল স্টাফের সঙ্গে সংযুক্ত (Special Service Officer, Attached General Staff, Straits Settlements)। এই দলীলের অবিকল নকল ইসু করেছেন ডাডলে রিডাউট, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, সৈন্যাধ্যক্ষ, স্ট্রেট্স্ সেটেলমেন্ট্স (Dudley Ridout, Brigadier-General Commanding the Troops, Straits Settlements.)

প্রথম বিবৃতি দেওয়ার কিছু কম এক বছর পরে, **১৯১৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর** তারিখে স্ট্রেট্স্ সেট্লমেন্টের হেড-কোয়ার্টার্স ফোর্ট ক্যানিং দুর্গে অবনী মুখার্জি তাঁর দ্বিতীয় বিবৃতি দিয়েছিলেন। এই বিবৃতিও আগেকার অফিসার এইচ. আর. কোঠাওয়ালা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই বিবৃতিতে আগেকার বিবৃতির কথাগুলিকে আরও খোলসা করেছেন। আগেকার বিবৃতিতে বলেননি এমন অনেক কথাও এই বিবৃতিতে তিনি বলেছেন।

সিঙ্গাপুরের ফোর্ট ক্যানিং-এ অবনী মুখার্জিকে মারধর করা হয়েছিল কিনা তা আমার জানা নেই। জানা থাকা সম্ভব নয়। তবে, পেটের কথা বা'র কবার জন্যে যে ধৃত বন্দীদের ওপরে কোনো কোনো সময়ে মারধরও হয় একথা আমাদের অজানা নয়। মারের ফলেই হোক, কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, তিনি সব কথা কোঠাওয়ালাকে বলে দিয়েছিলেন, 'কোড্ওয়ার্ড'টিও বলে দিতে কসুর করেননি। রাসবিহারী বসু ও তাঁর সহকর্মীদের যে সব কথা তিনি বলতে শুনেছিলেন সে সব কথাও তিনি বলে দিয়েছিলেন কোঠাওয়ালাকে। অবনী মুখার্জি তাঁর জীবনে সর্বপ্রথম একটি বিপ্লবী কাজের ভার নিয়ে ভারতে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে তিনি তাঁর পেটের সর্ব কথা উগরে দিলেন সিঙ্গাপুরের দুর্গে মিলিটারি অফিসারের নিকটে। কি বার্তা তিনি বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন তা বলে দিলেন, কি তাঁর 'কোড্ওয়ার্ড' ছিল তাও প্রকাশ করলেন এবং কার কার নিকটে তিনি যাচ্ছিলেন সে কথাও বলতে ভুললেন না। এই যদি স্বীকারোক্তি না হয় তবে স্বীকারোক্তি আর কাকে বলে? যে-বার্তা তিনি বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন

শুধু তার কথা বলে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। কথায় কথায় তিনি রাসবিহারী বসু ও অবিনাশচন্দ্র রায়ের নিকট হতে যা যা শুনেছিলেন সে সবও তিনি কোঠা-ওয়ালাকে বলে দিয়েছিলেন। যেমন তিনি শুনেছিলেন যে জার্মানরা চান না যে রাসবিহারী বসু ভারতে গিয়ে সংগ্রাম গড়ে তুলুন। অবনী জিজ্ঞাসা করলেন রাসবিহারীর পক্ষে কি করে ভারতে যাওয়া সম্ভব? রাসবিহারী বসুর দলের লোকেরা বলে ফেলেছিলেন যে তিনি স্থলপথে ভারতে যাবেন।' তার আগে জার্মানরা জাহাজ চার্টার করে তাঁকে সায়ামে পৌঁছিয়ে দিবেন। অবিনাশচন্দ্র রায় আফগান-ভারত সীমান্তে গিয়ে জার্মানদের সঙ্গে ও ভারতীয় বিপ্লবীদেব সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে যে ছটফট করছিলেন একথাও তিনি কোঠাওয়ালাকে বলেছিলেন। লালা লাজপৎ রায় নিউইয়র্কে মৌলবী বারাকতুল্লার মুখে শুনে এসে জার্মান-ভারত ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কি কি কথা বলেছেন এবং অবনী মুখার্জির শাংহাই ছাড়ার পূর্বক্ষণে জার্মানদের নিকট হতে অবিনাশচন্দ্র রায় ২০,০০০ ডলার পেয়েছেন এবং তা থেকে ৫০০ ডলার তিনি অবনী মুখার্জিকে দিয়েছেন, ইত্যাদি অনেক কথা কোঠাওয়ালাকে দিয়ে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন অবনী মুখার্জি।

ফোর্ট ক্যানিং-এ আরও কয়েকজন ভারতীয় বন্দী ছিলেন, ভূপতি মজুমদারও ছিলেন। ভূপতি মজুমদার যে অবনী মুখার্জিকে চিনতেন না সেকথা আমি আগে লিখেছি। তাঁদের দু'জনের প্রথম পরিচয় হয় ফোর্ট ক্যানিং-এ। আমার যতটা মনে পড়ে ভূপতি মজুমদার আমায় একদিন বলেছিলেন যে চাবির গোছা ঘোরাতে ঘোরাতে একদিন অবনী এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "Excuse me (আমায় ক্ষমা করবেন), আপনি কি বাঙালী?" অবনী মুখার্জি তখন প্যারোলে (parole) মুক্ত ছিলেন।

ভূপতি মজুমদারের সঙ্গে যখন ফোর্ট ক্যানিং-এ অবনী মুখার্জির পরিচয় হয়েছিল তখন অবনী মুখার্জি ও আরও দু'একজন তাঁদের জানা ও অজানা সবকথা কোঠাওয়ালাকে ব'লে দিয়ে বিশ্বস্ত ও বশংবদ বন্দী হয়েছেন। ভূপাত মজুমদার আমায় একদিন বলেছিলেন যে ফোর্ট ক্যানিং-এ অবনী মুখার্জি শ্রীমজুমদারকে পাম্প ক'রে তাঁর পেটের কথা বা'র করে নিতে চেয়ে অকৃতকার্য হয়েছিলেন।

সিঙ্গাপুরে যাঁরা আটকা পড়েছিলেন তাঁরা সিঙ্গাপুরেই থেকে গেলেন। যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ক্রমশই বাড়ছিল। তার ফলে জাহাজে জায়গা পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। প্রথম স্বীকারোক্তির প্রায় এক বছর পরে অবনী দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি কেন করলেন? বোধ হয় ইতোমধ্যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট ভারতে অনুসন্ধান ক'রে জেনেছিলেন যে অবনী মুখার্জি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কেউ নন। অবনী নিজে বলেছেন যে 'এনার্কিস্ট' প্রভাস দে'র সঙ্গে একমাত্র তাঁর দেখা হয়েছিল। তিনি প্রভাস দে'র সঙ্গে কাজ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু কাজ তিনি করেননি। বার্লিনে অবনী মুখার্জি এম· এন· রায়কে বলেছিলেন, শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের মনে এ প্রত্যয় জন্মেছিল যে মুখার্জি কোনো বিপ্লবী দলের সভ্য নন। কিন্তু তিনি দেশে ফিরলে তাঁর বিপদ কম ছিল না। সিঙ্গাপুরের বিবৃতির প্রতিশোধে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের উদ্যত খড়্গ তাঁর মাথায় পড়তে পারত। তাই তিনি সিঙ্গাপুর হতে পালিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ভারতে আসার জন্যে নয়। ১৯২৪ সালে অবনী মুখার্জি বার্লিন হতে ক্ষমা চেয়ে ভারতে ফেরার অনুমতি চেয়ে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিকটে যে আবেদন করেছিলেন সেই সম্বন্ধে মন্তব্য লিখতে

গিয়ে ভারত গবর্নমেণ্টের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর লেফ্টেন্যাণ্ট কর্নেল সি· কে· (C. Kaye) এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

*　　　*　　　*

"After Abani Mukherjee had made his statement at Singapur he was allowed out on parole—which seems to suggest that the local authorities did not care whether he 'escaped' (as he did) or not."

*　　　*　　　*

C. Kaye
20.8.24

বঙ্গানুবাদ

সিঙ্গাপুরে অবনী মুখার্জি যখন বিবৃতি দিলেন তখন তাঁকে প্যারোলে বাইরে যেতে দেওয়া হলো। তার মানে এই মনে হচ্ছে যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মনে পরওয়াই ছিল না যে তিনি পালিযে যাবেন কি যাবেন না ; আব পালিযেই তিনি গিয়েছিলেন।

*　　　*　　　*

সি· কে·
২০-৮-২৪

সি· কে·'র এই মন্তব্য হতে সকলে সহজে বুঝতে পারবেন যে অবনী মুখার্জির প্যারোলের তাৎপর্য কি ছিল। প্যারোলে মুক্ত হওয়ার কারণে অবনী মুখার্জি সম্বন্ধে মিলিটারি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কমে গিয়েছিল। এটা মনে রাখতে হবে যে অবনী মুখার্জি বিচার বিভাগ বা শাসন বিভাগের হুকুমে সাধারণ জেল-খানায় বন্দী ছিলেন না। তিনি মিলিটারির হুকুমে দুর্গে বন্দী ছিলেন। দু'জায়গায় রীতি-নীতি ও কায়দা-কানুন এক নয়। অবনীর দ্বিতীয় বিবৃতির পরে তাঁকে আটক ক'রে রাখাব কোনো মানে ছিল না। কিন্তু জাহাজে স্থান পাওয়া ছিল বড় দুষ্কর। আর, স্থান পেলেও মিলিটারি কর্তৃপক্ষ তো তাঁকে ভারতেই পৌঁছিয়ে দিতেন। অবনীর কিন্তু ভারতে ফেরার সাহস ছিল না। ডাচ্ অধিকৃত স্থানের ওপরেই তাঁর নজর পড়া স্বাভাবিক ছিল। যুদ্ধে ডাচ্‌রা ছিলেন নিরপেক্ষ।

অবনী মুখার্জি সিঙ্গাপুর হতে পালিয়েছিলেন। কিন্তু কি করে পালালেন? তিনি যখন ধরা পড়েছিলেন তখন তাঁর নিকটে টাকা ছিল। জার্মানীর টাকা হওয়ার কারণে সেই টাকা জব্‌ৎ করা হয়েছিল কিনা তা জানিনে। যদি টাকা তাঁকে ফেরৎ দেওয়া হয়ে থাকে তবে তো সেই টাকাতেই তিনি পালানোর ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। লোকেদের দয়ার উদ্রেক করতেও তিনি পটু ছিলেন। প্যারোলে মুক্ত হওয়ার কারণে তিনি ঘুরে বেড়াতেন, লোকেদের সঙ্গে কথাও বলতে পারতেন। ব্যাপারটি সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করে নিতে হবে এই ভেবে যে তিনি জেল-খানার বন্দী ছিলেন না. জেলের ওয়ার্ডার বা পুলিসের কনস্টেবল তাঁর সঙ্গে থাকার কোনো কথাই উঠে না,—সর্বোপরি ফৌজী কিল্লা (কিলাহ্) হতে প্যারোলে মুক্ত ছিলেন তিনি।

সিঙ্গাপুর হতে পালানো সম্পর্কে অবনী মুখার্জি নানান জায়গায় নানান

ধরনের বিবৃতি দিয়েছিলেন। এক জায়গার বিবৃতির সঙ্গে অন্য জায়গার বিবৃতির কোনো মিল নেই। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ খবর দিয়েছেন অবনী মুখার্জির বিধবা রুশ স্ত্রী রোজা ফিটিংগোফ। খবরটি তিনি বলেছেন 'লিঙ্ক' ও 'প্যাট্রিয়টে'র মস্কোস্থিত প্রতিনিধি পি. উন্নিকৃষ্ণনকে। লেখাটির নাম "সোবিয়েৎ ইউনিয়নে ভারতীয় বিপ্লবীগণ" ("Indian Revolutionaries in Soviet Union") তিনি বলেছেন ঃ

"he [Abani] stepped on the soil of the land of Socialism in 1920 after breaking a British jail in Singapore where he had been incarcerated for his part in Bengal uprising. After the hairbreath escape from the jail he had to swim for miles perilously close to the hull of a hospitable ship to escape being shot from the shore. He reached Afghanisthan, went on to Berlin, then refuge of political exiles, and finally to the Soviet Union."১

বঙ্গানুবাদ

"তিনি [অবনী] সিঙ্গাপুরের ব্রিটিশ জেল ভেঙে ১৯২০ সালে সোশ্যালিজমের দেশের ভূমিতে প্রথম পা রেখেছিলেন। বাঙলা দেশের অভ্যুত্থানে যোগ দেওয়ার কারণে তিনি সিঙ্গাপুরে কারাজীবন কাটাচ্ছিলেন। জেল ভেঙে পালাতে গিয়ে তিনি অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছিলেন। তারপরে সঙ্কটজনক অবস্থায় তাঁকে মাইলের পর মাইল সাঁতার কাটতে হয়েছে। একটি বন্ধুভাবাপন্ন জাহাজের খোলের গা ঘেঁসে তিনি সাঁতার কাটছিলেন যাতে তট হতে বর্ষিত গুলি তাঁর গায়ে না লাগে। তিনি আফ্‌গানিস্তান পৌঁছেছিলেন। সেখান থেকে গিয়েছিলেন বার্লিনে। সেখানে রাজনীতিক আশ্রিত ব্যক্তি ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছিলেন সোবিয়েৎ ভূমিতে।"

আমার বড় দুঃখ হয় রোজা ফিটিংগোফের জন্য। আশ্চর্য নয় যে অবনী মুখার্জির এই বীরত্বের কাহিনী শুনেই তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু এর একটি কথাও তো সত্য নয়!

দেশবিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীঅতুল বসুকে অবনী বলেছেন যে সাঁতার কাটতে কাটতে তিনি একটি ডাচ্ অধিকৃত মনুষ্য বসতিহীন দ্বীপে পৌঁছেছিলেন। সেখানে বানরেরা যে ফল খাচ্ছিল সেই ফল অবনী গাছ থেকে পেড়ে খেতেন।

বার্লিনে অবনী মুখার্জি মানবেন্দ্রনাথ রায়কে বলেছিলেন, সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষের প্রত্যয় জন্মেছিল যে কোনো বিপ্লবী দলের সঙ্গে অবনী মুখার্জির কোনো সংস্রব নেই। তাই তাঁকে বাইরে বেড়াতে দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি একখানি জেলে নৌকার সঙ্গে তাঁর পলায়নের বন্দোবস্ত করেছিলেন। জেলে নৌকা তাঁকে একখানি চীনা জাহাজে তুলে দিয়েছিল, আর সেই চীনা জাহাজ তাঁকে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল জাবায়।

১৯২[illegible] সালের শেষাশেষি হতে ১৯২৪ সালের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত অবনী মুখার্জি ভারতে ছিলেন। সেই সময়ে "বিপ্লবী অবনী মুখার্জি" নামক একখানি

পুস্তক প্রকাশিত হয়। লেখক ঢাকা-অনুশীলন সমিতির শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ। অল্পসংখ্যক লোকের ধারণা এই যে পুস্তকখানি অবনী নিজে লিখে রাখাল ঘোষের নামে ছেপেছিলেন। কারণ, রাখাল ঘোষ নিজে লিখলে এই পুস্তকের লেখা আরও ভালো হতো। কত বছর আগে আমি এই বইখানি একবার মাত্র পড়েছিলেম, তা ভালো ক'রে মনেও নেই। শুধু সিঙ্গাপুর হতে অবনীর পলায়নের কাহিনীটি আবছা মনে আছে। অবনী মুখার্জি সমুদ্রে স্নান করছিলেন। দেখলেন পাশ দিয়ে একখানি নৌকা ভেসে যাচ্ছে। তিনি দু'হাতে সেই নৌকার তলা চেপে ধরলেন এবং নৌকার সঙ্গে ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন! এই খবরটি যাচাই করার জন্যে আমি অধ্যাপক রাখালচন্দ্র ঘোষের (তিনি বঙ্গবাসী কলেজে ইকনমিক্স্ পড়াতেন) নিকটে তাঁর এক অধ্যাপক বন্ধুকে১ পাঠিয়েছিলেম। তিনি গিয়েই শুনলেন যে ক'দিন আগে শ্রীঘোষ হঠাৎ মারা গেছেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও আমি "বিপ্লবী অবনী মুখার্জি" বইখানি জোগাড় করতে পারিনি।

অবনী মুখার্জি অবলীলাক্রমে মিথ্যা কথা বলে যেতেন। মিথ্যা তাঁর জিহবার ডগায় এমন স্বাভাবিক ভাবে এসে যেত যে তিনি হয়তো বুঝতেই পারতেন না যে তিনি মিথ্যা বলছেন। তাঁর বিষয়ে দেওয়া তথ্যগুলিই আমার এই মন্তব্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

সিঙ্গাপুর হতে তাঁর পলায়নের কাহিনীর কিছু কিছু আমি উপরে উল্লেখ করেছি। তিনি বার্লিনে এম· এন· রায়কে বলেছিলেন যে বানারসের শিবপ্রসাদ গুপ্তকে রাসবিহারী বসু জাপানে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তারপরে তাঁকে বৈপ্লবিক কাজের জন্য টাকা ও বার্তা দিয়ে দেশে পাঠাচ্ছিলেন। এখানে গুপ্তকে জাপানে ডেকে পাঠানোর কথা একেবারেই সত্য নয়। রায়কে সন তারিখের কথা তিনি যা বলেছিলেন সে সবও মিথ্যা। শিবপ্রসাদ গুপ্ত ধনী লোক ছিলেন। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তিনি বিশ্ব-ভ্রমণে বার হয়েছিলেন। যুক্ত প্রদেশের (উত্তর প্রদেশের) পণ্ডিত সুরেন্দ্র নারায়ণ শর্মাকে তাঁর বাড়ীর লোকেরা তাঁর সঙ্গে দিয়েছিলেন। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারও তাঁর সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা ইউরোপ ও আমেরিকার ভ্রমণ শেষ ক'রে জাপানে এসেছিলেন। জাপানের পরে তাঁরা কোরিয়া ও চীন ভ্রমণ করেন। শাংহাইতে তাঁদের ভ্রমণের সমাপ্তি ঘটে। বিনয়কুমার সরকার শাংহাইতেই থেকে গেলেন। অন্য ব্যক্তি আমেরিকা হতেই দেশে ফিরে এসেছিলেন। শিবপ্রসাদ গুপ্ত একাই দেশে ফিরছিলেন। পথে জাহাজে তাঁকে গিরেফ্তার ক'রে সিঙ্গাপুরের ফোর্ট ক্যানিং দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ ভারতে অনুসন্ধান ক'রে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো রিপোর্ট না পেয়ে ১৯১৬ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে তাঁর ওপর হতে সমস্ত অর্ডার তুলে নিলেন। চার-পাঁচ দিনের ভিতরে তাঁকে জাহাজে স্থানও জোগাড় ক'রে দেওয়া হয়। তিনি দেশে ফিরে আসেন। হিন্দীতে লেখা বিশ্ব-ভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁর বিরাট গ্রন্থে এসব কথা লেখা আছে। গুপ্ত লিখেছেন ফোর্ট ক্যানিং-এ আরও ক'জন ভারতীয় বন্দীকে তিনি দেখেছেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর কোনো কথা হয়নি। অবনী মুখার্জির নামোল্লেখ তাঁর গ্রন্থে নেই। সিঙ্গাপুরে তিনি তিন মাস বন্দী ছিলেন। জাপানে আড়াই মাস এবং কোরিয়া ও চীনে দুই মাস তিনি ভ্রমণ করেছিলেন।

১ অধ্যাপক শান্তিময় রায়।

অবনী মুখার্জি এম· এন· রায়কে বলেছিলেন যে ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণে তিনি জার্মানীতে পড়াশুনা করছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া মাত্রই তিনি ওই দেশ হতে পালিয়ে যান। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে তিনি ১৯১৬ সালে জাপানে পৌঁছান। তার পরের বছরের (১৯১৭ সালের) মাঝামাঝি সময়ে রাসবিহারী বসুর সাহায্যে শিবপ্রসাদ গুপ্তের সঙ্গে তিনি দেশে ফিরছিলেন, পথে গিরেফ্‌তার হয়ে সিঙ্গাপুরে ফোর্ট ক্যানিং-এ বন্দী হন। অবনী মুখার্জির এ বিবৃতিও সত্য নয়। আমি যা যা ওপরে লিখেছি সে সব হতে প্রমাণ হয়ে যাবে যে কথাগুলি তিনি বানিয়ে বলেছেন। পি· উন্নিকৃষ্ণান সম্ভবত অবনীর স্ত্রীর নিকট শুনে লিখেছেন, অবনী তো কোনো-দিন আমেরিকা যাননি। এটা এম· এন· রায়ের মনগড়া। কিন্তু অবনী আমেরিকা যাওয়ার কথা বহু লোককে বলেছেন। চিত্রশিল্পী শ্রীঅতুল বসুকে বলেছেন, তাঁর অগ্রজ পবিত্র বসুর সঙ্গে আমেরিকায় অবনীর পরিচয় ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীরা জার্মানীর দিকেই ছুটেছিলেন। আর, তিনি "বিপ্লবী অবনী মুখার্জি" হয়ে কিনা জার্মানী হতে পালিয়ে গেলেন! ১৯১৫ সালের ১৭ই মে তারিখে তিনি জাপানে পৌঁছেছিলেন। মাত্র চার মাস সেখানে ছিলেন। ১৯১৫ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে অবনী মুখার্জি ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে শাংহাই হ'তে সিঙ্গাপুর রওয়ানা হয়েছিলেন।

১৯১৫ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে সিঙ্গাপুরের ফোর্ট ক্যানিং-এ কোঠা-ওয়ালার নিকটে তিনি প্রথম বিবৃতি দিয়েছিলেন।

১৯১৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ফোর্ট ক্যানিং-এ কোঠাওয়ালার নিকটে তাঁর দ্বিতীয় বিবৃতিও দিয়েছিলেন।

অবনীকে রায়ের প্রশ্রয়

১৯২০ সালে এম· এন· রায়ের সঙ্গে দেখা করার আগে অবনী মুখার্জি বার্লিনে পুরানো ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁদের নিকটে তিনি স্বীকার করেছেন যে সিঙ্গাপুরে তিনি স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি দিয়েছেন। এই বিবৃতি না দিলে তাঁর ও শিবপ্রসাদ গুপ্তের ফাঁসি হয়ে যেত। কেন ফাঁসি হতো তা অবনী কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারেননি। যে-লোক ধরা পড়তে না পড়তেই সব কথা ফাঁস করে দেন তাঁর আবার ফাঁসি কেন হবে? আর, শিবপ্রসাদ গুপ্তের সঙ্গে অবনীর কিসের সম্পর্ক? তিনি অবনীর সহযাত্রী ছিলেন না। বার্লিনের ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীরা এম· এন· রায়কে অবনী মুখার্জি সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, একথাও তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে অবনী সিঙ্গাপুরে স্বীকারোক্তি দিয়ে এসেছেন। তা সত্ত্বেও রায় অবনীকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। এ প্রশ্রয় যদি তিনি না দিতেন তা হলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে অবনী কিছুতেই স্থান পেতেন না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে একটা দলাদলির মনোভাব হতেই তিনি অবনীকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

অবনী মুখার্জি সিঙ্গাপুরে স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি দিয়ে এসেছেন একথা শোনার পরে তাঁর মনে কেন যে প্রশ্ন জাগল না তা বোঝা মুশ্‌কিল। যাঁদের বিরুদ্ধে অবনী বিবৃতি দিয়েছিলেন তাঁদের একজন,—ভগবান সিং-এর সঙ্গে এম· এন· রায়ের সেই সময়ে চীনে দেখা হয়েছিল। তিনি রাসবিহারী বসুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। রায় তাঁর সঙ্গে সাত দিন একত্রে জাহাজে ছিলেন। তিনি

আশাভঙ্গ হয়ে আমেরিকা ফিরে যাচ্ছিলেন। আশ্চর্য নয় যে এ আশাভঙ্গের কারণ ছিল অবনীর বিবৃতি। যে সব কথা রায় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন সে সব কথা হতেই তাঁর মনে অবনী সম্পর্কে প্রশ্ন উদয় হওয়া উচিত ছিল। এ সম্বন্ধে যে কৈফিয়ৎ তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় দিয়েছেন তা গণ্য করার মতো নয়।

হল্যাণ্ডেব বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কমিউনিস্ট নেতা কমরেড রুটগের্সের নামে একখানি পত্র নিয়ে **অবনী মুখার্জি ইন্দোনেশিয়া হতে পশ্চিম ইউরোপে এসেছিলেন।** পত্রের লেখক কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি না হলে তিনি কখনও রুটগের্সকে পত্র লিখতেন না। তিনি যে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন তা এই থেকেও বোঝা যায় যে তিনি অবনী মুখার্জিকে একখানি ডাচ্ পাসপোর্টও পাইয়ে দিয়েছিলেন। এই পাসপোর্টে অবনীর নাম ছিল ডক্টর আর. শাহীর। হল্যাণ্ডে কমরেডরা নিশ্চয় অবনীর পাসপোর্টের কথা জানতেন। কিন্তু তিনি একথা মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অন্য সব ভারতীয়ের নিকট হতে গোপন রেখেছিলেন। তিনি ভারতীয়দের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তিকে বলেছেন যে এক ভদ্রলোকের মালয় চাকর সেজে তিনি হল্যাণ্ডে এসেছেন। এম. এন. রায়কে তিনি বলেছেন যে জাহাজে স্টুয়ার্ডের চাকরী ক'রে তিনি হল্যাণ্ডে এসেছেন। কিন্তু তাঁর নামের সঙ্গে 'ডক্টর' কথাটা জোড়া আছে। 'ডক্টর' তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী। ১৯২০ সালে ইন্দোনেশিয়ার কোনো 'ডক্টর' কি মালয় চাকরের কিংবা স্টুয়ার্ডের কাজ করতেন? এখানে নলিনী গুপ্তের সঙ্গে অবনী মুখার্জির চমৎকার মিল আছে। নলিনীর নিকটে ব্রিটিশ পাসপোর্ট ছিল। সে পুলিসের নিকটে ছাড়া আর কাবুর নিকটে তা ব্যক্ত করেনি। আশ্চর্য এই যে পুলিসের ইনটেলিজেন্স বিভাগ তা সত্ত্বেও লিখেছে যে নলিনী গুপ্ত জাহাজে চাকরী ক'রে ভারতে এসেছিল। আর, ডক্টর শাহীর তাঁর ডাচ্ পাসপোর্ট ব্যবহার করেই ১৯২২ সালে ভারতে এসেছিলেন। আবার এই ডাচ্ পাসপোর্ট ব্যবহার করেই তিনি ১৯২৪ সালে জার্মানী ফিরে গিয়েছিলেন।

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি যে এশিয়ার সবচেয়ে পুরানো পার্টি একথা আমরা জানি। ১৯২০ সালের ২৩শে মে তারিখে এই পার্টি স্থাপিত হয়েছিল। আরও আগে হতে তুর্কিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল এবং তুর্কিস্তানও এশিয়ায় অবস্থিত। কিন্তু তুর্কিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল সোবিয়েৎ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির একটা সম্প্রসারণ মাত্র। তাই এশিয়ার প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি হওয়ার গৌরব ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিরই প্রাপ্য। শুধু কি তাই? সমগ্র এশিয়ার মধ্যে মার্কসবাদী আন্দোলনও সর্বপ্রথমে ইন্দোনেশিয়াতেই আরম্ভ হয়েছিল। এ ব্যাপারে পরোক্ষভাবেও এশিয়ার অন্য কোনো দেশের দাবী নেই। ওপরে আমি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতা রুটগের্সের নাম করেছি। ইন্দোনেশিয়া ভারত মহাসাগরের বুকে কয়েক হাজার দ্বীপের সমষ্টি। এটা সাম্রাজ্যবাদী ডাচের উপনিবেশ ছিল। এই শতাব্দীর শুরুতে চাকরী নিয়ে রুটগের্স ইন্দোনেশিয়ায় যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের কি ফল ইন্দোনেশিয়ায় ফলেছে! তারই প্রভাবে দেশে ফিরে এসেই তিনি সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। তাঁর মুখে ইন্দোনেশিয়ার শোচনীয় বিবরণ শুনে ১৯১৩ সালে একটি ব্যবসায়িক সমিতির চাকরী নিয়ে আর একজন ডাচ্ হল্যাণ্ড হতে সে দেশে গেলেন। **এই লোকটিই হচ্ছেন ইন্দোনেশিয়ায় মার্কসবাদী আন্দোলনের জনক। ১৯১৩ সালে তিনিই সে দেশে প্রথম মার্কসবাদী আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর নাম এইচ. জে. এফ. এম. স্নীব্‌লিয়েট।** (H. J. F. M.

Sneevliet)। তিনি ছিলেন ১৯০৯ সালে স্হাপিত ডাচ্ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির একজন সভ্য। ১৯১৮ সালে এই পার্টির নাম হয় হল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি (The Communist Party of Holland)। "ইন্দো-নেশিয়ান কমিউনিজম ঃ এ হিস্টরি" নামক ইংরেজি পুস্তকের লেখক আর্নল্ড সি· ব্রাকম্যান (Arnold C. Brackman) লিখেছেন ১৯৩৫ সালে হল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির নাম পরিবর্তিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি নেদারল্যাণ্ড্স (The Communist party Netherlands) হয়েছিল। তিনি বলছেন ইন্দো-নেশিয়াসহ সমস্ত ডাচ্ সাম্রাজ্যকে পার্টির ভিতরে আনার জন্যে নামের এই পরিবর্তন করা হয়েছিল।

১৯১৩ সালে স্নীব্লিয়েট উত্তর জাবার সেমারাং বন্দরে (পোর্টে) চাকরী নিয়ে এলেন। তাঁর উদ্দেশ্য তো মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রচার ছিলই, এসেই তিনি বুঝতে পারলেন যে ইন্দোনেশিয়া তাঁর কাজের পক্ষে একটি উর্বর ক্ষেত্র। সেখানে তিনি কিছু সংখ্যক ডাচ্ বামপন্থী সোশ্যালিস্টদের পেলেন যাঁরা ইন্দোনেশিয়ায় শোষণ ও শাসনের নগ্ন মূর্তি দেখে মার্কসবাদ প্রচারের জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। স্নীব্লিয়েট তাঁদের সঙ্গে একত্র হয়ে কাজ শুরু করলেন। ১৯১৪ সালে তিনি জে. এ· ব্রানড্স্টেডের১ (J. A. Brandsteder), এইচ· ডব্লিউ· ডেকের (H. W. Dekker), ও পি· বেরগ্সমা (P. Bergsma) এবং অন্যান্য বামপন্থী সোশ্যালিস্টদের একটি সংগঠন তৈয়ার করলেন। তার নাম তাঁরা দিলেন ইন্দোনেশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক এসো-সিয়েশন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এটাই ছিল প্রথম মার্কসবাদী সংগঠন। ১৯১৪ সালে "মুক্ত দুনিয়া" (The Free World) নাম দিয়ে তাঁরা একখানা কাগজও বা'র করলেন। ১৯১৭ সালে স্নীব্লিয়েট দু'জন ইন্দোনেশিয়াবাসীকে তাঁদের সংগঠনের ভিতরে আনলেন। তাঁদের মধ্যে সেমাউন ছিলেন শারেকাত ইস্লামের (শির্কাৎ-ই-ইস্লামের) সেমারাং অধ্যায়ের প্রধান নেতা। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন উদীয়মান সাংবাদিক দর্শনো। শারেকাত ইস্লামের সভ্য থেকেও এই দু'জন ইন্দোনেশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক এসোসিয়েশনের সভ্য হলেন। পশ্চিমের বিপ্লবী মার্কসবাদের সঙ্গে ইন্দোনেশীয় জনগণের সংযোগের প্রথম সেতু হলেন সেমাউন ও দর্শনো।

স্নীব্লিয়েটের কর্মধারা উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে যখন পৌঁছাতে লাগল তখন তা ডাচ্ পলিটিকাল ইন্টেলিজেন্স সার্বিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তার ফলে ১৯১৮ সালে স্নীব্লিয়েট ইন্দোনেশিয়া হতে বহিষ্কৃত হলেন, ১৯১৯ সালে বহিষ্কৃত হলেন ব্রানড্স্টেডের, ১৯২১ সালে বা'র্স্কে বহিষ্কৃত করা হলো, আর, ১৯২৩ সাল পর্যন্ত সমস্ত ডাচ্ বামপন্থী সোশ্যালিস্টকে ইন্দোনেশিয়া ছাড়তে হলো। ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেস গভীর গুরুত্বসহকারে স্নীব্লিয়েট লেনিনের কলোনিয়েল থিসিসের আলোচনা

১ ১৯২২-২৩ সালে Brandsteder আমস্টারডামে আমাদের পোস্টবক্স ছিলেন। তাঁর ঠিকানায় আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক চিঠিপত্রগুলি পাঠাতাম। তিনিও আমাদের পত্রাদি মাঝে মাঝে ডাকে দিতেন। আমার মনে পড়ে তখন আমরা A. J. Brandsteder লিখতাম। হতে পারে জে· এ· ব্রান্ড্স্টেডের ও এ· জে· ব্রান্ড্স্টেডের এক ব্যক্তি নন। (লেখক)

করেছিলেন। কলোনি সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল এবং তাঁর আলোচনায় লেনিন নিজেকে উপকৃতও মনে করেছিলেন। খুব আশ্চর্য হওয়ার কথা এই যে এই স্নীব্‌লিয়েটই পরে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল ছেড়ে দিয়ে ট্রট্‌স্কিপন্থী হয়েছিলেন। তখন তিনি লেখায় তাঁর কল্পিত মারিং (Marring) নামটি ব্যবহার করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে হিট্‌লার ফ্যাসিস্টরা যখন হল্যান্ড দখল করেছিল সেই সময়ে তারা স্নীব্‌লিয়েটকে গুলি ক'রে হত্যা করে।

অবনী মুখার্জি রুটগের্সের নামে ইন্দোনেশিয়ার কোনো কমিউনিস্টের নিকট হতে যে পত্র নিয়ে এসেছিলেন সেই পত্রকে রুটগের্স অনেক বেশী মূল্য দিয়েছিলেন। কি কারণে তিনি এ পত্রের এত বেশী মূল্য দিলেন তা বোঝাবার জন্যে এখানে আমি ইন্দোনেশিয়ার আন্দোলন সম্বন্ধে এত কথা বললাম।

অবনী মুখার্জির কাজ-কর্ম হতে আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর লোক পটাবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। সেই ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে তিনি বাটাভিয়ার (জাকার্তার) কমিউনিস্টদের নিকট হতে রুটগের্সের নামে শুধু একখানি পত্রই সংগ্রহ করেননি, তাঁদের মারফতে তিনি একখানি পাসপোর্টও জোগাড় করেছিলেন। ডক্টর আর শাহীর নামের এই পাসপোর্ট তাঁকে ১৯২৪ সালেও ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

১৯২০ সালে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় চেকা অবনী মুখার্জিকে গিরেফ্‌তার করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় বলে লেনিন তখন অবনী মুখার্জিকে গিরেফ্‌তার হতে দেননি। কিন্তু মুখার্জি যদি সেই দিনই চেকার পিটারের দ্বারা গিরেফ্‌তার হতেন তবে সম্ভবত দু'চার দিনের ভিতরেই তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে যেত। সিঙ্গাপুর হতে যে-ভীতি তাঁকে ভারতবর্ষে যাওয়ার চেষ্টা হ'তে বিরত করেছিল সেই ভীতিই আবার মস্কোতে জগদ্দল পাথর হয়ে তাঁর বুকের ভিতরটা চেপে ধরল। বিদেশ হতে পরিচয় পত্র এনে পেট্রোগ্রাড ও মস্কোর কয়েকটি বিপ্লব ও সোবিয়েৎ-বিরোধী অভিজাত পরিবারের সঙ্গে অবনী মুখার্জি দেখা করেছিলেন। এর কি প্রয়োজন ছিল তা তিনি কাউকে বোঝাতে পারেননি। সে-যাত্রা তাঁর জীবন বেঁচে গিয়েছিল বটে, কিন্তু চেকার রিপোর্টটা তাঁর নামীয় ফাইলে শামিল হয়েই থাকল।

কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়ার পরে অবনী মুখার্জিকে বাকুতে অধিষ্ঠিত প্রাচ্য দেশীয় জনগণের কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্যে পাঠানো হয়েছিল। ১৯২০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হ'তে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই অধিবেশন চলেছিল। বাকু হতে অবনী মুখার্জি তাশখন্দে এসে এম· এন· রায় ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে তাশকন্দে এম· এন· রায়ের উদ্যোগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম স্থাপিত হয়েছিল। অবনী মুখার্জি ও তাঁর রুশ স্ত্রী রোজা ফিটিং-গোফ্ পার্টির সংস্থাপক সভ্যদের মধ্যে ছিলেন।

১৯২১ সালে তাশকন্দের সব কিছু তুলে দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা ও ভারতীয় ছাত্ররা মস্কো চলে আসেন এবং মস্কোই তখন তাঁদের হেড কোয়ার্টার্সে পরিণত হয়। ইতোমধ্যে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের একটি দল জার্মানী হতে মস্কো পৌঁছে গিয়েছিলেন। গুলাম আম্বিয়া খান লুহানী ছিলেন চট্টোপাধ্যায়ের প্রবক্তা। ১৯১৫-১৬ সালে সিঙ্গাপুরে মিলিটারি ইন্‌টেলিজেন্সের নিকটে অবনী মুখার্জি যে স্বীকারোক্তি করেছিলেন সেকথা তিনি বার্লিনে এই ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের নিকটে স্বীকার

করেছিলেন। আমার বিশ্বাস, তাঁরা স্বাধীনভাবেও এ খবরটি পেয়ে গিয়েছিলেন। মস্কোতে মানবেন্দ্রনাথই ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাঁর আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়ে অবনী মুখার্জি যে মোড়লি শুরু করে দিয়েছিলেন সেটা ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের নিকটে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই তারা অবনী মুখার্জিকেই প্রথম আক্রমণের ভিতর দিয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে আক্রমণ করেছিলেন। চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী আগ্নেশ স্মেডলিকে মুখার্জি কি একটা কুৎসিত আক্রমণ করেছিলেন। তাতে চট্টোপাধ্যায় মুখার্জিকে মারতে যান। অন্যরা কোন রকমে থামিয়ে দেন। ন্যাশনালিস্টরা বলেন যে অবনী মুখার্জির সিঙ্গাপুরের বিবৃতির ফলে ভারতে অনেকে জেলে গেছেন। অনেকের ফাঁসিও হয়েছে। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস" (নূতন সংস্করণ, ১৯৫৩) হতেই মোটামুটি এ খবরগুলি নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও লিখেছেন ঃ

"এই সময়ে অবনী মুখোপাধ্যায়ের উৎপাতে বার্লিনাগত দল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সে তাহাদের বদনাম করিয়া বেড়াইত এবং আরও নানা রকমের উৎপাত করিত। এইরূপ করিয়াই সে পার্টি পলিটিক্স চালাইত। শেষে উত্যক্ত হইয়া চট্টোপাধ্যায়, লোহানী প্রভৃতি ভে, চে, কা'র (Ve, Che, Ka) কর্মকর্তা মোগিলস্কিকে এক দরখাস্ত পাঠাইতে চায় যে, অবনী মুখার্জি যে সকল কাজ করিতেছে, তাহাতে মনে হয় যেন সে একজন গোয়েন্দা (acting as if an agent-provocateur) সেইজন্য তাহাকে মস্কো হইতে সরাইয়া দেওয়া হউক। লেখক চট্টোপাধ্যায়ের বাক্যজালে বাধ্য হইয়া সেই দরখাস্তে সহি করেন। * * * ব্যাপারটা পরে বুঝিলাম, মুখোপাধ্যায় বিদেশীয় ডেলিগেট্‌দের কাছে বলিয়া বেড়াইতেন, বার্লিনের বৈপ্লবিকেরা জার্মান এজেন্ট। তাহারা জার্মান গবর্নমেন্টের পক্ষে কাজ করিত। তাহারা কমিউনিস্ট নহে'—ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, আরও অনেক রকমের খুনশুড়ি করিত।" (পৃষ্ঠা ২৮৪)

"দরখাস্ত পাঠাইতে চায়" নহে, সত্য সত্যই দরখাস্ত তাঁরা পাঠিয়েছিলেন এবং ডক্টর দত্ত যে ভাষায় দরখাস্ত পাঠানোর কথা বলেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী উগ্র ছিল তাঁদের ভাষা। এম· এন· রায় অবনীকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন যে কড়া নজরের ভিতরে অবনীকে মস্কোতে রেখে দেওয়া হোক। কিন্তু এই সংক্রান্ত কাগজপত্র অবনী মুখার্জির নামে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের মুহাফিজখানায় (আরকাইব্‌সে) নথিভুক্ত হয়ে ছিল। ১৯৩৭ সালে আরকাইব্‌সে অবনী মুখার্জির ফাইল হ'তে এই কাগজগুলি এবং আরও অনেক এই ধরনের কাগজপত্র নিশ্চয়ই ঘুমন্ত অবস্থা হ'তে মাথা তুলে থাকবে। ১৯৩৭ সালেই সোবিয়েৎ ইউনিয়নে অবনী মুখার্জির মৃত্যুদণ্ড হয়।

একটি কথা মনে রাখতে হবে যে **অবনী মুখার্জির সিঙ্গাপুর হতে পলায়ন মনকে চোখঠারা মাত্র।** সিঙ্গাপুরের মিলিটারি কর্তৃপক্ষ তাতে কোনো বাধা দেননি। তিনি প্যারোলে মুক্ত ছিলেন। সেই অবস্থায় জাবায় পালিয়ে যান। যদি আর্মি কর্তৃপক্ষের সাহায্যে তিনি ভারতে আসতেন তবে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তাঁর উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এই ভয় তাঁর মনে ছিল।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মানুষের চেহারা মনে রাখার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল। যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলামিশা করেছেন তাঁরা এই কথা ব'লে থাকেন। কিন্তু আমরা যারা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি, অথচ মিলামিশা করিনি, আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে ঘটনা ঘটার সময় তিনি মনে রাখতে পারতেন না। এই বিষয়ে পাটীগণিতের ওপরে তাঁর খুব অবজ্ঞা ছিল। তাঁর স্মৃতিকথার ৪৭৭ পৃষ্ঠায়

তিনি লিখেছেন : “I was surprised that Mukherjee had left Moscow just before the Third World Congress, and that he willingly agreed to stay away. I came to know the reason as soon I returned to Moscow” অর্থাৎ আমি শুনে স্তম্ভিত হলাম যে তৃতীয় বিশ্ব কংগ্রেসের আগেই মুখার্জি মস্কো ছেড়ে চলে গেছেন এবং তিনি ইচ্ছাপূর্বক সরে থাকতে রাজী হয়েছেন। মস্কো ফিরে আসা মাত্রই আমি কারণটা জেনেছিলাম। এর পরে রায় বলতে চেয়েছেন যে জার্মানী হতে ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীরা এসে পড়াতেই অবনী মুখার্জি সরে পড়েছিলেন। রায় তাশকন্দ হতে মস্কো ফেরার আগে ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীরা মস্কো পৌঁছেছিলেন একথা সত্য, কিন্তু অবনী মস্কো ফিরেছিলেন রায়ের পরে। ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের সঙ্গে অবনীর মস্কোতে দেখা হয়েছে। অবনীর ব্যবহারে উত্যক্ত হয়েই যে ন্যাশনালিস্টরা তাঁর বিরুদ্ধে চেকার নিকটে নালিশ করেছিলেন, একথা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন। রায়ও তাঁর স্মৃতিকথার ৪৯০ পৃষ্ঠায় একথার উল্লেখ করেছেন।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের তৃতীয় বিশ্ব কংগ্রেসের অধিবেশন ১৯২১ সালের ২২শে জুন হতে ১২ই জুলাই পর্যন্ত মস্কোতে বসেছিল। এর আগে কি ক'রে অবনী মস্কো হতে চলে যেতে পারেন? অবনীর নিকটে এই কংগ্রেসের ডেলিগেটের অনুজ্ঞা পত্র ছিল। তাতে লেখা ছিল যে অবনী এডভাইসরী ভোটের অধিকারী। এই অনুজ্ঞা পত্রে তারিখ দেওয়া ছিল ২১শে জুন, ১৯২১। ভারতের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর লেঃ কর্নেল কে' (Lt. Col. C. Kaye) অবনীর বিষয়ে তাঁর ওপরওয়ালার নিকটে মন্তব্য পেশ করতে গিয়ে লিখেছেন যে এই ডেলিগেট কার্ডের ফটো কপি তাঁর নিকটে আছে। ১৯২২ সালের শেষভাগে ভারতে এসে রায় ও আমাদের বিরুদ্ধে অবনী তাঁর এই অনুজ্ঞা পত্র ব্যবহার করেছিলেন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আহ্‌মদাবাদে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ষট্‌ত্রিংশত্তম অধিবেশন হয়েছিল। এই অধিবেশনের প্রতিনিধিগণের নামে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ইশ্‌তিহার বিতরিত হয়েছিল। তাতে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জির স্বাক্ষর ছিল। রায় লিখেছেন ইশ্‌তিহার-খানি মস্কোতে রচিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। নিশ্চয় তা তৃতীয় বিশ্ব কংগ্রেসের অধিবেশনের আগে রচিত ও মুদ্রিত হয়নি। রায়ের কথানুসারে তাঁর ইংরেজী পুস্তক India in Transition (ইণ্ডিয়া ইন্ ট্রানজিশন) মস্কোতে রচিত হয়েছিল। রায় লিখেছেন লেনিন তার পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন। পুস্তকখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপে। তৃতীয় বিশ্ব কংগ্রেসের পরেই পুস্তকখানি রচিত হয়েছিল। রায় বলেছেন সন্দেহের ছায়ায় বসে বসে (নিশ্চয় তৃতীয় কংগ্রেসের পরে মস্কোতে) অবনী মুখার্জির অলস দিনগুলি কাটছিল। রায় তাঁকে তাঁর পুস্তকের জন্যে পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহ ক'রে দিতে বলেন। পরম উৎসাহের সহিত অবনী এই কাজটি করেছিলেন। রায় বলেছেন সম্পূর্ণরূপে অবনীর সংগৃহীত মাল-মসলার ওপরে ভিত্তি করেই তিনি তাঁর পুস্তকের প্রথম অধ্যায়, “The Rise of the Bourgeoisie” (ধনিক শ্রেণীর অভ্যুদয়) লিখেছিলেন। কিন্তু এই পরিসংখ্যান ও তথ্যগুলি কোথা হ'তে সংগ্রহ করা হয়েছে তার কোনো উল্লেখ পুস্তকে নেই। এদিকে পুস্তকের মলাটে লিখে দেওয়া হলে “by M. N. Roy with the collaboration of Abani Mukherji' (অবনী মুখার্জির সহযোগিতায় এম. এন. রায় প্রণীত)। তিনি পরিসংখ্যান ও তথ্যের কোনো যাচাই না করেই বইখানি ছেপেছিলেন। পরে ধরা পড়ল যে অবনী

মুখার্জির সংগৃহীত পরিসংখ্যান ও তথ্যগুলি ভুলে ভরা। "ইণ্ডিয়া ইন্ ট্রানজিশনে"র ভূমিকার তারিখ দেওয়া হয়েছিল "মার্চ, ১৯২২"। যদি ধরেও নিই যে অবনী মুখার্জি কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের তৃতীয় বিশ্ব কংগ্রেসের 'ডেলিগেট ম্যানডেট' জাল করেছিলেন তবে তৃতীয় বিশ্ব কংগ্রেসের পরের ঘটনা-গুলির (আহ্‌মদাবাদ কংগ্রেসের ইশ্‌তিহার প্রকাশ ও "ইণ্ডিয়া ইন্ ট্রান্‌জি-শনে"র লেখা ইত্যাদি) সম্বন্ধে আমরা কি বলব? এই ঘটনাগুলি তো সত্যই ঘটেছিল। আমরা আরও দেখেছি যে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে এম. এন. রায় অবনী মুখার্জিকে সঙ্গে নিয়ে মস্কোর আফগান দূতাবাসে অসুস্থ রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে দেখতে গিয়েছিলেন।

১৯২৪ সালে ভারতবর্ষ হ'তে বার্লিনে ফিরে এসে অবনী মুখার্জি ব্রিটিশ লেবর গবর্নমেণ্টের প্রাইম মিনিস্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের নিকটে অতীতে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে স্ত্রী-পুত্রসহ ভারতে ফেরার অনুমতি চেয়ে একখানা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, যে কোনো প্রকারের মুচলিকায় তিনি সই করতে রাজী আছেন। সেই সময়ে তিনি জার্মান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এম. বের্গেরের (M. Berger) নিকটে এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি অবনীর দরখাস্তের সহিত ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের দফতরে দাখিল করা হয়েছিল। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তা ভারত গবর্নমেণ্টের নিকটে পাঠিয়েছিলেন। এখন এই সব কিছুই ভারতের ন্যাশনাল আরকাইব্‌সে সুরক্ষিত আছে। অবনীর সিঙ্গাপুরের স্বীকারোক্তি দু'টিও ন্যাশনাল আরকাইব্‌সে রয়েছে।

অবনীর এই বিবৃতিতে তিনি বলেছেন ঃ

". আমার লুকানো স্থান হতে ১৯২০ সালে আমি বা'র হয়ে আসি এবং রাশিয়ায় যাই। সেখানে আমি ভারতের প্রতিনিধিরূপে থার্ড ইন্‌টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দিই। আমি পুরো দু'বছর রাশিয়ায় বাস করেছি এবং সকল কংগ্রেস ও কনফারেন্সে যোগ দিয়েছি।" ("I lived in Russia for full two years and took parts in all the Congresses and Conferences.")

"কিন্তু ১৯২২ সালের প্রথম ভাগ হতে ইন্‌টারন্যাশনালের সহিত আমার নীতিগত পার্থক্য শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে ইন্‌টারন্যাশনাল একটি উপদলের বিন্যস্ত স্বার্থের নিকটে আত্মসমর্পণ করতে থাকে। নিজের মূল নীতি ত্যাগ ক'রে ইন্‌টারন্যাশনাল এই উপদলের নীতিকেই নিজের নীতি করে নেয়। এর ফলে তার এই তথাকথিত নীতিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় এবং নিজেদের বিক্রয় করতে রাজী না হওয়ায় আমি আলাদা হয়ে যাই। এই সময়ে ভারতে যাওয়ার উদ্দেশে আমি রাশিয়া ত্যাগ করি।" ["But from the first part of 1922 I began to differ with international in principle as it more and more **scumbed (succumbed?)** before the **vested interested** of a group rather Clik (Clique?) and replaced original principles for the interests of that body. Consequently due to my refusal to accept that so called principle and to sel ourselvs I was isolated and I left Russia to proceed to India."]

এভাবে অবনী মুখার্জি যখন বার্লিনে ফিরে গেলেন তখন বার্লিনের বাশিন্দা ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীরা আনন্দে বিহ্বল হয়ে তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন।

এই অবনীকেই তাঁরা মস্কোতে চেকার হাতে স'পে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে তো ছিল ১৯২১ সালের কথা। ১৯২২ সালে মানবেন্দ্রনাথ রায় অবনী মুখার্জির শত্রুতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। আর, রায় যদি অবনীর শত্রু হন তবে তিনি তো ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের মিত্র না হয়েই পারেন না। রায়ই হচ্ছেন নির্বাসিত ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের পথের কাঁটা। তাঁকে ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে উৎখাত করতে না পারলে কমিউনিস্ট ইন্‌টার-ন্যাশনালের নিকট হ'তে তাঁরা টাকা পেতে পারেন না। নির্বাসিত বিপ্লবীদের টাকা একান্তভাবেই চাই। তাঁরাই হলেন আদি ও অকৃত্রিম বিপ্লবী। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়তে হয় তাঁরাই গড়বেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর পুস্তকের ৩০২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ "যাঁহারা মস্কোতে নিজেদের কম্যুনিস্ট মতাবলম্বী বলিয়াছিলেন, তাঁহারা একত্রিত হইয়া একটি কম্যুনিস্ট পার্টি স্থাপন করেন। ইহার সভ্য হইয়াছিলেন লেখক, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, আবদুল ওয়াহেদ, সুরেন্দ্রনাথ কর এবং ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ"। কেউ জানেন না বার্লিনের এই কমিউনিস্ট পার্টি কোথায় গেল এবং এই পার্টির সভ্যরা ভারতে এসে কমিউনিস্ট আন্দোলনে কি কাজ করেছিলেন।

১৯২২ সালের কোনও সময়ে বারাকতুল্লাহ্‌ বার্লিনে এলেন। তিনি নির্বাসিত বিপ্লবীদের নিয়ে একটি পার্টি গঠন করার চেষ্টা শুরু করলেন। এই সময়ে এম· এন· রায় বার্লিনে ছিলেন। আমরা ব্রিটিশ ইন্‌টেলিজেন্স রিপোর্ট হতে জানতে পাই যে রায় এই সময়ে বারাকতুল্লার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে নিজের সঙ্গে আনতে পারলেন না। তিনি ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের সহযোগে "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স পার্টি" স্থাপিত হলো ব'লে ঘোষণা প্রকাশ করে দিলেন। তার মানে, আমাদের কাগজের নামের তিন ভাগের দু'ভাগ অংশ তাঁরা আত্মসাৎ ক'রে নিলেন। সকলেই জানেন আমাদের কাগজের নাম ছিল "ভ্যানগার্ড অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স"। ভারতে পুলিসের নজর অন্যদিকে ফেরাবার জন্যে আমরা সাময়িকভাবে "এড্‌ভান্স গার্ড" নামটি তখন ব্যবহার করছিলেম। এই সুযোগ পেয়েই তারা 'পাইরেসি'র (আত্মসাৎকরণের) কাজটা ক'রে নিলেন। বারাকতুল্লার সঙ্গে চিচারিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি আশা করেছিলেন চিচারিনের মারফতে ভারতের কাজের জন্যে তিনি কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের নিকট হতে কিছু টাকা আদায় ক'রে নিবেন। কিন্তু চিচারিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে তিনি নাকি বলেছিলেন যে চট্টোপাধ্যায়কে পার্টি হতে বাদ দিলে তিনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এই তথ্যটিও ব্রিটিশ ইন্‌টেলিজেন্সের রিপোর্ট হতে নেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য মনে হওয়ায় এখানে উল্লেখ করলাম। চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের দফ্‌তরের ফাইলটি ক্রমশই স্ফীত হচ্ছিল।

অবনী মুখার্জি বার্লিনে এসেই "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স পার্টি"তে যোগ দিলেন। ভারতের ভিতরে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের যে-সব লোকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল তাঁদের সকলের ঠিকানা তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। বার্লিনে এসে তিনি সম্ভবত তাঁদের প্রত্যেককেই চিঠিপত্র লিখতে লাগলেন। আমি প্রতি ডাকেই (তখনকার দিনে সপ্তাহে একবার মাত্র বিদেশী ডাক আসত) কখনো বাঙলায় লেখা, কখনো বা ইংরাজিতে লেখা তাঁর পত্র পেতে লাগলাম। কিছু কিছু সাহিত্যও, এমন কি এনার্কো সিণ্ডিকালিস্টদের কাগজ পর্যন্ত তিনি পাঠালেন। কোনো পত্রে এম· এন· রায়কে আক্রমণ করতেন না। আমি বুঝতে পারছিলেম না ব্যাপারটি কি? এই জন্যে পত্রগুলি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ

করছিলেম। ইতোমধ্যে আমি এম· এন· রায়ের পত্র পেয়ে গেলাম। তিনি আমাদের অবনী মুখার্জি সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন, লিখেছেন, অবনী মুখার্জি পার্টি হতে, অতএব কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের 'র‍্যাংক' (rank) হতে বহিষ্কৃত। অবনী আমাদের কাজ ভণ্ডুল করার জন্যে ভারতেও আসতে পারেন। এটা ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা।

অবনী মুখার্জির ভারতে আগমন

১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসের কোন এক রাত্রিবেলা আবদুর রজ্জাক খান যখন আমার নিকট হ'তে সে-রাত্রির জন্যে বিদায় নিচ্ছিলেন তখন তিনি আমায় জানালেন যে পরের রাত্রে আমায় একজনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। কে তিনি জানতে চাইলে খান সাহেব জানালেন যে তিনি বাঙালী, তবে এসেছেন রাশিয়া হতে। তখনই আমার এম· এন· রায়ের পত্রের কথা মনে পড়ল। আমি তাঁর নাম জানতে চাইলাম। খান সাহেব বললেন, তাঁর নাম অবনী মুখার্জি। সেই মুহূর্তেই আমি খান সাহেবকে জানিয়ে দিলাম যে অবনী মুখার্জির সঙ্গে আমি কিছুতেই দেখা করব না। আমি খবর পেয়েছি যে তিনি পার্টি হতে বহিষ্কৃত হয়েছেন। খান সাহেবকেও আমি অনুরোধ করলাম, আপনিও ওই লোকের সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখবেন না। তিনি আমাদের আন্দোলনের ক্ষতি করতে এসেছেন। খান সাহেব আমাকে বললেন, তিনি অবনী মুখার্জিকে তাঁর মামাদের একটি খালি বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে অবনীর কিছু কথাবার্তাও হয়েছে। বললেন, "অবনী একান্ত ভাবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। যখন তিনি শুনলেন যে আমি আপনার সহকর্মী তখন উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি ব'লে উঠেছিলেন, 'তবে তো আমি ঠিক জায়গাতেই এসেছি'।" খান সাহেব আমায় বললেন, "এখন তো দেখছি তাঁকে হতাশই হতে হবে"।

পরের রাত্রে খান সাহেব অবনী মুখার্জিকে জানিয়ে দিলেন যে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব না। আমি খবর পেয়েছি যে তিনি পার্টি হতে বহিষ্কৃত। শোনা মাত্রই অবনী মুখার্জি ক্রোধ ও উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, "আমি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে দেখে নেব"। এটা অবশ্য আমার আবদুর রজ্জাক খানের মুখে শোনা কথা।

আবদুর রজ্জাক খানের সঙ্গে অবনী মুখার্জির সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল সন্তোষকুমার মিত্রের মারফতে।

খান সাহেবের মারফতে অবনী যে আমায় "দেখে নিবেন" ব'লে শাসিয়েছিলেন তার সঙ্গে সংসৃষ্ট একটি ঘটনার কথা এখন আমি বলছি।

১৯২২ সালের শেষ ভাগে এবং ১৯২৩ সালের শুরুর দিকে অর্থাভাবের জন্যে আমার কোনো ভাড়াকরা থাকার ঘর ছিল না। আবদুল হালীমেরও ওই অবস্থাই হয়েছিল। আমি তাই হালীমকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদনী ইলাকায় ৩, গুমঘর লেনে আমার ছাত্রদের বাড়ীর বসবার ঘরে রাত্রে শুতে যেতাম। সেখান থেকে একদিন খুব সকালে উঠে পায়ে হেঁটে আমি নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোডে আবদুর রজ্জাক খানের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম তিনি তখনও ঘুমুচ্ছেন। আমি তাঁকে জাগালাম। চোখ খুলে আমায় তাঁর বিছানায় বসা দেখতে পেয়ে তিনি বালিশের তলা হতে কিছু কাগজ বার করে আমার হাতে দিলেন, আর বললেন, "দেখুন তো সন্তোষ (সন্তোষকুমার মিত্র) কি দিয়ে গেল"। একথা

বলেই তিনি মুখ ধুতে চলে গেলেন। তখন দিনের আলো খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি জানালার ধারে গিয়ে কাগজটার ওপরে একবার চোখ বুলালাম। দেখলাম ইংরেজি ভাষায় পেন্সিলে লেখা একটি মুসাবিদা। আমাদের জবর কোষ্ঠীকাটা হয়েছে তাতে। **বুঝে নিতে কষ্ট হলো না যে অবনী মুখার্জি সত্যই আমায় দেখে নিচ্ছেন।** এর মধ্যে খান সাহেব মুখ ধুয়ে ফিরে এসে বললেন, "চারটা কিংবা সাড়ে চারটার সময় সন্তোষ মিত্র এসে আমায় এই মুসাবিদা ও কিছু উপদেশ দিয়ে গেছে। বলেছে আমি যেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফৎ কমিটির বেশ কয়েকখানা ছাপানো লেটার পেপার চুরি করি, ও পত্রের মুসাবিদাখানা তাতে টাইপ করাই এবং মুসাবিদায় দেওয়া বিদেশের বিভিন্ন ঠিকানায় চিঠিগুলি যেন আমি পাঠিয়েও দিই"। আমার সঙ্গে যে আব্দুর রজ্জাক খানের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা আছে একথা সন্তোষ মিত্র জানতেন। অন্তত, শিশির কুমার ঘোষের নিকট হতে তা শুনেছিলেন তিনি। আমি যে অবনী মুখার্জির সঙ্গে দেখা করতে রাজী হইনি একথাও তিনি শুনেছেন। কারণ, তিনি তো খান সাহেবের সঙ্গে অবনীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে অবশ্য সন্তোষকুমার মিত্রের তখনও ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। অবনী মুখার্জির সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে জালিয়াতির ষড়যন্ত্র তিনি অবাধে করতে পারতেন। মনে করেছিলেন তাতেই তাঁর লাভ বেশী হবে। কিন্তু কোন সাহসে তিনি এমন একটা জঘন্য জালিয়াতি কাজের সাথী আবদুর রজ্জাক খানকে করতে যাচ্ছিলেন তা আমি কখনও বুঝতে পারিনি। তাদের এই ষড়যন্ত্র তো ব্যক্তি মুজফ্ফর আহ্মদের বিরুদ্ধে ছিল না। ছিল আমরা যে ছোট্ট আন্দোলনটি গড়ছিলাম তার বিরুদ্ধেও। এবং আবদুর রজ্জাক খান ছিলেন আমাদের আন্দোলনের একজন সংগঠক। আমি খান সাহেবকে বললাম, পেন্সিলের লেখা ভালো করে পড়তে পারছিনে। এটা আমি এখন নিয়ে যাই, পাঠোদ্ধার ক'রে আপনাকে ফেরৎ দেব। তিনি নিয়ে যেতে আপত্তি করেননি, আবার ফিরিয়ে দেওয়ার কথাতেও কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেননি। বলতে তো পারতেন আর ফেরৎ দিয়ে কি হবে? আমি কাগজটা ফেরৎ দেব বলেছিলেম বটে, কিন্তু আমার মনের ত্রিসীমানায়ও ফেরৎ দেওয়ার কোনও বাসনা ছিল না।

অবনী মুখার্জির মুসাবিদাটি পকেটে নিয়ে আমি সেই জায়গায় গেলাম যে-জায়গায় তাঁর আমাকে লিখিত পত্রগুলি আমি রেখেছিলাম। সেখান থেকে পত্রগুলি নিয়ে আমি আমার ছাত্রদের বাড়ীর বৈঠকখানায় গেলাম সেখানে দিনের বেলায় কেউ থাকতেন না। আমি মুসাবিদার লেখা ও অবনীর আগেকার লেখা চিঠিগুলির লেখা মিলিয়ে দেখলাম। আমার মনে এতটুকুও সন্দেহ থাকল না যে সব লেখা একই হাতের। সেই মুহূর্তেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে অবনীর নিজ হাতের মুসাবিদাটি বিদেশে পাঠিয়ে দেব। সেই দিনই পাঠিয়েছিলাম কিনা আমার মনে নেই, ১৯২৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে পাঠিয়েছিলেম। এই মুসাবিদার একই খামে পুরে আমি এম· এন· রায়কে বাঙলায় যে পত্র লিখেছিলেম তাতে তারিখ দেওয়া আছে "কলকাতা, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩"। খুব সম্ভবত সেদিন বিদেশী ডাক পাঠানোর তারিখ ছিল। সপ্তাহে একদিন যেমন বিদেশের ডাক আসত, তেমনই বিদেশের ডাক যেতও সপ্তাহে একদিন। আমার পাঠানো খামটি বোম্বের ফরেন্ পোস্ট আফিসে খোলা হয়েছিল। তাঁরা আমার পত্রের ও অবনীর মুসাবিদার ফটোস্টাট কপি রেখে খামটি বন্ধ করে বিদেশে যেতে দিয়েছিলেন। সেই খাম জার্মানীতে এম· এন· রায়ের হাতে পৌঁছেছিল। ফটোস্টাট কপিগুলি কানপুর কমিউনিস্ট (ভারত সরকারের ভাষায় "বলশেভিক") ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায়

আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে দাখিল করা হয়েছিল। আমার বাঙলা পত্রখানি ইংরেজি তর্জমা করেছিলেন কলকাতার বেঙ্গলী ট্রান্সলেটারের আফিসের শ্রীকুঞ্জবিহারী রায়। এই মোকদ্দমার পেপার বুক হতে নিয়ে আমি এই দুটি দলীল এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম।

Ex. 18.
Letter signed M. D. (Mahtab Deen)
Muzaffar to Roy

Calcutta
1st February, 1923

My dear Friend,

Perhaps you are aware that Mr. Abani Mukherji has come to India and is at present staying in Calcutta. It seems from his activities that he has come here with the obvious object of making some mischiefs. He wants to discredit you in India and that is in a very mean and shameful way. Here is a draft letter in Mr. Mukherji's own handwriting. I have captured it somehow or other. This was given to a gentleman to have it typed on the printed letter paper of the Bengal Provincial Khilafat Committee without the knowledge of the authority. He may do many such mischiefs and it is not possible that every such case will come to my notice. As to the items of the letter most of them are known to you except that of Mr. Muhammad Daud, the General Secretary of the Indian Seamen's Union, Calcutta, not the president of the Calcutta Seamen's Union as said by Mr. Mukerji. Mr. Daud comes of a rich family. His family is exploiting the poor weavers of Shantipur. This I think his disqualification to be a member of our party. But to tell the truth he is not Government agent. Of course he may accept a big government post when offered as many a Indian leader of his class do.

Ex. 18 A
(Enclosure of Muzaffar's letter to M. N. Roy)
To
Comrade Zinowief[১]
Chairman, Executive Committee,
the III International,
Through Comrade Brandler, Girme...Berlin 2.
Dear Comrade,

The message of the III International has reached us here inspite of all isolations. It has brought a new peasants besides

১ অবনী জিনোভিয়েফের বানান এখানে জার্মান ধরনে করেছেন।

it has considerably strengthened the instinctive feeling of solidarity of the labouring and hope amongst the conscious Circles of the Indian Labour and peasant masses who begins to feel that if they want to live they must organise themselves for the goal and that to effect this International solidarity is absolutely necessary. The shameless way in which N. C. O. and civil disobedience movements made us victim in the hands of our opponent classes have done a great deal in opening our eyes. Over all we have realized that T. U. as it has become a new means of oppression instead of safeguarding our economic interest. In all actuality it has become a concord of swindlers, spies and agents of Capitalists.

The situation being so we the labour and peasant bodies in the Khalifat and Congress movements together with the good elements in the Trade Unions have decided to organise a mass party in the lines of the III International. Our foreign rulers being alert to this possibility, the work before us has become a difficult one, but all the same we are sure of success and hope to come before the world in a short period.

In the meantime we see that a certain number of unscrupulas swindlers and Government agents anticipating the great deal of money could be had from your sources have gone and are going there with various forged documents as if they are representatives of organizations in reality which does not exist. This adventure is ruinous to our cause and as there are many spies amongst them we are afraid that if this is not stopped our attempts might get spoiled in the very start. To materialise this we send you herewith a list of men with a short sketch of what they are, request you to warn all concerncd against them. We are on the move of collecting further documents about them and hope to send you with a proper delegation by the 5th Congress.

1. **Nalini Gupta :** He came here last with the very purpose of getting some persons to make a so called organisation that some money could be got out of you. In our opinion he is a terrible mercinary.

2. **Mozaffar Ahmad :** Nalini Gupta's agent in Calcutta. A letter has come to Mozaffar that his presence is necessary in

Europe to get that money and his passage money has been sent from there.

3. **J. Mittra.** He is going with various credentials; all are false but one that is from the Calcutta Seamen's Union. Mozaffar has no connection with this union, but as Mr. Daud Khan; President of the said Union is a party in the swindle so he has managed to get it.

4. **J. N. Mittra** : A relative of compatriot of Gupta, he has already gone to Berlin and it is a wonder to us how Mr. M, N. Roy and interests could trust such one.

5. **Srihrith (Suhrit) Roy** : The manager of all works undertaken by Mr. M. N. Roy. Subrith (Suhrit)..........Afterwards he has been sent to Europe by the Government to spy on our movements.

6. **Bhattachariar (Ram Battacharya)** : He is a friend of Subrit (Suhrit) and we have good reason for suspecting him as well to be a spy.

7. **Daud Khan** : President, Calcutta Seamen's Union. An agent of the Government to control the revolutionary seamen.

8. **T. N. Roy** : A master swindler, recently received a good sum of money from M. N. Roy. He poses as a peasant organizer but all of it is humbug. It is a fact that his brother did do some work among the Bengal peasantry but on his death that organization has been liquidated. At present he is also a party of the swindling concern that has been organized by Gupta.

We also want to bring one thing to your notice that it is questionable why Mr. M. N. Roy whom you have appointed to organize India, associates with these swindlers and spies and refuses to have anything to do with the revolutionaries that want to come in touch or work with him.

1. Letter address on the Cover :—
   H. Brandler,
   Rosenthalin Strasse 38, Berlin inside enclose two copies one for Zinovief and the other written on the top copy for the German Party.

2. Address on the Cover :—
   R, Tretbar
   Reuter St. 84 IV
   enclose two copies with a request to send them to Brandler.
3. Address on the Cover :—
   W. Munzinber,
   Unterden Linden II, Berlin
   enclose like above 2 copies.
4. Com Krenyt.
   Unterden Linden II, Berlin enclose like above 2 copies.
5. H. Khan
   C/O Friza Hansa ufer 8 Berlin
   enclosed like above 2 copies.

ওপরে দেওয়া ঠিকানাগুলিতে অবনী মুখার্জি তাঁর জাল চিঠির প্রতিলিপি পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে তখনকার দিনে কংগ্রেস কমিটি ও খিলাফৎ কমিটি বহির্বিশ্বের নিকটে সমমর্যাদাসম্পন্ন ছিল।

(Copy)

2, October, 1922,

To

THE CENTRAL COMMITTEE OF THE
BRITISH COMMUNIST PARTY

Dear Comrades,

It has been brought to the notice of the E. C. C. I. that Abani Mukherji who was formerly working in the E. C. C. I. and is now in Berlin, is engaged in spreading all sorts of compromising stories against comrades M. N. Roy and Evelyn Roy. He is also, in the name of the Comintern, attempting to secure the aid of some other organizations to asist him to carry on Indian work.

We hereby inform you that Mukherji has no connection with the comintern whatsoever. We have absolutely no confidence in him, and therefore we earnestly request you not to have any dealings with him. We refute his insinuations against Comrades Roy.

Com. M. N. Roy is the only person authorised by the Comintern to Indian Work.

As the E. C. C. I. is now investigating the activities of Mukherji, we ask you, to send us all information you have in this matter.

This being a secret document, we request you to confide only in those comrades who are directly affected with this question.

With Communist greetings.

General Secretary
(signed) KUUSINEN

Ex. 16.

[Letter warning members against Abani Mukerji, signed "KOLAROV" on behalf of Communist International.]

(COPIE)

The Executive committee of Communist International hereby notifies all its national sections as well as all other parties, groups and individuals concerned, that reports have been received to the effect that one Abani Mukherji who attended the II Congress of the Communist International and sometime worked as a member of the Indian Communist Group, has been engaged in activities which make serious reflection upon his political honesty. In view of this fact it is quite impossible for him to remain in the ranks of the Communist International.

On October 2, 1922[১], the Communist parties of Great Britain, Germany and Italy were first warned of reprehensible activities of Abani Mukherji. More facts received since then obliged the Executive Committee to declare once again its lack of confidence in Mukerji, who has absolutely no connection with nor does he hold any mandate whatsoever either from the Communist International or from the red International of Labour Unions.

The Labour Unions, political parties and other revolutionary groups in India are particularly warned against the activities of

[১] Ex 34 B (Session Court) (Sd.) H. E. H. 23. 4. '24

Mukerji, as they are the most directly concerned and are likely to be most injured.

The national sections are requested not to have any connection with Mukerji, to take this circular together with the previous one dated October 2, 1922 as guidance in the matter and to confirm the receipt of the present.

International
Comit
Enl. J. Jt
communiste

(sd.) W. Colarov.

বাঙলা তর্জমা

এক্‌জিবিট ১৮

এম· ডি· (মাহ্‌তাবদীন) স্বাক্ষরিত
রায়কে লেখা মুজফ্‌ফরের পত্র

কলকাতা
১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩

প্রিয় বন্ধু,

হয়তো আপনি জানেন যে মিস্টার অবনী মুখার্জি ভারতে এসেছেন এবং এখন কলকাতায় আছেন। তাঁর কাজ-কর্ম হ'তে এটা মনে হচ্ছে যে তিনি খোলা-খুলি কিছু কুমতলব নিয়েই এদেশে এসেছেন। তিনি নীচ ও নির্লজ্জভাবে আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চান। এই সঙ্গে মিস্টার অবনী মুখার্জির নিজের হাতের লেখা একখানি পত্রের মুসাবিদা আপনাকে পাঠাচ্ছি। কোনো প্রকারে আমি এখানা হস্তগত করেছি। এই মুসাবিদা একজন ভদ্রলোককে এই উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল যে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফৎ কমিটির ছাপানো চিঠির কাগজে তা টাইপ করাবেন এবং কমিটিকে না জানিয়েই তা করাবেন। তিনি এমন আরও অনেক অপকার্য করতে পারেন। এটা সম্ভব নয় যে সবটা আমার নজরে পড়বে। পত্রে যাঁদের কথা লেখা হয়েছে মিস্টার মুহম্মদ দাউদ ছাড়া আর সকলের বিষয় আপনি জানেন। তিনি ইণ্ডিয়ান সিমেন্স ইউনিয়নের জেনেরেল সেক্রেটারি, প্রেসিডেণ্ট নন। মিস্টার দাউদ ধনী পরিবারের লোক। তাঁর পরিবার শান্তিপুরের তাঁতীদের শোষণ করেন। আমি মনে করি আমাদের পার্টি সভ্য হওয়ার পক্ষে এ জন্যে তিনি অযোগ্য। সত্য কথা বলতে গেলে তিনি সরকারের এজেণ্ট নন। তবে, একটি বড় সরকারী চাকরী তাঁকে দিলে তিনি তা গ্রহণ করবেন, যেমন তাঁর শ্রেণীর অনেক ভারতীয় নেতাই তা করে থাকেন।

[আমার বাঙলায় লেখা মূলপত্রের ফটো কপিই শুধু আদালতে দাখিল করা হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্টের জজদের পড়ার জন্যে পেপারবুক শুধু ইংরেজিতেই ছাপা হয়েছে। এখানে আমি অনুবাদের অনুবাদ করেছি। অবনীর জালপত্রে একটি জে· মিত্র নাম আছে। আমি রায়কে লিখেছি যে তিনি দাউদ সাহেবকে ছাড়া আর সকলের কথা জানেন। কিন্তু আশ্চর্য যে আমি জে· মিত্র কে তা এখন মনে করতে পারছিনে। যতীন মিত্র নামে এক ভদ্রলোক ট্রেড ইউনিয়নে ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো আমাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না।]

এক্‌জিবিট ১৮-এ

(এম· এন· রায়কে লেখা মুজফ্‌ফরের পত্রের সংলগ্নিকা)

কমরেড জিনোভিয়েফ

চেয়ারম্যান, এক্‌জেকিউটিব কমিটি,
থার্ড ইন্‌টারন্যাশনাল,

কমরেড ব্রাণ্ডলেরের মারফতে,
জিরমে.........২
বার্লিন

প্রিয় কমরেড,

আমাদের সর্বপ্রকার বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বাণী আমাদের এখানে পৌঁছেছে। এই বাণী নূতন নূতন কৃষকদের আমাদের দিকে আকর্ষণ করেছে। তা ছাড়া, এ বাণী শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে ঐক্যবন্ধ হওয়ার স্বাভাবিক মনোভাবকে বাড়িয়েছে। কৃষকসাধারণের মনেও তা আশার সঞ্চার করেছে। তাঁরা অনুভব করতে আরম্ভ করেছেন যে বাঁচতে হলে তাঁদের সংঘবন্ধ হতে হবে এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে তাঁদের পক্ষে আন্তর্জাতিক ঐক্যবন্ধতা একান্ত প্রয়োজন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন যেরূপ নির্লজ্জভাবে বিরুদ্ধ শ্রেণীগুলির শিকারে আমাদের পরিণত করেছে তাতে আমাদের চোখ খুলে গেছে। তার ওপরে, আমরা বুঝেছি যে ট্রেড ইউনিয়ন যে ভাবে গঠিত হয়েছে তাতে তা আমাদের আর্থিক স্বার্থের সংরক্ষণ না ক'রে আমাদের ওপরে অত্যাচারের একটি উপায় স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে প্রবঞ্চক ও ধনিকগণের গুপ্তচর ও দালালের (agents) সমন্বয়।

অবস্থা যখন এই তখন খালিফাৎ[১] ও কংগ্রেস আন্দোলনের ভিতরে আমরা যে-সব মজুর ও কৃষক সংগঠনগুলি রয়েছি, আর ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভিতরে যে-সব সৎ লোকেরা আছেন,—সবাই মিলে আমরা স্থির করেছি যে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুসরণে একটি জনগণের পার্টি গড়ে তুলব। এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের বিদেশী শাসকেরা সজাগ। আমাদের কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। এসব সত্ত্বেও আমাদের সাফল্যলাভ সুনিশ্চিত। অল্প সময়ের ভিতরেই আমরা জগতের সামনে নিজেদের জাহির করব।

ইতোমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু সংখ্যক অসৎ, প্রতারক ও গবর্নমেণ্টের চর ভেবেছে যে আপনাদের উৎস হতে প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে। এই ভেবেই তাদের কিছু লোক আপনাদের ওদেশে গেছে এবং এখনও যাচ্ছে। বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরূপে পরিচয় দেওয়ার জন্যে তাঁরা জাল দলীল বানিয়ে নিয়ে গেছে। আসলে সে সব সংগঠনই নেই। এই দুঃসাহসিকতা আমাদের কাজের সর্বনাশ করবে। এদের ভিতরে গুপ্তচর রয়েছে। আমাদের ভয় হচ্ছে যে এটা এখনই বন্ধ না করলে আমাদের প্রচেষ্টা শুরুতেই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। এই বন্ধ করাটা কাজে পরিণত করার জন্য আমরা এসব লোকের নামের একটি তালিকা তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আমাদের অনুরোধ, এদের

১ খিলাফৎ কমিটির তরফ হতে পত্র লেখা হচ্ছে অথচ খিলাফৎকে কিনা বলা হচ্ছে খালিফাৎ।

সম্বন্ধে সকলকে সাবধান ক'রে দিবেন। আমরা তাদের সম্বন্ধে আরও দলীল সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। এবং আশা করি যে পঞ্চম কংগ্রেসের প্রকৃত প্রতিনিধি-দলের সঙ্গে সে সব পাঠাতে পারব।

(১) **নলিনী গুপ্ত** : গতবারে সে এখানে কিছু লোক জড় ক'রে একটি তথাকথিত সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এসেছিল যাতে আপনাদের নিকট হতে কিছু টাকা বা'র করতে পারে। আমাদের মতে নলিনী গুপ্ত একজন বিপজ্জনক ভাড়ায় খাটার লোক।

(২) **মোজাফ্ফর আহ্মদ** : নলিনী গুপ্তের কলকাতার এজেন্ট। মোজাফ্ফরের নামে একখানা পত্র এসেছে যে টাকা আনার জন্যে ইউরোপে তার উপস্থিতি প্রয়োজন। তার রাহা খরচের বাবতে ইউরোপ হতে টাকা পাঠানো হয়েছে।

(৩) **জে· মিত্র** : সে কয়েকটি পরিচয় পত্র নিয়ে যাচ্ছে ; কলকাতা সিমেন্স ইউনিয়নের পরিচয় পত্র ছাড়া আর সব ক'খানা পরিচয় পত্রই মিথ্যা। এই ইউনিয়নের সঙ্গে মোজাফ্ফরের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে, এই ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মিস্টার দাউদ খান প্রতারণার সহযোগী হওয়ার কারণে মোজাফ্ফর এই পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা করতে পেরেছে।

(৪) **জে· এন· মিত্র** : গুপ্তের একজন দেশের লোকের আত্মীয়। সে আগেই বার্লিনে পেঁৗছে গেছে। আমাদের নিকটে এটা খুবই আশ্চর্য ঠেকছে যে কি ক'রে মিস্টার এম· এন· রায় ও স্বার্থসমূহ (intersts)১ এই রকম একজন লোকের ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন।

(৫) **সুহৃথ [সুহৃৎ] রায়** : রায় যে সব কাজ গ্রহণ করেছেন সে সব কাজের ম্যানেজার। সুবৃথ (সুহৃৎ) । আমাদের গতিবিধির ওপরে নজর রাখার জন্যে পরে গবর্নমেণ্ট তাকে ইউরোপে পাঠিয়েছেন।

(৬) **রাম ভট্টাচার্য** : সে সুহৃদের বন্ধু এবং আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে সেও একজন গুপ্তচর।

(৭) **দাউদ খান** : ক্যালকাটা সিমেন্স ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট বিপ্লবী নাবিকদিগকে আয়ত্তে রাখার জন্যে গবর্নমেণ্টের একজন এজেন্ট।

(৮) **টি· এন· রায়** : মোড়ল প্রতারক। সম্প্রতি এম· এন· বায়ের নিকট হতে একটি মোটা অঙ্কের টাকা পেয়েছেন। তিনি নিজেকে একজন কৃষক সংগঠক মনে করেন। কিন্তু এসব তাঁর ছলনা। এটা সত্য যে তাঁর ভ্রাতা বাঙলা দেশের কৃষকদের ভিতরে কিছু সাংগঠনিক কাজ করেছিলেন, তবে তাঁর মৃত্যুর পরে সে সংগঠন উঠে গেছে। গুপ্ত যে একটি প্রতারক সংস্থা গঠন করেছে টি· এন· রায়ও বর্তমানে তার অন্তর্ভুক্ত।

আপনাদের গোচরে আমরা আরও একটি কথা আনতে চাই। আপনারা এম· এন· রায়কে ভারতে সংগঠক নিযুক্ত করেছেন। এটা সন্দেহজনক ব্যাপার যে তিনি কিনা যোগাযোগ রাখছেন এই সকল প্রতারক ও গুপ্তচরদের সঙ্গে। যে সকল বিপ্লবী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ও কাজ করতে চান তিনি তাঁদের এড়িয়ে চলেন।

১ এখানে অর্থ বোধগম্য নয়।

এখানে পাঁচটি ঠিকানা আছে ওপরে ইংরেজিতে ঠিকানাগুলি দেওয়া হয়েছে ব'লে বাঙলায় সেগুলি আর দেওয়া হলো না।

অবনী মুখার্জির ইংরেজি লেখা স্থানে স্থানে বোধগম্য নয়। এ জন্যে বাঙলা তর্জমা করা কঠিন। আশ্চর্য নয় যে তর্জমাও স্থানে স্থানে অবোধ্য হয়ে থাকবে।

এক্‌জিবিট ১৬

[অবনী মুখার্জির বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে সভ্যদের নামে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের তরফ হতে ডব্লিউ কোলারবের স্বাক্ষরে একখানি সার্কুলার।]

প্রতিলিপি

কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের এক্‌জেকিউটিব কমিটি তার বিভিন্ন দেশের জাতীয় অঙ্গগুলিকে (Sections) ও অন্য পার্টিগুলিকে এবং বিভিন্ন গ্রুপ আর সংসৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে এতদ্বারা জানাতে চান। তাঁদের নিকটে খবর পৌঁছেছে যে অবনী মুখার্জি নামক একজন ব্যক্তি, যিনি কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন এবং কিছুকাল ভারতীয় কমিউনিস্ট গ্রুপে সভ্য হিসাবে কাজ করেছেন, এখন এমন সব কাজে লিপ্ত হয়েছেন যা তাঁর রাজনীতিক সাধুতা সম্বন্ধে অবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। এই কারণে তাঁর পক্ষে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের অন্তর্ভুক্ত থাকা অসম্ভব।

১৯২২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে অবনী মুখার্জির নিন্দনীয় কাজ-কর্ম সম্বন্ধে প্রথমে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি, জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টি ও ইটালীর কমিউনিস্ট পার্টিকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে আরও অনেক ঘটনা জানা গেছে। এই জন্যে এক্‌জেকিউটিব কমিটি আবার ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছে যে অবনী মুখার্জির ওপরে কমিটির কোনো আস্থা নেই। কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল ও রেড ইন্‌টারন্যাশনাল অফ লেবর ইউনিয়নের সহিত একেবারেই তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি এই সংস্থাগুলির কোনো পরিচয় পত্রও (mandate) ধারণ করেন না।

ভারতের লেবর ইউনিয়নসমূহের, রাজনীতিক পার্টিসমূহ ও অন্য বিপ্লবী গ্রুপগুলিকেও মুখার্জির কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। কারণ, মুখার্জির কার্যকলাপ প্রত্যক্ষভাবে তাঁদেরই সহিত সংসৃষ্ট, আর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাও তাঁদেরই বেশী।

আমাদের বিভিন্ন দেশের জাতীয় অঙ্গগুলিকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাঁরা যেন অবনী মুখার্জির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখেন, তাঁরা যেন ওই সার্কুলার এবং ১৯২২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখের সার্কুলারকে নিজেদের পথপ্রদর্শকরূপে ব্যবহার করেন, আর আমাদের যেন জানান, এই সার্কুলার তাঁরা পেলেন কিনা।

মোহর (স্বাক্ষর) ডব্লিউ· কোলারব

[বুল্‌গেরিয়ার কমরেড কোলারব কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের একজেকিউটিব কমিটির ও প্রেসিডিয়ামের সভ্য ছিলেন। ১৯২২ সালে সম্ভবত তিনি কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের সেক্রেটারিয়েটের সভ্যও ছিলেন।]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফৎ কমিটির রিপোর্ট হিসাবে অবনী মুখার্জি নিজের হাতে লেখা জিনোভিয়েফ্‌কে সম্বোধিত দলীলটি আমার হাতেই যে প্রথম

পড়েছিল তার বর্ণনা আমি ওপরে দিয়েছি। মুখার্জির এই জালিয়াতির খবর ঘুণাক্ষরেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফৎ কমিটি কিছুই জানতেন না এবং কোনো দিন জেনেছেন বলেও আমার বিশ্বাস নেই। অবনীর নিজের হাতে পেন্সিলে লেখা এই দলীল মস্কোতে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশন্যালের দফ্‌তরে অবনী মুখার্জি নামীয় ফাইলে রক্ষিত ছিল। পেন্সিলের লেখা কতকাল পড়তে পারা যায় তা আমি জানিনে। যদি দলীলটি পড়বার মতো অবস্থায় থাকে তবে তা মস্কোতে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের মুহাফিজখানায় (archives) আজও রক্ষিত আছে।

১৯২২ সালের কোন্ মাসে যে অবনী মুখার্জি মস্কো হতে জার্মানীতে গিয়েছিলেন তা আমি সঠিক বলতে পারব না। তার নির্দিষ্ট সময় সম্বন্ধে কোনো দলীল-পত্র আমার হাতে আসেনি। বার্লিনে ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীরা তখন মৌলবী বারাকতুল্লার ন্যাশনাল ইন্ডেপেন্ডেন্স পার্টিতে যোগ দিয়েছেন,—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হতে আরম্ভ ক'রে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেকেই। ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চয় তাঁদের কাম্য ছিল। কিন্তু বেঁচে থাকতে পারলে তবে তো স্বাধীনতার জন্যে তাঁরা লড়াই করবেন, বেঁচে থাকার উপায় কি? প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। তার ভিতর দিয়ে তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা লাভ করতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধের পর সেই জার্মানী ডুবেছে, তবে বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নূতন ক'রে ভেসে উঠেছে রাশিয়া। এই বিপ্লবী রাশিয়ায় ১৯২১ সালে গিয়ে ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীরা কোনো রকমের সুবিধা করতে পারেননি। বিশ্ববিপ্লবী সঙ্ঘ কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল চট্টোপাধ্যায়ের রেভোলিউশনারী বোর্ড গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। মানবেন্দ্রনাথ রায় জার্মান ষড়যন্ত্রের লোক হলেও বার্লিন কমিটিতে ছিলেন না। তিনি এসে কিন্তু মস্কোতে জাঁকিয়ে বসেছেন। সেখানে তিনি ভারতীয় মুহাজির (আত্মনির্বাসিত) যুবকদের নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছেন। বার্লিন কমিটির ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের নিকটে এ ব্যাপাব একেবারেই অসহ্য ছিল। বার্লিন কমিটির সভ্য না হলেও এম. এন. রায় তাঁদেরই দলের, অর্থাৎ জার্মান ষড়যন্ত্রের লোক ছিলেন। বার্লিন কমিটিওয়ালারা কিছুতেই তাঁর সঙ্গে কাজ করতে রাজী হলেন না। তাঁর মনে কি ছিল তা আমি জানি না। ১৯২১ সালে তিনি একসঙ্গে কাজ করার জন্যে বার্লিন কমিটিওয়ালাদের বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু এম. এন. রায় আগে হতে মস্কোতে এসে জাঁকিয়ে বসে গেছেন তো বটেই, তিনি তাঁদের পুরানো মত ও পথ বর্জন ক'রে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। মস্কোতে রায়ের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করলে তাঁরই নেতৃত্ব মেনে নিতে হতো। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হরদয়ালের নেতৃত্ব মানতে পারেননি এম. এন. রায়ের নেতৃত্ব কি ক'রে মেনে নিবেন? দশ জন ফকীর অনায়াসেই একখানা চাদর পেতে তার ওপরে ঘুমুতে পারেন, কিন্তু দু'জন বাদ্‌শাহের জায়গা এক দেশে কি ক'রে হতে পারে? অথচ কমিউনিস্ট ইন্‌টার-ন্যাশনালের টাকা তাঁদের চা-ই। অতএব, দীর্ঘ নির্বাসনের পচা মনোবৃত্তি তাঁদের প্রেরণা জোগাল যে হটাতে হবে এম. এন. রায়কে।

যাক এসব কথা। এখন আমি আসল ঘটনায় আসছি। অবনী মুখার্জি বার্লিনে এসেই ইণ্ডিয়ান ইন্ডেপেন্ডেন্স পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হতে, অতএব কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের 'র‍্যাঙ্ক' হতেও তিনি বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। ইণ্ডিয়ান ইন্ডেপেন্ডেন্স পার্টি স্থির করেছিলেন যে

এবারে তাঁরা শেষ লড়াই লড়বেন। যেমন করেই হোক এম. এন. রায়কে উৎখাত করতেই হবে। তাঁর পায়ের তলা হতে ভারতের মাটি সরিয়ে নিতেই হবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যে তাঁরা স্থির করলেন যে অবনী মুখার্জিকে ভারতে পাঠানো হবে। অবনী মুখার্জি ঠিক মতো কাজ করছেন কিনা তা তদারক করার জন্যে কিছুকাল পরে একজন পরিদর্শকও ভারতে পাঠাবেন।

কিন্তু এদিকে অবনী মুখার্জি যে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল হতে বহিষ্কৃত হয়ে আছেন। পরিচয়-পত্র ছাড়া ভারতের রাজনীতিক মহলে তিনি কি ক'রে দাঁড়াবেন? এম. এন. রায়কে উৎখাত করতে হলে নিজেকে কমিউনিস্টরূপে পরিচয় দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অতএব স্থির হলো :

(১) কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্যে অবনী মুখার্জি যে অনুজ্ঞা পত্র (etadnam) পেয়েছিলেন সেটাই ভারতবর্ষে দেখানো হবে। তাতে প্রমাণিত হবে যে অবনী কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের সহিত সংসৃষ্ট।

(২) ভারতে পরিচিত হওয়ার জন্যে অবনী মুখার্জিকে এই ব'লে একখানি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল যে তিনি "ভারতীয়দের রুশ সাহায্য কমিটি"র সভ্য ও সহযোগী সম্পাদক (the member and joint Secretary of the Indian Committee for Russian Relief)। বারাকতুল্লাহ্‌ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। স্বাক্ষরের তারিখ ১৩ই অক্টোবর, ১৯২২।

অনেক পরে কর্নেল কে' এই সম্বন্ধে লিখেছেন যে :

"Abani Mukherji came to India, on his recent journey, as an emissary of the 'anti-Ray' Party of Indian revolutionaries in Europe. He carried with him 'credentials' of which I have photographed copies : his mandate, printed in Russian, I learn declaring him to be a 'bonafide delegate of the third Congress of the Communist International with the right to an advisory vote', and a certificate that he was 'the member and joint Secretary of the Indian Committee for Russian Relief', signed by Barakatullah and Bhupendra Nath Dutt. In addition to these two notorious revolutionaries, Abani Mukherji was in close contact with another, even more notorious, 'Chatto'. The Certificate was dated October 13, 1922, and the 'mandate' June 21, 1921. The latter was cancelled by a circular dated October 2, 1922, in which the Communist International disowned Abani and expressed their confidence in M. N. Roy, against whom Abani Mukherji decided on working".

sd. **C. Kaye**
20.8.24

Famine Relief

... during his stay there.
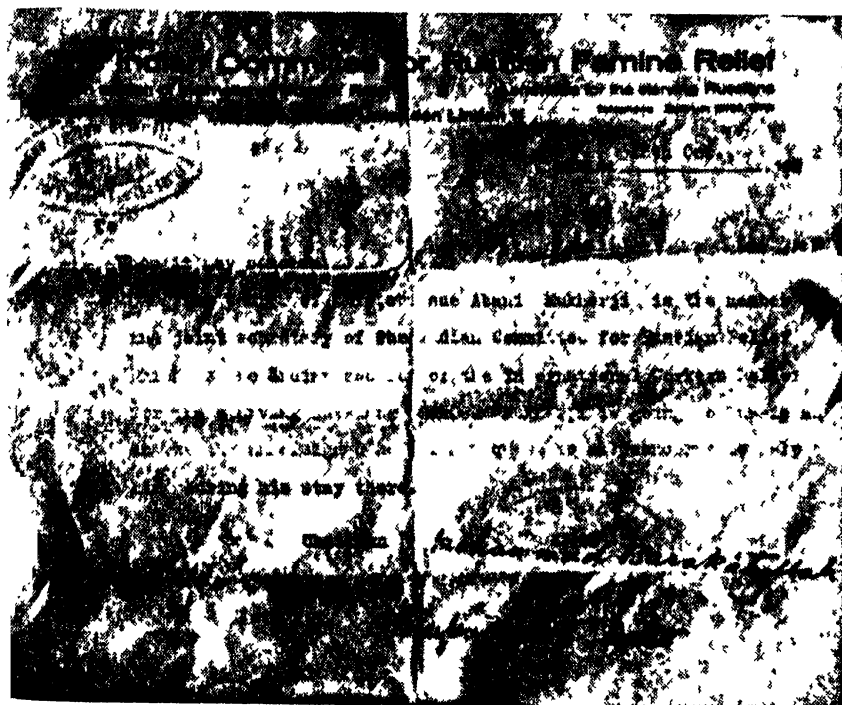
THE INDIAN COMMITTEE FOR RUSSIAN FAMINE RELIEF

Indian Section of International Workers' Relief — Committee for the Starving Russians

Telephone : 12790/12791 — Telephone : Zentrum 12790/12791

Berlin Linter den Linden 11

Berlin : 13th Oct., 1922

To

Whom it may concern

The bearer of this, comrade Abani Mukherji is the member and joint Secretary of the Indian Committee for Russian Relief which is the Indian section of the International Workers' Relief for the starving Russians. Comrade Mukherji is going to Russia and we the undersigned herewith request to all concerned to help him during his stay there.

Chairman Mohammad Barakatullah
Secretary Bhupendranath Datta

রাশিয়ার দুর্ভিক্ষ ত্রাণে ভারতীয় কমিটি

আন্তর্জাতিক শ্রমিক ত্রাণের ভারতীয় শাখা — অনশনক্লিষ্ট রাশিয়ানদের জন্য কমিটি

টেলিফোন ঃ ১২৭৯০/১২৭৯১ — টেলিফোন ঃ জেণ্টরাম ১২৭৯০/১২৭৯১

বারলিন, লিনটার ডেন লিনডেন-১১

বারলিন ১৩ই অক্টোবর ১৯২২

সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য

অনশনক্লিষ্ট রাশিয়ানদের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমিক ত্রাণের ভারতীয় অংশের রাশিয়ান ত্রাণের জন্য ভারতীয় কমিটির সভ্য ও যুগ্ম সম্পাদক কমরেড অবনী মুখার্জি এই পত্রের বাহক। কমরেড মুখার্জি রাশিয়া যাচ্ছেন এবং আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা এই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর রাশিয়ায় থাকাকালীন সময়ে তাঁকে সাহায্য করতে অনুরোধ করছি।

সভাপতি ঃ মহম্মদ বারাকতুল্লাহ্
সম্পাদক ঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

কর্নেল কে'র মন্তব্যের অনেক কথা আমি আগে বলেছি। তিনি আরও বলেছেন, ইউরোপে গঠিত ভারতীয় বিপ্লবীদের 'রায়-বিরোধী' পার্টির চর হিসাবে অবনী মুখার্জি ভারতে এসেছিলেন। এই পার্টির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বারাকতুল্লাহ্, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের 'ম্যান্ডেটে'র তারিখ ছিল ২১শে জুন, ১৯২১। ১৯২২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখের এক সার্কুলারের দ্বারা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল এই অনুজ্ঞা পত্র খারিজ ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন এম. এন. রায়ের ওপর তাঁদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে, আর অবনী মুখার্জি তাঁদের লোক নন। (মনে রাখতে হবে এটা অবনী মুখার্জির ইউরোপ ত্যাগ করার আগেকার কথা। বারাকতুল্লাহ্ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তরা তখন তা জানতে পারেননি।) কর্নেল কে' আরও বলেছেন যে অবনী মুখার্জির 'ম্যানডেট' ও সার্টিফিকেটের ফটো কপি তাঁর নিকটে আছে।

এখন কথা হচ্ছে অবনী মুখার্জি কি করে ভারতে এসেছিলেন। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্টে কোনো কোনো জায়গায় উল্লেখ আছে যে জাহাজের চাকরী করে ভারতে এসেছিলেন। এই রকম বিবৃতি দেওয়া সেকালে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের একটা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছিল। অবনীর জাহাজে চাকরী ক'রে আসার কথা একেবারেই সত্য নয়। বেঙ্গল পুলিসের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট পি. সি. ব্যামফোর্ড লিখেছেন (২৩শে আগস্ট, ১৯২৩), অবনী মুখার্জি হামবুর্গ হতে হান্সা লাইনের "বার্টেনফেল্স্" নামক জাহাজে মাদ্রাজ হয়ে কলিকাতা এসেছিলেন। এ জাহাজেই অবনী এসেছিলেন কিনা তা জানিনে, তবে তিনি প্যাসেঞ্জার হয়ে যে এসেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ডক্টর আর. শাহীর নামে অবনীর ডাচ্ পাসপোর্ট ছিল। এই পাসপোর্ট নিয়েই তিনি ইন্দোনেশিয়া হতে ইউরোপ এসেছিলেন। এই পাসপোর্টেই তিনি ভারতেও এসেছিলেন এই কথা জোর করে বলছি এই জন্যে যে ইউরোপে ফেরার সময়ে তিনি এই পাসপোর্টেই ফিরেছিলেন। ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে দেশ-বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীঅতুল বসু ইউরোপ যাওয়ার সময়ে কলম্বো হতে মার্সাই বন্দর পর্যন্ত জাহাজে অবনীর সহযাত্রী ছিলেন। অবনী শ্রীবসুর নিকটে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁকে বলেছিলেন যে আমেরিকায় তাঁর অগ্রজ পবিত্র বসুর (কেমিস্ট) সঙ্গে তাঁর (অবনীর) পরিচয় ছিল। শ্রীবসু আমাকে বলেছেন যে জাহাজে অবনী মুখার্জির আর. শাহীর নামীয় পাসপোর্ট তিনি নেড়েচেড়ে দেখেছেন।

আমি আগেই বলেছি যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের লোকদের সঙ্গে অবনী মুখার্জির কোনো পরিচয় ছিল না। জাপানে তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদেরই একটি বার্তা (তাঁর জীবনের প্রথম বিপ্লবী কাজ) নিয়ে তিনি ভারতে ফিরছিলেন, সিঙ্গাপুরে গিরেফ্তার হয়ে ফোর্ট ক্যানিং-এ বন্দী হন। ভূপতি মজুমদারও ওখানে বন্দী হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে অবনীর প্রথম পরিচয় এই দুর্গে। অবনী তখন প্যারোলে মুক্ত। ভূপতি মজুমদার বলেছেন অবনী তাঁর পেটের কথা বা'র করার চেষ্টা করেছিলেন। এই জন্যে তিনি অবনীকে ভালো চোখে দেখতেন না। কিন্তু কলকাতায় অবনীদের বাড়ী-ঘর ছিল, আত্মীয়স্বজন ছিল এবং এক সময়ে অরাজনৈতিক বন্ধুরাও ছিলেন। কিন্তু বিপ্লবীদের ভিতরে তিনি শুধু ভূপতি মজুমদারকে চিনতেন। তাঁর কাছেই প্রথম গেলেন। ভূপতি মজুমদার, ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুপ্ত, বিপিনবিহারী

গাঙ্গুলি ও অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতিকে এক জায়গায় জড় ক'রে তাঁদের সঙ্গে অবনীর পরিচয় করিয়ে দেন। মনে রাখতে হবে যে ভূপতি মজুমদার ছাড়া আর সকলের সঙ্গেই অবনীর সেদিন জীবনে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। জানিনে তাঁদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল। ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'তে লিখেছেন, (৪৬৬ পৃষ্ঠা) "কর্তৃত্বপ্রিয়তা নিয়ে মানবেন্দ্র ও অবনী মুখার্জি'র কলহ বাধে।" আশ্চর্য এই যে যাদুগোপালের মতো লোক অবনী মুখার্জি'র সহিত রাজনীতিক আলোচনা ক'রে এতটুকু মাত্র বুঝতে পেরেছিলেন। অন্য একজন বিপ্লবী বললেন, এভেলিন (রায়ের স্ত্রী) ও রোজার (অবনীর স্ত্রী) মধ্যে ঝগড়া বাধার ফলেই ব্যাপারটা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে!!

এর পরে দেখতে পাওয়া গেল যে অবনী মুখার্জি'র সহিত সন্তোষকুমার মিত্রের পরিচয় হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলছেন বিপিন গাঙ্গুলী এই পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি শুনেছিলেম, সেই সময়ে বিপিন গাঙ্গুলীর সহিত সন্তোষ মিত্রের সদ্ভাব ছিল না। অসদ্ভাবের কারণ নাকি ছিল শিশিরকুমার ঘোষ, যাঁকে পুলিসের চর বলে লোকে সন্দেহ করতেন। সন্তোষ মিত্র নাকি কিছুতেই শিশিরকে ছাড়তে রাজী ছিলেন না। আমার ধারণা জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষই সন্তোষ মিত্রের সহিত অবনী মুখার্জি'র পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে থাকবেন। তাঁর 'আশীর্বাদ' মস্তকে বহন করেই সন্তোষ মিত্র সেই সময়ে কাজে এগুচ্ছিলেন।

আমাদের ছোট্ট কমিউনিস্ট আন্দোলনটিকে ঘায়েল করার প্রথম চেষ্টা অবনী মুখার্জি করেছিলেন কলকাতায়। এই কাজে তাঁর প্রধান সহকারী হয়েছিলেন সন্তোষকুমার মিত্র। এই ষড়যন্ত্রে অবনী কি করে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন তার বিবরণ আমি ওপরে দিয়েছি। ঘায়েল আমরা হলাম না, প্রথম উদ্যমেই ঘায়েল হলেন অবনী মুখার্জি নিজে।

আমি আশ্চর্য হলাম সন্তোষ মিত্রের ব্যবহারে। তিনি তখন আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনেন না, কোনো দিন তিনি আমায় দেখেননি, তিনি কেন অবনী মুখার্জি'র গর্হিত কাজের সহযোগী হলেন? 'ধূমকেতু' কাগজের মারফতে ভূপতি মজুমদারের সহিত আমার পরিচয় হয়েছিল। তা ছাড়া এম· এন· রায় আমার মারফতে তাঁকে চিঠিপত্র লিখেছেন। তাঁদের পুরনো দিনের পার্টি পরিচয়। আমি ভূপতি মজুমদারকে বললাম, "দেখুন আপনাদের পার্টি'র কে কোন্ গ্রুপের নেতা তা আমার জানার কথা নয়। আমি জানতেও চাইনে। কিন্তু অবনী মুখার্জি'র সঙ্গে মিশে সন্তোষ মিত্র কেন আমার বিরুদ্ধে এই কাজটি করতে গেলেন? তিনি তো আমাকে চেনেনও না।"

ভূপতি মজুমদার তখন একদিন সন্ধ্যার পরে সন্তোষ মিত্রকে 'ধূমকেতু' আফিসে ডেকে আনলেন। এটা নজরুল ইসলামের গিরেফ্‌তার হওয়ার অনেক পরের কথা। সন্তোষ মিত্র এলেন। আমার সামনেই ভূপতিবাবু তাঁর বক্তব্য শুনতে চাইলেন। কোনো কৈফিয়ৎই দিতে পারলেন না তিনি। অবনী মুখার্জি কিন্তু ইউরোপে ফিরে গিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নিকটে রিপোর্ট করেছিলেন যে সন্তোষ মিত্র বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ডক্টর দত্ত তখন জানতেন না সন্তোষ মিত্র কে? ১৯২৫ সালে তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর ফেরার কত দিন পরে তা জানিনে, সন্তোষ মিত্রের সঙ্গে তার প্রগাঢ় পরিচয় হয়েছিল। এই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে তিনি তাঁর "অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে"র নূতন সংস্করণে অবনীর সেই পত্রের ঘটনা লিখতে গিয়ে লিখেছেন, "সন্তোষ তখন ১৬ বৎসরের বালক" (৩০৮ পৃষ্ঠা)। এই বালকটি সিক্সথ্ ইয়ার (এম· এ·) পড়ার সময়ে

১৯২১ সালে অসহযোগ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছিলেন। ১৬ বছর বয়স না হলে তখনকার দিনে কেউ মেট্রিকুলেশন পাশ করতে পারতেন না। কাজেই ১৯২৩ সালের আরম্ভে সন্তোষ মিত্রের বয়স কমপক্ষে ২৪ বছর হয়েছিল। তিনি তখন একটি টেররিস্ট গ্রুপের দাদা (নেতা) ছিলেন।

অবনী মুখার্জি ও ঢাকার অনুশীলন সমিতি

অবনী মুখার্জিকে বারাকতুল্লাহ্ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যখন বার্লিনে সার্টিফিকেট দিচ্ছিলেন তার কয়েক দিন আগেই কুশিনিন তাঁর সার্কুলার ইসু করেছিলেন যে অবনী মুখার্জি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কেউ নয় এবং এম· এন· রায়ের ওপরে ইন্টারন্যাশনালের পরিপূর্ণ আস্থা আছে। এই সার্কুলারের কথা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির লোকেরা প্রথমে জানতেন না, পরে তাঁদের বহু সংখ্যক লোক জেনেছিলেন। আর, অবনী মুখার্জি নিজে তো জানতেনই। তার ওপরে তাঁর হাতে লেখা মুসাবিদা নিয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এসব সত্ত্বেও অবনী মুখার্জি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সামনে বুক ফুলিয়ে বললেন, "আমিই কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রকৃত প্রতিনিধি, মানবেন্দ্রনাথ রায় নয়"। রাক্ষসে ভাষায় "হাঁউ মাঁউ খাঁই. টাকার গন্ধ পাঁই"। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ভাবলেন জার্মান ষড়যন্ত্রের সময়ে কেউ কেউ টাকা তো পেয়েছিলেন। আহ! কী ভালই না হয় এখন যদি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নিকট হতে কিছু টাকা পাওয়া যায়!! চললো আলওয়ান দিয়ে মাথা ঢেকে রাত্রে রাত্রে অবনীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতুল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তো অবনীকে নিয়ে দড়ি টানাটানি শুরু হয়ে গেল। আশ্চর্য এই যে উপেন্দ্রনাথ আবার এম· এন· রায়কে চিঠিও লিখছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় আমাদের প্রচারের কিছু সুবিধাও ক'রে দিয়েছেন এবং গয়া কংগ্রেসের সময়ে আমাদের প্রোগ্রাম প্রচারে বিশেষ সাহায্য করেছেন তিনি। তবুও প্রতুল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে অবনীকে নিয়ে দড়ি টানাটানি করলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ পর্যন্ত উপেন্দ্রনাথ অবশ্য সরে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রতুল গঙ্গোপাধ্যায় অবনী মুখার্জিকে নিয়ে গেলেন। ঢাকা গিয়ে অবনী মুখার্জির লাভ হয়েছিল। "বিপ্লবী অবনী মুখার্জি" নাম দিয়ে ঢাকা হতে তাঁর একখানা জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের নাম, রাখালচন্দ্র ঘোষ। অনেকে বলেন বইখানি অবনী মুখার্জির নিজের লেখা। রাখালচন্দ্র ঘোষের রচনা হলে নাকি লেখা আরও অনেক ভালো হতো। অবনী মুখার্জি যে ঢাকা গেলেন তাতে কার কি লাভ হয়েছিল? বারাকতুল্লাহ্, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যাঁরা অবনী মুখার্জিকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন অবনীর ঢাকা যাওয়ায় তাঁদের কিন্তু এক কানাকড়িও লাভ হয়নি। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে এম· এন· রায়ের আসন তাতে এতটুকুও টলেনি। অনুশীলন সমিতি টাকাও পাননি। অবনী মুখার্জি নামকাটা সিপাহী ছিলেন, টাকা কোথায় পাবেন? কমিউনিস্ট পার্টির ও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সংগঠন অনুশীলন সমিতিরা বুঝেছিলেন কিনা জানিনে। অবনী মুখার্জি পার্টি হতে বহিষ্কৃত ছিলেন, তিনি কি ক'রে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সহিত অনুশীলন সমিতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটাতে পারতেন? বরঞ্চ তাঁদের নিকট হতে চিঠিপত্র নিয়ে গেলে অবনী মুখার্জি নিজে কিছু উপকৃত হলেও হতে পারতেন। তাও তো তিনি হননি। ১৯২৪ সালে অবনী মুখার্জি রাশিয়ায় ফিরে গিয়েছিলেন। ১৯২৬

সালের শেষাশেষিতে কিংবা ১৯২৭ সালের শুরুতে ৩৭, হ্যারিসন রোডের ঠিকানায় আমাদের কাগজ "গণবাণী"র নামে অবনী মুখার্জির বাঙলায় লেখা একখানি পত্র আমরা পেয়েছিলেম। মস্কো হতে লেখা পত্র। তাতে তিনি লিখেছিলেন : "আমি এখন স্টাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে কাজ করছি। পার্টির সঙ্গে অর্থাৎ রায়ের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বুখারিনের এ· বি· সি· অফ্‌ কমিউনিজ্‌ম্‌ বাঙলায় তর্জমা করেছি। আপনারা ইচ্ছা করলে তা ছাপাতে পারেন।" (স্মৃতি হতে উদ্ধৃত)। আমি এই পত্রের উত্তর দিইনি। খোলাখুলি-ভাবে "এ· বি· সি· অফ্‌ কমিউনিজ্‌ম্‌" ছাপাবার অবস্থা তখনও দেশে সৃষ্টি হয়নি। আর, হলেও আমাদের ক্ষমতায় কুলাত না।

অবনী মুখার্জি যে দেশে ফিরেছিলেন ভারত গবর্নমেণ্ট তা সঙ্গে সঙ্গেই জেনেছিলেন। তাঁর কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের থার্ড কংগ্রেসের ডেলিগেট ম্যান্‌ডেট আর বারাকতুল্লাহ্‌ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সার্টিফিকেটের ফটো কপি কর্নেল কে'র হাতে পৌঁছে গিয়েছিল। কোন্‌ সূত্রে, কর্নেল কে'র হাতে এসব পৌঁছাল তা জানিনে।[১] ব্রিটিশ ইন্‌টেলিজেন্সের লোকেরা ইউরোপের কোথায় না ছিলেন? বিশেষ ক'রে, যে যে স্থানে ভারতীয়েরা ছিলেন সে সব জায়গায় ব্রিটিশ ইন্‌টেলিজেন্সের লোকেরাও ছিলেন। সকলের কথা জানিনে, কিন্তু সন্তোষকুমার মিত্রের সঙ্গে তো শিশিরকুমার ঘোষের নিবিড় যোগসূত্র ছিল। শিশির কি খবর দিত না পুলিসকে? অবনীর জাল চিঠির ব্যাপারে তিনি সন্তোষ মিত্রের ওপরে চটেছিলেন। কিন্তু শিশির ঘোষকে তিনি ত্যাগ করেননি।

অবনী মুখার্জি সম্বন্ধে ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেন্‌টের মিস্টার হেয়ার স্কটের বক্তব্য

অবনী মুখার্জি ভারতে এসে যে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন তাতে ভারত গনর্বমেণ্ট খুবই খুশী ছিলেন। গ্রেট ব্রিটেনের ভারতীয় ব্যাপার সংক্রান্ত উজীরের (The Secretary of State for India) বড় বেশী বলশেভিক ভীতি ছিল। বলশেভিকবাদ ভারতে দানা বাঁধুক এটা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট একেবারেই চাইতেন না। 'ভারতবর্ষে বলশেভিকদের পেলেই টিপে মেরে দাও' এই রকমই প্রায় ছিল তাঁদের মনের অবস্থা। সেক্রেটারি অফ্‌ স্টেট্‌ ফর ইণ্ডিয়ার এই ধরনের এক টেলিগ্রামের উত্তরে ভারত গবর্নমেণ্টের একজন বড় অফিসার লিখেছিলেন (Home pol. Deptt. F. No. 103/111/1923.) :

4. The second suggestion of the Secretary of State, making it an offence to be a Communist, appears to be a matter for legislation. I do not think the mere fact of being a Communist can be made punishable under the ordinary law unless we are able to prove that every Communist is a member of an organisation, the aim and object of which is to overthrow British rule in India by violent means. In the case of Roy we can. I think, prove that he is aiming at the destruction of the Government

১ জাতীয় মহাফিজখানার কাগজ পত্র পড়ে পরে জেনেছি যে সিঙ্গারাভেলুর সহকারী বেলায়ুধন এগুলি পুলিসকে ফটো কপি করতে দিয়েছিলেন। (লেখক)

established by law in India by revolutionary methods, and this would apply to every member who can be proved to belong to his party, but I doubt if we could do the same as regards every person who is known or professes to be a Communist. *Take, for instance, the case of Abani Mukherji who is now believed to be in India. He is a Communist, but is opposed to and working against Roy and his party. We know that he has been associating with Bolsheviks in Berlin and Russia, but we have no proof that he has been engaged in revolutionary activities directed against India that would be accepted in any Court of law.* (Italics mine)

* * *

Home Department — H.V.B. Hare Scott
14.2.23

বঙ্গানুবাদ

৪। কোনো লোকের কমিউনিস্ট হওয়াই অপরাধ, সেক্রেটারি অফ্ স্টেটের এই যে দ্বিতীয় প্রস্তাব, এটা **মনে হয় আইন তৈয়ারকরণের প্রস্তাব। আমি মনে করি** না যে কোনো লোক শুধু কমিউনিস্ট হলেই তাঁকে সাধারণ আইনে সাজা দেওয়া যায়, যতক্ষণ না এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে প্রত্যেক কমিউনিস্ট এমন একটি সংগঠনের সভ্য যে সংগঠনের উদ্দেশ্য ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে বল প্রয়োগ ক'রে উচ্ছেদ করা। আমি মনে করি, রায়ের ব্যাপারে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে বিপ্লবাত্মক প্রতিক্রিয়া প্রয়োগ ক'রে তিনি ভারতে আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত গবর্নমেণ্টকে ধ্বংস করতে চান। তার পার্টির প্রত্যেক মেম্বরের বিরুদ্ধেও এটা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু আমার সন্দেহ আছে যে, কমিউনিস্ট ব'লে পরিচিত কিংবা নিজেকে কমিউনিস্ট ব'লে প্রচার করেন এমন প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে ওপরে লিখিত ব্যক্তিদের মতো সাজা দেওয়া যায়। **দৃষ্টান্ত হিসাবে অবনী মুখার্জির বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। আমাদের ধারণা, তিনি এখন ভারতে আছেন। তিনি একজন কমিউনিস্ট। কিন্তু তিনি রায়ের বিরোধী এবং রায়ের বিরুদ্ধে ও রায়ের পার্টির বিরুদ্ধে কাজ করছেন। আমরা জানি যে বার্লিনে ও রাশিয়ায় তিনি বলশেভিকদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু আমাদের হাতে এমন কোনো প্রমাণ নেই, যা কোনো আদালতকে দিয়ে গ্রহণ করানো যায় যে অবনী মুখার্জি ভারতের বিরুদ্ধে কোনো বৈপ্লবিক কাজে নিযুক্ত আছেন।**

* * *

হোম ডিপার্টমেন্ট্ — এইচ· ভি· বি· হেয়ার স্কট
১৪·২·২৩

অবনী মুখার্জি সম্বন্ধে ভাইস্রয়ের মন্তব্য

অবনী মুখার্জির ব্যাপারে শুধু মিস্টার হেয়ার স্কট যে তাঁর বক্তব্য লিখেছেন তা নয়, সেক্রেটারি অফ্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার টেলিগ্রামের বিষয়ে স্বয়ং ভাইস্রয়ও তাঁর বক্তব্য পাঠিয়েছেন। এই বক্তব্যে তিনি অবনী মুখার্জিরও নামোল্লেখ করেছেন।

Telegram P., no. 160 dated the 28th February, 1923
From—The Viceroy (Home department)

To—The Secretary of State for India, London.
Sedition—Bolshevic menace and emissaries.

* * *

With regard to the mere fact of being Communist, we consider this no **offence** in itself under ordinary law, but it is an offence whenever it can be proved that the aim and object of organisation or individual is to overthrow British rule in India by violent means, in which case we should prosecute at once. The difficulty, as stated in the above telegram dated the 5th February, is not in law, but in obtaining evidence. We deprecate **ad hoc** legislation which we should not without great difficulty be able to get through legislation. *Besides, we have evidence of dissensions among the few agents in India, e.g. Abani Mukherji is working hard to expose Roy and his supports as a set of swindlers. This enable us to exercize a close watch over their movements and to retain threads in our hands which we would lose by more overt action against persons holding Communistic opinion.* (Italics mine)

* * *

বঙ্গানুবাদ

টেলিগ্রাম পি. নম্বর ১৬০, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩ ভাইসরয়ের (হোম ডিপার্টমেনটের) তরফ হতে, সেক্রেটারী অফ্ স্টেট্স্ ফর ইণ্ডিয়া, লণ্ডনের বরাবরে। রাজদ্রোহ। বলশেভিক আতংক ও বলশেভিক চরগণ।

* * *

কোনো লোকের শুধু কমিউনিস্ট হওয়াকে সাধারণ আইন অনুসারে আমরা কোনো **অপরাধ** মনে করি না, কিন্তু যখন কোনো সংগঠন বা ব্যক্তি ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে নির্মূল করার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে প্রবৃত্ত হয় তখনই আমরা তাদের আদালতে অভিযুক্ত করব। আমরা যেমন ৫ই ফেব্রুয়ারীর টেলিগ্রামে ব্যক্ত করেছি যে আসল অসুবিধা আইনের নয়, কণ্টকর ব্যাপার হচ্ছে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা। আমরা বিশেষ আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে অনুরোধ জানাই। প্রচণ্ড বাধার ভিতর দিয়ে আইন সভায় তা পাস করাতে হবে। **তা ছাড়া, ভারতে অল্প সংখ্যক [বলশেভিক] এজেণ্ট আছেন। তাঁদের ভিতরে যে বিবাদ-বিসংবাদ রয়েছে তার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে একদল প্রতারকরূপে রায় ও তাঁর সমর্থকদের মুখোশ খোলার জন্যে অবনী মুখার্জি কঠোর পরিশ্রম করছেন। অবনী মুখার্জির এই কাজের দ্বারা তাদের গতিবিধির উপরে নিকট থেকে নজর রাখার পক্ষে আমাদের সুবিধা হয়েছে এবং এই গতিবিধির ডোরটাও আমরা আমাদের হাতে ধরে রাখতে পারছি। এই সুবিধাটা আমরা হারাব যদি আমরা যাঁরাই কমিউনিস্ট মত ধারণ করেন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো অস্ত্র প্রয়োগ করি (মোটা হরফ আমার—লেখক)।**

অবনী মুখার্জি ভারতে এসে প্রায় অবাধে কাজ করতে পেরেছেন। তিনি মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ প্রচার করার জন্যে ভারতে আসেননি। এম. এন. রায় ও আমরা যারা তখন এম. এন. রায়ের সঙ্গে কাজ করছিলেম, আমাদের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নেওয়ার জন্যেই তিনি এদেশে এসেছিলেন। উপরিউক্ত মিস্টার হেয়ার স্কট ও ভাইস্‌রয়ের মন্তব্য হতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে অবনী মুখার্জিকে গিরেফ্‌তার করার বা গিরেফ্‌তার ক'রে তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করার কোনো ইচ্ছা ভারত গবর্নমেণ্টের ছিল না। মিস্টার হেয়ার স্কট বলেছেন যে আদালত তাঁর মোকদ্দমা গ্রহণই করবে না। যে-ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স পার্টি (বারাকতুল্লাহ্‌, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি) তাঁকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন ভাইস্‌রয়ের ভাষায় "কঠোর পরিশ্রম" করেও তিনি তাঁদের জন্যে কিছু করতে ও গড়তে পারেননি। অর্থাৎ সেদিনের ক্ষুদ্র কমিউনিস্ট পার্টিকে তিনি ধ্বংস করতে পারেননি।

বারাকতুল্লাহ্‌ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তরা সমস্ত ব্যাপারটিকে গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন। অবনীর রওয়ানা হওয়ার আগেই তাঁরা একজনকে অবনী মুখার্জির কাজ তদারক করার জন্যে পাঠাবেন স্থির করেছিলেন। অবনী এই কথা মাদ্রাজে সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের নিকটে উল্লেখ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, মুসলমান নামের একজন আসবেন। সিঙ্গারাভেলু আবার এই কথা নলিনী গুপ্তকে বলেছিলেন। পুলিসের নিকটে দেওয়া বিবৃতিতে নলিনী গুপ্ত তা ব্যক্ত করেছেন। সত্য সত্যই অবনীর কাজের তদারক করার জন্যে মুস্‌লিম নামধারী একজন ইউরোপ হতে এসেছিলেন। তাঁর নাম সৈয়দ আবদুল ওয়াহিদ। তিনি ইটালীয় জাহাজে এসে সেই জাহাজেই ফিরে গিয়েছিলেন।

অবনী মুখার্জির অনুশীলন সমিতির সহিত যোগাযোগের কথা আগেই বলেছি। তাঁর তাঁদের কি দেওয়ার ছিল এবং কি তাঁরা তাঁর নিকট হতে পেয়েছিলেন তা জানিনে। তবে, অনুশীলন সমিতির বিশেষ বিশেষ লোককে ১৯৩৮ সালে বলতে শোনা গেছে যে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের সহিত তাঁদের সোজাসুজি যোগাযোগ আছে,—অবশ্য সে যোগাযোগ অবনী মুখার্জির মারফতে যোগাযোগ, যে অবনী মুখার্জি ছিলেন কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল হতে বহিষ্কৃত। আর, এই অবনী মুখার্জি ১৯৩৭ সালে মস্কোতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

১৯২৪ সালের জুন মাসে অবনীর আর একদফা স্বীকারোক্তি

অনেক দলীল-পত্রে পাওয়া যাচ্ছে যে অবনী মুখার্জি গয়ার ব্যারিস্টার মণিলাল ডক্টরের (শাহ্‌) সহিত সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। মাদ্রাজের সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের সহিত অবনীর সংযোগ ছিল আরও গভীর। অবনীর নিজের দাবী তাই। আমি ওপরে উল্লেখ করেছি যে ভারতবর্ষ হতে বার্লিনে ফিরে গিয়ে ১৯২৪ সালের ২৬শে জুন তারিখে অবনী মুখার্জি ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার মিস্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের নিকট ক্ষমা (amnesty) চেয়ে একখানি দরখাস্ত জার্মানীর ব্রিটিশ দূতের (ambassador) মারফতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর রুশ স্ত্রী ও তাঁর গর্ভজাত পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভারতবর্ষে ফিরতে চেয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি জার্মান ট্রেড ইউনিয়নের নেতার নিকটে নিজের সম্বন্ধে একটি বিবৃতিও দিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে জার্মান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা যেন ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মারফত এই বিবৃতি ব্রিটিশ প্রধান

মন্ত্রীর নিকটে পাঠিয়ে দেন। তাই করা হয়েছিল। তার জন্যেই আজ আমরা এই বিবৃতিটি পড়তে পেয়েছি।

অবনী মুখার্জির বার্লিনের এই বিবৃতিতে আছে যে মাদ্রাজে সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারেরা যে "হিন্দুস্তান লেবর এণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টি" (দুর্ভাগ্যবশত এম· এন· রায়ের প্রস্তাবিত) গড়তে চেয়েছিলেন সেটা আসলে তিনিই গড়ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে এটা জনগণের একটি বৈধ সংগঠন হবে, এর স্লোগান হবে কোনো উপদ্রব নয়, "Non-violence" নিরুপদ্রবই চাই; এর কাজ হবে পার্লামেণ্টারি প্রথায় কাউন্সিলের ভিতরে, কাউন্সিলের বাইরে এই সংগঠন শ্রমজীবীদের স্বার্থের প্রতি নজর রাখবে; ইত্যাদি, ইত্যাদি। তার পরে, অনুশীলন সমিতির পুরানো সভ্যদের যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে এই বিবৃতিতেই অবনী মুখার্জি স্বীকার করেছেন যে তিনি কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল হতে বহি ষ্কৃত। আর, এই ব্যাপারটি ঘটেছিল ১৯২২ সালে অবনী মুখার্জির ভারতবর্ষে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে।

ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারের নিকট হতে ক্ষমা (Amnesty) চাওয়া ও পাসপোর্টের জন্যে আবেদন করা অবনী মুখার্জির কি খেল ছিল তা বোঝা মুশ্‌কিল। কিসের ক্ষমা চেয়েছিলেন তিনি? তার বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমাই তো ভারতবর্ষে ছিল না। নির্বাসিতেরা তাঁদের বিরুদ্ধে বড় বড় মোকদ্দমা ঝুলছে মনে করতেন বটে, আসলে তা নয়। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ক্ষমা চেয়ে ও পাসপোর্ট চেয়ে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিকটে দরখাস্ত করেছিলেন। তাঁকে যখন শর্তমূলক পাসপোর্ট মঞ্জুরের কথা জানানো হলো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ক্ষমা মঞ্জুরের কি হলো? বার্লিনের ব্রিটিশ দূতাবাসের লোকেরা বললেন, তাঁর বিষয়ে ক্ষমা মঞ্জুরের কিছু নেই। আর, অবনী মুখার্জি, যিনি দেশে কোনো রাজনীতিই কোনো দিন করলেন না তাঁর বিরুদ্ধে কিসের মোকদ্দমা থাকতে পারে? ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁকে পাসপোর্ট দিতে চেয়েছে তাঁর নিজের দায়িত্বে। এটা ছিল ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের কাজের ধরন। তার বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা যখন ছিল না তখন তিনি দেশে আসলেই তো পারতেন। এই অবস্থায় দেশে ফেরার পরে বার্লিন কমিটির সেক্রেটারি ডক্টর দত্তের কিছুই হয়নি। অবনী মুখার্জির কি হতো?

আজকাল পুরানো দিনের গোপন দলীল-পত্র সরকারী মুহাফিজখানায় পড়তে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে অবনী মুখার্জির কাগজ-পত্র পড়ার সুযোগ আমরা পেয়েছি। ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর কর্নেল সেসিল কে'র দীর্ঘ মন্তব্য আমরা পড়েছি। তাতে কোথাও লেখা হয়নি যে অবনী মুখার্জির বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা দায়ের থাকা অবস্থায় কিংবা জামিনে মুক্ত অবস্থায় তিনি পালিয়েছিলেন। কর্নেল কে' অবনী মুখার্জির সিঙ্গাপুর হতে পালানোর কথাও লিখেছেন। ক্ষমা (amnesty) মঞ্জুরের কিছু না থাকা সত্ত্বেও লেখেননি যে ক্ষমা মঞ্জুরের কোনো কথাই উঠে না। আমাদের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফৎ কমিটির লেখা ব'লে যে চিঠিখানা অবনী মুখার্জি জাল করেছিলেন সেখানা দেখছি তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিল। ভারত গবর্নমেণ্টের মনে সন্দেহ জেগেছিল যে এই লোকটি জিনোভিয়েফকে পত্র লিখল কেন? হয়তো বাইরে সে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল হতে বহিষ্কৃত এবং ভিতরে অন্য ব্যবস্থা করেছিল। ভারত গবর্নমেণ্টের ধারণা ভিত্তিহীন ছিল। এর কোনো ভিত্তি থাকলে অবনী মুখার্জি কখনও তাঁর জাল পত্রের কপি কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল বিরোধী ব্রান্‌ড্‌লারকে পাঠাতে বলতেন না।

কিন্তু সত্যই কি অবনী মুখার্জি দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন? দেশে এসে

তিনি খেতেন কি? ২৭, সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে তাঁর ভাগের একখানা, দু'খানা কিংবা তিনখানা ঘর নিয়ে তিনি কি করে ইউরোপীয় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কাটাতেন? রুজি-রোজগারের কি ব্যবস্থা তিনি করতে পারতেন? শিখেছিলেন শুধু তাঁতীর কাজ। তাও হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে সোবিয়েৎ দেশের একটি মেয়ে কি সোবিয়েৎ নাগরিক অধিকার ছেড়ে দিয়ে ভারতে আসতেন? নাগরিক অধিকার একবার ছেড়ে দিয়ে বাইরে চলে গেলে আর তো তিনি তা কখনো ফিরিয়ে পেতেন না। ডক্টর অক্ষয় সাহার স্ত্রীর দুঃখের কথা কে না জানেন? অবনী মুখার্জি দেশে ফেরার জন্যে যদি এতই পাগল হয়েছিলেন তবে পাসপোর্ট মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও দেশে তিনি এলেন না কেন? ১৯২৫ সালে কি ক'রে তিনি সোবিয়েৎ নাগরিক অধিকার নিলেন? আসলে অবনী মুখার্জির স্ত্রী-পুত্র সহ ভারতে ফেরার কোনও ইচ্ছা ছিল না, লেবর পার্টি গবর্নমেণ্টে এসেছিলেন ব'লে সেই উপলক্ষে তিনি খানিকটা নিজেকে প্রচার ক'রে নিয়েছিলেন। এই কৌশলটা তিনি ভালোই জানতেন।

চট্টোপাধ্যায় অবশেষে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন

দারুণভাবে আশাভঙ্গ হয়ে ১৯২৪ সালে অবনী মুখার্জি ভারতবর্ষ হতে বার্লিনে ফিরেছিলেন। যাঁরা তাঁকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন তাঁরাও হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁদের ভিতরে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯২৫ সালের প্রথম ভাগে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অনুমতি ও পাসপোর্ট পেয়ে ভারতে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর প্রচুর সম্পত্তি ছিল। ইউরোপীয় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দেশে এসে বাস করার সংস্থা তাঁর ছিল। তবে স্ত্রী-পুত্রই তাঁর ছিল না। অবিবাহিত ছিলেন তিনি। মৌলবী বারাকতুল্লাহ্ গদর পার্টির আমন্ত্রণে আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং ১৯২৭ সালে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় স্বাধীনতাকামী লীগের (The League Against Imperialism and for National Independence) যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন। এই লীগের হেড অফিস বার্লিনে ছিল। ১৯৩৩ সালে হিটলারের অভ্যুদয়ের পরে তিনি সোবিয়েৎ রাশিয়ায় চলে যান। তিনি রুশ নাগরিক অধিকার লাভ করেছিলেন।

ক্লেমেন্স পাম্ দত্তের পত্রাংশ

"In 1936 or 1937, Chattopadhyaya had an academic post in the department of ethnology in Leningrad University. I visited him at the Museum of Ethnology there which was apparently under his charge and about which he was very keen. My impression is that some one told me he died during the siege of Leningrad."

("১৯৩৬ কিংবা ১৯৩৭ সালে চট্টোপাধ্যায় লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকতার একটি কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সেখানে নৃতত্ত্বের

মিউজিয়ামে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। দেখে যা বুঝেছিলাম তাতে মিউজিয়ামটি তাঁরই কর্তৃত্বাধীন ছিল এবং সেই সম্বন্ধে তাঁর প্রবল উৎসাহও ছিল। আমার ধারণা, কেউ আমায় বলেছিলেন যে লেনিনগ্রাডের অবরোধের সময়ে চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছিল"।)

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে মস্কোস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সোবিয়েৎ গবর্নমেণ্টকে বীরেন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ক'রে নাকি জানতে পেরেছিলেন যে তিনি সোবিয়েৎ নাগরিক হয়েছিলেন এবং (Arteriosclerosis) রোগে মারা গেছেন। এই রোগে নাকি রক্তবাহিনী ধমনী শক্ত হয়ে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর সহিত ভারতের ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের একটা সমঝতা হয়েছিল এই শর্তে যে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসন হতে মুক্ত করার জন্যে জার্মানী ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রচুর অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য করবেন। কেননা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পর্যুদস্ত হলে জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ জয়ের পরম সুযোগ আসবে। শেষ পর্যন্ত জার্মানী ভারতীয় বিপ্লবীদের অর্থ-সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু অস্ত্র-সাহায্য করেননি। যে ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মানীর সঙ্গে সমঝতা করেছিলেন চট্টোপাধ্যায় তাঁদের নেতৃস্থানে ছিলেন। জার্মানীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরপুর ছিল। রুশ বিপ্লবের পেছনে যে ফিলসফি কাজ করেছিল সেটা বুঝতে তাঁর বছরের পর বছর সময় লেগেছিল। এই জন্যে শুরুতে তিনি সোবিয়েতের বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন এবং লেনিনের বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন সর্বাপেক্ষা বেশী। লেনিনকে জার্মান অনুগৃহীত ব্যক্তি ইত্যাদি সব কিছু তিনি বলেছিলেন। এসব বিষয়ে দলীলপত্র কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের মুহাফিজখানায় নথিভুক্ত ছিল। এই কারণে সোবিয়েৎ দেশের কমিউনিস্ট নেতারা কখনও ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবী চট্টোপাধ্যায়কে ভালো চোখে দেখেননি। ওপরে আমি চিচারিনের কথা উল্লেখ করেছি। চট্টোপাধ্যায়ের কমিউনিস্ট ও সোবিয়েৎ নাগরিক হওয়ার পরেও কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের মুহাফিজখানায় রক্ষিত তাঁর নামীয় ফাইলটি তাঁর বিরুদ্ধে হয়তো গিয়ে থাকবে।

মুখার্জি সম্বন্ধে যত তথ্যের সমাবেশ তিনি তাঁর প্রবন্ধে করেছেন তার অধিকাংশই সত্য নয়। এই তথ্যগুলির সম্বন্ধে কিছু বলার আগে তিনি যে অবনীর নাম "অবনী ত্রিলোক মুখার্জি" (Abani Trilok Mukherjee) লিখেছেন সে সম্বন্ধে আমি জানাতে চাই যে বাঙালীদের ভিতরে এই রকম নাম লেখার রেওয়াজ একেবারেই নেই। অবনীর নাম অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়, আর তাঁর বাবার নাম ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নিকট হতে "রায় সাহেব" খেতাব পেয়েছিলেন। অবাঙালীদের বোঝার সুবিধার জন্যে আমি বলছি যে মুখোপাধ্যায়কে সংক্ষেপে মুখার্জিও বলা হয়। অবনী মুখার্জি নানা রকম চাল চালতেন। "অবনী ত্রিলোক মুখার্জি" নাম ধারণও তাঁর একটি চাল ছিল।

❦ লেনিনগ্রাডের হস্তলেখা বিশারদদের ভুল জ্ঞানের পরিচয়

লেনিনগ্রাড হতে হস্ত-লিখন বিশারদ এসে অবনীর একটা হাতের লেখা পরীক্ষা ক'রে বলেছেন যে লেখাটা অবনীর নয়, এম. এন. রায় তা জাল করেছেন। এই ব্যাপারটির সঙ্গে আমিও সংসৃষ্ট ছিলেম ব'লে এখানে আমারও কিছু বলা প্রয়োজন।

ওপরে আমি জিনোভিয়েফকে সম্বোধন করা একখানা পত্র প্রকাশ করেছি। পেন্সিলে লেখা অবনী মুখার্জির এই পত্রের বিস্তৃত বিবরণও ছাপা হয়েছে। পত্রের এই মুসাবিদা একান্তভাবে অবনীরই হাতের লেখা। এম. এন. রায় তখন বার্লিনে ছিলেন। বার্লিন হতে কলকাতায় এসে এম. এন. রায় এই পত্র কিছুতেই জাল করে যেতে পারেন না। এই পত্র আমিই ডাকযোগে বার্লিনে এম. এন. রায়কে পাঠিয়েছিলেম। বোম্বের ফরেন পোস্ট অফিসে এই পত্রের ফটো কপি রাখা হয় এবং কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় এই ফটোস্টাট কপি একজিবিটরূপে সরকার পক্ষ থেকে দাখিলও করা হয়েছিল। তারই প্রতিলিপি ওপরে মুদ্রিত হয়েছে। অবনীর মূল পেন্সিলে লেখা মুসাবিদা বার্লিনে এম. এন. রায়ের হাতে পৌঁছেছিল। হাইকোর্টের পেপার বুকে মানবেন্দ্র নাথের আমায় লেখা এক পত্রে আছে যে অবনীর সেই মুসাবিদা তখনও তিনি পাননি। আমার মনে আছে পরে তিনি তার প্রাপ্তি স্বীকার করেছিলেন। হাইকোর্টের পেপার বুকে তা নেই। তিনি তা কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের রেকর্ড রুমে অবনী মুখার্জি নামীয় ফাইলে রেখে দিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, আজও এই দলীল কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের মুহাফিজখানায় রক্ষিত আছে। অবশ্য আজ হয়তো পেন্সিলের লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

উন্নিকৃষ্ণানের লেখা হ'তে এটা বোঝা যাচ্ছে না যে অবনীর ব্যাপারে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল কখন অনুসন্ধান করেছিলেন এবং কেন করেছিলেন? ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে অবনী মুখার্জি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হতে, কাজেই কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের র‍্যাঙ্ক হতেও বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। ১৯২৪ সালের জুন মাসে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিকটে দাখিল করার জন্যে বার্লিনে নিজে নিজের যে বিবৃতি তৈয়ার করেছিলেন তাতে তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল হতে বহিষ্কৃত। আরও বলেছেন যে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের পতন হয়েছে এবং তা স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের উপদলে পরিণত হয়েছে, ইত্যাদি। ১৯২৬ সালের শেষভাগে (কিংবা ১৯২৭ সালের শুরুও হতে পারে) অবনী আমাদের যে পত্র লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন যে পার্টির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। তবে কি সোবিয়েৎ নাগরিক অবনী ১৯২৭ সালে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন? তা না হলে তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধান কেন করানো হলো? লেনিনগ্রাড হতে হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্টদের কেন ডাকা হলো? আর তাঁরা যদি এলেনই তবে তাঁরা কলকাতায় অবনী যে জাল মুসাবিদা তৈয়ার করেছিলেন সেটাই বা পড়লেন না কেন? ওই দলীল হতেই তো সব কথা উঠেছিল। সেটাও এম. এন. রায় জাল করেছিলেন বলে কি বিশারদরা মত দিয়েছিলেন? তবে কি এই বিশারদ ব্যাপারটাই আগাগোড়া একটা গোঁজামিল? আমি নিজে এই ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেম বলেই এটা আমার এত ক'রে বলতে হলো। জিনোভিয়েফকে সম্বোধিত অবনীর কলকাতার জাল পত্রখানাই তাঁকে সাজা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তবু মানবেন্দ্রনাথ অবনীর জীবনী কেন জাল করলেন? এত নির্বোধ ছিলেন তিনি? অবনী যে আমেরিকা গিয়েছেন তা তিনি বহু লোককে বলেছেন। তাঁর গুণগ্রাহীদের বলেছেন। আমি ওপরে এক জায়গায় তার নাম উল্লেখ করেছি।

আরও কয়েকটি তথ্য আমি দিচ্ছি।

ভারতবর্ষে অবনীকে গিরেফ্‌তারের জন্যে কোনো পুরস্কার ঘোষিত হয়নি। তিনি যখন গোপনে ভারতে এসেছিলেন তখন ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্ট-মেণ্টের মিস্টার হেয়ার স্কট বলেছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা আদালতে

প্রমাণিত হবে না। তাঁর গতিবিধির সব খবর গবর্নমেণ্ট জানতেন। ভাইস্‌রয় বলেছেন তাঁর গতিবিধির ডোর তাঁদের হাতে ধরা আছে।

সোবিয়েৎ ইউনিয়নে অবনী মুখার্জি তাঁর জীবনের শেষ ক' বছর কোন্‌ বিষয়ে কতটা পাণ্ডিত্যলাভ করেছিলেন আমি তা জানিনে। তবে, "গ্রাম ভারত" (Rural India?) সম্বন্ধে অবনী মুখার্জি সোবিয়েত ইউনিয়নে যে পুস্তক লিখেছিলেন তা সে-দেশে মুদ্রিত হয়েছিল। তার পরে দেখা গেল যে পুস্তকখানি ভুলে ভরা। তাই, সে পুস্তক আর প্রকাশিত হয়নি।

অবনী মুখার্জি কোনো দেশের কোনো ইউনিভার্সিটি হতে 'ডক্টরেট' পাননি। অবশ্য সোবিয়েৎ ইউনিয়নে তাঁকে ডক্টরেটে ভূষিত করা হয়েছিল কিনা সে খবর আমি নিতে পারিনি।

হাঁ, একটি কথা। ১৯২১ সালে ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীরা মস্কোতে অবনীর বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলেন যে অবনীর সিঙ্গাপুরের স্বীকারোক্তির ফলে ভারতে অনেক লোক ধরা পড়েছেন, তাঁদের ভিতরে কোনো কোনো লোকের ফাঁসিও হয়েছে। এই সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা আমি করেছি। বায়ান্ন-তিপান্ন বছর পরে তথ্য কি পাওয়া যায়? কুলচন্দ্র সিংহ রায় তখন কলকাতায় ন্যাশনাল কলেজে ছিলেন। অন্য কাউকে না পেলে শেষ তাঁর নিকটে বার্তা পৌঁছানোর কথা ছিল। তিনি বেঁচে আছেন, আশি বছরের ওপরে তাঁর বয়স। অবনী ধরা পড়ার আগেই তিনি গিরেফ্‌তার হয়েছিলেন। কাজেই, অবনীর স্বীকারোক্তির ফলে তিনি গিরেফ্‌তার হননি। তিনি বলেন পিংলের স্বীকারোক্তির ফলেই তিনি গিরেফ্‌তার হয়েছিলেন। রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তিনি বানারসে গিয়ে দেখা করেছিলেন। অবনীকে বার্তা ও টাকা দিয়েছিলেন অবিনাশচন্দ্র রায়। ১৯১৫ সালে তিনি শাংহাইতে ছিলেন। এই অবিনাশচন্দ্রের কথা কেউ কিছু বলতে পারছেন না। কুলচন্দ্র সিংহ রায়ও কিছু জানেন না। চন্দননগরের যে পাঁচ জনের সঙ্গে অবনীর পরে পরে দেখা করার কথা ছিল তাঁদের মধ্যে শুধু মণীন্দ্র নায়েক বেঁচে আছেন, আশির ওপরে তাঁর বয়স। তিনি শুধু জানিয়েছেন যে অবিনাশচন্দ্র রায়কে মতিলাল রায় জানতেন। আর বেশী কিছু তিনি বোধ হয় বলতে চাইলেন না। তাঁকে অবনীর স্বীকারোক্তি আমি পড়িয়েছি। এই স্বীকারোক্তির ফলে চন্দননগরের ফরাসী প্রজা-দের ধরা পড়ার কোনো কথাই উঠে না।

আমার মনে হয় অবনীর স্বীকারোক্তির ফলে ভারতের কারুর ফাঁসি তো দূরের কথা, কেউ কোথাও ধরাও পড়েননি। কুমিল্লার গিরীন্দ্র সেন গিরেফ্‌তার হয়েছিলেন ঘটে, কিন্তু তা অবনী মুখার্জির জন্যে কিনা তা বলা শক্ত। অবনী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের বাইরের লোক ছিলেন, ভিতরের কিছুই জানতেন না তিনি। অন্তত সেই যুগে অবনী একজন দুঃসাহসিক ভবঘুরে ছিলেন, তার বেশী কিছু নয়। তাঁর আর একটি বিশেষ গুণ ছিল এই যে তিনি ছিলেন একজন মিথ্যার সম্রাট। হাঁ, ধরা পড়ার সময়ে অবনীর নিকট একটি ডায়েরী ছিল। সেই ডায়েরীতে অনেক কিছু লেখা ছিল। তার জন্যে ভারতবর্ষে কারুর কিছু ক্ষতি হয়েছিল কিনা আমি বলতে পারব না।

বার্লিন যুগ

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের তৃতীয় কংগ্রেসে (১৯২১ সালের ২২শে জুন হতে ১২ই জুলাই) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে ভারতীয় আন্দোলন সংক্রান্ত সব কিছু তাশকন্দ হতে গুটিয়ে আনতে হবে। ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির হেড্ কোয়ার্টার্স তাই তখনকার মতো মস্কোতেই উঠে আসল। ১৯২১ সালের ২১শে এপ্রিল তারিখে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের "অল্-রাশিয়ান সেন্ট্রাল এক্জেকিউটিব কমিটি" মস্কোতে "শ্রমজীবী প্রাচ্যের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয় (অপর নাম স্তালিন বিশ্ববিদ্যালয়)" স্থাপন করলেন। তাশকন্দ হতে আগত ভারতীয় ছাত্ররা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে লাগলেন। এম. এন. রায় ও তাঁর স্ত্রী এভেলিন রায়ও এখানে পড়াচ্ছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ইশ্তিহার (মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জি স্বাক্ষরিত) আহ্মদাবাদ কংগ্রেসে বিতরিত হয়েছিল (ডিসেম্বর, ১৯২১)। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের তৃতীয় কংগ্রেসের পরে এম. এন. রায় এই দলীল মস্কোতেই রচনা করেছিলেন।

রায়ের "ইণ্ডিয়া ইন্ ট্রান্জিশন" নামক ইংরেজি পুস্তকও এই সময়ে মস্কোতেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে মস্কো হতে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয়। সব দিকে বিচার ক'রে এটাই তখন স্থির হলো যে বার্লিন হতে ভারতের সহিত সংযোগের সুযোগ অনেক বেশী।

১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে এম. এন. রায় ও এভেলিন রায় বার্লিনে গেলেন। তার মানে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির হেড্ কোয়ার্টার্স বার্লিনে স্থানান্তরিত হলো। সেখানে নির্বাসিত ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীরা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা ছিলেন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার বিরোধী। পারলে তাঁরা এম. এন. রায়কে বিশ বাঁও পানির তলায় ডুবিয়ে দেন এমন ছিল তাঁদের মানসিক অবস্থা। এর আগের অধ্যায়ে অবনী মুখার্জির কথা ও অন্যান্য কথা বলতে গিয়ে আমি এ সম্বন্ধে লিখেছি।

বার্লিনে ভারতীয় অনেকেই ছিলেন, ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্ট অনুসারে প্রায় একশ' জন ছিলেন। কিন্তু এম. এন. রায়দের স্বামী-স্ত্রীকে প্রকৃত সাহায্য করার মতো কেউ ছিলেন না। লিখবার মতো লোক তো ছিলেনই না। ১৯১৫ সালে মানবেন্দ্রনাথ পেটে যে বিদ্যা নিয়ে ভারত ত্যাগ করেছিলেন তিনি শুধু সেই বিদ্যাতে সন্তুষ্ট হয়ে বিদেশে নির্বাসিত বিপ্লবীর জীবন যাপন করেননি। তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করে তাঁর ভিতরের প্রতিভাকে বিকশিত ক'রে তুলেছিলেন। ইউরোপের বাশিন্দা ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের ভিতরে রায়ের **পরম শত্রু** ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত একদিন দুঃখ করে আমায় বলেছিলেন যে বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীরা লেখাপড়ার চর্চা মোটেই করলেন না, একমাত্র মানবেন্দ্রনাথই তার ব্যতিক্রম।

আমেরিকায় নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবী সুরেন্দ্রনাথ কর জার্মানীতে এসে এম. এন. রায়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর আসার জন্যে রায় রাহা খরচের টাকা যে

পাঠিয়েছিলেন একথার উল্লেখ সেই সময়কার দলীলপত্রে পাওয়া যায়। এম. এ. রায় ও সুরেন্দ্রনাথ করের যুক্ত স্বাক্ষরে ইশ্‌তিহারও প্রকাশিত হয়েছে। তারপরে সুরেন্দ্রনাথ কর কেন মৌলবী বারাকতুল্লাহ্‌ প্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স পার্টি"তে ও ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে রায় কিংবা ডক্টর দত্ত কোনো কথা বলেননি। কানপুর কমিউনিস্ট (বল্‌শেভিক) ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা উপলক্ষে ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে আমি যখন নলিনী গুপ্তের সঙ্গে দ্বিতীয়বার—অবশ্য কানপুর ডিস্‌ট্রিক জেলে মিলিত হয়েছিলেম, (প্রথমবার আসার পরে ১৯২২ সালের মার্চ মাসে নলিনী ইউরোপ যাত্রা করেছিলেন) তখন তিনি আমাদের বলেছিলেন যে তিনি রায়ের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ করের ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছিলেন। ঝগড়া বাধানোর ব্যাপারে নলিনী গুপ্ত বরাবরই একজন ওস্তাদ ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কর অল্প দিনের ভিতরেই জার্মানীতে মারা যান। তিনি যক্ষ্মা রোগে ভুগছিলেন।

সেই যুগে যাঁরা জার্মানী হতে দেশে ফিরতেন তাঁরা বলতেন যে এম. এন. রায়রা বার্লিনে বড় বড় ব্যয়সাধ্য হোটেলে বাস করতেন। সত্যই তাঁরা তাই করতেন কিনা সে খবর আমি কখনও নিইনি। সেই সময়ে মানবেন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রথমা স্ত্রী এভেলিন ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন সৃষ্টি করার জন্যে যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন এটা আমরা কিছুতেই ভুলে যেতে পারি না। রায়ের ইংরেজি পুস্তক "ইণ্ডিয়া ইন্‌ ট্রানজিশন" মস্কোতে রচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর বার্লিনে আসার পরে। ১৯২২ সালের ১৫ই মে তারিখে ইংরেজি পাক্ষিক THE VANGUARD OF INDIAN INDEPENDENCE (ভ্যানগার্ড অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স অর্থাৎ **ভারতীয় স্বাধীনতার অগ্র সৈনিক**) বার্লিন হ'তেই প্রথম প্রকাশিত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মুখপত্র ছিল এই পত্রিকাখানি। মনে হয় বার্লিনে অবস্থিত ভারতের ইন্‌টেলিজেন্সের কিংবা ব্রিটিশ ইন্‌টেলিজেন্সের লোকেরা এই পত্রিকা যে বার হবে সে খবর আগে হতে ভারতে পাঠাননি। কারণ প্রথম সংখ্যার কাগজ কলকাতায় আসার পরে কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন সব-ইনস্পেক্‌টর মুহম্মদ ইস্‌মাইল, পরে খান বাহাদুর ও ডেপুটি কমিশনার, হন্তদন্ত হয়ে উত্তর কলকাতায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন যে কাগজখানি কোন্‌ প্রেসে গোপনে ছাপা হয়েছে। পুলিস তখন হয় তো কন্‌টিনেন্‌টাল টাইপের চেহারা চিনতেন না। অবশ্য, কিছু কিছু জার্মান টাইপ তখনও কলকাতার বাজারে আসছিল। দ্বিতীয় সংখ্যার কাগজ যখন কলকাতায় এসে পৌঁছাল তখন পুলিস সব কিছু জেনে গেছেন। তাঁরা লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউস হতে সব খবর পেয়েছেন। তাছাড়া, তাঁরা ভারতের ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্নেল সেসিল কে'র বার্লিনস্থ এজেণ্টদের নিকট হ'তেও রিপোর্ট পেয়ে থাকবেন। কর্নেল কে' বলেছিলেন তাঁর এজেণ্টরা পৃথিবীর সব দেশে আছেন।

যতীন মিত্র বার্লিনে তেমন কোনো কাজে আসেন নি। রায়ের পক্ষে তিনি ছিলেন একটি বোঝা।

"দি ভ্যানগার্ড অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স" কিছু দিন পরে এড্‌ভান্স গার্ড (THE ADVANCE GUARD অর্থাৎ **অগ্রসর সেনা**) হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় পুলিসের নজর অন্য দিকে ফেরানো। এক বছর পুরো হওয়ার

পরে আবার শুধু "দি ভ্যানগার্ড" নাম হয়। সব শেষে নাম হয়েছিল **দি মাসেজ অফ ইণ্ডিয়া** (THE MASSES OF INDIA, অর্থাৎ ভারতের জনগণ)। ১৯২৫ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে "দি ভ্যানগার্ডে"র নাম পরিবর্তিত হয়ে "দি মাসেজ্ অফ ইণ্ডিয়া" হয়েছিল। বার্লিনে কাগজ চালানোর ব্যাপারে নলিনী গুপ্ত রায় দম্পতিকে কমই সাহায্য করতে পারতেন। কেননা তিনি ইংরেজি লেখাপড়া খুব কম জানতেন। যতীন্দ্রনাথ মিত্রকে যে নলিনী গুপ্ত জার্মানী নিয়ে গিয়েছিলেন সে কথা আমি আগেই লিখেছি। তাঁর আইনসংগত পাসপোর্ট ছিল। তাঁকে এম· এন· রায় বার্তাবহরূপে ভারতে পাঠাতে চেয়েছিলেন। তিনি দেশে আসার জন্যে রওয়ানা হয়ে আবার বার্লিনে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর ফিরে আসার ইচ্ছা ছিল না। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির খরচে একটা কিছু শিখে আসতে চাইছিলেন। তাও যদি শিখতেন তিনি! তিনি নিজে কিংবা তাঁর হয়ে অন্য কেউ ব্রিটিশ ইন্‌টেলিজেন্সকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে যতীন্দ্রনাথ মিত্র কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের বার্তা নিয়ে ভারতে ফিরে যাচ্ছেন। তারপর লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে এক হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেল। সাবধান! সাবধান!! যতীন্দ্রনাথ মিত্র যেন ভারতে ঢুকতে না পান। আর যদি ঢুকে পড়েন তবে তাঁকে ধরে সংগে সংগেই যেন জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আসতে লাগল ভাইসরয়ের নামে। ভারতে ন্যাশনাল আরকাইব্‌সে রক্ষিত পুরানো দিনের গোপন কাগজপত্র পড়লে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। আহা! বেচারা যতীন মিত্র আজ আর বেঁচে নেই। থাকলে এসব গোপন কাগজপত্র পড়ে খানিকটা আত্মশ্লাঘা বোধ করতে পারতেন। ১৯২৬ সালে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। তখন দেখা গেল যে তাঁর সম্বন্ধে ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের আগেকার দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনা আর নেই। পুলিস তাঁর দিকে তেমন তাকিয়েও দেখছেন না। রাজনীতিক সংগ্রামে ঝাঁপ দেওয়ার মতো লোক যতীন মিত্র কোনো দিনই ছিলেন না। জার্মানী হতে ফেরার পরে কোথাও কোনো কাজ পেলেন না। অন্ন চিন্তায় জর্জরিত হয়ে তিনি কোথায় ছিলেন আমি কিছুই জানতেম না। ১৯৫১ সালে জেল হতে বার হয়ে এসে আমি বহু বৎসর পরে তাঁর খবর পেলাম। বাতে ভুগছেন, কষ্টে আছেন। আমাদের পার্টির জন্যে তিনি কখনও কিছু করেননি, পার্টি তাঁকে চিনতেনও না। আমি অতি সামান্য সাহায্য পাঠিয়েছিলেম। আমার পার্টি এলাউন্স হতে কীই বা পাঠাতে পারতেম? শুনেছি বড় কষ্ট পেয়ে যতীন মিত্র মারা গেছেন।

এই যতীন মিত্রকে নিয়েও এম· এন· রায় মুশকিলে পড়েছিলেন। ১৯২৩ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বার্লিন হতে তিনি আমাকে লিখেছিলেন ঃ

"It does not seem that Jatin Mitra will be of any particular use. It is another mistake of Kumar's to have brought him."

(মনে হচ্ছে না যে যতীন মিত্র বিশেষ কাজে আসবে। এটা কুমারের [নলিনী গুপ্তের নাম] আর একটি ভুল যে তিনি তাঁকে এনেছেন।)

ইংরেজি পত্রাংশ রায় লিখিত বাঙলার অনুবাদ। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, হাইকোর্টের আপিলের জন্যে কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার অন্য ভাষায় লিখিত দলীলগুলি ইংরেজিতে অনুবাদিত হয়েছিল। ওপরের বাঙলা অনুবাদ আমার।

আমার মনে হয় যতীন মিত্র কোন কাজেই লাগছিলেন না। অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এম· এন· রায় ১৯২৩ সালের ১৯শে মার্চ তারিখে আমায় আবার লিখলেন ঃ

"Jatin Mitra helps in office work to some extent. He is an unasked for burden. The Kumar's achievement. What to do with him ? I am trying to utilize him at least on clerical work, but a downright ass. You should have stopped his coming. A lot of money has been thrown into the water and is being thrown."

(যতীন মিত্র অফিসের কাজে কিছু কিছু সাহায্য করছে। সে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত বোঝা। কুমারের একটি মহান সাধন! তাকে নিয়ে কি করা যায়? আমি তাকে কমপক্ষে অফিসের কাজে লাগাতে চাইছি। [কিন্তু চাইলে কি হবে] লোকটি একটি আস্ত গাধা। আপনার উচিত ছিল তার আসা বন্ধ করা। তার জন্যে বহু টাকা জলে ফেলা হয়েছে এবং এখনও ফেলা হচ্ছে।)

এই পত্রাংশও কানপুর মোকদ্দমার পেপার বুক হতে নেওয়া। এম. এন. রায়ের পত্র বাঙলায় লেখা ছিল। তার ইংরেজি অনুবাদ করেছেন কুঞ্জবিহারী রায়। আমি এখানে অনুবাদের অনুবাদ করেছি।

যতীন মিত্রের মতো অকেজো লোককে নিয়েও রায় দম্পতি কঠোর পরিশ্রম করে কাগজ লিখেছেন ও ঠিক সময়ে তা বা'র করেছেন। কোনো দিন সামান্য বিলম্বও ঘটেনি। পুস্তক ও ইশ্‌তিহার ইত্যাদিও এই বার্লিন যুগে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, রায় দম্পতি বলতে আমি এখানে মানবেন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রথমা স্ত্রী এভেলিনের কথাই বলেছি।

১৯২২ সালের বার্লিন যুগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটি বিশিষ্ট কাজ হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের বিবেচনার জন্যে একটি প্রোগ্রাম পাঠানো। এই সময়ে রায় অনেককে অনেক পত্র লিখেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখেছিলেন, তাঁর পুত্র চিররঞ্জনকে লিখেছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র বসুকেও লিখেছিলেন।

এখানে একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। নলিনী গুপ্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়কে অনেক "হাইকোর্ট দেখিয়েছেন"। আশ্চর্য এই যে রায় বারে বারে নলিনীর মিথ্যার শিকারে পরিণত হয়েছেন। সম্ভবত ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস ছিল। নলিনী একদিন আমায় বললেন যে তিনি অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একবার জেলে গিয়ে দেখা করতে চান। এক সময়ে তাঁর সঙ্গে একই মেসে, অর্থাৎ সেই সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের মেসে থাকতেন নলিনী। দেখা করার কোনো অসুবিধা ছিল না। খিলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলনের কল্যাণে কলকাতার আলীপুর সেন্‌ট্রাল জেল লোকে লোকারণ্য ছিল। জেলের সব শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল। বাইরে থেকে যে-কোনো লোক এসে ভিতরের যে-কোনো লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারতেন। নলিনী আর আমি একদিন আলীপুর জেলের গেটে গিয়ে ভিতরে স্লিপ পাঠালাম। নলিনী পাঠালেন অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে, আর আমি পাঠালাম নোয়াখালীর হাজী আবদুর্ রশীদ খানের নামে। ভিতরে গিয়ে আমরা জেইলারের আফিসের ভিতরের দিককার জানালায় দাঁড়িয়ে দু'জনে দু'জনের সঙ্গে দেখা করলাম। কারণ, আফিসের ভিতরে খুব ভিড় ছিল। বিশেষ ক'রে ফরিদপুরের পীর বাদশা মিঞার সঙ্গে তাঁর নূতন জামাই (কার্তিকপুরের গিয়াসুদ্দীন আহ্‌মদ চৌধুরী) দেখা করতে এসেছিলেন। নলিনী নিজের কাজ (মিশন) সম্পর্কে অধ্যাপক ব্যানার্জিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে

কি বলেছিলেন তা জানিনে। তবে, ব্যানার্জি চিত্তরঞ্জন দাশের ছেলে চিররঞ্জন দাশকে ডেকে এনে নলিনীর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে নিজে তাঁর ব্যারাকে ফিরে গেলেন। তিনি হয়তো রাজাবাজার বোমার মামলার আসামী অমৃতলাল হাজরার বিরুদ্ধে পুলিসের নিকটে দেওয়া নলিনীর বিবৃতির কথা জানতেন। তাঁর সঙ্গে একই মেসে থাকার সময়েই নলিনী এই কাজটি করেছিল। আমিও হাজী আবদুর রশীদ খানের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা ব'লে গেটের বাইরে চলে গিয়ে নলিনীর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। চিররঞ্জনের সঙ্গে নলিনীর কথা হয়েছিল। কি কথা হয়েছিল তা নিজের কানে আমি শুনিনি। চিররঞ্জন নাকি নলিনীকে বলেছিলেন যে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুসহ আমাদের প্রোগ্রাম মেনে কাজ করবেন। হয়তো বাপের মতও করাবেন একথাও বলে থাকবেন।

এর পরে নলিনী গুপ্ত বার্লিনে ফিরে গিয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে আরও একবার "হাইকোর্ট দেখালেন"। তার ফলে আমরা দেখতে পেলাম যে রায়ের নিকট হতে লম্বা লম্বা চিঠি আসছে চিত্তরঞ্জন দাশের নামে, তাঁর পুত্র চিররঞ্জন দাশের নামে এবং সুভাষচন্দ্র বসুর নামেও। সুভাষ বসুর নামীয় পত্রখানি প্রথমে আমার নিকটে এসেছিল। আমি তা ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে দেখাই। দত্ত যখন সংস্কৃত কলেজে পড়ছিলেন তখন তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিলসফির অনার্স ক্লাসে যোগ দিতে হতো। এই ক্লাসে সুভাষ তার সহপাঠী ছিলেন। এই জন্যে উৎসাহভরে তিনি বললেন, "সুভাষের পত্রখানা আমিই তাকে পৌঁছিয়ে দেব"। কিন্তু ফিরে এসে তিনি আমায় জানালেন যে "সুভাষ পত্রখানি নিল না"। আমি পড়লাম মুশকিলে। এই পত্র নিয়ে সুভাষ বসুর সঙ্গে আমায় দেখা করতে বলা হয়েছিল। সুভাষ যখন তাঁর সহপাঠী ভূপেন দত্তের নিকট হতে পত্রখানি গ্রহণ করেননি তখন এটা নিশ্চিত ছিল যে আমার নিকট হতেও তিনি তা গ্রহণ করবেন না। আমার সঙ্গে আগে তাঁর কোনো পরিচয়ও ছিল না। তবুও আমি একদিন সুভাষের নিকটে গেলাম। তিনি বললেন যাঁরা তাঁকে পত্র লিখতে চান তাঁরা যেন সোজাসুজি লেখেন। সিবিল সার্বিস পাস ক'রে চাকরী গ্রহণ না করার অহংকারে তাঁর তখন মাটিতে পা পড়ছিল না, তা ছাড়া হয়তো একথাও ভেবেছিলেন যে এর-ওর মারফতে চিঠি-পত্র গ্রহণ ক'রে কেন তিনি মিছামিছি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে যাবেন।

কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে আমাদের প্রোগ্রাম পেশ

বাহাদুর চার্লস্ আশ্‌লী

১৯২২ সালের ৫ই নভেম্বর হতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মস্কোতে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের শেষার্ধে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট চার্লস্ আশ্‌লী (Charles Ashliegh) এম. এন. রায়ের নিকট হতে বার্তা ও প্রতিনিধিদের রাহা খরচের টাকা নিয়ে (মস্‌উদ আলী শাহের মতে আট শ' পাউণ্ড) বোম্বেতে পৌঁছেই বিপদে পড়ে যান। তিনি যে আসছেন এ খবর আগেই ভারত গবর্নমেণ্ট পেয়ে যান। লণ্ডনের ইণ্ডিকা হাউস হতে (সেক্রেটারি অফ্ স্টেট্ ফর ইণ্ডিয়ার আফিস হতে) ভারত গবর্নমেণ্টের নামে নির্দেশ আসে যে আশ্‌লীর জাহাজ বোম্বে পঁহুছা মাত্রই তাঁর পাসপোর্ট হতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভ্রমণের ভিসা (Visa) যেন বাতিল করে দেওয়া হয়। তাই করা হয়েছিল। চার-পাঁচ দিনের আগে আশ্‌লীর ইউরোপে যাওয়ার কোনো জাহাজ ছিল না। এই সময়টা কড়া পুলিস পাহারার ভিতরে তাঁকে বোম্বের হোটেলে থাকতে দিতে বোম্বে পুলিস বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বাহাদুর বিপ্লবী ছিলেন চার্লস্ আশ্‌লী। ভারতের অন্য কোথাও যেতে না পারলেও বোম্বে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি এস. এ. ডাঙ্গের সঙ্গে দেখা করতে পেরে-ছিলেন। তাকে তিনি কাগজ-পত্র, মৌখিক উপদেশ এবং প্রতিনিধিদের রাহা খরচের টাকা (ব্রিটিশ পাউণ্ড নোট) দিয়ে গিয়েছিলেন। বোম্বেতে যা যা ঘটেছিল এই সবই চার্লস্ আশ্‌লী বার্লিনে পৌঁছে এভেলিন রায়ের নিকটে রিপোর্ট করেছিলেন। রায় তখন কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসের উদ্যোগ-আয়োজন করার জন্যে মস্কো গিয়েছিলেন। এভেলিন সঙ্গে সঙ্গেই আশ্‌লীর সবিশেষ রিপোর্ট রায়কে মস্কোয় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আশ্‌লী সংক্রান্ত দুর্ঘটনার রিপোর্ট পাওয়ার পরে ২রা নবেম্বর (১৯২২) তারিখে রায় মস্কো হতে ডাঙ্গেকে একখানি পত্র লেখেন। এই পত্র হতে কিছু কিছু অংশ আমি এখানে তুলে দেব ঃ

MOSCOW
November 2 [1922]

My dear Comrade Dange,

Our friend, who saw you at Bombay, has come back in time and has related the whole affair. It is unfortunate that he met such a disaster. We counted much upon the success of his mission. But we believe that he did the best that could be done under the circumstances, that is to transfer his charge to the

best Person available. And we look upon you as the most suitable for the purpose and trust that you have seen that some result is achieved. It is needless to say that presence of some delegates from India will be very welcome and will lead to future welfare of our movement.

* * * *

বঙ্গানুবাদ

মস্কো
নবেম্বর ২ [১৯২২]

প্রিয় কমরেড ডাঙ্গে,

আমাদের যে বন্ধু বোম্বেতে আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন তিনি যথা সময়ে ফিরে এসেছেন এবং সব কথা আমাদের জানিয়েছেন। এটা খুবই বেদনাদায়ক ব্যাপার যে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। যে কাজের ভার তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন তার সফলতা প্রাপ্তির ওপরে আমাদের অনেক কিছু নির্ভর করছিল। কিন্তু এটা আমরা বিশ্বাস করি, যে দুরবস্থার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন সে অবস্থায় সর্বোত্তম ব্যবস্থা যা করা যেত তা তিনি করেছেন, অর্থাৎ **শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির** হাতে কাজের ভার তিনি ন্যস্ত করেছেন। এবং এই কাজের জন্যে আমরা **আপনাকেই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক মনে করি।** আমরা বিশ্বাস করি, আপনি বুঝেছেন যে এই থেকে কিছু ফলোদয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটা বলা বাহুল্য যে ভারতবর্ষ হতে কিছু সংখ্যক প্রতিনিধির আগমন খুবই সুস্বাগত হবে এবং তা আমাদের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের পক্ষে মঙ্গলপ্রসূও হবে।... ..

তারপরে রায় এই পত্রে বলেছেন, ভারতে যে কমিউনিস্ট পার্টি অংকুরিত হচ্ছে তার উচিত বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে ("for the revolutionary nationalist struggle") একটি জনগণের পার্টির স্থাপনায় একান্তভাবে পরিশ্রম করা। তাতে রায় কয়েকটি পয়েণ্টও দিয়েছেন। প্রথম পয়েণ্টটি হচ্ছে ঃ

"1. All the Left Wing nationalist elements are organised in order to present a solid opposition at Gaya to those who went to the congress as a political organ,"

(১। যাঁরা কংগ্রেসকে রাজনীতিক সংগঠন হিসাবে ব্যবহার করার জন্যে গয়া যাবেন তাঁদের একযোগে বিরোধিতা করার জন্যে সমস্ত বাম মতাবলম্বী জাতীয়তা-বাদীদের সংগঠিত ক'রে তুলতে হবে।)

তারপরে, জনগণকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার প্রোগ্রামের কথা রায় বলেছেন। এই প্রোগ্রাম এমন হবে যার দ্বারা কংগ্রেসের ভিতরকার অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা, অর্থাৎ যাঁরা জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী তাঁরা আমাদের দিকে আকৃষ্ট হবেন। কংগ্রেসকে যে আধ্যাত্মিকতার দিকে টেনে নেওয়া হচ্ছে তা থেকেও কংগ্রেস বেঁচে যাবে।

রায় বলছেন ঃ

"5. I will write this proposed programme along with lines repeatedly indicated in our paper during the last half a year."

(৫। এই প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম আমিই রচনা করব এবং গত ছয় মাস আমাদের কাজের যে ধারার কথা আমরা বারে বারে আমাদের কাগজে ব্যক্ত করেছি সেই ধারাকে ভিত্তি করেই রচনা করব।)

কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের সামনে পেশ করার জন্যে মস্কোতেই এম· এন· রায় তাঁর এই প্রোগ্রামটি রচনা করেছিলেন। তাতে সুবিধা হয়েছিল এই যে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের কর্তৃপক্ষের দ্বারা তিনি তার অনুমোদন করিয়ে নিতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যে ক'জন সভ্য মস্কোতে ছিলেন তাঁদেরও তিনি প্রোগ্রামের মুসাবিদা দেখিয়ে নিতে পেরেছিলেন। এই প্রোগ্রামই ভারতের জন-সমক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় ইশ্‌তিহার। প্রথম ইশ্‌তিহার আহ্‌মদাবাদ কংগ্রেসে (১৯২১) বিতরিত হয়েছিল।

মস্কো হতে বার্লিনে ফিরে এসে এম· এন· রায় তাঁর প্রোগ্রামটির প্রচারে মনোনিবেশ করলেন। ভারতের পুলিস আগে হতেই খবর পেয়েই গিয়েছিলেন যে এই রকম একটি প্রোগ্রাম আসবে। ২রা নভেম্বর (১৯২২) তারিখে ডাঙ্গেকে লেখা রায়ের পত্রে প্রোগ্রামের উল্লেখ ছিল। আরও অনেককে হয়তো রায় একথা জানিয়ে থাকবেন। পুলিস আটঘাট বেঁধে তৈয়ার হয়েছিলেন যে এই প্রোগ্রামের ভারতে প্রচার তাঁরা বন্ধ করবেনই। প্রায় তাঁরা সফলও হয়েছিলেন। সি· আর· দাশ হতে আরম্ভ ক'রে অন্য বহু লোকের ডাক অনুসন্ধান ক'রে তাঁরা প্রোগ্রামটি আটকিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য দিক হতে তাঁরা মার খেয়ে গেলেন, যে কথা হয়তো তাঁরা আগে ভাবতেও পারেননি। বিশ্বদূত রয়টার এই প্রোগ্রামটি লণ্ডন হতে ভারতে প্রচার ক'রে দিলেন।

প্রোগ্রামটিকে বিশ্লেষণ ক'রে এম· এন· রায় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের কাগজ "এডভান্স গার্ডে" পুরো প্রোগ্রামটি ছাপা হয়েছিল। ২০শে ডিসেম্বর (১৯২২) তারিখে রয়টার এই প্রোগ্রাম সম্বন্ধে একটি বিবৃতি ছাপেন। শিরোনাম ও উপ-শিরোনামসহ "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় তা ছাপা হয়েছিল। শিরোনাম ও উপ-শেরোনাম রয়টারের, না, অমৃতবাজার পত্রিকা"র তা জানিনে। তবে, আগেকার কালে সাধারণত পত্রিকাওয়ালারাই এ শিরোনামগুলি দিতেন।

ভারতে বলশেভিক লক্ষ্যসমূহ

স্বতন্ত্র হওয়ার অভিসন্ধি—খোলাখুলি বিপ্লব ঘটানোর দাবী—বিস্ময়কর প্রোগ্রাম, লণ্ডন, ডিসেম্বর ২০

ভারতীয় কমিউনিস্ট রায়, ওর্ফে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এখন বার্লিনের বাশিন্দা, রাশিয়ান সোবিয়েতের অনুমোদনক্রমে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নিকটে পেশ

করার জন্যে যে-প্রোগ্রাম তিনি রচনা করেছেন তার সবিশেষ বিবরণ জ়ুরিখ্‌ হতে ইংল্যাণ্ডে পেঁছেছে।

সংগঠিত বিপ্লবের ভিতর দিয়ে এই প্রোগ্রাম ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হতে বা'র করে নিতে চায়। সব কিছুর ওপরে এই প্রোগ্রাম স্থাপন করতে চায় একটি ন্যাশনাল এসেম্‌ব্‌লী, প্রোগ্রাম জমীদারী প্রথাকে উচ্ছেদ করতে চায়, জমীদারী ইস্টেট্‌গুলিকে বাজেয়াফ্‌ৎ ক'রে নিতে চায়, রেলওয়ে, ট্রাম প্রভৃতি সাধারণের ব্যবহারের যন্ত্রগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে চায়, সর্বনিম্ন মজুরী ধার্য করতে চায়, আটঘণ্টা কাজের দিন করতে চায়, আর চায় মজুরদের কাউন্সিল গঠন ক'রে মজুরদের অধিকার রক্ষা করতে।

লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্যে দেশময় কৃষক সমিতিসমূহ (ইউনিয়নস) গঠন করতে হবে, "ট্যাক্স বন্ধ করার দাবী মুখরিত" জনগণের মিছিলসমূহ বা'র করতে হবে, উচ্চ মূল্যের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্যে ধর্মঘটসমূহকে সমর্থন জানাতে হবে ও ধর্মঘটসমূহ সংগঠন করতে হবে। তা ছাড়া, দেশময় জাতীয় ভলান্‌টিয়ার বাহিনীসমূহ গঠন করতে হবে। আর, আইনসভাগুলিতে প্রবেশ করতে হবে সেগুলিকে ভাঙার জন্যে।

[অমৃতবাজার পত্রিকা, ২২শে ডিসেম্বর (১৯২২) হতে উদ্ধৃত]
—(কপি রাইট)

১৯২২ সালের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে রয়টার লণ্ডন হতে এম· এন· রায়ের (রায়ের প্রোগ্রাম নামে তা প্রচারিত হয়েছিল) প্রায় পুরো প্রোগ্রামটি ভারতে পাঠালেন। তার সঙ্গে রায়ের অতি সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয়ও দিয়েছিলেন। তাতে বলেছেন রায়ের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বাংলাদেশে তিনি রাজনীতিক ডাকাত ছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি জাবায় জার্মানীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি কালিফোর্নিয়ায় আশ্রয়-গ্রহণকারী ছিলেন। তারপরে মেক্‌শিকোতে তিনি ছিলেন বল্‌শেভিকদের প্রচারক। ১৯২০ সাল হতে তিনি বার্লিন, মস্কো ও তাশকন্দের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জীবিকার জন্যে তিনি তাঁর রাশিয়ার কমিউনিস্ট মনিবদের জন্যে সাহিত্য কর্মে ও রাজনীতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। "এডভান্স গার্ড" নামক কাগজও তিনি চালিয়ে থাকেন। ভারতে এই কাগজের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

১৯২২ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে লণ্ডন হতে রয়টার প্রেরিত এই প্রোগ্রাম সারা ভারতের দৈনিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়, কেউ ছেপেছিলেন বেশী, কেউ কম। কলকাতায় "অমৃতবাজার পত্রিকা" প্রোগ্রামটির বেশীর ভাগ ছেপেছিলেন বললেও চলে। শুধু শেষ দিককার একটি ছোট অংশ তাঁরা ছাপেননি। আমি শুনেছি, নিজের চোখে কখনও দেখিনি, বোম্বের "দি টাইম্‌স্‌ অফ ইণ্ডিয়া" নামক ইংরেজি দৈনিক প্রোগ্রামটির খুব বেশী অংশ ছেপেছিলেন।

কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ রায়ের **"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি"** (best person available) এস· এ· ডাঙ্গে একটা কাণ্ড ক'রে বসল। ২২শে ডিসেম্বর (১৯২২) তারিখে সমস্ত ভারতের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা আমাদের প্রোগ্রামের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করলেন, হয়তো বিরুদ্ধে মন্তব্যও লিখলেন। লিখবেনই তো তাঁরা। তাঁদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এস· এ· ডাঙ্গেও তার "সোশ্যালিস্ট" নামক ইংরেজি সাপ্তাহিকের ২৩শে ডিসেম্বরের (১৯২২) সংখ্যায় প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে একটি সম্পাদকীয়

মন্তব্য লিখে বসল, আর তার শিরোনাম দিল "রয়টার বলশেভিকবাদ প্রচার করছে" (Reuter Spreading Bolshevism)। ১৯২২ সালের কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন প্রদেশের মেম্বরদের কেউ কাউকে চিনতেন না, শুধু একে অন্যের নাম জানতেন। তা সত্ত্বেও আমি ডাঙ্গেকে একখানা পত্র লিখলাম। তাতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ওই রকম মন্তব্য সে কেন লিখল, আর ওই রকম শিরোনামই বা সে কেন দিল? ডাঙ্গে একখানা পোস্ট কার্ডে আমার পত্রের উত্তর দিল,—লিখল আমার পত্র পেয়ে সে অতি আনন্দিত ("overjoyed")। সে আশা করেছিল এই রকম শত শত পত্র আসবে।[১]

যাই হোক, নীচে আমি গয়া কংগ্রেসের নামে প্রচারিত পুরো প্রোগ্রামের বাঙলা অনুবাদ দিলাম ঃ

১ ডাঙ্গেদের মারাঠী ভাষায় আমাদের বাঙলার মতো "আপনি" শব্দ নেই। পরে যখন আমরা হিন্দুস্তানীতে পরস্পর কথা বলেছি তখন "তুম" শব্দ ব্যবহার করেছি। (লেখক)

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের জন্যে একটি প্রোগ্রাম

আমাদের আন্দোলন এমন এক স্তরে এখন এসে পৌঁছেছে যখন জাতীয় মুক্তির এবং তৎসংক্রান্ত কার্যকলাপের একটি সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম গ্রহণ করার ব্যাপারকে আর ফেলে রাখা যায় না।

যাঁরা মাঝ পথে এসে থেমে থাকতে চান না, কিংবা উদারনৈতিকদের (liberals) দ্বারা প্রচারিত তথাকথিত আপোসপন্থী "বিবর্তনবাদী" পদ্ধতিতে অবিশ্বাসী, তাঁদের অবস্থা বিবৃত করার জন্যে জাতীয় মুক্তির একটি প্রোগ্রাম এখনই তৈয়ার করা আবশ্যক। **স্বরাজ** নামক অস্পষ্ট কথাটির নানান রকম ব্যাখ্যা করা যায়, বস্তুত আমাদের আন্দোলনে যে নানান পথের ও নানান স্বার্থের লোকেরা যোগ দিয়েছেন তাঁরা নিজ নিজ মতলব অনুযায়ী তা করেছেন। এত অনিশ্চিত উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো আন্দোলন শক্তিশালী হতে পারে না। পক্ষান্তরে, এইভাবে চালালে আন্দোলন দুর্বল হয়ে যায়। কংগ্রেসের পতাকাতলে যথাসম্ভব বিপ্লবী শক্তিসমূহকে সমবেত করার জন্যে একটি সংগ্রামশীল কাজের প্রোগ্রাম তাই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আমাদের জাতি এক ধরনের লোকের সমবায়ে গঠিত একটি জনসমষ্টি নয়। তা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। এ সকল শ্রেণীর স্বার্থ বিভিন্ন এবং প্রায়ই একের স্বার্থের সহিত অপরের স্বার্থের সংঘাত বাধে। এই সামাজিক শ্রেণীরা তাঁদের আপন আপন শ্রেণী স্বার্থের জন্যে লড়াই করেন। তাঁরা কিন্তু বিশ্বাস করেন যে জাতীয় মুক্তি সাধিত হলে তাঁদের কোন নালিশ আর থাকবে না। এই কারণে ন্যাশনাল কংগ্রেস একটি সংহত রাজনৈতিক দল (পার্টি) নয়। এটা আগে হতে চলে আসা জাতীয় সংগ্রামের একটি সংগঠন মাত্র। অতএব ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রোগ্রাম কোন একটি শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের প্রোগ্রাম হতে পারে না। ন্যাশনাল কংগ্রেস বিদেশী শাসক শ্রেণীর দ্বারা নির্যাতিত শক্তিসমূহের একটি সমবায় মাত্র। তার প্রোগ্রামকেও বিভিন্ন শ্রেণীর যুক্ত প্রোগ্রাম হতে হবে।

প্রথমেই আমাদের স্থির করতে হবে যে জাতির বেশীর ভাগ মানুষের সুখ-সুবিধার জন্যে আমরা কোন্ ধরনের জাতীয় স্বায়ত্তশাসন চাই; তারপরে এমন সংগ্রামের পদ্ধতি স্থির করতে হবে যার দ্বারা স্বায়ত্তশাসন করায়ত্ত হবে।

জাতীয় মুক্তির প্রোগ্রাম

একথা সকলেই জানেন যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন ভারতের জনসাধারণকে অর্থনীতিক ধ্বংসের পথে টেনে এনেছে, তাঁদের শিল্প-প্রসারের গতি করেছে রুদ্ধ, তাঁদের নামিয়ে এনেছে সামাজিক অধঃপতনের মুখে, আর তাঁদের মানসিক বিকাশের পথেও এই শাসন সৃষ্টি করেছে বাধা। ভারতের মানুষদের উপরে

ব্রিটিশ শাসকদের বেদনাকর অপরিসীম শোষণ ও নিষ্ঠুর নির্যাতন ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করেছে। এই দাসত্ব হতে ভারতের মানুষদের মুক্ত করার প্রয়োজনই হচ্ছে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য। যতদিন রাজনীতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে থাকবে ততদিন জনগণের জন্যে কোনো অর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নতি সম্ভব হবে না। এই কারণে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা জাতীয় গবর্নমেণ্টের পরিচালনা গ্রহণ। লিবারেল লীগের দলত্যাগী দেশপ্রেমিকদের ভাবনা অনুযায়ী এটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধোন্মাদদের অনুমোদনে ও পরহিতৈষণামূলক সংরক্ষণের ভিতরে লাভ হতে পারে না। কেননা, কোনো রকমের স্বায়ত্তশাসন বা হোম রুল বা স্বরাজ্য ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্বে লাভ করার মানে কিছুই লাভ করা নয়। এই পথে অগ্রসর হওয়ার মানেই হবে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করা। এই সবই হবে ছদ্মাবরণ মাত্র। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতা হিসাবে সাহসের সহিত কংগ্রেসের এইরূপ পন্থা গ্রহণের বিরোধিতা অবশ্যই করা উচিত। কোনো রকমের ভুল ভ্রান্তির আশ্রয় না নিয়ে কংগ্রেসকে তার লক্ষ্য ঘোষণা করতে হবে। এই লক্ষ্য হবে পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন জাতীয় গবর্নমেণ্ট। তার ভিত্তি হবে বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই ভোট দেওয়ার গণতান্ত্রিক নীতি।

সমান অংশীদার হওয়ার তত্ত্ব একটি কল্পনাবিলাস মাত্র

"ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্রের (commonwealth) ভিতরে সমান মালিকানা"র তত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদের সোনার পাথর বাটি (gilded version) ছাড়া আর কিছুই নয়। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই শুধু এর ভিতরে সান্ত্বনা খুঁজে পেতে পারেন। কারণ, এর পেছনের মতলব হচ্ছে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দেশীয় জমীদার ও ধনিকদের শোষণ ব্যবস্থায় ব্রিটিশের জুনিয়ার অংশীদার করে নেওয়া। এই জাতীয় সুবিধা (concession) পেলে উচ্চ শ্রেণীসমাজের লোকেরা সীমাবদ্ধভাবে উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু জনসাধারণের বিশাল অংশের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক দাসত্ব থেকেই যাবে। "শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক" পন্হাবলম্বনের যাঁরা প্রচারক তাঁরা আসলে ভারতীয় জাতিকে ব্রিটিশের চিরদাসত্বে রেখে দেওয়ার পক্ষপাতী। আমাদের "সুসভ্য" করে তোলার জন্যে ব্রিটিশ যে আমাদের দেশ জয় করেনি একথা বুঝিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। দয়ালু ব্রিটিশ শাসনের পরিচালনায় থেকেই আমরা পরিপূর্ণ রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্যলাভ করব এটা বিশ্বাস করা মনে একটা ভ্রান্তি পোষণ করা মাত্র। যাঁরা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সহিত সহযোগিতায় বিশ্বাসী তাঁরা নিরেট মাথাওয়ালা ব্যবসায়ী, যে কোনো ভ্রান্তিতে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন। যদি তাঁরা "শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক" পথের কথা প্রচার করেন তবে বুঝতে হবে যে রাজনীতিক পরিচালনায় হঠাৎ একটা বিরাট পরিবর্তন আসার চেয়ে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায় তাঁদের শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

আমাদের জমীদার ও ধনিক শ্রেণী

জমিদারেরা তাঁদের জমীদারীর নিরাপত্তা চাইবেন, আর চাইবেন তাঁদের সেই অধিকারের সংরক্ষণ যার দ্বারা তাঁরা অত্যধিক করের ও আরও বহু রকম

আবওয়াবের চাপে কৃষককুলের রক্ত শোষণ করতে পারবেন। যে গবর্নমেণ্ট তাঁদের এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন তারই বিশ্বস্ত সমর্থক হবেন তাঁরা। শাসকদের জাতীয়ত্ব কি তাতে তাঁদের কিছুই এসে যায় না। ধনী উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রের বিস্তার চান। যে গবর্নমেণ্ট এ ব্যাপারে তাঁদের বিস্তারের সুযোগ-সুবিধা দিবেন সেই গবর্নমেণ্ট তাঁদের সমর্থন ও সহযোগিতা পাবেন। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট যদি আমাদের দেশের শিল্প বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিবন্ধক সৃষ্টির পুরানো নীতি এখনও বজায় রাখতে চান তবে আমাদের ধনিক শ্রেণীরা তাঁদের বিরুদ্ধে গিয়ে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যোগ দিবেন। কিন্তু শোষণের সুবিধার জন্যে আর বিশ্বযুদ্ধে যে সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে তাতে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিতে কিছু পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। জনগণের ভিতর ক্রমবর্ধমান অসন্তোষে ব্রিটিশ শাসকদের এমন কিছু শক্তিশালী ভারতীয়দের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হতে বাধ্য করেছে যাঁরা শাসন ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখাকে ফলদায়ক ও লাভজনক মনে করেন। এই রকম সাহায্য করার জন্যে এই ভারতীয়দের ব্রিটিশ কিছু অর্থনীতিক ও রাজনীতিক সুযোগ-সুবিধা দেবে। এই ভাবে জমীদার ও ধনিক শ্রেণীরা মনে করেন যে সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর ভিতরেই তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া সম্ভব। তাঁরা মনে করেন ব্রিটিশ শাসনের অধীনেই তাঁদের সম্পত্তির অধিকার রক্ষিত হবে এবং তাঁদের অর্থনীতিক উন্নতির পথ খুলে যাবে। জমীদার ও ধনিক শ্রেণীদের ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার কোনো কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের অর্থনীতিক স্বার্থের খাতিরে তাঁরা শান্তিপূর্ণ অবস্থাই চান যে-শান্তিপূর্ণ অবস্থা সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির দ্বারা স্থাপিত হয়েছে। জমীদার ও ধনিকেরা দেশের রাজনীতিক অবস্থাতে হঠাৎ পরিবর্তন আসাকে ভয়ের চোখে দেখেন। কারণ, সম্পত্তি, ব্যবসায় ও শিল্পের নিরাপত্তার জন্যে যে "শান্তিশৃঙ্খলা" অপরিহার্য দেশের হঠাৎ রাজনীতিক পরিবর্তন তাতে বিঘ্ন ঘটাবে। জনগণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ভয়কে বাদ দিয়ে জাতীয় মুক্তির সঠিক প্রোগ্রাম কার্যে পরিণত করা সম্ভব নয়। আর, জনগণ একবার রাজনীতিক ক্ষমতা দখল করলে তা দেশের উচ্চশ্রেণীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাঁরা আবার তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বের অবস্থায় ফিরে যেতে রাজী নাও হতে পারেন। এই সকল অস্বাগত সম্ভাবনাসমূহকে এড়াবার জন্যে জমীদার ও ধনিক শ্রেণীরা শান্তিপূর্ণ ও ধীর-লভ্য উন্নতি লাভেরই পক্ষপাতী। নিজেদের ওপরে কোনো বিপদ ডেকে না এনে যতটা পাওয়া সম্ভব ততটা পাওয়াকেই তাঁরা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন।

এই সতর্কতা ও আপোস-নিষ্পত্তির নীতিতে ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থের কোনো স্থান নেই। সমাজের উচ্চস্তরের অল্প সংখ্যক লোকদের স্বার্থ ও নিরাপত্তার দিকে নজর রেখেই এটা পরিকল্পিত হয়েছে। এই কারণে এটা বলা বাহুল্য, ন্যাশনাল কংগ্রেসকে অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে যে লিবারেল লীগের প্রোগ্রাম কিংবা মূলত ওই রকমের অন্য কোনো প্রোগ্রাম সমস্ত ভারতীয় জাতিকে মুক্তির ধারে কাছেও নিয়ে যাবে না। কারণ, "কমনওয়েলথের ভিতরে সমানাংশে"র "মালিক হওয়া", কিংবা "ডোমিনিয়ন স্বায়ত্তশাসন" লাভ করা, কিংবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে "স্বশাসন" লাভ করা,—এই সব কিছুতেই ভারতের জনসাধারণ ব্রিটিশ শাসনাধীনই থাকবেন, তবে এই শাসন ভারতের ধনিক শ্রেণীর সাহায্যে ও মৌন সম্মতিতে চালিত হবে।

অপরিবর্তিত হৃদয়

ব্রিটিশ শাসকেরা "হৃদয়ের পরিবর্তন করবেন" এই মত যাঁরা প্রচার করেন তাঁরা সেই সকল লোকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ভুলে যান যাঁরা মাঝ পথে মিটমাট করে নিতে চান। এই মতাবলম্বীদের পক্ষে সম্ভাবনা আছে যে তাঁরা ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সঙ্গে একীভূত ক'রে নিবেন। ফলে এই দাঁড়ায় যে "হৃদয় পরিবর্তনের" মতটি একটি বিপজ্জনক মত এবং কংগ্রেসকে অতি অবশ্য এই মতের হাত হতে মুক্ত হতে হবে। কংগ্রেসের ভিতরের এই দোমনা ভাব. তার উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তা, গত এক বছর তার কার্য-ক্রমকে দোদুল্যমানতা ও দুর্বলতার পথে টেনে এনেছে। ভারতীয় জনসাধারণের স্বাধীনতা লাভের জন্যে দৃঢ়পণ সংগ্রাম আবশ্যক। একটি সুপরিকল্পিত প্রোগ্রাম সামনে তুলে ধরার ওপরেই সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করবে। এই রকম প্রোগ্রামই শুধু জনগণকে জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনবে—এই রকম প্রোগ্রাম যা জন-জীবনের মূল সমস্যাগুলিকে বিবেচনা করেছে।

এই কারণে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস নিম্নলিখিত প্রোগ্রাম ঘোষণা করছে ঃ

জাতীয় মুক্তিসাধন ও পুনর্গঠনের প্রস্তাব

(১) পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা যা সর্বপ্রকারের সাম্রাজ্যবাদী সংস্রব হতে বিচ্ছিন্ন হবে এবং যা সর্বপ্রকার বৈদেশিক তত্ত্বাবধান হতে মুক্ত হবে।

(২) বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই ভোটের দ্বারা একটি ন্যাশনাল এসেম্‌ব্লী নির্বাচিত হবে। জনগণের প্রভুত্ব (Sovereignty) ন্যস্ত হবে এই ন্যাশনাল এসেমব্লীর ওপরে, আর এই ন্যাশনাল এসেমব্লীই হবে সর্বোচ্চ অধিকার (Supreme authority)।

(৩) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র (Federated Republic of India) স্থাপন।

মুক্ত জাতির অর্থনীতিক ও সামাজিক জীবন যে নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হবে তা হচ্ছে ঃ

সামাজিক ও অর্থনীতিক প্রোগ্রাম

(১) জমীদারী প্রথার বিলোপ সাধন। কোনো ক্ষতিপূরণ না দিয়েই বড় বড় জমীদারী ইস্টেটগুলির বাজেয়াফ্‌ৎকরণ। জমীর শেষ মালিকানা জাতীয় রাষ্ট্রের (National State) হাতে ন্যস্ত হবে। যাঁরা সত্য সত্য চাষ করেন তাঁদের শুধু জমী রাখতে দেওয়া হবে। জমী নিয়ে যাঁরা অন্যের নিকট হতে ট্যাক্স আদায় (Tax-farming) করবেন তাঁদের জমী দেওয়া হবে না।

(২) চাষীর আর্থিক অবস্থা উন্নত করার উদ্দেশ্যে জমীর খাজনার হার নিম্ন-তম ধার্য করা হবে। টাকা ধার দিয়ে কৃষককে সুদখোর মহাজনের ও ফটকাবাজ ব্যবসায়ীর মুঠো হতে মুক্ত করার জন্যে রাষ্ট্রীয় কৃষি কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক স্থাপিত হবে।

(৩) হাল আমলের কৃষি ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে কৃষককে রাষ্ট্র হতে সাহায্য দেওয়া হবে। রাষ্ট্রীয় কো-অপারেটিবের মধ্যবর্তিতায় চাষ করার মেশিন কৃষকের নিকটে বিক্রয় করা হবে বা তাঁকে ধার দেওয়া হবে।

(৪) সকল রকম পরোক্ষ ট্যাক্স বাতিল ক'রে দেওয়া হবে এবং তার স্থলে ৫০০ টাকা আয় হতে শুরু ক'রে ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর ধার্য হবে।

(৫) জনসাধারণের নিত্য ব্যবহারের যন্ত্রগুলি (Public Utilities), খনি-সমূহ, রেলপথগুলি, তারবার্তা পাঠাবার ব্যবস্থাগুলি (Telegraphs) এবং দেশের ভিতরকার জলপথগুলি,–এসবেরই মালিক হবে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রই এসব বিভিন্ন কার্যকরী কমিটির মারফতে পরিচালনা করবে,–মুনাফা করার জন্য নয়, জাতির ব্যবহার ও উপকারের জন্য।

(৬) রাষ্ট্রের সাহায্যে ও তত্ত্বাবধানে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা হবে।

(৭) আইন প্রণয়ন ক'রে কল-কারখানার মজুরদের সর্বনিম্ন মজুরী ধার্য করা হবে।

(৮) বয়স্ক পুরুষ মজুরদের জন্যে সর্বোচ্চ আট ঘণ্টা কাজের দিন ও সাড়ে পাঁচ দিনের সপ্তাহ আইন ক'রে নির্ধারিত করতে হবে। নারী মজুরদের জন্যে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক মজুরদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে।

(৯) কারখানার মালিকেরা মজুরদের বাসস্থান, কাজের ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি ও অন্যান্য সুখ-সুবিধার একটা বিশেষ মান বজায় রাখতে আইনের দ্বারা বাধ্য থাকবেন।

(১০) মজুরদের বৃদ্ধ বয়সে জীবনধারণের সুব্যবস্থাকারী আইন প্রণয়ন করতে হবে। অসুস্থতা ও বেকারীর ইন্‌সিউরেন্স সম্বন্ধে প্রত্যেক শিল্পে আইন পাস করিয়ে নিতে হবে।

(১১) মজুর সংগঠনগুলিকে আইনের মর্যাদা দিতে হবে এবং মজুরদের দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে তাঁদের ধর্মঘট করার অধিকারকে মেনে নিতে হবে।

(১২) প্রত্যেক বড় কারখানার মজুরদের অধিকার রক্ষা করার জন্যে তাঁদের দ্বারা কাউন্সিল গঠিত হবে। কাউন্সিলগুলি তাঁদের কার্য পরিচালনায় রাষ্ট্রের সমর্থন পাবে।

(১৩) বড় বড় শিল্পে মজুরদের সঙ্গে মুনাফার ভাগ বণ্টনের রেওয়াজ চালু করতে হবে।

(১৪) অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা। বালক ও বালিকা উভ । জন্যেই শিক্ষা প্রাইমারী শি বৈতনিক ও আবশ্যিক হবে। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা হবে অবৈতনিক। টেক্‌নিকাল ও সরকারী সাহায্যে স্থাপিত হয়।

(১৫) সমস্ত ধর্মমত হতে রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। তবে আপন আপন বিশ্বাস মেনে চলার ও প্রত্যেকের পূজা-প্রার্থনা করার স্বাধীনতাকে গ্যারাণ্টি দেওয়া হবে।

(১৬) নারীরা পূর্ণ সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক অধিকার ভোগ করবেন।

(১৭) কোনো স্থায়ী সৈন্যদল (standing army) রাখা হবে না, কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে দেশের সকল মানুষকে অস্ত্র-সজ্জিত করা হবে। একটি জাতীয় মিলিসিয়া (militia) অর্থাৎ, যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত নাগরিক বাহিনী গঠন করা হবে। একটা বিশিষ্ট সময় প্রত্যেক নাগরিককেই সামরিক শিক্ষা নিতে বাধ্য করা হবে।

কি করে লক্ষ্যে পেঁছাতে হবে?

ভারতবর্ষের খুব বেশীর ভাগ লোকের উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা এই প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তা যদি পূর্ণ হয় তবে জাতীয় স্বাধীনতা হতে উদ্ভূত উন্নতি ও সমৃদ্ধি সকল শ্রেণীর ধরা-ছোঁয়ার ভিতরে এসে যাবে। এখন আমাদের সম্মুখের লক্ষ্য খুবই পরিষ্কার। প্রত্যেকেই জানেন তিনি কিসের জন্য সংগ্রাম করছেন। যে-কোনো অর্থে ব্যাঘাত হতে পারে, **স্বরাজ** এখন আর সেই রকম অনিশ্চিত বিমূর্তন (abstraction) নয়, কিংবা এটা একটা "মানসিক অবস্থাও" নয়। **স্বরাজ** মানে জাতীয় স্বাধীনতা, এটা এখনও আমাদের প্রোগ্রামের সংক্ষিপ্তসার, তা থেকে জাতীয় জীবনের একটি পরিষ্কার ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যে জীবনে মুক্তির সুস্থ আবহাওয়ায় আমরা শ্বাস গ্রহণ করতে পারব।[১]

আমাদের লক্ষ্য যখন স্থির হয়ে গেল তখন আমাদের এখন উপায় বা'র করতে হবে কি ক'রে আমরা সেই লক্ষ্যে পেঁছাব। এটা বলার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না যে, লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্যে একটি তিক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী লড়াই আমাদের লড়তে হবে। ভারতবর্ষকে স্বাধীন সভ্য জাতির পদ-মর্যাদায় উন্নীত করার উদ্দেশ্যে ভারতের জনসাধারণ তাঁদের প্রোগ্রাম কার্যে পরিণত করার জন্যে যে চেষ্টা করবে তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পাশবিক বাধা হতেই তাদের "সভ্যতা সৃষ্টিকারী" চরিত্রের পরীক্ষা হয়ে যাবে। এই প্রোগ্রামের সংগে লিবারেলরা কতটা নিজেদের মেশাবেন তা থেকেই তাঁদের দেশপ্রেমের পরিমাপ হয়ে যাবে। এই প্রোগ্রাম তাঁদের কোনো আঘাত হানছে না। প্রোগ্রাম চায় যে প্রত্যেক অকপট ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সাহস ও দৃঢ়তার সহিত বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন। প্রোগ্রাম চায় না যে অল্প সংখ্যক লোকের অর্থনীতিক উন্নতি হোক এবং তাঁরাই শুধু সুখী জীবন যাপন করুন। এই প্রোগ্রাম সকলের জন্যে স্বাধীনতা, উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে। আমরা অবশ্য জানি যে উভয় পক্ষ হতে আমরা কি আশা করতে পারি; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কখনও তার "হৃদয়ের পরিবর্তন" করবে না, আর আমাদের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা বর্তমানে যে সুখী জীবন যাপন করছেন ও ভবিষ্যতে যে তাঁদের উন্নততর সুখী জীবনের সম্ভাবনা রয়েছে তাকে বিপন্ন করে জাতির প্রকৃত স্বাধীনতা তাঁরা চাইতেই পারেন না। অতএব, আমাদের এই মুহূর্তের করণীয় কার্য হচ্ছে যে তাঁদেরই শুধু সংগ্রামে টেনে আনা যাঁদের ভালোর জন্যে আমাদের এই প্রোগ্রামকে কার্যে পরিণত করা আবশ্যক।

১ প্রোগ্রামের এতটা পর্যন্ত ২২শে ডিসেম্বর (১৯২২) তারিখের "অমৃত-বাজার পত্রিকা"য় ছাপা হয়েছিল। এর পরের অংশটা খুব সম্ভব রয়টার টেলিগ্রাম করেননি। কিংবা "অমৃতবাজার পত্রিকা"ই কি এই অংশটা বাদ দিয়েছিলেন? আমার মনে হয় রয়টারই ওই অংশটা টেলিগ্রাফ করেননি। ওটা তাঁদের হজম করার মতো নয়। (লেখক)

আমাদের শক্তিসমূহের বিশ্লেষণ

এখন কথা হচ্ছে এই যে কোনো সংগ্রামে নামতে হলে পাওয়া-যেতে-পারে এমন বিশবস্ত শক্তিগুলির অপরিহার্যরূপে সঠিক মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এই শক্তিগুলিকে পরিচালনার জন্যেও মূল্যায়নের প্রয়োজন। জাতীয় ফৌজরূপে আমাদের বিপুল জনগণ সবেমাত্র জাগরণের মুখে এসেছেন। তাঁদের বোধশক্তি এখনও সীমাবদ্ধ এবং তাঁদের দৃষ্টি এখনও দূর প্রসারিত নয়। জাতীয় মুক্তির বিমূর্ত ধারণা তাঁদের সে সম্বন্ধে উদাসীন ক'রে রেখেছে। দূর ভবিষ্যতে তাঁরা যে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী হবেন তার কোনো জোরাল আবেদন তাঁদের কল্পনায় মূর্তি পরিগ্রহ করেনি। তাঁদের জীবনের এই মুহূর্তের ব্যাপারগুলি, যে-ব্যাপারগুলি তাঁদের প্রতিদিনকার জীবনে আঘাত হানছে,—এ সব ব্যাপারই তাঁদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। ধাপে ধাপে তাঁদেব বৃহত্তর সংগ্রামের পথে পরিচালনা করার জন্যে তাঁদের এই মুহূর্তের সমস্যাগুলি নিয়েই আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হবে। তবে এই সমস্যাগুলির কোনো সমাধানই হতে পারে না যদি আগাগোড়া একটা রাজনীতিক ও সামাজিক পরিবর্তন না আসে; কিন্তু জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যদি আমরা তাঁদের এই মুহূর্তের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্যে সংগ্রাম করি তবে আমরা তাঁদের বিপ্লবী চেতনার বৃদ্ধিতে সাহায্য করব। এ ভাবেই আমরা তাঁদের মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারব যে প্রকৃত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কি ক'রে তাঁদের প্রতিদিনের জীবন সমস্ত জাতির ভাগ্যের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এটা জানা কথাই যে অত্যধিক আর্থিক শোষণের ফলে ভারতীয় জনগণের ধৈর্য শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং তাঁদের মনে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ক'রে বসে থাকার যে বংশপরম্পরাগত বিশ্বাস ছিল তাদের সে বিশ্বাসেও চিড় ধরেছে। গত ক'বছর তাঁরা যে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত তাঁদের সে ইচ্ছা তাঁরা কাজে দেখিয়ে দিয়েছেন। জনগণের এই বিদ্রোহই হচ্ছে দৃঢ় ভিত্তি যার ওপরে দাঁড়িয়ে ন্যাশনাল কংগ্রেসের কার্য পরিচালনা করা উচিত।

অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহকে উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়াই হবে জাতীয় সংগ্রামকে শক্তিশালী করা। বর্তমান শাসন ব্যবস্থাধীনে নির্যাতীত ও শোষিত শক্তিগুলিকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং তাঁদের জাতীয় মুক্তি লাভের সংগ্রামে পরিচালিত করার জন্যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করছেন ঃ

কার্যোদ্ধারের প্রোগ্রাম

(১) জমিদারী প্রথার বাড়াবাড়ি অত্যাচারের ও উচ্চ হারের খাজনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকরণেচ্ছু গরীব কৃষকদিগকে পরিচালিত করা। সংগ্রামশীল কৃষকদের ইউনিয়ন তৈয়ার করলে এই কাজ সিদ্ধ হবে.—যে ইউনিয়ন (ক) ফিউডাল অধিকার ও প্রাপ্যগুলি বাতিল করে দেওয়ার দাবী জানাবে, দাবী জানাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ও তালুকদারী প্রথার বিলোপ সাধনের; (খ) বড় বড় ইস্টেটগুলিকে বাজেয়াফ্‌ৎ করে নিতে হবে; (গ) বাজেয়াফ্‌ৎ ইস্টেটগুলি কৃষকদের কাউন্সিলসমূহের দ্বারা

চালিত হবে; (ঘ) জমির খাজনা, সেচের ট্যাক্স ও পথকর প্রভৃতি কমিয়ে দিতে হবে; (ঙ) স্থায়ী জোত জমি: (চ) উচ্ছেদ করা চলবে না; (ছ) পরোক্ষ ট্যাক্সের বাতিল; (জ) নিম্ন মূল্য ধার্য; (ঝ) সুদ-খোর মহাজনদের নিকটে রেহানে বন্ধকী দলীলগুলি নাকচ করে দিতে হবে।

(২) কৃষকদের দাবীগুলিকে জোরদার করার জন্য দেশময় গণ-মিছিলসমূহের সংগঠন করতে হবে এবং তা থেকে "খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ করার আওয়াজ তুলতে হবে"।

(৩) উচ্চ মূল্যের বিরুদ্ধে, রেলওয়ে ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং ডাক মাসুল ও লবণের ট্যাক্স বৃদ্ধির, আর পরোক্ষ ট্যাক্স সমূহের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

(৪) মজুর ইউনিয়নগুলিকে মেনে নেওয়ার জন্যে এবং তাঁদের দাবী আদায়ের জন্যে তাঁদের ধর্মঘট করার অধিকারকে মানিয়ে নেওয়ার জন্যে সংগ্রাম।

(৫) কল-কারখানার মজুরদের জন্যে আট ঘণ্টার দিন, নিম্নতম মজুরী ও ভালো বাসস্থান আদায় করে নেওয়া।

(৬) এই সকল দাবীর সমর্থনে ধর্মঘট করা এবং সুবিধা পেলে এই ধর্মঘটকে সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত করা।

(৭) সমস্ত ধর্মঘটকে রাজনীতিক সমর্থন জানানো এবং কংগ্রেসের তহবীল হতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া।

(৮) প্রেস, মঞ্চ ও সমিতির স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করা।

(৯) নগরসমূহে উচ্চ বাড়ী ভাড়ার বিরুদ্ধে ভাড়াটেদের ধর্মঘটসমূহ গড়ে তোলা।

(১০) দেশব্যাপী ভলান্টিয়ার সংগঠন গড়ে তোলা।

(১১) গবর্নমেণ্ট ও সওদাগরী অফিসসমূহের উচ্চতর বেতনের জন্যে ক্লার্ক ও কর্মচারীদের ধর্মঘট গড়ে তোলা।

(১২) ভাঙার উদ্দেশ্যে কাউন্সিলগুলিতে প্রবেশ করা।

(১৩) রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে গণসমাবেশসমূহ সংগঠন করা।

শেষ পদক্ষেপ

এই প্রোগ্রামের কার্যোদ্ধারকারী প্রতিটি দফা জনসাধারণের কোনো না কোনো অংশের স্বার্থের সহিত সংযুক্ত। তাকে কার্যে পরিণত করলে সমগ্র জাতির লড়াই করার ক্ষমতা বেড়ে যাবে। যে কোনো সময়ে কাজে নামার জন্যে জাতীয় ফৌজ কুচ-কাওয়াজ করতে থাকবে। প্রতি শ্রেণীই বুঝবে যে কংগ্রেস তার ভালোর জন্যে চেষ্টা করছে। এই ভাবে সুবৃহৎ গণ-আন্দোলন গড়ে তুললে, যাতে জন-সাধারণের বৃহৎ হতে বৃহত্তম অংশ যোগ দিবেন, গবর্নমেণ্টের কর্তৃত্ব ভেঙে পড়বে। সমাজের যে অংশ উৎপাদনের সহিত সংযুক্ত, তাঁদের অসহযোগের ফলে দেশের জীবন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এভাবে গবর্নমেণ্টকে চরম আঘাত হানা হবে। দেশব্যাপী আইন অমান্যের আন্দোলন চালু করলে তা সংগ্রামের শেষ স্তরে আমাদের নিয়ে যাবে। তারই অপরিহার্য ফল হবে যে আমরা জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করব। এই স্বাধীনতার অবস্থায় ভারতবর্ষ সামাজিক, অর্থনীতিক ও মানসিক স্তরে উন্নীত করার সুযোগ পাবে। অবশ্য, আমরা প্রোগ্রামে

জাতীয় পুনর্গঠনের যে সকল নীতি ব্যক্ত করেছি সে সব কার্যে পরিণত করতে হবে।১

জুরিখ
ডিসেম্বর, ১৯২২

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের নামে ওপরে মুদ্রিত প্রোগ্রামটি পাঠানো হয়েছিল। প্রোগ্রামটি যখন কংগ্রেসেরই বিবেচনার জন্যে পাঠানো হয়েছিল তখন উচিত ছিল কংগ্রেসের অধিবেশনে তার আলোচনা করে গ্রহণ বা বর্জন করা। তার কিছুই করা হয়নি। ইউরোপে যে-সকল ভারতের কমিউনিস্ট ছিলেন তাঁরা নানা ঠিকানায় প্রোগ্রামটি কংগ্রেসকে পাঠিয়েছিলেন। তার বেশীর ভাগই হয়তো পোস্ট আফিস হতে সরকারের ইনটেলিজেন্স বিভাগের লোকেরা নিয়ে গেছেন, কিন্তু প্রোগ্রামের এক কপিও যে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের দফতরে পৌঁছায়নি একথা বিশ্বাস করা বড় কঠিন। তা ছাড়া, রয়টার তো প্রায় পুরো প্রোগ্রামটিই প্রচার করে দিয়েছিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সহ বহু কাগজে তা ছাপাও হয়েছিল। তবুও ভীত সন্ত্রস্ত কংগ্রেস নেতারা তা স্পর্শ করলেন না। অবশ্য কমিউনিস্টরা আশাও করেননি যে তাঁরা তা করবেন। আমরা আমাদের প্রচার করেছি।

গয়া অধিবেশনের সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ আগে অনেক ভালো ভালো কথা বলেছিলেন। কিন্তু গয়ার অধিবেশনে বললেন, স্বরাজ? তার কি কোনো সংজ্ঞা দেওয়া চলে? এ তো নিজের ভিতরে উপলব্ধি করার বস্তু।

ইতিহাসের দিক হতে মনে রাখতে হবে যে গয়ায় পাঠানো প্রোগ্রামটিই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রোগ্রাম। ভারতের রাজনীতিতেও এই প্রোগ্রাম ছিল অভিনব। এমনভাবে জনগণের দাবীর কথা এই প্রথম ভাবতে ঘোষিত হয়েছিল।

আগেই বলেছি যে ১৯২২ সালের ৫ই নবেম্বর হতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মস্কোতে কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। এই চতুর্থ কংগ্রেসের তরফ হতেও গয়ায় অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সপ্তত্রিংশত্তম অধিবেশনের নামে একটি বাণী পাঠানো হয়েছিল। এর কপিও পোস্ট আফিস হতে গবর্নমেন্টের ইনটেলিজেন্স বিভাগের লোকেরা নিয়ে গিয়ে থাকবেন। কিন্তু কমিউনিস্টরা নানা স্থান হতে নানা ভাবে এই জাতীয় দলীলপত্র পাঠাতে অভ্যস্ত ছিলেন। এর একটি কপিও যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সপ্তত্রিংশত্তম অধিবেশনের দফতরে পৌঁছায়নি তা বিশ্বাস করতে মন চায় না। কংগ্রেস কিন্তু তার কোনো উল্লেখ কোথাও করেছেন বলে মনে পড়ে না। তবে ভারত গবর্নমেণ্ট কানপুর কমিউনিস্ট [বলশেভিক] ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় (১৯২৪) আসামীদের বিরুদ্ধে এই দলীলটি প্রমাণ হিসাবে দাখিল করেছিলেন এবং এর বিশুদ্ধ কপিই দাখিল করেছিলেন। আমি এই দলীলটিও এখানে ছেপে দিচ্ছি। তা থেকে তখনকার দিনে কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনাল কি চাইতেন তা অনেকে বুঝে নিতে পারবেন।

---

১ এই প্রোগ্রামের মূল ইংরেজি এই পুস্তকের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হলো। এখানে অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।

কানপুর মোকদ্দমার দলীল-পত্র কোর্ট হতে ছাপা হয়েছিল। আমরা ন্যাশনাল আরকাইব্‌স্‌ হতে তার মাইক্রোফিল্ম নিয়েছি। সেই ফিল্মকে পরিস্ফুট করে দেখতে পাচ্ছি যে এই দলীলটি ছাপার ভুলে জর্জরিত। কোর্টে টাইপ করার সময়ে এই ভুলগুলি ঢুকেছে। লন্ডনে চেষ্টা করেও এর একটি বিশুদ্ধ কপি জোগাড় করতে পারিনি। কাজেই, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে দলীলটির ছাপার ভুল সংশোধন করে তার বাঙলা অনুবাদ করিয়ে এখানে ছাপালাম। মূল ইংরেজিও পুস্তকের পরিশিষ্টে ছাপা হলো।

গয়া কংগ্রেসের নামে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসের বাণী*

ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সমীপেষু,
গয়া, ভারতবর্ষ

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেস আপনাদের উদ্দেশে তাদের আন্তরিক অভিনন্দন পাঠাচ্ছে। ইংরেজ আধিপত্যের কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য ভারতীয় জনগণের যে সংগ্রাম, আমরা প্রধানত সেই সম্পর্কেই আগ্রহী। এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ সমেত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত জনসমষ্টির পরিপূর্ণ সহানুভূতি এবং সমর্থন আপনাদের প্রতি রয়েছে।

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠনকারী চরিত্র সম্পর্কে আমরা কমিউনিস্টরা পরিপূর্ণ ভাবে সচেতন। এই প্রাচ্যের জনগণের উপর অমানুষিক শোষণ চালাচ্ছে এবং সেই জনগণকে অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদ অবস্থায় রেখে দিয়েছে যাতে ধনতন্ত্রের সী লোভকে পরিতৃপ্ত করা যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে উপায়ে ভারতীয় জনগণের জীবন-শোণিত শোষণ করে তা সুবিদিত। তাকে কঠোরভাবে নিন্দা করবার কোন ভাষা নেই, আবার সাধারণ ভাবে নিন্দা করার মধ্যেও কোন কার্যকারিতা নেই। ভারতে ব্রিটিশ শাসন বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বলের দ্বারাই তাকে বজায় রাখা হয়েছে, কাজই একমাত্র সহিংস বিপ্লবের দ্বারাই সেই শাসনকে উৎখাত করা সম্ভব এবং করতেও হবে তাই। যদি সম্ভব হয় তবে আমরা হিংসাত্মক পথ অবলম্বন করারই পক্ষে। আত্মরক্ষার জন্য ভারতীয় জনগণ অবশ্যই হিংসাত্মক পথ গ্রহণ করবে। হিংসার উপর নির্ভর করে যে বিদেশী আধিপত্য বেঁচে আছে তাকে হিংসাত্মক পথে ছাড়া খতম করা যাবে না। ভারতের জনগণ আজ এক মহান বৈপ্লবিক সংগ্রামে লিপ্ত। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সর্বান্তঃকরণে সেই জনগণের সঙ্গে রয়েছে।

বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের শেষ লক্ষ্য

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে আসবার উপরই নির্ভর করছে ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক

* অধ্যাপক কৃষ্ণ চক্রবর্তী অনুগ্রহ করে এই দলীলখানি বাঙলায় তর্জমা করে দিয়েছেন।

প্রগতি। বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের শেষ লক্ষ্য এই সাম্রাজ্যবাদী কবল থেকে বেরিয়ে আসা। আর যা করেই হোক, আলোচনার মাধ্যমে বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই লক্ষ্যে পেঁাছানো সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যে কোন রূপ সম্পর্ক রক্ষা করাই হোক না কেন, তার আদত অর্থই হলো ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর স্বার্থে এবং তাদের দ্বারাই ভারতীয় জনগণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হওয়া। খুব বেশী কিছু হলে দেশীয় উচ্চতর শ্রেণীগুলির সহযোগিতায় সেই নিয়ন্ত্রণ পরিচালিত হবে. কিন্তু ঐ নিয়ন্ত্রণ সেখানে বহাল থাকবে এবং জাতির স্বাধীনতাকে ব্যাহত করবে।

বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ হলো বিপ্লবের রণধ্বনি

বিশ্ব ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ভগ্নদশা এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বঞ্চিত জনগণের জাগরণজনিত বিশ্বের বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং এই দুটি বৈশিষ্ট্য সাম্রাজ্যবাদকে আজ তার পুরনো ধরনের শোষণ ব্যবস্থা বদলাতে বাধ্য করছে। সাম্রাজ্যবাদ আজ তাই চেষ্টা করছে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সম্পত্তিশালী উচ্চ শ্রেণীগুলির সহযোগিতা লাভ করতে। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তার শাসনব্যবস্থার শুরু থেকেই সমস্ত জমিদার শ্রেণীকে বিশ্বস্ত সহযোগী হিসাবে পেয়েছে। এবং অধিকতর উন্নত ধরনের উৎপাদন যন্ত্রের বিকাশকে বাধা দিয়ে এই শ্রেণীর বিনাশকে ঠেকিয়ে রেখেছে। সামন্ততন্ত্র এবং তার অবশেষ হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার দুর্গ, তার সামাজিক ভিত্তিকে ধ্বংস না করে জনগণের জাতীয় চেতনা উদ্রেককারী অর্থনৈতিক শক্তিগুলির বিকাশ সম্ভব নয়। এই কারণেই যে শক্তিগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে প্রতিকূল শক্তি সামন্ত প্রভু এবং আধুনিক সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীদের পক্ষেও সেগুলি হলো বিপজ্জনক, আর এই জন্যে বিদেশী শাসকদের কাছে তাদের এই আনুগত্য। সম্পত্তিশালী উচ্চ শ্রেণীগুলির সাক্ষাৎ অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং ভদ্রোচিত জীবিকার অধিকারী অথবা উচ্চ সরকারী পদগুলিতে অধিষ্ঠিত সৌভাগ্যশালী বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সঙ্গে এত বেশী রকম ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত যে তারা একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর চাইতেই পারে না। সেইজন্যে তারা বিবর্তনবাদী জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব প্রচার করে. যার কর্মসূচী হলো "সাম্রাজ্যবাদের আওতার মধ্যে থেকে স্বায়ত্তশাসন" এবং সেটা লাভ করতে হবে ক্রমে ক্রমে শান্তিপূর্ণ পথে এবং আইনানুগ উপায়ে।

এই সাংবিধানিক গণতন্ত্রের কর্মসূচীর বিরোধিতা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট বেশীদিন করবে না, তার কারণ শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত কর্তৃত্বের ব্যাপারে এই কর্মসূচী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করে না ; পরন্তু এই কর্মসূচীর বীর সমর্থকেরা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সম্ভাব্য স্তম্ভস্বরূপ।

স্বাধীনতা অথবা দাসত্ব—এর মধ্যে কোন মধ্যপথ নেই

যে উদারনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী নীতি ঘোষিত হলো ১৯০৯ সালে মর্লে-মিণ্টো সংস্কারের মধ্যে দিয়ে এবং যার উদ্বোধন ঘটল ১৯১৯ সালের ভারত সরকারের আইন প্রবর্তনার মধ্য দিয়ে সেটা শীঘ্রই হোক বা দেরিতেই হোক শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে হোম রুল অথবা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারে গিয়ে দাঁড়াবে। স্বাধীন আইরিশ রাষ্ট্র এবং ইজিপ্টের "স্বাধীনতা"র মতো ব্যর্থ তামাসার আর

একটি পুনরাবৃত্তি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আশা করা যেতে পারে। যারা এই রকম কোন পরিণামকে জাতীয় প্রশ্নের সমাধান হিসাবে দেখে থাকে তাদের সাম্রাজ্যবাদের অনুচর বলে ধরতে হবে জাতীয় কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত আন্দোলন অবশ্যই এই ধরনের সমস্ত ব্যক্তিদের সংস্রব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে এবং ব্রিটিশের পক্ষ থেকে "হৃদয়ের পরিবর্তন" জাতীয় কোন মোহ থেকে সেই আন্দোলনকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে। ভারতবর্ষের জনগণ হয় স্বাধীনতা অর্জন করবে নতুবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিষ্পিষ্ট হয়ে মৃত্যু বরণ করবে, এ ছাড়া অন্য কোন মধ্যবর্তী পথ নেই। ভারতীয় জনগণ রক্তাক্ত বৈপ্লবিক সংগ্রাম ছাড়া বর্তমান দাসত্ব থেকে কখনই নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না।

বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সামাজিক বনিয়াদ সকল শ্রেণীকে নিয়ে হতে পারে না, কারণ অর্থনৈতিক কারণ বশতঃই সমস্ত শ্রেণী এই আন্দোলনে অংশ নিতে এগিয়ে আসবে না। সেই কারণে আপনাদের আন্দোলনের মেরুদণ্ড হলো জনগণের সেই সমস্ত অংশ যাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ কোনরকম সাময়িক কৌশলগত ব্যবস্থায়ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেনি। জনগণের এই অংশ হলো জাতির সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর অংশ, কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে দেউলিয়া মধ্যবিত্ত, নিঃস্ব কৃষক এবং শোষিত মজুরশ্রেণী। যে পরিমাণে এই প্রকৃত বিপ্লবী জনগণকে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে দূরে নিয়ে আসা যাবে এবং আত্মিক ও জাগতিক বিষয়ে সামন্ত প্রভু এবং পুঁজিবাদী উচ্চ শ্রেণীগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা দোলায়মান ও আপসকামী নেতৃত্ব থেকে মুক্ত করে আনা যাবে ঠিক সেই পরিমাণে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

গত দু'বৎসর ছিল ভারতবর্ষে শক্তিশালী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময়কাল। কৃষক এবং সর্বহারার জাগরণ ব্রিটিশের অন্তরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই রকম একটা গভীর বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব এই আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে পরাধীন জাতিগুলির সংগ্রামকারীর সম্পর্ক

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে পরাধীন জাতিগুলির সংগ্রামকারীর সম্পর্ক বৈপ্লবিক আদর্শবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং পারস্পরিক স্বার্থের উপরই তার ভিত্তি। আমাদের সহানুভূতি এবং সমর্থন মিষ্টি কথার সঙ্গে জড়িয়ে ফাঁকা বুলির মধ্যে নিবদ্ধ নয়। আমরা ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে অবশ্যই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াব এবং সেই জন্যেই আপনাদের সংগ্রামকে দুর্বল করবে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বার্থের ক্ষতি করবে এমন ভুল-গুলোকে দেখিয়ে না দিলে আমরা আমাদের বিপ্লবী কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হব।

জাতীয় মুক্তির আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সর্বদাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

১। সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন ভিন্ন জনগণের জীবনের স্বাভাবিক উন্নতির কোন নিশ্চয়তা নেই।

২। ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে কোন প্রকারের আপস-রফা জাতির বৃহত্তর অংশের অবস্থার কোন উন্নতি সাধন করবে না।

৩। হিংসাত্মক বিপ্লবের পথে ছাড়া ব্রিটিশ প্রভুত্বের উচ্ছেদ সাধন করা যাবে না।

৪। কেবলমাত্র মজুর এবং কৃষকেরাই বিপ্লবকে জয়ের পথে নিয়ে যেতে সক্ষম।

বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের কর্মসূচী

সুতরাং, প্রতিক্রিয়াশীল উচ্চ শ্রেণীগুলির সর্বপ্রকার সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবার জন্যে জাতীয় কংগ্রেসকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে যে, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই তার রাজনৈতিক কর্মসূচী। জাতির বৃহত্তম অংশ অর্থাৎ শ্রমজীবী জনসমষ্টি এই কর্মসূচীর পক্ষে সমবেত হবে, তার কারণ প্রচলিত ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া তাদের বর্তমান অবস্থার কোন উন্নতিসাধন সম্ভব নয়। জাতীয় মুক্তির হেতুর সপক্ষে জনগণকে টেনে আনবার জন্যে অক্লান্ত এবং সাহসিক আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। বর্তমান স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থানগুলি প্রচারকার্যের উপযোগী খুব উর্বর ক্ষেত্র প্রদান করছে। জনগণের বৈপ্লবিক চেতনা বৃদ্ধি করতে হলে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে তার রাজনৈতিক কর্মসূচী ছাড়াও একটা অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার। প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিশ্বস্ত সামন্ত জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দরিদ্র কৃষকদের আন্দোলন পরিচালনা করে কংগ্রেস একদিকে জনগণের মধ্যে তার শিকড়কে গভীরভাবে প্রোথিত করতে পারবে, অপরদিকে এই আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের একেবারে ভিত্তিমূলে আঘাত করবে। যে-দেশীয় সৈন্যবাহিনী ভারতবর্ষের বুকে ব্রিটিশ শাসনকে জিইয়ে রেখেছে দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে থেকেই তাঁদের সংগ্রহ করা হয়। এই কারণে কৃষি বিপ্লবের একটি কর্মসূচী দেশীয় সৈন্যদের জাতীয় স্বাধীনতার সপক্ষে টেনে আনতে পারবে।

উপসংহারে, জনগণের বিপ্লবী শক্তির দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসসাধনে আপনাদের চূড়ান্ত সাফল্যের প্রতি আমাদের দৃঢ়প্রত্যয় ঘোষণা করছি।

ভারতীয় জনগণের এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রতি পৃথিবীর অগ্রসর সর্বহারা শ্রেণীর সমর্থন এবং সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি আমরা আবার আপনাদের দিচ্ছি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! ভারতের মুক্ত জনগণ দীর্ঘজীবী হোক!

ভ্রাত্রীয় অভিনন্দন
হামবার্ট ড্রোজ
সম্পাদক, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের
চতুর্থ কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলী

গোড়ায় গলৎ

কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালকে কেন্দ্র করে আমরা ভারতে কাজ আরম্ভ করেছিলেম। কিন্তু তার গোড়াতেই গলৎ থেকে গিয়েছিল। আগেই আমি বলেছি যে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের তরফ হতে ভারতের কাজের চার্জে ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। তিনি থাকলেন কয়েক হাজার মাইল দূরে জার্মানীতে, আর আমরা থাকলাম উপমহাদেশ ভারতবর্ষের নানা স্থানে। না আছে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে, না আছে আমাদের দেশের ভিতরও একে অন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়।

আমাদের পরস্পরের ব্যবধান পাঁচ-ছয় শ' বা হাজার-বারো শ' মাইল হতে শুরু ক'রে দেড় হাজার মাইল পর্যন্ত। যদি আমায় কলকাতা হতে কানপুর যেতে হয় দূরত্ব ছয় শ' মাইলের বেশী। কিছু বেশী দেড় হাজার মাইল দূরের পেশোয়ারে যদি যেতে চাই তবে প্রচণ্ড খরচের ব্যাপার তো আছেই, তাছাড়া আটকের ওখানে সিন্ধু নদ পার হওয়ার সময়েই পুলিস জিজ্ঞাসা করবে "কে তুমি? কোথায় যাচ্ছে?" কিতাবে লিখিতভাবে না হলেও নিষিদ্ধ দেশ ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। দেশের ভিতরেও আমাদের যোগাযোগ ছিল চিঠিপত্রের মারফতে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় আন্তর্জাতিক ডাক বিভাগের ওপরে ভরোসা করেই তাঁর আন্তর্জাতিক কার্যকলাপ আরম্ভ ক'রে দিলেন। জার্মানীতে বসেই কিছু ঠিকানা তিনি নিজে জোগাড় ক'রে নিয়েছিলেন, আর আমরাও তাঁকে অনেক ঠিকানা পাঠিয়েছিলেম। "ভ্যানগার্ড অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" কাগজে দেওয়া পোস্ট বক্সের ঠিকানাতেও বহু লোক পত্রাদি লিখলেন। ভারত হতে পত্র পেলেই রায় উৎফুল্ল হতেন, লেখক সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়ার প্রয়োজন তিনি মনে করতেন না।

ইম্পিরিয়েল পুলিস ইন্‌টেলিজেন্সের ব্যবস্থা ছিল খুবই উন্নত। ভারতবর্ষেও পুলিস ইন্‌টেলিজেন্সের ব্যবস্থা সুগঠিত ছিল। কমিউনিস্টের ব্যাপার আবার তদারক করতেন ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর। জার্মানীতেও এম. এন. রায়ের কার্যকলাপের ওপরে ব্রিটিশ ইন্‌টেলিজেন্সের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ব্রিটিশ ইন্‌টেলিজেন্সের ভারতীয় চরও জার্মানীতে অনেক ছিল।

তখনকার দিনে সপ্তাহে একটি বিশিষ্ট দিনেই শুধু বিদেশের ডাক আসত। আবার সপ্তাহের একটি বিশিষ্ট দিনেই বিদেশে ডাক যেত। ইউরোপের ডাক জাহাজ বোম্বেতে আসত এবং বোম্বের ফরেন পোস্ট আফিস হয়েই ভারতের ডাক যেত ইউরোপে। বিদেশ হতে আমাদের যাঁদের চিঠি লেখা হতো তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। আমাদের পুস্তিকা ও কাগজ অবশ্য অপেক্ষাকৃত বেশী ঠিকানায় পাঠানো হতো। তার মধ্যে দু'একটি ঠিকানা হয়তো পুলিসের নজর এড়িয়ে যেত। কিন্তু চিঠিপত্রের বেলায় সেটা প্রায় অসম্ভব ছিল। আমাদের নাম

ও ঠিকানার একটি তালিকা ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের লোকেরা তৈয়ার ক'রে ফেলেছিলেন। বিদেশী ডাকের দিন বিদেশী ডাকের আলাদা ব্যাগ প্রত্যেক ডেলিভারি পোস্ট আফিসে আসত। তা থেকে আমাদের নামীয় জিনিসগুলি ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের লোকেরা অতি সহজে বার করে নিতে পারতেন। চিঠি-পত্রগুলি খুঁজে পাওয়া আরও সহজ পদ্ধতি পুলিস আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন যে বিদেশের কোন্ কোন্ পোস্ট আফিসে সাধারণত আমাদের নামীয় পত্রগুলি পোস্ট করা হতো। এসব খবর ব্রিটিশ ইন্‌টেলিজেন্স ভারতীয় এজেন্টরাও হয়তো জোগাতেন। মোটের ওপরে, ওই সব পোস্ট আফিসের মোহর পড়েও এদেশের পুলিসেরা আমাদের পত্রগুলি বা'র করে ফেলতেন। সন্দেহ হলেই ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের লোকেরা বিশেষ পদ্ধতিতে পত্রগুলি খুলে ফেলতেন। আমাদের পত্রাদি বের হয়ে পড়লে সেগুলি পড়ে তাঁরা কিছু টুকে রেখে খাম বন্ধ ক'রে প্রাপকের নিকটে পাঠিয়ে দিতেন, কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফটো কপি রেখে পত্রগুলি ছেড়ে দিতেন। আবার এমনও হতো যে পত্রগুলি আমাদের নিকটে আর পাঠানোই হতো না। ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের লোকেদের হাত ফসকে দু'চারখানি পত্র যে আমাদের নিকটে পৌঁছায়নি তা নয়।

একটি বিশ্ববিপ্লবী সংস্থার তরফ হতে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের পরিচালনা, সেই আন্দোলন আবার বহুলাংশে গোপন, ডাক বিভাগের মারফতে চলতে পারে না। এই নিয়ে আমরা যে রায়ের সঙ্গে আলোচনায় বসব তার কোনো উপায় ছিল না। তিনি ছিলেন সেই দেশে, আর আমরা এই দেশে। মধ্যখানে দুস্তর সাগর। চিঠিতে যদি আমরা আলোচনা করতাম তবে তার কথা সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস জেনে যেতো। বিদেশেও তিনি সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোকেদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন। মস্কোতে কিঞ্চিৎ জেরা করলেই নলিনী গুপ্ত ধরা পড়ে যেতেন। নলিনী গুপ্ত তাঁকে কি বলেছিলেন আমরা তা জানতাম না। অথচ এই নলিনী ১৯১৪ সাল হতে পুলিসের নিকটে বিবৃতি দিয়ে আসছিলেন। রামচন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুহৃৎ রায় পুলিসের নিকটে স্বীকারোক্তি দিয়ে পুলিসের দ্বারা বিদেশে প্রেরিত,—এই কথা তাঁর সন্ত্রাসবাদী পার্টির বন্ধুরা বারে বারে জানিয়েছেন। তিনি তাতে কান দেননি।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কর্তব্য ছিল অন্য ব্যবস্থা করা,—বার্তাবহের আনাগোনা করানোর ব্যবস্থা। তাতে খরচ হতো প্রচুর, কিন্তু খরচ তো আর তিনি নিজের পকেট হতে করতেন না, খরচ করতেন বিশ্ববিপ্লবী সংস্থা কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল। তাঁদের শাখা-প্রশাখা বিস্তারের জন্যে খরচ তাঁরা করতেনই। আর, মানবেন্দ্রনাথের হাত দিয়ে খরচ কি তাঁরা কিছু কম করেছিলেন?

বছরে তিন কিংবা চার বার বার্তাবহের আনাগোনার ব্যবস্থা করলে হয়তো সে খবরও কোনো দিন জানাজানি হয়ে যেতে পারত, কিন্তু আমরা আরও অনেক দিন পরে ধরা পড়তুম। সংগঠনের কাজ আরও অনেকখানি এগিয়ে যেতো। আর কিছু না হোক, সংগঠনের ভিত্তি কিছুটা মজবুত অন্তত হতো। আমি যতটা ভাবতে পারি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার ভিতর হতে অখ্যাতনামা, অথচ বিশ্বস্ত কোনো কমরেডকে বার্তাবহ হিসাবে বাছাই করলে এবং ইউরোপের সীমানায়ও বিশেষভাবে গোপনতা অবলম্বন করলে সুদীর্ঘকাল কোনো দুর্ঘটনা ঘটত না। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার কথা আমি এই কারণে বলছি যে একবার কোনো ব্রিটিশ প্রজা ভারতে প্রবেশ করতে পারলে তাঁকে ভারত হতে বহিষ্কার করার কোনো আইন ছিল না, তাঁর নিকটে যদি কোনো পাসপোর্ট না থাকে তাহলেও। এই

বার্তাবহ এম. এন. রায়ের মারফতে পাওয়া কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের লিখিত নির্দেশ ও উপদেশ আমাদের নিকটে বহন ক'রে আনতে পারতেন। আবার, ইউরোপে ফিরে যাওয়ার সময় আমাদের নিকট হতে লিখিত রিপোর্টও তিনি নিয়ে যেতে পারতেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে ফরেন্ এক্সচেঞ্জের কোনো ঝামেলা ছিল না। বিদেশী যাত্রীরা মোটা টাকা সংগে বহন করতে পারতেন। কাজেই, আমাদের বার্তাবহ ভারতবর্ষে কাজ চালানোর জন্যে সংগে অনেক টাকাও আনতে পারতেন।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল একটি একক ও অভূতপূর্ব বিশ্ববিপ্লবী সংস্থা ছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত পৃথিবীতে তার শাখা-প্রশাখা স্থাপন ও কাজের সীমানা বিস্তার। বিশ্বে আপন কাজের বিস্তার করার জন্যে এই বিপ্লবী সংগঠন নিশ্চয় টাকা খরচ করবেন এবং ভারতবর্ষের জন্যেও করবেন। এই খরচ তাঁরা গোপনে ও খোলাখুলিভাবে যেমন ইচ্ছা করতে পারতেন। এতে কার কি বলার ছিল? অবশ্য, এই সময়ে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের পক্ষে স্বনামে এদেশে টাকা খরচ করা অসম্ভব ছিল। আমাদের শ্রেণী-শত্রুরা তবুও প্রচার করতেন যে কমিউনিস্টরা রাশিয়ার 'এজেণ্ট' ছিল। হাঁ, আমাদের কেউ কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের 'এজেণ্ট' বললে আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করতাম। জার্মানীতে ১৯১৮ সালের বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হলে কাজের সুবিধার জন্য কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের হেড্ কোয়ার্টার্স জার্মানীতেই স্থাপিত হতো। জার্মানীতে বিপ্লব যখন সফলতা লাভ করল না তখন সোবিয়েৎ রাশিয়া ছাড়া আর কোনো দেশ কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের হেড্ কোয়ার্টার্স স্থাপনের অনুমতি দিতেন না। এ কথা সকলের বোঝা দরকার যে কমিউনিস্ট পার্টিই সোবিয়েৎ গবর্নমেণ্টকে পরিচালনা করতেন। সোবিয়েৎ গবর্নমেণ্ট কমিউনিস্ট পার্টিকে চালাতেন না।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের সন্ত্রাসবাদী ও ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীরা সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর নিকট হতে মোটা টাকা গ্রহণ করেছিলেন এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নিকট হতেও টাকা পাওয়ার জন্যে লালায়িত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের শ্রেণী-শত্রুরা কোনো দিন একটি কথাও বলেননি।

যাক, আমি আবার মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কার্যকলাপের কথায় ফিরে আসছি। চিঠিপত্রের মারফতে তিনি ইউরোপ হতে বৈপ্লবিক কাজের পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু তিনি কাদের পত্র লিখছিলেন আর কারাই বা তাঁকে পত্র লিখছিলেন এ বিষয়ে যাচাই কে করলেন? তিনি যদি কোনো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীর সংগে যোগাযোগ স্থাপন করলেন তবে সেই বিপ্লবী ১৯২০ সালের রাজকীয় ক্ষমা প্রদর্শনের পর কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন সেটা তিনি কি ক'রে বুঝলেন? আমার কথাই ধরা যাক। আমাকে তবুও নলিনী গুপ্ত দেখে গিয়েছিলেন,—আমি কে, কি করছি, আগে কি করতাম এ সব রিপোর্ট তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর সন্ত্রাসবাদী বন্ধুরা আমাকে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের গ্রুপের লোক হিসাবে ধ'রে নিয়েছিলেন। জার্মানী হতে আমার বিষয়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাও অনুসন্ধান করিয়েছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ বসু (সিমলা ব্যায়াম সমিতির বিখ্যাত অমর বসু) কুত্‌বুদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে এসে আমার সংগে আলাপও করে গিয়েছিলেন। আশ্চর্য নয় যে আমি মাওলানা আবুল কালামের লোক, এই রিপোর্ট তিনিও পাঠিয়ে থাকবেন। কারণ, কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব এক সময়ে (এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে) মাওলানার ম্যানেজার ছিলেন এবং সেই সময়ে

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা মাওলানার নিকটে যাতায়াত করতেন। মাওলানার গ্রুপের লোক হওয়া কিছু খারাপ কাজ নয়। আবদুর রজ্জাক খান তাই ছিলেন, কিন্তু আমি কখনও মাওলানার গ্রুপের লোক ছিলাম না। মুহম্মদ আলী (খুশী মুহম্মদ) তাঁর ছাত্রজীবনের বন্ধু অধ্যাপক গুলাম হুসয়নকে পেশোয়ার হতে কাবুলে ডেকে নিয়ে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে এনেছিলেন এবং সাংগঠনিক কাজ করার জন্যে তাঁকে পাঞ্জাবে পাঠিয়েছিলেন। আর আর সব লোকই চিঠি-পত্রের মারফতেই এম. এন. রায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁদের পত্র পড়েই রায় বুঝে নিতেন কে উপযুক্ত লোক, কে নয়। এস. এ. ডাঙ্গে ও সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের যোগ্যতার পরিমাপ তিনি এই ভাবেই করেছিলেন। যাঁর সঙ্গে একেবারেই চেনা নেই, যাঁর বিষয়ে কোনো দিন কিছু শুনিনি তাঁর কাছ থেকে একখানা পত্র পেলেই কি আমি আনন্দে নেচে উঠব? এম. এন. রায় কিন্তু তাই করতেন। কোনো বিপ্লবীর পক্ষে, বিশেষ করে যে বিপ্লবী একটা বিরাট দায়িত্ব নিয়ে গোপন কাজের চালনা করেন তাঁর পক্ষে, এটা গর্হিত কাজ। এম. এন. রায়ের হাতে প্রচুর টাকা ছিল। ভারতবর্ষ হতে ছয় বছর অনুপস্থিত থাকার ফলে তাঁর চেহারায় নিশ্চয় পরিবর্তন এসেছিল। আরও মোটা টাকা খরচ করে এবং ছদ্মবেশ ধারণ করে কোনও সওদাগরী জাহাজে নিশ্চয়ই তিনি ভারতবর্ষে অন্তত একবার আসতে পারতেন। তখন সব কিছু জেনেশুনে ও নিজের চোখে দেখে তিনি এই সওদাগরী জাহাজেই কিংবা অন্য কোনো জাহাজে ফিরে যেতে পারতেন। তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অবনী মুখার্জির কাজ তদারক করার জন্যে সৈয়দ আবদুল ওয়াহিদকে এইভাবে ভারতে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি ফিরেও গিয়েছিলেন। এম. এন. রায় এরূপ কষ্ট স্বীকার করা উচিত মনে করেননি। আমার মনে আছে তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে ভারতে এসে তিনি আমাদের সঙ্গে কাজ করতে পারেন কিনা। আমার মনে হয় তিনি আসলে আমাদের মন বুঝতে চেয়েছিলেন। কথায় আছে বুড়ী সত্যিই কি আর মরতে চান? তিনি শুধু নাতি-নাতনীর মন বুঝতে চান।

১৯২৩ সালের ২১শে মার্চ তারিখে এম. এন. রায়কে লেখা আমার এক পত্রে (কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার এক্জিবিট নম্বর ১৫ এ) শিশিরকুমার ঘোষ ও বৈদ্যনাথ বিশ্বাসকে নিয়ে আমি বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেম।

শিশিরকুমার ঘোষ সম্বন্ধে আমি এই পুস্তকের ১১৫ পৃষ্ঠা হতে ১১৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অনেক লিখেছি। পুলিসের প্ররোচক এই শিশিরের সব কথা আমি যথা সময়ে এম. এন. রায়কে জানিয়েও দিয়েছিলেম। তবুও যতীন মিত্র জার্মানীতে গিয়ে যখন এম. এন. রায়কে জানালেন যে মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে শিশিরের ব্যক্তিগত ঝগড়া আছে (কিসের ঝগড়া? আমি কি অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেম?) তখনই তিনি শিশিরের প্রতি সদয় হয়ে উঠলেন এবং তার পত্রোত্তর দিলেন। আমাকে রায় লিখলেন যে তিনি শিশিরের পত্রের উত্তর দিয়েছেন, আর শিশির ইউরোপে যেতে চাইলে আমি যেন তাকে পাঠাই। এর পরে রাগে ও ক্ষোভে আমি কি করব বুঝতে পারছিলাম না। যে যতীন মিত্রের মুখে রিপোর্ট পেয়ে তিনি শিশিরকুমার ঘোষ সম্বন্ধে প্রায় গদগদ হয়ে উঠেছিলেন সেই যতীন মিত্রকেই পরে আমায় লেখা এক পত্রে তিনি একটি "আস্ত গাধা" বলেছিলেন।

আমি যখন শিশির ঘোষের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেম তখন শিশির যতীন মিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁর অনেক তোয়াজ করেন।

তাঁকে মাঝে মাঝে খাইয়েছেন, হয়তো কিছু টাকাও দিয়েছেন। তাই, তিনি জার্মানীতে গিয়ে শিশির সম্বন্ধে ওই রিপোর্ট করেন।

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর গ্রুপের সভ্য বৈদ্যনাথ বিশ্বাস সম্বন্ধে দু'একজন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী বন্ধু আমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন,—বলেছিলেন লোকটি বিশ্বাস করার মতো নয়। তাঁদের হাতে কোনো দলীল ছিল না, আর তা থাকা তখন সম্ভবও ছিল না। মানবেন্দ্রনাথকে আমি একথা জানিয়েছিলেম। তবু তিনি আমায় জানালেন যে বৈদ্যনাথকে তাঁর চাই। আমি যেন তাঁকে একখানি থার্ড ক্লাস টিকেট কিনে দিই, আর ১০ পাউন্ড হাত খরচ বাবতে দিই। মনে হয় বৈদ্যনাথের নিকটে পাসপোর্ট ছিল। এই ব্যাপার নিয়ে রায়ের সঙ্গে আমার পত্রের মারফতে ঝগড়া হয়ে যায়। আমার পত্রাংশ উইন্ডমিলার ও ওভার স্ট্রীট তাঁদেব বিরাট গ্রন্থ 'কমিউনিজম্ ইন্ ইন্ডিয়া'তে উদ্ধৃত করেছেন (৬১ পৃষ্ঠা)।

সেই সময়ে বৈদ্যনাথ বিশ্বাস বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের জেনেরেল সেক্রেটারি ছিলেন। মুকুন্দলাল সরকারের অনেক কাগুজে প্রতিষ্ঠানের এটাও একটি ছিল। একটি প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি ছিলেন বলেই বৈদ্যনাথ বিশ্বাস মানবেন্দ্রনাথের নিকটে আকর্ষণের বস্তু ছিলেন। ১৯১৫ সালে রায় যখন শেষবারের মতো বিদেশে যান তখন তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসের পরিচয় ছিল কিনা তা বলা আমার পক্ষে কঠিন। আমার ধারণা যে পরিচয় ছিল না। কারণ বিশ্বাসের সেদিনের কর্মক্ষেত্র ছিল দুমকা, কলকাতা নয়।

সেই সময়ে (১৯২০-এর দশকে) লোকে ভেবে আশ্চর্য হতেন যে বিশ্বাস বেতন কোথা হতে পান? তাঁর সংগঠনের কোনো টাকা ছিল না। ব্রিটিশের নিকট হতে রাজা খেতাব-পাওয়া বাঙলা দেশের একজন বড় জমিদার (পাইকপাড়ার রাজা মণীন্দ্র সিংহ) তাঁদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর নামই শুধু ধার দিয়েছিলেন, টাকা দিতেন না। বৈদ্যনাথ বিশ্বাস বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের আফিসে চাটাই পেতে পড়েও থাকতেন না। তিনি সারা দেশ ঘুরে বেড়াতেন। গুলাম হুসয়ন তাঁর স্বীকৃতিমূলক বিবৃতিতে বলেছেন, বিশ্বাস লাহোরে তাঁর বাড়ীতেও অতিথি হয়েছেন।

বিশ্বাসকে যে সন্দেহ করা হতো তার কিছু প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এক সন্ধ্যায় কানপুরে একটি বড় তাঁবুর ভিতরে কমিউনিস্ট কনফারেন্স আরম্ভ হয়েছিল। একজন লোক আলোয়ান দিয়ে তাঁর সমস্ত শরীর ঢেকে, শুধু দু'টি চোখ বাইরে রেখে সভার মধ্যস্থলে বসেছিলেন। আমি কিছুই লক্ষ্য করিনি, কিন্তু লাহোরের শাম্সুদ্দীন হাস্সান আমায় দেখালেন যে ওই দুটি চোখ বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের। শাম্সুদ্দীনের সঙ্গে কানপুরেই সবেমাত্র আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনিই একজন ভলান্টিয়ারকে ডেকে এনে সভা হতে বিশ্বাসকে বার করে দিলেন। আশ্চর্য এই যে এই শাম্সুদ্দীনের সঙ্গে আবার মুকুন্দলাল সরকারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি দীর্ঘকাল জেলে ছিলেম। বিশ্বাস সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলার সুযোগ পাইনি। শুনেছিলেম রায়ও তাঁকে আর ইউরোপে ডেকে নেননি। তবুও দেখলাম কমিউ-নিস্টদের ভিতরেও বিশ্বাসের প্রতি কারুর বিশ্বাস নেই।

১৯২২ সালে দু' একজন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী বন্ধু বৈদ্যনাথ বিশ্বাস সম্বন্ধে কেন আমায় সতর্ক করেছিলেন তার কারণ এত বছর পরে আমি এখন বুঝেছি। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর "History of the Freedom Movement in India" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৯৯-৩০০ পৃষ্ঠায় একটি সরকারী

রিপোর্ট হতে একটি উদ্ধৃতি ছেপেছেন। এই রিপোর্টটির নাম "Connections with the Revolutionary Organization in Bihar and Orissa, 1906-16," Compiled by W. Sealy and marked "Strictly Secret". This report is printed by the Bihar Government in 1917. ডক্টর মজুমদারের তুলে দেওয়া উদ্ধৃতিটি আমি নীচে দিলেম ঃ

"Baidyanath Biswas eventually made a very detailed statement of his complicity in, and knowledge of various branches of the revolutionary conspiracy. He spoke of his connection with Bipin Ganguli's gang, which had first come to notice some time before the arms theft, which its members committed ; the Pabna party under Abinash Roy and Jatin Hui ; the Barisal parties under Narendra Mohan Ghosh Choudhuri (transported for life in the Sibpur and concerned in the Jaipur dacoity) ; Jatin Mukherjee's notorious gang ; the Garden Reach, Beliaghata and Agarpara taxicab dacoities ; his association with Phani Chakravarti and Atul Ghosh of the gun-running conspiracy ; the handing over of 26 of the stolen pistols to Jadugopal Mukherjee, one of the most dangerous and active members of the conspiracy ; and much else of which he had either personal or second-hand knowledge." (He described his first meeting with Bipin Ganguli who used to train a number of young recruits to the revolutionary party, and the whole history of the theft of arms and ammunition from Rodda's).

বঙ্গানুবাদ

"কোনও একটি ঘটনার পরিণামে খুঁটিয়ে বিবৃতি দিতে গিযে বৈদ্যনাথ বিশ্বাস বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের যে-সব শাখার সহিত নিজে লিপ্ত ছিলেন, আর যে-সব শাখার বিষয়ে তিনি পরিজ্ঞাত ছিলেন এই সব কিছুর কথাই তিনি বলে দেন। বিপিন গাঙ্গুলীর গ্যাং-এর সহিত তাঁর সম্পর্কের কথা তিনি বলেছিলেন ; এই দলের সভ্যরা যে অস্ত্র চুরি করেছিলেন তার কিছুদিন আগে হ'তে তাঁরা নজরে পড়ে গিয়েছিলেন ; অবিনাশ রায় ও যতীন হুইয়ের পরিচালনাধীন পাবনা পার্টির কথা তিনি বলেছিলেন ; তিনি বলেছিলেন নরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরীর অধীন বরিশালের পার্টিগুলির কথাও (নরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী শিবপুর ডাকাতি মোকদ্দমায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন আর জয়পুর ডাকাতির সঙ্গে তাঁর সংস্রব ছিল) ; যতীন মুখার্জির কুখ্যাত দলের কথা তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন ; তিনি বলে দিয়েছিলেন গার্ডেনরীচ, বেলিয়াঘাটা ও আগরপাড়ার ট্যাক্সি ডাকাতিগুলির বিবরণ ; ফণী চক্রবর্তী ও অস্ত্রচালান ষড়যন্ত্রের অতুল ঘোষের সঙ্গে যে তার সংযোগ ছিল তাও তিনি বলেছিলেন , ষড়যন্ত্রের একজন বিপজ্জনক ও সদা কর্মলিপ্ত সভ্য যাদুগোপাল

মুখার্জির হাতে যে ২৬টি চুরিকরা পিস্তল তুলে দেওয়া হয়েছিল সে বিবৃতি দিতেও বৈদ্যনাথ বিশ্বাস ভোলেননি; এবং আরও অনেক এমন কথা তিনি বলেছিলেন যে-সব তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতেন কিংবা অপরের মুখে শুনেছেন।" (তিনি বিপিন গাঙ্গুলীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের কথা বলে-ছিলেন। নূতন দলে আনা কিছু সংখ্যক বিপ্লবীকে বিপিন গাঙ্গুলী শিক্ষা দিতেন তাও বৈদ্যনাথ বলেছিলেন। রডার অস্ত্র ও অস্ত্রোপকরণ চুরির গোটা ইতিহাসটাই তিনি বলে দিয়েছিলেন।)

এ কথা মনে রাখা দরকার যে রায় কিন্তু আমাকে বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের থার্ড ক্লাস টিকেট কেনার টাকা ও হাত খরচের দশ পাউন্ড কখনও পাঠাননি।

এস. এ. ডাঙ্গের বিরুদ্ধে তার স্বহস্তলিখিত কিছু দলীলপত্র পাওয়া যাওয়ার জওয়াবে সে একনাগাড়ে চার দিন বক্তৃতা দিয়েছিল। তখন আমার বিরুদ্ধে কিছু মাল-মসলা বা'র হয় কিনা দেখার জন্যে সে "কমিউনিজ্‌ম্‌ ইন্‌ ইন্ডিয়া" উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতে হঠাৎ গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠা তার চোখে পড়ে যায়। তা থেকে সে সভায় বলে যে মুজফ্‌ফর বড় সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক। তার প্রমাণস্বরূপ সে বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের কথা বলে। এমন জোর দিয়ে কথাটা সে বলেছিল যে যেন বৈদ্যনাথ বিশ্বাসকে ইউরোপ পাঠিয়েই দেওয়া হয়েছিল। আমি বুঝতে পারিনি আমার কথা ডাঙ্গে কেন উল্লেখ করেছিল? অপরাধ তো করেছিল সে। ক্ষমা চেয়ে ও মুক্তি ভিক্ষা করে কানপুরের ডিস্‌ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে একখানি পত্র ও ভাইস্‌রয়ের নিকটে দুখানি দরখাস্ত তো সে-ই পাঠিয়েছিল। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের গুপ্তচর হওয়ার ইচ্ছা তো সেই প্রকাশ করেছিল।

আমরা যারা কাজ আরম্ভ করেছিলেম

আমাদের কথা আমি আগেই কিছু কিছু বলেছি। যা কিছু বলার ছিল তাব সব কথা বলিনি। এখন সে সব কথা বলি। আমি "স্মৃতিকথা" লিখছি। তাই ইতিহাসের মতো করে না লিখে কথার পিঠে কথা বসিয়ে যাচ্ছি মাত্র। ইতিহাস "লেখার জন্যে" আমি আমাদের পার্টির দ্বারা নিয়োজিতও হইনি। তবে, কবি যে গেয়েছেন "শাসন-সংযত কণ্ঠ গাহিতে পারি না জননী!" আমার অবস্থা সেরকম নয়। ইচ্ছা করলেই আমি দলীল-পত্র সমন্বিত অনেক কিছু লিখে যেতে পারি। তাতে পুঁথি বেড়ে যাবে। সেই পুঁথি পড়বেন কে? তা ছাড়া, আমার বয়স প্রতিদিন একদিন করে বাড়ছে, আর সেই সঙ্গে জীবনেরও একদিন ক্ষয় হচ্ছে।

আগেই উল্লেখ করেছি যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সভ্যরা ১৯২০ ও ১৯২১ সালে তাশকন্দে আর মস্কোতে পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের কযেকজন যখন পেশোয়ার জেলে বন্দী তখনই আমরা ১৯২২ সালে এ দেশে কাজ আরম্ভ করি।

শওকত উস্‌মানী

শওকত উস্‌মানী ১৯২১ সালে মস্কোতেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। আমরা যারা পেশোয়ারের বন্দী ছিলাম না, আমাদের ভিতরে উস্‌মানীই ছিল অপেক্ষাকৃত পুরানো।

ভারতের বিকানীর রাজ্যের প্রজা ছিল উস্‌মানী। তার পরিবার বর্ণে রাঠোর

রাজপুত। অর্থাৎ, উস্‌মানীদের পূর্ব পুরুষ ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করার আগে হিন্দু ছিল।

উস্‌মানীর প্রকৃত নাম মাওলা বখ্‌শ্‌। বিকানীরের ডুংগর কলেজের (আসলে একটি হাই ইংলিশ স্কুল) রেজিস্টারে তার এই প্রকৃত নামটিই লেখা ছিল। উস্‌মানীর সময়ে বানারসের কংগ্রেস নেতা সম্পূর্ণানন্দ ছিলেন ডুংগর কলেজের হেড্‌ মাস্টার।

মাওলা বখ্‌শ্‌ নামের অর্থ ঈশ্বরের দান। মাওলা বখ্‌শের স্বকৃত দ্বিতীয় নামকরণ হচ্ছে শওকত উস্‌মানী। এর অর্থ উস্‌মানীয় (Ottoman) মহিমা। তুর্কি সাম্রাজ্যকে উস্‌মানীয় সাম্রাজ্যও বলা হতো। নিজের নামের পরিবর্তন ইত্যাদি হতে বোঝা যায় যে খিলাফৎ আন্দোলনের দ্বারা উস্‌মানী অতি মাত্রায় প্রভাবিত হয়েছিল।

ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের রিপোর্ট হতে জানা যায় যে ১৯২০ সালে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে উস্‌মানী অকৃতকার্য হয়েছিল। এই ১৯২০ সালেই সে হিজরাৎ আন্দোলনে যোগ দিয়ে দেশত্যাগও করেছিল। কিসে সে ফেল করেছিল তা জানিনে। ইংরেজি সে খুব ভাল জানত। পারসী ভাষায়ও তার জ্ঞান ভালো দেখছি। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর "স্মৃতিকথা"য় উস্‌মানীকে কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেজুয়েট ব'লে উল্লেখ করেছেন।

উস্‌মানীর চরিত্রে নানা রকম জটিলতা ছিল। সে যেমন ছিল বদ্‌মেজাজী, তেমনিই ছিল অসহিষ্ণু। তার ওপরে সে আত্মকেন্দ্রিকও ছিল। তাশকন্দে ও মস্কোতে যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা হয়েছিল তখন প্রতিবাদী আচার্য প্রথমে তাতে যোগ দিয়েছিলেন। পরে এম· এন· রায়ের সংগে ঝগড়া করে তিনি পার্টি হতে বার হয়ে যান এবং আবার আবদুর রবের সংগে যোগ দিয়ে আলাদা পার্টি গঠন করতে থাকেন। মস্কোতে মুহাজিরদের মুখে মুখে আবদুর রব ও আচার্য এই দু'টি নাম একসংগে উচ্চারিত হতো।

ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হওয়া সত্ত্বেও উস্‌মানী তলে তলে আবদুর রব ও আচার্যের সংগে যুক্ত ছিল। ১৯২১ সালে সে-ই সর্বপ্রথম এম· এন· রায়ের নিকটে প্রস্তাব করেছিল যে সে দেশে ফিরে গিয়ে সেখানেই কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে ও বৈপ্লবিক কাজের পরিচালনা করতে চায়। তার গোপন পরিকল্পনা ছিল যে আবদুর রব ও আচার্যের পক্ষে সে বহুসংখ্যক বিপ্লবী কর্মীকে জড়ো করবে এবং এই কর্মীদের সাহায্যে এম· এন· রায়কে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল হতে উৎখাত করবে। কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল উস্‌মানীর দেশে ফেরার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। স্থির হলো যে যাঁরা দেশে ফিরবেন তাঁরা একসংগে দু'জন ক'রে রওয়ানা হবেন। রফীক আহ্‌মদের বিবৃতি অনুসারে প্রত্যেককে একজন করে সাথী বেছে নিতে বলা হয়েছিল। শওকত উস্‌মানী সাথী বেছেছিল সৈয়দ মস্‌উদ আলী শাহ্‌কে।

এখানে মস্‌উদ আলী শাহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া দরকার। উত্তর প্রদেশের মীরাট জিলায় একটি তহসীলের নাম সার্ধানা। এখানে একটি অভিজাত আফ্‌গান পরিবার বাস করতেন। সম্ভবতঃ এখনও বাস করেন। কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে এই পরিবারটি সার্ধানায় এসে বাস ইখ্‌তিয়ার করেছিলেন কিংবা ইংরেজের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই পরিবারেরই একটি শিক্ষিত ছেলের নাম সৈয়দ মস্‌উদ আলী শাহ্‌। তার বয়সে বড় জেঠতুতোভাই সৈয়দ ইক্‌বাল আলী শাহ্‌ এক সময়ে

নামকরা ইংরেজি জার্নালিস্ট ছিলেন। থাকতেন লণ্ডনে এবং লিখতেন মিডল্ ঈষ্ট সম্বন্ধে।

মস্উদ আলী শাহ্ ১৯২০ সালে হিজরাৎ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তাশকন্দে আবদুল কাদির খান (একজন ব্রিটিশ চর) ও সে একত্রে নবগঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। মুহাজিরদের ভিতরে তখনও কেউ কেউ মস্উদ আলী শাহ্‌কে শত্রুর চর মনে করতেন। কিন্তু সে এম· এন· রায়ের ও এভেলিন রায়ের স্নেহ আকর্ষণ করেছিল। এতকাল পরে লিখতে বসে আজ দলীলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে মস্উদ আলী সত্যসত্যই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বৈদেশিক বিভাগের চর ছিল এবং ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের কর্নেল সেসিল কে'র মতো হোমরা-চোমরার সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল।

শওকত ওস্মানী ও মস্উদ আলী শাহ ইরানের গবর্নমেণ্টের পাসপোর্ট পেয়ে গিয়েছিল। এই পাসপোর্টেই তারা ইরানের ভিতর দিয়ে ভারতে পেঁাছে-ছিল। তারা করাচি পেঁাছেছিল, না, বোম্বে পেঁাছেছিল তার সঠিক বিবরণ আমি কোথাও পাইনি।

১৯২৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শওকত উস্মানী কলকাতা এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রেছিল। (এত সঠিক তারিখ মনে রাখা সম্ভব নয়। একটি দলীলে তারিখটি এখন পাওয়া গেছে।) বল্‌ল, সে সবে কলকাতায় ঘোরাঘুরি করে বানারস ফিরেছিল। সেখানে পেঁাছেই সে রায়ের চিঠি পায়। তাতে উপদেশ ছিল যে উস্মানী যেন কলকাতায় গিয়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে দেখা করে। "তাই আবার কলকাতায় ফিরে এসেছি", উস্মানী বলল। সেই সময়ে তার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়। সে তখন আমায় জানিয়েছিল যে ভারতে ফিরে এসে সে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে, অর্থাৎ, এম· এন· রায়ের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিল। এই কারণে সে আবার ইরানের শিরাজ শহরে ফিরে যায়। শিরাজ হতে সোবিয়েৎ কন্সাল তাম্পাকোফের সাহায্যে সে রায়কে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লেখে এবং দেশে ফিরে গিয়ে কি কি সে দেখেছে তাও সেই পত্রে রায়কে সে জানায়। এইভাবে সংযোগ স্থাপন করে সে দেশে ফিরে আসে। মস্উদ আলী শাহ্ উস্মানীর পরম বন্ধু ছিল এবং মস্কো হ'তে ইরানের ভিতর দিয়ে দেশে ফেরার সময়ে তার ভ্রমণের সাথীও ছিল। শিরাজে ফিরে যাওয়ার আগে উস্মানী মস্উদ আলী শাহ্‌কে লাহোরে খুঁজতে গিয়ে পায়নি। বোধ হয় দেখা করার জন্যে তাদের উভয়ের নির্দিষ্ট স্থান ছিল লাহোর। কলকাতায় কিন্তু উস্মানী আমায় বলেনি যে মস্উদ আলী শাহ্ আবার মস্কো ফিরে গেছে এবং সেখান থেকে গেছে বার্লিনে, যদিও বার্লিন হতে এম· এন· রায়ের পত্রের ভিতরে সে আমায় একখানি পত্র পাঠিয়েছিল। তাতে সে আমায় শিরাজি নামক একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেছিল।

উস্মানী প্রথম বার ভারতে ফিরে যে আবার শিরাজে গিয়েছিল এ কথা আমাদের পার্টির ভিতরে কেউ কেউ জানতে পারেন, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই তা জানেন না। কিন্তু ভারত গবর্নমেণ্টের ইন্টেলিজেন্স বিভাগ ব্যাপারটি জানতেন। গিরেফ্‌তার হওয়ার পরে উস্মানী পুলিসের নিকটে যে বিবৃতি দিয়েছে তা থেকে তাঁরা তো জেনেছেনই, কিন্তু তার আগেও তাঁরা জেনেছেন। মস্উদ আলী শাহ্ তাঁদেরই লোক ছিল।

শওকত উস্মানী যে আচার্য ও আবদুর রবের হয়ে সাংগঠনিক কাজ করতে দেশে ফিরেছিল এ কথা এম· এন· রায় জেনে ফেলেছিলেন। এদিকে উস্মানী সারা

ভারতবর্ষ ঘুরেও আচার্য ও আবদুর রবের পক্ষে কিছুই করতে পারল না। কেউ সাড়া দিলেন না। হতাশ হয়ে সে শিরাজে ফিরে গেল এবং নিজের ত্রুটি, বিচ্যুতি ও অপরাধের জন্যে ক্ষমা চেয়ে তাস্পাকোফের সাহায্যে এম. এন. রায়ের নিকটে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখল। এটাই ছিল উস্‌মানীর শিরাজে যাওয়ার আসল কারণ।

পেশোয়ারের মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কাগজপত্রে পাওয়া যাচ্ছে যে রায় ১৯২২ সালের ২১শে মে তারিখে বোম্বের ছোটানীর ঠিকানায় উস্‌মানীকে একখানা পত্র লেখেন। তারপর ১৯২২ সালের ২৭শে জুন তারিখে উস্‌মানীর গোপন ঠিকানায় আরও একখানা পত্র রায় তার নিকটে পাঠান। এই পত্রে মস্‌উদ আলী শাহের খবর তিনি জানতে চেয়েছেন। তার মানে ১৯২২ সালের ২৭শে জুন তারিখেও মস্‌উদ আলী শাহ্‌ মস্কো বা বার্লিনে পৌঁছয়নি। তাতে উস্‌মানীর লজ্জাকর ব্যবহারের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন এবং এও বলেছেন যে তাঁকে তাঁরা আর একবার কাজের সুযোগ দিবেন। ("Roy wrote again on the 27th June, 1922, to a covering address and asked for news of Masood Ali Shah. He referred to disgraceful act of Usmani, but said that they were giving him another chance") রায় ও মিসেস্‌ রায়ের পরম স্নেহের পাত্র মস্‌উদ আলীকে তাঁরা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না।

কুঅ'র মুহম্মদ আশরাফ

উস্‌মানী তখনও কলকাতাতেই ছিল। হঠাৎ আমরা প্রমাণ পেয়ে গেলাম যে ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের লোকেরা তার আসার খবর পেয়ে গেছে এবং তাকে একান্তভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাফিজ মস্‌উদ আহ্‌মদ (মস্‌উদ আলী শাহ্‌ নয়) নামক এক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এসে জুটেছিল। তার বাড়ী চট্টগ্রাম জিলার চন্দ্রঘোনায়, আর সে শিক্ষালাভ করেছিল সাহারানপুর জিলার বিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসায়। ধার্মিক শিক্ষার ভিতর দিয়ে বিপ্লবী গড়ে তোলার একটি বিদ্যালয় ছিল দেওবন্দ। এটা ছিল হাফিজ মস্‌উদ আহ্‌মদকে সঙ্গে নেওয়ার একটি কারণ। কয়েকমাস হ'তে তার চাল-চলন আমাদের ভালো লাগছিল না। সে ছিল কুত্‌বুদ্দীন সাহেবেরও বন্ধু। একদিন কুত্‌বুদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে (৭, মৌলবী লেন, কলকাতা-১৬) সে তার শিরওয়ানীটি খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখে পায়খানায় যায়। তখন আমি তার পকেটে হাত দিয়ে একটি ছোট্ট নোট বই বের করে ফেলি। দেখলাম তাতে পার্‌সী ভাষায় উস্‌মানীর হুলিয়া লেখা রয়েছে। আমি দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। আমার পেছনে তখন পুলিস পাহারা। অনেক কষ্টে তাদের এড়িয়ে উস্‌মানী কিংবা অন্য কারুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তাকে বললাম যে তার হুলিয়া পুলিসের চরের ডায়েরীতে লেখা হয়ে গেছে, আমি নিজে চোখে দেখেছি। সে কলকাতায় গিরেফ্‌তার হোক এটা আমি চাইনে। এই অবস্থায় তাকে অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম আমিই।

আলীগড় কলেজের, পরে আলীগড় মুস্‌লিম ইউনিভার্সিটির আরবী ও পার্‌সী ভাষার অধ্যাপক খাজা আবদুল হাই তাঁর প্রিয় ছাত্র কুঅ'র মুহম্মদ আশরাফকে সঙ্গে নিয়ে গয়া কংগ্রেস হ'তে সোজা আলিগড়ে ফিরে না গিয়ে কলকাতায় তাঁর পুরানো বন্ধু কুত্‌বুদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আরও দু'জন ছিলেন—কেরালার (কালীকটের?) গোপাল মেনন

ও মহীদীন কয়া। সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়। তবে খাজা আবদুল হাই ও কুঅ'র মুহম্মদ আশরাফের সঙ্গে বেশী। খাজা সাহেব দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়েছেন, মৌলবী ওবায়দুল্লার প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিনি। একজন বিপ্লবীও তিনি ছিলেন। ১৯১৫ সালে লাহোর গবর্নমেণ্ট কলেজের ও মেডিকাল কলেজের ১৫ জন ছাত্রকে সীমান্তের বাইরে পাঠানোর পেছনে তাঁর প্রেরণা ছিল। লাহোর হতে 'কিসান' নাম দিয়ে একখানি উর্দু দৈনিক তিনি বার করেছিলেন। ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের সামরিক আইনের (Martial law) যুগে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজাও হয়েছিল। আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগেই খাজা সাহেব মানবেন্দ্রনাথ রায়ের "ইণ্ডিয়া ইন্ ট্রান্জিশান" ইত্যাদি পড়েছিলেন। পাঞ্জাবের ঘটনার পরে তিনি অধ্যাপক হিসাবে আলীগড় কলেজে যোগ দিয়েছিলেন। খিলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে মাওলানা মুহম্মদ আলীর নেতৃত্বে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ছাত্র ও অধ্যাপকেরা বাইরে এসে ন্যাশনাল মুস্লিম ইউনিভার্সিটি স্থাপন করেন। কুঅ'র মুহম্মদ আশরাফ আর খাজা সাহেবও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। আশরাফ পড়াশুনায় নামকরা ছাত্র ছিলেন। রাজনীতিতে ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। তখন বোধ হয় বি· এ· পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন কিংবা সবে বি· এ· পাস করেছিলেন। ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন আশরাফ। তাঁদের দু'জনই যাওয়ার সময়ে ওয়াদা করে গেলেন যে আমাদের লাইনেই তারা রাজনীতি করবেন। পরে খাজা আবদুল হাই বেশী বয়সে বিয়ে করে সক্রিয় রাজনীতিতে আর থাকেননি, আর আশরাফ কখনও রাজনীতি ছাড়েন নি। তিনি পরেকার খ্যাতনামা কমিউনিস্ট নেতা ডক্টর কুঅ'র মুহম্মদ আশরাফ, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের পি· এইচ· ডি·। রাহুল সাংকৃত্যায়ণকে আশরাফ বলেছেন যে শুরু হতেই এম· এন· রায়ের ওপরে তাঁর ঘৃণা ছিল। কিন্তু সেই সময়ে (১৯২২ সালের শুরুর দিকের) গোপন পুলিস রিপোর্টে আমরা দেখতে পাই যে কুঅ'র মুহম্মদ আশরাফ বি· এ· জার্মানীতে এম· এন· রায়ের নিকটে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

খাজা আবদুল হাই সাহেবের নামে একখানি পত্র দিয়ে আমি উস্মানীকে আলীগড়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। নূতন পরিচয় করার জন্যে উস্মানীর পক্ষে খুবই ভালো জায়গা ছিল আলীগড়। উস্মানীর জন্যে সত্যই সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। মনে হয় ব্যবস্থাটি আশরাফই করেছিলেন। আশরাফরা মালিকানা রাজপুত। ভারতবর্ষে একমাত্র মালিকানা রাজপুতদের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমানের বিয়ে হয়। এদিক থেকে তাঁরা খুবই উদার। মালিকানা রাজপুতদের ইলাকাতেই, আচনেরা ও কালানুরে উস্মানীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু উস্মানী হাতে বেশী সময় পায়নি। আমি ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কথা বলছি। ওই বছরেরই মে মাসের ৯ই তারিখে কানপুরে উস্মানী গিরেফ্তার হয়ে যায়। কানপুর কমিউনিস্ট (বলশেভিক) ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সংস্রবে আবার আমি উস্মানীর কথা বলব।

শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে ও মায়লাপুরম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার

দেশের ভিতরে যাঁরা পার্টি গড়ার প্রথম যুগে কাজে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের ভিতরে শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে ও মায়লাপুরম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার দু'টি

বিশেষ নাম। তাঁদের কথা আমি আগেও উল্লেখ করেছি। তাঁদের বিষয়ে যা আমি আগে বলিনি তা এখন আমি এখানে বলব। আমি এখানে দু'টি নাম একত্রে উল্লেখ করলাম। তার কারণ, তাঁদের দু'জনই চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য সাধন করতে চেয়েছিলেন।

ডাঙ্গে আমায় নিজেই বলেছে যে তার "গান্ধী বনাম লেনিন" (Gandhi Versus Lenin) নামক ইংরেজি পুস্তক ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীইন্দুলাল যাজ্ঞিক যে ইংরেজিতে রণছোড়দাস ভবন লোটবালার (Ranachoddas Bhavan Lotvala) ছোট্ট জীবনী লিখেছেন তাতেও এ কথা স্বীকৃত হয়েছে। আমি এই পুস্তকের প্রথম মুদ্রণে লিখেছি "গান্ধী বনাম লেনিন" কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাতেই মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মারফতে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের সঙ্গে ডাঙ্গের সংযোগ স্থাপিত হয়। ডাঙ্গের সঙ্গে কথাবার্তার ভিতর দিয়ে আমি তাই বুঝেছিলেম। এখন অনেক দলীল-পত্র আমার হাতে এসেছে। সে-সব হতে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে ১৯২১ সালে কিংবা ১৯২২ সালের প্রথম কয় মাস "গান্ধী বনাম লেনিন" কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর সেসিল কে' লিখেছেন যে ১৯২২ সালের জুন মাসে "বোম্বে ক্রনিকল" নামক ইংরেজি দৈনিকে ডাঙ্গের "গান্ধী বনাম লেনিন"-এর সমালোচনা ছাপা হয়। তা থেকেই তিনি ডাঙ্গের নামের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন। এখন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে "গান্ধী বনাম লেনিন" ডাঙ্গেকে লোটবালার সঙ্গে পরিচিত করেছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তাকে এই পুস্তক পরিচিত করেনি। ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত "সোশ্যালিস্ট" পত্রিকাই ডাঙ্গেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত করেছিল। সোবিয়েতের প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তান ও ইরানের সোবিয়েত দূতাবাসগুলিতে ডাঙ্গে তার "সোশ্যালিস্ট" কাগজই পাঠাত। ১৯২২ সালের জুন মাসের পরে এবং সেপ্টেম্বর মাসের আগে কোনো এক সময়ে ডাঙ্গে ও সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার এম. এন. রায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়েছিলেন। সিঙ্গারাভেলু রায়কে পত্রে লিখেছিলেন তিনি একজন জেলে, সমুদ্র-কূলে বাস করেন, আর মাছ ধরেন। নিঃসন্দেহে জেলে তিনি ছিলেন, পৃথিবীর একটি চমৎকার সমুদ্র-কূলে মাদ্রাজের ২২, সাউথ বীচে তিনি বাসও করতেন, কিন্তু মাছ তিনি ধরতেন না। তবে তাঁর ভাইয়ের মাদ্রাজের ইউরোপীয়ান ক্লাবে মাছ জোগান দেওয়ার কন্‌ট্রাক্ট ছিল।

"Shortly before Charles Ashliegh's arrival in Bombay (18th or 19th September 1922) Roy had obtained two important recruits in India—Dange in Bombay and Singaravelu in Madras.

"S. A. Dange first came to notice when, in June 1922, the 'Bombay Chronicle' published a review of a book written by him—'Gandhi V. Lenin' ".

(Cecil Kaye : Communism in India, page 23)

ডাঙ্গে ও সিঙ্গারাভেলুর সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের যোগাযোগ যে উল্লিখিত সময়ে হয়েছে তাতে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। "ইণ্ডিয়া ইন্‌ ট্রানজিশন" পড়ে সিঙ্গারাভেলু রায়কে পত্র লিখেছিলেন, বলেছিলেন তামিল ভাষায় তিনি তাঁর

তর্জমা করবেন,—এই কথা রায় আমাকে লিখেছিলেন। কি বলে সিঙ্গারাভেলু রায়কে প্রথম পত্র লিখেছিলেন তার উল্লেখ আমি ওপরে করেছি। ডাঙ্গে তার "সোশ্যালিস্ট' প্রথম সংখ্যা হতেই "অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি"র সভ্যদের নিকটে পাঠাচ্ছিল। কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের কাকা, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নজ্‌মুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিলেন। তাঁর ওখানেই প্রথম আমরা "সোশ্যালিস্ট" দেখি। কে এই ডাঙ্গে এই কথা আমরা ভাবছিলেম এমন সময় এম. এন. রায়ের একখানি পত্র এলো। তিনি তাঁর পুরানো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী বন্ধুদের ওপরে বড় বেশী চটেছিলেন। লিখেছিলেন ওঁরা মেস্‌ ও বোর্ডিং হাউসের তখ্‌ৎপোশের ওপরে শুয়ে শুয়ে বিপ্লবের স্বপ্নই দেখবেন, কিন্তু বিপ্লব কখনও করবেন না। আমাকে বলেছিলেন, আপনি বরং বোম্বেতে গিয়ে ডাঙ্গের সহযোগে একটি দোকান গড়ে তুলুন যে-দোকানে আমাদের সাহিত্য পৌঁছিয়ে দেওয়া যাবে। বুঝলাম ডাঙ্গে আমাদেরই লোক।

প্রায় একই সময়ে ডাঙ্গে আর সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারকে পেয়ে মানবেন্দ্রনাথের আনন্দের অন্ত ছিল না। ২রা নবেম্বর (১৯২২) তারিখে তিনি মস্কো হতে যে পত্র ডাঙ্গেকে লিখেছিলেন তার উল্লেখ আমি আগে করেছি। যোগাযোগ হতে-না হতেই তেইশ বছরের ছেলে ডাঙ্গে সম্বন্ধে যে উচ্চ বিশেষণ তিনি প্রয়োগ করেছিলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এই ডাঙ্গে ২৩শে ডিসেম্বর (১৯২২) তারিখে সোশ্যালিস্ট কাগজে রায়ের প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে লিখল। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সের সিঙ্গারাভেলুও কম গেলেন না। গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে আমাদের প্রোগ্রামকে সমর্থন করতে উঠে তিনি বললেন যে তিনি একজন কমিউনিস্ট। তারপর বললেন যে তিনি বলপ্রয়োগ না করার পদ্ধতিতে (non-violence) বিশ্বাসী। আরও বললেন ঃ—"That method has been disputed by our fellow Communist abroad. I told them that we have adopted that method as a practical necessity, and that I believe in that method. Therefore they differ fundamentally as to method."

(Overstreet and Windmiller : Communism in India, page 57)

("বিদেশে আমার কমিউনিস্ট ভ্রাতৃগণ বলপ্রয়োগ না করার পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন না। আমি তাঁদের বলেছি এর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই আমরা এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। আমি এই পদ্ধতিতে বিশ্বাস করি। অতএব, এর সঙ্গে তাঁদের বিরোধ মৌলিক।") আমি রায়কে লিখলাম, সিঙ্গারাভেলু কেন নিজেকে কমিউনিস্ট ব'লে ঘোষণা করলেন? তা না করেই তো তিনি বক্তৃতা দিতে পারতেন। আমার বলার ইচ্ছা ছিল যে সিঙ্গারাভেলু নিরুপদ্রব অসহযোগ করে আদালত ছেড়েছেন, কোনও বল প্রয়োগ না করাতেই তিনি বিশ্বাস করতেন। তাছাড়া, মজুরদের ভিতরে কাজ করার জন্যে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির নিকট হতে ষোল হাজার টাকা তিনি পেয়েছেন কিংবা পেতে যাচ্ছেন (টাকাটা তিনি তখন বা পরে পেয়েছিলেন), এই অবস্থায় বলপ্রয়োগ করাতে বিশ্বাস তিনি করতেও পারতেন না। কিন্তু নিজেকে কমিউনিস্ট ব'লে পরিচয় না দেওয়াটা তাঁর ইচ্ছাধীন ছিল। রায় ধারণা ক'রে নিয়েছিলেন যে সিঙ্গারাভেলুর এই সব কিছু কৌশল মাত্র ছিল। রায় আমার পত্রোত্তরে জানালেন যে সিঙ্গারাভেলু সম্বন্ধে

আপনি যা বলেছেন তা ভুল। তিনি যোগ্য ব্যক্তি, ইত্যাদি। ডাঙ্গে ও সিঙ্গারাভেলু সম্বন্ধে পরে রায়ের ধারণায় পরিবর্তন এসেছিল। ভারতের প্রতিনিধিদের নিয়ে ফ্রান্সে একটি বৈঠকের কথা উঠেছিল। রায় লিখলেন যে ডাঙ্গে যোগ দিবে কিনা সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছেন। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিঙ্গারাভেলু সম্বন্ধে রায়ের মত ছিল "A person meaning well but stupid and humbug" (তাঁর সদিচ্ছা আছে, তবে তিনি নির্বোধ এবং ভান করেন)।

আমরা যতটা তখনকার দিনে দেখেছি (১৯২২-২৩ সালে) শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে ও মায়লাপুরম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার নিজেদের কমিউনিস্ট বলতেন বটে কিন্তু মজুর শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতায় তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। তবে কার্যত ন্যাশনালিস্ট হয়েও আন্তর্জাতিক আর্থিক সাহায্য গ্রহণে তাঁরা সতত উৎকট বিশ্বাসী ছিলেন। সিঙ্গারাভেলু তো বলতেন আন্তর্জাতিক মজুর শ্রেণীর অর্থ-সাহায্য না পেলে ভারতবর্ষে মজুর আন্দোলন চলতে পারে না।

"In January (1923) Dange and Singaravelu exchanged congratulations on their wisdom in declining Roy's invitation to Europe." (Home Deptt. Poll. File No. 103/IV. PP 3-30 National Archives of India)

From S. A. Dange, Bombay to Singaravelu Chettiar, Madras : Dated 29. 1. 23

* * * *

"You perhaps know that Roy wants to hold a conference of Indian Communists in Berlin. I think it is a mad venture for Indians to go hunting Communism in European conferences. Whatever has to be done, must be done in India. Moreover, there must be less talk of revolution than what Roy indulges in, even when the preliminary rights of labour are not obtained, it is a dream to talk of proletarian revolution. You might differ but that is my view."

(Home/Poll./1924, F261, National Archives of India)
Singaravelu Chettiar to Dange, dated 3. 2. 1923.

* * * *

"...We shall go on as best as we can in propagating communism among the masses. Who are the Indian communists, how many of them, who are prepared to go to Berlin when Germany is on the throes of starvation? There is a good deal to be done here before one thinks of a congress. But let him go on if he has resources enough, but it is absolutely impossible to cross our shores at the present. You know the Official Secrets Bill with: its provisions against foreign corres-

pondence, however innocent. When that is the case why think of the Berlin Conference."

(Home/Poll/1924, F 261, National Archives of India)

মর্মার্থ

"ডাঙ্গে ও সিঙ্গারাভেলু যে এম. এন. রায়ের ইউরোপ যাওয়ার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেছিলেন তার জন্যে তাঁরা ১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে পরস্পরকে অভিনন্দিত করেছিলেন।"

২৯. ১. ১৯২৩ তারিখে ডাঙ্গে সিঙ্গারাভেলুকে লিখল ঃ "রায় যে বার্লিনে ভারতীয় কমিউনিস্টদের সম্মেলন ডাকতে চাইছেন সেটা একটা পাগলামি ব্যাপার। ভারতীয়রা কমিউনিজমের সন্ধানে ইউরোপীয় সম্মেলনসমূহে যোগ দিতে যাবেন এটা পাগলামি ছাড়া আর কি? আমরা যা কিছু করব ভারতবর্ষেই করব। রায় যে কথায় কথায় বিপ্লবের কথা বলছেন তা কিছু কম ক'রে বলা উচিত। যে দেশে মজুরদের প্রাথমিক দাবীগুলিও স্বীকৃত হয়নি সে দেশে মজুরশ্রেণীর বিপ্লবের কথা বলা স্বপ্ন মাত্র।" আপনার মতবিরোধ থাকতে পারে কিন্তু এটাই আমার অভিমত।

ডাঙ্গেকে লেখা সিঙ্গারাভেলুর পত্র হতে ঃ

"......যত ভালো করে সম্ভব জনগণের নিকটে আমরা কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করতেই থাকব। ভারতীয় কমিউনিস্ট কারা? জার্মানী যখন উপবাসের ক্লেশে ক্লিষ্ট তখন তাঁদের মধ্য হতে কত জন বার্লিনে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন? [পার্টি] কংগ্রেসের কথা ভাবার আগে এদেশে অনেক কিছু করার আছে। তাঁর [রায়ের] যদি প্রচুর সংগতি থাকে তিনি এগিয়ে যেতে পারেন কিন্তু আমাদের পক্ষে এখন এদেশের সীমানা ত্যাগ করা সম্ভব নয়। অফিসিয়েল সিক্রেট্স্ বিলের কথা আপনি জানেন। এর বৈদেশিক পত্র লেখালেখি সম্পর্কিত ধারাগুলি যতই নির্দোষ দেখাক না কেন, এই সময়ে বার্লিন কন্ফারেন্সের কথা কেন ভাবতে যাওয়া?"

ডাঙ্গে আর সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার—কমিউনিস্ট আন্দোলনের সেই প্রাথমিক যুগে কিভাবে যে এই দুই চালাকের সংযোগ ঘটেছিল তা ভাবতে আজও আশ্চর্য ঠেকে।

রামচরণলাল শর্মা

১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কানপুরে জয়ণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে রামচরণলাল শর্মার নামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। সেখানেই প্রথম আমি জানতে পেলাম যে তিনিও কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার একজন আসামী। যেহেতু তিনি ফরাসী ভারতে (পণ্ডিচেরীতে) রাজনীতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তার জন্যে তাঁকে আদালতে আমাদের সঙ্গে হাজির করানো যাবে না। ব্রিটিশ পুলিস নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ ক'রে ফরাসী ভারতের ব্রিটিশ সীমানার দিকে তাঁকে আনার চেষ্টা ক'রে সফল হননি।

পরে আমি রামচরণলাল সম্বন্ধে খবর নিয়ে জেনেছি যে তিনি সংযুক্ত প্রদেশের (উত্তর প্রদেশের) এটা জিলার লোক। সেসিল কে' লিখেছেন যে রামচরণলাল স্বেচ্ছায় কলকাতার যুগান্তর প্রেসের মুদ্রাকর হয়েছিলেন। এ কথা সত্য কিনা তা যাচাই করতে পারিনি। সে যুগের প্রায় সকলেই মরে গেছেন। যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে সংসৃষ্ট অবিনাশচন্দ্র রায় বেঁচে আছেন শুনেছি। কিন্তু তাঁর নিকটে কোনো লোক এ ব্যাপারে যাচাই করার জন্যে পাঠাইনি। কারণ তাঁর বয়স এখন নাকি বিরাশি-তিরাশি বছর।

আমি যতটা খবর নিতে পেরেছি তাতে রামচরণলাল শর্মা "স্বরাজ" নাম দিয়ে ইলাহাবাদ হতে উর্দু ভাষায় একখানা কাগজ বা'র করেছিলেন। এই কাগজে রাজদ্রোহমূলক লেখা ছাপানোর অপরাধে ১৯০৯ সালে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪-এ ধারা অনুসারে শর্মা আদালতে অভিযুক্ত হন। কেউ কেউ ১২১-এ ধারার কথা লিখেছেন। কিন্তু আমার পাওয়া খবর অনুসারে তিনি ১২৪-এ ধারা অনুসারেই অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে, মোকদ্দমার বিচার ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে না হয়ে সেশন্স্ কোর্টে হয়েছিল। তাতে ১৯০৯ সালের দীর্ঘ দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে তিনি দণ্ডিত হয়েছিলেন। এই কারাদণ্ডের একটি অংশ তিনি আন্দামানেও খেটেছেন। ১৯১৮ সালে শর্মা মুক্তি পান।

রোহতকে একটা রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে ১৯২০ সালের জুলাই মাসে আবার তাঁর বিরুদ্ধে ১২৪-এ ধারার গিরেফ্তারি পরওয়ানা বা'র হয়। এই বারে ধরা না দিয়ে তিনি পণ্ডিচেরীতে পালিয়ে গেলেন।

দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করার পরে রামচরণলালের স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল এবং তাঁর মনের বৈপ্লবিক দৃঢ়তা একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। আরও একবার জেলে যেতে তিনি কিছুতেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর এই অবস্থার কথা সার সেসিল কে' তাঁর "কমিউনিজ্ম্ ইন ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকের ৯১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"In 1921 he sued for pardon, offering to turn police informer 'as to movements of leading seditionists, among whom he moved freely', or to be employed in Afghanistan 'to report on the dissemination of Bolshevic propaganda' in that country. As he was constitutionally incapable of playing straight, he was not employed ; he is now deeply committed to M. N. Roy, but would doubtless sell him reasonably cheaply."

অর্থাৎ, "১৯২১ সালে সে ক্ষমা ভিক্ষা করল এবং বলল তার বিনিময়ে সে 'নেতৃস্থানীয় রাজদ্রোহীদের গতিবিধি সম্বন্ধে খবর জোগাবে, যাঁদের ভিতরে তার অবাধ যাতায়াত আছে,' কিংবা তাকে আফগানিস্তানে নিযুক্ত করলে 'সে দেশে বলশেভিক প্রচার সম্বন্ধে সে রিপোর্ট করবে'। সে সোজাসুজি কাজ করার পক্ষে চরিত্রগতভাবে অক্ষম ব'লে তাকে নিযুক্ত করা হয়নি ; এখন সে গভীরভাবে এম. এন. রায়ের নিকটে আত্মসমর্পণ করেছে, তবে নিঃসন্দেহে সে নিজেকে সস্তা দামে বিক্রয় করবে।"

রামচরণলাল শর্মা কি ক'রে এম. এন. রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল সেই কথাটা জানা দরকার। অযোধ্যাপ্রসাদ আমার নিকটে যা রিপোর্ট করেছিল

আমি সেই কথাটিই এখানে বলব। অযোধ্যাপ্রসাদ যুক্ত প্রদেশের ঝান্সীর বাশিন্দা। ছেলেবেলায় সে গান্ধীর সবরমতী আশ্রমে ছিল। তারপরে তার কোনো বন্ধুর সঙ্গে সে পণ্ডিচেরী গিয়ে রামচরণলাল শর্মার সঙ্গে পরিচয় করে এবং তাঁর স্নেহভাজনও হয়ে পড়ে। যতটা আমি মনে করতে পারছি এই সূত্র ধরেই সে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। অযোধ্যাপ্রসাদ মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার একজন আসামীও ছিল। শর্মার সঙ্গে বাস করে অযোধ্যা-প্রসাদ যে সঠিক তথ্য আবিষ্কার করেছিল তা হচ্ছে এই। শর্মা অত্যন্ত দুরবস্থার ভিতরে পণ্ডিচেরীতে তাঁর দিন কাটাচ্ছিলেন। তা দেখে একদিন এক গোয়েন্দা পুলিস অফিসার শর্মাকে এম. এন. রায়ের ঠিকানা এনে দেন। তাঁকে ওই ঠিকানায় পত্র লেখালেখি করতে বলেন। এই ভাবেই রামচরণলাল শর্মার সঙ্গে এম. এন. রায়ের সংযোগ স্থাপিত হয়। এই সংযোগকে এম. এন. রায় তাঁর একটি পরম সংযোগ মনে করেছিলেন।

যে-লোকটি পুলিসের সংবাদ সরবরাহকারী হতে চেয়েছিল, যার চরিত্রগত অক্ষমতার জন্যে পুলিস তাকে কাজে নিযুক্ত করেনি, তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পূর্বে রায়ের তাঁর বিষয়ে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। আমাদের আন্দোলনের কী ক্ষতিই না তিনি করলেন তা তিনি বুঝতে চাইলেন না। পুলিসের কথায় এম. এন. রায়ের সঙ্গে শর্মা কি শুধু সংযোগই স্থাপন করেছিলেন? পুলিসকে কোনো খবর কি তিনি দিতেন না? এই লোকের নিকটেই রায় আবার মুহম্মদ আলী ওর্ফে সেপাসসিকে পাঠিয়েছিলেন।

রামচরণলাল শর্মা ইংরেজি ভাষা কম জানতেন। মার্কসীয় সাহিত্য, অধ্যয়ন করার সুযোগ তিনি পাননি। সন্ত্রাসবাদে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। এ ছাড়া আর কিছু তিনি বুঝতেন না। তাঁর সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসেরও তেমনি কোনো ভিত্তি ছিল না। কারণ, তিনি তো নিজেকে ব্রিটিশের নিকটে বিক্রয় করতে প্রস্তুত ছিলেন।

আমার জেল হতে ফেরার পরে ১৯২৬ সালে রামচরণলাল তাঁর ছোট ভাই শিবচরণলালকে আমার নিকটে পাঠিয়েছিলেন। এই ছোট ভাইটি আমায় বললেন যে তাঁর অগ্রজ বৃদ্ধ ও ভগ্নস্বাস্থ্য। বহুমূত্র রোগেও তিনি ভুগছেন। এই সময়ে তিনি খানিকটা শান্তিতে থাকতে চান। কিন্তু পণ্ডিচেরীর পুলিস তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। অতএব কলকাতা হতে একজন যুবককে পণ্ডিচেরী পাঠানো হোক, যিনি কোনো একজন পুলিস অফিসারকে খুন ক'রে কলকাতা চলে আসবেন। তাতে পুলিসেরা ভয় পেয়ে রামচরণলালকে আর বিরক্ত করবে না। তাঁর প্রস্তাবের কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলেম। হয়তো তিনি পাগল হয়েছিলেন, কিংবা একটি আস্ত শয়তান ছিলেন তিনি। একজন পুলিস অফিসারকে যদি খুনই করতে হয় তবে সে কাজ তাঁর ছোট ভাই শিবচরণ করবেন না কেন? ঝাঁসীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ঝাঁসী হতে একজন যুবককে তিনি কেন এ কাজ করতে ডাকলেন না? বাঙলা দেশের একজন যুবককে কেন এমন কাজ করতে যেতে হবে? অথচ মানবেন্দ্রনাথ তাঁকে পত্রের মারফতে গভীর-ভাবে বোঝাতে চাইছিলেন যে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের পথ ভুল পথ।

না জেনে, না শুনে, কর্মী নির্বাচন ক'রে রায় আমাদের আন্দোলনের অশেষ ক্ষতি করেছিলেন।

এ পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ মোটামুটি পড়ে পঁচাশি বছরের বিপ্লবী আমীর চাঁদ বোমওয়াল ২৪-১-১৯৭১ তারিখে দেরাদুন হতে আমায় একখানি

পত্র লিখেছেন। উর্দু ভাষায় লিখিত এই পত্রে তিনি আমায় জানিয়েছেন যে ইলাহাবাদ হতে ১৯০৭ সালের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত উর্দু কাগজ 'স্বরাজ্য' (নাম 'স্বরাজ' নয়) রামচরণলাল শর্মা বা'র করেননি। কাগজখানির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন শান্তিনারায়ণ ভাটনগর, যুক্ত প্রদেশের লোক। আমীর চাঁদ বোমওয়াল ছিলেন এই কাগজের শেষ সম্পাদক। ১৯১০ সালে নূতন প্রেস আইন পাস হওয়ার পর হতে এই কাগজকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ কাগজে লেখার জন্যে পরে পরে আটজন গিরেফ্‌তার হয়েছিলেন।

'স্বরাজ্যে'র সহিত রামচরণলালের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিনি রাস্তার মোড়ে ও বাজারে কিছু লোক জমা ক'রে অনলবর্ষী বক্তৃতা দিতেন, কোনো কোনো বক্তৃতায় 'স্বরাজ্যে'র প্রবন্ধও পড়তেন। তাঁর এই বক্তৃতার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক তিনটি রাজদ্রোহের মোকদ্দমা হয়। সেশন আদালতে এসব মোকদ্দমার বিচার হয়েছিল এবং তিনি দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। সাজা তিনি আন্দামানেও কাটিয়েছেন। আমীর চাঁদ পরিষ্কার করে কিছু লেখেননি, তিনটি সাজাই বোধ হয় এক সঙ্গে চলেছিল।

কর্নেল কে'র 'কমিউনিজম ইন্ ইণ্ডিয়া' হ'তে যে উদ্ধৃতি আমি দিয়েছি আমীর চাঁদ বোমওয়াল তা বিশ্বাস করতে চান না। তাঁর মনে যে ব্যক্তি একবার আন্দামান ঘুরে এসেছেন তাঁর পক্ষে এ জাতীয় দুর্বলতা প্রকাশ কি করে সম্ভব? কেন সম্ভব নয়? জাতীয় মুহাফিজখানায় এ রকম দুর্বলতার অনেক দলীল পাওয়া যাবে। তাছাড়া, ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের লোকের নিকট হতে ঠিকানা নিয়ে তিনি এম. এন. রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ কি করে স্থাপন করলেন?

শর্মা যে 'স্বরাজ্যে'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন এই ভুল খবর আমায় তাঁর লোকেরা দিয়েছিলেন। ১৯১৮ সালের সিডিশন কমিটির রিপোর্টে লিখেছে যে শান্ত যুক্ত প্রদেশে বিপ্লবী আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে ইলাহাবাদের স্বরাজ্য পত্রিকা।

আন্তর্জাতিক অর্থ-সাহায্য

যাঁরা কমিউনিস্ট তাঁরা তো জানবেনই, কমিউনিস্ট যাঁরা নন তাঁরাও জানেন, কমিউনিস্ট আন্দোলন আন্তর্জাতিক। দেশে দেশে যে সকল ন্যাশনাল কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল সে সব একীভূত হয়েছিল বিশ্ব কমিউনিস্ট পার্টিতে। এই বিশ্ব কমিউনিস্ট পার্টিই **'কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল'**। একথা মনে রাখতে হবে যে আন্তর্জাতিকতায় অটুট বিশ্বাসী হয়েও কমিউনিস্টরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। কিন্তু, সংকীর্ণমনা ন্যাশনালিস্ট তাঁরা কোনো অবস্থাতেই নন।

বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের একটি কর্তব্য ছিল। দেশের অবস্থানুসারে কাজের ব্যবস্থা হতো। বিভিন্ন দেশে কাজের প্রসারের জন্যে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালকে টাকাও খরচ করতে হতো। এই ব্যাপারে গোপনীয়তা অবলম্বন করা ছিল একান্তই স্বাভাবিক। তবে, আমাদের রাজনীতি ও মতবাদ গোপন ব্যাপার ছিল না। তা ছাপার অক্ষরে প্রচারিত হতো। আমাদের শত্রুরা আমাদের রাশিয়ার দালাল (agent) বলে প্রচার করত। অবশ্য, কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের 'এজেণ্ট' হওয়াকে আমরা কখনও অগৌরবের কাজ বলে মনে করিনি। কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের নিকট হতে টাকা পাওয়ার জন্যে ভারতের 'ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবী'রাও লালায়িত ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের নিকট হতে টাকা গ্রহণ করে তাঁরা ধন্য হয়েছিলেন।

আগেই বলেছি মানবেন্দ্রনাথ রায় কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের তরফ হতে ভারতের কাজের চার্জে ছিলেন। প্রবাসে গঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিরও তিনি নেতা ছিলেন। কাজেই, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কাজের জন্যে টাকাও কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের নিকট হতে তিনিই তুলতেন। এই কারণে, ভারতের কাজের জন্যে টাকা আমাদের তাঁর কাছেই চাইতে হতো। ব্যক্তিগত ভাবে আমার দু'পা দু'নৌকায় ছিল না। দৃঢ়তার সহিত টাকা চাইবার অধিকার তাই আমার ছিল। কিছু সংখ্যক লোক বলে বেড়ান যে "মুজফ্‌ফর বড় টাকা টাকা করত"। এম. এন. রায়ের মোকদ্দমার সেশন্‌স্ কোর্টের রায়েও এ ধরনের একটি কথা আছে।

এম. এন. রায়ের সহিত আমার সহকর্মিতার সময়ে, অর্থাৎ আমার ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে স্টেট্ প্রিজনার হওয়ার আগে পর্যন্ত[১], আমি মোট কত টাকা পেয়েছিলেম তার একটি হিসাব আমি এখানে দিচ্ছি ঃ

(১) আমি সর্বপ্রথম পেয়েছিলেম সুইস্ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের লণ্ডন শাখার নামে ৩১ পাউণ্ডের একখানি চেক্। একথা সত্য যে চেক্‌খানি আমার নামেই এসেছিল, কিন্তু তা আমার জন্যে আসেনি। নলিনী গুপ্ত কলম্বো হতে ইউরোপের টিকেট কেনার জন্যে যে চার শ' টাকা যতীন মিত্রের নিকট হতে ধার

১ এই উপলক্ষে আমি ১৭ই মে (১৯২৩) তারিখে প্রথম গিরেফ্‌তার হয়েছিলেম।

নিয়েছিলেন তা শোধ দেওয়ার জন্যেই টাকাটা এসেছিল। এই চেকের পেছনে আমি শুধু একটি দস্তখৎ করেছিলেম। বিখ্যাত 'আমেরিকান ডেণ্টাল সার্জন' ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের থ্যাকার স্পিংক কোম্পানীর ব্যাঙ্কে একটা হিসাব ছিল। সেই হিসাবে জমা দিয়ে লণ্ডন হতে চেক্‌টা ভাঙিয়ে আনা হয়েছিল। ডক্টর সেনগুপ্ত নিজ হাতে টাকাটা যতীন মিত্রকে দিয়েছিলেন। যতীন মিত্র আরও একশ' টাকা ফাউ নিয়েছিলেন। বর্ধমানের বিজয় বসু এই টাকাটা আমায় দিয়েছিলেন। এই পুস্তকের ৯৭ পৃষ্ঠায়ও তাঁর নামোল্লেখ আছে। পুলিস রিপোর্টে আছে যে আমি ৪০০ টাকা নলিনী গুপ্তকে কলম্বোর ঠিকানায় পাঠিয়েছিলেম। এ খবর একেবারেই ভুল। আমি তাঁকে কোন টাকাই পাঠাতে পারিনি।

(২) দ্বিতীয় দফায় রায় আমায় পাঠিয়েছিলেন সুইস ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের লণ্ডন শাখারই বরাবরে ৩ পাউণ্ড ১৩ শিলিঙের একখানি চেক। চার পাউণ্ড পুরো কেন হলো না, খুচরা ১৩ শিলিং কেন হলো, এর তাৎপর্য আমি কোনো দিন বুঝতে পারিনি। এই টাকায় রায় কিছু ভারতীয় বই পাঠাতে বলেছিলেন। আমি পুস্তকের তালিকা ও চেক একসঙ্গেই কলকাতা কলেজ স্কোয়ারের বুক কোম্পানী লিমিটেডের নিকটে জমা দিয়েছিলেম। লণ্ডনের সঙ্গে তাঁদের কারবার ছিল। বইও তাঁরাই পাঠিয়েছিলেন। কিছু বেশী টাকারই পাঠিয়েছিলেন।

(৩) তৃতীয় দফায় কলকাতার একটি ডাচ ব্যাঙ্কের বরাবরে আমার নামে পঞ্চাশ পাউণ্ডের একখানা ড্রাফ্‌ট এসেছিল। প্রবোধের নামেও আর একখানা ড্রাফ্‌ট ওই একই ব্যাঙ্কের বরাবরে এসেছিল। কিন্তু এই চেক্‌খানা ছিল একশ' পাউণ্ডের। এই দু'খানা ড্রাফ্‌টই একই খামের ভিতরে ভূপতি মজুমদারের কোনো ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল এবং নিরাপদে তাঁর হাতে পৌঁছেছিল। আমার নামীয় ড্রাফ্‌টখানা শ্রীমজুমদার আমায় দিয়েছিলেন। প্রবোধের নামীয় ড্রাফ্‌টও তিনি নিশ্চয় তাঁকে দিয়ে থাকবেন। প্রবোধ ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের একটি ছদ্মনাম। হতে পারে এ নামের আড়ালে অতুলকৃষ্ণ ঘোষও ছিলেন। রায়ের পুরানো পার্টির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই দু'খানা ড্রাফ্‌ট পাঠানোর সম্বন্ধে এম. এন. রায় আমায় লিখেছিলেন যে অন্য কোনো পথ না পেয়ে তিনি এই পথ অবলম্বন করেছেন। ভূপতি মজুমদার রায়ের পুরানো পার্টির একজন সহকর্মী।

আমি সমস্ত পৃথিবীকে জানিয়ে রাখতে চাই যে এম. এন. রায় তার কার্যকালে আমায় পঞ্চাশ পাউণ্ডের (৭৫০ টাকার) বেশী দেননি। এই টাকা হতে আমি মাত্র দশটি টাকা খরচ করেছিলেম। বাকী টাকা আমার বন্ধু কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদের নিকটে জমা রেখে স্টেট্‌-প্রিজনার হয়ে আমি জেলে চলে যাই। কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা চলাকালে এই টাকাতে মণিলাল ডক্টরকে ব্যারিস্টার নিযুক্ত করে কুত্‌বুদ্দীন সাহেব ও আবদুল হালীম কানপুরে পাঠিয়েছিলেন।

এ দেশে প্রেরিত টাকার একটি বড় হিসাব ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরো দাখিল করেছেন। তাতে ভূপতি মজুমদারের নিকটে আসা ৫০+১০০ পাউণ্ডের হিসাব নেই। এই বড় হিসাবের কোনো টাকাই আমি পাইনি। এই বড় হিসাবটির ফাইল নম্বর হচ্ছে 18-6/26/Pol (Sec.)।

স্যার ডেভিড পেট্রি ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি "কমিউনিজ্‌ম্‌ ইন্‌ ইণ্ডিয়া ১৯২৪-২৭" নাম দিয়ে একখানি বই লিখেছেন। এ বইখানি গোপন পুস্তক, উচ্চস্তরের অফিসারদেরই শুধু তা পড়ার অধিকার ছিল। এতকাল পরে এ বছর) তার ওপর হতে গোপনীয়তার ছাপ উঠে

গেছে। ন্যাশনাল আরকাইব্‌স্‌ অফ্‌ ইণ্ডিয়ায় পুস্তকখানি এখন সকলের জন্যে উন্মুক্ত। এই পুস্তকের একুশের পৃষ্ঠায় লিখিত হয়েছে ঃ

"...In the course of the covering letter, Roy appointed Muzaffar Ahmad distributing centre for his pamphlets and The Vanguard on a monthly salary of Rs. 100/"

(পত্রে লেখা হয়েছে রায় তার পুস্তিকাগুলি ও 'ভ্যানগার্ড' বিতরণের জন্যে মাসিক ১০০ টাকা বেতনে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে নিযুক্ত করেছিলেন।)

ডেভিড পেট্রির পুস্তক পড়ার আগে এ খবর আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। রায়ের কোনো পত্রে এমন একটি খবর আমি কখনও পড়িনি। এ আষাঢ়ে গল্প কোথায় কার দ্বারা রচিত হয়েছিল তা আমি জানিনে। সার ডেভিডের পুস্তকে খবরটিই শুধু ছাপা হয়েছে, কিন্তু পত্রখানা ছাপা হয়নি। তবে, সত্যই যদি সেই সময়ে আমার মাসিক একশ' টাকা বেতন কোথাও হতে ধার্য হতো তবে বড়ই ভালো হতো। আমার মনে হয় তা হলে আমার টিউবারকিউলোসিসটা আর হতো না।

ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগও বিদেশ হতে টাকা পাওয়ার বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে অদ্ভুত প্রচার করেছে। তারা বলেছে, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ যে বিদেশ হতে ভাতা পেত তার প্রমাণ হিসাবে দু'খানা চেকের ফটোস্টাট কপি তাদের নিকটে আছে। সেই ৩১ পাউণ্ড ও তিন পাউণ্ড ১৩ শিলিঙের চেক দু'খানা। সার সেসিল কে' তাঁর পুস্তকে স্বীকার করেছেন যে ৩১ পাউণ্ডের চেকখানা নলিনীর ধার নেওয়া টাকা শোধ দেওয়ার জন্যে এসেছিল। আশ্চর্য এই যে তিনিই ছিলেন কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ভারত গবর্নমেণ্টের পক্ষের বাদী!

আমি কিন্তু এম. এন. রায়কে কিঞ্চিৎ সাহায্য করতাম। তিনি ভারতের বিষয়ে লিখছিলেন। ভারতের অনেক পত্র-পত্রিকা সুদূর বিদেশেও তিনি পেতেন। তবুও আমার চেষ্টা ছিল যে ভারত সম্পর্কে তাঁকে যত বেশী পরিজ্ঞাত রাখা যাবে ততই ভালো হবে। তাই, কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা আর পুস্তিকা আমিও তাঁকে সংগ্রহ করে পাঠাতাম। তাতে কোনো কোনো ডাকের দিনে আমার দু'টাকাও খরচ হয়ে গেছে। বন্ধুদের নিকট হতে চেয়ে-চিন্তে এটাকা আমি জোগাড় করেছি।

যোগাযোগ হওয়ার পর হতেই রায় আমায় ইউরোপে ডেকেছেন। কিন্তু ডাকলেই তো আর যাওয়া যায় না। আমি সর্বক্ষণের কর্মীর মতো কাজ করেছি। বারে বারে তাঁকে আমি টাকার জন্যে পত্র লিখেছি। ১৯২২ সালে কোনো টাকাই আমি তাঁর নিকট হতে পাইনি। আমি নিজেকে অবহেলিত বোধ করেছি বটে, কিন্তু কাজ ছেড়ে দিইনি। সেটা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কেন না, কাজ আমি এম. এন. রায়ের জন্যে শুরু করিনি।

১৯২৩ সালে রায়ের মনোভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আসে। টাকা আমার হাতে পৌঁছাক বা না পৌঁছাক, এম. এন. রায় তাঁর নিজের পদ্ধতিতে টাকা আমায় পাঠাতে চেষ্টা করেছেন। কোনো ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক হতে তার কলকাতা শাখার বরাবরে ডিমাণ্ড ড্রাফ্‌ট পাঠাতে চাইলে তা খামের ভিতরে পুরে প্রাপকের কলকাতার ঠিকানায় পাঠাতে হতো। এই খাম পুলিসের হাতে পড়লে তারা তা আর প্রাপককে ডেলিভারি দিত না। ব্যাঙ্কের নিকটে পৃথক খবর আসত। ব্যাঙ্ক নিয়ম অনুসারে নব্বই দিন অপেক্ষা করত। তার ভিতরে কেউ ড্রাফ্‌ট নিয়ে না এলে তাঁরা প্রেরকের হিসাবে টাকাটা ফেরৎ দিতেন। অতএব, টাকাটা শেষ পর্যন্ত রায়েরই হাতে থেকে যেতো।

এম· এন· রায়ের জার্মানীতে অবস্থিত এক বন্ধুর অগ্রজের নিকটে তিনি পঞ্চাশ পাউণ্ড হিসাবে দু'খানা ড্রাফ্ট আমার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। ড্রাফ্ট দু'খানার প্রাপ্তি স্বীকারও তিনি ইউরোপে করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও লিখেছিলেন যে মৌলবী লেনে (আমার কলকাতার ঠিকানা) গিয়ে তিনি জানতে পেয়েছিলেন যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নামক কোনো ব্যক্তিকে ওখানকার কেউ চিনেন না। ডাহা মিথ্যা কথা। রায়ের নিকট হতে নাম ও ঠিকানা পেয়ে আমি নিজেও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেম। তিনি বললেন কোনো টাকা কেউ তাঁকে পাঠাননি। অর্থাৎ টাকাটা ভদ্রলোক মেরেই দিলেন,—তখনকার এক্সচেঞ্জের হিসাবে ১৫০০ টাকা।

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এম· এন· রায়ের সঙ্গে পত্র লেখালেখি করতেন। রায়ের নিকট হতে টাকাও তিনি পেয়েছেন। ব্যামফোর্ড (পুলিসের বড় অফিসার) লিখিত রিপোর্টে আছে যে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত কলকাতার বাইরে যাওয়ার সময়ে জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়কে তিনটি কাজের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন ঃ

(১) মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে [অতএব, এম· এন· রায়ের সঙ্গেও] সংযোগ রক্ষা করা ;

(২) ভূপেন্দ্রকুমারের কলকাতার সংগঠনগুলির দেখাশুনা করা ;

(৩) জীবনলালের বোম্বের পুরানো পরিচয়কে [ডাঙ্গের সঙ্গে পরিচয়ের জন্যে] আবার ঝালিয়ে নেওয়া।

জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার সংযোগ যে স্থাপিত হয়েছিল একথা আমি আগেই বলেছি। স্যার সেসিল কে' লিখেছেন ঃ

"After Muzaffar Ahmad's arrest, Roy appointed Jiban Lal Chatterji as Muzaffar Ahmad's successor,......"

(Communism in India, Page 92)

অর্থাৎ, "মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ধরা পড়ার পরে রায় জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়কে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন।"

আমার এমন কোনো বিশেষ স্থান ছিল না যে রায় তাতে জীবনলালকে অভিষিক্ত করবেন। তবে তাঁর সঙ্গেও রায়ের সংযোগ ছিল।

এম· এন· রায়ের পরবর্তী ব্যবহার হতে এটা বোঝা গিয়েছিল যে তিনি আমার অভাবে যৎকিঞ্চিৎ অসুবিধা বোধ করেছিলেন। হয় তো আমার মতো চটপট উত্তর অন্যরা দিতেন না। আমার গিরেফ্‌তারের পরে অন্যরা সাবধানও হয়ে গিয়ে থাকবেন।

আমার গিরেফ্‌তারের পরে ১৯২৩ সালের জুলাই মাসের শেষার্ধে নলিনী গুপ্ত আবার কলকাতা এসেছিলেন। ১৯২৩ সালের আগস্ট মাসে এম· এন· রায় বার্লিন হতে নলিনী গুপ্তকে এক পত্রে লিখলেন ঃ

BERLIN
August, '23

* * *

"What is the news of "M" Something should be done to rescue him. Some monetary help will be available. Pay a

little attention to this direction. About this I have written to a friend[১] of his, but have had no reply."

(Exhibit No. 54, Cawnpore Communist Conspiracy Case, 1924)

এই পত্রাংশও বাঙলার ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন আমাদের পূর্ব পরিচিত কুঞ্জবিহারী রায়। এখানে M-এর অর্থ মুজফ্ফর আহ্মদ। তাকে জেল হতে কি করে উদ্ধার করা যায় সে কথা রায় নলিনীকে ভাবতে বলেছেন। বলেছেন, এই কাজের জন্যে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। রায়ের এ বিষয়ে লেখা পত্রগুলি জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় ও নলিনী গুপ্ত পেয়েছিলেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। পেলেও কোনও লোককে জেল হতে বা'র করে আনা এতই কি সহজ? আমাদের বাঙলা ভাষায় একটি কথা আছে ঃ

থাকতে দিলে না ভাত-কাপড়।
মরলে করে দান-সাগর॥

এম. এন. রায়ের প্রস্তাবটিও কতকটা এই ধরনের।

চার্লস্ আশ্লীর কথা

এটা একটি দীর্ঘ বিবরণ। অনেকের চরিত্র বোঝার পক্ষে এই বিবরণীটি মূল্যবান। তাই সংক্ষেপে তাঁর সম্বন্ধে আমি এখানে কিছু বলব।

মানবেন্দ্রনাথ রায় ভারতে আসার জন্যে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির নিকট হতে লোক চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ পার্টি এই কাজের জন্যে চার্লস্ আশ্লীকে (Charles Ashleigh) নির্বাচিত করেন। ব্রিটিশ পার্টি আর এম. এন. রায়ের মনে কি ছিল তা জানিনে। আশ্লী কিন্তু শুধুমাত্র বার্তাবহ হওয়ার চেয়েও উচ্চস্তরের লোক ছিলেন। তাঁর বয়স ত্রিশের কোঠায় হলেও পৃথিবীর দু'টি মহাদেশে (আমেরিকা ও ইয়োরোপে) তিনি সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। মজুর সংগ্রাম চালাতে গিয়ে ১৯১৮ সালে তিনি আমেরিকায় দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ব্রিটিশের ইংরেজ প্রজা হওয়ার কারণে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁর খোঁজখবর নিতেন। এই কারণে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি জেল হতে ছাড়া পেলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকা হতেও তিনি বহিষ্কৃত হলেন। এই চার্লস্ আশ্লী ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে আবার ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। প্রথমে বার্লিনে গিয়ে এম. এন. রায়ের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করলেন, তাঁর নিকট হতে উপদেশ নিলেন, চিঠি-পত্র নিলেন এবং অনেক টাকাও নিলেন। ১৯২২ সালের ৫ই নবেম্বর হতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পেট্রোগ্রাড ও মস্কোতে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের যে চতুর্থ কংগ্রেসের অধিবেশন হতে যাচ্ছে তাতে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধিগণের রাহাখরচের টাকা। বার্লিনে আশ্লীর নলিনী গুপ্তের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। নলিনী গুপ্ত আশ্লীকে তিনখানি পরিচয় পত্র দিয়েছিলেন ঃ

(১) বোম্বের টাটা এসিউরেন্স কোম্পানীর চীফ্ একাউণ্টাণ্ট মিস্টার কিরণবিহারী রায়ের নামে। নলিনী ও কিরণবিহারী রায়ের বাড়ী বাকেরগঞ্জ

১ Jibanlal Chatterjee.

জিলার একই অঞ্চলে ছিল। ছোটবেলা তাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও ছিল। কিরণবিহারী রায় যখন গ্লাসগোতে ইন্‌করপোরেটেড একাউণ্টাণ্টশিপ্ (চাটার্ড একাউণ্টাণ্ট-শিপও হতে পারে) পড়ছিলেন নলিনী তখন সেখানে কারখানায় চাকরী কর-ছিলেন। ইন্‌টেলিজেন্স রিপোর্টে আছে, নলিনী গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে কিরণবিহারী রায়ের সহপাঠী ছিলেন। এটা একেবারেই সত্য কথা নয়। পুলিসের নিকটে বিবৃতি দিতে গিয়ে নলিনী বলেছেন যে কীর্তিপাশা হাই স্কুলের ফোর্থ ক্লাসে (Class VII) পড়ার সময়ে ১৯১০ সালে আর্থিক দুরবস্থার কারণে তাঁকে পড়া ছেড়ে দিতে হয়। এটাই সত্য খবর। নলিনী আরও একটি খবর আমাদের বলেছিলেন। তিনি বড় বেশী মিথ্যা কথা বলতেন। সে জন্যে আমরা তা বিশ্বাস করিনি। তিনি বলেছিলেন যে বাড়ীতে না বলে তাঁরই উৎসাহে কিরণবিহারী রায় ইংল্যাণ্ডে পড়তে গিয়েছিলেন। নলিনী তখন তাঁর খরচ চালাতেন। কিরণবিহারী রায়ের বাবা শুনতে পেয়ে নিজেই টাকা পাঠাতে আরম্ভ করেন। এই কারণে কিরণবিহারী রায় নাকি নলিনীর নিকটে ঋণী ছিলেন।

(২) নলিনী দ্বিতীয় পত্র দিয়েছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের, অর্থাৎ আমার নামে, আর

(৩) তৃতীয় পত্র দিয়েছিলেন ডাক্তার টি· এন· রায়ের (তেজেন্দ্রনাথ রায়ের) নামে। তিনি মিস্টার জে· এন· রায় ব্যারিস্টারের ছোট ভাই ছিলেন।

চার্লস্ আশ্‌লী বোম্বে পর্যন্ত এসেছিলেন, কলকাতায় আসতে পারেননি। তিনি ত্রিস্তে (Trieste) হতে পিল্‌স্না (Pilsna) জাহাজে বোম্বেতে আসছিলেন। নলিনী গুপ্ত তাঁর জাহাজের নাম জেনে এসেছিলেন কিনা তা জানিনে। আশ্‌লীর সাংবাদিক বন্ধু জর্জ স্লোকম্বে তখন 'ডেইলী হেরাল্ডে' পারিসের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনিই আশ্‌লীর জাহাজে চড়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, আশ্‌লী নিজেও একজন সাংবাদিক ও সুলেখক ছিলেন। তিনি একাধিক ভাষাও জানতেন। রুশ উপন্যাস "সিমেণ্ট"-এর ইংরেজী অনুবাদ তিনিই করেছেন। জাহাজ রওয়ানা হওয়া মাত্রই ব্রিটিশ ফরেন্ ডিপার্টমেণ্ট খবর পেয়ে গেল যে আশ্‌লী ভারতে যাচ্ছেন। তখনই তাঁরা ভারত গবর্নমেণ্টকে টেলিগ্রামে জানিয়ে দিলেন যে 'পিল্‌স্না' জাহাজ বোম্বে পঁহুছা মাত্রই চার্লস্ আশ্‌লীর সাম্রাজ্য ভ্রমণের 'ভিসা' যেন নাকচ করে দেওয়া হয়। 'পিল্‌স্না' বোম্বেতে পোঁছার সঙ্গে সঙ্গেই বোম্বে পুলিস এই অর্ডার তামিল করল। কিন্তু চার্লস্ আশ্‌লী কূলেই নামতে পারতেন না যদি একটা অদ্ভুত যোগাযোগ না ঘটে যেত। 'পিল্‌স্না' ১৮ই সেপ্টেম্বরে (১৯২২) তারিখে বোম্বে পৌঁছেছিল। পৌঁছামাত্রই তাকে ডকে যেতে হয়। আর ২২শে সেপ্টেম্বরের (১৯২২) আগে অন্য কোনো ইউরোপ যাওয়ার জাহাজ ছিল না। কাজেই আশ্‌লীকে কূলে নামতে দিতে এবং এই ক'দিন হোটেলে থাকতে দিতে পুলিস বাধ্য হয়েছিল। আসার সময়ে জাহাজে একজন সহযাত্রী মেজরের সহিত আশ্‌লীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। যতটা অনুমান করা যায় আশ্‌লী তাঁর চিঠিপত্রগুলি ও অতিরিক্ত টাকাকড়ি এই মেজরের নিকটে রেখে দিয়েছিলেন। জাহাজ হতে নেমেই মেজর সোজা ম্যাজেস্টিক হোটেলে চলে যান। মনে হয় সেখানে তাঁর স্থান রক্ষিত ছিল। 'ভিসা' নাকচ ইত্যাদি ব্যাপারে আশ্‌লীর যেতে দেরী হয়। পুলিস রিপোর্টে আছে যে আশ্‌লীকে প্রথমে ম্যাজেস্টিক হোটেলে যেতে দেখা যায়। সেখানে গিয়ে তিনি মেজরের সঙ্গে দেখা করেন। তারপর এসে ঘর নিলেন তাজমহল হোটেলে। সাদা পোশাকওয়ালা পুলিস দূর থেকে হোটেলের মেইন গেটের ওপরে নজর রাখছিল।

চার্লস্ আশ্‌লী হোটেলের ঘরে বসে থাকলেন না। তিনি পেছনের গেট দিয়ে বা'র হয়ে গেলেন এবং ট্যাক্সিতে চেপে প্রথমে গেলেন নলিনী গুপ্তের বন্ধু কিরণবিহারী রায়ের সন্ধানে। তিনি কিন্তু ভয়ে চার্লস্ আশ্‌লীর সঙ্গে দেখাই করলেন না। এখানে বিফল মনোরথ হয়ে তিনি চলে গেলেন ইংরেজি দৈনিক "বোম্বে ক্রনিকলে"র আফিসে। এই কাগজের ইংরেজ সম্পাদক মিস্টার মার্মাডিউক পিক্‌থলের (Marmaduke pickthall) সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। হয়তো আগে হতে পিক্‌থলের সঙ্গে আশ্‌লীর পরিচয় ছিল কিংবা তাঁর নামে আশ্‌লী কোনো পরিচয় পত্র এনে থাকবেন। ডাঙ্গের সঙ্গে তাঁর দেখা করার দরকার ছিল। ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের রিপোর্ট অনুসারে এর অল্প দিন আগে মাত্র এম. এন. রায়ের সঙ্গে এস. এ. ডাঙ্গের সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। যাই হোক, মিস্টার পিক্‌থল সঙ্গে সঙ্গেই লোক পাঠিয়ে ডাঙ্গেকে "বোম্বে ক্রনিকলে"র আফিসে আনিয়ে নিলেন। দেখা হলো চার্লস্ আশ্‌লীর সঙ্গে শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের। এম. এন. রায় যে যে বিষয়ে আশ্‌লীকে ডাঙ্গে ও অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে বলেছিলেন সে সবই তিনি ডাঙ্গের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর তিনি ডাঙ্গের হাতে দিলেন চিঠিপত্রগুলি এবং চতুর্থ কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের রাহাখরচের টাকা। এই টাকার পরিমাণ কত ছিল তা আমি জানিনে। তবে, ব্রিটিশ স্পাই মস্‌উদ আলী শাহের মতে আটশত পাউন্ড। পাউন্ড নোটেই এই অর্থ ডাঙ্গেকে দেওয়া হয়েছিল।

বোম্বে পুলিস ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি যে এস. এ. ডাঙ্গের সঙ্গে চার্লস্ আশ্‌লীর দেখা হয়েছিল। শুধু কি তাই? কলকাতা হতে একজন এসেও আশ্‌লীর সঙ্গে গোপনে দেখা করে গিয়েছিলেন। পরে ডাঙ্গে নিজেই প্রচার করেছিল যে তার সঙ্গে আশ্‌লীর দেখা হয়েছিল। কারণ, সে যে পাউন্ড নোট ভাঙাচ্ছিল সেটা অন্যরা জেনে গিয়েছিলেন। চতুর্থ কংগ্রেসে কোনো প্রতিনিধি সে পাঠাবার চেষ্টাও করেনি। টাকাটা নিজেই সে পরিপাক করেছিল। আমি আগেই লিখেছি আন্তর্জাতিকতায় এস. এ. ডাঙ্গে বিশ্বাস করত না, কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থ ভক্ষণে তার কোনো অরুচি তখনও ছিল না, এখনও নেই। আর, কলকাতা হতে একজন যে আশ্‌লীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এ খবর বোম্বে ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগ মাঝ পথে চিঠি খোলাখুলি হতে পরে জানতে পেরেছিলেন। ভারত গবর্নমেণ্ট অবশ্য আগেই জেনেছিলেন।

চার্লস্ আশ্‌লীর ব্যাপার নিয়ে বোম্বে পুলিস ভারত গবর্নমেণ্টের নিকটে অপদস্থের একশেষ হয়েছিল।

এখন কথা হচ্ছে এই যে কলকাতা হতে কে গিয়ে আশ্‌লীর সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন? আশ্‌লীর জাহাজ কখন এসেছিল, কখন তাঁর সাম্রাজ্য ভ্রমণের 'ভিসা' নাকচ করা হয়েছিল, তার কিছুই আমি জানতেম না। আমার নিকটে রায় লিখে-ছিলেন যে নন্দলাল নামে একজন কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমাকেই স্থির করতে হবে রায়ের পুরানো পার্টির বন্ধুদের মধ্য হতে কার কার সঙ্গে তাঁকে দেখা করিয়ে দিতে হবে। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কানপুর ডিস্‌ট্রিক্ট জেলে ডাঙ্গের মুখেই আমি শুনি যে নন্দলাল আসলে ছিলেন চার্লস্ আশ্‌লী। তাঁর সম্বন্ধে আমি ওপরে যা যা লিখেছি সে সব কথাই সে আমাদের বলে, শুধু টাকা গ্রহণের কথাটি ছাড়া।

কলকাতার লোক যাওয়ার কথাটা অনেক পরে আমি সরকারী রেকর্ড হতে জানতে পেরেছিলেম। একবার আমার মনে এলো জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় কি

গিয়েছিলেন? তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখলাম ১৯২২ সালের ১৮ই হতে ২২শে সেপ্টেম্বরের ভিতরে তিনি বোম্বে গিয়েছিলেন কিনা। তিনি আমায় বলেছেন যে ১৯২২ সালের ভিতরে কখনও তিনি বোম্বে যাননি। অন্য ঘটনার দ্বারা তাঁর কথা সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। ডাঙ্গে যখন গয়া কংগ্রেসে যাচ্ছিল তখন এস. এস. মিরাজকরের নিকট হতে সে জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের নামে একখানি পরিচয় পত্র নিয়ে গিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে যে জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করার জন্যে ডাঙ্গে উদ্‌গ্রীব ছিল। ১৯২০ সালে বাঙলার দুটি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের লোকেরা সকলেই জেল হতে মুক্তি পান। তখন এই দু'দলের লোকেরা বাঙলার নারায়ণগঞ্জে প্রস্তুত ঝিনুকের বোতাম (ওখানে বিস্তৃত কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি) নিয়ে বোম্বেতে ব্যবসা করতে যান। আসলে উদ্দেশ্য ছিল নূতন ছেলে রিক্রুট করা। এ কাজে তাঁরা বিফল মনোরথ হয়েছিলেন। ওই সময়ে 'যুগান্তর' দলের জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের সহিত এস. এস. মিরাজকরের পরিচয় হয়। চার্লস্ আশ্‌লী যে এসে ফিরে চলে গেছেন, একথা ডাঙ্গে নিশ্চয় জীবনলালকে বলে থাকবে। তিনি কিন্তু গয়া হতে কলকাতায় ফিরে এসে আমায় সে কথা জানাননি। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তখন ডেহ্‌রী-অন-শোনে তাঁর যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত বন্ধু চারুচন্দ্র ঘোষকে সেবা করছিলেন। ভূপেন্দ্রকুমারের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে জীবনলাল ডাঙ্গেকে সেখানে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। একথাই জীবনলাল আমায় বলেছিলেন। কিন্তু ১৯৬৪ সালে এক বক্তৃতায় ডাঙ্গে বলেছে যে "মুজফ্‌ফর মনে করেছে আমি ডেহরী-অন-শোনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। না, বেড়াতে যাইনি। আমরা সেখানে মিটিং করেছিলাম।" হাঁ, তাঁরা গোপন মিটিং করেছিলেন। তাই, আমায় কিছু জানাননি।

ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের একটি রিপোর্টে খবরটি পাওয়ার পর আমি কিছুতেই স্থির করে উঠতে পারছিলেম না যে কলকাতা হতে কে গিয়ে আশ্‌লীর সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছিলেন। আমি এই সকল আবল-তাবল লিখছি। সেই জন্যে আমার জানার আগ্রহের কোনো শেষ ছিল না। সম্প্রতি "ন্যাশনাল আরকাইবস্ অফ্ ইণ্ডিয়া" হতে সার সেসিল কে' লিখিত "কমিউনিজম ইন ইণ্ডিয়া"র ফটো কপি আনিয়ে পড়ার পরে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। সার সেসিল তাঁর পুস্তিকার ২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"It may be mentioned here that Muzaffar Ahmad, in Calcutta had been warned by Roy of Ashleigh's impending arrival and had sent Jotin Mitter to Bombay, to escort him to Calcutta. Jotin Mitter saw Ashleigh, who expressing his regret that he could not remain in India, told Jotin Mitter that he would send Nalini Gupta in his place."

মর্মার্থ

"এখানে উল্লেখ করা চলে যে রায় কলকাতার মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে আশ্‌লীর আসার কথা জানিয়েছিলেন। আশ্‌লীকে সঙ্গে ক'রে কলকাতায় আনার জন্যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাই যতীন মিত্রকে বোম্বে পাঠান। সেখানে মিত্র আশ্‌লীর সঙ্গে দেখা করেন। আশ্‌লী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে তিনি ভারতে থাকতে

পাবেন না, তবে তিনি যতীন মিত্রকে এই আশ্বাস দেন যে তিনি নলিনী গুপ্তকে পাঠাবেন।"

যতীন মিত্র সম্বন্ধে আমি আগে অনেক বলেছি। তাঁর সম্বন্ধে এম. এন. রায়ের ধারণাও আমি এই পুস্তকে তুলে দিয়েছি। এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে আশ্‌লীকে সঙ্গে আনার জন্যে আমি যতীন মিত্রকে বোম্বে পাঠাতে পারি? তাঁকে আমি বিশ্বাসই করতাম না। তিনি শিশিরকুমার ঘোষের সঙ্গে মাখামাখি করতেন। তা ছাড়া আমি তো জানতামই না যে কোন্ তারিখে ও কোন জাহাজে আশ্‌লী বোম্বে পোঁছুবেন? যতীন তার জার্মানী যাওয়ার টাকা আসার জন্যে কলকাতায় অপেক্ষা করছিলেন। ৩১ পাউন্ড পাওয়া মাত্রই তিনি কলম্বোর পথে রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ওই পথে খরচ কম ছিল। দুর্ভাগ্যবশত আমি এখন মনে করতে পারছি না কোন্ মাসে তিনি টাকাটা পেয়েছিলেন? তবে এটা ঠিক কথা যে সেপ্টেম্বর মাসের (১৯২২) তৃতীয় সপ্তাহেও তিনি ইউরোপের পথে রওনা হননি। যতীন মিত্র প্রথম জার্মানী পোঁছেছিলেন ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে, কিংবা অক্টোবরের শেষ সপ্তাহেও হতে পারে।

যতীন মিত্রকে কে বোম্বে পাঠিয়েছিলেন এবং কেন পাঠিয়েছিলেন? আমার নাম করে চার্লস্ আশ্‌লীকে কলকাতা নিয়ে এলে কার কি উদ্দেশ্য সাধিত হতো? যতীন মিত্রের বোম্বে যাওয়ার পেছনে নলিনী গুপ্তের প্রেরণার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বার্লিনে আশ্‌লীর নলিনী গুপ্তের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে নলিনী গুপ্তের পক্ষে জাহাজের নাম জেনে নেওয়া মোটেই অসম্ভব ছিল না। আর, জাহাজের নাম জানা থাকলে সে জাহাজ কখন বোম্বে পোঁছুবে তা অতি সহজে জানা যায়। এম. এন. রায়কে ধোঁকা দেওয়াই ছিল নলিনী গুপ্তের একটা বিশেষ কাজ। ভারতে আসার জন্যে তিনি বার্লিন হতে জেনোয়া গেলেন। ক'দিন পরে বার্লিনে ফিরে এসে রায়কে তিনি জানালেন যে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারা গেল না। কিন্তু কেন, একথা রায় আর জানতে চাইলেন না। নলিনীর হাতে বৈধ পাসপোর্ট ছিল। এই পাসপোর্ট ব্যবহার ক'রে তিনি একবার ইউরোপ হতে কলম্বো হয়ে ভারতে এসেছিলেন এবং ভারত হতে কলম্বো হয়ে আবার ইউরোপে ফিরেছিলেন। সেই পাসপোর্ট তাঁর ছিল, পকেটে টাকাও ছিল। জেনোয়াতে টিকেট কেন তিনি কিনতে পারলেন না? এম. এন. রায়কে কেন মস্কো ও ইরানের পথে তাঁর ভারতে আসার ব্যবস্থা করতে হলো? এটা নিশ্চিতরূপে ধরে নেওয়া যায় যে নলিনী গুপ্ত এম. এন. রায়কে বলেছিলেন যে তাঁর কোন পাসপোর্ট নেই। নলিনী পুলিসের নিকটে বিবৃতিতে বলেছে যে ব্রিটিশ কন্সাল তাকে ভিসা দেয়নি। তিনি ভারতে আসছিলেন, আর ইউরোপে ফিরে যেতে পারবেন কিনা কে জানে,—তাই সোবিয়েৎ রাশিয়া ও ইরান ঘুরে যেতে চেয়েছিলেন। এর গূঢ় অর্থ এই ছিল যে প্রয়োজন হলে পুলিসকে কিছু খবর দিতে পারবেন। যতীন মিত্র একান্তভাবে তাঁরই লোক ছিলেন। তাঁকে দিয়ে হয়তো চার্লস্ আশ্‌লীর নিকট হতে রাহাখরচের টাকাটা হাত করতে চেয়েছিলেন। কারণ, নলিনী গুপ্তও ভারতে আসছিলেন। কিন্তু আমার মনে একটি সন্দেহ এই আছে যে নলিনী তার পরিকল্পনার কথা যতীন মিত্রকে কি ভাবে জানালেন? ডাকে জানালে শতকরা নিরানব্বই ভাগ সম্ভাবনা ছিল যে তা পুলিসের হাতে পড়বে। তাছাড়া, নলিনীর এসে পোঁছানো পর্যন্ত যতীন ভারতে থাকতে পারত না।

যতীন মিত্রের বোম্বে যাওয়া সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল শিশিরকুমার ঘোষের ওপরে। আগেই বলেছি শিশিরের সঙ্গে যতীন মিত্রের খুব মাখামাখি

হয়েছিল। যতীনের বোম্বে যাওয়ার পরিকল্পনা শিশিরের পক্ষে করাও সম্ভব। শিশির পুলিসের নিয়োজিত লোক ছিল। চার্লস্ আশ্‌লীর ভারতে আসার খবরটা ইউরোপেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। কোন্ জাহাজে আশ্‌লী আসছিলেন কোন্ তারিখে তিনি বোম্বে পৌঁছুবেন এর সব কিছু পুলিস জানত। পুলিসের নিকট হতে খবর পেয়েই শিশিরকুমার ঘোষ সম্ভবত যতীনকে নিয়ে ফাঁদ পেতে-ছিল। উদ্দেশ্য ছিল রাহাখরচের টাকাটা হাত করা। আশ্‌লী আমাকে চিনতেন না, আমার ফটোও তিনি কোনো দিন দেখেননি, কাজেই তাঁকে যে কোনো লোকের কাছে নিয়ে গিয়েই বলতে পারা যেতো যে "ইনিই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ"। যার সংগেই হোক না কেন, যতীন মিত্রের চক্রান্ত কার্যকরী হয়নি।

১৯৬৪ সালে নিজের সম্বন্ধে ৪ দিনব্যাপী যে বক্তৃতা শ্রীপাদ অমৃত ডাংগে কমিউনিস্ট পার্টির ন্যাশনাল কাউন্সিলের সভায় দিয়েছিল তাতে সে কানপুর জেলে চার্লস্ আশ্‌লীর আগমন সম্বন্ধে আমাদের যা যা বলেছিল সে-সব কথা একেবারেই উল্টে দেয়। ছাপার অক্ষরে এ সব কথা পড়ে আমারও মনে সন্দেহ হতে থাকে যে হয়তো আমি ভুল শুনেছিলেম। 'এখন ডাংগে যা বলছে তাই হয়তো সত্য'। ডাংগে বলল, মার্মাডিউক পিক্‌থল আশ্‌লীর সংগে ডাংগের সাক্ষাৎ করিয়ে দেননি। এই কাজটি করিয়েছিলেন 'বোম্বে ক্রনিকলে'র এসিস্টাণ্ট এডিটর শ্রী আর. কে. প্রভু। শ্রীপ্রভুকে এ কাজ করার জন্যে অনুরোধ করে-ছিলেন সৈয়দ আবদুল্লাহ্ ব্রেলভী। তিনি 'বোম্বে ক্রনিকলে'র জয়েণ্ট এডিটর ছিলেন এবং তাজমহল হোটেলে থাকতেন। অশীতি বর্ষ বয়স্ক শ্রীপ্রভুকে দিয়ে এই বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ানো হয়েছিল।

ডাংগে দ্বিতীয় মিথ্যার অবতারণা এই করেছিল যে আশ্‌লী আমেরিকার নাগরিক ছিলেন। অবাঞ্ছিত বিদেশী নাগরিকরূপে তাঁকে দেশ হতে বহিষ্কার করার জন্য কোর্টের একটা হুকুমের প্রয়োজন ছিল। তারই জন্যে তাঁকে কয়েক দিন তাজমহল হোটেলে থাকতে দিতে হয়েছিল। অথচ অবাঞ্ছিত ব্রিটিশ নাগরিক হওয়ার কারণে চার্লস্ আশ্‌লী ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকা হতে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। তাঁর নিকটে ব্রিটিশ নাগরিকের পাসপোর্ট ছিল। তা থেকে তাঁর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভ্রমণের ভিসা নাকচ করা হয়েছিল। তাঁর জাহাজ হতে নামার মুখে যদি পুলিস তাঁর সাম্রাজ্য ভ্রমণের ভিসা বাতিল না করতে পারতেন তবে পাসপোর্ট ছাড়াও তিনি এদেশে থেকে যেতে পারতেন। কেউ তাঁকে স্পর্শ করতে পারতেন না।

চার্লস্ আশ্‌লী ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৯২২) তারিখে প্রথম বোম্বে পৌঁছে-ছিলেন। তাঁর বোম্বে ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রথম জাহাজ ছিল ২২শে সেপ্টেম্বর (১৯২২) তারিখের "কাইসার-ই-হিন্দ"। এই জাহাজেই তিনি ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ সাংবাদিক জর্জ স্লোকম্বে (George Slocombe) গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন কিনা তা আমি জানিনে। তবে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির খুব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি যে ছিলেন তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। তিনি 'ডেইলি হেরাল্ডে'র প্রতিনিধি ছিলেন। ভারতে আসার সময়ে তিনি আশ্‌লীর জাহাজে চড়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি করেছিলেন। 'কাইসার-ই-হিন্দ' মার্সাইতে পৌঁছার পরেও পারিসে স্লোকম্বের সংগে আশ্‌লীর আবার দেখা হয়। তখন তিনি ভারতবর্ষে কি কি ঘটেছিল তার সব কথাই স্লোকম্বেকে জানান। এই থেকে আমার মনে হয়

যে স্লোকম্বে ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। আশ্লী স্লোকম্বেকে বলেছিলেন, একজন ইংরেজ সম্পাদক তাঁর সঙ্গে এস. এ. ডাঙ্গের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, ডাঙ্গের হাতে তিনি চিঠিপত্র ও রাহাখরচের টাকা ইত্যাদি দিয়ে এসেছেন ইত্যাদি। স্লোকম্বে কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ইম্পিরিয়েল পুলিস ইন্‌টেলিজেন্সের (I.P.I.) নিকটে সব কথা বলে দেন।

Source H. R. His address in Paris is 19 Rue Dantin

15. 11. 22

Indian Communist Party

* * *

2. George Slocombe, the representative of Daily Herald in Paris, whose connection with M. N. Roy and Charles Ashleigh was mentioned on page 4 of last note of this series, has been located in Paris. According to Slocombe, Ashleigh arrived in Paris towards the end of October, and left for Berlin, where he saw Mrs. Evelyn Roy. Slocombe says Ashleigh is at the present moment in Humburg, he is expecting him back shortly in Paris. From Ashleigh Slocombe learnt the following details regarding his activities in Bombay. In Bombay Ashleigh met an Englishmen, the editor of a paper, Slocombe cannot remember the name of this man[১], which Ashleigh gave him, but said it was a long name. Through this Englishman, Ashleigh met a certain Indian[২] with whom the editor was in touch, and handed over to this Indian passage money for delegates, who were invited to join Roy, and the invitation issued by Roy. Slocombe added that the English editor was himself a Communist."

(Home Deptt. Political File No. 956 of 1922. page 11, Extract from IPI Report $\frac{W}{Misc.}$ 422)

সংক্ষিপ্তসার

চার্লস্ আশ্লীর ব্যাপারটি শুরু হতেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। আশ্লীর রওয়ানা হওয়ার খবরটাও হয়তো স্লোকম্বের মারফতেই ইম্পিরিয়েল পুলিস ইন্‌টেলিজেন্স পেয়ে গিয়েছিল এবং তা থেকেই ব্রিটিশ ফরেন্ ডিপার্ট-মেণ্টের নির্দেশে বোম্বে পৌঁছা মাত্রই তাঁর সাম্রাজ্য ভ্রমণের ভিসা বাতিল হয়ে

১ Marmaduke Pickthall

২ S. A. Dange

যায়। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে আশ্‌লী প্যারিসে ফিরে গেলেন। স্লোকম্বেকে তিনি বললেন বোম্বেতে কি কি ঘটেছে। স্লোকম্বে ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগেব লোকদের বললেন যে বোম্বেতে একখানি ইংরেজি দৈনিকের ইংরেজ সম্পাদকের সাহায্যে আশ্‌লীর একজন ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এই ভারতীয়ের সঙ্গে আগে হতে ইংরেজ সম্পাদকের যোগাযোগ ছিল। ইংরেজ সম্পাদকের নামটি বড় লম্বা। এই জন্যে স্লোকম্বে তা মনে রাখতে পারেননি। [এখানে মার্জিনে ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের লোকেরা লিখে রেখেছেন Marmaduke Pickthall.] ভারতীয়টির হাতে আশ্‌লী প্রতিনিধিদের রাহাখরচের টাকা, এম· এন· রায়ের নিমন্ত্রণ পত্র ইত্যাদি দিয়ে এসেছিলেন। [নিমন্ত্রণ পত্রের মানে এই হচ্ছে যে রায় বার্লিনে একটি কন্‌ফারেন্স ডেকেছিলেন] স্লোকম্বে বলেছেন এই ইংরেজ সম্পাদক একজন কমিউনিস্ট।

কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা, ১৯২৪

মোকদ্দমার আগে

শওকত উস্‌মানীকে আলীগড়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। আমার মনে হয় ভালোই করেছিলেম। ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের তখন শেষ। আগেই বলেছি এই সময়ে আমার কোনো থাকার জায়গা ছিল না। তাই আবদুল হালীমকে, তারও কোনো জায়গা ছিল না, সঙ্গে নিয়ে চাঁদনী ইলাকায় তিন নম্বর গুমঘর লেনে আমার ছাত্রদের বাড়ীর বৈঠকখানায় প্রতি রাত্রে ঘুমাই। একদিন ভোর বেলা ঘুম থেকে সবে উঠেছি, দেখলাম কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সব-ইন্‌স্পেক্টর মুহম্মদ ইস্‌মাইল ওই গলি দিয়ে যাচ্ছে। তাঁর পুলিসে ঢোকার আগেও তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল। যদিও আলোয়ান দিয়ে মাথাটা ঢেকে রেখেছিলেন তবুও তাঁর কপাল দেখে তাঁকে চিনলাম। আমি নাম ধরে তাঁকে ডাকলাম এবং বললাম এত ভোরে এদিকে কেন? বললেন, তাঁর একটি চাকরানী পালিয়েছে, শুনেছেন চাঁদনীতে কোনো বাড়ীতে কাজে লেগেছে। আসলে তিনি দেখতে এসেছিলেন কোন্ কোন্ পয়েণ্টে পুলিসের ওয়াচাররা দাঁড়াবে।

একসঙ্গে চারজন, না, ছয়জন ওয়াচারের এক দঙ্গল আজ তা আমার ভালো মনে নেই, আমার পেছনে পেছনে ঘুরতে লাগল। ক'দিন যেতে না যেতে দেখলাম এই ওয়াচারদের সঙ্গে একজন সবইন্‌স্পেক্টরও থাকছেন। একেবারে খোলাখুলি ওয়াচ চলতে লাগল। এই রকমটা অন্য কারুর বেলায় হয়েছে বলে শুনিনি। পরে শুনেছিলেম কলকাতা স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার মিস্টার কীড্ নাকি বলে দিয়েছিলেন যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ওপরে খোলাখুলি ওয়াচ চলুক। এই এক দঙ্গল লোক নিয়ে কোথাও আমার যাওয়ার উপায় থাকল না। ভাবলাম ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে দেখি। তাঁর নিকটে একজন লোক পাঠালাম। তিনি ব'লে পাঠালেন অনেক আগে হতে গিয়ে "সারভ্যাণ্ট" (ইংরেজী দৈনিক) আফিসের দোতলায় থাকবেন। আমি যেন ওয়াচারদের সঙ্গে নিয়েই যাই এবং সোজা দোতলায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। ওয়াচাররা রাস্তাতেই থেকে যাবে। সেই ভাবেই ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে দেখা করেছিলেম। তিনি কিছু কাল গ্রামে বাস ক'রে আসতে বললেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে আমার গ্রামে যাওয়ার উপায় ছিল না। তার ওপরে আমি ছিলাম একেবারেই নিঃসম্বল। ভূপতি মজুমদারের মারফতে পঞ্চাশ পাউণ্ডের ড্রাফ্‌টখানি পেলেও সেটা তখনও ক্যাশ করানো হয়নি। এই সময়ে জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ও ব'লে পাঠিয়েছিলেন যে তিনি মুন্সীগঞ্জের (ঢাকা) ওদিকে গ্রামে থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

এদিকে আর একটা কাণ্ড ঘটে গেল। এই ওয়াচারদের দল নিয়েই আমার দিন কাটছিল। একদিন বিকাল বেলা বেড়াতে বা'র হয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ঘাসের ওপরে কিছুক্ষণ বসেছিলেম। ওয়াচাররাও কিছু দূরত্ব বজায় রেখে ঘাসের ওপরে বসে পড়েছিল। হঠাৎ আমার মাথায় একটা খেয়াল চাপল। সেন্ট্রাল

কলকাতা গলিঘুঁজিতে ভরা। ভাবলাম একবার চেষ্টা করে দেখা যাক ওয়াচারদের এড়িয়ে বা'র হয়ে যাওয়া যায় কিনা। অনেক আগে আমি সে সব চিনে রেখেছিলেম। আমি উঠেই হাঁটতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে হাঁটার গতি যথাসাধ্য বাড়িয়ে দিলাম। এখানকার গলিঘুঁজি ওয়াচারদের চেনা ছিল না। তারা প্রায় সবাই পেছনে পড়ে গেল। মির্জাপুর (এখনকার সূর্য সেন) স্ট্রীট যখন পার হচ্ছিলাম তখন পেছনে ফিরে দেখলাম ফরিদপুর জিলার সেই টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণটি আমার পেছু ছাড়েনি। আমাদের বাঙলা দেশে কেউ মাথায় টিকি রাখেন না, কিন্তু এই ব্রাহ্মণটির মাথায় মোটা টিকি ছিল। আমার খুব রাগ হলো লোকটির ওপর,—ভাবলাম ওকে আজ রাত্রে স্নান করিয়ে ছেড়ে দেব। বৈঠকখানার মুসলিম ইলাকার সরু সরু পথগুলি (রাস্তা নয়) ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলাম। সেই সব পথে লোকে বাসন ধোয়া জলও ফেলে। তখনও বাঙলা দেশে চপ্পল পরার রেওয়াজ হয়নি, লোকেরা শু পরতেন। তা না হলে এই লোকটির পা বাসন ধোওয়া জলে ভিজে যেতো। আমি নিজে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেম। কলেজ স্কোয়ারে এসে অনেকক্ষণ বসে থাকলেম। তার পরে খুব ধীরে ধীরে স্কোয়ারের ভিতরে বেড়াচ্ছিলেম। গেট বন্ধ হওয়ার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। হঠাৎ কোথা থেকে একটি খেপা কুকুর এলো। গায়ে লম্বা লম্বা লোমওয়ালা যে ছোট্ট কুকুরগুলি হয় তার একটি। প্রথমে কুকুরটি পুলিসের লোকটিকে কামড়াতে গিয়েছিল। সে এমন জোরের সঙ্গে হইচই করতে লাগল যে কুকুরটি লাফিয়ে উঠে আমার হাঁটুর নীচে কামড়ে দিল এবং আমার পরনের কাপড়ে তার দাঁত আটকে গিয়ে সে ঝুলতে লাগল। আমি জোরে ঝেড়ে ফেলে দিলাম কুকুরটিকে। তার পরে সে আরও কয়েকজনকে কামড়ে দিল। এই সব কিছু এক মিনিটের কম সময়ের ভিতরে ঘটে গিয়েছিল। মির্জাপুর স্ট্রীটের একটি দোকানে গিয়ে আলোতে ঘা'টা দেখছিলাম, একজন ভদ্রলোক বললেন এখনই মেডিক্যাল কলেজের এমারজেন্সীতে চলে যান। সেখানে গিয়ে দেখলাম আমার পরিচিত একজন সিনিয়র ছাত্র ডিউটি দিচ্ছেন। তিনি ক্ষতস্থানটা পরিষ্কার করে নাইট্রিক এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন। আমার ঠিকানা ইত্যাদিও লিখে নিলেন। সে যুগে পাস্তুর ইনস্টিটিউট ছিল শিলঙ পাহাড়ে। কলকাতায় না ছিল কোনো হিমঘর, না ছিল কোনো রেফ্রিজারেটর। শিলঙে আমায় যেতেই হবে। তবুও আমি ডাক্তার তেজেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে বললাম আপনি এখানেই একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। আমার শিলঙে যাওয়া বন্ধ করুন। তিনি আমায় বোঝালেন যে এখানে চিকিৎসা করার মাল-মসলা নেই। একটি পুস্তক আমায় পড়ে শোনালেন যে কুকুরে কামড়াবার আঠারো বছর পরেও জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে। বাধ্য হয়ে আমায় শিলঙ যেতে হলো।

কেন শিলঙে যেতে চাইনি?

এণ্টির‍্যাবিক চিকিৎসার জন্যে কেন আমি শিলঙে যেতে চাইনি তার একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। ১৯২২ সালের মে মাস হতে এম. এন. রায়ের সঙ্গে আমার পত্র লেখালেখি আরম্ভ হয়েছিল। প্রায় তখন থেকেই তিনি আমায় ইউরোপে ডাকছিলেন। বলছিলেন অনেক কিছু আলোচনার আছে। আমার ধারণা হয়েছিল আমার সঙ্গে আলোচনা করে তিনি অনেক কিছু আমায় বোঝাতে চান এবং আমার নিকট হতেও দেশের অনেক অবস্থা বুঝতে চান। আমারও বিদেশ

যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। ডাঙ্গের মতো কমিউনিজ্‌মের সন্ধানে ইউরোপ যেতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু রায় আমায় ইউরোপে ডাকেন বটে, রাহাখরচের টাকা পাঠান না। পুলিসের নজরে যখন পড়ে গেছি তখন পাসপোর্ট পাওয়ার কোনো আশা ছিল না। গেলে জাহাজে চাকরী করে যেতে হবে। এম. এন. রায়ের আমাকে লেখা বেশীর ভাগ পত্রই পুলিস পড়ছিল। কাজেই তাদের নজর এদিকেও থাকবে। আমাদের মতো লোকের স্যালুন বিভাগে কাজ নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকায় এই বিভাগের ওপরে পুলিসের নজর থাকবে সবচেয়ে বেশী। তার পরে থাকবে ডেকের ওপরে। কিন্তু আমার মতো একজন দুর্বল লোক কয়লাওয়ালা যে হতে পারে, মনে হয়েছিল এটা পুলিস বিশ্বাস করতে পারবে না। তাই আমি এদিকেই চেষ্টা করলাম। জাফর আলী সাহেব নাবিক নেতা আফতাব আলীর বড় ভাই। তাঁর নিকটে গিয়ে আমি সব কথা বললাম। আফতাব তখন আমেরিকায় ছিলেন। জাফর আলী সাহেব কথা দিলেন যে তিনি সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন। খিদিরপুরে কালীবাবুর বাজারে তাঁর জাহাজীদের ইউনিফর্মের দোকান ছিল। তাঁর কারবার ইঞ্জিন ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে। তিনি বললেন এমন সেরাঙের সঙ্গে তিনি ব্যবস্থা করে দিবেন যিনি আমাকে দিয়ে কোনো কাজই করাবেন না। মুশকিল হয়েছিল এই যে অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকার জন্যে আমার গায়ের কোনো কোনো জায়গায় তখন খোস হয়েছিল। খোসওয়ালা লোকের জাহাজে চড়া বারণ। তাই এই খোস ভালো করতে বহুদিন লেগে গেল। তার পরে জাফর আলী সাহেবের সঙ্গে ইউরোপে যাওয়া সম্বন্ধে আবার কথা বলছি, এমন সময়ে আমায় কামড়াল খেপা কুকুরে। শিলঙ গিয়ে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল। সেখানে থেকে ফিরে এসে এক ভোরের খবরের কাগজে পড়লাম কানপুরে একজন 'বলশেভিক চর' গিরেফ্‌তার হয়েছেন। এই 'বলশেভিক চর'টি ছিল শওকত উস্‌মানী। সেদিন ১০ই মে (১৯২৩)। তার মানে শওকত উস্‌মানী গিরেফ্‌তার হয়েছিল ৯ই মে (১৯২৩) তারিখে। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছিলেম যে এবারে আমার পালা। কোথাও সরে থেকে যে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করব তার উপায় ছিল না। কুতুবুদ্দীন সাহেব কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী সাঁওতা নামক একটি গ্রামে সপরিবারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই ড্রাফট্‌খানা তখনও ভাঙানো হয়নি। কুতুবুদ্দীন সাহেবকে তা রাখতে দিয়েছিলেম। তিনি এমন এক জায়গায় ড্রাফট্‌খানা রেখে গেছেন যে সেখান থেকে তা নিয়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার মানে যাঁর নিকটে রাখা আছে তিনি তা আমায় দেবেন না। সৌভাগ্য যে হঠাৎ লোক পেয়ে কুতুবুদ্দীনকে খবর পাঠালাম। লিখে দিলাম যে "আপনার বাড়ী যে কোনো দিন পুলিস তালাশি করবে। পত্র পাওয়া মাত্রই চলে আসুন।" তিনি এলেন ১৬ই মে (১৯২৩) রাত্রে। আমি তখন কুতুবুদ্দীন সাহেবের বাড়ীগুলির মধ্যে ৫, মৌলবী লেনে থাকি। সব শুনে তিনি বললেন "ড্রাফ্‌ট ভাঙানোর জন্যে অপেক্ষা করে কাজ নেই, কাল আমি আপনাকে কিছু টাকা দেব। আপনি আপাতত কোথাও সরে পড়ুন"। খুব ভোরে আমরা তখনও ঘুমিয়ে আছি। জুতোর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম মিস্টার কীড্‌ মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। সব-ইন্‌স্পেক্টর বজলে মুর্‌শেদী বলছেন, "Sir, he is Muzaffar Ahmad" ("সার, ইনিই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ")।

দু'টি পাশাপাশি বাড়ী। ১৩ নম্বর ইলিশিয়াম রো ও ১৪ নম্বর ইলিশিয়াম রো, এখন নাম লর্ড সিংহ রোড। তের নম্বরের বাড়ীটি বেঙ্গল পুলিসের ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের, আর চৌদ্দ নম্বরেরটি হলো কলকাতা পুলিসের স্পেশ্যাল

ব্রাঞ্চের। মধ্যখানে প্রাচীর আছে, আবার এ-বাড়ী হ'তে ও-বাড়ীতে যাতায়াতের দরওয়াজাও আছে।

আমাকে নিয়ে গিয়ে স্পেশাল ব্রাঞ্চের বাড়ীর আউট হাউসে প্রথমে বসানো হলো। এই দুই বাড়ীর লোকদের মধ্যে নিয়ম আছে যে কোনো নূতন লোক ধরা পড়ে এলে দু'বাড়ীর ছোট-বড় অফিসাররা ও ওয়াচাররা একবার করে তাঁকে দেখে যান। আমাকেও সকলে একবার দেখে গেলেন। অর্থাৎ, যাঁরা আগে আমায় কখনও দেখেননি, তাঁরা চিনে নিলেন আমাকে। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইন্‌স্পেক্টর নলিনী মজুমদার (তখন তিনি তাই ছিলেন) যাওয়ার সময় বলে গেলেন, "আচ্ছা, পেশোয়ারে দেখা হবে"। অন্য অফিসাররাও তাই বললেন। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের এসিস্টাণ্ট সব-ইন্‌স্পেক্টর ও ওয়াচাররা জোরে জোরে প্রতিবাদ করতে লাগল যে "রোদে দাঁড়িয়ে ওয়াচ করলাম আমরা, আর এখন ট্রাভেলিং এলাউন্স ও ভাতা মারবে আই. বি.'র লোকেরা"। এটা ছিল এস. বি. আর আই. বি.'র পুরানো ঝগড়া। কলকাতার বাইরে কোথাও যেতে হলে আই. বি.'র লোকেরাই যেতো। আমি মনে মনে নিশ্চিত হলাম যে যে-জন্যেই হোক পেশোয়ারে যাচ্ছি। অফিসাররা খুব খুশী যে তাঁরা মোটা এলাউন্স মারবেন।

সন্ধ্যার সময় মিস্টার কীড্ আমায় বললেন "তোমায় ক্রিমিন্যাল প্রসেডিওর কোডের চুয়ান্ন ধারা অনুসারে গিরেফ্তার করা হলো"। তখনকার দিনে কলকাতা পুলিসের কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ছিল। তাঁরা যে কোন লোককে গিরেফ্তার করে ১৫ দিন পুলিস হাজতে রেখে দিতে পারতেন। আমাকে লালবাজার পুলিস লক্-আপে পাঠানো হলো। আমি নিজে জানতাম না চুয়ান্ন ধারা কি? আমার তখনকার বন্ধুরাও জানতেন না। আমার গিরেফ্তার হওয়ার নবম দিবসে বন্ধুরা মিস্টার এ. কে. ফজলুল হককে খবর দিলেন। তখনই তিনি ইলিশিয়াম রো'তে গিয়ে আমার জামিন চাইলেন এবং বললেন, সংগে সংগে জামিন মঞ্জুর না করলে পরের দিন তিনি হাইকোর্টে দরখাস্ত করবেন।

ফজলুল হক সাহেব স্পেশাল ব্রাঞ্চের আফিস হতে বা'র হয়ে যাওয়া মাত্রই কীড্ সাহেব আমায় ৫০০ টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়ার অর্ডার দিলেন। ক্রিমিনাল প্রসেডিওর কোডের ৫৪ ধারা অনুসারে গিরেফ্তার হওয়া আসামীর জামিন চাওয়া মাত্রই মঞ্জুর করতে হয়। বাইরে আসার পরে সর্বস্তরের লোকেরা বলতে লাগলেন যে কোনো মোকদ্দমা নেই। সত্যিকার মোকদ্দমা থাকলে কি পুলিস কখনও ৫০০ টাকার জামিনে ছেড়ে দেয়? সকলের কথায় আমি বোকা বনে গেলাম! পুরো ব্যাপারটাই ভুল বুঝলাম। ইচ্ছা করলেই আমি সেই সময়ে সরে যেতে পারতাম। চাই কি ইউরোপ যাওয়ার চেষ্টাও করতে পারতাম। ড্রাফট ভাঙিয়ে ৭৫০ টাকা হাতে এসেছিল। আমি শুধু মোকদ্দমার কথাই ভেবেছিলাম। ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বিনা বিচারে বন্দী হওয়ার কথা আমার মনেই আসেনি। কোনো বন্ধুও আমার এই সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দেননি। উচ্চ পর্যায়ে সরকারী মহলে কি হতে যাচ্ছে তা আমি কি করে জানব?

গিরেফ্তার হয়ে হাজতে থাকার সময়ে আমায় প্রায় প্রতিদিনই লালবাজার হতে ইলিশিয়াম রো'তে নিয়ে গিয়ে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছিল। পুলিস কতটা কি জানে তা বুঝবার জন্যে আমি ক'দিন কিছুই বললাম না। তার পরে একদিন চিঠি পত্রের বাণ্ডিল খুলে আমায় দেখানো হলো। তাতে দেখলাম আমাদের দু'পক্ষের পত্রের অনেক ফটো কপি। তখন ভাবলাম আমাকে কৌশল বদলাতে হবে। বললাম এম. এন. রায়কে আমি চিঠি পত্র লিখি, কমিউনিস্ট ইন্টার-

ন্যাশনালকেও মানি। নলিনী গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথাও বললাম। এও বললাম যে নলিনী গুপ্ত কমিউনিস্ট নন। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দিকে তাঁর মনের টান আছে। [অনেক পরে খুব ভালো ক'রে অনুসন্ধানের পরে জেনেছি যে নলিনী যুগান্তর বা অনুশীলন এই দু'পার্টির কোন পার্টিরই সভ্য ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন দুঃসাহসিক ভবঘুরে]। আমি যে বিবৃতি দিয়েছিলেম তার কপি এখন ভারতের জাতীয় মহাফিজখানা হ'তে পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হ'তে আরম্ভ ক'রে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সকল কমিউনিস্ট ছিলেন (মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আসামীদের যোগ করে বলছি) আমি তাঁদের চিনতাম না, তাঁদের অতীত সম্বন্ধেও আমার কিছু জানা ছিল না। একমাত্র শওকত উস্মানীকে চিনতাম। সে আমার আগে ধরা পড়েছিল। সেও বিবৃতি দিয়েছিল। অবশ্য তার বিবৃতি আমি পড়িনি, তার কপিও নিইনি। প্রথম তিনজন স্টেট প্রিজনারের মধ্যে আমি গিরেফ্তার হয়েছিলেম সকলের পরে।

বাঙলা দেশে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সংযোগ ছিল। তাঁদের বিষয়ে আমি কোন বিবৃতি দিইনি, একটি কথাও বলিনি পুলিসকে।

পুলিস আবদুল হাফিজের বিবৃতির সঙ্গে আমার বিবৃতি কিঞ্চিত ঘুরিয়ে দিয়েছে। নলিনীর সঙ্গে আবদুল হাফিজের সাক্ষাৎ হয়েছিল আমহার্স্ট স্ট্রীটে, আমার সঙ্গে নয়।

* * *

ব্রিটেনের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের চোখে আমরা ছিলাম 'বলশেভিক'। সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার মতে আমরা কেউ জেলের বাইরে থাকার উপযুক্ত লোক নয়। তাই তিনি চাইতেন, হয় আমাদের দণ্ডিত কয়েদীরূপে কারাগারে নিক্ষেপ করা হোক, নতুবা আমাদের করা হোক ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনের বন্দী। সেই সময়ে এই সব কথা ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারিনি। এখন পুরানো সরকারী রেকর্ড হাতে এসেছে ব'লে সব কথা অনর্গল বলে যাচ্ছি। 'বলশেভিকবাদ' ভারতবর্ষে ঢুকে পড়লে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বনাশ হবে. এই মনোভাব হতে স্টেট সেক্রেটারি খানিকটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ভারত গবর্নমেণ্টের ভিতরে একটা ইতস্ততঃ ভাব ছিল। কারণ, অবস্থাটা ঠিক 'ধর' আর 'মার'র মতো ছিল না।

মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা পেশোয়ারে আরম্ভ হওয়ার আগেও অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল। কেউ কেউ বললেন আসামীরা সবে বিদেশ হতে এসে দেশে ঢুকেছেন। তাতে মোকদ্দমা কি ক'রে চলতে পারে? গবর্নর জেনেরেলের একজে-কিউটিব কাউন্সিলের হোম মেম্বর (মালকম হেইলি) বললেন মস্কোতে কেউ ইউনিভার্সিটিতে পড়লে সেটা কি ক'রে অপরাধ হতে পারে? আসামীদের ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বন্দী করে রাখা হোক! কেউ কেউ বললেন শওকত উস্মানী মস্কো হতে ফিরে এসে ভারতময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে ধ'রে মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় জুড়ে দিলে মোকদ্দমাটির জোর হয়। উৎসাহের বশে সীমান্ত প্রদেশের সরকার পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা করার উদ্দেশ্যে শওকত উস্মানীর বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্টও ইস্যু করে দিয়েছিল। এই ওয়ারেণ্ট ছিল বলেই কানপুরে ধরা পড়ার পরে উস্মানীকে পেশোয়ারে পাঠানো হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চীফ কমিশনার সার জন মাফে বললেন তাঁর ইচ্ছা আসামীদের ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বন্দী করে রাখা।

তবে, তাঁদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমাও চলতে পারে। কর্নেল কে' বললেন মোকদ্দমা চলতে পারে তো মোকদ্দমাই চলুক। মোকদ্দমা কিন্তু পেশোয়ারেই চালাতে হবে। তখনই তাঁর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল যে পেশোয়ারের জুডিশিয়েল কমিশনার মুহম্মদ আকবর খানের মোকদ্দমায় যে রায় দিয়েছেন সেই রায় ওলটাতে পারবেন না। একই জুডিশিয়েল কমিশনার তখনও ছিলেন।

কিন্তু শওকত উস্‌মানীকে গিরেফ্‌তার করে যখন পেশোয়ারে পাঠানো হলো তখন মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা দায়রা আদালতে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মাঝ পথে কোনো আসামীকে যোগ করলে মোকদ্দমা আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। তা ছাড়া, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চীফ কমিশনার সার জন মাফে (Sir John Maffey) ভারত গবর্নমেণ্টকে লিখলেন ঃ

"3. There is now no conspiracy case pending in this province, though, owing to an inaccurate message issued to the Press from Cawnpore, the Criminal Investigation Department of the United Provinces and Bengal appear to have acted on the assumption that there is. The United Provinces' Crimina. Investigation Department have informed the Intelligence Branch, Peshwar, that the Government of the United Provinces are not prepared to institute a case against Usmani in those provinces, while the Bengal Criminal Investigation Department have arrested associate of Usmani named Muzaffar Ahmad, and have suggested that he should be included in the case with the former in Peshwarl

"4. While the trial of Usmani in Peshawar might possibly be argued to be legal, if evidence of his activities outside India were strong (which it is not), neither he nor Muzaffar Ahmad, who has never apparently left India, can be tried in Peshawar for their actions in furtherence of the revolutionary conspiracy committed in India ; for these actions, though they are connected with individuals and movements in the Punjab, United Provinces, Bengal, Bombay and possibly, other provinces, do not, so far as the available evidence shows, definitely link up with a single individual or act in the North West Frontier Province."

(No. 487. P. C. N, dated the 29th May. 1923)

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

"(৩) কোনো অনিষ্পন্ন ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা এখন পেশোয়ারে নেই। কানপুর হতে সংবাদ সরবরাহকারীদের যে ভুল খবর দেওয়া হয়েছে তাতে সংযুক্ত প্রদেশ ও বাংলার সি. আই. ডি. ধরে বসে আছে যে এই রকম মোকদ্দমা পেশোয়ারে রয়েছে। সংযুক্ত প্রদেশের সি. আই. ডি. তাই পেশোয়ারের ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে লিখল যে তাদের প্রদেশের গবর্নমেণ্ট শওকত উস্‌মানীর বিরুদ্ধে মামলা

রুজু করতে রাজী নয়। বাঙলার সি· আই· ডি· পেশোয়ার ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে লিখল যে তারা শওকত উস্‌মানীর সাথী মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে গিরেফ্‌তার করেছে। তাদের প্রস্তাব এই যে পেশোয়ারে শওকত উস্‌মানীর মোকদ্দমায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকেও জুড়ে দেওয়া হোক।

"(৪) যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভারতের বাইরে উস্‌মানী খুব জোরদার কাজ করেছে, তবে পেশোয়ারে উস্‌মানীর বিচার আইনসঙ্গত একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু ভারতের বাইরে উস্‌মানী জোরদার কাজ করেনি। এটা পরিষ্কার ব্যাপার যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কখনও ভারতের বাইরে যায়নি। অতএব ভারতের ভিতরে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে শওকত উস্‌মানী বা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বিরুদ্ধে পেশোয়ারে মোকদ্দমা চলতে পারে না; কেননা, যদিও এই সকল কাজকর্মের যোগ পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বাংলা দেশ, বোম্বে ও সম্ভবত অন্যান্য প্রদেশের ব্যক্তি ও আন্দোলনের সঙ্গে থাকলেও যতটা প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোনো ব্যক্তি বা কাজের সঙ্গে তার যোগ নেই।" (নম্বর ৪৮৭-পি· সি· এন· ২৯শে মে, ১৯২৩)।

বাঙলার সি· আই· ডি· (ক্রিমিন্যাল ইনভেসটিগেশন ডিপার্টমেণ্ট) যদিও পেশোয়ারে শওকত উস্‌মানীর মোকদ্দমার সঙ্গে আমার মোকদ্দমা জড়িয়ে দিয়ে 'যা শত্রু পরে পরে' করতে চেয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মোটা ভাতা মারার চক্রান্ত করেছিল সার জন মাফের পত্রের পরে তাদের আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। পেশোয়ারে উস্‌মানীর মোকদ্দমা আর হলো না, কাজে কাজেই আমারও নয়। কিন্তু কম্বলি কি ছাড়তে চায়? ভারত সরকার ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনের আশ্রয় নিলেন।

Order in Council

Action to be taken against

1. Shaukat Usmani. 2. Ghulam Hussain. 3. Muzaffar Ahmad, under Regulation III and their cases then to be more fully examined with a view to prosecution under the ordinary law.

The cases against (4) Dange and (5) Singaravelu should be similarly examined with a view to prosecution.

Reading 8.6.23

বঙ্গানুবাদ
গবর্নর জেনেরেল ইন কাউন্সিলের হুকুমনামা

১। শওকত উস্‌মানী ২। গুলাম হুসয়ন ও ৩। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ওপর তিন নম্বর রেগুলেশন প্রয়োগ করা হোক এবং তার পরে সাধারণ আইন অনুসারে তাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা যায় কিনা সেই বিষয়টি পরিপূর্ণরূপে পরীক্ষা করা হোক।

এইভাবে (৪) ডাঙ্গে ও (৫) সিঙ্গারাভেলুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করার ব্যাপারগুলিও পরিপূর্ণরূপে পরীক্ষা করা হোক।

রেডিং ৮·৬·২৩

১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনের আসল নাম ছিল "দি বেঙ্গল স্টেট প্রিজনার্স এক্ট ১৮১৮" (The Bengal State Prisoners Act of 1818)। এই কারণে এই আইনের বন্দীদের স্টেট্ প্রিজনার্সও বলা হতো।

ভারত গবর্নমেণ্টের হোম সেক্রেটারীর স্বাক্ষরে স্টেট প্রিজনারদের নামে যে ওয়ারেণ্ট ইস্যু হতো তাতে বন্দী হয়ে থাকার স্থানের নাম দেওয়া অপরিহার্য ছিল।

ভারত গবর্নমেণ্ট তাঁদের ৯ই জুন (১৯২৩) তারিখের পথ পরিষ্কারক টেলিগ্রামের পর ১২ই জুন (১৯২৩) তারিখে বার্মা গবর্নমেণ্টকে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাঠালেন ঃ

Telegram P., No. 1309 dated Simla, the 12th June, 1923.

From the Secretary to the Government of India, Home Department.

To The Chief Secretary to the Government of Burma, Mymyo.

Please refer to my clear the line telegram No. 1309-D, dated 9th instant. There are obvious reasons including the conditions of incarceration prescribed by the regulation, that place of confinement of these men should be as far as possible removed from the scene of their recent activities and connections. If so, arrangements for their transfer will be made in due course.

মর্মানুবাদ

টেলিগ্রাম পি., নম্বর ১৩০৯
সিমলা, ১২ই জুন, ১৯২৩
প্রেরক—ভারত গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারি,
হোম ডিপার্টমেণ্ট
বরাবরে বার্মা গবর্নমেণ্টের চীফ সেক্রেটারি, মাইমিও

অনুগ্রহ ক'রে আমার এ মাসের ৯ই তারিখে পাঠানো ১৩০৯-ডি নম্বর পথ পরিষ্কারক টেলিগ্রাম পড়ে দেখুন। রেগুলেশনের নির্দিষ্ট বন্দী জীবনের ব্যবস্থা সহ আরও কতকগুলি স্পষ্ট কারণ আছে যে এ সকল ব্যক্তির আটক থাকার জায়গা তাদের সাম্প্রতিক কাজ-কর্মের ও সংযোগের জায়গা হতে যথাসম্ভব দূরে হওয়া আবশ্যক। এ রকম ব্যবস্থা হলে যথাসময়ে তাদের বদলীর ব্যবস্থা করা হবে।

আমাদের নিয়ে কি করা হবে সেই বিষয়ে ভারত গবর্নমেণ্ট মাথা স্থির করতে পারছিলেন না। একবার শওকত উস্মানী আর আমাকে মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় জুড়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু সীমান্ত প্রদেশের চীফ কমিশনারের আপত্তিতে তা হ'তে পারল না। তার পরে মুজফ্ফর আহ্মদ, শওকত উস্মানী ও গুলাম হুসয়নকে ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বিনা বিচারে বন্দী ক'রে রাখার হুকুম হলো। আমাদের নির্বাসনের স্থান নির্দিষ্ট হলো বার্মায়। যদিও বার্মা সেই সময়ে ভারতের একটি প্রদেশ ছিল তবুও প্রকৃতপক্ষে বার্মা ছিল আমাদের নিকটে সাগর পারের একটি বিদেশ। বার্মা গবর্নমেণ্টকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে আমরা যেন আমাদের কর্মস্থান ও সংযোগস্থান হতে যথাসম্ভব দূরে

নির্বাসিত হই। বার্মার ভিতরে আমাদের না ছিল কোনো কর্মস্থল, আর না ছিল কোনো যোগাযোগের জায়গা। টেলিগ্রামের ভাষা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের পৃথক পৃথক রাখতে বলা হয়নি। স্থান (place) কথা আছে, স্থানগুলি (places) কথা নেই।

২০শে জুন (১৯২৩) তারিখে বার্মা গবর্নমেণ্ট ভারত গবর্নমেণ্টকে জানালেন যে (Telegram P., No. 529-C, dated the 20th June, 1923) গুলাম হুসয়নকে থায়েটমিও (**Thayetmyo**) জেলে, শওকত উস্‌মানীকে মিংগিয়ান (**Myingyan**) জেলে এবং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে মান্দালয় (**Mandalay**) জেলে বন্দী করে রাখা স্থির হয়েছে। তাঁদের রেঙ্গুন পৌঁছাবার সম্ভাব্য তারিখ জানান।

তলে তলে এত কিছু যে হয়েছে তার কিছুই আমরা জানতাম না। পুরানো কাগজপত্রে এ সব পড়ে এই আশি বছর বয়স চলাকালেও মনে মনে কিঞ্চিৎ উত্তেজনা বোধ করছি। আর, বেশ ভালো লাগছে এই ভেবে যে আমার আবাসের জন্যে মান্দালয় জেল স্থির হয়েছিল। জীবনে কোনোদিন বার্মায় যাইনি। তবুও নামের উচ্চারণ হতে কেন যেন মনে হচ্ছে যে থায়েটমিও ও মিংগিয়ান জায়গা ভালো নয়।

একটি কথা বড় আশ্চর্য মনে হচ্ছে। স-কাউন্সিল গবর্নর-জেনেরেলেব অর্ডারে ছিল যে মোকদ্দমা করার উদ্দেশ্যে আমাদের কাগজপত্র সবিশেষ পরীক্ষা করার জন্যই আমাদের তিন জনকে সাময়িকভাবে স্টেট প্রিজনার ক'রে রাখা হলো। এই-ই যখন ব্যাপার ছিল তখন আমাদের বার্মায় পাঠানোর চেষ্টা কেন হলো? অবশ্য, শেষ পর্যন্ত আমাদের বার্মায় পাঠানো হয়নি।

আমরা তিনজন মাত্র স্টেট প্রিজনার হলাম, কিন্তু মায়লাপুরম্ সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার ও শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে প্রভৃতি কেউ তা হলেন না। আমাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করার কথা সরকার গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন।

সেক্রেটারি অফ্ স্টেট ফর্ ইণ্ডিয়া ও ভারত গবর্নমেণ্টের মধ্যে বলশেভিকদের, অর্থাৎ আমাদের বিষয়ে যে সকল টেলিগ্রাম বিনিময় হয়েছিল সেগুলিকে একত্রে ছাপালে একখানি বড় গ্রন্থ হয়ে যাবে।

ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার উদ্যোগ আয়োজন

ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের অন্তর্গত ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরো মোকদ্দমার উদ্যোগ-আয়োজনে লেগে গিয়েছিলেন। তাঁদের সেণ্ট্রাল ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরো নামটি পরিবর্তিত হয়ে তখন এই নামটি হয়েছে। ডিরেক্টর ছিলেন লেফ্‌টেন্যাণ্ট-কর্নেল সেসিল কে'। এই ভদ্রলোক ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্বিস কিংবা ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্বিসের অফিসার ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ইণ্ডিয়ান আর্মি অফিসার। তাঁর তত্ত্বাবধানে যেমন দলীল পত্র সংগৃহীত হচ্ছিল, তেমনই সেই সকল লোকের নামও স্থির করা হচ্ছিল যাঁদের এই মোকদ্দমার আসামী করা হবে।

প্রথমে ১৫৫ জনের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই তালিকায় সেই সব লোকের নামও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাঁদের ঠিকানায় আমাদের সাহিত্য ও চিঠি-পত্র ইত্যাদি আসত। পুরানো কাগজপত্র ঘাটাঘাঁটি করার সময়ে আমি এত

গভীরে প্রবেশ করিনি যাতে এই ১৫৫ জনের তালিকাটি পাওয়া যায়। আমি এটাকে হাস্যকর তালিকা মনে করি। শেষ পর্যন্ত ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরো তেরো জনের একটি তালিকা তৈয়ার ক'রে তাঁদের পূর্ণ বিবরণ সহ কৌসুলীর নিকটে বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই তেরো জন হচ্ছেন ঃ

(১) মানবেন্দ্রনাথ রায়
(২) মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
(৩) শওকত উস্‌মানী
(৪) গুলাম হুসয়ন
(৫) শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গে
(৬) মায়লাপুরম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার
(৭) রামচরণলাল শর্মা
(৮) নলিনী গুপ্ত (নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত)
(৯) শামসুদ্দীন হাস্‌সান
(১০) এম· পি· টি· বেলায়ুধন
(১১) মণিলাল ডক্টর (শাহ্‌)
(১২) সম্পূর্ণানন্দ
(১৩) সত্যভক্ত

কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার রেকর্ডে সর্বত্র শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গে লেখা হয়েছে, কোথাও শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে লেখা হয়নি।

এম· পি· টি· বেলায়ুধন (Velayudhan) সিঙ্গারাভেলু (Singaravelu) চেট্টিয়ারের সহকর্মী ছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট ইণ্টার-ন্যাশনালের কাজ হ'তে বহিষ্কৃত হয়ে যখন অবনী মুখার্জি ভারতের বিভিন্ন স্থানের কমিউনিস্টদের পত্র লিখলেন তখন অনেকেই তাঁর পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করেননি, কিন্তু বেলায়ুধন করেছিলেন। তিনি কথা দিয়েছিলেন যে অবনী মুখার্জিকে তিনি সাহায্য করবেন। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও মৌলবী বারাকতুল্লাহ্‌ অবনীকে যে পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন ও কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের তৃতীয় কংগ্রেসে প্রবেশলাভের যে অনুজ্ঞাপত্র অবনী পেয়েছিলেন এই দু'টি জিনিসই তিনি ইউরোপে ফেরার সময়ে বেলায়ুধনের নিকটে রেখে গিয়েছিলেন। কথা ছিল, অবনীর ইউরোপে পৌঁছানোর পরে তাঁকে বেলায়ুধন জিনিস দু'টি পাঠিয়ে দিবেন। হয়তো তাঁকে পাঠিয়েও দেওয়া হয়ে থাকবে। কিন্তু মধ্য পথে বেলায়ুধন কিঞ্চিৎ বাণিজ্য ক'রে নিতে ভোলেননি। তিনি দু'টি জিনিসই পুলিসের ইন্‌-টেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে ফটো কপি করে নিতে দিয়েছিলেন। তার একটি আমি এখানে ছেপে দিলাম। এই ফটোকপি ন্যাশনাল আরকাইব্‌স্‌ অফ ইণ্ডিয়া হ'তে সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিকানীরের ডুঙ্গর কলেজে সম্পূর্ণানন্দ শওকত উস্‌মানীর হেড্‌ মাস্টার ছিলেন। তিনিই বানারসের বিখ্যাত ডক্টর সম্পূর্ণানন্দ। পরে চীফ্‌ মিনিস্টার ও গবর্নর হয়েছিলেন।

মণিলাল ডক্টরের কথা আমি অন্য জায়গায় লিখব।

সত্যভক্ত ভরতপুর রাজ্যের লোক। তাঁর আসল নাম চিকনলাল (চকনলাল), বাঙলার বৈষ্ণবদের 'চিকন কালা'র চিকন। তাঁর রাজনীতিক জীবনের শুরুতে তিনি গান্ধীর সবরমতী আশ্রমে ছিলেন। আমার মনে হয় সেখানেই তিনি 'সত্যভক্ত' হয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তাঁর মাথাতেই সম্ভবত

নেতাদের ফটো ছাপিয়ে বিক্রয় করার খেয়াল প্রথম আসে। ইলাহাবাদে তিনি এই ব্যবসায় আরম্ভ করেন। গান্ধী ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের লক্ষ লক্ষ ফটো তিনি বিক্রয় ক'রে থাকবেন। অন্য নেতাদেরও কত হাজার করে ফটো তিনি বিক্রয় করেছিলেন তা কে জানে। মোটের ওপরে সত্যভক্ত ভালো ব্যবসায় করেছিলেন। এর পরে আমরা দেখতে পাই যে 'নাগপুর হ'তে তিনি 'প্রনবীর' নাম দিয়ে হিন্দী কাগজ বা'র করছেন। কোথাও কোথাও 'প্রাণবীণা' নামেও উল্লেখ দেখেছি। ডাঙ্গে যখন 'সোশ্যালিস্ট' নাম দিয়ে কাগজ বা'র করেছিল তখন পত্র লেখালেখি ক'রে তার সঙ্গে সত্যভক্ত পরিচিত হন।

এটা আশ্চর্য যোগাযোগ। পরে আমরা দেখেছি দু'জনই ভারতীয় কমিউনিজম চান,—আন্তর্জাতিক নয়।

কৌঁসুলীরা কাগজপত্র পড়ে আসামীর তালিকা হতে পাঁচ জনের, অর্থাৎ (১) শামসুদ্দীন হাস্সান (২) এম· পি· টি· বেলায়ুধন (৩) মণিলাল ডক্টর (৪) সম্পূর্ণানন্দ ও (৫) সত্যভক্তের নাম বাদ দিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯২৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে স-কাউন্সিল ভারতের গবর্নর জেনেরেল নীচের আটজনের বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের (ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের) ১২১-এ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা করার মঞ্জুরী দিলেন ঃ

(১) মানবেন্দ্রনাথ রায়
(২) মাওলাবখ্শ্ ওর্ফে শওকত উস্মানী
(৩) মুজফ্ফর আহ্মদ
(৪) গুলাম হুসয়ন
(৫) নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত
(৬) রামচরণলাল শর্মা
(৭) শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গে
(৮) মায়লাপুরম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার

১৮৯৮ সালের ক্রিমিনাল প্রসেডিওর কোডের ১৯৬ ধারা অনুসারে স-কাউন্সিল গবর্নর জেনেরেল ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের অন্তর্গত ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর, লেফটেন্যাণ্ট-কর্নেল সি· কে'কে নির্দেশ দিলেন যে তিনি কানপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উপরিউক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করুন।

কোনো ইংরেজ জজের টেবিলে রাজনীতিক মোকদ্দমার কাগজপত্র রেখে দিলে আসামীর সাজা হওয়াই ছিল নিয়ম, কচ্চিৎ তার ব্যতিক্রম দেখা গেছে। মিস্টার সি· রস্ অলস্টন যখন কানপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা পরিচালনার ভার নিলেন, অর্থাৎ ব্যারিস্টার হিসাবে তার ব্রীফ গ্রহণ করলেন তখন তিনিও ভারত সরকারের বড় অফিসারদের বলে দিলেন, সংযুক্ত প্রদেশের গবর্নমেণ্টকে বলে দিন যে তাঁরা যেন এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানের কাজে কানপুরে একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে পোস্ট করেন।

কিন্তু আট জনের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা দায়ের করার মঞ্জুরী যে স-কাউন্সিল গবর্নর জেনেরেল দিলেন তার জন্যেও হোম ডিপার্টমেণ্টকেও অনেক বাধার বেড়া পার হতে হয়েছে। এই মোকদ্দমাটি শুধু দায়ের করলেই হবে না, তাতে আসামীদের দণ্ডবিধান বিষয়েও সুনিশ্চিত হতে হবে। ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের অন্তর্গত ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো অনেক চেষ্টা ও কষ্ট ক'রে বিরাট সংখ্যক দলীলপত্র জড়ো করলেন। কিন্তু এত

সব পড়বে কে? তাই আবার এ সকল দলীলের সংক্ষিপ্তসার তৈয়ার করে উকীল-ব্যারিস্টারদের পড়তে দিলেন। প্রথমেই পড়তে দিলেন সার মুহম্মদ শফীকে। তিনি ছিলেন গবর্নর জেনেরেলের এক্জেকিউটিব কাউন্সিলের আইন বিষয়ক সভ্য। শফী সাহেব পড়লেন এবং পড়ে মত দিলেন যে পেশোয়ার ষড়যন্ত্র (মস্কো ষড়যন্ত্র) মোকদ্দমার রায় সহ যে-সব দলীল আমায় পড়তে দেওয়া হয়েছে সে সব থেকে আমি বুঝেছি, রায়ের মূল পত্র না পাওয়া গেলে এবং তাঁর দস্তখৎ প্রমাণিত না হলে বোম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতা, লখ্নউ বা লাহোরের কোনো বিচারালয় হতে এই সকল ব্যক্তির দণ্ডবিধানের আশা করা নৈরাশ্যব্যঞ্জক হবে।

"To my mind, it is perfectly obvious that if, for any reason, the originals of Roy's letters to his various correspondents in India mentioned in the general Statement regarding Roy's previous history and activities as well as in the particular Statements regarding each of the five accused persons now under arrest cannot be produced in Court, or grounds of admissibility of Secondary evidence definitely established and Roy's signature proved, it is hopeless to expect conviction of these persons from any Court of Law at Bombay, Madras, Calcutta, Lucknow or Lahore where, of course, naturally the contemplated trial will have to take place." (6. 6. 23. 261/1924 & K. W.)

এক্জেকিউটিভ কাউন্সিলের অন্য সভ্যরাও কম-বেশী সার মুহম্মদ শফীর মতোই কথা বললেন।

তখনকার দিনে বাঙলা দেশের এডভোকেট জেনেরেল ছিলেন ভারত গবর্নমেণ্টের আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা (legal Adviser)। তাঁর সম্মতি না পেলে ভারত গবর্নমেণ্ট এই রকম কোনো মোকদ্দমা রুজু করতে পারেন না। মিস্টার এস. আর. দাশ (সতীশরঞ্জন দাশ) তখন ছিলেন বাঙলার এড্ভোকেট জেনেরেল। ভারত গবর্নমেণ্টের সলিসিটর কিছু দলীলপত্র সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসে মিস্টার এস. আর. দাশের সঙ্গে দেখা করলেন। কাগজগুলি পড়ে তিনি বললেন এসব প্রমাণের বলে আসামীদের সাজা দেওয়ানো সম্ভব হবে না। বড় মুশ্কিল। সাজা যে দেওয়াতেই হবে। এর পরে তিনটি বড় পোর্টমেণ্টো ভর্তি কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে ভারত গবর্নমেণ্টের তিনজন বড় বড় ইংরেজ অফিসার (লেফ্টেন্যাণ্ট-কর্নেল সি. কে. তাঁদের মধ্যে ছিলেন) মিস্টার এস. আর. দাশের সঙ্গে কলকাতায় দেখা করলেন। কর্নেল কে' তাঁকে দলীলপত্রগুলি বোঝালেন। মিস্টার দাশ তখন বুঝেছিলেন যে ভারত গবর্নমেণ্টকে এই মোকদ্দমাটি করতেই হবে। কথা হলো যে মোকদ্দমার আরজিটির মুসাবিদা তাঁকেই করে দিতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ১৯২৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখেও ভারত গবর্নমেণ্ট মিস্টার দাশের নিকট হতে আরজির মুসাবিদা পাননি।

তখন এই ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯২৪) তারিখে ভারত গবর্নমেণ্টের হোম মেম্বর সার মালকম হেইলী (Sir Malcolm Hailey) মিস্টার এস. আর. দাশকে একখানি ডেমি অফিসিয়েল পত্র লিখলেন। তাতে তিনি বললেন ঃ

"......বহু মাস হতে আমরা এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিবেচনা করছি। আমরা

এই লোকগুলিকে রেগুলেশন, ‘থ্রি’তে আবদ্ধ করে রেখেছি ; এবং এটা বাঞ্ছনীয় যে তাদের বিরুদ্ধে যদি আমাদের নালিশ থাকে তবে তা যথাসম্ভব সত্বর সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা উচিত। আমি অবশ্য কোনো ব্যক্তিকেই আদালতে হাজির করব না যদি তার সম্বন্ধে সঠিক আইন বিষয়ক উপদেশ না পাই ; কিন্তু আপনি জানেন যে আলোচ্য মোকদ্দমায় আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য আসামীদের কঠোর দণ্ড দেওয়ানো নয়, আমরা ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলে দিতে চাই, আর বোঝাতে চাই যে তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে আসামীদের আটক ক'রে রেখে আমরা অন্যায় কাজ কিছু করিনি।”

(“...Our consideration of the case has been going on for many months. We are detaining these people under Regulation III ; and it is always desirable that if we have a case against such men it should be brought forward as soon as possible. I would not of course put any man through the course unless I received legal advice that there was a sound case against him such as would justify such action ; but as you know in the present case our main object is less to obtain a heavy sentence against the accused than to thoroughly expose the whole conspiracy and to justify our action in using Regulation III.”)

এর পরে অবশ্য মিস্টার এস· আর· দাশ আমাদের বিরুদ্ধে আরজির মুসাবিদা তৈযার করে দিযেছিলেন। এই আরজিই লেফ্‌টেন্যান্ট-কর্নেল সি· কে· বাদী হয়ে কানপুরেব ডিস্‌ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার জে· ডব্লিউ· ক্লের (J. W. Clay) কোর্টে ১৯২৪ সালের ১লা মার্চ তারিখে দাখিল করেছিলেন। শুরু হলো কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা, ভারত গবর্নমেণ্টের ভাষায় কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা, যদিও ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে প্রকৃত অনুসন্ধানের কাজ ১৭ই মার্চের (১৯২৪) আগে আরম্ভ হয়নি।

ডাঙ্গের একটি ব্যাপার

বোম্বে গবর্নমেণ্ট চাইছিলেন যে এস· এ· ডাঙ্গেকে কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আসামী করা হোক। এ বিষয়ে স-কাউন্সিল বোম্বের গবর্নরের সিদ্ধান্তের অংশ বিশেষ নীচে দেওয়া হলো।

From Demi-official letter from A. Montgomerie, Esq., I. C. S., Secretary to the government of Bombay, Home Department. (Special)

To the Hon'ble J. Crerar, C. S. I., C. I. E., Secretary to the government of India, Home Department (Politics), No. S. D. 1243, dated Poona, the 16th July 1923.

6. In view of the above considerations, His Excellency the Governor in Council is strongly of opinion that it would be more politic to continue to keep a close watch on Dange and his

activities. **He is our most fruitful source of information as to Bolshevist activities** and he is not himself at present particularly prominent Bolshevist. He has had failure in the propaganda efforts, he has been in bad health and has been shouldered out of his leading position by Singaravelu of Madras. If he remains quiescent, he will provide us with regular and useful information. If he becomes more dangerous and develops a more practical propaganda of sedition, it will probably be possible to prosecute him under section 124-A, Indian Penal Code. In any case, His Excellency in Council consider that delay for the present would not materially affect the situation, in view particularly of the recent reports of the probable restrictions in future of Bolshevist propaganda in the East as a result of negotiations over the trading regulations between Russia and Great Britain.

(Emphasis mine)

সংক্ষিপ্তসার

বোম্বে গবর্নমেণ্টের হোম সেক্রেটারী মিস্টার এ. মণ্টগোমারি স-কাউন্সিল বোম্বের গবর্নরের সিদ্ধান্ত ভারত গবর্নমেণ্টকে জানালেন যে বোম্বে গবর্নমেণ্ট এস. এ. ডাঙ্গেকে কানপুর মোকদ্দমার আসামী করার বিরুদ্ধে। কারণ, বোম্বে গবর্নমেণ্টের মতে ডাঙ্গের ওপরে আরও বেশী করে নজর রাখাই হবে রাজনীতিক বিচক্ষণতাব পরিচয়। **সে বলশেভিকদের কাজ-কর্ম সম্বন্ধে বোম্বে গবর্নমেণ্টের খবরের উৎস**। এ সময়ে সে একজন নাম-করা বলশেভিকও নয়। সিঙ্গারাভেলু তার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। যদি সে শান্ত-নিস্তব্ধ থাকে তবে সে আমাদেব প্রযোজনীয় খবর জোগাতে থাকবে। আর, যদি সে রাজদ্রোহ প্রচাবের দ্বাবা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে তখন তাকে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের (ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের) ১২৪-এ ধারা অনুসারে আদালতে অভিযুক্ত করা সম্ভব হবে। গবর্নর বিবেচনা করছেন যে বিলম্বে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। রাশিয়া আর গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে যে বাণিজ্যিক আলোচনা চলেছে তাতে অবস্থায় পরিবর্তন আসতে পাবে। (বড় হরফ আমার—লেখক)।

ভারত গবর্নমেণ্ট স্থির করলেন যে ডাঙ্গেকে মোকদ্দমা হতে বাদ দিতে হবে। এমন কি কর্নেল কে' ডাঙ্গের প্রতি অজস্র গালি বর্ষণ করেও (ওটা তাঁর একটা কৌশল ছিল) ডাঙ্গেকে মোকদ্দমা হতে বাদ দেওয়ার পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনে ভারত বিষয়ক মন্ত্রী (সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া) কোনো কথাই শুনলেন না। এস. এ. ডাঙ্গেকেও কানপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় জড়াতে হলো।

শেষ পর্যন্ত যে আট জনকে মোকদ্দমায় আসামী করা হলো তাঁদের মধ্যে দু'জনকে যে আদালতে হাজীর করানো যাবে না সেটা আগেই জানা ছিল। তাঁরা ছিলেন (১) **মানবেন্দ্রনাথ রায়** ও (২) **রামচরণলাল শর্মা**। রায় ইউরোপের কন্‌টিনেন্‌টে ছিলেন আর রামচরণলাল শর্মা ভারতের ভিতরে ফরাসী ইলাকা

পণ্ডিচেরীতে রাজনীতিক আশ্রয় গ্রহণকারী ছিলেন। মায়লাপুরম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের টাইফয়েড হয়েছিল। তারপর যখন তিনি স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে চেষ্টিত ছিলেন তখন তাঁকে কানপুর মোকদ্দমার সংস্রবে ওয়ারেণ্ট নিয়ে পুলিস গিরেফ্‌তার করতে আসেন। বড় বড় ডাক্তারেরা, তাঁদের মধ্যে ইংরেজ ডাক্তারও ছিলেন, সার্টিফিকেট দিলেন যে রোগীকে এখনও বিছানায় থাকতে হবে। তখন তাঁকে জামিন মঞ্জুর ক'রে মাদ্রাজের ২২ নম্বর সাউথ বীচে নিজের বাড়ীতে থাকতে দেওয়া হলো।

নলিনী গুপ্ত ভারতে আসার জন্যে ১৬ই ডিসেম্বর (১৯২২) তারিখে মস্কো হতে রওয়ানা হয়েছিলেন। ইরানের ভিতর দিয়ে তিনি করাচি পৌঁছেছিলেন ১৯২৩ সালের ১২ই জুন তারিখে। করাচি হতে তিনি বোম্বে যান। আর বোম্বে হতে যান মাদ্রাজে। সেখানে মায়লাপুর্‌ম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের বাড়ীতে ক'দিন থাকেন। মাদ্রাজ হতে কলকাতা আসেন জুলাই মাসের (১৯২৩) শেষার্ধে। হাওড়া স্টেশন হতে তিনি সোজা ৩৯ নম্বর হ্যারিসন রোডে, রমেশচন্দ্র দাশগুপ্তের মেসে যান এবং রমেশকে সেখানে পেয়েও যান। ১৯২২ সালে নলিনীর ভারতবর্ষ ছাড়ার সময়েও রমেশ ওই বাড়ীতেই ছিলেন। দেখা হতেই নলিনী রমেশকে বললেন, "আমাকে মুজফ্‌ফরের নিকটে নিয়ে চল।" রমেশ উত্তর দিলেন, "তিনি তো জেলে রয়েছেন।" আশ্চর্য এই যে ডাঙ্গে কিংবা সিঙ্গারাভেলু নলিনীকে আমার গিরেফ্‌তারের খবর দেননি। কানপুর জেলে এই কথাগুলি, অর্থাৎ হাওড়া স্টেশন হতে নলিনী সোজা রমেশের মেসে গিয়েছিলেন, এবং রমেশের মুখেই প্রথম শুনেছিলেন যে আমি গিরেফ্‌তার হয়েছি, ইত্যাদি,—নলিনী আমায় বলেছিলেন। আমার জেলের বাইরে আসার পরে রমেশ দাশগুপ্তও তাই বলেছিলেন। কেউ কেউ অন্য কথা বলেছেন।

১৯২৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে নলিনী কলকাতায় গিরেফ্‌তার হয়েছিলেন। তখন তিনি কাঁকুড়গাছিতে গোপনে বাস করতেন। ধরা পড়ার পরে তিনি পুলিসের নিকটে আরব্য উপন্যাসের কায়দায় সত্য ও মিথ্যা মিশিয়ে সুদীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছিলেন। এক দিনের বিবৃতি শেষ হওয়ার পরে তিনি বলেছেন, "আরও অনেক কথা বলার রয়েছে, কাল বলব।"

এম. এন. রায় তাঁর **সন্ত্রাসবাদী** বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে **প্রথমবারে (১৯২১ সালে) নলিনী গুপ্তকে দেশে পাঠিয়েছিলেন।** তাঁর "স্মৃতিকথা"য় এর উল্লেখ আছে। তা'ছাড়া, কোনো সন্ত্রাসবাদী বন্ধুকে লেখা এক পত্রে তিনি লিখেছেন, "তোমাদের সংবাদ পাওয়ার জন্যে আমি নলিনীকে দেশে পাঠিয়েছিলেম।"

মস্কোর প্রাচ্য জনগণের কমিউনিস্ট ইউনিভার্সিটির ছাত্র-সংগ্রহ করার জন্যে ১৯২৩ সালে নলিনী গুপ্তকে দ্বিতীয়বার দেশে পাঠানো হয়েছিল। এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজটি করার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সে কাজ তিনি করতেও পারেননি। একজন মাত্র ছাত্র, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে, তিনি পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ব্যাপারেও বিপর্যয় ঘটেছিল। সে কথা আমি পরে বলব।

নলিনীর দ্বিতীয়বারে কলকাতায় আসার পরে যা যা ঘটেছিল সে সম্বন্ধে তিনি আমায় কানপুর জেলে এক দীর্ঘ বিবরণ শুনিয়েছিলেন। সেই বিবরণটি ছিল এই রকম ঃ

কলকাতায় এসে তিনি আমায় পেলেন না। থাকার স্থান কোথাও না পেয়ে

তিনি ডক্টর মেঘনাদ সাহার নিকটে গেলেন। বার্লিনের হস্‌পিটালে তাঁর সঙ্গে নলিনীর পরিচয় হয়েছিল। পুলিসের নিকটে বিবৃতিতে নলিনী বলেছেন যে তাঁর সঙ্গে ডক্টর সাহার পরিচয় লণ্ডনে হয়েছিল। যাই হোক, নলিনী আমায় বলেছিলেন যে ডক্টর সাহা নলিনীর কথা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি নলিনীকে সঙ্গে নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর নিকটে গেলেন এবং নলিনীর আশ্রয়ের কথা বললেন। সুভাষ বসু সেই সময়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টিদের বড় দুই তরফকে এক করার চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি যুগান্তর পার্টির উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ও অনুশীলন পার্টির রমেশ চৌধুরীকে ডেকে আনালেন এবং নলিনীকে আশ্রয় দিতে বলে দিলেন। নলিনীর স্বভাব ছিল যে কারুর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আধ থেকে এক ঘণ্টার ভিতরে তিনি বলে দিতেন যে তিনি বিস্ফোরক (explosive) তৈয়ার করতে জানেন। এ খবর পেয়ে রমেশ চৌধুরী আনন্দিত হলেন এবং উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলে দিলেন যে আশ্রয়ের ব্যবস্থা তিনিই করে দিবেন। উপেনবাবু খুশী মনে চলে গেলেন। তিনি নলিনীর বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনেছিলেন।

রমেশ চৌধুরী কিন্তু আনন্দিত হয়ে নলিনী গুপ্তকে ঢাকা নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি কিছু সংখ্যক যুবককে শেখাতে লাগলেন কি করে বিস্ফোরক প্রস্তুত করতে হয়। এই সময়ে অবনী মুখার্জিও ঢাকায় ছিলেন। নলিনী যখন এই কথা শুনলেন তখন তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন যে "আমি ওকে খুন করব।" এই খুন করার কথাটি কিন্তু নলিনী আমায় বলেননি, বলেছিলেন অন্য একজন। নেতা প্রতুল গঙ্গোপাধ্যায় অবনী মুখার্জিকে অনেক বেশী মূল্য দিতেন। নলিনীকে ঢাকা ছাড়তে হয়েছিল। অনুশীলন পার্টির একজন আমায় বলেছিলেন যে এই সময়ে চট্টগ্রামের চারুবিকাশ দত্ত এসে নলিনীকে নিয়ে যান। তার পরে তাঁরা খুলনায় কোথাও ছিলেন।

কাঁকুড়গাছিতে নলিনীর সঙ্গে অখিল নামক একজন থাকতেন। নলিনী আমায় বলেছিলেন যে এই অখিল ছিলেন অনুশীলন পার্টির নেতা রমেশ আচার্য। নলিনী অজস্র মিথ্যা কথা বলতেন। তাঁর কোন্ কথা মিথ্যা আর কোন্ কথা সত্য তা আমার পক্ষে বোঝা মুশকিল ছিল।

ধরা পড়ার পরে (২০শে ডিসেম্বর, ১৯২৩) নলিনী দিনের পর দিন পুলিসের নিকটে বিবৃতি দিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ের বিবৃতি শেষ হলে পুলিস গবর্নমেণ্টের নিকটে রিপোর্ট পাঠাল যে আদালতে অভিযুক্ত হওয়ার মতো কোনো কিছু নলিনীর বিরুদ্ধে নেই। তাঁর নামে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনের ওয়ারেণ্ট পাঠিয়ে দিন। ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসের কোনো এক তারিখে নলিনী গুপ্তকে স্টেট্ প্রিজনার করা হয়েছিল।

গুলাম হুসয়ন পেশোয়ারের এড্‌ওয়ার্ডস মিশন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সেখান থেকে কাবুলে তাঁর ছাত্র জীবনের প্রিয়তম বন্ধু মুহম্মদ আলীর (খুশী মুহম্মদের) সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তার পরে তিনি কাবুলে একটি অস্থায়ী চাকরী গ্রহণ করে সেখানে গিয়ে কিছু দিন বন্ধু মুহম্মদ আলীর সঙ্গে কাটিয়ে আসেন। মুহম্মদ আলীর জিম্মায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কাজের বিস্তারের জন্যে বহু টাকা ছিল। সেই টাকা হতে অনেক টাকা তিনি গুলাম হুসয়নের হাতে দেন। তাঁর স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি হতে বোঝা যায় যে তিনি প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। দেশে ফিরে এসে তিনি মিশন কলেজের চাকরী ছেড়ে দিয়ে লাহোরে চলে এলেন। কিছু কিছু সাংগঠনিক কাজ যে তিনি

করেননি এমন নয়, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে লাহোরে এক খণ্ড জমি কিনে নিজের জন্যে একটা পাকা বাড়ীও তিনি উঠিয়ে নিলেন। অসাধুতার ভিতর দিয়েই তাঁর তথাকথিত পার্টি-জীবন আরম্ভ হয়েছিল। কষ্ট সইবার শক্তি তাঁর একেবারেই ছিল না। বৈপ্লবিক রাজনীতিতে যাঁরা শামিল হন তাঁদের দুঃখ-কষ্টে জীবন যাপনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়। কিন্তু গুলাম হুসয়ন ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে যখন স্টেট প্রিজনার হলেন তখন তিনি শুরুতেই ভেঙে পড়লেন। অথচ, কলেজে পড়াতেন বলে তাঁর নিজের একটা মর্যাদা ছিল। তাঁর পরিবারের আলাদা মর্যাদা ছিল। সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণকারী তাঁর পিতামহ ডাক্তার আল্লাদিত্তা বিখ্যাত আই সার্জন (চক্ষুতে অস্ত্রোপচারকারী) ছিলেন। সার মালকম হেইলী তাঁকে চিনতেন। এই কারণে তাঁর জন্যে ও তাঁর পরিবারের জন্যে নানান রকম ভাতা মঞ্জুর হয়েছিল। এ সব সত্ত্বেও জেলের চার দেওয়ালের ভিতরে আটক থাকা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বিবৃতি দেওয়া আরম্ভ করলেন। এই বিবৃতি দিতে দিতে যখন তিনি শুনলেন যে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হবে আর তিনিও হবেন সেই মোকদ্দমার আসামী, তখন তো তিনি একপ্রকার কাঁদাকাটি আরম্ভ করে দিলেন। তাঁর বিবৃতি হয়ে উঠল একখানি আস্ত মহাভারত। সেই সময়ে মুহম্মদ শফীকের বিরুদ্ধে পেশোয়ারে পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা চলছিল (সেশন্‌স্ কেস্ নম্বর ২৬, ১৯২৪ সাল; হোম ডিপার্টমেণ্ট পলিটিকাল, ফাইল নম্বর ২৬৪ অফ ১৯২৪)। ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্ট তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বললেন যে, তাঁকে মুহম্মদ শফীকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হবে। সেই সাক্ষ্যও তিনি দিলেন।

১৯২৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে গুলাম হুসয়ন ভারতের স-কাউন্সিল গবর্নর জেনেরেলের নিকটে যে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন তার শেষ কয়েকটি ছত্র এখানে তুলে দিলাম:

"In case there be any circumstances casting any suspicion or doubt on the integrity of what I have submitted most respectfully, I am prepared to explain it without any reservation. Deeply as I have erred, my sufferings have been no less deep. I acknowledge my mistake. It was a crime. Fatality alone dragged me into these circumstances, otherwise all this ill accords with my calibre. I was engaged in a conspiracy against the Bolshevics. The little amount of political work that I did, I did to secure a part of their illgotten gold, and there I am in prison broken and annihilated, In spite of my sins I hope your Excellency's Government will mercifully take a lenient view of my faults. I will not ever attempt a similar experience. So help me God!"

বাঙলা অনুবাদ

"পরম শ্রদ্ধার সহিত আমি যা হুজুরের নিকটে দাখিল করেছি তাতে, অর্থাৎ আমার সত্যবাদিতায় যদি এতটুকুও সন্দেহ হয় তবে কোনো গোপনতার আশ্রয়

না নিয়ে সব কিছু আবারও বলতে প্রস্তুত আছি। আমি আমার ভুল স্বীকার করছি। আমার ভুল যত গভীর, তা থেকে আমি যে দুঃখ-বেদনা পেয়েছি তা কম নয়। আমার ভুল হচ্ছে আসলে অপরাধ। দুরদৃষ্ট আমার এ সব কাজে টেনে নিয়েছে। তা না হলে আমার পদের একজন লোক কি ক'রে যত সব মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়ল। আমি বলশেভিক বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেম। আমি যে সামান্য রাজনীতিক কাজ করেছি, তা তাদের অন্যায়ভাবে পাওয়া অর্থে ভাগ বসানোর জন্যেই করেছি এবং এই জন্যেই আমি আজ কারাগারে, আমার মন ভেঙে গেছে, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। অপরাধ আমি অনেক করেছি, সে সব সত্ত্বেও আমি আশা করছি যে হুজুরের সরকার দয়ার্দ্র চিত্তে আমার দোষগুলির বিচার করবেন। আমি আর কখনও এমন কাজ করব না। হে ঈশ্বর আমায় সাহায্য কর!"

গুলাম হুসয়নের ওপর হতেও মোকদ্দমা তুলে নেওয়া হলো। শেষ পর্যন্ত আমরা চারজন আসামী থাকলাম।

(১) শওকত উস্‌মানী
(২) নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত
(৩) মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
(৪) শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গে।

১৯২৪ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে কানপুরের জয়ণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টাব ডব্লিউ ক্রিস্টির (W. Christie) আদালতে কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ হলো। তার একদিন কিংবা দু'দিন আগে গুলাম হুসয়ন শপথ নিয়ে লাহোরের এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার মুনীর হুসয়নের নিকটে যে তাঁর শেষ স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা শেষ হয়েছিল।

কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আসামীদের তরফ হতে কোনো উকীল ব্যারিস্টার ছিলেন না। আগেই বলেছি, মোকদ্দমার প্রস্তুতি পর্বেই ইলাহাবাদ হাইকোর্টের ব্যারিস্টার মিস্টার সি· রস অলস্টনকে দৈনিক এক হাজার টাকা ফিস দিয়ে সরকার পক্ষে নিযুক্ত করা হয়েছিল। মোকদ্দমার আরজির মুসাবিদা ক'রে দিয়েছিলেন বাঙলা দেশের এডভোকেট জেনেরেল মিস্টার এস· আর· দাশ (সতীশ রঞ্জন দাশ)। দায়রা আদালতে সোপর্দ করা পর্যন্ত মোকদ্দমার অনুসন্ধানের কাজ চালাবার জন্যে সি· রস অলস্টন একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট দাবী করেছিলেন ; মিস্টার ডব্লিউ ক্রিস্টি ছিলেন সেই ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট।

এই জয়ণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টেই দর্শকদের আসনে আমি প্রথম সত্যভক্তকে দেখি। ইউরোপীয় পোশাক পরিহিত, মাথায় পাগড়ি ছিল, সেটা টিকি ঢাকার জন্যেও হতে পারে। তিনিই পরে "ইণ্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি" গঠন করতে চেয়েছিলেন।

ডাঙ্গের প্রাইভেট সেক্রেটারি

শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গের এক নবলব্ধ বন্ধুর নাম ছিল বাসুদেব হরি জোশী। ডাঙ্গেকে গিরেফ্‌তার করে কানপুরে আনার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও কানপুরে আসেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দর্শকদের আসনে তিনিও বসতেন। একদিন কোর্ট চলাকালে তিনি বসে বসে কে জানে কিসের নোট নিচ্ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন উদ্ধত

স্বভাবের এক নবযুবক। জোশীর ওপরে তাঁর নজর পড়তেই তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন ঃ

"কে তুমি ওখানে বসে আমার বিনানুমতিতে নোট নিচ্ছ?"

২৪ বছর বয়স্ক, বেঁটে ডাঙ্গে তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে উঠল এবং সেই মুহূর্তেই বলল ঃ

"মাননীয় মহাশয়, ইনি হচ্ছেন মিস্টার ভি· এইচ· জোশী, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি। আমি তাঁকে নোট নিতে বলেছি।"

ম্যাজিস্ট্রেট নরম হয়ে বললেন, "আমার অনুমতি কেন নিলে না"।

বাসুদেব হরি জোশী এই ব্যাপারে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করলেন এবং সেই দিন থেকে তিনি নিজেই প্রচার করতে লাগলেন যে তিনি এস· এ· ডাঙ্গের প্রাইভেট সেক্রেটারি। এই ভাবে তিনি বহু বৎসর ডাঙ্গের প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে থাকলেন। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা চলাকালে ডাঙ্গের হয়ে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের নিকটে ওকালতি করার জন্যে গোপনে তিনি মস্কো যেতে চেয়েছিলেন। বোম্বের ডক ইলাকায় ধরা পড়ে যান। বহু বৎসর পরে শুনেছি ডাঙ্গের সঙ্গে বাসুদেব জোশীর ঝগড়া হয়ে গেছে। আরও পরে শুনেছি বাসুদেব জোশী আর বেঁচে নেই।

ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। আমি আগেই বলেছি, নিম্ন আদালতে আমাদের কোনো উকীল-ব্যারিস্টার ছিলেন না, ডাঙ্গেরও নয়। ইতোমধ্যে বাসুদেব জোশী কানপুরের মারাঠী বাশিন্দাদের ভিতরে (সংখ্যায় তাঁরা খুব বেশী ছিলেন না) ডাঙ্গেকে অবয়বে ছোট হলেও বিরাট ব্যক্তিত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ডাঙ্গের একজন উকীল থাকলেও থাকতে পারত। পেনাল কোডের ১২১-এ ধারার মোকদ্দমার বিচার দায়রা আদালতেই (সেশনন্স কোর্টে) শুধু হতে পারে। আমরা ভাবলাম নিম্ন আদালতে আমরা মিছামিছি মুখ খুলতে যাই কেন?

নিম্ন আদালতে ডাঙ্গের বিবৃতি

১৮৯৮ সালের ক্রিমিনাল প্রসেডিওর কোডের ২৬৪ ধারা অনুযায়ী এই জাতীয় মোকদ্দমায় আসামীকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডেকে এনে অনুসন্ধানরত ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আসামীর উত্তর সাক্ষ্য নয়। কারণ, তিনি শপথ গ্রহণ করেন না। ডাঙ্গেকেও প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং "হা" বা "না"র মামুলী উত্তরও দিয়েছিল। তাকে শেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ

Q.—Have you any more to say?

A.—My studies in economy had convinced me that as India was being industrialized a working class would be created in India. The industrialization of the country was being carried on by British capital with the help of native capital. That native capital was struggling to get the hold of the monopoly to exploit Indian wealth. That this struggle was expressed in the movement called the nationalists' movement. That that native capital wanted to use the working class towards its own ends. I wanted

the working class to fight for its economic betterment, and as I thought that capitalism is western product, the working class also must fight on western lines and that socialism was the expression of that movement. I started to spread the doctrine of socialism even before Mr. M. N. Roy was heard in India to be working on behalf of the Communist International. I wrote a book and started a paper : the book and the paper were sent to press in Europe as well as in India. That perhaps attracted the attention of M. N. Roy and the convention. When the Sessions of the convention were being held in 1922 an individual was sent to me, he met me in Bombay, he represented himself to be coming to me under a mandate from the convention. He did not show me any document and asked me if I could attend the sessions of the convention. Mr. Ashley was the name of the gentleman. In one of the Exhibits he is referred to as Mr. Nanda Lal (see Ex. 6). I asked him about the intentions and the policy of Mr. M. N. Roy and the convention. When I was given to understand that it meant the breaking away of India from the British Empire I told him that I could join the convention or attend the sessions. After that as I was given the address of Mr. M. N. Roy by Mr. Ashley I addressed him on the subject. Meanwhile I was going on with my work of socialist propaganda. As it was a necessity for me as an editor to have complete knowledge of the European movement I maintained connections with Roy in order to get the required information. Reuter telegraphed Roy's programme to India. I disapproved of his programme through my paper. As regards the visit of Mr. Ashley and my connections with Roy I issued statement in the Vernacular press on 5-7-23 stating the facts as they were. I am not a member of the conspiracy to deprive the King-Emperor of his sovereignty of British India by a violent revolution ; neither have I assisted the furtherance of any such conspiracy and if it lies within the powers of this Ct. I beg to be acquitted.

(Sd.) R. A. W. CHRISTIE
(Sd.) S. A. DANGE

The above is a full and true record of the statement given by Dange accused and it was recorded by me and read over to accused.

(Sd.) W. CHRISTIE
28. 3. '24.

বাঙলা অনুবাদ

প্রশ্ন ঃ তোমার কি আর কিছু বলার আছে?

উত্তর ঃ অর্থনীতির অধ্যয়ন হতে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে যেহেতু ভারতে কল-কারখানা প্রসারিত হচ্ছে সেই কারণে ভারতে একটি মজুর শ্রেণীরও সৃষ্টি হবে। ভারতীয় মূলধনের সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশ মূলধনই দেশকে শিল্পায়িত করে তুলছে। ভারতীয় ধনৈশ্বর্যকে শোষণ করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় মূলধন একচেটিয়া অধিকার লাভের জন্যে সংগ্রাম চালাচ্ছে। জাতীয় আন্দোলনের ভিতর দিয়ে এই সংগ্রাম চলেছে। ভারতীয় ধনপতিরা তাঁদের নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মজুর শ্রেণীকে ব্যবহার করতে চাইছে। আমি চাইছি যে মজুর শ্রেণী তাঁদের আর্থিক উন্নয়নের জন্যে লড়াই করুন, এবং আমি ভেবেছি যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন পশ্চিমের জিনিস তখন পশ্চিমের পথেই মজুরশ্রেণী তাদের সংগ্রামের পরিচালনা করবেন। এই আন্দোলনের মোদ্দা কথা হবে সোস্যালিজম।

মিস্টার এম· এন· রায় যে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের হয়ে কাজ করছেন একথা ভারতে কেউ শোনার আগে হতেই আমি ভারতে সোস্যালিস্ট মতবাদ প্রচার করছি। আমি একখানি পুস্তক লিখেছি এবং একখানি কাগজও বা'র করেছি। আমার পুস্তক ও কাগজ ইউরোপের ও ভারতের সংবাদপত্রে পাঠানো হয়েছিল। তাই বোধ হয় এম· এন· রায় ও কন্‌ভেনশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যখন ১৯২২ সালে কন্‌ভেনশনের অধিবেশন হচ্ছিল তখন বোম্বেতে আমার নিকটে এক ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছিল। বোম্বেতেই তিনি আমার সংগে দেখা করেন। আমায় তিনি বলেছিলেন যে কনভেনশনের অনুজ্ঞাপত্র নিয়ে তিনি এসেছেন। এই দলীল তিনি আমায় দেখাননি। আমায় তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি কন্‌ভেনশনে যোগ দিতে পারি কিনা। এই ভদ্রলোকের নাম ছিল আশ্‌লী। একটি এক্‌জিবিটে তাঁর নাম লেখা হয়েছে মিস্টার নন্দলাল (এক্‌জিবিট নম্বর ৬)। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম যে মিস্টার এম· এন· রায় ও কন্‌ভেনশনের উদ্দেশ্য ও নীতি কি? আমায় যখন জানানো হলো যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হতে বা'র হয়ে আসাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য ও নীতি তখন জানিয়েছিলেম যে কন্‌ভেনশনে ও তার অধিবেশনে আমি যোগ দিতে পারি না। এর পরে মিস্টার আশ্‌লী আমায় মিস্টার এম· এন· রায়ের ঠিকানা দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে আমি রায়কে পত্র লিখেছি। ইতোমধ্যে আমি আমার সোস্যালিজমের প্রচার করেই চলেছিলাম। কাগজের সম্পাদক হওয়ার কারণ ইউরোপীয় আন্দোলন সম্বন্ধে আমার ওয়াকিফহাল থাকা প্রয়োজন। এই জন্যেই আমি রায়ের সংগে সংস্রব রক্ষা করেছি। রয়টার রায়ের প্রোগ্রাম টেলিগ্রাম যোগে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। আমি তার বিরুদ্ধে লিখেছি। মিস্টার আশ্‌লীর সহিত সাক্ষাতের ও এম· এন· রায়ের সংগে আমার সম্পর্ক সম্বন্ধে আমি ৫· ৭· '২৩ তারিখে সমস্ত ঘটনা উল্লেখ ক'রে বিবৃতি দিয়েছি। রাজসম্রাটকে ব্রিটিশ-ভারতের রাজ্যাধিকার হতে বিপ্লবের পথে বলপূর্বক বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রের সহিত আমি লিপ্ত নেই। আমি এই রকম কোনো ষড়যন্ত্রকে সাহায্য করিনি। যদি এই কোর্টের ক্ষমতায় থাকে তবে প্রার্থনা করি যে আমার মুক্তি দেওয়া হোক।

(স্বাক্ষর) আর· এ· ডব্লিউ ক্রিস্টি
(স্বাক্ষর) এস· এ· ডাঙ্গে

ওপরে আসামী ডাঙ্গের দেওয়া পূর্ণ ও সত্য বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছে এবং আমাকেই তা রেকর্ড করতে হয়েছে। আমি তা আসামীকে পড়ে শুনিয়েছি।

(স্বাক্ষর) ডব্লিউ· ক্রিস্টি
২৮·৩·'২৪·

ডাঙ্গে যে নিম্ন আদালতে এই রকম একটি বিবৃতি দিবে সে কথা সে ঘুণাক্ষরেও আমাদের কিছু জানায়নি। চার্লস্ আশ্লী সম্বন্ধে আমি ওপরে অনেক কথা বলেছি। তার সঙ্গে মিলিয়ে আমি এই বিবৃতি সকলকে পড়তে অনুরোধ করছি। তা হলে সকলে বুঝতে পারবেন কত অসঙ্গতিতে এই বিবৃতি ভরা। চার্লস্ আশ্লী ১৯২২ সালের ১৮ই এপ্রিল হতে ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত বোম্বেতে ছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসে ভারতবর্ষের যে-সকল ডেলিগেট যোগ দিবেন তাদের রাহাখরচের টাকা নিয়ে এসেছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন ৫ই নবেম্বর হতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলেছিল। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসকে ডাঙ্গে কেন কন্ভেন্শন বলেছে তা সে-ই জানে।

ডাঙ্গেকে নিয়ে কানপুর জেলে আমরা অনেক জ্বালায় জ্বলেছি। তার চরিত্র জটিলতায় ভরা। সে ভাবত এই বুঝি আমি অন্যদের চেয়ে ছোট হয়ে গেলাম। অথচ তার ছোট হওয়ার কোনো কথাই ছিল না। তার বাহন বাসুদেব জোশী রাত দিন তার সম্বন্ধে প্রচার করে বেড়াতেন। মারাঠী বাশিন্দাদের ভিতরে তিনি ডাঙ্গেকে তিলকের সমপর্যায়ে না হলেও তার নিকটতম স্থানে তুলে দিয়েছিলেন।

চারজন আসামীর ভিতরে তিনজন (১) শওকত উস্মানী (২) মুজফ্ফর আহ্মদ ও (৩) নলিনী গুপ্ত ছিলেন স্টেট্ প্রিজনার। অর্থাৎ ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশনের বন্দী। তাঁদের ওপর হতে এই ওয়ারেণ্ট তুলে না নিয়েই তাঁদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছিল। আমি যতটা বুঝেছিলেম এটা বে-আইনী ছিল। কিন্তু আপত্তি তুলবে কে? উকিলেরা তো কিছুই বুঝতেন না। সে যাই হোক, আমাদের তিনজনের উপর হতে ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশনের ওয়ারেণ্ট যখন তুলে নেওয়া হয়নি তখন সেই অনুযায়ী আমাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা তো ইনটেলিজেন্স ব্যুরোকে করতে হবে। স্বয়ং ডিরেক্টর ওখানে হাজির আছেন। কিন্তু ডাঙ্গের তাতে ঘোর আপত্তি। সে বলল, এখানে আবার তিন নম্বর রেগুলেশন কেন? তখন আমরা বললাম, জাহান্নামে যাক তিন নম্বর রেগুলেশন, আমরা সাধারণ বিচারাধীন বন্দী হয়ে থাকব। ডাঙ্গের সঙ্গে আমরা ঝগড়া করতে চাইনি।

নিম্ন আদালতে প্রথম শুনানি আরম্ভ হয়েছিল ১৭ মার্চ (১৯২৪) তারিখে। পেশোয়ারের মোকদ্দমাগুলিতে বিশেষ ক'রে মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কোনো প্রচার হয়নি। কিন্তু কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার ভারত গবর্নমেণ্টই প্রচারের সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। তাঁদের অনুরোধেই এসোসিয়েটেড্ প্রেস ও রয়টারের প্রতিনিধি সব সময় কোর্টে উপস্থিত থাকলেন এবং ভারত গবর্নমেণ্টের তরফ হতে প্রেসের প্রতিনিধিদের ব'লে দেওয়া হলো যে মোকদ্দমার শিরোনাম যেন দেওয়া হয় "কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা"। ভারতে যে বলশেভিকদের অনুপ্রবেশ ঘটছে কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার দ্বারা ব্রিটেনের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট জগতের নিকটে এই প্রচারকার্যই চালাতে চেয়েছিলেন।

অনুসন্ধানকারী ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ডব্লিউ· ক্রিস্টি ১লা এপ্রিল (১৯২৪)

তারিখে তাঁর লিখিত কমিটাল অর্ডারে দস্তখত করলেন। চারজন আসামীই দায়রায় সোপর্দ হলেন।

দায়রায় বিচার হবে সারা ভারতে, সারা বিশ্বেও বলা যায়, কুখ্যাত এক দায়রা জজের আদালতে। তাঁর নাম এইচ. ই. হোম (H. E. Holme)। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জিলার চৌরি চৌরায় একটি ছোট কৃষক অভ্যুত্থান হয়। কৃষকেরা অত্যাচারী পুলিসের থানা আক্রমণ করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেন। পুলিসের মোট একুশ জন লোক থানায় ছিল, সকলেই পুড়ে মারা যায়। দায়রা আদালতে এই মোকদ্দমার বিচার করেছিলেন জজ্ হোম (Holme)। বিরাট সংখ্যক লোকেদের ভিতর হতে কি করে প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে পাওয়া গেল, কি করেই বা জজ তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন জানি না। সমস্ত ব্যাপারটাই অসম্ভব ছিল। কিন্তু মিস্টার হোমের মন বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ স্পৃহায় ভরপুর ছিল। তিনি একই মোকদ্দমায় একই সঙ্গে ১৭২ জনের ওপরে ফাঁসির হুকুম শুনিয়ে দিলেন। সেদিন ভারতে অবস্থিত ইংরেজ-দেরও মাথা হেঁট হয়েছিল। ইলাহাবাদ হাইকোর্ট সঙ্গে সঙ্গেই কাগজ-পত্র চেয়ে নিলেন। তাঁরা দশ-বারোজনের ওপরে মাত্র ফাঁসির হুকুম বহাল রাখলেন।

এহেন জজ্ দায়রা আদালতে আমাদের বিচার করবেন। নানান রকম বন্দোবস্ত করতে সময় লেগেছিল। ২২শে এপ্রিলের (১৯২৪) আগে সেশন্স কোর্ট বসতে পারেনি। ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দেখেছিলেম, এখানেও দেখলাম, কোর্টের বাইরে লুইস গান্ বসানো হয়েছে। কানপুরের দায়রা বিচারের ঘরটায় ব্যবস্থা অদ্ভুত মনে হলো। একটা দেয়ালের গা ঘেঁষে জজের মঞ্চ (ইজ্‌লাস) তৈয়ার হয়েছে। তার নীচে মেজের ওপরে উকীল ব্যারিস্টারদের চেয়ার। দর্শকদের ব্যবস্থাও তাঁদের সঙ্গেই। তাঁদের পেছনে আসামীদের কাঠগড়া। বাইরে থেকে এসে কোর্ট রুমে ঢুকলেই প্রথমেই আসামীদের পাওয়া যেতো। এই রকম ব্যবস্থা পক্ষে ভালোই হয়েছিল। ইচ্ছা করলে আমরা দু'চারটি কথা বাইরের সঙ্গে বলে নিতে পারতাম। বাইরে লোকেদের সঙ্গে কথা যে বলিনি তাও নয়। এ ভাবেই কানপুরের বাঙালী বাশিন্দা রাজকুমার সিংহের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হতে আই, এস. সি. পরীক্ষা দিয়ে তখন তিনি বাড়ীতে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও কেউ কেউ আসতেন। গান্ধী টুপি মাথায় পরে যোগেশ চট্টোপাধ্যায় আসতেন। পরে কাকোরি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় রাজকুমার সিংহ ও যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ মিয়াদের সাজা হয়েছিল। অহংকার-মত্ত লোক ছিলেন চট্টোপাধ্যায়। কিসের এত অহংকার কে জানে? ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে গয়ায় সারা-ভারত কৃষক কন্‌ফারেন্স যখন হচ্ছিল তখন তিনি সেখানে নিজেদের একমাত্র বিপ্লবী ব'লে পরিচয় দিতে গিয়ে অধ্যাপক রঙ্গের নিকট জোর ধমক খেয়েছিলেন। রঙ্গ বলেছিলেন যে-কথার মানে বোঝেন না সে কথা ব্যবহার করেন কেন? চট্টোপাধ্যায় চুপ হয়ে গিয়েছিলেন।

আগেই বলেছি নিম্ন আদালতে আমাদের কোনো উকীল-ব্যারিস্টার ছিলেন না। দায়রা আদালতের জন্যে দেখলাম একজন ব্যারিস্টার ও একজন উকীল নিযুক্ত হয়েছেন। ডাঙ্গের বন্ধু ও তথাকথিত প্রাইভেট সেক্রেটারি বাসুদেব জোশীর কথা আগে বলেছি। তিনি ডাঙ্গের একজন একনিষ্ঠ প্রচারক ছিলেন। এই প্রচারের প্রভাবে জি. জি. জোগ বিশেষভাবে এগিয়ে আসেন। তিনি কানপুরের বাশিন্দা একজন মহারাষ্ট্রীয় ছিলেন। কমলা টাওয়ারে, অর্থাৎ জুগ্‌গিলাল কমলপতের ফার্মে ভালো চাকরী করতেন। কানপুরে তিনি

কংগ্রেসেরও একজন নেতা ছিলেন। তাঁকে নিয়ে এবং আরও কাকে নিয়ে বাসুদেব জোশী একটি ডিফেন্স কমিটি করেছিলেন। এই সব কিছুর সংস্রব ডাঙ্গের সঙ্গে ছিল। খুব সম্ভবত গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীও এই কমিটির সভ্য ছিলেন। তবে জোরের সঙ্গে কিছু বলতে পারব না। এই কমিটি একজন উকীলকে ইলাহাবাদ হতে নিযুক্ত করে আনলেন। তাঁর নাম ছিল পণ্ডিত কপিলদেব মালবীয়। তিনি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। কংগ্রেসের লোক হওয়ার কারণে, বা অন্য কোনো কারণে কিনা তা ঠিক বলতে পারব না, জোগদের সঙ্গে কপিলদেবের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁরা একান্তভাবে চাইতেন যে কপিলদেব আইনের ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করুন। জোগ সাহেব খোলাখুলি বলতেন, এ মোকদ্দমায় সাজা অবধারিত। যদি এর ভিতর দিয়ে কপিলদেব কিছু খ্যাতি অর্জন করেন তাতে কার কি ক্ষতি?

আমাদের উকীল-ব্যারিস্টার

এতক্ষণ উকীলের কথা বললাম। এবার ব্যারিস্টারের কথা কিছু বলি। মিস্টার মণিলাল ডক্টর (শাহ্) একজন ব্যারিস্টার। 'ডক্টর' তাঁদের পারিবারিক পদবী। আসল পদবী শাহ্। তিনি গুজরাতের, সম্ভবত বরোদা রাজ্যের লোক, অন্তত, বরোদায় বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ শিক্ষাবিভাগে চাকরি দিলেন না বলেই তাঁকে আইনের ব্যবসায়ে প্রবেশ করতে হয়েছিল। এই জন্য অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে সারা জীবন তাঁর ক্ষোভ ছিল। এম· এ·, এল· এল· বি পাস করাব পরে ভারতের একটি কোর্টে নাম লিখিয়ে ব্যারিস্টারী পাস করার জন্যে তিনি লণ্ডনে যান। সেখানে তিনজন ভারতীয় বিপ্লবী নেতা সাভারকর, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কাশীপ্রসাদ জয়সওয়ালের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। তিনি বলতেন তাঁদের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের রাজনীতি তিনি মেনে নিতে পারেননি। গান্ধীজীর পরামর্শে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। সেখানে তিনি ভালোই ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মচর্যের প্রশ্ন নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়ে যায়। তিনি বললেন অনেকগুলি সন্তান পয়দা করার পরে গান্ধীজীর ব্রহ্মচর্যে মতি হয়েছে। আর, তিনি তো সবে বিয়ে করেছেন, কিংবা বিয়ে যে করবেন সে করারে আবদ্ধ আছেন (আমার ভালো মনে নেই), তিনি কি ক'রে ব্রহ্মচারী হতে পারেন? মণিলাল গান্ধীজীর আশ্রম হতে বা'র হয়ে আসেন। তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, কিন্তু কোথাও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁকে তিষ্ঠতে দিলেন না। শেষ তিনি ছিলেন ফিজি দ্বীপে। সেখানে থেকেও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁকে বা'র করে দিলেন। তার পরে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। কানপুরে আমাদের মোকদ্দমা যখন চলছিল তখন তিনি ছিলেন বিহারের গয়াতে। আমি জানতাম ট্রেড্ ইউনিয়নের ব্যাপারে তাঁর আকর্ষণ ছিল। কিন্তু অবনী মুখার্জি যে তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে একত্রে ইশ্‌তেহার প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন, আমার গিরেফ্‌তারের সময় পর্যন্ত (১৭ই মে, ১৯২৩) এসবের কিছুই আমি জানতাম না। জীবনে আইনের ব্যবসায় করতে গিয়ে তিনি যেমন অকৃতকার্য হয়েছিলেন তেমনই রাজনীতি করতে গিয়েও তিনি অত্যন্ত ঘোলাটে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সোজা মানুষ ছিলেন মণিলাল ডক্টর। কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা পরিচালনা করার মতো ব্যারিস্টার তিনি ছিলেন না। পণ্ডিত কপিলদেব মালবীয়ের যোগ্যতা যে বেশী ছিল তাও নয়।

আগেই বলেছি যে কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদের নিকটে আমি ৭৪০ টাকা রেখে গিয়েছিলেম। আমাদের মোকদ্দমায় আসামী পক্ষের সমর্থনে তিনি সেই টাকাটা খরচ করলেন। মণিলালকে নিযুক্ত করার জন্যে তিনিই আবদুল হালীমকে গয়ায় পাঠালেন। এই ভাবেই নিযুক্ত হলেন মণিলাল ডক্টর। শুধু দায়রা আদালতে মোকদ্দমা চালাবার জন্যেই তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পাঁচ শ' টাকায়, না, ছ'শ টাকায় তাঁর সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল তা আমার মনে নেই, তবে তিনি চারজন আসামীর জন্যেই নিযুক্ত হয়েছিলেন। কানপুরের বন্ধুরা (জি· জি· জোগ ও বাসুদেব যোশী প্রভৃতি) যে কপিলদেবকে নিযুক্ত করেছিলেন সে কথার উল্লেখ আগে করেছি।

লণ্ডনে পড়ার সময়ে লাহোরের ব্যারিস্টার মিস্টার জীবনলাল কাপুর (পরবর্তীকালে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি) আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনিও সেশন্স কোর্টে আমাদের পক্ষ সমর্থনের ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে মণিলাল ডক্টরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

মিস্টার জিন্নাহ্‌কে ব্রীফ্‌ দেওয়ার চেষ্টায় অসফল

আমাদের আন্দোলন আন্তর্জাতিক। তাই, দেশের বাইরে, লণ্ডনেও একটি ডিফেন্স কমিটি গঠিত হয়েছিল। চার্লস্‌ আশ্‌লী হয়েছিলেন এই কমিটির সম্পাদক। চার্লস আশ্‌লীর কথা আমি আগে বলেছি। জর্জ ল্যান্সবারিও আমাদের ডিফেন্সের ব্যাপারে আগ্রহশীল ছিলেন। লণ্ডন হতে বন্ধুরা, মিস্টার মার্মাডিউক পিক্‌থলের মারফতে কিনা তা জানিনে, কিংবা লণ্ডনের কোনো সলিসিটর ফার্মের মারফতেও হতে পারে, এই মোকদ্দমায় আসামীদের তরফেব ব্রীফ নেওয়ার জন্যে মিস্টার এম· এ· জিন্নাহ্‌কে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি ব্রীফ নিতে অস্বীকার করেননি, কিন্তু ফিস দাবী করেছিলেন দু'হাজার পাউণ্ড (ত্রিশ হাজার টাকা)। মিস্টার সি· অলস্টনের দৈনিক ফিস ছিল এক হাজার টাকা। এই হিসাবে জিন্নাহ্‌ ফিস কিছু বেশী দাবী করেননি। তবে রাজনীতিক মোকদ্দমায় আসামী পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে উকীল-ব্যারিস্টাররা যে সহানুভূতি দেখিয়ে থাকেন কমিউনিস্ট বন্দীদের ব্যাপারে তা দেখাতে মিস্টার জিন্নাহ্‌ প্রস্তুত ছিলেন না। এ ব্যাপারে তিনি শ্রেণী-সচেতন ব্যক্তি ছিলেন।

মিস্টার আই· বি· সেনকে এম· এন· রায়ের ব্রীফ্‌ দেওয়ার চেষ্টা

মানবেন্দ্রনাথ রায় আবার আর এক কাণ্ড করেছিলেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার মিস্টার আই· বি· সেনকে (ইন্দুভূষণ সেন) খবর পাঠিয়েছিলেন যে মিস্টার সেন যেন তাঁর পক্ষে কানপুরের আদালতে উপস্থিত থাকেন। মানবেন্দ্রনাথ যখন দেশে ছিলেন তখন বোধ হয় আই· বি· সেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। থাকলে কখনও তিনি তাঁকে ফৌজদারী (Criminal) মোকদ্দমায় আদালতে উপস্থিত হতে বলতেন না। মিস্টার আই· বি· সেন কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়ানী বিভাগে (Civil Side-এ) প্রাক্‌টিস করতেন। জিহ্বায় কিঞ্চিৎ জড়তা ছিল বলে তিনি কখনও কোর্টে দাঁড়িয়ে মোকদ্দমার সওয়াল-জওয়াব করতেন না। কিন্তু মোকদ্দমার আরজির মুসাবিদা তৈয়ার করার ও আরজির জওয়াব লেখার কাজে তিনি অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন। এই জন্যেই

কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর নাম ছিল। মোট কথা, রায়ের পক্ষে দাঁড়াবার জন্যে মিস্টার আই· বি· সেন কানপুরে আসেননি।

জেলখানায় আমাদের মতি এক ছিল না। ডাঙ্গের ধারণা ছিল যে আমরা তাকে সন্দেহ করি। সে আমাদের সঙ্গে বিনা বিচারে বন্দী হয়নি, সে রয়টারের টেলিগ্রাম করা আমাদের প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে তার কাগজে লিখেছিল, এসব আমার ভালো লাগেনি। সে চতুর্থ কংগ্রেসের ডেলিগেটদের রাহাখরচের টাকা পেয়েও কাউকে পাঠাবার চেষ্টা করেননি। মোটা টাকা নিজে হজম করেছে, বোম্বে গবর্নমেণ্ট তার বিরুদ্ধে কিছুতেই মোকদ্দমা করতে চাননি,—বলেছেন, বাইরে থাকলে সে তাঁদের খবরের উৎস হবে। এ সব ডাঙ্গে জানত এবং ভাবত আমরাও বুঝি সব কিছু জানি। আমরা তাকে সন্দেহ করছি ভেবে সে মনে মনে সর্বদা পীড়া বোধ করত। কিন্তু ডেলিগেটদের রাহাখরচের টাকা নিয়ে সে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আর বোম্বে গবর্নমেণ্ট যে তাকে জেলের বাইরে রাখার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেও সফল হয়নি, সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া যে কোনো কথাই শুনতে চাননি, এসবের আমরা কিছুই জানতেম না।

একের সঙ্গে অন্যের ঝগড়া লাগাবার কাজে **নলিনী গুপ্ত** ছিলেন দক্ষ শিল্পী। আমরা তাঁর নিকটে এই জন্যে ঋণী যে তিনি আমাদের চারজনের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া বাধিয়ে আমাদের জীবন বিষময় ক'রে তোলেননি। কোথায় কোথায় কিভাবে কার সঙ্গে কার ঝগড়া তিনি বাধিয়েছেন সে সকল গল্প তিনি আমাদের নিকটে করতেন। সেই সময়ে তিনি এই কথাও আমাদের বলেছিলেন যে তিনিই এম· এন· রায়ের সঙ্গে **সুরেন্দ্রনাথ করের** ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছিলেন, যার ফলে এন· এন· রায়কে ছেড়ে সুরেন কর ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তদের দলে চলে গেলেন।

জেলে আমাদের মতিগতি

শওকত উস্‌মানী ১৯২১ সালে প্রথমবার ভারতে ফেরাব সময়ে গোপনে আবদুর রব ও আচার্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এসেছিল। তাঁদের সঙ্গে সে ওয়াদা করে এসেছিল যে তাঁদের হয়েই সে ভারতে সাংগঠনিক কাজ করবে। জানাজানি হয়ে যাওয়ার পরে উস্‌মানী রায়ের নিকটে ক্ষমা চায়। নলিনী গুপ্ত এসব কথা তুলে উস্‌মানীকে খোঁচাতেন। শুয়ে পড়ে ঘুমের ঘোরে কথা বলার ভান ক'রে উস্‌মানী বলত, "বড় ঘরে গিয়ে একবার দেখে নেব"। 'বড় ঘর' মানে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল।

আমার নিজের কথা নিজে আমি কেমন করে বলব? তবে মনে হয় কোনো অশোভন ব্যবহার আমি করিনি।

আসামী ভাগাভাগি

আগেই বলেছি, মণিলাল ডক্টর ও কপিলদেব মালবীয় আমাদের পক্ষের আইনজীবী নিযুক্ত হলেন। আসামী ভাগাভাগি না হলে কোর্টের নিয়মানুসারে মণিলাল ডক্টর হতেন সিনিয়র আইনজীবী, আর কপিলদেব জুনিয়র। ডাঙ্গের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে জি· জি· জোগ দু'জন আইনজীবীকে স্ব স্ব প্রধান ক'রে দিলেন। তাতে আমার অন্তত কোনো আপত্তি ছিল না কিন্তু যে ভাবে আসামী তাঁরা ভাগ করলেন তাতে উস্‌মানী আর আমার মাথা কাটা গেল। আমরা দু'জন

পড়লাম মণিলাল ডক্টরের ভাগে, আর নলিনী গুপ্ত ও ডাঙেগ পড়ল পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত কপিলদেব মালবীয়ের ভাগে। অন্য ভাবে ধরলে হিন্দু নামধারী কলকাতার নলিনী গুপ্ত ও বোম্বের শ্রীপাট অমৃত ডাঙেগ পড়ল এক ভাগে, আর মুস্‌লিম নামধারী কলকাতার মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কানপুরের শওকৎ উস্‌মানী পড়ল অপর ভাগে।১ ডাঙেগই তার বন্ধু বাসুদেব হরি জোশী ও জি. জি. জোগকে দিয়ে এই বিভাগটি করিয়েছিল। হঠাৎ জেলখানায় ডাঙেগ আর নলিনীর ভিতরে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। শুধু হিন্দু নাম হওয়ার কারণে কলকাতার একজন আসামী ও বোম্বের একজন আসামী এক ভাগে পড়ল। মুসলমান নামধারী হওয়ায় কলকাতার একজন ও কানপুরের একজন পড়ল অপর ভাগে। অনায়াসে কলকাতার দু'জন একই ভাগে পড়তে পারত, অন্য দু'জন অন্যভাগে পড়লে কিছুই ক্ষতি হতো না, তাতে কারুর সাজা কম বা বেশী হতো না। কিন্তু আমাদের সকলের মুখ রক্ষা পেত। এই ব্যবস্থা ক'রে জোগেরা পণ্ডিত কপিলদেব মালবীয়কে যত খুশী ওপরে ঠেলে তুলতে পারতেন। তবে কপিলদেব নিতান্ত জুনিয়র উকীল ছিলেন। হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস করার অধিকারও তখন তাঁর ছিল না। যাই হোক এভাবেই দায়রা আদালতে আমাদের মোকদ্দমা শুরু হলো।

এখানে প্রাসঙ্গিক নয়, তবুও আমি কয়েকটি কথা এখানেই বলে রাখতে চাই। যখন আমি স্টেট্‌ প্রিজনার ছিলেম তখন বাইরের সঙ্গে আমার যোগাযোগ কমই ছিল। আবদুল হালীম কলকাতায় আছে কিনা তাও জানতেম না। তাই কানপুর যাওয়ার দু'চার দিন আগে কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেল হতে কীর্নাহারে তার বাড়ীর ঠিকানায় পত্র লিখেছিলেম। মণিলাল ডক্টর আমাদের ব্রীফ্‌ গ্রহণ করার পর কানপুর জেলে এসে প্রথম যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন তখন তাঁর মুখে শুনলাম যে আবদুল হালীম তাঁকে মোকদ্দমার ব্রীফ্‌ দেওয়ার জন্যে গয়া গিয়েছিল। শুনে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেম যে অশেষ দুঃখ-কষ্টের ভিতরে থেকেও সে ভেঙে পড়েনি। তার পরে আমাদের মোকদ্দমা চলার সময়ে দু'বার কানপুরে গিয়ে আবদুল হালীম আমাদের সঙ্গে দেখাও করেছিল।

আমি যখন স্টেট্‌ প্রিজনার ছিলেম তখন সব চেয়ে বেশী দিন ছিলেম ঢাকা সেন্‌ট্রাল জেলে। এই ঢাকায় হঠাৎ একদিন একটা ইয়ার্কি শুরু হলো। লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল টমসন নামে এক ব্যক্তি বাঙলা দেশের কারাসমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেল ছিলেন। তাঁর জেলে থাকা ছাড়া তাঁর সঙ্গে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনের বন্দীদের অন্য কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁদের জন্যে সব

---

১ কানপুর ডিস্‌ট্রিক্ট জেলে আমরা (নলিনী, ডাঙেগ, উস্‌মানী ও আমি) যখন একত্র হয়েছিলেম তখন নলিনী আর ডাঙেগ আমাদের বুঝতে দিয়েছিল যে যে ১৯২৩ সালে বোম্বেতে তাদের দেখা হয়নি। অনেক পরে ১৯৬৪ সালে পুলিসের নিকটে দেওয়া নলিনীর বিবৃতি পড়ে বুঝেছি যে ডাঙেগর সঙ্গে বোম্বেতে ১৯২৩ সালে নলিনীর দেখা হয়েছিল। ডাঙেগর এম. এন. রায়কে লেখা পত্র হতেও তা বোঝা যায়। আবার ১৯৬৪ সালে ফলাও করে ডাঙেগ যে বক্তৃতা দিয়েছে তাতে সে বলেছে সে তো নলিনীকে বাঁচিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিল কিন্তু মুজফ্‌ফরের রক্ষণাবেক্ষণে থেকে কলকাতাতেই নলিনী গিরেফ্‌তার হলো! মিথ্যাবাদীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ডাঙেগ জানত নলিনীর কলকাতায় আসার অনেক আগে হতেই মুজফ্‌ফর জেলে ছিল।

দায়-দায়িত্ব জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের। খাওয়া-পরার ও অন্য সব খরচ বহন করবেন ভারত গবর্নমেণ্ট। বাঙলা দেশের গবর্নমেণ্ট কিন্তু ভারত গবর্নমেণ্টকে জানিয়ে দিলেন যে সব খরচ তাঁরাই বহন করবেন। এর পেছনে টমসনের ইয়ার্কি ছিল।

১৯২৩ সালের ৮ই জুন তারিখে তিন জনকে (মুজফ্ফর আহ্মদ, শওকত উস্মানী ও গুলাম হুসয়নকে) ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বন্দী করে রাখার 'অর্ডার ইন-কাউন্সিল' লর্ড রেডিং দস্তখৎ যে করেছিলেন একথা আমি আগে বলেছি। তখন আমি কলকাতা পুলিসের লালবাজার লক্-আপে ছিলেম। সেখান থেকে আমাকে লালবাজার পুলিস আফিসে নিয়ে এসে ভারত গবর্নমেণ্টের হোম সেক্রেটারি মিস্টার জে. ক্রেরাবের দ্বারা স্বাক্ষরিত এই অর্ডারটি ১৯২৩ সালের ১৬ই জুন তারিখে আমার উপরে জারী করা হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল যে আমাকে কলকাতার আলীপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে বন্দী হয়ে থাকতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে আলীপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আলীপুর জেলে তখন আন্দামান ফেরৎ ১৫/১৬ জন দীর্ঘমিয়াদী বন্দী ছিলেন। জেলে তাঁরা বিশেষ ব্যবহার পেতেন। তাঁদের জন্যে পৃথক রান্নাঘরও ছিল। আমার খাওয়া সেখান থেকে আসতে লাগল। তেমন খারাব খাওয়া নয়, মাছ-মাংস থাকত। ২৪ পরগনার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার লজ আমায় বললেন, তোমার জন্যে তোমার ওয়ার্ডে রান্নাঘর তৈয়ার করে দেওয়া হবে, এখানেই হবে তোমার রান্নাবান্না, ওখানকার ওঁদের খাওয়ায় তোমার চলবে কেন? আমি বললাম, ওই খাওয়াতেই আমার চলবে। আমি দীর্ঘমিয়াদী রাজনীতিক কয়েদীদের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত হতে চাইনি। কর্তৃপক্ষ আমার কথা মেনে নিলেন বটে, কিন্তু ভারত গবর্নমেণ্টকে জানিয়ে দিলেন যে মুজফ্ফর আহ্মদের জন্যে তেমন কোনো খরচ নেই,—তার বিল উঠেছে (সম্ভবত ১৬ই জুন হতে ৩০শে জুন পর্যন্ত) মাত্র উনিশ টাকা দু'আনা। যাই হোক, এই ভাবে আলীপুর জেলে আমার তিন মাস নয় দিন কেটে গেল। এই সময়টা সারা বাঙলায় আমিই ছিলেম একমাত্র স্টেট্ প্রিজনার।

আমার তিন মাস কেটে যাওয়ার পর দশম দিবসে, ১৯২৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে আরও কয়েকজন স্টেট্ প্রিজনার কলকাতার আলীপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে এলেন। তাঁদের ভিতরে ছিলেন ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, ভূপতি মজুমদার, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুপ্ত, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ভট্টাচার্য, রবি সেন, অমৃতলাল সরকার ও রমেশ চৌধুরী। যতটা মনে পড়ে এঁদের মধ্য থেকে কয়েকজন সেদিনই বা তার পরের দিন মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলী হয়ে গেলেন। আমি বদলী হলাম ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে।

বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই, এমনভাবেই আমার দিনগুলি কাটছিল ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। এখানেও একা আমিই রয়েছি স্টেট্ প্রিজনার। তবে, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী এসেছিলেন অনেক পরে।

কাজী ইমদাদুল হকের ভালোবাসার পরিচয়

এখানে একদিন সকাল বেলা (সতীশ বাবু আসার অনেক আগে) জেল কর্তৃপক্ষ আমায় জানালেন যে তাঁরা গবর্নমেণ্ট হতে একটি নির্দেশ পেয়েছেন।

তাতে বলা হয়েছে যে স্টেট প্রিজনারদের জেলের খাওয়ার দেওয়া হবে। কিন্তু প্রিজনার যদি ইচ্ছা করেন তিনি বাইরে থেকে খাওয়ার ও অন্যান্য জিনিস আনাতে পারেন। কারাসমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেল কর্নেল টমসন বেঙ্গল হোম ডিপার্ট-মেণ্টের কোনো তরুণ ইংরেজ অফিসারের সই নিয়ে এই কাজ করেছিলেন। একা আমি কি করব বুঝতে পারছিলেম না। ভরোসা এই ছিল যে অন্যান্য জেলে অন্য স্টেট প্রিজনাররা রয়েছেন। তাঁরা নিশ্চয় লড়বেন। সেদিন আমি কিছুই খেলাম না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপটেন বি. জি. মালিয়া বলেন, তাঁর বিশ্বাস যে এই অর্ডারটি শীঘ্রই তুলে নেওয়া হবে। তুমি অসুস্থ। তোমার খাওয়া আমরা হস্‌পিটাল থেকে পাঠাব। বাইরে যদি তোমার চেনা কেউ থাকেন, চা-এর ব্যবস্থাটা তুমি বাইরে থেকে ক'রে নাও। তোমার পত্র আমরা স্পেশাল মেসেঞ্জারের মারফতে পাঠিয়ে দেব। ১৯২৩ সালে ঢাকার সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। সরকারী চাকুরে নন, এমন কোনো লোকের নাম মনেও করতে পারছিলেম না। কোনো ছোট চাকুরিয়াকে লিখলে তিনি হয়তো বিপদে পড়বেন। সেকেণ্ডারী এণ্ড হায়ার সেকেণ্ডারী বোর্ড অফ এডুকেশনের সেক্রেটারি খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক্‌কে একখানি পত্র লিখে দিলাম। ভাবলাম আর যাই হোক তাঁর বড় চাকরীটি যাবে না। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিতে তিনি আমার সহকর্মী ছিলেন। তখন তিনি কলকাতা ট্রেনিং স্কুলের (নর্মাল স্কুলের) হেড মাস্টার ছিলেন। তাঁর বাসায় আমাদের যাতায়াত ছিল। তাঁর বড় ছেলেকে (ডাক নাম আফজল ছিল) অনেক কোলেও করেছি। আমার পত্র পাওয়া মাত্রই কাজী সাহেব এক টিন লিপটনের চা, বড় এক টিন হাণ্ট্‌লি পামারের ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট, এক সের চিনি ও দুধের টিন পাঠিয়ে দিলেন। পুলিসের ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে অনেক বিরূপ মন্তব্য লিখে রাখতে পারেন এই ভাবনাকে তিনি সেদিন অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাঁর এই ভালবাসার স্মৃতি কোনো দিন আমি ভুলতে পারিনি। একথা মনে পড়লেই আমি আজও অভিভূত হয়ে পড়ি।

অল্প কয়েক দিনের ভিতরেই উল্লিখিত অর্ডার উঠে গিয়েছিল। আমাদের খাওয়ার বাবতে গবর্নমেণ্ট দৈনিক একটাকা চার আনা হিসাবে বরাদ্দ ক'রে দিয়েছিলেন।

দায়রা আদালতের সুদীর্ঘ বিবরণ আমি এখানে দিতে চাই না। মোকদ্দমার বাদী কর্নেল কে' আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার জবানবন্দী দিয়েছিলেন এবং বিবাদী পক্ষ হতে তাঁর জেরাও (cross examination) করা হয়েছিল। তখন তাঁর একটি উক্তিতে কিঞ্চিৎ খটকা বেধে যায়। তিনি বললেন মাদ্রাজ পুলিস হতে তিনি যে রিপোর্ট পেয়েছিলেন তাতে নলিনী গুপ্ত ১৯২১ সালের ২৪শে নবেম্বর তারিখে ধনুষ্কোডি অতিক্রম করেছিলেন। নলিনী বলেছিলেন ২৪শে নবেম্বর নয়, ২৪শে ডিসেম্বর। বিদেশ হতে কলম্বো হয়ে যাঁরা ভারতে আসেন তখন তাঁদের ভারতের যে স্থানে প্রথম প্রবেশ করতে হয় তার নাম ধনুষ্কোডি। এখানে যাত্রীদের নাম রেজিস্টারে তোলা হয়, তাঁদের পাসপোর্ট ভালো করে দেখা হয়, আর শুল্ক বিভাগও তখন যাত্রীদের মাল পরীক্ষা করেন।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে গিরেফ্‌তার হওয়ার পরে সেই মাসেরই ২২শে তারিখে নলিনী পুলিসের নিকটে বলেছেন যে তিনি ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে ভারতে আসার জন্যে বার্লিন হতে ট্রেনে মার্সাই যান। সেখানে ব্রিটিশ কন্‌সুলেটে গিয়ে তিনি প্রথমে তাঁর ব্রিটিশ পাসপোর্টখানি নূতন (renewed) করে নিলেন। তারপরে ফরাসী যাত্রী জাহাজ আউকরের (Aukor)

যাত্রী হয়ে তিনি কলম্বো যাত্রা করেন। কোন্ তারিখে Aukor মার্সাই ছেড়েছিল একথা নলিনীর বিবৃতিতে নেই। তবে তখনকার দিনে মার্সাই হতে এগারো দিনে ফরাসী যাত্রী জাহাজ কলম্বো পৌঁছাতো। যে তারিখেই তিনি মার্সাই ছাড়ুন না কেন জাহাজ কলম্বো পৌঁছাবার আগে নলিনীর এপেন্ডিক্সের বেদনা আরম্ভ হয়। কাজেই জাহাজ জেটিতে ভেড়া মাত্রই নলিনীকে কলম্বো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তাঁর অপারেশন হয় এবং ছয় সপ্তাহ হাসপাতালে থেকে তিনি ছাড়া পান। এই সব কিছু হিসাব ক'রে ১৯২১ সালের ২৪শে নবেম্বর তারিখে নলিনীর পক্ষে ধনুষ্কোডিতে পৌঁছা সম্ভব ছিল।

এ নিয়ে আমার এত হিসাব করার কারণ আছে। আমারও ধারণা ছিল, ১৯২১ সালের নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নলিনী কলকাতা পৌঁছেছিলেন। আমি কোনো কোনো জায়গায় তা লিখেওছি। কিন্তু পুলিসের নিকটে দেওয়া নলিনীর বিবৃতি পড়ে আমার সব ধারণায় ওলট-পালট হয়ে যায়। আমায় ধরে নিতে হলো যে নলিনী ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় পৌঁছে-ছিলেন, নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নয়। কিন্তু আমি যদি সেপ্টেম্বর মাসকে হিসাবে নাও ধরি তাহলেও অক্টোবর (১৯২১) মাসের শেষ তিন সপ্তাহ ও নবেম্বর মাসের প্রথম তিন সপ্তাহ কলম্বো মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে থাকার পরে নলিনী অনায়াসে ২৪শে নবেম্বর (১৯২১) তারিখে ধনুষ্কোডিতে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। তা না হলে ২৪শে ডিসেম্বরের (১৯২১) আগেকার দিনগুলিতে তিনি কোথায় ছিলেন এবং কি করছিলেন? কলম্বো হতে মাদ্রাজ পৌঁছাতে লাগে মাত্র একদিন।

মোটের ওপরে দায়রা আদালতে মোকদ্দমার শুনানির দিনগুলি একে একে শেষ হয়ে গেল। তারপরে সেশন্স জজ্ হোম তার রায় লেখার জন্য কয়েক দিন সময় নিলেন। প্রথমে তিনি ১৬ই মে রায় শোনাবার দিন ধার্য করেছিলেন। তারপরে সেই তারিখটি পালটে দিয়ে তিনি ২০শে মে (১৯২৪) তারিখে রায় শোনানোর দিন স্থির করলেন। এই ২০শে তারিখে কোর্টে গিয়ে আমরা দেখলাম আসামীদের যাতে 'লু' না মারতে পারে তার জন্যে যে খস্‌খসের বেড়া দুয়ারে দেওয়া হয়েছিল তা আর নেই, কোর্টের ঘর শূন্য। শুধু জজ্, তাঁর পেশকার, আর্দালি ও দু'চার জন পুলিস রয়েছেন। উকীল-ব্যারিস্টার কেউ কোথাও নেই, সম্ভবত কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। ডাঙ্গের বন্ধুরাও এসে পৌঁছাতে পারেননি।

মিস্টার হোম (Holme) তাড়াতাড়ি তাঁর রায় শুনিয়ে দিলেন যে শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গে, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, শওকত উস্‌মানী ও নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত এই চার জনের প্রত্যেককে চার বছর কারাগারে কঠোর দণ্ড ভোগ করতে হবে। এই দণ্ডাজ্ঞা দ্রুত উচ্চারণ করেই তিনি পুলিসের লোকদের বললেন, "আসামীদের এখনই জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

সেই সময়কার কানপুর ডিস্‌ট্রিক্ট জেলের জেলর, খান সাহেব আমানতুল্লাহ্ শুনেছি ইলাহাবাদ জিলার নাইনীর লোক ছিলেন। ওয়ার্ডারদের মুখে শুনেছি, ওয়ার্ডাররূপেই তিনি প্রথমে জেলের চাকরীতে ঢুকেছিলেন। তার পরে কাজ করতে করতে জেলর হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইংরেজি লেখাপড়াও শিখে-ছিলেন। উনিশ শ' ত্রিশের যুগে কারাসমূহে যখন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীপ্রথা প্রবর্তিত হয় তখন যুক্ত প্রদেশে (উত্তর প্রদেশে) ফয়জাবাদ ডিস্‌ট্রিক্ট জেলকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের জন্যে নির্দিষ্ট বিশেষ জেলে পরিণত

করা হয়। খান সাহেব আমানতুল্লাহ্ তার আগেই খান বাহাদুর হয়েছিলেন এবং তিনি হয়েছিলেন ফয়জাবাদ স্পেশাল জেলের প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

যাক, এখন আমাদের কথা বলি। কোর্ট হতে ফেরা মাত্রই খান সাহেব আমানতুল্লাহ্ আমাদের ইউ· পি· জেলের সাধারণ কয়েদীদের খাটো জাঙিগয়া ও খাটো কুর্তা পরিয়ে দিলেন। গলায় লোহার হাঁসুলি ও পায়ে লোহার কড়া পরানো তখনও বাকী রাখলেন। সকলে বুঝতে পারছেন যে দায়রা জজ্ জেলে আমাদের প্রতি বিশেষ ব্যবহারের কোনো সুপারিশ করেননি। তিনি যে আমাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের চরম দণ্ডে দণ্ডিত করেননি এটাই ছিল আমাদের সৌভাগ্য। পরে খান সাহেব আমাদের কাগজপত্র নিয়ে তাঁর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাড়ী হয়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট লিখে দিলেন যে গবর্নমেণ্টের মঞ্জুরী সাপেক্ষভাবে আমাদের চারজন কয়েদী জেলে First Class Misdemeanant (ফার্স্ট ক্লাস মিস্‌ডিমিন্যাণ্ট) রূপে গণ্য হবেন। আমি কখনও খবর নিইনি। হয়তো ব্রিটেনের জেলে এই রকম একটি নিয়ম প্রবর্তিত আছে। খিলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলনের যুগেও বোধ হয় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি এই রকম ব্যবহার করা হতো। উনিশ শ' বিশের দশকে জেলে শ্রেণী-বিভাগের প্রবর্তন হয়নি। যাঁরা কোনো ঘৃণিত অপরাধ (felony) করেননি তাঁদেরই মিস্‌ডিমিন্যাণ্ট বলা হয়। যে ক'দিন আমরা কানপুর জেলে মিস্‌ডিমিন্যাণ্ট ছিলাম সেই ক'দিন আমরা নিজেদের পোশাক পরতাম এবং আমাদের খাওয়া-দাওয়াও অপেক্ষাকৃত ভালো দেওয়া হতো।

এই ব্যবস্থা অল্প দিন চলেছিল। শেষ পর্যন্ত গবর্নমেণ্ট হতে খবর এলো যে 'বলশেভিক কয়েদী'রা (আমাদের 'বলশেভিক কয়েদী'ই বলা হতো) জেলখানায় কোনো বিশেষ ব্যবহার পাবে না। তারা সাধারণ কয়েদীদের (convicts) পর্যায়ে অবনমিত হবে। এবার আমরা গলায় লোহার হাঁসুলি, এক পায়ে লোহার কড়া, খাটো কুর্তা ও খাটো জাঙিগয়া পরে সত্য সত্যই সাধারণ কয়েদী হলাম। কিন্তু হলে কি হবে, আমাদের সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে ভিড়িয়ে দেওয়া হলো না।

আমরা জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বললাম, বিশেষ ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা নিজেরা গবর্নমেণ্টকে কোনো দরখাস্ত পাঠাইনি। এবারে আমরা নিজেরা দরখাস্ত পাঠাব। আমাদের লেখার সরঞ্জাম দেওয়া হোক। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। দরখাস্ত আর পাঠাতে দেওয়া হবে না। এর প্রতিবাদে আমরা অনশন ধর্মঘট করলাম। আগে হতেই আমাদের চারজনকে চার বিভিন্ন জেলে বদলী করার হুকুম এসে গিয়েছিল কিনা জানিনে, সেদিনই বিকাল বেলা আমরা বদলী হলাম। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ রায়বেরেলি ডিস্ট্রিক্ট জেলে, শওকত উস্‌মানী বেরেলি ডিস্ট্রিক্ট জেলে, শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গে সীতাপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে ও নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত গোরখ্‌পুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে বদলী হলেন। কানপুর জেল ছাড়ার আগে ডাঙ্গে ও নলিনী খেয়ে নিয়েছিল। উস্‌মানী আর আমি না খেয়েই রওয়ানা হলাম। কিন্তু আমাদের হিস্টরি টিকিটে লেখা হলো না যে আমরা না খেয়ে আছি। রায়-বেরিলি জেলে পৌঁছে আমি আরও দু'দিন না খেয়ে থাকলেম। তার পর সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এসে আমায় গবর্নমেণ্টের নিকটে বিশেষ ব্যবহার পাওয়ার দাবী ক'রে দরখাস্ত পাঠানোর অনুমতি দেওয়ায় আমি অনশন ত্যাগ করলাম। আমার এই দরখাস্তখানা ন্যাশনাল আরকাইব্‌স্ অফ ইণ্ডিয়াতে আছে। বলা বাহুল্য, আমাদের বিশেষ কয়েদী হিসাবে আর ব্যবহার করা হয়নি।

দণ্ডিত হওয়ার পরে আমরা যে ক'দিন কানপুর জেলে ছিলাম তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলি।

ডাঙ্গে বলল, সে এম. এন. রায়কে চারখানা মাত্র পত্র লিখেছে। তার জন্যে একেবারে চার বছরের কারাদণ্ড! ডাঙ্গে আরও বলল নলিনীর পক্ষে চার বছরের দণ্ড ভোগ সার্থক হবে। তিনি দেশ-বিদেশ দেখেছেন, মস্কো গেছেন এবং কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের তৃতীয় কংগ্রেসও দেখেছেন। ডাঙ্গে আরও বলল, সে রায়ের নিকট হতে মাত্র পঞ্চাশ পাউণ্ড পেয়েছিলেন। কেন পাঠালেন রায় এই টাকা? সে তো কোনো টাকা কোনো দিন চায়নি। তাকে হাজার হাজার টাকা দেওয়ার লোক রয়েছেন। অর্থাৎ, রণছোড় দাস ভবন লোটবালার কথা বলছিল ডাঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে ডাঙ্গে চারখানির অনেক বেশী পত্র লিখেছিল এবং পঞ্চাশ পাউণ্ডের অনেক বেশী টাকাও পেয়েছিল। সে সব এখন রেকর্ডে পাওয়া যায়।

অন্য একদিন রাত্রে ডাঙ্গে বলল, এই চার বছর সাজার জন্যে আমি আমার স্ত্রীকে হারিয়েছি (I have lost my wife)। আমরা সকলে আহা হা করে উঠলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, কবে ঘটল এ দুর্ঘটনা? ডাঙ্গে বলল, না, মরেনি। একটি মেয়ে আমার বাগ্‌দত্তা ছিল, সে কি আর চার বছর অপেক্ষা করবে?

আমরা বললাম, করবে।

সে মেয়েটি সত্যই অপেক্ষা করেছিলেন। উষাবাঈ তাঁর নাম, বিধবা মেয়ে। হয়তো বাল বিধবা।

নলিনী গুপ্ত বলল, আমার শরীরে নানান ব্যাধি। দু' বছরের সাজা হলে বেঁচে থাকলেও থাক্‌তে পারতেম। চার বছর বেঁচে থাকা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

ডাঙ্গে আর নলিনীর মধ্যে বন্ধুত্ব তো বাড়ছিলই, এই ক'দিনে তা দানা বেঁধে উঠল।

হাই কোর্টে আপীল

দায়রা আদালতে আমাদের বিচার ও সাজা হয়ে গেল, এখন হাই কোর্টে আপীল করার পালা। কিন্তু কে করবেন আপীল, কোথায় পাওয়া যাবে টাকা, আর কে হবেন আমাদের তরফের উকীল-ব্যারিস্টার? এই মোকদ্দমার আপীলে সাজা কমে যাবার সম্ভাবনা ছিল। ব্রিটিশ বৈদেশিক মন্ত্রী লর্ড কর্জনের প্রেরণায় মোকদ্দমাটি হয়েছিল। রুশরা ভারতে বলশেভিকবাদ প্রচার করছেন এটা ব্রিটিশ সমস্ত জগতের নিকটে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। গবর্নর জেনেরেলের এক্‌জেকিউটিব কাউন্সিলের হোম মেম্বর সার মালকম হেইলী বাঙলার এড্‌ভোকেট জেনেরেল মিস্টার এস. আর. দাশকে লিখেছিলেন যে এই মোকদ্দমায় তাঁরা আসামীদের সাজা চান, কিন্তু কঠোর সাজা চান না। তাঁরা পৃথিবীকে দেখাতে চান যে বলশেভিকবাদ ভারতে অনুপ্রবেশ করছে এবং আরও প্রমাণ করতে চান যে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনের প্রয়োগ ক'রে তাঁরা কোনো অন্যায় কাজ করেননি। সার মালকম হেইলীর পত্রের এই উক্তি ছাড়াও আমরা দেখেছি যে পেশোয়ারের মতো নিষিদ্ধ স্থানে মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় বেশীর ভাগ আসামীর এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল, দু'জন আসামীর মাত্র হয়েছিল দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

হাই কোর্ট আপীলের ব্যাপারে আমাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল এই যে একজন

ভালো উকীল বা ব্যারিস্টারকে নিযুক্ত করা হোক। কপিলদেব মালবীয় হাই কোর্টের উকীল ছিলেন না। কাজেই হাই কোর্টেও তিনিই নিযুক্ত হবেন একথা তখন উঠেইনি। মণিলাল ডক্টর ছিলেন ব্যারিস্টার। যে কোনো কোর্টে তাঁর দাঁড়াবার অধিকার ছিল। আমরা চাইনি যে হাই কোর্টে তিনিই আপীলের তদবীর করুন।

আমাদের মনের এই অবস্থায় একদিন নলিনী গুপ্ত আমায় অনুরোধ করলেন যে আমি যেন তাঁর তরফ হতে কলকাতার ব্যারিস্টার মিস্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে একখানি পত্র লিখে দিই। তাঁকে অনুরোধ করা হোক যে ইলাহাবাদ হাই কোর্টে এসে তিনি যেন কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আপীলের তদবীর করেন। ডাঙ্গের বন্ধুদের মনে যে অন্য কথা ছিল তখন আমি অন্ততঃ তা বুঝিনি। আমি প্রতিবাদ করলাম। বললাম, তাঁর ফিস দিতে হবে, তাঁর ইলাহাবাদ যাতায়াতের খরচ দিতে হবে এবং হোটেলে থাকার খরচও দিতে হবে। তিনি যদি ফিস নাও নেন, (কমিউনিস্টদের নিকট হতে ফিস না নেওয়ার কোনও কারণ ছিল না) তবুও মোটা টাকা খরচ হবে। সেই খরচ কে দেবেন? নলিনী বললেন, "আপনি ভাববেন না,—মিস্টার সেনগুপ্ত আমাদের আত্মীয়, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে"। বাঙলা দেশে হিন্দুদের ভিতরে বৈদ্যরা সংখ্যাল্প বর্ণ (Caste)। তাঁদের ভিতরে নাকি প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আত্মীয়তা! মিস্টার সেনগুপ্তকে পত্র লেখা হয়েছিল। নলিনী ধরেই নিয়েছিলেন যে তিনি আসবেন। কমরেড আবদুল হালীম যখন দেখা করতে এসেছিলেন তখন তাঁকেও তিনি বলে দিয়েছিলেন যে মিস্টার জে· এম· সেনগুপ্ত ইলাহাবাদ হাই কোর্টে আমাদের আপীলের তদবীর করতে আসছেন। শুনেছি কলকাতায় এ খবর রটেও গিয়েছিল।

আমরা কানপুর জেলে থাকতেই একদিন সকালে একখানি ওকালতনামা সই করার জন্যে জেলের ভিতরে আমাদের নিকটে পাঠানো হলো। ডাঙ্গের বন্ধুদের উদ্যোগে গঠিত ডিফেন্স কমিটি নিশ্চয় এই ওকালতনামা পাঠিয়ে দিয়ে থাকবেন। ওকালতনামায় ইলাহাবাদের বিখ্যাত এডভোকেট মিস্টার প্যারীলাল ব্যানার্জির নাম লেখা ছিল। আমরা এই ওকালতনামা সই করে দিয়েছিলেম। ৭ই জুলাই (১৯২৪) তারিখে আমাদের চারজনকে যে চার বিভিন্ন জেলে বদলী করে দেওয়া হলো এটা ছিল আইন বিরুদ্ধ কাজ। আপীল শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো কয়েদীকে অন্য জেলে বদলী করা নিয়ম বিরুদ্ধ। অবশ্য, যে শহরে আপীল আদালত অবস্থিত সেই শহরে বদলী করা যায়। কিন্তু আমাদের পাঠানো হলো দূরের দূরের চারটি জেলে। কলকাতার জেলে আমি বদলী হতে চেয়েছিলেমই, দ্বিতীয় দরখাস্তে বললাম আপীলের জন্যেও আমার কলকাতায় যাওয়া দরকার। সেখানকার বার হতেই আমায় আইনজীবী নিযুক্ত করতে হবে এবং কলকাতার অবস্থাপন্ন বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে টাকাও সংগ্রহ করতে হবে। একথাও আমি লিখেছিলেম যে আমার আপীলের নিষ্পত্তির জন্যে যদি আমার যুক্ত প্রদেশের জেলে থাকা দরকার তবে তো আমার কানপুর হতে রায়-বেরেলি ডিস্ট্রিক্ট জেলে না পাঠিয়ে ইলাহাবাদের কোনো একটি জেলে পাঠানো উচিত ছিল। আমার এই দরখাস্ত গবর্নমেণ্ট অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাঁরা বললেন আপীলের তদবীর করার জন্যে প্রাদেশিক বারেই বহু আইনজ্ঞ আছেন।

কোনো দিক হতে কোনো খবর পেলাম না। ৭ই জুলাই (১৯২৪) পর্যন্ত আমরা চারজনই একত্রে কানপুর জেলে ছিলেম। সেদিন পর্যন্ত নলিনীর পত্রের জওয়াবে তাঁর 'আত্মীয়' মিস্টার জে· এম· সেনগুপ্ত কোনো সাড়া দেননি।

নলিনীর মনে মাঝে মাঝে তাঁর সহজাত দুষ্ট বুদ্ধির উদয় হতো। সেই বুদ্ধি হতে তিনি মিস্টার সেনগুপ্তকে পত্র লিখেছিলেন কিনা কে জানে? হয়তো তাই।

ডাঙ্গে ও নলিনীর তখনকার মনের অবস্থা ছিল এই রকম যে আপীল দায়ের করলেও চলে, না করলেও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, তাঁরা ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে গবর্নমেণ্টের নিকটে আবেদন করেছিলেন। তাঁদের মনে ধারণা হয়েছিল যে তাঁদের মুক্তি সুনিশ্চিত। এই সম্বন্ধে আমি অন্যত্র বিস্তৃত ভাবে লিখব।

রায়-বেরেলিতে আমার অবস্থা ছিল শোচনীয়। আমি আমার বন্ধু কাজী নজরুল ইস্‌লামকে (বাঙলার প্রসিদ্ধ কবি) গোপনে একখানি পত্র লিখেছিলেম। এই পত্রখানি কর্তৃপক্ষের হাতে পড়ে যায়। তার জন্যে যুক্ত প্রদেশের কারাসমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেল আমায় কঠোর সাজা দেন। অর্থাৎ (১) আমি এক বছর জেলের কোনো 'রেমিশন' পাব না; (২) এক বছর বাইরে কাউকে কোনো পত্র লিখতে পাব না; (৩) এক বছর বাইরে থেকে কোনো পত্র গ্রহণ করতে পারব না; (৪) এক বছর কারুর সঙ্গে মুলাকত (Interview) করতে পারব না। এই প্রতিবন্ধকটি আমায় একটি অসহায় অবস্থার মধ্যে টেনে নিয়েছিল। তবে, আমার এই সাজাগুলি মোকদ্দমার আপীলের ব্যাপারে প্রযুজ্য ছিল না। এ ব্যাপারে উকীল-ব্যারিস্টাররা আমার সঙ্গে দেখা করে আমার বক্তব্য শুনে যেতে পারতেন। প্রয়োজন হলে আমাকে দিয়ে ওকালতনামাও সই করানো যেতো। কিন্তু কেউ কোনো দিন আমার নিকটে আসেননি। কানপুরের ডিফেন্স কমিটি আপীলের ব্যাপারটিও দেখাশুনা করছিলেন। কিন্তু আমায় তারা সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে দিয়েছিলেন। কানপুরে থাকার সময়ে আমরা যে ইলাহাবাদ হাই কোর্টের বিখ্যাত এডভোকেট মিস্টার প্যারীলাল ব্যানার্জির বরাবরে ওকালতনামা সই করে দিয়েছিলেম তাতে আমার মনের আশার সঞ্চার হয়েছিল। মনে হয়েছিল, তিনি যখন আমাদের ওকালতনামা গ্রহণ করেছেন তখন আমাদের হয়ে তিনি কোর্টেও দাঁড়াবেন।

কানপুরে শ্রী জোগ ও তাঁর বন্ধুদের চিন্তা-ভাবনা সব কিছু তাঁদের তরুণ বন্ধু কপিলদেব মালবীয়কে ঘিরেই জমাট বাঁধছিল, তিনি হাই কোর্টের উকীল না হওয়া সত্ত্বেও। আমাদের সঙ্গে, অন্তত আমার সঙ্গে তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ হতো না। তাই, কথাবার্তার ভিতর দিয়ে তাঁদের মনের গহনে আমি প্রবেশ করতে পারিনি। একজন নিম্ন আদালতের উকীলকে যে তাঁরা হাই কোর্টেও দাঁড় করাতে চাইবেন এটা বোঝা আমার পক্ষে কঠিন ছিল। কপিলদেব ইলাহাবাদে প্রাক্‌টিস করতেন। সে হিসাবে তিনি আমাদের এডভোকেটকে দয়া করে সাহায্য করবেন, এটাই ছিল আমার ধারণা।

হাই কোর্টে আপীলের মেমোর্যান্‌ডাম মিস্টার প্যারীলাল ব্যানার্জি দস্তখৎ করেছিলেন। তবে, তাঁর জুনিয়র বা ক্লার্ক আপীলটি ফাইল (দাখিল) করেছিল কিনা আমি তা জানিনে। আপীলের মেমোর্যান্‌ডামে দু'টি মাত্র অজুহাত (ground) দেওয়া হয়েছিল। এত কম অজুহাত দেওয়ার জন্যে তাই কোর্টের জজেরা সমালোচনা করেছিলেন। অজুহাত দু'টি ছিল ঃ

Grounds

I. Because the Conviction Under Section 121-A I. P. C. is not justified as no offence is made out.

2. Because the judge has relied on inadmissible evidence.

বঙ্গানুবাদ

(১) ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে দণ্ডবিধান ন্যায়-সঙ্গত হয়নি, যেহেতু অপরাধ প্রমাণিত হয়নি।

(২) যেহেতু বিচারক অগ্রহণীয় সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপরে নির্ভর করেছেন।

এই আপীলের (ক্রিমিনাল আপীল নম্বর ৫৮৮, ১৯২৪ সাল) বিচার করায় জন্যে ইলাহাবাদ হাইকোর্টে

(১) মাননীয় সার গ্রিমউড মিয়ার্স, নাইট, প্রধান বিচারপতি ও

(২) মাননীয় সার থিওডোর কারো পিগোট, নাইট, বিচারপতিকে নিয়ে১ একটি বেঞ্চ গঠিত হয়েছিল।

কানপুরের ডিফেন্স কমিটির ওপরে আমাদের যে আপীলের জন্যে নির্ভর করতে হয়েছিল তা আমি আগে বলেছি। একথাও বলেছি যে ইলাহাবাদ হাই কোর্টের খ্যাতনামা এডভোকেট মিস্টার প্যারীলাল ব্যানার্জি আমাদের ওকালতনামা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরই নামে আমাদের আপীল ইলাহাবাদ হাই কোর্টে দাখিল করা হয়েছিল। নলিনী গুপ্তের মিস্টার জে. এম. সেনগুপ্তকে পত্র লেখা হতে একটি রব উঠেছিল যে আমাদের আপীলের তদবীর করার জন্যে তিনি ইলাহাবাদে আসবেন। নলিনী নিজে এই রটনায় সাহায্য করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সব কথা হাওয়ায় ভাসছিল। কেউ মিস্টার সেনগুপ্তকে নিযুক্ত করেননি। করলে তো তিনি ইলাহাবাদ হাই কোর্টকে লিখতেন। সেনগুপ্ত যে আসবেন একথা মিস্টার প্যারীলাল ব্যানার্জিরও কানে গিয়েছিল। তিনি নিশ্চয় মনে মনে ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন। আপীলের শুনানি আরম্ভ হওয়ার তারিখের "গত পরশু দিন" আমাদের কানপুরের ডিফেন্স কমিটি মিস্টার ব্যানার্জিকে জানালেন যে কলকাতা হতে কেউ আসছেন না। অতএব তাঁকেই হাই কোর্টে আপীলের সওয়াল-জওয়াব করতে হবে। তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। ইচ্ছা করলে তিনি আমাদের ডিফেন্স কমিটির লোকদের গলা ধাক্কা দিয়ে বা'র করে দিতে পারতেন। আমি কোর্টের নিয়ম-কানুন ভালো জানিনে, মিস্টার ব্যানার্জি আমাদের ওকালতনামা গ্রহণ করেছিলেন, কোনো কিছু না করলে হাই কোর্টের জজেরা হয়তো তাঁকে ধরতেন। তাই তিনি জজেদের সব কথা জানিয়ে দিলেন এবং বললেন তাঁর প্রস্তুতি হয়নি। তাঁকে অন্য একটি তারিখ দেওয়া হোক। জজেরা অন্য তারিখ দিতে অস্বীকার করলেন, বললেন আগস্ট মাসে শুনানি হওয়ার কথা ছিল। পণ্ডিত কপিলদেব মালবীয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নিম্ন আদালতে তিনি কয়েদীদের পক্ষে ছিলেন ব'লে তাঁকেই হাই কোর্টে আপীলের সওয়াল-জওয়াব করার বিশেষ অনুমতি দেওয়া হলো। [পাইওনীয়ার, ইলাহাবাদ, ১২ই নবেম্বর, (১৯২৪)]।

এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। বারের একজন খ্যাতনামা এডভোকেট কারণ দেখিয়ে অন্য একটি তারিখ চেয়েছিলেন, তাঁকে তা মঞ্জুর করা হলো না. এমন

১ 1. Hon'ble Sir Grimood Mears, Knight, Chief Justice.
2. Hon'ble Sir Theodore Caro Piggot, Knight...Judge.

কথা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। পণ্ডিত কপিলদেব মালবীয় আগে হতেই স্পেশাল অনুমতির জন্যে দরখাস্ত ক'রে রেখেছিলেন, না, মিস্টার প্যারীলাল ব্যানার্জির অনুরোধ নামঞ্জুর হওয়ার পরে দরখাস্ত করেছিলেন তা পুরানো খবরের কাগজে খুঁজে পাওয়া গেল না। মোটের ওপরে, ব্যাপারটি এই দাঁড়িয়েছিল যে হাই কোর্টের জজেরা মিস্টার ব্যানার্জিকে একটি নূতন তারিখ দিলেন না, কিন্তু হাই কোর্টের উকীল নন এমন একজন জুনিয়র উকীলকে বিশেষ অধিকার দিলেন। তাঁরা আগস্ট মাসের কথা কেন বলেছিলেন তা জানিনে। কারাগারে বন্দী কয়েদীদের জন্যে তো তাঁদের তারিখ পিছিয়ে দিতে হয়নি। গবর্নমেণ্টই প্রস্তুত হতে পারেননি। শরৎকালীন ছুটিও এসে গিয়েছিল। ছুটির সময়ের জজ ছিলেন ডক্টর শাহ্ মুহম্মদ সুলায়মান ও মিস্টার লালগোপাল মুখার্জি। এই দু'জন জজের কোর্টে আমাদের আপীলের শুনানি হোক এটা সরকার পক্ষের ব্যারিস্টার মিস্টার রস অলস্টন কিছুতেই চাননি। গ্রিমউড্ মিয়ার্স ইংল্যাণ্ডে ছুটিতে ছিলেন। তিনি ফিরে আসুন এটাই তিনি চাইছিলেন। এ ব্যাপারে রস অলস্টন ও ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে অনেক পত্র বিনিময় হয়েছে। পত্রগুলি রেকর্ডে আছে।

শেষ পর্যন্ত কপিলদেবই আপীলের সওয়াল-জওয়াব করেছিলেন। সম্ভবত ভালো বক্তৃতাই দিয়ে থাকবেন। কিন্তু কমিউনিস্টদের মোকদ্দমা কিভাবে চালাতে হয় তা তিনি জানতেন না। আমাদের উকীল নিজে যে মতই পোষণ করুন না কেন, আদালতে তাঁকে আমাদের লোক হয়ে যেতে হবে। আদালতে যে-সব দলীল আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে সরকার পক্ষ হতে দাখিল করা হয়েছিল সে সব ভালো করে পড়লে তিনি বুঝতে পারতেন আমরা কি চাই। তিনি সে দিকটাতে যাননি। গেলে হাই কোর্টে বলতে পারতেন না যে আমাদের কাজ-কর্ম ঘৃণার চোখে ("Contempt") দেখা উচিত ছিল। আমাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করার ও আমাদের সাজা দেওয়ানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। এটাই কি দেশের সামনে আমাদের বক্তব্য ছিল? এই কথা বলে তিনি আমাদের ছাড়াতে তো পারেনইনি, আমাদের দণ্ডকালও কমাতে পারেননি। জজেরা বলেছেন এতে তাঁদের মনে কোনো দাগ কাটেনি ("The plea does not impress us".) তিনি আমাদের কাজের প্রতি "ঘৃণা" প্রকাশ না করে পেশোয়ারের মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কথা তুলে ধরতে পারতেন। সেই মোকদ্দমার এক বৎসরের দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বন্দীরা দন্ডকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরে তখন বাইরে এসেছিলেন। শওকত উস্‌মানীর সঙ্গে দেখা করলে তিনি সব খবর জানতে পারতেন। কর্নেল কে'র নিকটে পেশোয়ারের রায়ের (judgement) নকলও ছিল।

১৯২৪ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখে হাই কোর্টে আপীলের শুনানি আরম্ভ হয়েছিল। ৬ই নবেম্বর তারিখে শুনানি শেষ হয়ে যায়। ১০ই নবেম্বর (১৯২৪) তারিখে ইলাহাবাদ হাই কোর্ট কানপুর কমিউনিস্ট (বলশেভিক) ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আপীল নাকচ (ডিস্‌মিস) করে দিলেন।

কানপুর কমিউনিস্ট (বলশেভিক) ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার যবনিকার পতন এখানেই হয়ে গেল অবশ্য অনেক কথা এখনও বলার বাকী থাকল।

কানপুরে গঠিত ডিফেন্স কমিটির মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হলো। হাই কোর্টের আপীলেও তাঁদের বন্ধু পণ্ডিত কপিলদেব মালবীয় দাঁড়িয়েছিলেন। এটাই তাঁরা চেয়েছিলেন।

দায়রা আদালতে মোকদ্দমা যখন চলছিল তখন সরকার পক্ষ থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় লিখিত বহু পত্র আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ আদালতে দাখিল করা হয়েছিল। এই সকল পত্রের মধ্যে বাঙলায় লেখা দু'খানা পত্রের ইংরেজি অনুবাদের অংশবিশেষ আমি এখানে তুলে দিচ্ছি, মূল পত্রগুলি পাওয়ার আর কোন উপায় নেই। এই পত্রাংশগুলি অবনী মুখার্জি সম্বন্ধে লেখা। আমি এই পুস্তকের ১৬৫ পৃষ্ঠা হতে ২০৭ পৃষ্ঠার ভিতরে অবনী মুখার্জি সম্বন্ধে সবিস্তর আলোচনা করেছি।

প্রথম পত্রখানি হচ্ছে এক্‌জিবিট নম্বর ১০, বার্লিন হতে ১৯২৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে আমাকে লেখা। অবনী দেশে ফিরে এসে আমরা যে ছোট আন্দোলনটি গড়ে তুলেছিলাম তা ধ্বংস করার চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। তাতেই এম· এন· রায় বলেছেন।

"Abani Mukherji is a dangerous man. I brought him up like a Snake on milk and plantain. Then all the worthies here wanted to put him up in jail as a British spy, it was only through me that his life was saved. To day he is a leader of this party. So dreadful was arrogance. Any way I cannot pardon him any more. So he is done for in the Universal Revolutionary Society."

(কুঞ্জবিহারী রায়ের দ্বারা বাঙলা হতে ইংরেজি অনুবাদ।)

অনুবাদের অনুবাদ

"অবনী মুখার্জি একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি। আমি দুধ-কলা খাইয়ে সাপ পুষেছিলাম। সেই সময়ে এখানকার মাননীয় ব্যক্তিরা [রায় ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের কথা বলছেন] ব্রিটিশ চররূপে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন। আমার কল্যাণেই তখন তার জীবন রক্ষা পেয়েছিল। আজ সে এই পার্টির [ইন্ডিয়ান ইন্ডেপেন্ডেন্স পার্টির] একজন নেতা। কী ভয়ানক ঔদ্ধত্য! যাই হোক, আমি তাকে আর ক্ষমা করতে পারি না। বিশ্ব বিপ্লবী সংস্থায় তাকে শেষ ক'রে দেওয়া হয়েছে।" [অবনী মুখার্জি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের সব কাজ হতে বহিষ্কৃত হয়েছিল।]

দ্বিতীয় পত্রখানি ১৯২৩ সালের আগস্ট মাসে মানবেন্দ্র রায় বার্লিন হতে নলিনী গুপ্তকে লিখেছিলেন। এখানা কানপুর মোকদ্দমার এক্‌জিবিট নম্বর ৫৪। এই পত্রে আছে :

"Where is that vagabond gone? Is he still in the country? If he comes here, I shall perform his Sradh. I shall not make any mistake this time."

(বাঙলা হতে কুঞ্জবিহারী রায়ের ইংরেজি অনুবাদ।)

অনুবাদের অনুবাদ। "সেই ভবঘুরেটি [অবনী মুখার্জি] কোথায় গেল? সে কি এখনও দেশে আছে? যদি সে এখানে আসে আমি তার শ্রাদ্ধ করব। এবার আমি আর কোনো ভুল করব না।"

শ্রীকুঞ্জবিহারী রায়ের আক্ষরিক অনুবাদ পড়ে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছেন।

বিদেশী লেখকেরা হয়েছেন বেশী বিভ্রান্ত। শ্রীকুঞ্জবিহারী রায়কে আমি চিনি। তিনি সুশিক্ষিত ব্যক্তি। ১৯১৮ সালে আমি অল্প দিন বঙ্গীয় সরকারের বাঙলা অনুবাদকের আফিসে তাঁর সঙ্গে (তাঁর অধীনে বলাই যথাযথ প্রয়োগ হবে) কাজ করেছি। সারা চাকুরী জীবন তিনি এই অনুবাদের কাজ করেছেন। আমার বিশ্বাস পুলিসের অনুরোধেই তিনি এভাবে আক্ষরিক অনুবাদ করে থাকবেন। "আমি তার শ্রাদ্ধ করব" একটি বাঙলা বাগধারা (idiom)। তার অর্থ হচ্ছে "আমি তাকে উচিত শিক্ষা দেব"। অবনী মুখার্জিকে 'খুন করব' এই অর্থ এই বাগধারার নয়। আমাকে লেখা পত্রখানি (এক্‌জিবিট নম্বর ১০) ১৯২৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে লেখা। তখনও অবনীর জাল করা পত্রগুলি রায়ের হাতে পৌঁছায়নি। ওই বছরের আগস্ট মাসে নলিনীকে রায় যখন পত্র লিখেছিলেন তার অনেক আগে তিনি অবনীর জালকরা পত্রগুলি পেয়েছিলেন। নলিনী গুপ্তকে লেখা পত্রাংশের (একজিবিট নম্বর ৫৪) সহিত আমাকে লেখা পত্রাংশ (একজিবিট নম্বর ১০) আমি সকলকে একবার মিলিয়ে পড়তে অনুরোধ করছি।

যে বাঙলা বাগধারার আক্ষরিক অনুবাদ হয় না সম্ভবত পুলিসের অনুরোধে তার আক্ষরিক অনুবাদ করে শ্রীকুঞ্জবিহারী রায় একটি বিভ্রাট বাধিয়েছেন। বিদেশের লোকেরা এই থেকে ধরে নিয়েছেন যে মানবেন্দ্রনাথ রায় অবনী মুখার্জিকে খুন করতে চেয়েছিলেন।

"But they [the British] also knew that he was working against Roy, and it therefore seems likely that they felt it would be more damaging to the Communist movement to allow him to remain free to cause trouble for Roy. According to British intelligence Mukherjee was enough of a nuisance to provoke Roy into expressing his determination to have Mukherji murdered if he should ever return to Berlin." (Gene D. Overstreet and Marshal, Windmiller : Communism in India, Page 67.)

বঙ্গানুবাদ

কিন্তু তাঁরা [ব্রিটিশ] একথাও জানতেন যে সে [অবনী মুখার্জি] রায়ের বিরুদ্ধে কাজ করছেন, এবং এই কারণে এটা সম্ভব মনে হচ্ছে যে ব্রিটিশ উপলব্ধি করেছে রায়কে বিব্রত রাখার জন্যে অবনী মুখার্জিকে মুক্ত রাখলে তা কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের মতে অবনী মুখার্জি এমন বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল যে সে বার্লিনে ফিরে আসলে তাকে হত্যা করা হবে একথা রায়ের মুখ হতে বা'র হয়ে পড়েছিল।" (জেনে ডি. ওভারস্ট্রীট ও মার্শাল উইন্ডমিলার ঃ "কমিউনিজম্ ইন্ ইন্ডিয়া" পৃষ্ঠা ৬৭।)

শ্রীকুঞ্জবিহারী রায় যদি নলিনীকে লেখা রায়ের পত্রের আক্ষরিক অনুবাদ না করতেন তবে এত কথা উঠত না। ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধ হয়। রায় যখন অবনী মুখার্জির শ্রাদ্ধ করবেন বলেছেন তখন তাঁকে হত্যা না ক'রে শ্রাদ্ধ কি ভাবে হতে পারে? তাই হত্যা করার কথাটা ব্রিটিশ গোয়েন্দা ও বিদেশী লেখকদের মনে এসেছে।

ভারতবর্ষে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করতে পারেন না। শ্রাদ্ধ করার অধিকার থাকা চাই। এম. এন. রায়ের সে অধিকার ছিল না। তা ছাড়া, কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন আন্তর্জাতিক নেতা হয়ে, তিনি শ্রাদ্ধ করতেন কি করে? ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে অবনী মুখার্জি বার্লিনে ফিরে গিয়েছিলেন! এম. এন. রায়ও তখন বার্লিনে ছিলেন। কই মুখার্জি তো তখন নিহত হননি।

সোবিয়েৎ দেশে অবনী মুখার্জির সোবিয়েৎ নাগরিক স্ত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র সোবিয়েৎ নাগরিকরূপেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই উপলক্ষে অবনী সোবিয়েৎ নাগরিক অধিকার পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯২৫ সালে সে অধিকার তিনি পেয়েওছিলেন। আশ্চর্য এই যে ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডকে লেখা পত্রে অবনী কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সম্পর্কে জঘন্য উক্তি করলেও তাঁর সোবিয়েৎ অধিকার পাওয়ার পথে কোনও বাধার সৃষ্টি হয়নি। বলা বাহুল্য, তাঁর ভারতে আসার পাসপোর্টও ভারত গবর্নমেণ্ট মঞ্জুর করেছিলেন। শুধু বলা হয়েছিল যে তাঁকে নিজের দায়িত্বে আসতে হবে। দেশে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল না। কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় তাঁকে আসামী করা হয়নি। তাঁর নাম আসামীর তালিকায় ভুক্ত করা সত্ত্বেও সে নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। দেশে ফেরার পক্ষে তাঁর পথে কোনো বাধা ছিল না।

কানপুরের ডিফেন্স কমিটি টাকা তুলেছিলেন। দায়রা আদালতে মোকদ্দমার শুনানি শেষ হওয়ার পরে জজ হোম (Holme) যখন রায় লিখছিলেন তখন শওকত উস্‌মানীর এক কাকা বিকানীর হতে তাকে দেখতে এসেছিলেন। তিনি কিছু টাকাও সঙ্গে এনেছিলেন। টাকার অঙ্কটা ২৫০ ছিল, না, ৩৫০ তা এখন মনে করতে পারছিনে। তবে, ২৫০ টাকার কম কিছুতেই ছিল না। পুলিসের রেকর্ডে ৩৫০ টাকার কথা উল্লেখ আছে। হাই কোর্টে আপীলের জন্যে টাকাটা ডিফেন্স কমিটির হাতে দিয়ে যাওয়ার জন্য শওকত উস্‌মানী কাকাকে বলেছিল। তিনি তাই করেছিলেন। নাগপুর হতে মিস্টার রুইকরও কিছু টাকা পাঠিয়েছিলেন। শ্রীজোগেরা তো জানতেনই যে যেমন করেই হোক তাঁরা হাই কোর্টেও পণ্ডিত কপিলদেবকে দাঁড় করিয়ে দিবেন। তবে তাঁরা লণ্ডন হতে কেন টাকা আনালেন? লণ্ডনেও একটি ডিফেন্স কমিটি স্থাপিত হয়েছিল। জর্জ ল্যান্সবারী এম. পি. সেই কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আবার পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর পরিচয় ছিল। কমরেড চার্লস্‌ আশ্‌লীর কথা আমি আগে বলেছি। তিনিই ছিলেন লণ্ডনে গঠিত ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি। শ্রীজোগেরা পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুকে ধরে তাঁকে দিয়ে জর্জ ল্যান্সবারীকে টাকার জন্যে টেলিগ্রাম করলেন। দু'তিন কিস্তিতে তাঁরা ৪৭ পাউণ্ড (৭০৫ টাকা) পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত কপিলদেব মালবীয়ের হাই কোর্টে সওয়াল-জওয়াব (argument) ব্রিটিশ সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছিল। লণ্ডনের ডিফেন্স কমিটি এর বিরুদ্ধে পণ্ডিত মোতিলালের নিকটে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

পণ্ডিত কপিলদেব মালবীয় ইলাহাবাদের স্থানীয় লোক ছিলেন। সেখানকার নিম্ন আদালতে তিনি প্রাক্‌টিস করতেন। তাঁকে দৈনিক ৫০ টাকা ফিস দিলেও শ্রীজোগেদের নিকটে যথেষ্ট টাকা ছিল। লণ্ডন হতে টাকা আনবার কোনো প্রয়োজন তাঁদের ছিল না।

ডাঙ্গে ও নলিনীকে নিয়ে শ্রীজোগ মত্ত ছিলেন। তাঁদের দু'জনই অনুতপ্ত

হয়ে গবর্নমেণ্টের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। হাই কোর্টে আপীলের সওয়াল-জওয়াব কাপিলদেব করেছিলেন, আপীল ডিস্‌মিস হয়ে গেছে, এ খবর-গুলিও তিনি আমায় দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। আমার সংবাদপত্র পড়ার অধিকার ছিল না। সরকারীভাবে আপীল ডিস্‌মিস্‌ হওয়ার খবর আমার নিকটে পৌঁছাতে দু'মাস সময় লাগত। কারণ, কোনো আসামী মুক্তি পাননি। ডাক্তার ডি. কে. মুখার্জি অবশ্য খবরটি আমায় বোধ হয় পরের দিনই জানিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন রায়-বেরিলি জিলার সিবিল সার্জন এবং রায়-বেরেলি ডিস্ট্রিক্ট জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। বাঙালী হলেও তিনি কোনো দিন আমার সঙ্গে বাঙলায় একটিও কথা বলেননি। তিনি তাঁর অধীন কর্মচারীদেরও ভয়ের চোখে দেখতেন। আমার সঙ্গে বাঙলায় কথা বললে তাঁরা না তাঁকে সন্দেহ করে বসেন!

বলশেভিক মোকদ্দমা সম্পর্কে সাধারণের ধারণা

সেকালে কোনও ঘটনা সম্পর্কে দেশব্যাপী প্রচার ইংরেজি সংবাদপত্রের মারফতেই হতো। এবং বহুল পরিমাণে একালেও তাই হয়। ইংরেজি সংবাদপত্র হতে দেশীয় ভাষাগুলির সকল খবরের কাগজ সংবাদ নকল করত। পেশোয়ারের মোকদ্দমাগুলির কোনও প্রচার হয়নি। ভারত গবর্নমেণ্ট তা চাইতেন না। নিউজ এজেন্সিগুলি ইংরেজি ভাষায় কাজ চালাতেন। রয়টার বিদেশের খবর এদেশে প্রচার করতেন, আর এদেশের খবর প্রচার করতেন বিদেশে। দেশের একস্থানের খবর তাঁরা অন্যস্থানে প্রচার করতেন না। তার জন্যে ছিলেন এসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া। তাঁরা ভারতের খবর ভারতে সরবরাহ করতেন। পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কিছু কিছু খবর পাঞ্জাবের উর্দু কাগজগুলিতে ছাপা হয়েছে শুনেছি। কিন্তু সেগুলিকে ইংরেজিতে সংকলন ক'রে 'এসোসিয়েটেড প্রেস' অন্যত্র প্রচার করেননি। হয়তো সরকারের বারণ ছিল।

কিন্তু কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা যখন হলো তখন ভারত সরকারের নীতিতে পরিবর্তন ঘটেছে। গবর্নমেণ্ট স্থির করলেন যে সংবাদপত্রের সাহায্যে গবর্নমেণ্টই আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করবেন। তাঁরা ব্যবস্থা করলেন যে রয়টার ও এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি সর্বক্ষণ আদালতে উপস্থিত থাকবেন। ম্যাজিস্ট্রেটের ও সেশন্স জজের আদালতে তো তাঁরা ছিলেনই হয়তো হাইকোর্টেও ছিলেন, আমি ঠিক খবর দিতে পারব না। মিস্টার আয়েঙ্গার একজন দক্ষ সাংবাদিক ছিলেন। তাঁর পুরো নাম মনে করতে পারছিনে। পরে দিল্লীর সাংবাদিক জগতে তাঁর খুব নাম হয়েছিল। একজন সহকারী নিয়ে তিনি রয়টার ও এসোসিয়েটেড প্রেস এই উভয় সংস্থার কাজ চালিয়ে গেছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে যেদিন মোকদ্দমার প্রথম অনুসন্ধান আরম্ভ হলো সেদিন কর্নেল সেসিল কে' (ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের অন্তর্গত ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর এবং ভারত গবর্নমেণ্টের পক্ষ হতে মোকদ্দমার ফরিয়াদী) রয়টার ও এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধিদের ডেকে বলে দিলেন যে মোকদ্দমার শিরোনাম হবে "কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা"। পরের দিন সকাল বেলা ভারত-বর্ষের আসাম হতে বোম্বে ও হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্রই "বলশেভিক" নামটি অধীত ও উচ্চারিত হতে লাগল। এই থেকে শুধু কি আমাদের চারপাশে

ঘৃণা জমাট বেঁধে উঠেছিল? কারুর দৃষ্টি কি আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি? সরকারী খরচে ও আমাদের কারাবাসের মূল্যে কিছু প্রচার কি আমাদের পক্ষে হয়নি? হয়েছে। চীনের কমিউনিস্টরা শত্রুর যুদ্ধাস্ত্রগুলি কেড়ে নিয়ে তার দ্বারা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা ছিল সোবিয়েৎ রাষ্ট্র ও আমাদের বিরুদ্ধে একটা সংগঠিত প্রচারাভিযান। প্রচারাভিযানে ছাপানো দলীল-পত্র থাকতেই হবে। সে-সব দলীল যখন মোকদ্দমার এক্‌জিবিট হয়েছে তখন তার টুকরো টুকরো অংশ সংবাদপত্রে মুদ্রিতও হয়েছে। এই মুদ্রিত অংশগুলি অনেকে পড়ে আরও বেশী পড়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। ব্রিটিশ যা কিছু ভাবুন না কেন, আমরা আসামীরা যত কষ্ট পাই না কেন, কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হতেও আমাদের আন্দোলন প্রেরণা লাভ করেছে। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত যে আমাদের আন্দোলন অনেক শক্তি সঞ্চয় করল তাতে কানপুর মোকদ্দমারও কিছু অবদান আছে। ১৯২২ সালের কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে প্রচারিত প্রোগ্রাম ও ইশ্‌তিহারও প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

কানপুর দায়রা আদালতে যখন আমাদের বিচার চলেছিল তখন স্কুলের ছাত্ররা অন্তত ভেবেছিল যে আমরা কম পক্ষে ইউরোপীয় লোক হব এবং আমাদের চেহারা হবে ভয়ংকর ধরনের। কিন্তু কোর্টে আমাদের দেখতে এসে তারা বলে উঠত—"আরে ইয়ে লোগ তো হিন্দুস্তানী হ্যাঁয়"। বয়স্ক লোকেরা এসেও আমাদের দেখে যেতেন, সকল রাজনীতিক মোকদ্দমা চলাকালেই এরকম লোকেরা আসেন। খুব ভিড় কখনও দেখিনি। লুইস গান্‌ দেখে কেউ ভয় পেতেন কিনা তা জানিনে। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে লুইস গান্‌ বসানো হয়েছিল, সেশন্স কোর্টেও।

দায়রা আদালতের রায় প্রকাশের পরে অনেক কাগজ আমাদের পক্ষে-বিপক্ষে লিখেছেন। পেশোয়ারের মোকদ্দমাগুলিতে সরকার পক্ষই লাভবান হয়েছেন। আসামীদের পক্ষে প্রচার কিছু হয়নি বললেও চলে। কিন্তু কানপুর মোকদ্দমা একটি মতবাদকে (বলশেভিকবাদ) ভিত্তি করেই দায়ের করা হয়েছিল। মতবাদ সম্পর্কিত দলীল-দস্তাবেজও কোর্টে প্রচুর পরিমাণে দাখিল করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ নূতন ধরনের মোকদ্দমা ছিল এটা। সংবাদপত্রগুলির পক্ষে মতামত প্রকাশ করাও সহজ ছিল না। ২০শে মে (১৯২৪) তারিখে দায়রা জজ তাঁর রায় শুনিয়েছিলেন। ২২শে মে তারিখে কলকাতার ইংরেজি দৈনিক "অমৃতবাজার পত্রিকা" এই সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে তাঁরা বিশেষ করে কোর্টের আইন বিষয়ক বিচ্যুতির কথাগুলি একে একে তুলে ধরেছেন। সত্যই কানপুর মোকদ্দমায় আইনের বিচ্যুতি অনেক ছিল।

কলকাতার ইংরেজি দৈনিক 'বেঙ্গলী' কোনো মতামত প্রকাশ করেননি। বোম্বের 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' (ব্রিটিশ কাগজ) রিপোর্ট ছেপেছেন কিন্তু কোনো মতামত প্রকাশ করেননি।

কলকাতার ব্রিটিশ দৈনিক "ইংলিশম্যান" আমাদের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছেন।

ইলাহাবাদ হাই কোর্টে আমাদের আপীল নাকচ হয়ে যাওয়ার পরে ২১শে নবেম্বর (১৯২৪) তারিখে বোম্বের "সর্বদল" সম্মেলনে (The "All-Party" Conference) কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কথা ওঠে। ২১শে ও ২২শে নবেম্বর তারিখে সার দিনশা মানোকজী পেটিটের (Sir Dinsha Monockjee Petit) সভাপতিত্বে এই সম্মেলনের অধিবেশন হয়। মিস্টার

গান্ধী, মিস্টার সি· আর· দাশ, পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু, মিসেস বেসান্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। গবর্নমেণ্টের বঙ্গীয় নীতি (Government's Bengal Policy) বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল।

"Mr. Gandhi proposed the appointment of a representative committee to draw up a resolution dealing with the Government's policy in Bengal. Mrs. Besant maintained that the existence of a dangerous revolutionary conspiracy in India had been proved, and referring to the Cawnpore Bolshevist Conspiracy trial, urged the conference to repudiate the Third International." [The Times (London), November 22, 1924, Page 12, Col. 8. (Reuter)]

বঙ্গানুবাদ

"মিস্টার গান্ধী প্রস্তাব করেন যে বাঙলা দেশে গবর্নমেণ্টের নীতি বিষয়ে একটি প্রস্তাব তৈয়ার করার জন্যে একটি প্রতিনিধিমূলক কমিটি নিযুক্ত করা হোক। মিসেস বেসান্ত তাঁর দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করলেন, ভারতে যে বিপজ্জনক বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব আছে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে, এবং কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কথা উল্লেখ ক'রে তিনি বিশেষ জোর দিলেন যে তৃতীয় ইন্‌টারন্যাশনালকে বর্জন করা হোক।" [লণ্ডনের 'টাইম্‌স' পত্রিকা, ২২শে নবেম্বর, ১৯২৪, পৃঃ ১২, কলম ৮ (রয়টার)]

এই "সর্ব-দল" সম্মেলনে মিসেস্ বেসান্তের উক্তি গৃহীত হয়েছিল কিনা তা জানিনে। তবে বিদেশী লেখকেরা এই উক্তি বহু স্থানে উদ্ধৃত করেছেন। মিসেস বেসান্ত নিজে অনেক জায়গায় বলেছেন যে তাঁর এই কথা সকলের কথা।

শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গে ও নলিনীভূষণ দাশগুপ্তের ক্ষমা প্রার্থনা

আগেই বলেছি ১৯২৪ সালের ৭ই জুলাই তারিখে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার চারজন দণ্ডিত বন্দী ভিন্ন ভিন্ন জেলে বদলী হয়েছিলেন। ওই দিন আমরা কিছুই জানতাম না যে আমরা বিভিন্ন জেলে বদলী হয়ে যাব। দুপুরের কিছু পরে হঠাৎ একজন জেলের ওয়ার্ডার জেলের ভিতরে গিয়ে বললেন, আপনাদের চারজনই আফিসে চলুন। কেন জিজ্ঞাসা করায় বললেন, আপনাদের বদলীর হুকুম এসে গেছে।

দুপুরের আগে ডাঙ্গের বন্ধুরা (শ্রীজোগ ইত্যাদি) মুলাকত করে গিয়েছিলেন। জেলার ও তাঁর স্পেশাল ক্লার্ক মুহম্মদ হাফিজের সঙ্গে শ্রীজোগদের ভাব হয়েছিল। মনে হয় বদলীর কথাটা হাফিজ সাহেব শ্রীজোগকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনিও হয়তো ডাঙ্গেকে তা আমাদের অগোচরে বলে দিয়ে থাকবেন। রেলওয়ে স্টেশনে রওয়ানা হওয়ার আগে আমাদের কয়েক ঘণ্টা জেল আফিসে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এই সময়ে ডাঙ্গে কানপুরের ডিস্‌ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নামে তার দরখাস্তখানা লেখে। কানপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলের আফিস ঘরখানা বেশ বড়। সেখানে এক কোণে বসে সে কি লিখছিল সে বিষয়ে আমরা কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করিনি। তার বাগ্‌দত্তার কানপুরে আসার কথা ছিল।

আমরা ভেবেছিলেম সে বিষয়ে সে কিছু লিখে রেখে যাচ্ছে। কোনো সুযোগ বুঝে সে লেখাটা হাফিজ সাহেবের হাতে দিয়েছিল। আমাদের সামনে নলিনী গুপ্ত তাতে স্বাক্ষর করেননি। করলে আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতো এবং আমরা তা দেখতে চাইতাম। অন্য সকলের বিশ্বাস যে নলিনী গুপ্তের নামটিও তখন ডাঙ্গেই স্বাক্ষর করেছিল। তা ছাড়া ব্যাপারটা গোপন রাখার অন্য উপায় ছিল না। অবশ্য তাতে নলিনীর সম্মতি ছিল। এই যুক্ত স্বাক্ষরিত কাগজখানিই ছিল শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গে ও নলিনীভূষণ দাশগুপ্তের যুক্ত ক্ষমা প্রার্থনা। এখানি কানপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বরাবরে লেখা হয়েছিল। তাতে ৭ই জুলাই তারিখ দেওয়া হয়েছিল। আমাদের রেলওয়ে স্টেশনে রওয়ানা হওয়ার অল্প আগে মুহম্মদ হাফিজ সাহেব 'কমলা টাওয়ারে' শ্রীজোগকে টেলিফোন ক'রে দিলেন। 'কমলা টাওয়ার' জুগ্‌গিলাল কমলাপতের আফিস ছিল। শ্রীজোগ, গণেশশংকর বিদ্যার্থী এবং আরও কে কে রেলওয়ে স্টেশনে গিয়েছিলেন। আমরা কিছুই জানতে পারলাম না যে ডাঙ্গে ও নলিনী ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে কানপুর জেল ছাড়ল। তারপরে প্রায় চল্লিশ বছর পরে আমরা ভারতের জাতীয় মহাফিজখানায় রক্ষিত কাগজ-পত্র পড়ে ব্যাপারটি জানতে পারি ১৯৬৪ সালে।

File No. 421-Poll (Home Deptt.)—1924

P. 14

To

The District Magistrate,
Cawnpore.

Sir,

We, the undersigned, beg to inform you that we are willing to give an undertaking to Government not to Commit any more offences, for which we are at present Convicted and we shall be thankful to government if they will deign to consider our request favourably and release us as soon as possible, as we are undergoing suffering which we cannot sustain. We shall be personally thankful to you if you will arrange with Government for our petition being granted.

We are,
Your Obdt. Servants,
Shripat Amrit Dange
Nalini Bhushan Dasgupta

District Jail,
Cawnpore,
7th July 1924

পি· ১৪
জিলা ম্যাজিস্ট্রেট,
কানপুর

মহাশয়,

আমাদের বিনত নিবেদন এই যে আমরা গবর্নমেণ্টের নিকটে এই মুচলিকায় স্বাক্ষর করতে চাই যে যে-অপরাধের জন্যে বর্তমানে আমরা দণ্ডিত হয়েছি সেই অপরাধ আমরা আর কখনও করব না এবং গবর্নমেণ্ট যদি দয়া করে আমাদের আবেদন আমাদের পক্ষেই বিবেচনা করেন, আর আমাদের যথাসম্ভব সত্বর মুক্তি দেন তবে আমরা গবর্নমেণ্টের নিকটে কৃতজ্ঞ থাকব। কারণ আমরা যে-কষ্টে পড়েছি তা আমরা আর সহ্য করতে পারছি না। গবর্নমেণ্টকে দিয়ে আমাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করানোর ব্যবস্থা যদি আপনি করে দেন তবে আমরা ব্যক্তিগতভাবে আপনার নিকটে কৃতজ্ঞ থাকব।

আমরা আপনার
বিশ্বস্ত ভৃত্য
শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গে
নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

ডিস্ট্রিক্ট জেল,
কানপুর
৭ই জুলাই, ১৯২৪

ইংরেজি দরখাস্তখানিই মূল দরখাস্ত। তাতে যে দু'টি স্বাক্ষর আছে সেই স্বাক্ষর দু'টিও ডাঙ্গেরই হাতের লেখা। আমাদের সামনে একখানা কাগজে ডাঙ্গে ও নলিনী স্বাক্ষর দিলে আমাদের সন্দেহের উদ্রেক হতো। নিশ্চয় নলিনীর সম্মতি অনুসারেই তার দস্তখত ডাঙ্গে নিজে করেছে। নলিনী কখনও বলেনি যে স্বাক্ষর তার নয়। দস্তখত-এ "Bh" কালী বেশী পড়েছে। আমার ধারণা ডাঙ্গে Nalini লেখার পরে Ku লিখেছিল। কারণ নলিনীকুমার দাশগুপ্তও নলিনীর একটি নাম। তার বন্ধু কিরণবিহারী রায় সাক্ষ্যে বলেছেন যে 'কুমার' নলিনীর দ্বিতীয় নাম। ডাঙ্গে 'Ku' লেখার পরে তার মনে এসেছিল যে জজের রায়ে 'ভূষণ' আছে। তখন 'Ku'-কে ঘষে ঘষে সে 'Bh' ক'রে দিয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন ডাঙ্গে 'Bhu' না লিখে ভুলে "Bu" লিখে ফেলেছিল। পরে সেটাকে 'Bhu' করতে হয়েছিল। তার জন্যে "Bu"-এ কালি বেশী পড়েছে।

যাক, ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে এটাই ডাঙ্গের একমাত্র পত্র নয়। আরও পত্র নলিনী ও সে লিখেছে। একে একে সব ক'খানা পত্র এখানে আমি তুলে দেব। এখানে একটি কথা আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই। ১৯৬৪ সালে ডাঙ্গের পত্রগুলি যখন বাহির হয়ে পড়ে তখন ডাঙ্গের নাম "Shripad না, 'Shripat' এই নিয়ে একটা তর্ক উঠেছিল। ডাঙ্গের দু'জন বন্ধু রেণু চক্রবর্তী ও 'ফেরিশ্তা' (সম্ভবত নিখিলনাথ চক্রবর্তী, রেণু চক্রবর্তীর স্বামী) যুক্তি দিয়েছিলেন যে ডাঙ্গে বরাবর "Shripad" লিখেন। কিন্তু ক্ষমা প্রার্থনার দরখাস্তে "Shripat" আছে। অতএব, এই দরখাস্তগুলি জাল। ফেরিশ্তা আরও দু'কদম এগিয়ে গিয়ে

বললেন যে এই পত্রগুলি নলিনী গুপ্ত জাল ক'রে দিয়েছেন, যে নলিনী গুপ্ত ইংরেজিতে একখানি পোস্টকার্ড লিখতে হলেও আবদুল হালীমের সাহায্য নিতেন! সুযোগ বুঝে ডাঙ্গেও বলল, সে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেরা কখনও Shripat লিখেন না, তাঁরা লিখেন 'Shripad'।

এই তর্কটা একেবারেই অহেতুক ছিল। এখন দেখছি এই সব কেঁচো খোঁড়া-খুঁড়ির ভিতর দিয়ে সাপ বা'র হয়ে পড়েছে। তারপরে আরকাইব্স হতে আরও প্রচুর কাগজপত্র পাওয়া গেছে। পুলিসের রেকর্ডে ডাঙ্গের নাম শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গে (Shripat Amrit Dange)। কানপুরের মোকদ্দমার যে-মঞ্জুরী ভারত গবর্নমেণ্ট দিয়েছিলেন সে মঞ্জুরীও দেওয়া হয়েছিল Shripat Amrit Dange-র বিরুদ্ধে। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আসামী ছিল Shripat Amrit Dange,—Shripad Amrit Dange নয়। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ডাঙ্গে নিজে বলেছে :

"My name is Shripat Amrit Dange ; my father's name is Amrit Raghunath Dange ; I am by caste Brahman ; 24 years of age......

Sd. S. A. Dange

Sd. H. Holme,
Sessions **Judge.**

Above examination (overleaf as well) was taken in my presence and hearing and the record contains a full and true account of Statement made by the accused.

Sd. H. E. Holme,
Sessions Judge.
3.5.'24"

কোর্টের এই রেকর্ড মোকদ্দমার রেকর্ডের মাইক্রোফিল্ম হতে পরিস্ফুট করা হয়েছে। ন্যাশনাল আরকাইব্স অফ ইণ্ডিয়াতে গৃহীত।

আশা করি নামের বিতর্ক এখানে শেষ হয়ে গেল। এটা নিশ্চিত হয়ে গেল যে যে-ডাঙ্গে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আসামী হয়েছিল তার নাম ছিল Shripat Amrit Dange. শওকত উস্মানী খুব জোর দিয়ে বলেছিল যে তার নাম শওকত উস্মানীই, মাওলা বখ্শ নয়। সরকার পক্ষ তাই মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা বিকানীরের ডুঙ্গর কলেজ হতে ছাত্র রেজিস্টার এনে প্রমাণ করেননি যে শওকত উস্মানী আসলে মাওলা বখ্শ। 'নামে কিবা আসে যায়।'

গোরখপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে যাওয়ার পরে নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত গোরখপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকেও ক্ষমা চেয়ে একখানি পত্র লেখে। সেই পত্রখানিও এখানে তুলে দিলাম। এই থেকে আমরা বুঝে নিয়েছি যে ডাঙ্গে তার সম্মতিতেই তার নাম দস্তখৎ করেছিল।

P 18

To

The District Magistrate,

Gorakhpur

Sir,

I most humbly and respectfully beg to state that I have been convicted for four years R. I. on 20th May, 1924 under section 121-A., I. P. C. from the Court of Sessions Judge at Cawnpore.

I regret very much what I have done, and I request you kindly to do your best for my release, and promise that in future I will never take part in any kind of political movement, and I am ready to give any kind of assurance you may like.

I have the honour etc.
Sd. Nalini Bhusan Das Gupta
Prisoner
Gorakhpur Dt. Jail
16. 7. 24

বাঙলা অনুবাদ

পি. ১৮

গোরখপুরেব ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটেব ববাবরে

মহাশয়,

বিনয় ও সম্মান পূর্বক আমি হুজুরের গোচরে নিবেদন করছি যে ১৯২৪ সালের ২০শে মে তারিখে কানপুরের দায়রা জজের আদালত হতে ভাবতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১-এ ধারা অনুসারে আমি চার বছর কঠোর শ্রম করার সাজা পেয়েছি।

আমি যা করেছি তার জন্যে আমি অনেক, অনেক দুঃখিত, এবং আপনাকে আমি অনুরোধ করছি যে কৃপাপূর্বক আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করে আমাব মুক্তির ব্যবস্থা করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে ভবিষ্যতে আমি কোনো প্রকার রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিব না। আমি যে কোনো রকমের মুচলিকায় স্বাক্ষর দিতে প্রস্তুত আছি।

সম্মান সহকারে ইত্যাদি
(স্বাক্ষর) নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত
কয়েদী, গোরখপুর ডিস্ট্রিক্ট জেল
১৬.৭.২৪

দাযরা আদালতে সাজা পাওয়ার পরে তখনও উনিশ দিন কাটেনি, (৭ই জুলাই, ১৯২৪) ভাঙ্গে আর নলিনী "as we are undergoing suffering which we cannot sustain" ব'লে কানপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের

মারফতে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল। আবার নলিনী একা গোরখপুর ডিস্ট্রিক্ট জেল হতে ওই মাসেরই ১৬ই তারিখে ক্ষমা প্রার্থনা করে আর একখানা দরখাস্ত পাঠিয়েছিল।

সীতাপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে অপেক্ষা ক'রে ক'রে ডাঙ্গে যখন কোনো উত্তর পেল না তখন ২৮শে জুলাই (১৯২৪) তারিখে সে স-কাউন্সিল ভারতের গবর্নর জেনেরেলের নিকটে একখানা সুদীর্ঘ আবেদন পাঠাল এবং তাতে বলল যে **মুক্তি পাওয়ার পরে সে গবর্নমেণ্টের গোয়েন্দার কাজ করবে।** তার স্বহস্ত লিখিত দরখাস্তের টাইপ কপি নীচে তুলে দিলাম ঃ

C/o. The Superintendent
District Jail,
Sitapur (U. P. of A.O.)

From

Shripat Amrit Dange,
Prisoner, (4 years R. I. under Sec. 121-A. I. P. C.
In the Bolshevik Conspiracy Case of Cawnpore)

To

His Excellency,
The Governor-General-in Council.

Your Excellency,

I am one of the four in the Bolshevik Conspiracy Case of Cawnpore. I beg to put forward for your Excellency's consideration a prayer for the remission of my sentence for following reasons.

In submitting my prayer I have to refer to certain facts, which Your Excellency may not be cognisant of; but Your Excellency can verify their truth by referring to Col. C. Kaye, Director, Central Intelligence Bureau or to the person mentioned hereinafter.

When the above-referred case was proceeding in the Lower Court, Mr. Ross Alston, the learned Counsel for prosecution happened to have a side talk with me, during the course of which he remarked, "Government is not very particular about the punishment of the individual accused. The case is instituted only to prove to a doubting public the truth of Government's statements, made from time to time as to the existence of Bolshevik Conspiracy in India." I think the learned Counsel is not likely to have misrepresented Your Excellency's policy, as he was in too close touch with Government's officials to

have mistaken Government's intentions. As the position of Your Excellency's Government has been vindicated by the verdict of the Court, Your Excellency may not mind remmitting my sentence and granting my prayer.

I might also refer to another incident. Exactly one year back, the Deputy Commissioner of Police of Bombay, Mr. Stewart, was having a conversation with me, in his office, regarding my relations with M. N. Roy and an anticipated visit to me of certain persons from abroad. During the course of the conversation the Honourable officer let drop a hint, in the following words, the full import of which I failed to catch at that moment. Mr. Stewart said, "You hold an exceptionally influential position in certain circles here and abroad. Government would be glad if this position would be of some use to them." I think, I still hold that position. Rather it has been enhanced by the prosecution. If Your Excellency is pleased to think that I should use that position for the good of Your Excellency's Government and the country, I should be glad to do so, if I am given the opportunity by Your Excellency granting my prayer for release.

I am given the punishment of four years' rigorous imprisonment in order that those years may bring a salutary change in my attitude towards the King Emperor's sovereignty in India. I beg to inform Your Excellency that those years are unnecessary, as I have never been positively disloyal towards His Majesty in my writings or speeches nor do I intend to be so in future.

Hoping this respectful undertaking will satisfy and move Your Excellency to grant my prayer and awaiting anxiously a reply,

I beg to remain,
Your Excellency's
Most Obedient Servant,
Shripat Amrit Dange.

Written this day
28th July, 1924.

Forwarded through the superintendent, District Jail. Sitapur, (U.P.)

Endorsement No. 1048, dated Sitapur Jail the 31. 7. 24.

Submitted in original to the Inspector General of Prisons, U. P. disposal.

Sd/- Illegible
Major, I. M. D
Supdt., Jail, Sitapur.

বঙ্গানুবাদ

পি· ২৪

কেয়ার অফ সুপারিন্টেন্ডেন্ট
ডিস্ট্রিক্ট জেল
সীতাপুর (U. P. of A. O.)

প্রেরক

শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গে কয়েদী (১২১-এ ধারা অনুসারে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ৪ বছরের সাজা প্রাপ্ত)

মহামাননীয় স-পরিষদ্ ভারতের গবর্নর জেনেরেলের বরাবরে

মহামাননীয়,

আমি কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার চারজনের একজন। আমি সবিনয়ে মহামাননীয়ের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত কারণে একটি প্রার্থনা নিয়ে উপস্থিত হতে চাই,—আমার কয়েদ মৌকুফ করে দেওয়ার প্রার্থনা।

আমার প্রার্থনা দাখিল করতে গিয়ে কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে তুলব যে ঘটনাগুলির বিষয়ে মহামাননীয় পরিজ্ঞাত নাও হতে পারেন। কিন্তু আমার কথার ভিতরে সত্য নিহিত আছে কিনা তা মহামাননীয় কেন্দ্রীয় ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর কর্নেল সি· কে'র নিকট হতে বা পরে যাঁর নামোল্লেখ করব তাঁর নিকট হতে যাচাই করতে পারেন।

যখন উল্লিখিত মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে (ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে) চলছিল তখন সরকার পক্ষের ব্যারিস্টার রস অলস্টনের সঙ্গে আমার একান্তে কিছু কথা হয়। তখন তিনি বলেছিলেন "কোন্ আসামীর কত সাজা হবে সেই বিষয়ে গবর্নমেণ্ট তেমন আগ্রহান্বিত নয়। এদেশে বলশেভিক ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সময় সময় গবর্নমেণ্ট যে বিবৃতি দিয়ে থাকেন সন্দিগ্ধ জনসাধারণকে তা বোঝাবার জন্যেই এই মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে।" আমি মনে করি সরকারী ব্যারিস্টার মহামাননীয়ের গবর্নমেণ্টের নীতি বুঝতে ভুল করেননি। কারণ সরকারী অফিসারদের সঙ্গে তাঁর ঘন সংযোগ ছিল। হুজুরের সরকারের বক্তব্য আদালতে প্রমাণিত হয়ে গেছে। এখন আমার সাজা মৌকুফ করে দিয়ে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতে হুজুরের কোনো আপত্তি নাও থাকতে পারে।

এখানে আমি অন্য একটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করতে চাই। ঠিক এক বছর আগে আমি বোম্বে পুলিসের ডেপুটি কমিশনার মিস্টার স্টুয়ার্টের সঙ্গে তাঁর আফিসে কথা বলছিলাম। এম· এন· রায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে ও বিদেশ হতে আমার নিকটে একজন লোক আসবেন বলে যে আশা করা যাচ্ছিল সেই সম্বন্ধেও আমার সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছিল। আমাদের আলোচনার ভিতরে মাননীয় অফিসার পরে উল্লেখ করা কথাগুলির দ্বারা একটি ইঙ্গিত করেছিলেন। সে সময় আমি এই কথাগুলির পূর্ণার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। মিস্টার স্টুয়ার্ট

বলেছিলেন ঃ "এদেশে ও বিদেশে কোনো কোনো মহলে তোমার অসাধারণ প্রভাব আছে। তোমার এই স্থিতি যদি গবর্নমেণ্টের কোনো কাজে লাগে তবে গবর্নমেণ্ট খুশী হবে।" আমি মনে করি, এখনও আমার সেই মর্যাদা আছে। বরঞ্চ আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হওয়ার কারণে আমার সেই মর্যাদা আরও বেড়েছে। যদি হুজুর মনে করেন যে আমার সেই মর্যাদা হুজুরের গবর্নমেণ্ট ও দেশের জন্যে ব্যবহার করা উচিত, আমি আনন্দের সহিত তা করতে রাজী আছি, যদি হুজুর আমার মুক্তির প্রার্থনা মঞ্জুর করে আমাকে মুক্তি দেন।

আমাকে চার বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে এই চার বছর আমার ধারণায় রাজ-সম্রাটের বাজত্ব সম্বন্ধে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন এনে দেবে। আমি মাননীয়ের গোচরে আনতে চাই যে এই চার বছরের সাজার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। কারণ, আমি কখনও রাজ-সম্রাটদ্রোহী ছিলাম না। আমার লেখায় নয়, বক্তৃতাতেও নয়। ভবিষ্যতে সেই রকম করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।

সম্মানপূর্বক এই যে মুচলিকা আমি দিচ্ছি তা হুজুরের সন্তোষজনক হবে এবং আমি আশা করি যে হুজুর আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। আমি উৎকণ্ঠার সহিত হুজুরের উত্তরের অপেক্ষায় থাকব।

হুজুরের বাধ্য ও বিশ্বস্ত ভৃত্য
শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গে

২৮শে জুলাই
১৯২৪

স-পরিষদ্ গবর্নর জেনেরেলের নিকটে সরকারী গোয়েন্দা হওয়ার করারে মুক্তি ভিক্ষা ক'রে যে আবেদন ১৯২৪ সালের ২৮শে জুলাই তারিখে ডাঙ্গে পাঠিয়েছিল, (তার পরবর্তী আবদনে সে কেন সেই দরখাস্তের তারিখ ২৬শে জুলাই দিয়েছে তা বুঝতে পারছিনে) তার বিষয়ে আরও একটি আবেদন সে ১৯২৪ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখে গবর্নর জেনেরেলকে পাঠিয়েছিল।

From Home Deptt.
Political file No. 278/25 of 1925 Page 2 (Corres)

From

Shripat Amrit Dange, Esq., District Jail, Sitapur (U. P.)

To

His Excellency, Governor General-in-Council

Your Excellency,

Pending my appeal before the Hon'ble High Court, Your Excellency's Government were not prepared to take into consideration my petition, dated 26th (?) July, 1924 re. remission of my sentence, in what is known as the Bolshevik Conspiracy Case of Cawnpore. The decision of the Government was conveyed to me in their communication No. 5718/IV-1376 D/Nainital

11. 10. 24 forwarded with the endorsement No. 22594/E 37 of 24 D/21. 10. 24 of the Inspector General of Police, U. P.

My appeal, having now been dismissed, I beg to bring the same petition to Your Excellency's notice for consideration and await favour.

16th November,
1924

I beg to remain,
Your Obedient Servant,
Shripat Amrit Dange

ডাঙেগর এই দরখাস্তখানা তার আগেকার দরখাস্তের স্মারক মাত্র। এতে নূতন কোনো আবেদন নেই। যুক্তপ্রদেশের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেল অফ পুলিসের মারফতে (ডাঙেগ তাদের গোয়েন্দা হতে চেয়েছিল) ২১শে অক্টোবর (১৯২৪) তারিখে ডাঙেগকে জানানো হয়েছিল যে আপীলের ফয়সলা হওয়ার আগে ডাঙেগর গবর্নর জেনেরেলকে পাঠানো আবেদন বিবেচিত হবে না। ১০ই নবেম্বর তারিখে আপীল ডিসমিস হয়ে গিয়েছিল। তাই ১৬ই নবেম্বর তারিখে ডাঙেগ এই দরখাস্তের দ্বারা গবর্নর জেনেরেলকে জানিয়ে দিয়েছিল যে আমার আপীল ডিসমিস হযে গেছে। এবারে দয়া করে আমার আবেদন বিবেচনা করুন।

ডাঙেগ যে ভাষায় দরখাস্ত করেছিল সেই অনুযায়ী তাকে যদি তখনই মুক্তি দেওয়া হতো তা হলে তার রাজনীতিক জীবন বরাবরের জন্য শেষ হয়ে যেত। সে যে সঙেগাপনে ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের গোয়েন্দার কাজ করার করারে মুক্তি পেতে চেয়েছিল সে কাজ সে কখনও করতে পারত না। রাজনীতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত থেকেই শুধু গোপনে ভারত গবর্নমেণ্টকে খবর সে সরববাহ কবতে পারত। একথা ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্ট বুঝেছিল, ডাঙেগ বুঝেনি। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে এই কথা ভেবে ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্ট ডাঙেগকে তখন মুক্তি দেয়নি। কর্নেল কে· সেই সময়ে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জায়গায় এসেছিলেন ডেভিড পেট্রি। কিন্তু অবসর গ্রহণ করা সত্ত্বেও কে' কানপুর মোকদ্দমার আপীলে সাহায্য করেছিলেন। পেট্রি বললেন তখনই ডাঙেগকে ছেড়ে দিতে তিনি রাজী নন। কারণ, তাতে লোকে ভাববে ক্ষমা চাওয়া মাত্রই যদি মুক্তি পাওয়া যায় তবে অপরাধ ক'রে যাওয়াই ভালো। দু'বছর সাজা খেটে ডাঙেগ যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে, পেট্রি বললেন, তিনিই সকলের আগে তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করবেন। ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্ট-মেণ্টেব কাগজপত্রে ডাঙেগর ব্যাপার আলোচনার সূত্রে এও আমি পরে পড়েছি যে ডিপার্টমেণ্টের কিছু কিছু লোক মত প্রকাশ করেছিলেন যে ডাঙেগকে জেলখানায় বেশী বেশী রেমিশন দেওয়া হোক যাতে সে তাড়াতাড়ি ছাড়া পেতে পারে। ডাঙেগ ভালো রেমিশন (এক বছর) পেয়েছিল।

আবার নলিনী গুপ্তের কথা

গোরখপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে বাঙলার ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোকেরা এসে নলিনী গুপ্তের সঙেগ দেখা করেছিলেন। তাঁদেরই অনুরোধে নলিনী গুপ্তকে যুক্তপ্রদেশের গোরখপুর ডিস্ট্রিক্ট জেল হতে বাঙলার খুলনা ডিস্ট্রিক্ট জেলে বদলী

করা হয়েছিল। নীচে আমি যে পত্রখানি উদ্ধৃত করছি তা থেকে এই কথাগুলি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

Intelligence Branch, C. I. D.
13, Elysium Row
Calcutta, 27th June, 1925
No. 6673

Secret

From

J. E. Armstrong, Esq., O. B. E. Deputy Inspector-General of Police, Intelligence Branch, C. I. D., Bengal

To

The Chief Secretary to the Government of Bengal.

Sir,

I have the honour to address you on the subject of moving the Government of India to suspend the sentence of imprisonment which Convict Nalini Bhusan Gupta is at present undergoing.

This man, Nalini, was convicted and sentenced in May 1924 to four years' R. I. in connection with the Cawnpore (Bolshevik) Conspiracy Case. At our request he was transferred from the Gorakhpur Jail to the Khulna Jail at the end of 1924 and thereafter to the Alipore Central Jail, as it was found that he was suffering from appendix trouble and gall stones and that an operation would have to be performed. Hs was admitted into the Prince of Wales Hospital for treatment in December last and has only just returned to the Alipore Central Jail.

In spite of two operations his condition is distinctly bad and he is too weak and emaciated to stand. Major Sandes, the Superintendent of the Medical College, writes as follows :

"I myself have personally seen the case and it strikes one as that of a man being seriously but not at the moment dangerously ill. His mental condition is one of marked depression, and release undoubtedly would improve the latter condition." On the 10th June, Major Sandes again wrote :

"He (Colonel Connor, the Surgeon in charge of Nalini's case) is definitely of opinion that the convict is not progressing and that he is likely to go steadily downhill. His mental

outlook has an important bearing on his malady. If it is within the bounds of possibility to give him his liberty, even for a time, it might do much towards saving his life. In this opinion I concur."

Prior to his conviction Nalini made a statement to the police, but subsequently stated that through fear he had not disclosed all he knew. Since his conviction he has been interviewed on several occasions and has readily given information within his knowledge. It has not, however, been possible to obtain from him a detailed statement owing to his state of health.

In his present condition, if set at liberty, he is physically incapable of mischief and in view of the medical opinion quoted above that such a course may be the means of saving his life, I recommend that his sentence be temporarily suspended and that he be handed over to some relative. If this step is approved his relatives will be communicated with and suitable arrangements made.

I have etc.,
Sd/-J. E. Armstrong,
Deputy Inspector-General
of Police., I. B.

I submit these papers, for Home Member's information As D. I. B's letter shows there was no doubt that the man should be released and I therefore telegraphed in reply to Bengal Government agreeing to release. I will show to H. E. to-morrow if H. M. returns the papers.

Sd. Illegible
30.6.25

I have shown H. E. Post Copy of telegram should be sent by mail to Bengal.

Sd. Illegible
1.7.25

বঙ্গানুবাদ

গোপনীয়

জে. ই. আর্মস্ট্রং ও. বি. ই. পুলিসের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেল, আই. বি., সি. আই. ডি., বেঙ্গলের, নিকট হতে

বাঙলা দেশের চীফ্ সেক্রেটারীর বরাবরে

মহাশয়,

কয়েদী নলিনীভূষণ গুপ্ত যে এখন সাজা খাটছে তার সাজা স্থগিত রাখার কথা ভারত গবর্নমেণ্টকে জানানোর জন্যে আমি এই পত্র আপনাকে লিখছি। নলিনী নামক এই লোকটি কানপুর (বলশেভিক) ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। আমাদের অনুরোধে তাকে গোরখপুর জেল হতে ১৯২৪ সালের শেষ দিকে খুলনা জেলে বদলী করা হয়েছিল। তারপরে দেখা গেল যে সে এপেন্ডিক্স ও গল্ স্টোনের বেদনায় ভুগছে। তখন অপারেশনের জন্যে তাকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। আলীপুর সেন্ট্রাল জেল হতে চিকিৎসার জন্যে তাকে গত ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স অফ্ ওয়েল্স্ হসপিটালে ভর্তি করানো হয় এবং সেখান থেকে সবে মাত্র সে আলীপুর জেলে ফিরে এসেছে।

দু দু'বার অপারেশন করা সত্ত্বেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তাব অবস্থা খারাপ। সে এত বেশী দুর্বল ও মাংসহীন হয়ে পড়েছে যে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না। মেডিকেল কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর সান্ডেস বলছেন ঃ

"আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই রোগীকে পরীক্ষা করেছি। তাতে এই বুঝেছি যে রোগী কঠোরভাবে পীড়াগ্রস্ত, কিন্তু এই মুহূর্তে বিপজ্জনকরূপে নয়। এটা বোঝা যায়, সে মনের বল হারিয়ে ফেলেছে। তাকে মুক্ত করে দিলে নিঃসন্দেহে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।" ১০ই জুন তারিখে মেজর স্যাণ্ডেস্ আবার লিখেছেন ঃ

"তিনি (কর্নেল কোনোর, নলিনীর কেসের ভারপ্রাপ্ত সার্জন) এই মত ধারণ করেন যে কয়েদীর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না। এটাই সম্ভব যে তাব অবস্থার অবনতি ঘটবে। তার মনের অবস্থা তার ব্যাধির ওপরে ছায়াপাত করছে। তাকে মুক্তি দেওয়া, কিছু দিনের জন্যে হলেও, যদি সম্ভব হয় তবে তার জীবন রক্ষা পেতে পারে। এই প্রস্তাবে, (মেজর স্যাণ্ডেস বলছেন) আমি একমত।"

নলিনীর সাজা হওয়ার আগে সে পুলিসের নিকটে বিবৃতি দিয়েছিল, কিন্তু পরে সে বলেছে যে সে যা জানে তার সব কথা সে ভয়ে বলেনি। তার সাজা হওয়ার পরে তার সঙ্গে কয়েকবার দেখা করা হয়েছে। যখনই দেখা করা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই সে যা জানে তা বিনা ওজরে পুলিসকে বলেছে। তার অসুস্থতার কারণে তার নিকট সুবিস্তৃত বিবৃতি নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

তার বর্তমান অবস্থায় তাকে ছেড়ে দিলে, তার এমন শারীরিক শক্তি নেই যে সে কোনো নষ্টামি করতে পারে। ওপরে যে চিকিৎসকের মত উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে তাকে ছেড়ে দেওয়াটা তার জীবন রক্ষারও উপায় হতে পারে। আমি সুপারিশ করছি যে তার দণ্ডাদেশ আপাতত অস্থায়ীভাবে স্থগিত রাখা হোক এবং তাকে তার কোনো আত্মীয়ের হাতে সমর্পণ করা হোক। এইভাবে অগ্রসর হওয়াটা যদি অনুমোদিত হয় তবে তার আত্মীয়-স্বজনদের জানাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করা হবে।

সম্মানপূর্বক ইত্যাদি

স্বাক্ষর ঃ জে. ই. আর্মস্ট্রং

পুলিসের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনেরেল, আই. বি.

হোম মেম্বারের জানার জন্যে আমি এই কাগজপত্র দাখিল করছি।

ডি· আই· বি·'র চিঠি হতে বোঝা যাচ্ছে, কোন সন্দেহ নেই যে এই লোকটিকে ছাড়তে হবে। এই কারণে আমি উত্তরে বেঙ্গলকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি যে এই লোকটিকে মুক্তি দিতে গবর্নমেণ্ট রাজী হয়েছে। যদি হোম মেম্বার কাগজপত্র ফেরৎ দেন তবে আমি আগামী কাল হিজ একসেলেন্সিকে (গবর্নর জেনেরেলকে) সব কিছু দেখাব।

স্বাক্ষর ঃ অস্পষ্ট
৩০· ৬· ২৫

আমি হিজ একসেলেন্সিকে কাগজপত্র দেখিয়েছি। টেলিগ্রামের নকল ডাক-যোগে বেঙ্গলকে পাঠানো হোক।

স্বাক্ষর ঃ অস্পষ্ট
১· ৭· ২৫

মিস্টাব আর্মস্ট্রং বলেছেন ১৯২৪-২৫ সালে নলিনীব এপেণ্ডিক্স ও গল্-স্টোনের জন্যে অপারেশন হয়েছিল। আমার মনে হয় তিনি ঠিক বলেননি। ১৯২১ সালে কলম্বো মেডিকাল কলেজ হস্‌পিটালে নলিনীর এপেণ্ডিক্সের জন্যে অপারেশন হয়েছিল। গল্‌স্টোনের কথা আমি তখন কিছু শুনিনি। কলকাতা মেডিকাল কলেজের প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স হস্‌পিটালে নলিনীর দু'বার অপারেশন হয়েছিল একথা ঠিক। কলকাতার সুবিখ্যাত যক্ষ্মা চিকিৎসক ডাক্তাব রামচন্দ্র অধিকারী সেই সময়ে প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স হস্‌পিটালে (এই হস্‌পিটালে শুধু অপারেশন হয়) হাউস সার্জন ছিলেন। ১৯২৬ সালে আমি তাঁর নিকট হতে ব্যারামটা কি তা বুঝতে চেয়েছিলেম। তিনি সোজা করে বলেছিলেন যে ব্যারামটা ছিল ইন্‌টেস্‌টিনাল টিউবারকিউলোসিস অর্থাৎ অন্ত্রের যক্ষ্মা রোগ। মোটের ওপরে নলিনীর কঠোর ব্যাধি হয়েছিল। দু'বার অপারেশন হয়েছিল।

আগে কিছুই জানতেম না, এখন নলিনী সম্বন্ধে বিস্তর কাগজপত্র পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ১৯১৪ সালে রাজাবাজার বোমার মামলার আসামী অমৃতলাল হাজরার বিরুদ্ধে তার দেওয়া বিবৃতি (এই বিবৃতি দিয়েই সে ইংল্যাণ্ডে চলে গিয়েছিল) ও ১৯২৩ সালের শেষাশেষিতে ধরা পড়ে দিনের পর দিন আরব্য উপন্যাসের শাহিরজাদীর ধরনে যে-সব বিবৃতি সে দিয়েছে সে সব আমরা পড়েছি। ভারত গবর্নমেণ্টের মুহাফিজখানায় এ সব রক্ষিত আছে। মিস্টার আর্মস্ট্রং তার সাজা হওয়াব পরেকার বিবৃতিগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি এখনও আমরা পাইনি। তবে, মনে হয় ১৯২৪ সালের আগস্ট মাসে পুলিস নলিনীকে গোপেনের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন যে সুবোধ নামক একজন বিপ্লবীকে আমার নিকটে উপস্থিত করা হয়েছিল। আমি তাকে পত্র দিয়ে এম· এন· রায়ের নিকটে পাঠিয়েছিলেম। (Col. C. Kaye : Communism in India, page 134.) মোটের ওপরে নলিনী গুপ্ত ভবঘুরে বৃত্তির লোক ছিল। রাজনীতিতে সে ভুঁইফোড়। ১৯২৬-২৭ সালে সে আমাদের সঙ্গে কলকাতার ৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোডে ছিল। সেই সময়ে সে আমাদের কম জ্বালায়নি। তার উপদলীয়তায় আমরা উত্যক্ত হয়েছিলেম। তবুও কংগ্রেস আফিস হতে ও "ফরওয়ার্ড" কাগজের তরফ হতে যখন তাকে পুলিসের লোক বলে রটনা করা হচ্ছিল তখন আমরা তার হয়ে সে প্রচারের প্রতিরোধ করেছি।

১৯২৭ সালে সে যখন আবার জার্মানীতে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল তখন তার ১৯২১ সালে মার্সাইতে নূতন করে করা ব্রিটিশ পাসপোর্টের মিয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল। সে পাসপোর্ট সে আবার নূতন করে করতে পেরেছিল কিনা তা তখন সে আমায় কিছু বলেনি। কিন্তু আমি খবর পাচ্ছিলেম সে এখানে-ওখানে ঘোরা-ঘুরি করছে। সে একদিন অন্তত টেগার্টের (কলকাতার পুলিস কমিশনার) সঙ্গে যে দেখা করেছিল একথা জানি। ব্যাপারটি আমি জেনেছিলেম এই ভাবে। নলিনী একদিন যখন লালবাজার পুলিস আফিসে মিস্টার টেগার্টের সঙ্গে মুলাকাত করছিল তখন অন্য একটি মুলাকাতের জন্যে স্লিপ এলো। স্লিপ পাঠিয়েছিলেন এম. এন. রায়ের সহকর্মী ও যতীন মুখোপাধ্যায়ের দলের নেতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষ। তিনি তাঁর বন্দী ছোট ভাই অমরকৃষ্ণ সম্বন্ধে তদবীর করতে গিয়েছিলেন। মিস্টার টেগার্ট নলিনীকে সামনে বসিয়ে রেখেই অতুলকৃষ্ণ ঘোষকে ডেকে পাঠালেন। অতুলকৃষ্ণ টেগার্টের আফিসে ঢোকার আগেই শুনতে পেলেন যে তিনি বড় জোরে জোরে চেঁচাচ্ছেন। নলিনীকে তিনি বলছিলেন, "কি পেয়েছ তুমি? ভেবেছ মুজফ্‌ফর হবে লেনিন, আর তুমি হবে ট্রট্‌স্কি? তা হবার নয়।" আমার মনে হয়েছিল যে এটা ছিল টেগার্ট সাহেবের একটি অভিনয়। শুনেছি টেগার্ট সাহেব নাকি আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত একজন পুলিস অফিসার। অথচ তিনি জানতেন না ১৯২৭ সালের সোবিয়েৎ ইউনিয়নে ট্রট্‌স্কি কত বেশী সমালোচিত। অতুলকৃষ্ণ ঘোষের নিকট হতে আমি এ খবর পরের দিন পেয়েছিলেম। কিন্তু নলিনী আমায় কিছু জানাল না। কেন গিয়েছিল সে টেগার্টের নিকটে? পাসপোর্টের জন্যে যাওয়া তার পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল। কারণ, সেকালে কলকাতার পুলিস কমিশনার এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরাও ইন্‌টারন্যাশনাল পাসপোর্ট ইসু করতে পারতেন। যাওয়ার আগে নলিনী আমার নিকট হতে দূরে দূরে থাকছিল। শেষে একদিন এলো। আমার সঙ্গে দেখা না করে গেলে বোম্বেতে তার অসুবিধা হবে। বলছিল টাকা নেই, পাসপোর্ট নেই। আমি বললাম পাসপোর্টের জন্যে টেগার্টের সঙ্গে দেখা করলেন না কেন। জওয়াব দিলেন, "করেছিলাম, কিছু হলো না।" কিন্তু হয়তো তার পাসপোর্ট হয়েছিল, হয়তো টেগার্টের সঙ্গে আরও গভীর ব্যবস্থাও হয়েছিল। নলিনী গভীর জলের মাছ ছিল। হ্যাঁ, টাকার কথাও আমি তাকে বলেছিলেম। নলিনীর জন্যে আসা ২৫ পাউন্ড পুলিস কিরণবিহারী রায়ের নিকট হতে নিয়ে গিয়েছিল। সেই টাকা আমাদের মোকদ্দমার সময়ে কানপুর কোর্টে জমা হয়েছিল। এতকাল পরে সেই টাকাটা তোলার জন্যে নলিনী কানপুরের এক উকীলকে অথরিটি দিয়েছিল। টাকাটা আসার সময় হয়েছিল। আমি তাকে আরও ক'দিন থেকে ওই টাকাটা নিয়ে যেতে বলেছিলেম। কিন্তু সে রাজী হলো না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে টেগার্টের দেওয়া পাসপোর্ট তার নিকটে ছিল। তবুও সে বোম্বেতে গিয়ে পাসপোর্টের কথা বলে। কমরেড শান্তারাম মিরাজকর একটা ব্যবস্থা করেও দিয়েছিল।

নলিনীর কথা আর বলতে চাইনে। ১৯২৭ সালে সে যখন ইউরোপে ফিরে গিয়েছিল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সে তখন ব্রিটিশ চর রূপেই গিয়েছিল। সে জার্মানীতে একটি রেস্তোরাঁ চালাত। এই রেস্তোরাঁটি ভারতীয়দেয় আড্ডা ছিল। সব রকমের আলোচনা হতো নলিনী গুপ্তের রেস্তোরাঁয়। খুব সহজেই সে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে ভারতীয়দের খবর দিতে পারত। ১৯৩৩ সালে হিটলারের ক্ষমতা দখলের পরেও যুদ্ধ ঘোষণার সময় পর্যন্ত নলিনী বার্লিনে তার রেস্তোরাঁ চালিয়ে

যাচ্ছিল। যে সকল বিদেশীর গায়ে এতটুকুও কমিউনিজমের গন্ধ ছিল তাদের হিটলার জার্মানীতে থাকতে দেয়নি। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই জার্মানী ছেড়ে পালিয়েছিলেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিটলারের দ্বারা গিরেফ্তার হয়েছিলেন। শুনেছি তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠাগ্রজের পৌত্র ছিলেন ব'লে সে যাত্রা বেঁচে যান। যদিও প্রকৃতপক্ষে নলিনী গুপ্ত কমিউনিস্ট ছিল না, তবুও তার গায়ে প্রচুর কমিউনিজ্মের গন্ধ মাখানো ছিল। সে বেশ কয়েকবার মস্কো যাতায়াত করেছে। ভারতবর্ষে সে একটি 'বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায়' আসামী ছিল। সেই নলিনী হিটলারের ক্ষমতা দখলের পরেও কি ক'রে বার্লিনে রেস্তোরাঁ চালিয়ে গেল?

বিভিন্ন দেশের উচ্চস্তরে গবর্নমেণ্ট আর গবর্নমেণ্টের মধ্যে একটি ব্যবস্থা থাকে। এই ব্যবস্থায় এক দেশের গবর্নমেণ্ট আরেক দেশের এজেণ্টকে নিজের দেশে থাকতে দেয়। যেমন নলিনীকে হিটলার বার্লিনে থাকতে দিয়েছিল। সে বার্লিনের ভারতীয় বাশিন্দাদের সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে রিপোর্ট পাঠাত। এই ব্যবস্থায় আবার হিটলারের এজেণ্টও লণ্ডনে ছিল। সেই দেশের জার্মান বাশিন্দাদের সম্বন্ধে সে নিজে দেশে রিপোর্ট পাঠাত। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে নলিনীকে ভারতে চলে আসতে হয়। দেশে ফিরে সে আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি। তার হুকুমে তার ছোট ভাইপো সুনীলের (তার খুড়তুত বা জেঠতুত ভাইয়ের ছেলে) আবদুল হালীমের নিকটে আসা বারণ ছিল। নলিনী দিল্লীতে টমাস কুকের আফিসে কিছুদিন চাকরীও করেছিল। কি করে সে চাকরী পেল?

নলিনীর কথা আমি এখানেই শেষ করব। পুলিসের নিকটে তার বিবৃতির পর বিবৃতি দেওয়ার কথা যদিও আমরা কিছু জানতেম না তবুও ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তাকে আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল। সে আমার সঙ্গে ১৯২৭ সালে অনেক দুর্ব্যবহারও করেছিল। তবুও তার সম্বন্ধে একখানা পত্র আমি বিদেশে লিখেছিলেম। ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারী জার্মানী হতে দেশে ফিরে আসার পর (১৯২৮) কলকাতায় আসেন। তখন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন নলিনী গুপ্তকে বিদেশে অনেকে স্পাই (গুপ্তচর) মনে করেন। আমার তার সম্বন্ধে কি মত? আমি বলেছিলেম সে যে স্পাই এ প্রমাণ পাইনি। ডক্টর অধিকারী বললেন কথাটি তবে জার্মানীতে জানিয়ে দিন। আমি তাই করেছিলেম। আজ আমি এ সম্বন্ধে অনুতপ্ত। নলিনীর সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ যে ছিল না এমন কথা তো নয়। তার স্পাই হওয়া সম্বন্ধে আজকার মতো প্রমাণ যে পাইনি এ কথা যেমন সত্য, আবার মনে সন্দেহও যে ছিল একথাও সত্য। সেই কথা তো আমি লিখতে পারতাম। নলিনীর উপদলীয়তায় আমি ত্যক্ত ও বিরক্ত ছিলেম। তবুও তার সম্বন্ধে আমি দুর্বলতা প্রকাশ করেছি। এ কথা মনে পড়লেই আমি অনুতপ্ত হই।

মিয়াদ পুরো হওয়ার আগে আমার কারামুক্তি

পুরো ১৯২২ সাল ও ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমার শরীরের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার টিউবারকিউলোসিস এই কারণে হয়েছিল। ১৯২৩-২৪ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপ্টেন বি. জি. মালিয়া আই. এম. এস. আমার অসুখ টের পেয়েছিলেন। সেই জন্যে তিনি সেল (Six cells) হতে বা'র করে আমায় অনেকগুলি দরওয়াজা-ওয়ালা একটি ঘরে থাকতে দিয়েছিলেন। আমার অসুখের কথা তিনি আমায় কিছু

বলেননি। কিন্তু জেলের বাইরে তাঁর সঙ্গে আমার যখন একবার দেখা হয়েছিল তখন তিনি আমায় বলেছিলেন যে ঢাকা জেলে আমার রোগ তাঁর নিকটে ধরা পড়েছিল।

১৯২৪ সালের জুলাই মাসের এক রাত্রিতে রায়-বেরেলি জেলে আমাকে একা একটি ছোট বাড়ীতে রাখা হয়েছিল। সঙ্গে ছিল শুধু একজন কয়েদী। নিকটে কোথাও একজন জেলের ওয়ার্ডার ছিল। আমার সামান্য কাশি হলো, তারপরে আমার মুখ দিয়ে অনেক রক্ত পড়ল। থুথু ফেলার কোনো পাত্র ছিল না, সব রক্ত আমি মেঝেয় ফেললাম। যুক্ত প্রদেশে (উত্তর প্রদেশ) জেলের মেঝে কাঁচা অর্থাৎ মাটির। সকালে জেলের ডাক্তার (সাব-এসিস্টাণ্ট সার্জন) এসে মাটি চেঁচে সব কিছু ফেলে দিলেন। বেলা হতে জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার ডি· কে· মুখার্জি এলেন। তিনি আবার রায়-বেরেলি জেলার সিবিল সার্জন। পাইওরিয়ার জন্যে আমার মাঢ়ী খুব খারাব ছিল। তিনি বললেন রক্ত মাঢ়ী থেকে এসেছে। আমার দিক থেকে আর কিছু করার ছিল না, তবে ডাক্তার মুখার্জি আমার খবর নিতেন ও মাঝে মাঝে আমায় পরীক্ষাও করতেন। এর মধ্যে তিনি কোথায় কি কি রিপোর্ট পাঠাতেন তা আমি জানতে পেতাম না। একদিন তিনি এসে আমায় বললেন যে আমায় আলমোড়া ডিস্ট্রিক্ট জেলে পাঠানো হবে। আরও বললেন, লোকে আলমোড়ার মতো হিল স্টেশনে চেষ্টা করেও খরচের জন্যে যেতে পায় না, আর তুমি স্টেটের খরচে যাচ্ছ। যত পার খাওয়ার চেষ্টা করবে।

আমি যেদিন আলমোড়া গেলাম সেদিনই প্রথম আমার হিস্টরি টিকিটে লিখে দেওয়া হলো Incipient Tuberculosis (প্রাথমিক যক্ষ্মা রোগ)। আলমোড়া জেল উঁচু পাহাড়ের উপরে ছিল। সিপাহীরা আমায় ধরে ধরে সেই উঁচুতে তুলেছিল। যেদিন আমি ওই জেলে পৌঁছেছিলেম তার পরের দিন সকালে গবর্নমেণ্টের নিকট হতে চিঠি এলো যে ভারত গবর্নমেণ্ট স্বাস্থ্যের কারণে আমায় বিনা শর্তে মুক্তি দিয়েছেন। যতটা মনে পড়ে তারিখটি ছিল ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫।

আমাকে নিয়ে সরকারী মহলে কি লেখালেখি হয়েছিল তা আগে কোনো দিন জানতে পাইনি। হাল আমলে জাতীয় মুহাফিজখানায় দলীলগুলি সাধারণের জন্যে উন্মুক্ত হওয়ায় কিছু কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে। নীচে সেগুলি উদ্ধৃত করলাম ঃ

Jail Form No. 61

(To be submitted in Duplicate)

Statement of [?] prisoner recommended for release on account of bodily infirmity, from the District Jail at Rae-Bareli.

1. Name of prisoner—Muzaffar Ahmad

   No. 6575 (Bolshevik Prisoner)

2. Sex—Male, Age 31 years
3. Caste and profession—Bengali (Musalman), Journalist.
4. Crime—121-A, I.P.C.
5. Sentence and date—4 years R. I. on 20. 5. 1924

6. By what authority passed—Sessions Judge, Cawnpore.

7. Unexpired Period—2 years 9 months 12 days.

8. Nature of Complaint in consequence of which release is recommended, and a brief history of the disease.—Incipient Tuberculosis.

Since his admission into the jail on 5. 7. 1924[1] he has been slowly losing health and for the last two months the decline has been rather rapid. For the last fortnight he has been getting an irregular type of fever : his weight when he came in was 95 lbs.[2] which has gone down to 81 lbs. and he has been reduced almost to bone and skin. I am of opinion that he has been suffering from Incipient Tuberculosis.

9. Declaration of the Surgeon : Certified that—

(a) the disease is likely to prove fatal if the prisoner remains in prison ;

(b) there is a reasonable chance of recovery if the prisoner is released ;

(c) the disease has not been produced or aggravated by any wilful act on the part of the prisoner.

Sd. D. K. Mukherji
Officer in Medical Charge of Jail

10. Opinion and remarks by Officer in Charge of Jail.

No. 1153

Dated 7th August, 1925

Release recommended and submitted to the Inspector General of Prisons, United Provinces of Agra and Oudh, for necessary action.

The Medical Officer recommends the release and certifies to conditions (a), (b), and (c)

1. Yes, he has relatives to look after him if released.

Sd. D. K. Mukherji,
Superintendent of Jail.

11. Remarks and recommendation by Inspector General of Prisons.

[1] Rae-Bareli Jail on 8th July, 1924. (M. A.)

[2] My weight was 112 lbs when I was admitted into Cawnpore Jail, (M.A.)

No. 18681/E 38

Dated Lucknow, 8. 8. 1925.

Reference this office D. O. No. 1518/31.7.25.

Submitted to the Deputy Secretary to Government, United Provinces of Agra and Oudh, Judicial (Criminal) Department, with the remark that the prisoner may be released, his weight has fallen greatly and the Superintendent reports that he is losing health rapidly.

Sd. Illegible
Lt. Col. I.M.S.
Offg. Inspector General of
Prisons, United Provinces
of Agra and Oudh.

No. 5097

From

J. R. W. BENNETT, Esqr. I. C. S.
Deputy Secretary to the Government
United Provinces.

To

The Secretary to the Government of India
Home Department (political)
Dated Nainital, August 31, 1925.

Subject : Proposed release on medical grounds of Prisoner Muzaffar Ahmad of the Bolshevik Conspiracy Case.
Judicial (Criminal) Department

Sir,

I am directed to refer to the correspondence ending with the Home Department letter No. D-1613/25-Poll., dated July 13, 1925, and to forward for the orders of the Government of India the roll of prisoner Muzaffar Ahmad No. 6575 convicted in the Bolshevik Conspiracy Case who is at present confined at the District Jail at Rae-Bareli.

2. It will be observed that the prisoner is suffering from incipient tuberculosis and has been slowly losing weight since

his admission into the Rae-Bareli Jail on July 5[১], 1924. During the last two months his decline is reported to have been rather rapid. His weight which on admission was 95 lbs. is now only 81 lbs. and he has lately been suffering from irregular attacks of fever.

3. As consumption of this type is often fatal and the patient may sink rapidly the Governor in Council recommends that the Government of India may be moved to sanction the release of Muzaffar Ahmad as early as possible. Pending the receipt of the orders of the Government of India the Governor in Council has directed the transfer of the prisoner from the Rae-Bareli to the Almora District Jail.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Sd. J. R. W. Bennett
Deputy Secretary

Telegrams/Express

No. 1-278/25.

Political Branch : Dated 5th September, 1925.

To

UPAO, NAINITAL

Your letter 5097 dated 31st August. Government of India agree to release Muzaffar Ahmad.

I should like the Home Department to see Ps 2, 7 and 10 of the file in regard to the recent activities of Muzaffar Ahmad, one of the convicts in the Cawnpore Conspiracy Case, who was released last year on medical grounds of ill health.

From the U. P. letter (P. U. C.) it appears that Muzaffar Ahmad was released uncondionally, and presumably therefore, he violated no undertaking by again taking a prominent part in Communist activities. At the same time, the fact that a man like Muzaffar Ahmad can with impunity resume his old ways almost immediately on the top his release cannot but leave an unfortunate impression on the public mind. The judgement in

১ July 8. 1924 (M.A.)

the Cawnpore Conspiracy Case—especially that of the Allahabad High Court—was of the greatest service to the Government in that it convinced those members of the public who were open to conviction of the reality and of the potential danger of Bolshevik intrigues in India. Now, however, they see that Muzaffar Ahmad is again out of the jail, and although it was only a short time ago that he was sentenced, is again openly flaunting himself as an active Communist. Under these circumstances, the public can hardly be blamed if they make up their minds that the Government do not take a serious view of activities of the kind that earned Muzaffar Ahmad and his fellow plotters their punishment. If any such impression were to arise, it would be in every way unfortunate. If it is a fact that Muzaffar Ahmad was released absolutely unconditionally, his speedy return to his old courses points the moral that men of his kidney should never be released except on strictest conditions of continued good behaviour. If Muzaffar Ahmad is sufficiently restored to health to be able to do what he is reported to be doing, proper place for him is in jail, and it is unfortunate that the conditions of his release preclude us from sending him back there.

Sd. D. Petrie
20. 1. 26

Let me see our papers about Muzaffar Ahmad's release.

Sd. J. Crerar
21. 1. 26

In their dated the 31st August, 1925 the U. P. Government recommended the release of Muzaffar Ahmad in view of the state of his health caused by incipient tuberculosis and Government of India merely conveyed by telegram their sanction to the proposal.

Sd. J. Mc. D.
22. 1. 26

D. I. B. should see the pp. I regret they were not shown to him at the time. In such cases in future the alternative of conditional suspension or remission should be examined. The

difficulty of course is that the conditions must under the law be accepted by the prisoner. In the present case there was little chance of this and the medical reports indicated that he should be released at once.

Sd. J. Crerar.
25. 1. 26

As a matter of fact, I was shown the home Department papers about the actual release of Muzaffar Ahmad, but I was not aware whether it was conditional or unconditional. It is of course, correct that any condition of release must be accepted by the prisoner, but I would strongly recommend that in such future cases the alternative of conditional suspension of remission be examined, as is proposed in Secretary's note. I fancy we should have more acceptance than refusals.

In this particular case Muzaffar Ahmad has made us look rather foolish. What is more, he seems to be back in the movement again "with both feet".

Sd. D. Petrie
27. 1. 26

জেল ফর্ম নম্বর ৬১
(দু'খানা দাখিল করতে হবে)

শারীরিক অশক্ততার জন্যে রায়-বেরিলি ডিস্ট্রিক্ট জেল হতে মুক্তির জন্যে সুপারিশ করা বন্দীর বিষয়ে বর্ণনা।

(১) কয়েদীর নাম—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ (বলশেভিক কয়েদী),
(২) পুরুষ বা স্ত্রী—পুরুষ, বয়স ৩১ বৎসর ;
(৩) জাতি ও পেশা—বাঙালী (মুসলমান), সাংবাদিক ;
(৪) অপরাধ—১২১-এ ধারা, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন ;
(৫) দণ্ড ও দণ্ড প্রাপ্তির তারিখ—চার বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, ২০·৫·১৯২৪ ;
(৬) কে সাজা দিয়েছেন—দায়রা জজ্, কানপুর
(৭) যে সাজা এখনও খাটতে বাকী আছে—২ বৎসর ৯ মাস ১২ দিন
(৮) যে রোগের জন্যে মুক্তির সুপারিশ করা হয়েছে এবং রোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—প্রাথমিক যক্ষ্মা রোগ। ৫· ৭· ২৪* তারিখে কয়েদীর এই জেলে ভর্তির তারিখ হতে ধীরে ধীরে তার স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে এবং গত

* ৮ই জুলাই, ১৯২৪ (মু· আ·)

দু'মাস দ্রুত স্বাস্থ্যাবনতি ঘটছে। গত এক পক্ষকাল তার অনিয়মিত জ্বর হচ্ছে! এ জেলে ভর্তি হওয়ার সময়ে তার শরীরের ওজন ছিল ৯৫ পাউন্ড। সেই ওজন কমে এখন ৮১ পাউন্ডে নেমেছে।* সে এখন প্রায় অস্থিচর্মসার হয়ে পড়েছে। আমার মত এই যে সে এখন প্রাথমিক যক্ষ্মা রোগে ভুগছে।

(৯) সার্জনের ঘোষণা।

আমি নিশ্চিতরূপে জানাচ্ছি যে—

(ক) কয়েদী যদি জেলে থেকে যায় তবে এই রোগ তার মৃত্যু ঘটাতে পারে ;

(খ) কয়েদীকে মুক্তি দিলে একটা সঙ্গত সম্ভাবনা আছে যে সে আরোগ্য লাভ করতে পারে ;

(গ) কয়েদী নিজে এই রোগের সৃষ্টি করেনি এবং ইচ্ছাপূর্বক তাকে বাড়ায়ওনি।

স্বাক্ষর, ডি· কে· মুখার্জি
জেলে চিকিৎসার ভারপ্রাপ্ত অফিসার

(১০) জেলের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের মত ও মন্তব্য ঃ

নম্বর ১১৫৩
৭ই আগস্ট, ১৯২৫

মুক্তির জন্যে সুপারিশ করা হলো। আগ্রা ও অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশের কারাসমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেলের নিকটে বিহিত ব্যবস্থার জন্যে পাঠানো হলো।

(ক), (খ) ও (গ) শর্তে মেডিকাল অফিসার সুপারিশ করেছেন এবং সার্টিফিকেটও দিয়েছেন।

(১) কয়েদীকে দেখা-শুনা করার জন্যে তার আত্মীয়-স্বজনরা আছেন।

স্বাক্ষর, ডি· কে· মুখার্জি
জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

(১১) কারাসমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেলের সুপারিশ ও মন্তব্য ঃ

নম্বর ১৮৬৮১/ই ৩৮
লখ্‌নউ
৮ই আগস্ট, ১৯২৫

রেফারেন্স ঃ এই অফিসের ডি· ও· নম্বর ২৫১৮/৩১-৭-২৫

যুক্ত প্রদেশের জুডিসিয়েল (ক্রিমিনাল) বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারির নিকটে পাঠানো হলো এবং তার সঙ্গে এই মন্তব্য যোগ করা হলো যে কয়েদীকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। তার ওজন অনেক কমেছে এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রিপোর্ট করছেন যে কয়েদীর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটছে।

স্বাক্ষর (অস্পষ্ট)
লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্নেল, আই· এম· এস·
কারাসমূহের অস্থায়ী ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেল, যুক্ত প্রদেশ

* ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কানপুর জেলে ভর্তি হওয়ার সময়ে আমার ওজন ১১২ পাউন্ড ছিল। (মু· আ·)

প্রেরক নম্বর ৫০৯৭

আর· ডব্লিউ· বেনেট এস্কোয়ার, আই· সি· এস·, যুক্ত প্রদেশের গবর্নমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি

ভারত গবর্নমেন্টের সেক্রেটারি হোম ডিপার্টমেন্ট (পলিটিকাল) বরাবরে

নাইনিতাল

৩১শে আগস্ট, ১৯২৫

বিষয়ঃ কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কয়েদী মুজফ্ফর আহ্মদকে স্বাস্থ্যাবনতির অজুহাতে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব

জুডিসিয়েল (ক্রিমিনাল) ডিপার্টমেন্ট

মহাশয়,

আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে হোম ডিপার্টমেন্টের নম্বর ডি ১৬১৩/২৫ পলিটিকাল, ১৩ই জুলাই ১৯২৫, পত্রে যে লেখালেখি শেষ হয়েছে তার উল্লেখ করে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় দণ্ডিত ৬৫৭৫ নম্বর কয়েদী মুজফ্ফর আহ্মদের নাম যেন ভারত গবর্নমেন্টের হুকুমের জন্যে পাঠিয়ে দিই। মুজফ্ফর আহ্মদ এখন রায়-বেরেলি ডিস্ট্রিক্ট জেলে আবদ্ধ আছে।

(২) এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে বন্দী প্রাথমিক টিউবার-কিউলোসিস্ রোগে ভুগছে এবং ১৯২৪ সালের ৫ই জুলাই তারিখে রায়-বেরেলি জেলে ভর্তির সময় থেকে ধীরে ধীরে তার ওজন কমে যাচ্ছে। গত দু'মাস হতে দ্রুত বেগে তার স্বাস্থ্যা-বনতি ঘটছে। ভর্তির সময়ে তার শরীরের ওজন ৯৫ পাউন্ড ছিল। এখন তা কমে ৮১ পাউন্ড হয়েছে। কিছুদিন আগে হতে তার অনিয়মিত জ্বর হচ্ছে।

(৩) এই ধরনের ক্ষয়রোগ প্রায়ই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে। রোগী দ্রুত অবসন্ন হয়ে পড়তে পারে। স-পরিষদ গবর্নর সুপারিশ করছেন যে ভারত গবর্নমেন্টের নিকটে আবেদন করা হোক যে তাঁরা যেন যত শীঘ্র সম্ভব মুজফ্ফর আহ্মদের মুক্তি মঞ্জুর করেন। ভারত গবর্নমেন্টের নিকট হতে মুক্তির নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত স-পরিষদ গবর্নর কয়েদীকে রায়-বেরেলি জেল হতে আলমোড়া ডিস্ট্রিক্ট জেলে বদলী করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আমি আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য
স্বাক্ষর, জে· আর· ডব্লিও বেনেট
ডেপুটি সেক্রেটারি

টেলিগ্রাম / এক্সপ্রেস

নং ১-২৭৮/২৫ পলিটিকাল ব্রাঞ্চ ঃ ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫

উপাও, নাইনিতাল

আপনাদের ৩১শে আগস্ট তারিখের ৫০৯৭ নম্বর পত্রের জওয়াবে ভারত গবর্নমেন্ট মুজফ্ফর আহ্মদকে মুক্তি দিতে রাজী হয়েছেন।

এই ফাইলটি ২, ৭ এবং ১০ পৃষ্ঠাগুলির ওপরে হোম ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই পৃষ্ঠাগুলিতে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কয়েদী মুজফ্ফর আহ্মদের সাম্প্রতিক কর্ম-চাঞ্চল্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

গত বছর তাকে অসুস্থতা ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সংযুক্ত প্রদেশের (P. U. C) পত্র হতে বোঝা যাচ্ছে যে কোনো শর্তে আবদ্ধ না করেই মুজফ্ফর আহ্মদকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই কারণে এটা বলা যেতে পারে যে কমিউনিস্ট কার্যকলাপে আবার বিশেষরূপে যোগ দিয়ে সে কোনো শর্ত ভঙ্গ করেনি। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটা তো এই ঘটল যে মুজফ্ফর আহ্মদের মতো একজন লোক মুক্তি পাওয়া মাত্রই যে সে তার পুরানো পথ ধরল তাতে জনসাধারণের মনে কি দাগ কাটবে? কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার রায়, বিশেষ করে ইলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় গবর্নমেণ্টকে খুব বড় রকমে সাহায্য করেছে। এই রায় জনসাধারণের সেই অংশের মনে বিশ্বাস জন্মিয়েছে, যাঁরা বলশেভিক ষড়যন্ত্রের কথা বিশ্বাস করতে পারতেন না, যাঁরা ভাবতে পারতেন না যে এর পেছনে বিপদ লুকিয়ে আছে এখন তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন যে অল্পকাল আগে দণ্ডিত হলেও মুজফ্ফর আবার জেলের বাইরে এসেছে এবং একজন কর্মব্যস্ত কমিউনিস্ট হিসাবে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় সাধারণকে কোনো দোষই দেওয়া যায় না যদি তাঁরা মনে স্থির করে নেন যে গবর্নমেণ্ট সে-সব কাজকে এখনও গভীরভাবে গ্রহণ করেন না, যে-সব কাজের জন্য মুজফ্ফর আহ্মদ ও তার সঙ্গের ষড়যন্ত্রকারীরা সাজা পেয়েছিল। এরূপ ধারণা যদি সাধারণের মনে জন্মায় তবে তা সব দিক হতেই দুঃখজনক হবে। যদি এই ঘটনা সত্য হয় মুজফ্ফর আহ্মদ কোনো রকম শর্তের বন্ধন ছাড়াই মুক্তি পেয়েছে তবে তার পুরানো কাজে তার দ্রুত আগমন হতে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে তার মতো স্বভাবের লোককে শর্তের কঠোরতম বন্ধনে না বেঁধে কখনও মুক্তি দেওয়া উচিত নয়। মুজফ্ফর আহ্মদ যদি প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে থাকে তবে তার যে রকম কাজকর্মের রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে তাতে তার স্থান হওয়া উচিত কারাগারে। দুর্ভাগ্যবশত তাকে যে-ভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছে তা আমাদের তাকে আবার জেলে পাঠানোতে বাধা দিচ্ছে।

স্বাক্ষর, ডি· পেট্রি
২০· ১· ২৬

মুজফ্ফর আহ্মদের মুক্তি সম্বন্ধে আমাদের যে কাগজপত্র আছে আমায় তা দেখানো হোক।

স্বাক্ষর· জে· ক্রেরার
২১· ১· ২৬

ইউ· পি· গবর্নমেণ্ট তাদের ৩১শে আগস্ট ১৯২৫, তারিখে মুজফ্ফর আহ্মদকে তার প্রাথমিক যক্ষ্মারোগ হওয়ার কারণে তার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন। ভারত গবর্নমেণ্ট শুধু টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাদের মঞ্জুরী জ্ঞাপন করেছিলেন।
Sd J. Mc. D.

আই· বি· (ডিরেক্টর ইনটেলিজেন্স ব্যুরো) এই পৃষ্ঠাগুলি দেখুন। আমি দুঃখিত যে সেই সময়ে তাঁকে এসব দেখানো হয়নি। ভবিষ্যতে এই জাতীয় ব্যাপারে শর্তমূলকভাবে কয়েদ স্থগিত রাখার বা রেমিশন দেওয়ার পাল্টা ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখা হোক। এতে অসুবিধা এই আছে যে শর্তসমূহ আইন

অনুসারে বন্দীকেই সই করতে হয়। বর্তমান ব্যাপারে তা পাওয়ার কোনা আশাই ছিল না। কিন্তু মেডিকাল রিপোর্ট নির্দেশ দিচ্ছিল যে রোগীকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিতে হবে।

স্বাক্ষর· জে· ক্রেরার
২৫· ১· ২৬

প্রকৃত ঘটনা বলতে গেলে মুজফ্ফর আহ্মদের বাস্তবিক মুক্তি সম্পর্কে হোম ডিপার্টমেণ্টের কাগজগুলি আমায় দেখানো হয়েছিল। কিন্তু আমি জানতাম না মুক্তির নির্দেশ শর্তমূলক ছিল, না, বিনা শর্তে। একথা সত্য যে মুক্তির শর্তে বন্দীকেই সই দিতে হবে। তবে, আমি খুব জোরের সঙ্গে সুপারিশ করব যে ভবিষ্যতে এই রকম ব্যাপারে শর্তের বন্ধনে মুক্তি বা রেমিশনের পরীক্ষা যেন করা হয়। সেক্রেটারি তাই করার প্রস্তাব দিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে এই রকম প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার চেয়ে গ্রাহ্যই বেশী হবে।

এই বিশেষ ব্যাপারে মুজফ্ফর আহ্মদ আমাদের বোকা বানিয়ে ছেড়েছে। তারও বেশী এই হলো যে মনে হচ্ছে, সে আবার আন্দোলনে ফিরে এলো এবং ফিরে এলো "দু'পায়ে হেটে" ('with both feet')

স্বাক্ষর· ডি পেট্রি
২৭· ১· ২৬

ডেভিড পেট্রি কি চেয়েছিলেন? তিনি কি চেয়েছিলেন যে জেল হতে মুক্তি পাওয়ার পরে আমি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাই? আমি তাঁকে খুশী করতে পারিনি। মানুষের জন্ম শুধু একবারই হয়। কাজেই পৃথিবীতে কে না বেঁচে থাকতে চান? আজ যে আমার আশি বছর বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে, আমার বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে যায়নি। সার ডেভিড পেট্রি বোধ হয় এ পৃথিবীতে আর নেই।

আমি আলমোড়ায় জেল হতে মুক্তি পেয়ে সেখানে তিন মাসের বেশী কাল ছিলেম। স্বাস্থ্য কিছু ভালো হয়েছিল। আলমোড়া হতে দেহ্রাদুন (উসমানীকে দেখতে গিয়েছিলেম) ও কানপুর হয়ে ১৯২৬ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখে কলকাতা ফিরেছিলেম। এখানে ফিরেই ৩৭, হ্যারিসন রোডের দোতালায় ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্টস পার্টির (তখন নাম ছিল লেবর স্বরাজ পার্টি) আফিসে মেঝেয় বিছানা পেতেছিলেম। ২০শে জানুয়ারী তারিখে ডি· পেট্রি ভারত গবর্নমেণ্টের হোম সেক্রেটারি মিস্টার ক্রেরারের নিকটে আমার কর্ম-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন। এখন এসব পুরানো রিপোর্ট পড়ে আমি আশ্চর্য হয়েছি যে দু'সপ্তাহের ভিতরে আমি এমন কি কাজ করেছিলেম যার জন্য পেট্রি এত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন? এই ফাইলটি আমি দেখতে চেয়েছিলেম, কিন্তু আমার বন্ধুরা তা খুঁজে পাননি। ১৯২৬ সালে তো আমি প্রায়ই অসুস্থ থাকতাম। তা ছাড়া, পেট্রিরা আমার পেছনে লোক লাগিয়ে রেখে (Surveillance) আমার সারা রাজনীতিক জীবনকে বিষময় করে রেখেছিলেন। ডেভিড পেট্রির নিযুক্ত-করা লোক জানকীপ্রসাদ বাগেরহাট্টা তো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি পর্যন্ত হয়েছিল। পরে সে আমাদের নিকটে ধরা পড়ে যায়। হালে শুনেছি এই লোকটি মারা গেছে।

কানপুর কমিউনিস্ট কন্‌ফারেন্স

কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় আসামী করার জন্যে সরকার পক্ষ তেরটি নামের একটি তালিকা তাঁদের কৌঁসুলীদের নিকটে দাখিল করেছিলেন। সেই তালিকায় শেষ নামটি ছিল সত্যভক্তের। গবর্নমেণ্টের কৌঁসুলিরা সত্যভক্তের নাম সহ পাঁচটি নাম কেটে দেন। আগেই বলেছি যে নাগপুর হতে 'প্রনবীর' নামে একখানি হিন্দী সাপ্তাহিক তিনি বা'র করতেন। পুলিস রিপোর্ট হতে আমরা জানতে পারছি যে ডাঙেগর 'সোশ্যালিস্ট' বা'র হওয়ার পরে তিনি ডাঙেগর সঙেগ পত্র লেখালেখি করতেন এবং কি কি বই পড়বেন তা জানতে চাইতেন। আমাদের মোকদ্দমা শুরু হওয়ার আগে কোনো সময়ে তিনি কানপুরে উঠে এসেছিলেন এবং ওই শহরের পটকাপুরে একটি পুস্তকের দোকান খুলেছিলেন। পুস্তক সে দোকানে কি পরিমাণে ছিল তা জানিনে, তবে তাঁর 'সোশ্যালিস্ট বুক শপে'র বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো।

ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের লোকেরা যে কানপুর মোকদ্দমার আসামীর তালিকায় সত্যভক্তের নামও ভুক্ত করেছিলেন, আর ভারত গবর্নমেণ্টের কৌঁসুলিরা সে নাম কেটে দিয়েছিলেন, এ খবর কি তিনি জানতেন? আমার মনে হয় তিনি তা জানতেন না। আমরা হাল আমলে জাতীয় মুহাফিজখানায় দলীলপত্র পড়েই শুধু এ খবর জেনেছি। খবরটি সত্যভক্তের জানা থাকলে তিনি কানপুরে তাঁর 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি'র গঠনে কিছুতেই এগিয়ে আসতেন না। বড় ভীরু ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাঁর লেখা হতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে, তাঁর প্রেরণার উৎস যদি আর কোথাও থাকে সেটা আলাদা কথা।

কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার হাই কোর্টের আপীল ডিস্‌মিস্‌ হয়েছিল ১৯২৪ সালের নবেম্বর মাসের ১০ তারিখে। সত্যভক্ত তার জন্যে অপেক্ষা করেননি। সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখে (কেউ কেউ ১০ তারিখও বলেছেন) তিনি কানপুরে 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি' (The Indian Communist Party) গঠিত হওয়ার কথা ঘোষণা করে দিলেন। সেই সময়ে কলকাতার একখানি সংবাদপত্রে তিনি লিখলেন যে "in the Cawnpore Bolshevik Conspiracy Case it has been settled that to have faith in Communism in itself is no offence. Thus the fear of the law against Communism has been removed."[১]

["কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় এটা স্থির হয়ে গেছে যে কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাস করা কোনো অপরাধ নয়। অতএব কমিউনিস্ট মতবাদের বিরুদ্ধে যে আইনের ভীতি আছে তা দূরীভূত হয়েছে।"] (কর্নেল সি. কে. লিখিত 'কমিউনিজ্‌ম ইন্ ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকের ১৪৩ পৃষ্ঠা।)

সত্যভক্ত প্রচারিত দু'টি ইংরেজি বিজ্ঞপ্তি আমরা দেখেছি। প্রথম বিজ্ঞপ্তি

১ Quoted by Col. C. Kaye in his "Communism in India", page 143

প্রচারের তারিখ ১৮ই জুন, ১৯২৫। তার শিরোনাম হচ্ছে 'The Future Programme of the Indian Communist Party' (ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ভবিষ্য-কর্ম পদ্ধতি)। দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তির শিরোনাম 'The First Indian Communist Conference' (প্রথম ভারতীয় কমিউনিস্ট কন্‌ফারেন্স)। আগেকার বিজ্ঞপ্তির মতো এ বিজ্ঞপ্তিও কানপুর হতে প্রচারিত, তারিখ, ১২ই অক্টোবর. ১৯২৫। আমার এই পুস্তকে ক্রমশই স্থানাভাব ঘটছে। পুস্তকের এই খণ্ডটিতে যদি আমি এই দু'খানি দলীল তুলে দিতে পারতাম তবে তথ্যানুসন্ধানকারীদের পক্ষে সুবিধা হতো। কিন্তু দিতে পারা গেল না।

প্রথম দলীলখানার নাম 'প্রোগ্রাম' হলেও তাতে কোনো প্রোগ্রাম নেই। তাতে 'ফ্রিডম' (মুক্তি) ও 'স্বরাজ' এই দু'টি কথা আছে। অন্য কিছু তো দূরের কথা তাতে 'পরিপূর্ণ স্বাধীনতা'র কথা পর্যন্ত নেই। মাওলানা হস্‌রৎ মোহানী. যিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের আহ্‌মদাবাদ অধিবেশনে (১৯২১) সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তিনি কি করে কানপুরে সত্যভক্তের বাচালতা সহ্য করলেন তা বুঝি না। কানপুর কমিউনিস্ট কন্‌ফারেন্সে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে যে বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন তা প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। সত্যভক্তেরই মত তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার আন্তর্জাতিক অর্থ সাহায্যে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু আন্তর্জাতিকতার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পরে তিনি অত্যন্ত কাপুরুষতা প্রদর্শন করেছিলেন। মোকদ্দমায় আমাদের সাজা হয়ে যাওয়ায় ব্রিটিশ ও ভারত গবর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। ভারতে যে বলশেভিকবাদের প্রবেশ ঘটছে সেটা প্রমাণিত হয়েছিল। সেজন্য ভারত গবর্নমেণ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে একক সিঙ্গারাভেলুর বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা চালানোর আর প্রয়োজন হবে না। তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তুলে নেওয়ার কাজ অগ্রসরই হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর আর তর সইল না। তিনি পুলিসের নিকটে "unqualified apology" (নির্জলা মার্জনা ভিক্ষা) চেয়ে বসলেন।[1]

ক্রমে আমাদের চোখের সামনে পুরানো কাগজপত্র বের হয়ে পড়ছে। আমরা সে সব পড়ছি আর স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। কী ক্ষতিই না এ সব লোক আমাদের পার্টির করেছেন!

খুব সুখের বিষয় যে সেই সময়ের কমিউনিস্টরা সত্যভক্তদের মতের সমর্থন করেননি। সত্যভক্ত শেষ পর্যন্ত কন্‌ফারেন্সে থাকলেন না। একটি খদ্দরের ঝোলার ভিতরে তাঁর কাগজপত্র ভরে নিয়ে তিনি সেই যে চলে গেলেন তারপরে তাঁর সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হয়নি। সম্প্রতি খবর পেলাম যে তিনি বেঁচে আছেন এবং বৃন্দাবনে বাস করছেন। তুলসীমালা কণ্ঠে ধারণ করেছেন কিনা সে খবর পাইনি।

কনফারেন্স হতে চলে যাওয়ার পর তিনি আর একটি 'National Communist Party' (জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি) গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন। কাগজে লেখালেখিও করেছিলেন, কিন্তু সফলকাম হননি। চলে

1 The Government, having accepted an unqualified apology tendered by Singaravelu Chettiar of Madras,...passed orders for withdrawal of the Charge against him. (Extract from the "Pioneer" 30.6.24) Home Deptt. Poll. File No. 261. 1924.

যাওয়ার সময়ে সত্যভক্ত তাঁর পার্টির কাগজপত্র, সভ্যদের নামের তালিকা ও হিসাব ইত্যাদি দিয়ে যাননি। আমরা হসরৎ মোহানী সাহেবকে ছাড়া আর কিছুই পেলাম না, তাঁকেও আমাদের ছাড়তে হয়েছিল।

সত্যভক্ত কেন সাত তাড়াতাড়ি কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন, কেন তিনি হাইকোর্টের ফয়সলা কি হবে তা জানার জন্যে কয়েকটি দিনও অপেক্ষা করলেন না, কী তাঁর এই কাজের গূঢ় অর্থ ছিল তা বোঝা মুশ্‌কিল। তিনি না করলে কি এই কাজটি অন্য কেউ করতেন? তাঁর বিজ্ঞাপিত কমিউনিস্ট পার্টিতে কিন্তু কমিউনিস্ট মতবাদের এতটুকু গন্ধও মাখানো ছিল না।

আমি আগেই বলেছি যে আলমোড়া জেলে মাত্র একরাত্রি বাসের পরে আমি জেল হতে মুক্তি পাই। সেখানেই স্বাস্থ্যোদ্ধারের চেষ্টা করছিলেম। সত্যভক্তের নিকট হতে একখানি পত্র পেলাম যে কানপুরে কমিউনিস্ট কনফারেন্স হচ্ছে। আমি যেন অবশ্যই যোগ দিই। মনি-অর্ডার যোগে ত্রিশটি টাকাও তিনি আমায় পাঠিয়েছিলেন।

কানপুরে এসে যাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল তাঁরা ছিলেন লাহোরের শাম্‌সুদ্দীন হাস্‌সান, বোম্বের এস. ভি. ঘাটে কে. এন. জোগলেকর, আর, এস, নিম্বকর, বিকানীরের জানকীপ্রসাদ বাগেরহাট্টা, ঝান্সীর অযোধ্যাপ্রসাদ ও মাদ্রাজের সি, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার। অযোধ্যাপ্রসাদ আমায় বলেছিল সে কৃষ্ণস্বামী রাজাগোপালআচারীর ভ্রাতুষ্পুত্র। পরে কৃষ্ণস্বামী নিজেও তা আমায় বলেছিলেন। মাওলানা হস্‌রৎ মোহানী ও মায়লাপুরম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের সঙ্গে দেখা তো হয়েছিলই। অর্জুনলাল শেঠী ও কুমারানন্দের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। আরও একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁর নাম রাধামোহন গোকুলজী। হিন্দী লেখকদের মধ্যে সম্মানিত ও হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে একজন নেতা ছিলেন তিনি। নেপালে গিয়ে তিনি নির্বাসিত মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে দেখাও করে এসেছিলেন। এটাও ছিল তাঁর একটি 'বিপ্লবী' পরিচয়। শাম্‌সুদ্দীন হাস্‌সানের নামের উল্লেখ বারে বারে আমাদের মোকদ্দমায় হয়েছে। ডাঙ্গের সংস্রবে জোগলেকর ও টি. ভি, পার্বতের নামেরও আমাদের মামলায় উল্লেখ হয়েছে। কানপুরে পার্বতে আসেননি। নলিনী ও ডাঙ্গের কথাবার্তার ভিতর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ লজ্‌ ও ঘাটের নাম এসেছে। নলিনী বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ লজের টেবিলে তিনি আমাদের সাহিত্য ছড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। মুলসীপেটা সত্যাগ্রহের সংস্রবে ডাঙ্গে তার 'বন্ধু' নিম্বকরের নাম বলেছিল। তাঁদের কারুর সঙ্গে আমার আগে কখনও ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। আমি কানপুর মোকদ্দমার আসামী ছিলাম বলে তাঁরা আমার নাম জেনেছিলেন। অনেকে লিখেছেন কানপুর কনফারেন্সের কাজে জোগলেকর বড় বেশী খেটেছে। আমার চোখে কিন্তু তা পড়েনি। আমি ঘাটেকেই বেশী খাটতে দেখেছি। টাইপ ইত্যাদি করে দিত। থাকত কনফারেন্সের ছোট তাঁবুতে। জোগলেকর ও নিম্বকর অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিল। জোগলেকর সে বছর অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে প্রথম নির্বাচিত হয়। সে আমায় বলেছিল নির্বাচনে সে কিছু পয়সাও খরচ করেছে। তারা কংগ্রেস ক্যাম্পে থাকত। অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভ্য হওয়ার গরমটাই ছিল তাদের ভিতরে বেশী। জানকীপ্রসাদও অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিল। কিন্তু সে কমিউনিস্ট কন্‌ফারেন্সের ছোট্ট তাঁবুতে আমাদের সঙ্গে থাকত।

মস্কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আসামী (পরে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমারও আসামী) লাহোরের মীর আবদুল মজীদ কানপুর কমিউনিস্ট

কন্‌ফারেন্সে যোগ দেয়নি। কিছু কিছু রিপোর্টে এবং কোনো কোনো পুস্তকেও, ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে যে আবদুল মজীদ কানপুর কন্‌ফারেন্সে যোগ দিয়েছিল। একথা সত্য যে আবদুল মজীদ তার অনুপস্থিতিতে পার্টির এক্‌জেকিউটিব কমিটির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিল। মজীদ প্রবাসে গঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিল। এই পার্টিই তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের অংগীভূত (Section) হয়েছিল।

আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। শাপুরজি সাকলাতওয়ালা ভারতীয়। কিন্তু তিনি ইংল্যাণ্ডে বাস করতেন। টাটাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। রতন টাটার ভাগিনেয়, ও জামশেদপুরের কারখানার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন তিনি ছিলেন। ব্রিটেনের পার্লামেণ্টের তিনি সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার কারণে তিনি টাটাদের আফিস হতে বিতাড়িত হয়েছিলেন। সত্যভক্ত সাক্‌লাতওয়ালার সঙ্গে লেখালেখি ক'রে তাঁকে কানপুর কন্‌ফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট হতে অনুরোধ করেন। আশ্চর্য এই যে সাকলাতওয়ালা কোনো দিক হতে কোনো খবর না নিয়েই তাতে রাজী হয়ে যান। এই খবরটি সারা-ভারতে প্রচারিত হয় কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি সাকলাত-ওয়ালাকে এক অজ্ঞাত কুলশীল কমিউনিস্ট পার্টির কন্‌ফারেন্সে প্রেসিডেণ্ট হতে বারণ করে দিলেন। ভালোই হলো। তারপর সিংগারাভেলু চেট্টিয়ারকে প্রেসিডেণ্ট করা হয়। তিনি মতের দিক হতে সত্যভক্তের পক্ষে নিরাপদ ব্যক্তি ছিলেন।

সমস্ত কন্‌ফারেন্সটি ছিল একটি ছেলেখেলার ব্যাপার। একটি তাঁবুর ভিতরে কে ঢুকছিলেন, কে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। ২৬শে ডিসেম্বর (১৯২৫) তারিখে, কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনের সময় সত্যভক্তকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সিংগারাভেলুর বক্তৃতার তরজমা করতে গিয়ে একজন বারে বারে ভুল করছিলেন। জালিব সাহেব কন্‌ফারেন্সের ভিতরে বসেছিলেন। তিনি লখ্‌নউর বিখ্যাত উর্দু দৈনিক 'হাম্‌দমে'র বিখ্যাত সম্পাদক ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে সমস্ত বক্তৃতা উর্দুতে তরজমা করে দিলেন। "বুর্জুআজি"কে (ছাপানো হয়েছিল) আগাগোড়া তিনি 'বরগিজ' উচ্চারণ করে গেলেন। দিগ্‌গজ ব্যক্তি ছিলেন ব'লে কেউ কিছু বললেন না।

এস. ভি. ঘাটে ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৬) তারিখে 'নিউ এজ' (New Age) নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকে লিখেছে যে কানপুরের কমিউনিস্ট কন্‌ফারেন্স গণেশশংকর বিদ্যার্থীর আশীর্বাদপুষ্ট ছিল। সত্যই কি তাই? তাই যদি হবে, তবে বিরাট কংগ্রেস নগরের চৌহদ্দীর ভিতরে তাঁবু খাটাবার জন্যে একখণ্ড জমি কেন তিনি কমিউনিস্ট কন্‌ফারেন্সকে দিলেন না? অন্য কত কত সংগঠনকে তো তিনি জমি দিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কানপুর কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়েছিল তার অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারি ছিলেন গণেশশংকর বিদ্যার্থী। এ সব ব্যাপারে তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ছিল। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আমি এখানে বলব না। কিতাব বড় হয়ে যাচ্ছে। কানপুর কমিউনিস্ট কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়েছিল কংগ্রেস নগরের বাইরে রাস্তার অপর পারে কৃষকদের একখণ্ড জমির ওপরে। সাকলাতওয়ালা কানপুর কন্‌ফারেন্সে বাণী পাঠিয়েছিলেন এ কথা সত্য। কিন্তু এম. এন. রায় বাণী কখনও পাঠাননি। তিনি এই সব ব্যাপারের কঠোর সমালোচনা ক'রে ঘাটে ও জানকীপ্রসাদকে একাধিক দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম কখন স্থাপিত হয়েছিল এবং তা যে

কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের অঙ্গীভূত ছিল প্রমাণসহ তার উল্লেখ আমি অন্যত্র করেছি। সেটাই তো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার প্রকৃত সময়। এই প্রতিষ্ঠার সময় নিরূপণ করার জন্য দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি কানপুরের দিকে কেন ছুটলেন? কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল কি তাঁদের চোখের বালি ছিল? সহজেই বোঝা যায় ডাঙ্গের প্রভাবে এই ব্যাপারটি ঘটেছে। সত্যভক্তের মতো ডাঙ্গেও 'ইণ্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি'ওয়ালা ছিল। ১৯২৭ সালে ডাঙ্গে জেল হতে মুক্তি পাওয়ার পরে মহারাষ্ট্রের কোনও জায়গা হতে 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি' সম্বন্ধে সে যা বলেছিল তাতে দেশে-বিদেশে সকলে বুঝেছিলেন যে সে আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করে না। এই জন্যে আমাদের ইউরোপ হতে প্রকাশিত 'The masses of India' (ভারতের জনগণ) নামক কাগজে ডাঙ্গের অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা হয়েছিল। তারপর হতে ডাঙ্গে এ বিষয়ে চুপ মেরে গেছে। আমার 'প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' (The Communist Party of India and its Formation Abroad) নামক পুস্তক বা'র হওয়ার পরে সে আমাকে দীর্ঘ পত্র লিখেছিল। তাতে মোদ্দা কথা এই ছিল যে ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের অঙ্গীভূত হওয়ার কথায় তার সন্দেহ আছে। এই পত্র পাওয়ার পরে কলকাতায় আমাদের পার্টি আফিসে ডাঙ্গের সঙ্গে আমার দেখা এবং কথা হয়েছিল। কমরেড জ্যোতি বসু তখন উপস্থিত ছিলেন, এখানেও সে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের সংযুক্তিকরণ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। সে আমায় বলেছিল "ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে যে-ভাষা তুমি ব্যবহার করেছ তা খুবই সংযত।" বলা বাহুল্য ডাঙ্গে আমার মূল বাঙলাও পড়েছিল। আশ্চর্য এই যে আমাকে যখন ডাঙ্গের গালি দেওয়ার প্রয়োজন হলো তখন সে বলে বসল যে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতো একজন বৃদ্ধ লোকের প্রতি আমি অসংযত ভাষা ব্যবহার করেছি! যাক, কানপুরের কমিউনিস্ট কন্‌ফারেন্সকে আমি একটি লজ্জাকর ব্যাপার মনে করি। এর আগে পেশোয়ারে তিনটি কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হয়ে গেল, কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হলো, আর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হলো কিনা সত্যভক্তের তামাসা হতে? আমরা কয়েকজন লোক কানপুরে একটি কমিটি গঠন করেছিলেম। আমরা তা করতে বাধ্য হয়েছিলেম। সত্যভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নামটিকে কলঙ্কিত করছিল। সত্যভক্ত এই ব্যাপার না ঘটালে কমিউনিস্ট পার্টি তো গোপন (Underground) পার্টি হতো, ডাঙ্গে হয়তো সে পার্টিতে থাকত না। কানপুর মোকদ্দমার আগে ডাঙ্গে তার চিঠিপত্রে কখনও লিখত যে সে গোপনতায় বিশ্বাসী নয়। তেমন চিঠি মামলার এক্‌জিবিটে আছে। আবার তার গোপনে লেখা পত্রাদিও এক্‌জিবিটে আছে। যাঁদের সঙ্গে সে পত্রালাপ করছে তাঁদের জানতে না দিয়ে সে নিজের বাড়ীর সর্বজনবিদিত ঠিকানায় গোপন পত্রাদি গ্রহণ ক'রে কমরেডদের ঠিকানা ও পরিচয় পুলিসের নিকটে ফাঁস করে দিত।

ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টি

প্রথম দেওয়া নামটি দু'তিনবার বদল হয়ে নাম দাঁড়িয়েছিল **"ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টি"।**

স্থাপনার তারিখ ছিল পয়লা নবেম্বর, ১৯২৫। স্থাপনার স্থান বাঙলা দেশের কলকাতা। প্রথমে এই পার্টির ইংরেজি নাম ছিল **দি লেবর-স্বরাজ পার্টি অফ দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত শ্রমজীবী-স্বরাজ পার্টি)।** এই থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে পার্টির প্রথম প্রতিষ্ঠাতারা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে একটি রাজনীতিক দলরূপে গণ্য না ক'রে তাকে একটি রাজনীতিক মঞ্চ হিসাবে দেখেছিলেন। তখন পার্টির বাঙলায় নাম ছিল **"ভারতীয় জাতীয়-মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দল"।** কিন্তু ইংরেজি নামটিই ছিল আসল নাম। কারণ দেশের অন্যত্র ও বিদেশে এই নামটিই প্রচারিত হয়েছিল। আমরা দেখেছি আমেরিকান ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের দৃষ্টিও লেবর-স্বরাজ পার্টি আকর্ষণ করেছিল। ঝেনিয়া জুকফ ইউদিন ও রবার্ট সি· নর্থ (Xenia Jukoff Eudin and Robert C. North., Stanford University) তাঁদের Soviet Russia and the East (সোবিয়েৎ রাশিয়া এণ্ড দি ইস্ট) নামক পুস্তকের ঘটনা তালিকায় (Chronology) ১৯২৫ সালের পয়লা নবেম্বর তারিখে কলকাতায় "লেবর-স্বরাজ পার্টি" প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন।

এই পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে আমি আলমোড়ায় ছিলেম। প্রধান উদ্যোগ গ্রহণকারীদের ভিতরে চারজন বিশেষভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের নাম : (১) কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ (Qutbuddin Ahmad) (২) হেমন্তকুমার সরকার (৩) কাজী নজরুল ইস্‌লাম (Qazi Nazrul Islam) এবং (৪) শামসুদ্দীন হুসয়ন (আবদুল হালীমের জ্যেষ্ঠ সহোদর)। আবদুল হালীমও উদ্যোগীদের ভিতরে ছিল। কিন্তু তার জ্যেষ্ঠাগ্রজ পার্টি গঠনের কাজে থাকায় তার নামটি প্রথম চারজনের মধ্যে ধরা হয়নি। একথা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আবদুল হালীমকে তার জ্যেষ্ঠাগ্রজ রাজনীতিতে আনেননি। অনুজের অনুসরণ করেই অগ্রজ আমাদের সঙ্গে রাজনীতিতে এসে পড়েছিলেন। কমরেড আবদুল হালীম ভারতের ভিতরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ। তার কার্যারম্ভকাল ১৯২২ সালে, এস· এ· ডাঙ্গের কিছু আগে বা একই সময়ে। কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব ১৯২২ সাল হতেই কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। যদি নজরুল ইস্‌লাম ও আমার খবরের কাগজের কোম্পানী করাকে রাজনীতিক কাজ হিসাবে ধরা যায় তবে বলতে হবে ১৯২১ সাল হতেই তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন।

১৯২০ সাল হতে খবরের কাগজ চালানোর ভিতর দিয়ে নজরুল ইস্‌লাম আর আমি রাজনীতি করেছি। ১৯২১ সালের শেষাশেষিতে আমরা মার্কসবাদের

পড়াশুনা করব ব'লে স্থির করেছিলেম। কিছু পুঁথিপুস্তকও সেই সময়ে কিনেছিলেম। একথা আগে উল্লেখ করেছি।

হেমন্তকুমার সরকার ভাষাতত্ত্বের বিখ্যাত ছাত্র ও স্বর্ণপদকধারী। ভিতরে ভিতরে কোনো ধরনের বৈপ্লবিক রাজনীতিতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন কিনা তা আমি জানিনে। তবে ডাক্তার সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত কি একটি পার্টিতে সুভাষ বসু ও তিনি যোগ দিয়েছিলেন। শুনেছি ওটা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টি ছিল না। সুভাষ বসুর সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। পরে দু'জন সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, কিন্তু কিছুকাল পরে আবার গৃহে ফিরে আসেন। হেমন্তকুমার সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের গবেষণা যখন করছিলেন তখন হঠাৎ সব কিছু ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং কয়েকমাস জেলও তিনি খেটেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে সাপ্তাহিক 'বাঙ্গালার কথা'র সহকারী সম্পাদকও তিনি ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার পরে হেমন্তকুমার কৃষক আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। এই সময়ে তাঁর ভূমির মালিক বন্ধুরা তাঁদের শ্রেণীস্বার্থের প্রেরণায় রটিয়ে দিলেন যে তিনি একজন পুলিসের চর।

কলকাতা, ৩৭, হ্যারিসন রোডের (একটি বোর্ডিং হাউসের বাড়ী) দোতলায় দু'খানি ঘর ভাড়া নিয়ে এই পার্টির প্রথম আফিস স্থাপিত হয়েছিল।

লেবর-স্বরাজ পার্টির প্রথম গঠন-প্রণালী, প্রোগ্রাম ও পলিসি ১৯২৫ সালের পয়লা নবেম্বর তারিখেই ৩৭, হ্যারিসন রোড (এখন নাম মহাত্মা গান্ধী রোড) হতে কাজী নজরুল ইস্‌লামের স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল। 'লাঙল'-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় (৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৫) এই দলীলগুলি ছাপা হয়েছিল। এই দলীলগুলি আবার 'মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা'র (১৯২৯-৩৩) পি ৫৪৬ (১৩) নম্বর এক্‌জিবিট।

১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে লেবর-স্বরাজ পার্টির (শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দলের) মুখপত্ররূপে একখানি বাঙলা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। তার নাম ছিল 'লাঙল'। এ পত্রিকার কভারের পৃষ্ঠায় 'লাঙল' নামের পরে লেখা থাকত ঃ

প্রধান পরিচালক
নজরুল ইস্‌লাম

সম্পাদক
মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নগদ মূল্য এক আনা ঃ বার্ষিক তিন টাকা

সম্পাদক হিসাবে মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম ছাপা হতো সত্য, কিন্তু সম্পাদনার কাজ তিনি করতেন না, কিছুই করতেন না। তিনি এক সময় নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গে বাঙালী পল্টনের সৈনিক ছিলেন। তারপরে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে গার্ডের কিংবা তার তলাকার কোনো চাকরী নেন। সেই চাকরী চলে যাওয়ার পরে তিনি নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন, আর গান গাইতেন। কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে নজরুলের 'দুর্গম-গিরি-কান্তার-মরু' গান যাঁরা কোরাসে গেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। বহু বৎসর পরে দেখেছিলেম যে তিনি গেরুয়া পরে স্বামী বিরূপাক্ষানন্দ হয়েছেন।

এখন আর বেঁচে নেই। সম্পাদকরূপে তাঁর নাম রাখায় আমাদের কিঞ্চিৎ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তখন তাঁর জায়গায় আমাদের একজন বন্ধু, গঙ্গাধর বিশ্বাস সম্পাদক হয়েছিলেন।

১৯২৬ সালের ১২ই আগস্ট হতে 'লাঙল'-এর নাম পরিবর্তন ক'রে 'গণবাণী' কর হয়। কাগজের কভারের ওপরে লিখে দেওয়া হয়েছিল (এর সাথে 'লাঙল' একীভূত হয়েছে)। নাম পরিবর্তনের কারণ ছিল এই। 'লাঙল' নাম হতে বহুলোক মনে করতেন যে 'লাঙল' শুধু কৃষকদেরই কাগজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাগজ ছিল শ্রমজীবী জনগণের কাগজ। এবারে নূতন ডিক্লারেশন আমি নিজের নামে নিলাম। ধীরে ধীরে কাগজের ভার আমার ঘাড়ে চেপেছিল। আমি ভাবলাম মিছামিছি ঝুঁকিটা কেন অপর এক ব্যক্তির ওপরে চাপিয়ে রাখি। ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আঘাত আমাদের ওপরেও লাগে। মুসলিম নামধারী সম্পাদকের, অর্থাৎ আমার সম্পাদিত 'গণবাণী' হিন্দুরা কেনা কমিয়ে দিলেন। তখন আমার সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক রূপে প্যারীমোহন দাশের নাম ছাপা হতে থাকে। তিনি কোনো কাজ করতেন না। পরে কালীকুমার সেনের নামও যুগ্ম সম্পাদকরূপে ছাপা হয়েছে। তিনি কিছু কাজ করতেন।

লেবর-স্বরাজ পার্টির নাম পরিবর্তন

লেবর-স্বরাজ পার্টি নামকরণের সঙ্গে আমার কোনো সংস্রব ছিল না। আগেই বলেছি যখন এ পার্টি গঠিত হলো আমি তখন আলমোড়ায়। পার্টি গঠনের যে-চারজন উদ্যোক্তার নামোল্লেখ আমি করেছি তাঁরা নিশ্চয়ই এম. এন. রায়ের লেখায় 'ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্ট্স পার্টি' ও 'পিপল্স পার্টি'র নাম পড়ে থাকবেন। কিন্তু এই পার্টি গড়ার সময়ে তাঁদের যে এম. এন. রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তা আমার বিশ্বাস হয় না। কারণ, রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে পার্টির নাম হয়তো লেবর-স্বরাজ পার্টি হতো না। তা ছাড়া,

> "যেহেতু শ্রী অরবিন্দ ঘোষ যেমন বলিয়াছেন শ্রেণীগত স্বার্থত্যাগী ভদ্র যুবক, শ্রমিক ও কৃষকদের সংযোগ না হইলে ভারতের মুক্তি আসবে না।"

এই কথাটা এম. এন. রায় কখনও পার্টি প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করতে বলতে পারতেন না। কোনো মার্কসবাদী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের শিক্ষার কথা তুলতেই পারেন না।

এদিকে হেমন্তকুমার সরকার নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন কৃষ্ণনগরে ডেকেছিলেন। তার প্রথম অধিবেশন ১৯২৫ সালের ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বগুড়া শহরে হয়েছিল। ১৯২৬ সালের ৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হেমন্তকুমার সরকারের আহ্বানে কৃষ্ণনগরে হয়েছিল। প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ঃ

(১) কৃষক শ্রমিক দল গঠন
(২) বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন
(৩) কাউন্সিল নির্বাচন।

এই কন্ফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতি সেক্রেটারি ছিলেন হেমন্ত সরকার, আর সভাপতি ছিলেন শাম্সুদ্দীন আহ্মদ সাহেব, তখন ওখানকার জজ কোর্টের একজন উকীল। ছাত্রজীবন হতে রাজনীতিক আন্দোলনে ছিলেন, পরে বাঙলা দেশের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানে যাঁরা প্রজা ও কৃষক আন্দোলন করতেন তাঁদের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দি[illegible] কলকাতা

হাইকোর্টের বিখ্যাত এডভোকেট ও বাঙলা ভাষার বিখ্যাত লেখক ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম· এ·, ডি· এল· এবং অপর একজন বিখ্যাত এডভোকেট অতুলচন্দ্র গুপ্ত এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ডক্টর সেনগুপ্ত সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাজনীতিতে অতুলচন্দ্র গুপ্ত অগ্রসর চিন্তার ধারক ছিলেন। তিনি জমিদারী প্রথার বিরোধী ছিলেন, তখনকার দিনের মতো দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর মত ঘোলাটে ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতাকেই তিনি 'স্বাধীনতা' মনে করতেন।

সম্মিলনের আলোচনায় স্থির হলো যে 'লেবর-স্বরাজ পার্টি'র নাম 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল' হবে। ইংরেজীতে হবে The Bengal Peasants' and Workers' Party. শ্রেণী হিসাবে মজুরের নামটি আগে আসা উচিত এই তর্ক আমরা ক'জন কৃষ্ণনগরের সম্মিলনে করিনি। প্রজা ও কৃষক প্রতিনিধিদের সামনে এই যুক্তি তুলে বিশেষ লাভ হতো না। আমরা বললাম ইংরেজী শব্দ ব্যবহারের রীতির দিক হতে Workers (ওয়ার্কার্স) শব্দটিকে আগে বসানো উচিত। কারণ, তাতে অক্ষরের সংখ্যা কম। বললাম বাঙলাতেও তো প্রায়ই আমরা এই রকমই করি। আমাদের যুক্তি খুব বেশী সংখ্যক প্রতিনিধিই গ্রহণ করলেন না। কাজেই আমরা The Bengal Peasants' and Workers' Party (দি বেঙ্গল পেজান্ট্স এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি) নামটি নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। বাঙলা নামটি 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল'ই হয়েছিল। কলকাতায় এসে সাইন বোর্ড লেখানো ও লেটারহেড ছাপানোর সময়ে আমি ইংরেজী নামটিকে The Peasants' and Workers' Party of Bengal (দি পেজান্ট্স এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি অফ্ বেঙ্গল) ক'রে দিলাম। তাতে কেউ কোনো আপত্তি করেননি। আমাদের কষ্টের জীবন শুরু হলো।

আগেই উল্লেখ করেছি যে ১৯২৫ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমি কুমায়ুন পাহাড়ের আলমোড়া ডিস্ট্রিক্ট জেল হতে মুক্তি পেয়েছিলেম। ক্ষয় রোগাক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যের কারণে হলেও মুক্তির সময় আসার বহু পূর্বে আমার এই মুক্তির ব্যাপারটি ঘটেছিল ব'লে যাঁরা তখন আলমোড়ায় ছিলেন না তাঁদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। স্থানীয় তরুণ উকীল লালা চিরঞ্জীলালের একান্ত অনুরোধে ও প্রাথমিক সাহায্যে আমি আলমোড়ায় থেকে গেলাম। তিনি বললেন, কত দূর দূর হতে যক্ষ্মারোগীরা আলমোড়ায় স্বাস্থ্যো-দ্ধার করতে আসেন। আর আপনি যখন এসেই পড়েছেন তখন এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবেন কেন?

আমি আলমোড়ায় থেকে গেলাম। কিন্তু কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সহিত কোনও প্রকারের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করলাম না। তাঁদের মনে সন্দেহের উদ্রেক নিশ্চয় হতে পারে। আমি ভাবলাম তাঁরা যদি আমার বিষয়ে খবর নিয়ে সন্তুষ্ট হন তবে তাঁরাই আমার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবেন। আমি এ দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ সভ্য, আমার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর তাঁরা অবশ্যই নিবেন।

মুক্তির সাড়ে তিন মাস পরে কানপুরে এসে জানকীপ্রসাদ বাগেরহাট্টার সঙ্গে জীবনে আমার প্রথম দেখা হলো। সে একজন বড় কমিউনিস্ট, এম· এন· রায়ের সঙ্গে তার সোজাসুজি যোগাযোগ, এভেলিনের সঙ্গেও ছিল। সে আমায় বলেছিল যে আমার মুক্তির সংবাদ পেয়ে আন্তর্জাতিক মহলে প্রথমে সন্দেহের উদ্রেক

হয়েছিল। পরে তাঁরা খবর নিয়ে জেনেছেন যে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। আমার মনে হয় শেষের খবরটি জানকীপ্রসাদই দিয়ে থাকবে। প্রকৃত মেডিকাল রিপোর্টের ভিত্তিতে আমায় মুক্তি দেওয়া হয়েছিল কিনা এ খবর তারই পক্ষে জানার সুযোগ ছিল সব চেয়ে বেশী। কানপুরে জানকীপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার এক বছরের ভিতরে আমার গভীর সন্দেহ হয়েছিল, আমি আবিষ্কার করেছিলেমও বলা চলে, জানকীপ্রসাদ বাগেরহাট্টা ডেভিড পেট্রির একজন খবরের উৎস। মীরাট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা চলার সময়ে অনেক কাগজপত্রের ভিতরে আমরা এ বিষয়ে জানকীপ্রসাদের স্বহস্ত লিখিত দলীলও পেয়েছিলেম।

ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টি প্রথমে বাঙলা দেশে (১লা নবেম্বর, ১৯২৫) গঠিত হয়েছিল।

বাঙলা দেশের পরে এই পার্টি বোম্বেতে গঠিত হয়। গঠন করার তারিখ ছিল ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭। প্রথম সেক্রেটারি এস. এস. মিরাজকর ও সভাপতি ঢুণ্ডিরাজ ঠেংদী।

বোম্বের পরে 'কিরতি-কিসান পার্টি' নাম দিয়ে 'ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টি' পাঞ্জাবে গঠিত হয়েছিল। পার্টি গড়ার তারিখ ছিল ১২ই এপ্রিল, ১৯২৮। এটা অবশ্য রেকর্ডে লিখিত তারিখ। ভাগ সিং কানাডিয়ান ও সোহন সিং জোশ কানপুরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে (নবেম্বর, ১৯২৭) এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং স্থির করে যান যে পাঞ্জাবে তাঁরাও মজুর ও কৃষক দল (কিরতি কিসান পার্টি) গঠন করবেন। ডিসেম্বরের (১৯২৭) শেষ সপ্তাহে মাদ্রাজে ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশনে সোহন সিং জোশ আসেনি, ভাগ সিং কানাডিয়ান এসে-ছিলেন। তিনি রিপোর্ট করে গেলেন যে ডিসেম্বর মাসে (১৯২৭) পাঞ্জাবেও কিরতি কিসান পার্টি গঠিত হয়েছে। আমরা তাঁর কথা বুঝব না ভেবে তিনি মাস্টার তারা সিংকে ডেকে এনে আমাদের ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিলেন।

পাঞ্জাবের পরে সংযুক্ত প্রদেশের (উত্তর প্রদেশের) মীরাটে মিলিত একটি কনফারেন্সে ১৯২৮ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে 'ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টি, ইউ. পি' গঠিত হয়েছিল।

আগেই আমরা স্থির করেছিলেম যে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে ডিসেম্বর মাসের (১৯২৮) শেষাশেষিতে কলকাতায় একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন হবে এবং এই কন্ফারেন্সের সব ক'টি পার্টিকে একীভূত করে একটি সারা-ভারত পার্টির রূপ দেওয়া হবে।

আবার পেছনের কথায় ফিরে যাচ্ছি। বলে রাখা ভালো যে কৃষ্ণনগরের কন্ফাবেন্সে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের (The Peasants' and Workers' Party of Bengal) যুক্ত সেক্রেটারি হলেন কুতুবুদ্দীন আহ্মদ ও হেমন্তকুমার সরকার। ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রেসিডেণ্ট ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন।

বাঙলা দেশে নানা অসুবিধা

কৃষ্ণনগর কনফারেন্সের পরে আমরা সবে 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল' হয়ে ৩৭, হ্যারিসন রোডে বসেছি, এই সময়ে আবদুল হালীম একদিন ধরণীকান্ত গোস্বামীকে সঙ্গে এনে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। হুগলী বিদ্যামন্দিরে তাঁর সঙ্গে আবদুল হালীমের পরিচয়। সে সেখানে মাঝে মাঝে যেত। ভূপতি

মজুমদার হতে শুরু করে হামীদুল হক, সিরাজুল হক এবং আরও অনেকের সঙ্গে হালীমের পরিচয় ছিল। প্রথম পরিচয়ের পর হতে ধরণীকান্ত মাঝে মাঝে আসতেন। তিনি বুঝতে চাইতেন এটা কিসের পার্টি। আমরা তাঁকে বুঝিয়েছিলেম যে "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" ছদ্মাবরণে কমিউনিস্ট পার্টি নয়। কমিউনিস্ট পার্টি আলাদা রয়েছে। তখন বুঝতে পারিনি, এখন দুষ্প্রাপ্য কাগজপত্র ও পুলিস রিপোর্ট পড়ে বুঝতে পারছি যে ধরণীকান্ত গোস্বামীরা এই জিনিসটিই আমার নিকট হতে ভালোভাবে জানতে চেয়েছিলেন। কারণ, তাঁদের কয়েক জন তখন একটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার জন্যে উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আমার এই লেখা হতে সকলেই নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে তখনও ধরণীকান্ত গোস্বামী ও তাঁর বন্ধুরা "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে" (The Peasants' and Workers' Party of Bengal) যোগদান করেননি।

গোস্বামী ও তাঁর বন্ধুরা কেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে চেয়েছিলেন তার কারণও এখন খুব সহজে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। পুস্তকের লেখা শেষ করার জন্যে আমার মন এখন লেখা সংক্ষেপ করার দিকে ঝুঁকেছে। কিন্তু এখানে খুব সংক্ষেপে বলে গেলে অনেকেরই বোঝার অসুবিধা হবে। তাই কিছুটা খোলাসা ক'রে লেখা প্রয়োজন।

দু'জন ব্যক্তি আগে পরে বার্লিন ও মস্কো গিয়েছিলেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী। এই দু'জনই নলিনী গুপ্তের অবদান। মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁকে দু'বার ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিলেন। প্রথম বার পাঠিয়েছিলেন ১৯২১ সালের শেষাশেষিতে। উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। পরে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর এক পুরানো বিপ্লবী বন্ধুকে লিখেছিলেন যে তাঁদের খবর পাওয়ার জন্যেই তিনি নলিনীকে দেশে পাঠিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বার "প্রাচ্য শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে ছাত্র সংগ্রহ করে মস্কো পাঠানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে দেশে পাঠানো হয়েছিল। ইরানের ভিতর দিয়েই ছাত্রদের পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁদের আগ বাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে ইরানের বুশহরে একজন বিশিষ্ট কমরেডকে বসানো হয়েছিল। আমার সঙ্গে জেলে দেখা হওয়া মাত্রই নলিনী একথা আমায় বলেছিলেন; তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় আমাকে তিনি সত্য কথাই বলেছিলেন। কেননা, তিনি জানতেন না এম. এন. রায় আমায় এ বিষয়ে কিছু জানিয়েছেন কিনা এবং জানালে কতটা জানিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ মিত্রের কথা আমি আগে অনেক লিখেছি। এম. এন. রায় তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন সে কথাও বলেছি। লোকটির ভিতরে কোনো রাজনীতিক প্রেরণা ছিল না। অনুশীলন সমিতির সভ্যও তিনি কোনো দিন ছিলেন না। কমিউনিস্ট পার্টির ঘাড়ে চেপে, তার খরচে শুধু জার্মানী হতে কিছু একটা শিখে আসতে চেয়েছিলেন। বোম্বের একটি ঘৃণিত চক্রান্তে অকৃতকার্য হয়ে[১] যতীন্দ্রনাথ মিত্র ১৯২২ সালের নবেম্বর মাসে বার্লিনে পৌঁছেছিলেন। নলিনী গুপ্তের সঙ্গে যতীন মিত্রের দেখা হয়নি। নলিনী পুলিসের নিকটে বলেছিলেন, তিনি মস্কোতে জানতে পেরেছিলেন যে যতীন মিত্র বার্লিনে পৌঁছেছেন। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে হামবুর্গ পৌঁছেছিলেন। তার পরে নয় মাস তিনি মস্কোতে ছিলেন। ১৯২৫ সালের জুন মাসে তিনি ভারতে ফিরেছিলেন।

১ এ পুস্তকের ২৬০-২৬১ পৃষ্ঠায় দেখুন

১৯২৩ সালের গিরেফ্‌তারের পরে আমি ১৯২৬ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখে কলকাতা ফিরেছিলেম। তার এক-দু'মাস পরে যতীন মিত্র আমার সঙ্গে দেখা করলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখা করে গেলেন। ৩৭, হ্যারিসন রোডে আমাদের আফিসে মাদুর পাতা ছিল। ট্রাউজার পরা অবস্থায় তাঁর সেখানে বসার অসুবিধা ছিল। বললেন তাড়াতাড়ি আমার নিকট হতে একটি ঠিকানা নিয়ে নিন। পারিসের একটি ঠিকানা। ঠিকানাটি যথাসম্ভব সাবধানে ব্যবহার করতে বলে দিলেন।

বলেছি ধরণীকান্ত গোস্বামী আমার নিকট হতে ক'বার বুঝতে চেয়েছেন "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" কমিউনিস্ট পার্টি কি না। বুক কোম্পানী লিমিটেডে আমার যাতায়াত ছিল। ধরণী গোস্বামীর সহকর্মী নীরদকান্ত চক্রবর্তী সেখানে হিসাব রক্ষক ছিলেন। তিনিও একবার দু'বার আমায় কমিউনিস্ট পার্টির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি আশ্চর্য হতাম, ব্যাপারটি কি? এখন পুলিস রিপোর্টে, ইত্যাদিতে পড়ছি যে ১৯২৬ সালের ১৬ই এপ্রিল হতে ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতায় গোপনে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়ার কন্‌ফারেন্স হয়ে গেছে। ধরণী গোস্বামী ও গোপেন চক্রবর্তীদের কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু কন্‌ফারেন্সটা খুব বাঁধাবাধি ধরনের ছিল না। মনে হচ্ছে পুলিস এটাকে আমাদের কনফারেন্স মনে করেছিল। এই কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে সত্যভক্তের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক রাখা হবে না। যাঁরা কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন তারা এম. এন. রায় যে টাকা পাঠাচ্ছেন না তার জন্যে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন। যতীন্দ্রনাথ মিত্র খুব কড়া ভাষায় মুহম্মদ আলীকে একখানি পত্র লিখেন। তিনজন সভ্য নিয়ে ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির একটি ফরেন্‌ ব্যুরো ছিল। তাঁরা ছিলেন ঃ—(১)মানবেন্দ্রনাথ রায় (২) সি. পি. দত্ত ও (৩) মুহম্মদ আলী। এই পত্র হতে মিস্টার ডি. পেট্রির সম্পাদিত "কমিউনিজম ইন ইণ্ডিয়া" কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি করে দেওয়া হয়েছে। আমি সেই অংশটুকু এখানে তুলে দিলাম ঃ

"You people do not realise our difficulties here...the boss (Roy) and family are living as Princes......and the boys here—real, sincere workers—are starving. You hypocrites mean no business ; you are simply exploiters. Your behaviour has created such a bad atmosphere against you that now, except a few of us, all in the Panjab, U. P., Bombay and Bengal are losing confidence in you." (page 107)

অনুবাদ

"আপনারা উপলব্ধিই করতে পারছেন না যে এখানে আমাদের কি কষ্টের ভিতরে দিন কাটাতে হচ্ছে।......কর্তা (রায়) ও তাঁর পরিবার তো সেখানে রাজার হালে আছেন, আর এখানে ছেলেরা, তাদের সকলেই সরল ও বিশ্বস্ত কর্মী, উপোস করে মরছে। হে কপটচারীর দল, আপনারা কোনো কাজের কাজ চান না। আপনারা নিছক শোষণকারীর দল ছাড়া আর কিছুই নন। আপনাদের বিরুদ্ধে এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে যে (ধরণীকান্ত গোস্বামী ও গোপেন্দ্রকৃষ্ণ

চক্রবর্তীর দলের) আমরা ক'জন ছাড়া, পাঞ্জাব, ইউ· পি·, বোম্বে এবং বাঙলার সকলেই আপনাদের ওপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন।" (পৃষ্ঠা ১০৭)

যতীন মিত্র তো কোন দিন আমাদের সঙ্গে কনফারেন্সে বসতেই পারেন না। তিনি ইউরোপ যাওয়ার আগে পুলিসের চরের সঙ্গে দহরম-মহরম করেছেন, জার্মানীতে গিয়ে এম· এন· রায়ের নিকটে সেই চরের হয়ে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছিলেন। আমার নাম ক'রে, যদিও আমি তার ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতাম না, বোম্বেতে গিয়ে চার্লস্ আশ্লীকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিলেন। এই লোকের সঙ্গে আমরা কি ক'রে কন্ফারেন্সে বসতে পারতাম?

নলিনী গুপ্ত যে কাজের জন্যে দ্বিতীয় বার ভারতে এসেছিলেন, সে কাজের কথা, অর্থাৎ "প্রাচ্য দেশের শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে" পাঠানোর জন্যে ছাত্র রিক্রুট করার কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। তবুও ঢাকায় একজনকে তিনি রিক্রুট করেছিলেন। তাঁর নাম গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী। তিনি ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। বয়সেও খুব তরুণ ছিলেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েও তিনি বন্দীজীবন যাপন করেছিলেন। উনিশ শ' বিশের দশকে তিনি বিবাহিত ছিলেন। এই অবস্থায় নলিনী গুপ্ত ছাত্র হিসাবেই তাঁকে পাঠাবার ছাড়পত্র দিলেন। তার মানে এম· এন· রায়ের নামে একখানি পত্র তিনি গোপেন্দ্রকৃষ্ণকে লিখে দিলেন। অনুশীলন সমিতি কোনো পরিচয়পত্র তাঁকে দিলেন না।

ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি গোপেন্দ্র চক্রবর্তীকে কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য বার্লিন হতে মস্কো পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু দারুণ পরিতাপের বিষয়ই বলতে হবে,—যেদিন তিনি মস্কো পৌঁছলেন সেদিনই কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দফ্তরে ঢাকা অনুশীলন সমিতির একখানি পত্রও পৌঁছাল। তাতে লেখা ছিল যে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী বিশ্বস্ত লোক নয়, অনুশীলন সমিতির নামে তাঁকে যেন কোনো সুখ-সুবিধা না দেওয়া হয়। এর পরে তাঁকে আর "প্রাচ্য শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে" ভর্তি করা হলো না। তাঁকে নাইডু পদবীধারী দক্ষিণ ভারতীয় পরিচয় দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়। ১৯২৪ সালে বোধ হয় মস্কোতে দক্ষিণ ভারতীয় ছিলেন না, কিংবা কম ছিলেন। সব কিছু হতে আলাদা হয়ে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী মস্কোতে নয় মাস মাত্র ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি তাঁর অনুবাদকারিণীকে (interpreter) বিয়ে করেন। তাঁর সেখানে কোনো কাজ ছিল না। নয় মাস পরে তাঁকে দেশে ফেরৎ পাঠানো হয়। তখন তাঁর রুশীয় পত্নী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। স্বভাবতই তিনি কন্টিনেন্টাল ইউরোপ হয়ে দেশে ফিরেছিলেন। পারিসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ফরেন-ব্যুরোতে তখন মুহম্মদ আলী ছিলেন। এটা খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে মুহম্মদ আলীর সঙ্গে দেখা করার সময়ে গোপেন্দ্র চক্রবর্তী গভীর মনঃকষ্টে ভেঙে পড়েছিলেন। কি নিয়ে ফিরবেন তিনি দেশে? মুহম্মদ আলী তাঁকে বলে দিয়েছিলেন যে দেশে ফিরে এসে তিনি কিছু সংগঠন গড়ে তুলে যেন ফরেন্ ব্যুরোর নিকটে রিপোর্ট পাঠান। তখন ব্যুরো ভেবে দেখবেন কি করা যায়।

আমি জেলে ছিলেম। গোপেন চক্রবর্তীর কি হয়েছে, না হয়েছে, তার কিছুই জানতেম না। ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমার কলকাতা ফেরার কিছু দিন পরে শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি মস্কোর কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর পড়েছেন, কিন্তু কমিউনিস্ট হননি। আমার অভ্যাস হচ্ছে যে কোনো লোকের সঙ্গে বিশেষ করে শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লোকের

সঙ্গে, নূতন দেখা হলে তাঁর নিকট হতে আমি অনেক কিছু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি। তাঁর সঙ্গে আমার যখন কথা হচ্ছিল তখন কথায় কথায় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি অনুশীলন সমিতির সেই ছাত্রটির কথা যাঁকে নলিনী গুপ্ত চিঠি দিয়ে এম· এন· রায়ের নিকটে পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁর নাম জানতেম না। তিনি যে আগের জুন মাসে দেশে ফিরে এসেছেন সে কথাও আমার জানা ছিল না। শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, তাঁকে তো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করা হয়নি। তাঁর মস্কো পোঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই অনুশীলন সমিতির পত্রও পোঁছে যায় যে তিনি বিশ্বস্ত লোক নন। এই কারণে নাইডু নাম দিয়ে তাঁকে আলাদা ক'রে রাখা হয়েছিল। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যাওয়ার পরে একদিন আমি তাঁকে শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া খবর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। তিনি স্বীকার করলেন যে খবরটি সত্য। বললেন, অনুশীলন সমিতির ভিতরে নানা সংঘাত চলেছে। তারই বলি হয়েছেন তিনি। "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে" যোগ দেওয়ার পরে ধরণী গোস্বামীও একদিন বলেছিলেন যে কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত সমিতির ভিতরে এমন জোর উপদলীয়তা চালিয়েছে যে, 'তার ফলে আমাদের সমিতির বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়েছে।' পুলিনবিহারী দাসের 'সমাজ সেবক সংঘ' ও 'হক কথা' প্রভৃতির যখন কঠোর ভাবে সমালোচিত হতে লাগল তখন সমিতির ভিতরেও ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হলো। চারজন নেতা—(১) প্রতুল গঙ্গোপাধ্যায় (২) নরেন সেন (৩) রমেশ আচার্য ও (৪) রমেশ চৌধুরী সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। তাঁরা বললেন, টাকা গ্রহণ ইত্যাদি সব অপকর্মের জন্যে একা পুলিনবিহারী দাসই দায়ী। তাঁকে তাঁরা ছেঁড়া তেনার মতো দূরে ছুঁড়ে দিলেন।

১৬ই এপ্রিল হতে ১৮ই এপ্রিল (১৯২৬) পর্যন্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও ধরণীকান্ত গোস্বামী প্রভৃতি গোপনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির, অর্থাৎ তাঁদের নিজস্ব কমিউনিস্ট পার্টির যে অনিয়মিত কন্‌ফারেন্স করেছিলেন তার রিপোর্ট (তাঁদের প্রস্তাবসহ) তাঁরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ফরেন্ ব্যুরোর নিকটে প্যারিসে পাঠিয়েছিলেন। এই কন্‌ফারেন্সের পরে, ২৯শে এপ্রিল তারিখে গোপেন চক্রবর্তী ক্রিমিনাল প্রসেডিউর কোডের ১১০ ধারা অনুসারে ঢাকায় গিরেফ্‌তার হন। মনে হয় ১৯২৫ সালের জুন মাসে দেশে ফেরার পর হতে তিনি গা-ঢাকা দিয়ে চলছিলেন। ধরা পড়ার পরে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা হয়নি, তিনি বিনা-বিচারে বন্দীও হননি।

১৯২৬ সালের কোন্ মাসে তা ঠিক মনে করতে পারছিনে, তবে এপ্রিল মাসের কয়েক মাস পরে. একদিন ধরণীকান্ত গোস্বামী ৩৭, হ্যারিসন রোডে আমার নিকটে এলেন। তিনি প্যারিস হতে মুহম্মদ আলীর লেখা একখানি পত্র সঙ্গে এনেছিলেন। পত্রখানি বেশ বড় ছিল এবং হাতে লেখা ছিল। সম্ভবত গোপেন্দ্র-কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে তা লেখা হয়েছিল। তবে, যে নামে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছিল তা উচ্চারণ করা যায় না। পরে যতীন মিত্রকেও আমি গোপেন্দ্রকৃষ্ণের ওই একই নাম ব্যবহার করতে শুনেছি। ধরণী গোস্বামী আমাকে ওই পত্রের কয়েক ছত্র মাত্র পড়ে শোনালেন। পত্রখানি আমার হাতে দিলেন না। পত্রখানি হাতে লেখা ছিল। তার যতটুকু আমায় পড়ে শোনানো হয়েছিল তা আমি স্মৃতি থেকে এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

"মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এখন জেল হতে বা'র হয়ে এসেছেন, রাজনীতিক কাজেও নেমেছেন। এই অবস্থায় আপনারা কেন আলাদা দল ক'রে আলাদা হয়ে কাজ করবেন?

আমরা চাই আপনারাও মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করুন।"

আমি সঙ্গে সঙ্গেই বললাম, "আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা এখনই পার্টিতে আসুন।" তাঁরা "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের" কথাই আমায় বলছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টির কথা নয়। এখন পুলিস রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে যে তাঁরা 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া'র কনফারেন্স করেছিলেন। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি লাহোরে গিয়েছিলেম। আমি যাওয়ার আগে জানকীপ্রসাদ লাহোরে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়ার খোলাখুলি কন্‌ফারেন্স ডেকে এক কেলেঙ্কারি করেছিল। আমার মনের ইচ্ছা এই ছিল কন্‌ফারেন্স যখন ডাকাই হয়ে গেছে তখন কোনো রকমে তার কাজ নির্বাহ করতে হবে। আমি লাহোর হতে ধরণীকান্ত গোস্বামীদের পত্র লিখে জানতে চাইলাম তাঁরা এই কন্‌ফারেন্সের ব্যাপারে কতটা সাহায্য করতে পারেন? কোনও সাড়াই তাঁরা দেননি এই ব্যাপারে। সাকলাতওয়ালার আগমন উপলক্ষে আমি লাহোর হতে বোম্বে গিয়েছিলেম। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কলকাতায় ফিরে আসি।

সেই যে কবে ধরণীকান্ত গোস্বামী মুহম্মদ আলীর পত্রের কয়েকটি ছত্র আমায় পড়ে শুনিয়েছিলেন তার পরে কয়েক মাস তিনি কৃষক ও শ্রমিক দলে যোগদান করার বিষয়ে আর কোনো কথাই বললেন না। কমিউনিস্ট পার্টির বিষয়ে তো চুপ করে থাকলেনই। আমার বোম্বে হতে ফেরার পরে কথা আরম্ভ হলো। ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ধরণীকান্ত গোস্বামী, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী, নীরদকান্ত চক্রবর্তী ও প্যারীমোহন দাস এই চারজন সশরীরে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে যোগ দিলেন। আরও কয়েকজনের নামও তাঁরা লিখিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁরা কখনও আফিসে আসেননি। এই ক'জনের আবার দুর্নাম ছিল। প্রমথ ভৌমিকের নামও তালিকায় ছিল। কিন্তু তিনিও কোনো দিন আমাদের আফিসে আসেননি। ১৯৩৮ সালে তাঁর সঙ্গে আমার প্রকৃত পরিচয় হয়। বিনাবিচারে বন্দীদশা হতে মুক্তি পেয়ে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে এসেছিলেন।

কৃষ্ণনগরের পরে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের দ্বিতীয় সম্মেলন হয় ১৯২৭ সালের ১৯শে ও ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। অনুশীলন সমিতি হতে চারজন সভ্যও যোগ দিয়েছিলেন। কৃষ্ণনগর কনফারেন্সের পূর্বে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শাম্‌সুদ্দীন হুসয়নের নিকটে এসে লেবর স্বরাজ পার্টির সভ্য হয়েছিলেন। শাম্‌সুদ্দীন যখন শান্তিনিকেতনে শিক্ষক ছিলেন তখন সৌম্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল তা ছাড়া, হেমন্তকুমার সরকার ও কাজী নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গেও সৌম্যেন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। শাপুরজি সাকলাতওয়ালা এই কন্‌ফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন।

নলিনী গুপ্ত সম্বন্ধে আগে অনেক লিখেছি। তাঁর আসল রূপ তখনও ধরা পড়েনি। তার ওপরে আমি বিরক্ত ছিলেম। কিন্তু আমার মোকদ্দমায় আসামী ছিলেন বলে আমি তাঁকে ছাড়তে পারছিলেম না। তিনি পুলিসের চর এটা বুঝতে পারলে নিশ্চয় তাঁকে বিদায় করে দিতুম। এই সময়ে তাঁর উপদলীয়তায় আমরা অস্থির হয়ে উঠেছিলেম। তবে তিনি ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়ে বিদেশে যাওয়ার বন্দোবস্ত করছিলেন।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের দ্বিতীয় সম্মেলনে অতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতি

হয়েছিলেন, আর সেক্রেটারি হয়েছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সৌম্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমি আমার "প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন" নামক পুস্তকে অনেক লিখেছি। নলিনী গুপ্ত সম্পর্কেও বর্তমান পুস্তকে প্রচুর লেখা হয়েছে।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশে যাওয়ার আগে আমরা কমিটির একটা সভা ডাকলাম। এই সভায় তিনি তাঁর সেক্রেটারির পদটা ছেড়ে না দিয়ে দীর্ঘ দিনের ছুটি নিলেন। তাঁর জায়গায় একটিং সেক্রেটারি হলেন আবদুর রজ্জাক খান।

ব্যাপারটি যখন ইতিহাসের বিষয়ীভূত তখন নিজের কথা কিছু না বললে সত্য গোপন করা হবে। কৃষ্ণনগরের কন্‌ফারেন্সে কুতবুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব ও হেমন্তকুমার সরকার যুক্ত সম্পাদকদ্বয় হলেন বটে কিন্তু সেক্রেটারির কাজ তাঁদের একজনও কিছু করলেন না। সে কাজ আমাকেই চালাতে হলো। কাগজ পরিচালনার সমস্ত কাজও আবদুল হালীম আর আমিই চালালেম। দ্বিতীয় কন্‌ফারেন্সের পরে আবদুর রজ্জাক খান নবাগতদের জিদের ফলে একটিং সেক্রেটারি হলেন। কিন্তু তার পরে তিনি কাজে খুব মনোযোগ দিলেন না। বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের তৃতীয় কনফারেন্স ১৯২৮ সালের ৩১শে মার্চ ও ১লা এপ্রিল তারিখে ভাটপাড়াতে হয়েছিল। এই কনফারেন্স করার আগে তার প্রস্তুতির জন্য তাঁকে খুঁজেই পাওয়া গেল না। ভাটপাড়া কনফারেন্সেও তিনি উপস্থিত থাকেননি। এটা একটি বিশিষ্ট কনফারেন্স হয়েছিল। কারণ, "A Call to Action" (এ কল টু একশন) নামক পুস্তিকায় যে প্রস্তাবগুলি মুদ্রিত হয়েছে তার সবগুলি প্রস্তাব এই সম্মেলনে আলোচিত ও গৃহীত হয়। এই সম্মেলনেই বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের ইংরেজি নাম ওয়ার্কার্স এন্ড পেজাণ্টস পার্টি অব বেঙ্গল করা হয়, বাঙলা নাম যা ছিল তাই থেকে গেল। A Call to Action (এ কল টু একশন) এবং এই ভাটপাড়া কনফারেন্সের রিপোর্ট পরে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছিল। এই কন্‌ফারেন্সে আমি সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছিলেম।

মীরাটের কনফারেন্সে সংযুক্ত প্রদেশের ওয়ার্কার্স এন্ড পেজাণ্টস পার্টি গঠিত হয়। এবং সেখানে আমরা এই ঘোষণাও প্রকাশ করি যে, ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা কলকাতায় একটি সারা ভারত ওয়ার্কার্স এন্ড পেজাণ্টস পার্টির কনফারেন্স ডাকবো। সেই কনফারেন্সেই সব কটি ওয়ার্কার্স এন্ড পেজাণ্টস পার্টিকে একত্র ক'রে ওয়ার্কার্স এন্ড পেজাণ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া (ভারতের মজুর ও কৃষকদল) গঠন করবো। এর আগে আমাদের বাঙলা দেশে পার্টি সম্বন্ধে আরও কিছু খবর দেওয়া প্রয়োজন। ১৯২৭ সালের নবেম্বর মাসে আমরা ৩৭, হ্যারিসন রোড হ'তে ২/১, ইওরোপীয়ান এ্যাসাইলাম লেনের বাড়ীর দোতলায় একটি পুরো ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টির আফিস তুলে আনি। এখানে একটি ঘরে আমাদের আফিস ছিল এবং অন্য দুটি ঘরে আমরা বাস করতাম।

অনুশীলন সমিতি হ'তে যাঁরা বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে এসেছিলেন, ঢাকার গোপাল বসাককে নিয়ে তাঁদের সংখ্যা আরও কয়েকজন বেড়েছিল। যদিও তাঁরা আমাদের সঙ্গে থাকতেন তাঁরা তেমন মনোযোগ দিয়ে পার্টির কাজ করলেন না। এমন কি একদিন অন্য কাউকে কিছু না জানিয়ে তাঁরা 'ওয়ার্কার্স প্রটেকশন লীগ' নাম দিয়ে একটি বড় সাইনবোর্ড পার্টি আফিসের দোতলায় লাগিয়ে দিলেন। আসল ব্যাপারটি ছিল এই যে, ১৯২৭ সালের শেষ ভাগে এবং ১৯২৮ সালে আমাদের আন্দোলন খুব বেড়ে যায়, তাতে ধরণীকান্ত গোস্বামী প্রভৃতি সম্বন্ধে (কিন্তু গোপেন চক্রবর্তী সম্বন্ধে নয়) অনুশীলন সমিতির নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী

বদলে গেল। আমি আগে বলেছি অনুশীলন সমিতির কেদারেশ্বর সেনগুপ্তের চক্রান্তে (ধরণীকান্ত গোস্বামীর কথা) ধরণীকান্ত গোস্বামীদের অনুশীলন সমিতির বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল। গোপেন চক্রবর্তী বিদেশ হ'তে ফিরে আসার পরে যখন অনুশীলন সমিতির নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন (গোপাল বসাকের রিপোর্ট) তখন একমাত্র নরেন সেন ছাড়া আর কোন নেতা তাঁকে গ্রহণ করলেন না। নরেন সেনও তখন সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে বা'র হয়ে যাচ্ছিলেন। সমিতির নেতাদের তখন জোর ভক্তি ছিল অবনী মুখার্জির ওপরে, নলিনী আর অবনীর একত্রে স্থান ছিল না। গোপেন আবার ছিলেন নলিনীর লোক। কিন্তু ১৯২৮ সালে ধরণীকান্ত গোস্বামী প্রভৃতির উপরে অনুশীলন সমিতির নেতাদের ভক্তি আবার ফিরে এলো। কারণ, তখন আমাদের আন্দোলন খুব জমে উঠেছে। এই নেতারা তাঁদের সঙ্গে আলাদা ভাবে দেখা সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁদের উপদেশ দিলেন যে তাঁরা যেন ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টিকে দখল ক'রে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁদের এই কাজের প্রথম সূচনা করলেন বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের আফিসে 'ওয়ার্কার্স প্রটেকশন লীগে'র নামে একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে সেটাও আমি সহ্য ক'রে নিলাম। বাইরের লোককে বোঝাতে থাকলেম যে, 'ওয়ার্কার্স প্রটেকশন লীগ' মজুরদের ক্ষতিপূরণের মামলা ইত্যাদি চালাবে।

১৯২৮ সালে আমাকে দু'বার বোম্বে যেতে হয়েছে। সেই সময়ে তাঁরা, অনুশীলন সমিতি হতে-আসা কমরেডরা, আবদুর রজ্জাক খানকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে মিটিং করেছেন। নীরেন সেন নামক ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টির একজন সভ্য আমাকে এই খবর দিলেন। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। তাঁকে এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "এতদিনের পুরানো কথা আমার কিছু মনে নেই।" বহু বৎসর নীরেনের সঙ্গে আমার কোনো যোগ ছিল না। রাধারমণ মিত্রের মারফতে আমি তাঁর নিকটে খবর পাঠাই। রাধারমণ মিত্রকে বলেছিলেম কেন নীরেনকে আমার দরকার। নীরেন সেন যখন খবর দিয়েছিলেন তখন তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলেম, "ওঁরা কি চান?" নীরেন বললেন, "ওঁরা চান যে সারা-ভারত কনফারেন্সের পরে ধরণী গোস্বামী বাঙলা দেশের সেক্রেটারী হবেন।" আমি তখনই নীরেন সেনকে বলে দিই যে, "আমার সম্মতি আমি এখনই লিখে দিতে পারি। আমি যদি সারা-ভারত পার্টির সম্পাদক হই, তা' হলে বাঙলা দেশের সম্পাদক ধরণী গোস্বামীই তো হবেন।" কিন্তু এর কোন প্রতিক্রিয়া তাদের ভিতরে হয়েছে বলে মনে হলো না। সারা-ভারত কনফারেন্সের ব্যাপারে তাঁরা আমাকে খুব কম সাহায্যই করলেন। এমনকি মাথার উপরে কনফারেন্সের কাজ ফেলে, তাঁদের প্রত্যেকেই ঝরিয়া অল-ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে চলে গেলেন। তাঁদের বাসনা ছিল যে কিছু পথ এগিয়ে গিয়ে বোম্বের কমরেডদের তাঁরা হাত করবেন।

আমি যতটা বুঝতে পারলেম এই দখল করার ব্যাপারটা তখন তাঁদের মনে কাজ করছিল। তার বন্দোবস্তের জন্য তাঁরা আলাদা ভাবে কাজ করছিলেন, অবশ্য গোপনে। এও তাঁরা চাইছিলেন যে বাউড়িয়ার স্ট্রাইক-করা চটকল মজুরদের দলবদ্ধ ভাবে এনে সম্মেলনে ভোট দেওয়াবেন এবং পার্টি দখল ক'রে নেবেন। কিন্তু এই মজুরেরা পার্টি সভ্য না হওয়ায় ভোট দিতে পারলেন না।

সারা-ভারত সম্মেলনে আমরা পার্টিতে নূতন-আসা সোহন সিং জোশকে সভাপতি করেছিলেম। তার কারণ ছিল এই যে বোম্বের কোনো কমরেডকে

সভাপতি করতে চাইলে এস· এ· ডাঙেগর নাম উঠতো। কিন্তু তার বন্ধু জোগলেকর ও নিম্বকর তখন তাকে একবারেই সহ্য করতে পারছিল না। তাকে সভাপতি নির্বাচন করলে বোম্বেতে পার্টির ভিতরে দারুণ ঝগড়া বেধে যেতো। এর হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা সোহন সিং জোশের নাম প্রস্তাব করেছিলেম এবং সম্মেলনে তিনিই সভাপতি হয়েছিলেন। ভারতের যে সকল জায়গায় আমাদের পার্টির সভ্য ছিলেন, সেই সব জায়গা থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। ২১শে, ২২শে ও ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৮, এই তিন দিন সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। হলও ভাড়া করা হয়েছিল এই তিন দিনের জন্যে। কিন্তু ২৩শে তারিখে সম্মেলনে গোলমাল হওয়ায় ২৪শে তারিখেও সম্মেলন হয় অতিথিদের জন্যে ভাড়াকরা বাড়ীতে, ১২১, লোয়ার সার্কুলার রোডে।

অলবার্ট হলে (এখন কফি হাউস) আমাদের অধিবেশন হয়েছিল। ২২শে তারিখে সন্ধ্যার পরে আমরা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা আলাদা ভাবে অলবার্ট হলের কমিটি রুমে একটা সভা করলেম। আমরা স্থির করেছিলেম যে ধরণীকান্ত গোস্বামী এবং গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে তাতে ডাকা হবে। কারণ, আমাদের ইচ্ছা ছিল তাঁদের দু'জনকে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ক'রে নেওয়া। সেই সময়ে ধরণী গোস্বামীকে ওখানে পাওয়া গেল, কিন্তু গোপেন কোথায় চলে গিয়েছিলেন। মিটিং-এ বসা মাত্রই ধরণীকান্ত গোস্বামী বললেন,—"এটা কিসের মিটিং?" বেন ব্রাডলি (বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস ব্রাডলি,—ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য) উত্তর দিলেন, "এটা কমিউনিস্ট পার্টির মিটিং"। ধরণীকান্ত গোস্বামী বললেন, "আমি তো কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য নই। আমাকে কেন এখানে ডাকা হলো?" বেন ব্রাডলি উত্তর দিলেন, "তোমাকে পার্টিতে নেওয়ার জন্যে আমরা প্রস্তাব করব।" ধরণীকান্ত গোস্বামী খুবই চটলেন এবং মিটিং হ'তে উঠে চলে গেলেন। অর্থাৎ তাঁরা যে আলাদা কমিউনিস্ট পার্টি করতে চেয়েছিলেন, সেটা তাঁদের মন হ'তে তখনও মুছে যায়নি। সেদিন সারা রাত্রি ধ'রে তাঁরা কাজ করলেন। সভ্যদের, বন্ধুদের ও দরদীদের বোঝালেন যে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের নিকট হতে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী ম্যাণ্ডেট পেয়েছিলেন। মুজফ্ফর আহ্মদ সেই অধিকার usurp করেছে, অর্থাৎ জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছে। এখন [মুজফ্ফরের] কমিউনিস্ট পার্টি সব কিছু দখল করে নিচ্ছে। ধরণী ও গোপেনদের সমর্থক মহলে একটা 'গেল' 'গেল' রব উঠল। বঙ্কিম মুখার্জি ও রাধারমণ মিত্র ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টির সভ্য ছিলেন না, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করতেন। কালীকুমার সেন ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টির সভ্য ছিলেন। ধরণীকান্ত গোস্বামীর প্রচারে তাঁদেরও মনে দাগ কাটলো। আরও কেউ কেউ কথাটা বিশ্বাস করলেন। কারণ, গোপেন মস্কো গিয়েছিলেন। সেখানে কি অবস্থায় ছিলেন সে খবর কে রাখেন? ২৩শে তারিখে কনফারেন্সে এই নিয়ে খুবই গোলমাল হলো। আমরা আরও একদিন কনফারেন্সের সময় বাড়িয়ে দিলাম। সে বাড়িয়ে দেওয়া দিনেও গোলমাল মিটল না। ধরণীকান্ত গোস্বামী তাঁর দলবল নিয়ে কনফারেন্স হ'তে বার হ'য়ে গেলেন। অবশ্য, আবদুর রজ্জাক খান ও শামসুল হুদা তলেতলে তাঁদের দিকেই ছিলেন। কনফারেন্স শেষ হ'য়ে গেল। বাঙলা দেশের সেক্রেটারী আমিই থেকে গেলাম। সারা-ভারত পার্টির আফিস কলকাতায় না রেখে বোম্বেতে স্থানান্তরিত করা হলো। আর· এস· নিম্বকর সারা ভারতের সেক্রেটারি নির্বাচিত হলো।

২৩শে তারিখে আমাদের একটা মিছিল বার করার প্রোগ্রাম আগে থেকেই স্থির

করা ছিল। এই মিছিল আমরা বা'র করলেম। পার্ক সার্কাসে যেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে সেই স্থান পর্যন্ত আমরা গেলাম। অনেক সব স্লোগান সেদিন আমরা দিয়েছিলেম। তার মধ্যে একটি ছিল "মজদুর ও কৃষকের সোবিয়েত রিপাবলিক"। তখনও কিন্তু কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত আমাদের নিকটে আসেনি। সেখানে অনুশীলন সমিতির শ্রেষ্ঠ নেতা প্রতুল গঙ্গোপাধ্যায়ও ঔৎসুক্য ও উত্তেজনাপূর্ণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। অনুশীলন সমিতির জন্য ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টি দখল করা হয়েছে কিনা এ খবর জানার জন্যে তিনি প্রায় মরে যাচ্ছিলেন। ধরণী গোস্বামী ভিড়ের ভিতরে ছিলেন। প্রতুল গঙ্গোপাধ্যায় বারে বারে এসে আমায় জিজ্ঞাসা করছিলেন, "ধরণী গোস্বামী কোথায়?" কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত আমি বলেছিলেম, "এই ভিড়ের ভিতরে কোথাও আছেন"।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তীর কথা

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী সম্বন্ধে আমার কিছু বলা দরকার। ১৯২২ সালের আগের কথা না ধরলেও, ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাস হতে আমি ভারতবর্ষের ভিতরে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। আমি কোনদিন কোন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির সভ্য ছিলেম না। গোপেন চক্রবর্তী অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। আমি যদি কোন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির সভ্য হ'তে চাইতাম, তাহলেও অনুশীলন সমিতির সভ্য আমি হতে পারতাম না। কারণ, তাঁদের গোপন গঠনতন্ত্রে (কনস্‌টিটিউশন) লেখা ছিল যে, অনুশীলন সমিতিতে অ-হিন্দুর প্রবেশ নিষেধ। আমি মুসলিম নাম নিয়ে জন্মেছি। গোপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার কোন পরিচয় ১৯২৬ সালের মাঝামাঝির আগে হয়নি। নলিনী গুপ্ত দ্বিতীয়বার যখন বাঙলা দেশে এসেছিলেন (জুলাই, ১৯২৩) তখন আমি জেলে। সেই সময়ে অনুশীলন সমিতির লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। 'যুগান্তরে'র নেতারা আগের বারেও তাঁকে পাত্তা দেননি। তাঁরা জানতেন তিনি দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন লোক। দ্বিতীয় বারে নলিনীকে কাজ দেওয়া হয়েছিল যে সে মস্কোর কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে ছাত্র জোগাড় ক'রে পাঠাবে। নলিনী একাজ না ক'রে বোমার ফর্মুলা ছেলেদের শিখিয়েছে এবং নিজের সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলেছে। একমাত্র সে গোপেন চক্রবর্তীকে পাঠিয়েছিল। তাঁরও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল।

আমার সঙ্গে গোপেন চক্রবর্তীর কোনো দিক হতে কোনো সম্পর্ক ছিল না। আগেই বলেছি মস্কোতে তিনি মাত্র নয় মাস ছিলেন। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার কোনো সুযোগ পাননি। দেশে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মস্কোতে আবার বিয়ে করেন। সেই স্ত্রী যখন অন্তঃসত্ত্বা তখন তাঁকে (গোপেনকে) দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফেরার সময়ে প্যারিসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ফরেন ব্যুরোর সভ্য মুহম্মদ আলী তাঁর কানে কি মন্ত্র দিয়েছিলেন তা আমি কি করে জানব? কিন্তু এটা তো আমি জানতেম যে মুহম্মদ আলী তাঁকে আমাদের সঙ্গে কাজ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি আগেও এ কথা বলেছি। আমি জানতেমও না গোপেন চক্রবর্তী যাঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা কি করতেন। এতকাল পরে ইন্‌টেলিজেন্স রিপোর্ট হাতে আসায় বুঝতে পারছি যে তাঁরা একটি ভারতের

কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে চাইছিলেন। এই জন্যেই ধরণীকান্ত গোস্বামী এইভাবে কমিউনিস্ট পার্টির মিটিং হতে চলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু গোপেন চক্রবর্তীর ক্ষমতা আমি কি করে কেড়ে নিলাম! ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে তিনি যখন হামবুর্গে পৌঁছেছিলেন তখন তো কানপুরের আদালতে আমাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলেছে। ১৯২৫ সালের জুন মাসে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। তখনও আমি জেলে। ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমি কলকাতায় ফিরেছি। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯২৬ সালের শেষার্ধে।

আগেই বলেছি গোপেন চক্রবর্তীরা পেজান্ট্‌স এন্ড ওয়ার্কার্স পার্টিতে ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে আমাদের তরফ হতে তিনি লিলুয়ার রেলওয়ে ধর্মঘটে কাজ করছিলেন। শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই সময়ে সেই ধর্মঘটের কাজে লিপ্ত ছিলেন। **এই সময়ের একটি কথা বলি।** একদিন শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নিকটে এসে প্রস্তাব করলেন যে তাঁরা ফিলিপ স্প্রাট ও আমার নামে মস্কোতে রেড ইন্‌টারন্যাশনাল অফ লেবর ইউনিয়ন্সের নামে সাহায্যের জন্যে একটি টেলিগ্রাম পাঠাতে চান। আমি বললেম, "মিত্র মশায় (কিরণচন্দ্র মিত্র ওর্ফে জটাধারী বাবা) নিজে যা খুশী করছেন, একটি স্ট্রাইক কমিটি পর্যন্ত গঠন করলেন না, আমি এই সঙ্গে আমার নাম জড়াতে চাই নে।" তা সত্ত্বেও তাঁরা আমাদের দু'জনের নামে টেলিগ্রাম ক'রে দিলেন। তাতে লিখে দিলেন সাহায্যের টাকা সোজাসুজি কে· সি· মিত্রের নামে পাঠিয়ে দিবেন। পুলিস এই টেলিগ্রাম আটকাল। স্টেট্‌স্‌ম্যানের একজন ইংরেজ রিপোর্টার ছিলেন, নাম মিস্টার প্লুটন। তিনি গিয়ে টেলিগ্রাফ আফিস হতে সেই টেলিগ্রামের একটি কপি বা'র করে আনলেন। তিনি আমাদের আফিসে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিস্টার স্প্রাট ও আপনি কি এই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন"? আমি মনে মনে স্তম্ভিত হলেম, কিন্তু মুখে বললেম, "আমরা স্ট্রাইকের জন্যে আমাদের নাম ব্যবহার করার অধিকার তাঁদের দিয়েছি"। মিস্টার প্লুটন টেলিগ্রামটি পরের দিনের স্টেট্‌স্‌ম্যানে ছেপে দিলেন। খবরটি ইউরোপে তারযোগে পাঠিয়ে দিয়ে রয়টার পরের কাজটি করে দিলেন। কয়েকদিনের ভিতরে মস্কো হতে বিশ হাজার টাকা এসে গেল।

হাওড়ার ডিস্‌ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার গুরুসদয় দত্তের সাহায্যে কে· সি· মিত্র ব্যাঙ্ক হতে টাকাটা তুলে নিলেন।

আমরা আশ্চর্য হলাম যে মিত্র মশায় কিংবা শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা গোপেন চক্রবর্তী কেউ আমাদের এই খবরটি দিলেন না। আমি একদিন গোপেন চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করলেম, "আপনি তো আমাদের পার্টির সভ্য। আপনি জানেন মিত্র মশায় আমাদের নাম ব্যবহার করেছেন। আপনি অন্তত টাকা আসার খবরটা আমাদের জানালেন না কেন?" গোপেন শুনে যেন আশ্চর্য হলেন, বললেন, "আপনাদের কারণে তো টাকা আসেনি। হাওড়া কংগ্রেসের হরেন্দ্র ঘোষ একবার ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর একটা আন্তর্জাতিক সংযোগ হয়েছিল। সেই সংযোগের মারফতে টাকাটা এসেছে।" এই গোপেন চক্রবর্তীকেও সেদিন আমায় চিনতে হয়েছিল। যাই হোক, ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্ট্‌স পার্টির বিশ্বস্ত সভ্য গোপেন চক্রবর্তী কখনও ছিলেন না। হরেন ঘোষ খোলাখুলিভাবে কমিউনিস্ট পার্টির এবং কমিউনিস্টদের সব কিছুর শত্রু ছিলেন। গোপেনের মতে সেই তিনিই নাকি রেড ইন্‌টারন্যাশনাল হতে টাকা আনিয়ে দিয়েছিলেন! কোনো

বিশ্বস্ত সভ্য কি এই রকম কথা কখনও বলতে পারেন? আমার মনে হয় গোপেন চক্রবর্তীর মনে তখন উপদলীয় রাজনীতি কাজ করছিল। তিনি হয়তো স্থিরই করেছিলেন যে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টির সভ্য তিনি আর থাকবেন না। সেই জন্যই তিনি এই পার্টির বার্ষিক চাঁদা দিতে বারে বারে অস্বীকার করছিলেন।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী ভ্রান্তিতে ভুগছেন। তাঁর বিশ্বাস যে বাঙলা দেশে তিনি পার্টির দ্বিতীয় সভ্য। প্রথম সভ্য কে সে কথা তিনি বলছেন না। নলিনী গুপ্ত কি? সে তো কখনও নিজেকে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য বলত না। বলত সে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী। গোপেন্দ্র চক্রবর্তী ১৯৩৪ সালের জুন মাসের আগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হননি। তাঁর ভ্রান্তির অপনোদন কখনও হবে কিনা তা জানিনে। হালে তিনি তাঁর হস্তলিখিত স্মৃতিকথা বহু লোককে পড়াচ্ছেন। অসত্য তথ্যে পরিপূর্ণ তাঁর এই স্মৃতিকথা। আশ্চর্য এই যে ইতিহাসের অধ্যাপক শান্তিময় রায়ও গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তীর ফাঁদে পা দিয়েছেন। তাব ফলে তিনি অসত্য তথ্যের সমাবেশ ক'রে তালগোল পাকানো শুরু করেছেন। (সোভিয়েত বিপ্লব ও ভারতবর্ষ ঃ শান্তিময় রায় লিখিত)।

জানকীপ্রসাদ বাগেরহাট্টা

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে জানকীপ্রসাদ বাগেরহাট্টার সঙ্গে কানপুর কমিউনিস্ট কনফারেন্সের সময়ে আমার প্রথম দেখা। আমি যখন ১৯২৩ সালে প্রথম গিরেফ্তার হই, সেই সময়ে জানকীপ্রসাদ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতেম না। কানপুরেই সে আমাকে প্রথম পরিচয় দিল যে সে কমিউনিস্ট পার্টির লোক এবং এম· এন· রায় ও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। জানকীপ্রসাদকে আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেম "তোমার এই বাগেরহাট্টা পদবীটা কি"? সে বললো, "আমরা গৌড় ব্রাহ্মণ। আগে বাঙলা দেশে ছিলাম, বাঙলা দেশ হতে পালিয়ে রাজপুতনায় এসেছি। এসেছি বাগেরহাট থেকে। সেইজন্য বাগেরহাট্টা লিখি।" দেখা গেল জানকীপ্রসাদ খুব করিতকর্মা ও চালাক লোক। ইংরাজী দ্রুত বলতে পারে। সে আরও একটি পরিচয় দিল যে সে শওকত উস্মানীর সহপাঠী। জানকীপ্রসাদের বাবা মাধবপ্রসাদ বিকানীরের উকিল ছিলেন। শওকত উসমানীও বিকানীরের লোক। তারা একই সঙ্গে বিকানীরের ডুঙ্গর কলেজে (হাই স্কুল) পড়ত। জানকীপ্রসাদ কিন্তু শওকত উস্মানীর সংস্রবে কমিউনিস্ট হয়নি। সে কী ক'রে কমিউনিস্ট হলো, এম· এন· রায় কী করে তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি আরম্ভ করলেন তার কিছুই জানি না। এস· ভি· ঘাটেও আমাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেনি। আমার মনে হয়, আজমীঢ়ের কোনো লোকের সূত্রে জানকীপ্রসাদ এম· এন· রায়ের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি আরম্ভ করে থাকবে। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসেই কার নিকট হতে জানি না, আজমীঢ়ের ঠিকানা এম· এন· রায় পেয়েছিলেন। আহ্মদাবাদ কংগ্রেসের নামে যে ইশ্তিহার প্রথম প্রচারিত হয়েছিল মস্কোতে ছাপা সেই ইশ্তিহারটি বহুল সংখ্যায় আজমীঢ়েই প্রথম এসেছিল। অবশ্য মস্কো হতে আসেনি, এসেছিল ইউরোপের কন্টিনেন্ট হতে। আজমীঢ়ের লোকেরাই এই ম্যানিফেস্টো আহ্মদাবাদ কংগ্রেসে বণ্টন করেছিলেন। এই আজমীঢ়ের সূত্রেই জানকীপ্রসাদের সঙ্গে এম· এন· রায়ের হয়তো যোগাযোগ ঘটে থাকতে পারে।

কানপুর কমিউনিস্ট কনফারেন্সে জানকীপ্রসাদ ও এস· ভি· ঘাটে ভারতের

কমিউনিস্ট পার্টির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনটা কনফারেন্সে হয়নি। কনফারেন্সে যে এক্‌জেকিউটিব নির্বাচিত হয়েছিল সেই কমিটি জানকীপ্রসাদ ও এস. ভি. ঘাটেকে যুগ্ম সেক্রেটারি মনোনীত করেন। তখন পার্টি আফিস বোম্বে চলে যায়। তারপরে পার্টি আফিস যে দিল্লীতে উঠে গেল সেই ব্যবস্থায় জানকীপ্রসাদ ঘাটেকে রাজী করিয়েছিল। আমাদের তার আগে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয়নি। পরে বুঝেছিলেম কেন আফিস দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই আফিসে ঘাটে কিছুকাল থেকেছিল। মস্কো থেকে ফিরে আসা হাবীব আহ্‌মদ নসীম তাদের কিছু কিছু সাহায্য করেছিলেন। হাবীব আহ্‌মদ মস্কো কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ ক'রে বাইরে এসেছিলেন। শাহ্‌জাহানপুরের লোক হলেও হাবীব আহ্‌মদ দিল্লীতে কিছু ব্যবসা করতেন। তাঁর বাবা ভারত গবর্নমেণ্টের হাওয়াই জাহাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি বড় চাকুরি করতেন। সেই সময়ে ১৯২৫-২৬ সালে তিনি অবসরপ্রাপ্ত হয়ে মক্কা চলে যান।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। কাকোরি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় আসামী আশ্‌ফাকুল্লাহ্‌ খান তখন পলাতক ছিলেন। তিনি ছিলেন হাবীব আহ্‌মদের বন্ধু। হাবীব আহ্‌মদের সূত্রে পলাতক আশ্‌ফাকুল্লাহ্‌র সঙ্গে জানকীপ্রসাদের পরিচয় হয়। জানকীপ্রসাদও তাঁকে নানা জায়গায় আশ্রয় দিয়েছিল। পরে আমার গভীর সন্দেহ হয়েছিল যে, আশ্‌ফাকুল্লাহ্‌ জানকীপ্রসাদের কারণেই ধরা পড়েছিলেন। তারপরে জানকীপ্রসাদ আমাদের মত না নিয়েই দিল্লীতে কমিউনিস্ট কনফারেন্স ঘোষণা করে দেয়। এই ঘোষণার পরে সে কলকাতায় এসেছিল এবং কয়েকদিন আমাদের সঙ্গে ছিল। তখনই আমরা হিন্দু-মুস্‌লিম দাঙ্গা সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ হতে একটা ছাপানো ইশ্‌তিহার প্রচার করি। এই ইশ্‌তিহারটি কলকাতায় গৌরাঙ্গ প্রেসে ছাপা হয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকা তখন হিন্দু-মুস্‌লিম দাঙ্গায় খুব উস্‌কানি দিচ্ছে। দু'টি সংস্থার প্রেস পৃথক থাকলেও উভয়ের মালিক সুরেশচন্দ্র মজুমদার আমাকে ঠেস দিয়ে বলেছিলেন,—"মহাশয়, আপনারা তো মহাপ্রাণ ব্যক্তি, আর আমরা হলাম গিয়ে অল্পপ্রাণ লোক।" এই ইশ্‌তিহারটি মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার একজিবিট। এর মুসাবিদা জানকীপ্রসাদের নিকটে ছিল। সে আমায় বলেছিল এটা এভেলিন রায়ের লেখা। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। কারণ, ১৯২৫ সালের শেষভাগে এভেলিন রায় আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালের শুরুর দিকেও দেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক খুব ভালো ছিল না। এভেলিন হয়তো তখনই এটা লিখে থাকবেন। এর দু'এক ছত্রে কুত্‌বুদ্দীন সাহেব কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করেছিলেন। কোথায় তা আমার ভালো মনে নেই। এমনও হতে পারে যে এই ইশ্‌তিহারটি এম. এন. রায়ও লিখে থাকতে পারেন। জানকীপ্রসাদ দিল্লীতেই কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কনফারেন্স ডেকেছিল। পরে সে স্থান বদলে লাহোরে কনফারেন্সের স্থান স্থির করে। তখনও আমার নিজের মনে এবং অন্য কমরেডদের মনেও এই ইচ্ছা ছিল যে আমরা কোনও রকমে লাহোরেই কনফারেন্সটা ক'রে ফেলবো। আসলে খোলাখুলি কমিউনিস্ট কনফারেন্স ডাকার দিকে আমার বেশী উৎসাহ ছিল না।

১৯২৬ সালের নবেম্বর মাসে আমি লাহোরে যাই। হাওয়া পরিবর্তনের জন্যই গিয়েছিলেম। ১৯২৬ সালে আমার বারে বারে জ্বর হচ্ছিল। হঠাৎ একদিন সকাল বেলা দেখলাম যে জানকীপ্রসাদ সেখানে এসে হাজির। তাকে জিজ্ঞাসা

করলেম যে, তুমি কেন এলে? সে উত্তর দিল যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমরা ওখানে থাকতে থাকতেই বোম্বে হ'তে ঘাটের চিঠি এল। ঘাটে আমাকে লিখেছে যে, ১৪ই জানুয়ারী (১৯২৭) তারিখে সাক্‌লাতওয়ালা আসছেন। জানকীপ্রসাদকে শীঘ্রই 'পাঠিয়ে দাও'। তখন আমি জানকীপ্রসাদকে বললেম, "আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। তুমি কালকের দিনটাও এখানে থেকে যাও। পরশু আমরা একত্রে যাবো।" জানকীপ্রসাদ বললো, "আমি কিছুতেই থাকতে পারব না। কারণ, কাল আমার দিল্লীতে অনেক কাজ আছে। টাকাকড়ি একেবারেই হাতে নেই। তার জোগাড় দিল্লীতেই করতে হবে। আরও অনেক কাজ রয়েছে।" এই বলে সে রাত্রের গাড়ীতেই জানকীপ্রসাদ দিল্লী চলে গেল। তার পরের দিন রাত্রের গাড়ীতে আমিও রওয়ানা হলাম। তৃতীয় দিন সকাল বেলা দিল্লী স্টেশনে টিকিটের কাউণ্টারের ওখানে জানকীপ্রসাদের সঙ্গে আমার দেখা হ'লো। জানকীপ্রসাদ ও আমি একত্রেই টিকিট কিনলাম এবং একত্রেই বি· বি· সি· আই· ট্রেনে বোম্বে গেলাম। এর আগে আমি কখনও বোম্বে যাইনি। জানকীপ্রসাদই আমায় ধোবি তালাওর একটি হোটেলে নিয়ে গেল। পথে ট্রেনে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলেম—"তুমি তো বলেছিলে তোমার নিকটে টাকা নেই। এত তাড়াতাড়ি একদিনে টাকাকড়ি কোথা হ'তে জোগাড় হ'লো?" তখন জানকীপ্রসাদ একটা ভুল করল। সে আমাকে বললো—"ভাই, সারাদিন ঘুরে ঘুরে কোথাও টাকা পেলাম না। সন্ধ্যাবেলা আমি নিরাশ হ'য়ে একজন বাঈজীর বাড়ী গেলাম। বাঈজীর সঙ্গে আগে হতে পরিচয় ছিল। মাঝে মাঝে আমি ওখানে গান শুনতে যাই। বাঈজী আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'পণ্ডিতজী, আপনাকে এত উদাস দেখাচ্ছে কেন?' আমি বললাম আমার কিছু টাকার দরকার। সারাদিন ঘুরে ঘুরে কোথাও টাকা পেলাম না। তখন বাঈজী আমাকে একটা ট্রেতে একশ' টাকার একখানা নোট এনে দিল।"

আমার মনে খুব সন্দেহ হলো। কারণ, আমি বরাবর শুনেছি বাঈজীরা লোকের কাছ থেকে টাকা নেয়, তারা যে কাউকে এইভাবে টাকা দিয়েও থাকে, তা আমার বিশ্বাস হলো না। আরও একটা জিনিস সেই সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল। জানকীপ্রসাদ লাহোরে আমায় বলেছিল যে, "কাল ডেভিড পেট্রির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।· (ডেভিড পেট্রি ছিলেন ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর।) তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন 'লাহোর তো কোনো হাওয়া বদলাবার জায়গা নয়, মুজফ্‌ফর কেন হাওয়া বদলাতে লাহোরে গেল'?" আমি জিজ্ঞেস করলেম—"তুমি ডেভিড পেট্রিকে কি ক'রে চিনলে"? সে বললো, "দিল্লীতে আমাদের আফিস আসার পরে পরিচয় হয়েছিল"। আমি তাকে যখন জিজ্ঞাসা করলেম—"দিল্লীতে কোথায়, কি করে তোমার সঙ্গে ডেভিড পেট্রির দেখা হলো?" সে বললো, "আমি মেইডেন্স হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন পেট্রি হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। আমাকে দেখেই এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন।"

লাহোরে শোনা ঐ কথার সঙ্গে বাঈজীর টাকা দেওয়ার কথা মিলিয়ে আমার মনে গভীর সন্দেহ হলো যে জানকীপ্রসাদ খুব সম্ভবতঃ ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর নিযুক্ত করা লোক। আমার মনে যে সন্দেহ হয়েছিল, আমি তা কথাবার্তায় বা ব্যবহারে প্রকাশ করলেম না।

বোম্বেতে পৌঁছে ঘাটের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই আমি তাকে সব কথা খুলে বলি। তাকে বলি যে, জানকীপ্রসাদ সম্বন্ধে আমাদের সাবধান হ'তে হবে। আমি

নিজের মনে চিন্তা ক'রে তখনই ঠিক করে ফেললাম যে লাহোরের কমিউনিস্ট কনফারেন্স আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। যেমন ক'রেই হোক ওটাকে আমি ভণ্ডুল ক'রে দেবো। শেষ পর্যন্ত ভণ্ডুল ক'রে দিতেও পেরেছিলেম। সাক্‌লাতওয়ালা বোম্বেতে আমাদের বলেছিলেন, "১৪ই মার্চ কার্ল মার্কসের মৃত্যু দিবস। সেদিন আমি আমাদের যত মজুর-সংগঠন আছে, তাদের সঙ্গে দিল্লীতে একটা মিটিং-এ মিলিত হ'তে চাই।" সেই মিটিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থান হ'তে আমাদের কমরেডরা দিল্লী এসেছিলেন। আর সেই সময়ে অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন দিল্লীর হিন্দু কলেজে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।

দিল্লীর চাওড়িবাজারে আর্য সমাজ মন্দিরে আমাদের সভা হয়েছিল। আমি সভাপতিত্ব করেছিলেম। অনেকে অনেক পুস্তকে লিখেছেন, ঐ সভাটি কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কনফারেন্স ছিল। আসলে মোটেই তা নয়। ঐ সভাটি সাক্‌লাতওয়ালার ইচ্ছা পূরণের জন্যই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের বিভিন্ন স্থানের নেতৃস্থানীয় কমরেডদের কাছে আমি জানকীপ্রসাদ সম্বন্ধে আমার সন্দেহের কথা বলি। তখন গওহর রহমান খান আমাদের বলেন যে, আশ্‌ফাকুল্লাহ্‌ খানের ব্যাপারে জানকীপ্রসাদের উপরে তাঁরও সন্দেহ আছে। আমরা যে জানকীপ্রসাদকে সন্দেহ করছি, সে তা বুঝতে পারে। তখন দিল্লীর রয়েল হোটেলে পার্টি মেম্বারদের পৃথক সভায় জানকীপ্রসাদ কেঁদে ফেলে, বলে, "আমাকে সন্দেহ করা হচ্ছে"। আমরা বলি "কোথায় সন্দেহ করা হলো? তোমাকে তো কিছু বলা হয়নি।"

আগে হ'তে ১৯২৭ সালের ৩১শে মে তারিখে বোম্বেতে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির একটি সাধারণ সভা হওয়ার কথা ছিল। আমি ঘাটেকে বলেছিলেম—"ওই সভাটাও ভেঙে দাও"। নিম্বকর ও জোগলেকর প্রভৃতির কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে তেমন কিছু আগ্রহ তখন ছিল না। ঘাটে ইচ্ছে করলেই সভাটি ভেঙে দিতে পারতো। কিন্তু চিরকালের দুর্বল মানুষ ঘাটে। সে সভাটি ভণ্ডুল করতে পারেনি। আমি তাতে যোগ দিইনি। তাতে কমিউনিস্ট পার্টির একটা গঠনতন্ত্র (কনস্‌টিটিউশন) গৃহীত হয়েছিল। তা'ছাড়া আরও কিছু প্রস্তাব পাস হয়েছিল। জানকীপ্রসাদ সেই সভাতেই ঘোষণা ক'রে যে সে আর কোন কিছুতে থাকবে না। কারণ, সে বুঝতে পারছে তার উপরে কমরেডদের বিশ্বাস নেই। তারপর হ'তে সে আর কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখেনি। আমাদের সন্দেহ যে ঠিকই ছিল তার প্রমাণ আমরা পেলাম মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলার সময়।

আমরা যখন মীরাট মোকদ্দমার সংস্রবে গিরেফ্‌তার হই, সেই সময় রেওয়ারিতে জানকীপ্রসাদের বাড়ীতেও তল্লাশি হয়। (রেওয়ারি দিল্লীর নিকট গুড়গাঁও জিলার একটা শহর। তার সেখানকার এক কাকা তাকে পোষ্য গ্রহণ করেছিল।) জানকীপ্রসাদের বাড়ী হতে যে সমস্ত কাগজপত্র পুলিস এনেছিল সেই সমস্ত কাগজপত্র অনুসন্ধান ক'রে আমরা ভারত গবর্নমেণ্টের ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর নামে পাঠানো একটা বিলের নকল পেয়ে যাই। আশ্চর্য এই যে জানকী-প্রসাদ যে আমার সঙ্গে দিল্লী হতে বোম্বে গিয়েছিল তার সেই ভ্রমণেরই রাহা-খরচের বিল ছিল ওটা। জানকীপ্রসাদকে আমি শেষ দেখেছিলেম ১৯৩৮ সালে। সে হঠাৎ একদিন কলকাতায় ৭৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে আমার ঘরে এসে উপস্থিত হয়। আমি তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করি—"তুমি কী করে এলে?

কোথায় আমার ঠিকানা পেলে?" সে বললে, "তুমি ঘাবড়িও না—আমি এখন আর কোন রাজনীতি করি না। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম পানবিড়ির দোকানে দোকানদারেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। তারা তোমার নামও উচ্চারণ করছিল বলে আমি তাদের তোমার ঠিকানার কথা জিজ্ঞাসা করি, তারা তোমার ঠিকানাটা দেয়।" জানকীপ্রসাদ বলে, "এখন আমি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লিখে থাকি। ইস্ট ইন্ডিয়ান ফিল্মের জন্য 'উদয়' নামে একটি চিত্রনাট্য লিখেছি। সেটা কলকাতায় দেখানো হবে। সেই উপলক্ষে আমি কিছুদিন এখানে বিপিন পাল রোডে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছি। আবদুল হালীম আর তুমি আমার ফ্ল্যাটে খেতে আসবে একদিন।" আমরা অবশ্য খেতে যাইনি। ও সত্য-সত্য কোন সিনেমার ব্যাপারে এসেছে কি না, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়েছিল। পরে 'উদয়' নাম দিয়ে বড় বড় হরফে লেখা পোস্টার দেওয়ালে দেখেছিলেম। জানকীপ্রসাদ এখন বেঁচে নেই।

বলা হচ্ছে যে ১৯২৬ সালে আমার কলকাতা ফেরার পরে আমার কথা মতোই কলকাতায় পার্টি মিটিং ডাকা হয়েছিল। কথাটা সত্য নয়। আমি কোনও মিটিং ডাকিনি। শামসুদ্দীন হাসসান দু'বার ও জানকীপ্রসাদ একবার নিজেদের প্রেরণাতেই কলকাতা এসেছিল। দিল্লীতে আফিস স্থানান্তরিত করার কথাও আমি কিছু বলিনি। প্রথমে দিল্লীতে ও পরে লাহোরে কমিউনিস্ট কনফারেন্স ডাকার ব্যাপারেও আমি ছিলেম না। ঘাটেকে ভালো মানুষ পেয়ে জানকীপ্রসাদ সব কিছু করেছিল।

শওকত উস্‌মানী সম্বন্ধে আরও কিছু কথা

শওকত উস্‌মানী সম্বন্ধে আমি আরও কিছু কথা লিখে রাখছি। পরে যাঁরা তথ্যানুসন্ধান করবেন তাঁদের কাজে লাগবে। কানপুর 'বলশেভিক' ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় পাওয়া সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সে ঝান্সি জেল হতে মুক্তি পেল। লাহোরের মীর আবদুল মজীদ ও ভোপালের রফীক আহ্‌মদ তাকে জেলের গেটে স্বাগত জানালেন। এই দু'জনই ১৯২১ সালে মস্কোতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। মুক্তি পাওয়ার পরে দিল্লী ও লাহোর হয়ে সে আজমীঢ়ে যায়। উস্‌মানী বিকানীরের নাগরিক। বিকানীর দেশীয় রাজ্য হওয়ার কারণে সে সেখানে যেতে সাহস পেল না।

উস্‌মানীর মুক্তির কয়েক দিন পরে আমি পার্টির কাজে বোম্বে গিয়েছিলেম। সেখান হতে কলকাতা ফেরার সময়ে তার সংগে দেখা করার জন্যে আজমীঢ়ের ঘোরা পথে কলকাতা ফিরলেম। সেখানে অর্জুনলাল শেঠীর বাড়ীতে তার সংগে আমার দেখা হলো। আমাদের পার্টির অবস্থা সম্বন্ধে সে আমার নিকট হতে কিছুই জানতে চাইল না। সে প্রস্তাব করল যে "আমি মস্কো চলে যেতে চাই। তোমরা পার্টি হতে আমার সেই অনুমতি দাও।" আমি তার এই প্রস্তাবে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেম। আমি তাকে বললেম, "তুমি অনেক দিন পরে জেলের বাইরে এসেছ। এখন আমাদের সামনে আন্দোলন করার ও পার্টি গড়ার পরম সুযোগ এসেছে। এই সময়ে তুমি মস্কো যাবে কিসের দুঃখে? অন্যরা কি বলবেন আমি তা জানিনে, আমি কিন্তু তোমার মস্কো যাওয়ার পক্ষে কিছুতেই মত দেব না।" শওকত উস্‌মানী মনঃক্ষুণ্ন হলো? শুধু কি মনঃক্ষুণ্ন? সে মনে মনে আমায় তার শত্রু ভেবে নিল। এই রকমই ছিল তার স্বভাব। বোম্বেতে গিয়েও পার্টির নিকটে সে তার মস্কো যাওয়ার প্রস্তাব তুলেছিল। তার প্রস্তাব পার্টি গ্রহণ করেনি। পুরানো পুলিস রিপোর্টে দেখেছি ডাংগে নাকি তলে তলে তাকে সমর্থন জানিয়েছিল।

আমি সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে বা অক্টোবরের শুরুর দিকে আজমীঢ় গিয়েছিলেম। নবেম্বর মাসে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে কানপুরে গিয়ে দেখলেম উস্‌মানী সেখানেই রয়েছে। তার মস্কো যাওয়ার সম্বন্ধে সে আর কোনো কথা উচ্চারণ করল না। কিন্তু তলে তলে মস্কো যাওয়ার কাজই সে করে যাচ্ছিল। কিছু দিন পরে সে একটি 'নাম কা ওয়াস্তে' সাংবাদিক এজেন্সি খুলে দিল্লীতে গিয়ে বসল। পার্টির সভ্যদের সংগে ব্যক্তিগতভাবে চিঠিপত্র সে লেখালেখি করত, কিন্তু পার্টির কোনো কাজই করত না।

শওকত উস্‌মানী যে দিল্লীতে তার বাসা বাঁধল, তার খরচ কি করে চলত? কে দিত তাকে টাকা? আমরা খবর পেয়েছিলেম যে সৈয়দ মস্‌উদ আলী শাহ্‌ উস্‌মানীর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করত। ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে যখন ভোপালের রফীক আহ্‌মদ সাহেবের সংগে কলকাতায় আমার দেখা হয়েছিল তখন তিনিও আমায় বলেছিলেন যে উস্‌মানীর খরচ চালাবার জন্যে মস্‌উদ আলী শাহ্‌ ঠিকাদারীর কাজ নিয়েছিল।

উস্‌মানীর দিল্লী থাকার সময়ে রফীক আহ্‌মদ একবার দিল্লী গিয়েছিলেন।

উস্‌মানী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে পার্টির কথা সে মানবে না, যেমন করে হোক মস্কো সে যাবেই এবং সেখানে গিয়ে ভারতের পার্টিকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে। দিল্লীতে এসে প্রথমে সে মস্‌উদ আলী শাহের সংগে সব ব্যবস্থা করে। তার সাহায্য ছাড়া উস্‌মানীর যাওয়া সম্ভব ছিল না। মস্‌উদ আলীর কথা আমি আগে বলেছি। সে ব্রিটিশ স্পাই বা চরের বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। কাজেই সে উস্‌মানীর প্রস্তাবে খুশী হয়েছিল। উস্‌মানীরা যখন প্রথম বারে (১৯২১) দেশে ফিরে আসে তখন মুহাজিরদের ভিতর হতে যাঁরা পার্টির সভ্য হয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেককে একজন ভ্রমণের সাথী বেছে নিতে বলা হয়েছিল। শওকত উস্‌মানী তখন মস্‌উদ আলী শাহ্‌কেই সাথী বেছে নিয়েছিল। মস্কোতে যাঁরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছিলেন তাঁদের ভিতরে শওকত উস্‌মানীই সকলের আগে দেশে ফেরার প্রস্তাব পেশ করে। মস্‌উদ আলী আর শওকত উস্‌মানী সকলের আগে ইরানের ভিতর দিয়ে দেশের দিকে রওয়ানা হয়। তাদের দু'জনেই একত্রে ইরান অতিক্রম করেছে। কিন্তু দেশে প্রবেশ করবার সময় তারা আগে-পরে প্রবেশ করেছিল কিনা তা আমি জানিনে। কর্নেল সেসিল কে' ব'লছেন তারা আগে-পরে দেশে এসেছিল।

মস্‌উদ আলী শাহ্‌ ১৯২০ সালে হিজরাত করেছিল। অর্থাৎ, সে একজন ব্রিটিশ চর হিসাবে হিজরাতকারীদের সঙ্গ নিয়েছিল। অভিজাত পরিবারের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও সে তার চরবৃত্তির মূল্য হিসাবে পথের সব কষ্ট স্বীকার করেছিল। তাশকন্দে এম. এন. রায়ের সংগে মিলিত হওয়ার পরেও কিছু কিছু মুহাজির যুবক তাকে সন্দেহ করত। কিন্তু সে এম. এন. রায় ও এভেলিন রায়ের স্নেহ আকর্ষণ করেছিল। তাশকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যখন গঠিত হয় তখন মুহাজিরদের ভিতর হতে মস্‌উদ আলী শাহ্‌ ও আবদুল কাদির খান (সেহ্‌রাই) সকলের আগে পার্টিতে যোগদান করে। এই আবদুল কাদির খানও ব্রিটিশের চর ছিল। পরে অন্যদের সংগে মস্‌উদ আলীও মস্কো গিয়েছিল এবং তারপরে শওকত উস্‌মানীর ভ্রমণের সাথী হয়ে দেশে ফিরে আসে।

শওকত উস্‌মানী ১৯২৩ সালে ধরা পড়ার পরে পুলিসের কাছে বয়ান দিতে গিয়ে বলে যে,—সে লাহোরে গিয়েছিল তার ভ্রমণের সাথীকে খুঁজবার জন্যে, কিন্তু তাকে সে পায়নি। আমার মনে হয়, মস্‌উদ আলী শাহ্‌ মীরাটের সার্ধানাব বাশিন্দা হলেও তার সংগে শওকত উস্‌মানীর লাহোরে দেখা করার কথা হয়ে থাকবে। ১৯২২ সালেই মস্‌উদ আলী দ্বিতীয় বার ইরানের পথে মস্কো যায়। সম্ভবতঃ, এবারও শওকত উস্‌মানী মস্কো যেতে চেয়েছিল। কিন্তু লাহোরে গিয়ে সে মস্‌উদ আলীকে পায়নি। মস্‌উদ আলী তেহ্‌রান হয়ে মস্কো পৌঁছেছিল। মস্কোতে সে ব্রিটিশ কমার্শিয়াল মিশনের ইন্‌টেলিজেন্স অফিসার বা গোপন ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সংগে দেখা করে। তাঁকে সে নিজের গোপন সংক্ষিপ্ত নাম "Bellmount" জানিয়ে দেয় এবং বলে যে, সে ভারতবর্ষের কর্নেল সেসিল কে'র সংগে পরিচিত। ব্রিটিশ কমার্শিয়াল মিশনের গোপন ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত অফিসার এই খবর "দি রাইট অনারেবল দি মারকুইস কার্জন অব্‌ কেডেলস্টন, পি. সি. কে. জি,..." কে জানান। এবং মস্‌উদ আলীর মুখে শুনে তার পরিচয়ও সেই সংগে ভারপ্রাপ্ত অফিসার কার্জনকে পাঠান। সেই পরিচয়টি হলো এই যে,—সে (অর্থাৎ মস্‌উদ আলী) ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত তাশকন্দের মিলিটারি স্কুলে ছিল।

তারপরে সে মস্কো হতে ইরানের ভিতর দিয়ে ভারতে রওয়ানা হয় এবং ১৯২১ সালের ১৫ই ডিসেম্বরে ভারতে পেঁছায়। ভারপ্রাপ্ত অফিসার জানালেন যে, মস্‌উদ আলীর সব কথা যাচাই করার সুযোগ তাঁর নেই। তবে, আলী শাহ্‌ শিক্ষিত ব্যক্তি। নিজেকে ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারে, এবং খুব ভালো (excellent) ইংরাজী বলতে পারে। মস্কো আসার পরে আলী শাহ্‌ বার্লিনে গিয়েছিল। সেখানে রায়ের সঙ্গে তার দেখা হয়। তারপর সে মেজর গ্রীনের মারফতে মেজর ফলির [Folly (?)] সঙ্গে দেখা করে এবং ১৪ই অক্টোবর তারিখে (১৯২২) টেলিগ্রামযোগে ভারতবর্ষ থেকে ১০০ পাউন্ড পায়। তারপর সে থার্ড ইন্‌টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেস (নভেম্বর ৫ হতে ডিসেম্বর ৫) যোগ দেবার জন্যে মস্কো চলে আসে। বার্লিনে তাকে বলা হয়েছিল যে মস্কোতে তার সঙ্গে আর একজনের দেখা হবে। কিন্তু সেই 'একজন' তার সঙ্গে এসে শেষ পর্যন্ত দেখা করেনি। মস্‌উদ আলী বলল যে, সেইজন্য আমি একাই রিপোর্ট করছি।

আমার সন্দেহ হয় যে, সেই 'আর একজন' হয়তো নলিনী গুপ্ত ছিল। নলিনী গুপ্ত ভারতে পুলিসের কাছে বিবৃতি দেবার সময় বলেছে যে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসে সে এবং মস্‌উদ আলী শাহ্‌ দর্শক হিসেবে যোগদান করেছিল। কংগ্রেস সম্বন্ধে আলী শাহ্‌ রিপোর্ট করেছে যে, ভারত হতে কোন প্রতিনিধি (Delegate) কংগ্রেসে আসেনি। অথচ এই প্রতিনিধিদের রাহাখরচ বাবতে ৮০০ পাউন্ড দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসে ভারতের কাজের জন্য নতুন করে কোন টাকা মঞ্জুর করা হয়নি।

মস্‌উদ আলী শাহ্‌ পরে আর একবার বার্লিনে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু এম. এন. রায় তাকে লিখে জানিয়েছিল যে, সে হয় মস্কোতে থাকুক নতুবা ভারতবর্ষে ফিরে যাক। আমি এই কথাগুলি ইন্ডিয়া হাউসের কাগজ পত্রের ফটোস্টাট কপি হতে সঙ্কলন করেছি। এর পরের খবর কর্নেল সেসিল কে' তাঁর পুস্তকে লিখেছেন যে, মস্‌উদ আলী শাহ্‌ রাশিয়াতে গিরেফ্‌তার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। কারাগার থেকে সে পালিয়ে যায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে আলী শাহ্‌ গিরেফ্‌তার হয়েছিল। গিরেফ্‌তার হলে আমরা অন্যান্য ভারতীয় কমরেডদের নিকট হতে খবর পেতাম। আমার মনে হয় মস্‌উদ আলী শাহ্‌ ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরে এসেছিল। তা না হলে সে শওকত উস্‌মানী ও তার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে ১৯২৮ সালে আবার মস্কো যাবার সাহস পেত না।

দিল্লীতে বসে বসে শওকত উস্‌মানী তার মস্কো যাওয়ার ব্যবস্থায় লেগে গেল। ১৯২৭-২৮ সালের প্রবল মজুর আন্দোলন, দীর্ঘস্থায়ী মজুর ধর্মঘট প্রভৃতি তার মন টলাতে পারল না। সে মস্কো যাবেই। ১৯২৮ সালের ১৭ই জুলাই হতে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মস্কোতে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশন হবে, এটা মনে রেখেই সে তার প্রস্তুতি করতে লাগল। আগে যাঁরা মস্কোতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন তাঁদের ভিতরে লাহোরের মীর আবদুল মজীদ, শেখুপুরার ফিরোজুদ্দীন মন্‌সুর ও হরিপুরের (হাজারা জিলা) গওহর রহমান খান, উস্‌মানীর মতে, কিছু বেশী মাত্রায় কমিউনিস্ট ছিলেন। সে তাঁদের নিকটে ঘেঁসল না। পেশোয়ার জিলার মুহম্মদ শফীক, শাহ্‌জানপুরের হবীব আহ্‌মদ ও ভোপালের রফীক আহ্‌মদের সঙ্গে সে যোগাযোগ করল। শফীক ও হবীব আহ্‌মদ যেতে রাজী হলেন, কিন্তু রফীক আহ্‌মদ অস্বীকার করলেন। শফীক সম্বন্ধে আগে অনেক বলেছি।

১৯২৮ সালে পার্টির কাজের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ ছিল না। জেল হতে

পুস্তকে তার উল্লেখ আছে।[১] তিনি এক পত্রে আমায় লিখেছিলেন, এই তিন জনের একজনকে (নিঃসন্দেহে বলা যায় সৈয়দ মস্‌উদ আলী শাহ্‌কে) একদিন গভীর রাত্রে ঘুম থেকে তুলে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরে তার আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। মস্‌উদ আলী শাহ্‌ যে একজন ব্রিটিশের চর তা নিশ্চয়ই সোবিয়েত গবর্নমেণ্টের নিকটে ধরা পড়ে গিয়েছিল, এবং সেই রাত্রিতে তাকে ওইভাবে বধ্যভূমিতেই নিশ্চয় নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকবে। শওকত উস্‌মানীর কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। মস্‌উদ আলী শাহ্‌ যে বিশ্বাস করার মতো লোক নয় এ ধারণা মুহাজির কমরেডদের মধ্যে অনেকে পোষণ করতেন। তা সত্ত্বেও শওকত উস্‌মানী তাকেই প্রথম বারে সাথী নির্বাচন করেছিল। আর যদি কর্নেল কে'র লেখা সত্য হয় যে মস্‌উদ আলী দ্বিতীয় যাত্রায় মস্কোতে গিরেফ্‌তার হয়ে জেল হতে পালিয়ে এসেছিল তা হলে ১৯২৭-২৮ সালে শওকত উস্‌মানী তা বুঝল না কেন? তারা তখন কয়েক মাস ঘনিষ্ঠভাবে বাস করেছিল। শওকত উস্‌মানীর এমন বন্ধুও আছেন যাঁরা বলছেন মস্‌উদ আলী শাহ্‌কে সোবিয়েত গবর্নমেণ্টের হাতে সমর্পণ করার জন্যেই ১৯২৮ সালে শওকত উস্‌মানী তাকে মস্কো নিয়ে গিয়েছিল। এটা সত্য কথা নয়। তা হলে তো মস্কো পৌঁছেই শওকত উস্‌মানী তাকে সোবিয়েত গবর্নমেণ্টের হাতে দিয়ে দিত। মস্‌উদ আলী শাহ্‌ও উস্‌মানীর মতো জাল পরিচয়পত্র (ম্যান্‌ডেট) নিয়ে গিয়েছিল। সেও সম্ভবত যোগদান করেছিল ইয়ং কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের কংগ্রেসে প্রতিনিধি-রূপে। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ বলছেন ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসেও তিনি মস্কোতে শফীক, হবীব ও আলী শাহ্‌কে এক সংগে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন, হোটেল লুকে তারা থাকত।

শফীক, হবীব আহ্‌মদ ও মস্‌উদ আলী শাহ্‌ সম্পর্কে শওকত উস্‌মানী ফিরে আসার পরে দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমরা কোনো খবর পাইনি। রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপের পুস্তকে মুদ্রিত ও পত্রে লেখা ১৯২৯ সালের খবর আমরা এখন পড়ছি, আগে কিছুই জানতে পারিনি। ১৯৩২ সালের শেষার্ধে সেশন্স কোর্টে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার শুনানি শেষ হয়ে যায়। তখন মোকদ্দমার রায় লেখার জন্যে জজ লম্বা সময় (পাঁচ মাস) নিলেন। ব্রিটিশ মজুরেরা আমাদের জন্যে আন্দোলন করেই যাচ্ছিলেন। তাঁরা সেক্রেটারি অফ্‌ স্টেট ফর্‌ ইণ্ডিয়ার মারফতে প্রস্তাব করলেন যে রায় লেখার সময়টা আসামীদের কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। ভারত গবর্নমেণ্ট স্থির করলেন যে আমাদের আলমোড়া ডিস্‌ট্রিক্ট জেলে পাঠানো হবে। ঠিক এই সময়টাতে একদিন অপরাহ্ণে আমি আমাদের ব্যারাকের গেটে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় জেল আফিস হতে একজন লোক এসে এক বাণ্ডিল চিঠিপত্র আমার হাতে দিয়ে গেল। সবচেয়ে ওপরের পত্রখানি ছিল একখানি পোস্ট কার্ড শওকত উস্‌মানীকে লেখা। পড়ব কি, পড়ব না, তা স্থির করার আগেই পত্রখানি আমার পড়া হয়ে গেল। বোম্বে হতে মুহম্মদ শফীক লিখেছেন। যতটা আমার মনে আছে তা হচ্ছে এই ঃ শফীক আগের দিন জাহাজ হতে নেমেছেন। ইউরোপ হয়ে (লণ্ডন হয়ে লিখেছিলেন কিনা মনে করতে পারছিনে) এসেছেন। তারপরে লিখেছে 'তোমাদের এই কষ্ট স্বীকারে কি ফায়দা হবে? কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের সহিত ভারতের

[১] My Life Story of Fiftyfive Years, pp, 156-57

কমিউনিস্ট পার্টির যে সংযুক্তিকরণ (affiliation) ছিল তাও তো স্থগিত হয়ে আছে।' কিন্তু মুহম্মদ শফীক এতদিন কোথায় কিভাবে ছিল, বন্দী হয়েছিল কিনা, কিছুই জানি না। আন্দাজে আমরা অনেক কথা বলেছি, কেউ কেউ বলেছেন রুশ ও ব্রিটিশ বন্দীর ফলে শফীক ফিরে আসতে পেরেছে, সঠিক খবর কিন্তু কিছুই এই পুস্তকে শফীকের ঠিকানা আছে। পাকিস্তানের কোনো অনুসন্ধিৎসু বন্ধু ইচ্ছা করলে খবরটা নিতে পারেন। হবীব আহ্‌মদ নসীমেরই বা কি হলো? সে উত্তর প্রদেশের শাহ্‌জাহানপুর শহরের বাশিন্দা ছিল। কেউ ইচ্ছা করলে খবর নিতে পারেন। মহেন্দ্রপ্রতাপের পত্র হতে বোঝা যায় মস্‌উদ আলী শাহের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। শফীকের পত্রের সাদা ভাষায় লেখা এই ক'টি ছত্রের ভিতরে কি যে লুকানো ছিল, কিছুই বুঝলাম না, শওকত উস্‌মানীর মাথা খারাব হয়ে গেল। সে বেঁকে বসল যে আলমোড়া সে যাবে না। কারাকর্তৃপক্ষ একজন লোকের জন্য গার্ডের একটা বড় সংখ্যা মোতায়েন রাখতে চান না। অনেক বুঝিয়ে, অনেক সম্‌ঝিয়ে শওকত উস্‌মানীকে তো আলমোড়া নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু সেখানে গিয়েও তার মাথা খারাবই থেকে গেল। এই সময়ে (১৯৩২) শওকত উস্‌মানী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হতে বহিষ্কৃত হয়। এ সব উনিশ শ' ত্রিশের দশকের কথা। আমি নিজেকে উনিশ শ' বিশের দশকের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখছি।

অল-ইণ্ডিয়া ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টির সম্মেলনের সময়ে ভিতরে ভিতরে ফাঁক পেলেই কমিউনিস্ট পার্টিরও মিটিং হয়েছে। সমস্ত ভারতের পার্টি সভ্যরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ভাবতে অবাক্‌ লাগে, উস্‌মানী যে পার্টির নির্দেশ অমান্য করে জাল পরিচয়পত্র নিয়ে মস্কো গেল সে বিষয়ে কোনো আলোচনা হলো না। সে যে এসেই ক্ষমা চেয়েছিল তাতেই সব কিছু চাপা পড়ে গেল। সে দিন আমরা কত দুর্বল পার্টি ছিলাম! কিন্তু পার্টি মিটিং-এ স্থির হয়েছিল যে লাহোরকে কেন্দ্র ক'রে শওকত উস্‌মানী তার কর্মস্থল বেছে নেবে। সে লাহোরে গিয়েওছিল, কিন্তু থাকল না, চলে গেল বোম্বেতে। সেখান থেকে বা'র করল একখানি উর্দু কাগজ—"পয়ামে মজদুর" নাম দিয়ে। উস্‌মানী ছিল বিকানীর রাজ্যের একজন অতি দরিদ্র প্রজা। কিন্তু তার মেজাজ যে রকমের ছিল তাতে বিকানীরের মহারাজা হলেই তাকে ভালো মানাতো।

যদি কোনো লোকের নিকট উস্‌মানীকে নতি স্বীকার করতে হতো সেই লোককে জীবনে সে কোন দিন ক্ষমা করতে পারত না। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট তাকে যে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল তার বিবরণ আমি আগে দিয়েছি। 'এই বুঝি আমি অন্যের চেয়ে ছোট গণ্য হয়ে গেলাম' তার মনে এই রকম একটি ভাবনা সর্বদা তাকে তাড়া করে বেড়াত। ১৯২৭-২৮ সালে সে কমিউনিস্ট ইন্‌টার-ন্যাশনালের ভিতরের অবস্থা কতটা জানত তা আমি জানিনে, তবে, এম· এন· রায়কে উৎখাত করার এবং সম্ভব হলে তাঁর শূন্য সিংহাসনে চড়ে বসার উদ্দেশ্য নিয়ে উস্‌মানী মস্কো গিয়েছিল। এম· এন· রায় তো প্রায় উৎখাত হয়েই ছিলেন, আর শওকত উস্‌মানী খুব তাড়াতাড়ি যদি পালিয়ে না আসত তবে বিপদে পড়ত। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় দেখে যে কত সুবিধাবাদী ছিল শওকত উস্‌মানী!

মীরাট মোকদ্দমার রায় হতে আমি এখানে কিঞ্চিৎ তুলে দিচ্ছি ঃ

"He asked me to tell you that 'your men' attacked him over there without reason. But the C. I. has cut his feet as well

as yours. He has nothing against you." (Meerut Communist Conspiracy Case Judgment, Vol. II. Page 437)

এই উদ্ধৃতি জজ রায়কে লেখা ডক্টর অধিকারীর এক পত্রের মুসাবিদা হতে নিয়েছেন। অধিকারীর সবে উস্‌মানীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তিনি তাকে ভালো করে চিনেননি, বোঝেননি। তবুও রায়ের কিছু ক্ষমতা নেই জেনেও তিনি তাঁর নিকটে উস্‌মানীর জন্যে ওকালতি করছেন। আর সুবিধাবাদী উস্‌মানী অধিকারীর মারফতে রায়কে খবর পাঠাচ্ছেন যে তাঁর বিরুদ্ধে উস্‌মানীর কোনো নালিশ নেই। অথচ মওকা মতো অবস্থায় পেলে সে রায়কে বিশ হাত গভীর জলের তলায় ডুবিয়ে দিত। উস্‌মানী রায়কে জানাতে চেয়েছে যে অকারণে রায়ের লোকেরা মস্কোতে তাকে আক্রমণ করেছে। তাতে সি· আই· (কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল) উস্‌মানী ও রায় উভয়ের পায়ের তলা হতে মাটি সরিয়ে নিয়েছেন।

উস্‌মানীরা জাল পরিচয়পত্র নিয়ে ষষ্ঠ কংগ্রেসে যোগ দিতে গিয়েছে এবং একজন ব্রিটিশ চরের সাহায্যে গিয়েছে। তারপরে সেই চরকে তাদের একজন হিসাবে সঙ্গে নিয়েও গিয়েছে। এই সত্য প্রকাশ করা কি উস্‌মানীকে আক্রমণ করা? আশ্চর্য এই যে এটাই ডক্টর অধিকারী রায়কে জানাতে যাচ্ছিলেন।

ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারী

ফিজিকাল কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট লাভ করার জন্যে গঙ্গাধর অধিকারী ১৯২২ সালে জার্মানীতে গিয়েছিলেন। ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মার্কসবাদেরও পড়াশুনা করেছিলেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট তো তিনি পেয়েছিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যও তিনি হয়েছিলেন। পার্টি সভ্য হওয়ার অনেক পরে জার্মানীতেই মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ডক্টর অধিকারী বলেছেন রায় তাঁকে কখনও নিজের বাসস্থানে নিয়ে যাননি, তাঁদের আলোচনা রেস্তোরাঁতেই হয়েছে। এটা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না যে রায়ের আলোচনা অধিকারীর মনে দাগ কেটেছিল। দেশে ফেরার সময়ে যে তিনি এম· এন· রায়ের প্রতিনিধি হয়ে ফিরেছিলেন এ কথা তিনি গোপন করেননি। ১৯২৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি বোম্বে পৌঁছেছিলেন। কলকাতায় আমাদের কনফারেন্স শুরু হয়েছিল ২১শে ডিসেম্বর তারিখে। কাজেই, তাঁকে তাড়াতাড়ি কলকাতা আসার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ঘাটে তাঁকে বোম্বেতে দেখে এসেছিল। সে-ই আমায় প্রথম জানালো যে রায়ের তরফ হতে অধিকারী নামে একজন এসেছেন। তারপরে অধিকারী কলকাতা আসার পরে ঘাটেই প্রথম তাঁকে কলকাতার অলবার্ট হলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমায় বললেন যে "I am coming from Roy"—(আমি রায়ের নিকট হতে আসছি)। রায় সেই সময়ে ভারতবর্ষে লোক পাঠাচ্ছিলেন। এটা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির পরে বৃহত্তম পার্টি) সভ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি দেশে ফিরলেন রায়ের লোক হয়ে! রায়ের বিরুদ্ধে কি কি চার্জ আছে তা তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন, ভারতে আমরা তখনও জানতাম না। আমরা তখনও জানতাম না যে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসে কি

কি আলোচনা হয়েছিল, তিনি জার্মানীতে ছিলেন ব'লে সব কিছু জানতেন। রায়ের বিরুদ্ধে চার্জগুলির কথা তিনি তন্নতন্ন করে জানতেন, আমরা এদেশের কমিউনিস্টরা তা জানতাম না। কমরেড ক্লেমেন্স পাম দত্ত ষষ্ঠ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন, এম. এন. রায় ছিলেন না। এই জন্যে কমরেড ক্লেমেন্স পাম দত্ত ইংল্যাণ্ডে ফেরার সময়ে জার্মানীতে এম. এন. রায়ের নিকটে সব কিছু বিস্তৃত-ভাবে রিপোর্ট ক'রে গিয়েছিলেন। এই রিপোর্ট করার সময়ে ডক্টর অধিকারী আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি জেনেছিলেন ও বুঝেছিলেন যে নিজের বিচ্যুতির জন্যে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দিন ফুরিয়েছে। তবুও কেন তিনি মানবেন্দ্রনাথের তরফ হতে ভারতে এলেন? তিনি জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। সুন্দর কাবাডি বা অন্যদের মতো তিনি ছিলেন না। তাঁরা আগে কোনো কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিলেন না। তাঁদের রায় রিক্রুট করেছিলেন।

বেচারা ডক্টর অধিকারী ছ'বছর পরে দেশে ফিরে পুরো এক'শ দিনও বোধ হয় বাইরে থাকতে পারেননি। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় গিরেফ্‌তার হয়ে জেলে যান। জেলে তিনি পার্টি শৃঙ্খলা হতে কখনও বিচ্যুত হননি। মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্বন্ধে তাঁর মোহ কেটে গিয়েছিল।

গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা

আমরা গ্রেট ব্রিটেনের অধীন দেশ ছিলাম। এই জন্যে ইংরেজদের পক্ষে আমাদের দেশে যাতায়াতের সুবিধা ছিল এবং সেই জন্যে কমিউনিস্ট ইন্‌টার-ন্যাশনালেরও নির্দেশ ছিল যে যে দেশের অধীন দেশ আছে সে দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে অধীন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে।

ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। ভারতীয় ছাত্র ও ভারতীয় নাবিকদের ভিতরে তাঁরা কাজ করার চেষ্টা করেছেন। তবে নাবিকদের ভিতরে কাজ ক'রে তাঁরা সফলতা অর্জন করতে পারেননি। কলকাতার পোর্টে এমন কোনো ভারতীয় নাবিকের দর্শন আমরা পাইনি যাঁরা দেশে এসে আমাদের পার্টিতে যোগ দিয়েছেন, বা আমাদের সঙ্গে সাংগঠনিক কাজ করেছেন। একমাত্র কলকাতার নাবিক আবদুল হাকীম আমাদের জন্যে একখানি পত্র বহন করে এনেছিলেন। তাঁর সদিচ্ছা সত্ত্বেও এই পত্র নিয়ে একটা বিপর্যয় ঘটে যায়। এই বিশিষ্ট পত্রখানি তিনি নিরাপদে কলকাতা পর্যন্ত এনেছিলেন। সেবারে তিনি বেশ কিছু দিন কলকাতা ছিলেনও কিন্তু ২/১, ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে (এখন এই রাস্তাটির নাম ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির পথিকৃৎ সভ্য আবদুল হালীমের নামে আবদুল হালীম লেন হয়েছে) ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টির আফিসে এসে তিনি তা আমাকে দিতে বেমালুম ভুলে যান। (পত্রখানি আমাকেই দেওয়ার নির্দেশ ছিল।) আবার সফরে যাওয়ার সময়ে এডেন হতে বাড়ীতে চিঠি লিখতে গিয়ে রাইটিং প্যাডের ভিতরে দেখতে পেলেন যে আমাকে লেখা পত্রখানি ডেলিভারি দেওয়া হয়নি। তখন এডেনেই তিনি পত্রখানি ডাকে ফেলে দিলেন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের নামে ২/১, ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনের ঠিকানায় পাঠানো একখানি বড় খাম তো পুলিসের হাতে যাবেই। এই পত্র নিয়ে ভারতের সেন্‌ট্রাল লেজিস্‌লেটিব এসেমব্লিতে দারুণ হৈচৈ হয়েছিল। পত্রখানি মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় সরকার পক্ষের—৩৭৭ নম্বর এক্‌জিবিট।

বোম্বে ও করাচী পোর্টে ব্রিটেনের পার্টি সংস্রবে আসা কোনো ভারতীয় নাবিক পার্টিতে এসেছেন কিনা তা আমি জানিনে। বিখ্যাত আমীর হায়দার খান ও কলকাতার শামসুল হুদা নাবিক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির সংস্রবে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন।

ভারতীয় ছাত্রদের ভিতরেই ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি ভালো কাজ করেছেন। আগেকার দিনে ভারতের 'কালা আদমী'দের সহিত ইংরেজরা হয় তো পার্থক্য জায় রেখে মিশতেন। কিন্তু ব্রিটিশ কমিউনিস্টদের ভিতরে সেই রকম পার্থক্য-ছিল না, তাঁরা প্রাণ খুলে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে মিশতেন। এই কারণে ভারতীয় ছাত্ররা সহজে ব্রিটিশ কমিউনিস্টদের প্রতি আকৃষ্ট হতেন। তবে, উনিশ শ' বিশের দশকে যে-সকল ভারতীয় ছাত্র লণ্ডনে কিংবা ইংল্যাণ্ডের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তে আমাদের ব্রিটিশ পার্টির সংযোগে এসে কমিউনিস্ট

হয়েছিলেন এমন কেউ সেই দশকে দেশে ফিরে এসে কমিউনিস্ট আন্দোলনে কিংবা গণ আন্দোলনে যোগ দেননি।

বাঙলা দেশে চাটার্ড একাউনট্যান্ট মিস্টার পি· সি· নন্দী ১৯২৭-২৮ সালে দেশে ফিরে এসে কমরেড ক্লেমেন্স পাম দত্তের মৌখিক বার্তা আমায় পৌঁছিয়েছিলেন। কমরেড ক্লেমেন্স পাম দত্ত "গণবাণী"র জন্যে লণ্ডনে সংগ্রহ-করা পনের পাউণ্ড মিস্টার নন্দীর মারফতে পাঠিয়েছিলেন। সেই টাকাও তিনি আমায় দিয়েছিলেন। ট্রেড ইউনিয়নের হিসাব অডিট্ করার ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের পার্টির সঙ্গে কিঞ্চিৎ দূর-সংযোগ বজায় রাখছিলেন। খুব শীঘ্রই তিনি তা থেকেও সরে গেলেন।

মেদিনীপুরের অধিবাসী পুলিনবিহারী দিন্দা ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরেছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় গিরেফ্তারের পরে তিনি শুধু পার্টিই ছাড়লেন না, ছাড়লেন কলকাতাকেও। বাকী জীবন তিনি মেদিনীপুরে কাটিয়েছেন। এখন তিনি আর বেঁচে নেই।

১৯২০-এর দশকে অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ক্যামব্রিজে পড়ার সময়ে ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতেন। তিনি জার্মানী হতে প্রকাশিত ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির সাহিত্য ইংল্যাণ্ডে ভারতীয়দের মধ্যে বিতরণ করতেন। বার্লিনে গিয়ে তিনি এম· এন· রায়ের সঙ্গে দেখাও করেছেন। I. P. I.-এর (ইম্পিরিয়েল পুলিস ইনটেলিজেন্সের) রিপোর্টে তাঁর নামের বিশেষ উল্লেখ আছে। কিন্তু দেশে ফিরে এসে তিনি আমাদের সঙ্গে কাজ করেননি, কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। ঊনিশ শ' চল্লিশের দশকে এবং পঞ্চাশেও কিন্তু সুগভীরভাবে ও সপরিবারে তিনি আমাদের সঙ্গে কর্মলিপ্ত হয়েছিলেন।

ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির যোগাযোগের ভিতর দিয়ে যাঁরা কমিউনিস্ট হয়েছিলেন তাঁদের ভিতরে লাহোরের ব্যারিস্টার মিস্টার জীবনলাল কাপুরও একজন। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় সেশন্স কোর্টে তিনি আমাদের পক্ষ সমর্থন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তখন কলকাতা হতে কুত্বুদ্দীন আহ্মদ ও আবদুল হালীম মণিলাল ডক্টরকে নিযুক্ত করে ফেলেছিলেন। ব্রিটিশ পার্টির সংস্রবে আসা যে সকল ভারতীয় ছাত্র ঊনিশ শ' ত্রিশের দশকে দেশে ফিরেছেন তাঁদের ভিতরে অনেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন এবং এখনও কাজ করছেন। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে ডক্টর কুঅ'র মুহম্মদ আশরাফ ১৯২৩ সালের শুরুতে আমাদের সংস্রবে এসেছিলেন। তখনকার পুলিস রিপোর্টে তাঁর নামোল্লেখও পাওয়া যায়। ব্রিটেনে তিনি পার্টির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে ছিলেন। ত্রিশের দশকে দেশে ফিরে এসে তিনি পার্টির সব সময়ের কর্মী হয়েছেন। সজ্জাদ জহীর, ডক্টর জেড· এ· আহ্মদ আর হাজরা বেগমও ত্রিশের দশকে এসে পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। তামিলনাড়ুতে এস· মোহন কুমারমঙ্গলম ও পার্বতী কৃষ্ণান (এঁরা দুজন ভাই-বোন) ত্রিশের দশকেই এসেছেন এবং পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। বাংলা দেশের নিখিলনাথ চক্রবর্তী, জ্যোতি বসু, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ও রেণু রায় (চক্রবর্তী) ব্রিটিশ পার্টির সংস্রবে এসেই কমিউনিস্ট হয়েছেন। চল্লিশের দশকের শুরুতে বা কিছু আগে-পরে তাঁরা দেশে ফিরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ভূপেশচন্দ্র গুপ্তও চল্লিশের শুরুতে দেশে ফিরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর ব্যাপারটি কিছু পৃথক।

তিনি সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির সভ্য হিসাবে বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন। ত্রিশের দশকে অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনিও বন্দী-নিবাসে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পড়াশুনা আরম্ভ করে দেন। এই বন্দী অবস্থাতেই তিনি বহরমপুরে বন্দী নিবাস হতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে ডিস্‌টিংশনের সহিত পাস করেন। তাঁর বিত্তবান ও অর্থশালী পিতা তখন গবর্নমেণ্টকে লেখেন যে তিনি তাঁর পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে চান। গবর্নমেণ্ট তাতে রাজী হওয়ায় ভূপেশ গুপ্ত ইংল্যাণ্ডে পড়তে গেলেন। তাঁর মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা এদেশেই আরম্ভ হয়েছিল। সেই দেশে গিয়ে তিনি সেই শিক্ষাকে বাড়িয়েছিলেন। চল্লিশের যুগে আরও অনেকে ইংল্যাণ্ড হতে ফিরে এসে পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। সকলের নাম এখানে লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ইংল্যাণ্ডে জবরদস্ত কমিউনিস্ট হয়েছিলেন, কিন্তু দেশে ফিরে এসে তাঁরা কিছুই করেননি।

ওপরে যাঁদের নাম আমি উল্লেখ করেছি তাঁদের ভিতরে ডক্টর আশরাফ আর বেঁচে নেই, আর একমাত্র জ্যোতি বসুই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসিস্ট)-এর সভ্য। বাকী সকলেই দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিতে রয়েছেন।

অন্য ভাবেও গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্য আমরা পেয়েছি। আমাদের কাজে সাহায্য করার জন্যে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা এদেশে এসেছেন। তাঁদের অবশ্য কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালই পাঠিয়েছেন। ভারতবর্ষ গ্রেট ব্রিটেনের অধীন দেশ ছিল ব'লে ইংরেজের পক্ষে, কমপক্ষে যে-কোনো ব্রিটিশ প্রজার পক্ষে, এদেশে এসে আমাদের কাজে সাহায্য করাটা ছিল অনেক সুবিধাজনক। একজন ব্রিটেনের বাশিন্দাকে বা অন্য কোনো ব্রিটিশ প্রজাকে ভারতবর্ষ হতে বহিষ্কার করার কোনো আইন ছিল না। ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশ পার্টির সভ্য পার্সি গ্লাডিং (Percy Gladding) ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কমিউনিস্টদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করতে পারেননি। আমি নিজে তখন জেলে ছিলেম।

জর্জ এলিশন

পার্সি গ্লাডিং ফিরে যাওয়ার কমবেশী এক বৎসর পরে জর্জ এলিশন (George Allison) আসেন। ১৯২৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে তিনি বোম্বে পৌঁছেছিলেন। জাতিতে তিনি স্কচ ছিলেন এবং পেশায় ছিলেন একজন কয়লা খনির মজুর। আর, গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির তিনি ছিলেন একজন পদস্থ ও বিশিষ্ট সভ্য। এদেশে আসার সময়ে রেড-ইন্‌টারন্যাশনাল অফ লেবর ইউনিয়নস তাঁকে কি কি উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁর মুখ হতে সে কথা আমি কখনও শুনিনি। তবে তাঁর কাজ-কর্মের প্রোগ্রাম হতে আমরা যা বুঝেছিলাম তাতে খোলাখুলিভাবে তিনি ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করবেন, আর পার্টির সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখবেন গোপনে। মে মাস হতে অক্টোবর পর্যন্ত তিনি বোম্বেতে ছিলেন। সেখানে এলিশনকে কোনো বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি। ছয় মাস তাঁর নির্বিঘ্নে কেটেছিল। কেউ বোঝেননি যে তিনি একজন কমিউনিস্ট।

জর্জ এলিশন স্বনামে ভারতে আসেননি। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনি

নাম করা সভ্য ছিলেন ব'লে স্বনামে সাম্রাজ্য ভ্রমণের ভিসা পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই, ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল (Donald Campbell) এই ছদ্মনামে তাঁকে পাসপোর্ট গ্রহণ করে ভারতে আসতে হয়েছিল। ১৯২৬ সালের নবেম্বর মাসে জোগলেকরের কাছ থেকে আমার নামে পরিচয় পত্র নিয়ে ক্যাম্পবেল নামীয় এলিশন কলকাতায় এলেন। আমি তখন অসুখে শয্যাগত। জোগলেকরের পত্রে কোথাও লেখা ছিল না যে পত্রবাহক ব্রিটিশ পার্টির একজন সভ্য। হয়তো সে তা জানতও না। সে আমায় লিখেছিল যে পত্রবাহক একজন ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। কলকাতায় কিছু ট্রেড ইউনিয়ন নেতার সঙ্গে তিনি পরিচিত হতে চান। আমার ওখানে (৩৭, হ্যারিসন রোডে) এলিশন সকালবেলা এসেছিলেন। তিনিও বললেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে পরিচয় করার কথা। বললেন, রাত্রে আবার আসবেন। আমি বললাম একজন ট্রেড ইউনিয়নিস্ট নিকটেই থাকেন। রাত্রে আমি তাঁকে আমার ঘরে ডেকে আনব। আমি শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে আনিয়েছিলাম। এলিশন তাঁর সঙ্গে অনেক কথা বললেন। তার পরে দু'জন এক সঙ্গেই বিদায় নিচ্ছিলেন। আমি শিবনাথকে বললাম, "দেখুন, আমি অসুস্থ। আপনি রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এঁকে একখানা ট্যাক্সি কিংবা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়ে দেবেন।"

শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এলিশনকে চিনেছিলেন। ফুটপাথে নেমে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি আমায় চিনেননি! অমুক সালে মস্কোর লেনিনগ্রাড স্টেশনে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।" সেই মুহূর্তেই এলিশনের কথাটা মনে পড়ে গেল। কারণ, তাঁর জীবনে মাত্র একবারই একজন ভারতীয়ের সঙ্গে মস্কোর লেনিনগ্রাড স্টেশনে দেখা হয়েছিল। এলিশনের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাল যে বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মস্কোর কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন, আর মুজফ্ফর আহ্মদ যখন ডেকে এনে তাঁর সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তখন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন কমিউনিস্ট না হয়েই পারেন না; এরপরে এলিশনের সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব ভাব হয়ে গেল। বন্দ্যোপাধ্যায়কেই এলিশন তাঁর ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল নামীয় পাসপোর্টখানা সযত্নে ও সঙ্গোপনে রেখে দেওয়ার জন্যে দিলেন। সেই মুহূর্ত থেকেই সর্বনাশের শুরু হলো।

আমি এলিশনের খবরের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকি। কিন্তু কোনো খবরই তিনি পাঠাচ্ছিলেন না। আবার আমি ভাবি, কোথাকার কে যে এলেন? প্রতি বৎসর যাঁরা মজুরদের অবস্থা ও আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করতে ইউরোপ হতে বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড হতে আসেন তাঁদের একজন কেউ হবেন বোধ হয়। এর পরে আমি ওই নবেম্বর মাসেই লাহোরে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির ফরেন ব্যুরোর মেম্বর মুহম্মদ আলীর একখানি পত্র এসেছে। তাতে অন্য অনেক কথার সঙ্গে লেখা হয়েছে যে ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির একজন বিশিষ্ট সভ্য। তাঁর সম্বন্ধে যেন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কলকাতায় না কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কারণ, ক্যাম্পবেল তখন কলকাতার ট্রেড ইউনিয়নের দু'দলের ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েছেন। আরও পরিষ্কার ভাষায় বললে তিনি কিশোরীলাল ঘোষের বাক্‌পটুতায় আকৃষ্ট হয়ে মৃণালকান্তি বসুর দলের দিকে ঝুঁকেছিলেন। আমি কলকাতায় আবদুল হালীমকে পত্র লিখে সব কথা জানালাম। সে সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাম্পবেলের সঙ্গে দেখা করল, কিন্তু তিনি (ক্যাম্পবেল) আবদুল হালীমকে

কোনো আমল দিলেন না। ৩৭, হ্যারিসন রোডে তিনি হালীমকে দেখেছিলেন। সে দিনও যদি তিনি হালীমকে সব বলতেন তবে সর্বনাশের হাত হতে রক্ষা পাওয়া যেত।

১৯২৭ সালের জানুয়ারীতে আমি লাহোর হতে বোম্বে পৌঁছে দেখলাম ডোনাল্ড ক্যাম্পবেলও কলকাতা হতে বোম্বে পৌঁছেছেন। শাপুরজী সাকলাত-ওয়ালার বোম্বে আগমন উপলক্ষেই আমাদের বোম্বেতে এই সমাবেশ। জানকীপ্রসাদ আমার সঙ্গেই এসেছিল। লাহোরের শামসুদ্দীন হাস্‌সানও এসে পৌঁছেছিল এবং এসেছিল মাদ্রাজ হতে সি. কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারও। ভারতে পৌঁছানোর পরে ডোনাল্ড ক্যাম্পবেলের বোম্বে অবস্থানের প্রথম ছয় মাস তাঁর সম্বন্ধে কেউ কিছু বোঝেনি। কলকাতা হতে ডাকযোগে জোগলেকরকে তিনি যে-পত্র লিখেছিলেন সে পত্র বোম্বেতে পুলিসের হাতে পড়ে যায়। তা থেকেই পুলিস ক্যাম্পবেল সম্বন্ধে তদন্ত শুরু করে। আমরা যখন বোম্বেতে পৌঁছালাম তখন ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল সম্বন্ধে সব ব্যাপার হাট করে দেওয়া হয়েছে। পুলিস ইনফরমার পরিবৃত হয়েই আমরা বোম্বেতে ছিলাম। তবে আমরা কেউ তখনও জানতাম না যে ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল হচ্ছেন আসলে জর্জ এলিশন।

বোম্বেতে আমরা কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেম। (১) ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টি শুধু বাঙলাতে সীমাবদ্ধ থাকবে না, অন্যান্য প্রদেশেও তাকে প্রসারিত করতে হবে। বোম্বেতে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টি স্থাপন করার ব্যবস্থা তখন হয়ে গেছে। (২) বোম্বে হতে একখানি মারাঠী সাপ্তাহিক বা'র করতে হবে, নাম হবে "ক্রান্তি"। বাঙলার সাপ্তাহিক "গণবাণী" তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সিদ্ধান্ত হলো যে "গণবাণী"কে আবার চালু করতে হবে। (৩) আরও সিদ্ধান্ত হলো যে ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল কলকাতায় থাকবেন, আর নবাগত ফিলিপ স্প্রাট থাকবেন বোম্বেতে।

ক্যাম্পবেল আর আমার মধ্যে ব্যবস্থা হলো যে তিনি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ক্যালকাটা মেইলে ফিরবেন। আর, আমি ফিরব ভিন্ন পথে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ক্যালকাটা মেইলে। আমার পথ কিছু বেশী, কাজেই আমার সময় বেশী লেগেছিল। বোম্বে হতে আমার ট্রেনটি ছেড়েওছিল দেরীতে।

কলকাতা ৩৭, নম্বর হ্যারিসন রোডে পৌঁছেই খবব পেলাম ওখানে পুলিসের তল্লাশি হয়ে গেছে। আমার ডোনাল্ড ক্যাম্পবেলের জন্যে ভয় হয়ে গেল। তিনি কয়েক ঘণ্টা আগে পৌঁছেছিলেন। সদর স্ট্রীটের একটি বোর্ডিং হাউসে তিনি থাকতেন। তখন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৭, হ্যারিসন রোডে এসে পৌঁছেছিলেন। তাঁকেই ক্যাম্পবেলের খবর আনার জন্যে পাঠালাম। তিনি ফিরে এসে জানালেন যে ক্যাম্পবেল গিরেফ্‌তার হয়ে গেছেন। কারণ ছিল শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাখতে দেওয়া সেই পাসপোর্ট। তিনি ভাটপাড়ার কালিদাস ভট্টাচার্যকে পাস-পোর্টখানি রাখতে দিয়েছিলেন। ব্যানার্জি আর ভট্টাচার্য বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশনের যথাক্রমে সেক্রেটারি ও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। পুলিস নিশ্চিত খবর পেয়েছিল। কালিদাস ভট্টাচার্যের ঘরে ঢুকে একটি কুলুঙ্গিতে হাত দিতেই পাসপোর্টখানি পেয়ে গেল এবং তাই নিয়ে চলে গেল। ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল সবে রেলওয়ে স্টেশন থেকে তাঁর সদর স্ট্রীটের বোর্ডিং হাউসে ফিরেছিলেন। পুলিসের দলবল সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল "মিস্টার ক্যাম্পবেল, আমরা আপনার পাসপোর্টখানি পেয়ে গেছি। আপনি আমাদের সঙ্গে লালবাজারে (পুলিস হেড্ কোয়ার্টার্সে) চলুন।" লালবাজার হতে ক্যাম্পবেলকে কলকাতার চীফ্

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজির করানো হলো। কিন্তু ক্যাম্পবেলের মোকদ্দমা হবে বোম্বেতে, সেখানেই তিনি জাহাজ হতে নেমেছিলেন। বোম্বে হতে ওয়ারেণ্ট এসে না পেঁছানোর কারণে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে জামিনে ছেড়ে দেওয়ার অর্ডার দিলেন। কিন্তু ক্যাম্পবেল আমাদের বলে রেখেছিলেন যে যদি তিনি কখনও ধরা পড়েন তবে আমরা যেন এগিয়ে গিয়ে তাঁর জামিন ইত্যাদি না করাই। যে-সব ট্রেড ইউনিয়নিস্টদের সঙ্গে তিনি মেলা-মেশা করেন তাঁদের দিয়েই যেন এ কাজটা করানো হয়। এটা পুলিসকে ধোঁকা দেওয়ার ব্যাপার ছিল। ওই মাসে তাঁর বোম্বে যাওয়ার পরে তাঁর সম্বন্ধে পুলিস সব কিছু জেনে গিয়েছিলেন। কাজেই, ধোঁকা দেওয়ার প্রশ্ন ছিল না। তবুও আমরা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরলাম। কেউ ডোনাল্ড ক্যাম্পবেলের জামিন দাঁড়াতে রাজী হলেন না। বাধ্য হয়ে আমরাই এগিয়ে গিয়ে তাঁকে জামিনে বা'র করলাম। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জামিন দাঁড়িয়েছিলেন।

ডোনাল্ড ক্যাম্পবেলের গিরেফ্‌তারকে কেন্দ্র করে বাঙলায় একটা বেশ 'ডামাডোল' হয়ে গেল। কেউ কেউ বললেন শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যাম্পবেলকে ধরিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে যে পাসপোর্ট সঙ্গোপনে রাখতে দেওয়া হয়েছিল সেই পাসপোর্ট পাওয়া গেল কিনা ভাটপাড়ার কালিদাস ভট্টাচার্যের বাড়ীর কুলুঙ্গিতে! শিবনাথ বললেন "আমি তো বিশ্বস্ত লোককেই পাসপোর্টখানি রাখতে দিয়েছিলেম। তাঁকে সব রকমে সাবধানও করে দিয়েছিলেম। কালিদাস ভট্টাচার্য সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির সভ্য ছিলেন, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি বিনা-বিচারে বন্দীও ছিলেন. এখনও তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন সভ্য। বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের (The Peasants' and Workers' Party of Bengal) সঙ্গেও তিনি ঘোরাফেরা করেন। আমি কোথায় অন্যায় করলাম?" কালিদাস ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, তিনি তাঁর বোনের বাড়ীতে পাসপোর্টখানি রেখেছিলেন। বোন আগের দিন আসামের গৌরীপুরে যাওয়ার সময়ে পাসপোর্টখানি তাঁকে ফেরৎ দিয়ে যান। নতুন ব্যবস্থা করার আগেই তা পুলিসের হাতে পড়ে যায়। পুলিস নিশ্চিত খবর পেয়ে এসেছিল। তারা কালিদাস ভট্টাচার্যের বাড়ীতে ঢুকেই কুলুঙ্গির ভিতরে হাত দিয়ে পাসপোর্ট-খানি তুলে নিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে বা'র হয়ে চলে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার! কালিদাস ভট্টাচার্য পাসপোর্টের গুরুত্ব বুঝতেন। তবুও কেন তিনি তা রাখার নূতন ব্যবস্থা করলেন না? ভাটপাড়ায় ব্রাহ্মণদের এত সব বিরাট বিরাট বাড়ী আছে যে কয়েক গজ হেঁটেই তিনি তার একটি বাড়ীতে এই দলীলখানি রেখে আসতে পারতেন। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে পুলিস সে-সব বাড়ীতে ঢুকত কিনা তাতে গভীর সন্দেহ আছে। কে যে এ ব্যাপারের জন্যে দায়ী তা কখনও পরিষ্কার হয়নি। তবে, পুলিস নিশ্চিত খবর পেয়ে এসেছিল, আর কালিদাস ভট্টাচার্য বড়ই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ডোনাল্ড ক্যাম্পবেলকে বোম্বে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই তাঁর বিরুদ্ধে জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করার জন্যে মোকদ্দমা হয়। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে লণ্ডন হতে সিবিল সার্বিস অফিসার ও আরও কে কে এসেছিলেন। কোর্টে প্রমাণ হয়ে গেল যে ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল নামীয় পাসপোর্ট জাল, আর ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল আসলে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট সভ্য জর্জ এলিশন। বিচারে তাঁর আঠারো মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল। এই আঠারো মাস সাজা খাটার পরে ইচ্ছা করলেই ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে তিনি ভারতে থেকে যেতে পারতেন।

ব্রিটিশ প্রজাকে ভারতবর্ষ হতে বহিষ্কার করার কোনো আইন ছিল না। কিন্তু ব্রিটেনের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সঙ্গে চক্রান্ত করে ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সাজা শেষ হওয়ার আগেই বোম্বে পোর্টে জর্জ এলিশনকে ইংল্যাণ্ডগামী একখানি জাহাজে তুলে দিল। ,

একটি খনি দুর্ঘটনার ফলে এলিশন খনিতে কাজ করার অনুপযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ভিতরে একটা সহজাত নেতৃত্ব ছিল। ব্রিটিশ পার্টির পলিট ব্যুরোর তিনি একজন সদস্য ছিলেন। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি লণ্ডনে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ফিলিপ স্প্রাট

জর্জ এলিশনের পরে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি হতে এসেছিলেন ফিলিপ স্প্রাট। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে সাকলাতওয়ালার বোম্বে আসাকে উপলক্ষ করে জর্জ এলিশনও কলকাতা থেকে বোম্বে এসেছিলেন। সেই সময়ে কয়েক দিন তাঁর সঙ্গে ফিলিপ স্প্রাটের দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ আলোচনা হয়েছিল।

স্প্রাট তখন ছিলেন একজন যুবক, ২৭ বছর মাত্র বয়স। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফিজিক্সে অনার্স (ট্রাইপোস) নিয়ে বি· এ· পাস করেছিলেন এবং গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছিলেন। তাঁকে শিখিয়ে-পড়িয়ে সি· পি· দত্ত (Clemens Palme Dutt) ভারতে পাঠালেন। তিনি ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বে পৌঁছেছিলেন। কেউ কেউ লিখেছেন যে ১৯২৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি বোম্বে পৌঁছেছিলেন। ১৩ই জানুয়ারী (১৯২৭) সন্ধ্যা বেলা আমার সঙ্গে ফিলিপ স্প্রাটের প্রথম দেখা হয়েছিল বোম্বের ওয়াই· এম· সি· এ·-তে। সি· কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার আমাকে দেখা করতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, জর্জ এলিশন জাল পাসপোর্ট নিয়ে আসার মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিছু দিন যেতে না যেতে ফিলিপ স্প্রাটও জড়িয়ে পড়লেন একটি রাজদ্রোহের (১২৪-এ, আই· পি· সি·) মোকদ্দমায়। তাঁর সঙ্গে এস. এস· মিরাজকর ও আরও একজন আসামী হয়েছিলেন। স্প্রাট "ইণ্ডিয়া এণ্ড চায়না" ("ভারত ও চীন") নাম দিয়ে একখানি পুস্তিকা লিখেছিলেন। মিরাজকর এর প্রকাশক ও অন্য একজন মুদ্রক ছিলেন। এই তিন জনের নামেই বোম্বের চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা দায়ের হলো। তাঁদের অবশ্য জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

মিসেস সরোজিনী নাইডুকে আমাদের বোম্বের কমরেডরা মা ডাকতেন। সকলে মিলে তাঁকে ধরলেন যে তিনি যেন এই মোকদ্দমার তদবীর করার জন্যে মিস্টার এম· এ· জিন্নাকে রাজী করান। মিসেস নাইডু নিজে মিস্টার জিন্নার বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু মিস্টার জিন্না ব্রীফ্ নিতে রাজী হলেন না। তবে, একটি মূল্যবান উপদেশ তিনি মিসেস নাইডুকে দিলেন। বললেন, দরখাস্ত করে কেসটি হাইকোর্টের সেশন্সে ট্রান্সফার করিয়ে নেওয়া হোক। সেখানে ফিলিপ স্প্রাট ইউরোপীয়ান জুররের দ্বারা বিচারের দাবী ছেড়ে দিবেন। তাতে বেশীর ভাগ ইণ্ডিয়ান জুররের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হবে। ভারতবর্ষে একজন ইংরেজের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা হচ্ছে বলে স্বভাবতই ভারতীয় জুররেরা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়েই পারেন না। বোম্বের

কমরেডরা মিস্টার জিন্নার উপদেশ অনুসারে কাজ করেছিলেন। মোকদ্দমা হাই-কোর্টের সেশনে সোপর্দ করা হলো। একজন ইউরোপীয় জুরর ও আটজন ভারতীয় জুররকে নিয়ে হাইকোর্টের সেশনে জুরী গঠিত হয়েছিল। বিচারের পরে আটজন ভারতীয় জুরর মত দিলেন যে আসামীরা নির্দোষ। একজন ইউরোপীয় জুররই শুধু আসামীদের দোষী সাব্যস্ত করলেন। বহুজনের সাথে একমত হয়ে বিচারপতি আসামীদের মুক্তি দিলেন। ইন্ডিয়া-চায়না মোকদ্দমার পরিসমাপ্তি এই ভাবেই ঘটেছিল।

১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস ব্রাডলি (বেন ব্রাডলি) এ দেশে এলেন। তাঁর বোম্বেতে থাকা স্থির হওয়ায় ফিলিপ স্প্রাটের কলকাতায় আসা স্থির হয়। কিন্তু তিনি সংগে সংগেই স্থায়ীভাবে কলকাতায় আসেননি। একদল আমেরিকান টুরিস্টের সংগে নিজেকে জার্মান-আমেরিকান পরিচয় দিয়ে একজন সোবিয়েত দেশীয় কমরেড এসেছিলেন। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসে এই কমরেডের নাম মাজুত ছিল। এটাই তার আসল নাম। তাঁর পাসপোর্টে কি নাম ছিল তা জানিনে। তিনি সেই সময়ে ইয়ং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের একজন নেতা ছিলেন। যতদিন টুরিস্টরা কলকাতায় ছিলেন ততদিন ফিলিপ স্প্রাটকেও এই কমরেডের সংগে কলকাতার কন্টিনেন্টাল হোটেলে থাকতে হয়েছিল। সময়টা ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাস ছিল। আমাকেও একদিন রাত্রে কন্টিনেন্টাল হোটেলে গিয়ে কমরেড মাজুতের সংগে দেখা করতে হয়েছিল। সোবিয়েত ইউনিয়নের ভিতরে নানা দেশ আছে। কিন্তু কমরেড মাজুত কোন দেশের লোক তা ফিলিপ স্প্রাট স্থির করতে পারেননি। তাঁর মতে মাজুত নিশ্চয় রুশ ছিলেন না। টার্ক হতে পারেন, ককেশিয়ানও হতে পারেন। স্প্রাটের ধারণা ভুল ছিল। মাজুত ছিলেন আমেরিকা হতে ফিরে আসা রুশ ইহুদী। যাই হোক, সে যাত্রা স্প্রাট আমাদের সংগে ২/১, ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে কয়েক দিন মাত্র ছিলেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মাদ্রাজ সেশনে (ডিসেম্বর, ১৯২৭) যোগ দেওয়ার জন্যে আমরা একসংগে মাদ্রাজে যাই। সেবারেই প্রথম ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্ট্স পার্টির তরফ হতে ন্যাশনাল কংগ্রেসের নামে ইশ্তিহার (ম্যানিফেস্টো) বিতরিত হয়েছিল। তার আগের বছর কংগ্রেসের গোহাটি সেশন্সের নামে সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট পার্টি অফ্ ইন্ডিয়া স্বনামে ইশ্তিহার বিতরণ করেছিল। এই ইশ্তিহারটি ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি তৈয়ার করে লন্ডনে ছেপেছিল। আমরা কলকাতায় ছাপানো প্যাকেট ডাকে পেয়েছিলেম। কমরেড আবদুল হালীম গোহাটিতে ইশ্তিহারগুলি বিতরণের ব্যবস্থা করেছিল।১

মাদ্রাজ হতে ফিলিপ স্প্রাট বোম্বে চলে গিয়েছিলেন। পুরো জানুয়ারী মাস তিনি বোম্বেতে বসে বসে "A Call to Action"-এ (এ কল টু একশন) মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি রচনা করেছিলেন।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শুরুর দিকে বোম্বেতে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির কমিটির একটি মিটিং হয়। এই মিটিংয়েই A Call to Action-এ মুদ্রিত প্রস্তাবগুলি আলোচিত ও গৃহীত হয়। আমিও এই সভায় যোগ দিয়ে-

১ মূল ইংরেজী ইশ্তিহারটি এই পুস্তকের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। ইশ্তিহারের বাঙলা অনুবাদ পরবর্তী অধ্যায়ে মুদ্রিত হলো।

ছিলেম। এই সময় ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে, সাইমন কমিশন বোম্বেতে জাহাজ হতে অবতরণ করেন। বোম্বেতে হরতাল পালিত হয়। বহু কারখানার মজুরেরা ধর্মঘট করেন। আমরা মাতুঙ্গা হতে মজুরদের মিছিল নিয়ে ফোরাস রোড পর্যন্ত হেঁটে এসেছিলেম। এই উপলক্ষেই ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টি কাস্তে-হাতুড়ি খচিত লাল পতাকা ও ফেস্টুন নিয়ে রাস্তায় বার হয়েছিল। তাতে বোধ হয় সর্বপ্রথম মাইক ব্যবহার করা হয়।

কমরেড মাজুতের টুরিস্টরা কোথায় গিয়েছিলেন তা জানিনে। এই ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯২৮) তাঁরা বোম্বেতে এসেছিলেন। বোম্বের একটা হোটেলে তাঁর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় বার দেখা হয়। এবারে তাঁর সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা হয়েছিল। তিনি এম. এন. রায় সম্বন্ধেও আমায় প্রশ্ন করেছিলেন। আসল কথা হচ্ছে এই যে এম. এন. রায়ের কাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্যেই কমিউনিস্ট ইন্টার-ন্যাশনাল মাজুতকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন।

১৯২৮ সালের মার্চ মাসে ফিলিপ স্প্রাট পাকাপাকিভাবে কলকাতায় এসে আমাদের সঙ্গেই ২/১, ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে (বর্তমান নাম আবদুল হালিম লেন) থাকতে লাগলেন। এবারে তিনি তাঁর জীবনধারণের প্রণালী আমাদের মতো করে নিলেন, খাওয়া-দাওয়া সব আমাদের মতো, শুধু পোশাকটা আধা ইউরোপীয়ান মতো থেকে গেল। আমরা প্রবল আপত্তি করলাম, কিন্তু স্প্রাট কিছুতেই কোন কথা শুনলেন না। তিনি ট্রেড ইউনিয়নে কাজ আরম্ভ করলেন। আমাদের কলকাতা ইলাকায় ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করা বোম্বের মতো সহজ ছিল না। তখনকার দিনে বোম্বের কলকারখানাগুলি বোম্বে শহরের ভিতরে অবস্থিত ছিল। চার পয়সার ট্রামের টিকেট কিনে সর্বত্র যাওয়া চলত। কিন্তু কলকাতার শিল্প ইলাকা ছিল হুগলী নদীর দু'ধারে বিস্তৃত, লম্বায় ৬০/৭০ মাইল হবে, বেশীও হতে পারে। একজন দরিদ্র ভারতীয় যে-খাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকতে পারেন, একজন দরিদ্র ইউরোপীয় সে-খাওয়া খেয়ে বাঁচতে পারেন না। দরিদ্র ইউরোপীয়ের খাওয়া-পরার মান দরিদ্র ভারতীয়ের মানের চেয়ে অনেক উন্নত। কিন্তু ফিলিপ স্প্রাট নিজেকে আমাদের মানে অবনমিত করেছিলেন।

১৯২৮ সালের বাঙলার মজুর আন্দোলনের কঠোর শ্রম তিনি সহ্য করেছেন। কখনও তিনি পার্টির শৃঙ্খলা হতে এতটুকুও বিচ্যুত হননি। তিনি বিচ্যুত হয়েছিলেন শুধু তাঁর ইউরোপীয় মান হতে। এই জন্যেই সম্ভবত তিনি আর ইউরোপে ফিরে যেতে পারলেন না।

ফিলিপ স্প্রাট ও আমরা অন্যান্য মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আসামীরা একত্রে গিরেফ্তার হয়ে মীরাট জেলে গিয়েছি। জেলে কোনো দিন কোনো অশোভন কাজ ফিলিপ স্প্রাট করেননি। তাঁর বিপ্লবী-মর্যাদা কখনও ক্ষুণ্ণ হতে দেননি।

এই পুস্তক আমার পার্টি জীবনের স্মৃতিকথা। এখানে আমি ঘটনার সন্নিবেশ করে যাচ্ছি। যে ঘটনা যেমন ঘটেছে তেমনি আমায় লিখে যেতে হচ্ছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিলিপ স্প্রাটের অবদান যে অত্যন্ত বেশী এটা আমায় স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু বড় দুঃখ যে এই ফিলিপ স্প্রাট আজ দলত্যাগী। পার্টি ছেড়ে দিয়ে তিনি যে পার্টির একজন দরদী হয়েছেন তা নয়, তিনি সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টির এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একজন দুশমনে পরিণত হয়েছেন। পৃথিবীতে এই রকম ঘটনা অনেক ঘটেছে; তবুও এক সময়

আমার মনে হয় যে ফিলিপ স্প্রাটের ব্যাপারে এ রকমটা না ঘটলেই বুঝি ভালো হতো। দলত্যাগী হয়ে স্প্রাট যে একটা মোটা বেতনের চাকরী পেয়েছেন তাও নয়। একটি ভারতীয়কে বিয়ে করে তিনি কষ্টের জীবনযাপন করছেন। তাঁর কাছে আজ বড় কাজ হচ্ছে সর্বতোভাবে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করা।

বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস ব্রাডলি

এটা তাঁর পুরো নাম। সংক্ষেপে তাঁর ভালোবাসার নাম বেন ব্রাডলি। মজুর শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। ১৪ বছর বয়সে কারখানার কাজে যোগ দেন। তার অল্প পরেই ইঞ্জিনীয়ারিং কাজের শিক্ষা আরম্ভ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শুরু হলো তখন তাঁর বয়স ষোল বছর। ১৯১৬ সালে তিনি ন্যাভিতে যোগ দেন এবং আড়াই বছর পরে এই কাজ হতে ছাড়া পান। ভারত গবর্নমেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে ১৯২১-২২ সালে তিনি একবার নয় মাসের জন্যে ভারতে এসেছিলেন। রাবলপিণ্ডিতে একটি অস্ত্র মেরামতের কারখানায় তাঁকে কাজ করতে হতো। তার পর হতে পেশায় তিনি জার্নিম্যান ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তাঁর ইউনিয়নের নাম ছিল ইঞ্জিনীয়ারদের যুক্ত ইউনিয়ন (Amalgamated Union of Engineers।)

১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যখন আমাদের সঙ্গে কাজ করার জন্যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন ভারতবর্ষ তাঁর নিকটে একেবারে অপরিচিত স্থান ছিল না। ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে ভারতে তীব্র মজুর সংগ্রাম চলেছিল। এই সংগ্রামের মধ্যেই বেন ব্রাডলি এদেশে এসে পড়েছিলেন। সুতাকল ও রেলওয়ে মজুরদের সংগ্রামে তিনি একান্তভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বোম্বেকে কেন্দ্র করেই তিনি কাজ করেছেন। খাওয়া-পরার স্ট্যাণ্ডার্ড, বিশেষ করে, খাওয়ার স্ট্যাণ্ডার্ড, ফিলিপ স্প্রাটের মতো তিনি কমিয়ে দেননি। সেই জন্যে তাঁর স্বাস্থ্য খারাব হয়নি। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হয়ে কোনো দিন এতটুকুও দুর্বলতার পরিচয় তিনি দেননি। মোকদ্দমায় তাঁর দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। হাইকোর্টের আপীলে সে-সাজা কমে এক বছরের হয়েছিল।

১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ তারিখে অন্য সকলের মতো তাঁকেও পুলিস গিরেফ্‌তার করতে গিয়েছিলেন। রেলওয়ে ইউনিয়নের কাজে বোম্বের বাইরে ছিলেন বলে সে দিন ধরা পড়েননি। তার দুই বা তিন দিন পরে ধরা পড়েছিলেন। আর, মুক্তি পেয়েছিলেন ১৯৩৩ সালের নবেম্বর মাসে। ইউরোপে ফিরে গিয়ে তিনি কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের নিকটে আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে বিস্তৃত রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন। কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের সপ্তম কংগ্রেসে বেন ব্রাডলিই তাম্বে নামে ভারতের পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

বেন ব্রাডলি লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন, ভারতবর্ষে তিনি আন্দোলন করেছিলেন এবং আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি কারাবরণ করেছিলেন, এ কথার উল্লেখ করতে তিনি গৌরব বোধ করতেন। যেমন করেই হোক আরও একবার ভারতবর্ষে আসার স্বপ্ন তিনি দেখতেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর সে স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পারেনি।

তিনি আমাদের সঙ্গে সর্বদা চিঠি লেখালেখি করতেন। তিনি ব্লাড্ প্রেসারে ভুগছিলেন। এই ব্লাড্ প্রেসারের জন্যেই তাঁকে হস্‌পিটালে পাঠানো হয়েছিল। হস্‌পিটালে যাওয়ার সময় তিনি আমায় পত্র লিখেছিলেন যে রক্তের চাপ বেড়ে যাওয়ায় তিনি হস্‌পিটালে যাচ্ছেন। আমার কি হয়েছিল যে সঙ্গে সঙ্গেই সে পত্রের উত্তর আমি দিলাম না। সঙ্গে সঙ্গে পত্রোত্তর দিলে ব্রাডলি তা পেতেন। তারপরে খবর পেলাম যে বেন ব্রাডলি আর নেই। কেন তার পত্রোত্তর সঙ্গে সঙ্গে দিলাম না এ জন্যে আজ আমার অনুতাপের সীমা নেই। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে আমাদের এই পরম বন্ধু ও সহযোদ্ধা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতি একখানি ইশ্‌তিহার

গৌহাটি অধিবেশন, ১৯২৬

[ইন্‌ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের নামে 'ভারতের (প্রবাসী) কমিউনিস্ট পার্টি' তিন বার ইশ্‌তিহার পাঠিয়েছিলেন। প্রথম পাঠানো হয়েছিল কংগ্রেসের আহ্‌মদাবাদ অধিবেশনের নামে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে। তাতে নাম স্বাক্ষরিত হয়েছিল মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জির। এ সম্বন্ধে আমি আগে বিস্তৃত লিখেছি। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে পাঠানো দ্বিতীয় ইশ্‌তিহারখানি ছিল আসলে একটি প্রোগ্রাম। এতেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নাম স্বাক্ষরিত ছিল না। রয়টার এ প্রোগ্রামকে 'রায়ের প্রোগ্রাম' নামে প্রচার করেছিল। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এসেছিল ভারতের (প্রবাসী) কমিউনিস্ট পার্টির শেষ ইশ্‌তিহার। এটা ইস্যু হয়েছিল কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশনের নামে। এটাই ছিল আবার কংগ্রেসের নামে ইস্যু করা প্রথম ইশ্‌তিহার যাতে খোলাখুলিভাবে "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি"র (THE COMMUNIST PARTY OF INDIA) নাম স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

এই ইশ্‌তিহারখানি ১লা ডিসেম্বর, ১৯২৬ তারিখে লন্‌ডনে মুদ্রিত হয়ে পোস্টাল পার্সেলে কলকাতা এসেছিল। লন্‌ডনে পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত ও বিক্রীতও হয়েছিল। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ সরকারের তরফ হতে তা আদালতেও দাখিল করা হয়েছিল (এক্‌জিবিট নম্বর পি ৮৫)। এখন এই মামলার পেপার বুকে ছাড়া আর কোথাও তা পাওয়া যায় না, আর পেপার বুকে ছাপার ভুল বড় বেশী। তাই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত মূলের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার জন্যে এই ইশ্‌তিহার মীরাট মোকদ্দমার পেপার বুক হতে টাইপ করিয়ে লন্‌ডনে ডক্টর বিপ্লব দাশগুপ্তকে পাঠানো হয়েছিল। লন্‌ডনে পুস্তিকারূপে মুদ্রিত ও বিক্রীত হওয়ার জন্যে তা ওদেশের কপিরাইট আইনের আওতায় পড়েছে। তার জন্যে ডক্টর দাশগুপ্ত পুস্তিকাটির ফটো কপি সংগ্রহ করতে পারেননি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত মূলের সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করে ফেরৎ পাঠানো টাইপ কপিটি আমাদের হাতে যখন পৌঁছাল ততদিনে এ পুস্তকের মূল বাঙলা সংস্করণ ছাপা হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, টাইপ কপিটি আমরা ডক্টর দাশগুপ্তকে বিলম্বে পাঠিয়েছিলেম। তাই, শুধু তা পুস্তকে ইংরেজি অনুবাদে সংযোজিত হতে পেরেছিল। এবারে বাঙলা পুস্তকের দ্বিতীয় মুদ্রণের সহিত বর্ণিত ইশ্‌তিহারের বাঙলা অনুবাদ ও মূল ইংরেজি যোগ করা হলো] —মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন আরম্ভের অব্যবহিত পূর্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্পষ্টতই একটি হতাশাব্যঞ্জক চিত্র খাড়া করে। ১৯২০-২১ সালের সেই অবস্থার সঙ্গে এর তফাৎ কতো যখন জাতীয় কংগ্রেসের চারপাশে জনগণ উৎসাহ সহকারে মিলিত হয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্বের জন্য আগ্রহভরে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আজও জাতীয় কংগ্রেস টিকে আছে, কিন্তু শুধুমাত্র নামেই, নিজের ভূলুণ্ঠিত কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার কয়েকটি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক গ্রুপ ছাড়া জাতীয় কংগ্রেস আর কিছুই নয়। জাতীয়তাবাদ—প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সাম্প্রদায়িকতার উত্তাল সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছে। তুচ্ছ অনুষ্ঠানগত বিষয় নিয়ে কলহ করা হলো দেশের রাজনৈতিক জীবনের সর্ববিদিত বৈশিষ্ট্য। আধ ডজনেরও বেশী রাজনৈতিক গ্রুপ পরস্পর বিরোধী কুৎসা করে চলেছে। প্রত্যেকেই জাতিকে প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করে। কিন্তু তাদের কেউই জাতির সামনে মূল সমস্যাটি তুলে ধরে না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা।

এমন কি যারা এ সব মেকী সংসদীয় ব্যবস্থার ক্লীবতাকে স্বীকারও করে তারা, তা সত্ত্বেও এর ভিতরে প্রবেশের আপ্রাণ চেষ্টা করে। তারা ভুলে গেছে যে, স্বাধীনতার পথ এই সব ক্লীব ও প্রতিনিধিত্ববিহীন আইনসভার কানা গলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা ভুলে গেছে যে, জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে আইনসভা অপরাপর অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকরী অস্ত্রগুলিকে বড়জোর সহায়িকাশক্তি হিসাবে সেবা করতে পারে।

আইনসভা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না

বর্তমান আইনসভা, যাকে দখল করা জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলির কর্মসূচীর মূল ও শেষ কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হলো হীনবল। আইনসভা এই কারণে হীনবল যে, তা জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে না। প্রতিনিধিত্ববিহীন অবস্থায় আইনসভা এমন কোনো মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে না যার মধ্য দিয়ে ব্যাপক শক্তির যথেষ্ট অভিব্যক্তি ঘটতে পারে। গত দু'বছরের অভিজ্ঞতায় এই ধারণা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হওয়া উচিত। তারা এই ভান করে যে, স্বরাজ পার্টি এই কাউন্সিলে অংশ গ্রহণ করেছে সেগুলিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু যাই হোক, প্রকৃত ঘটনা হলো মেকী-সংসদীয়তন্ত্রের বিশ্বাসঘাতী ভিত্তির উপর স্বরাজপার্টির ভরাডুবি।

যদিও পরিস্থিতি ছিল দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার, তবুও ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনসভার প্রতিনিধিত্ববিহীন চরিত্র প্রমাণ করার জন্য কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজনে লাগতে পারে। সমগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শোচনীয় সংসদীয় অধঃপতনের কারণেই এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের (বার্মা ছাড়া) মোট জনসংখ্যা প্রায় ২২১,৫০০,০০০। এর মধ্যে সাউথবরো (ভোটাধিকার) কমিটির রায় অনুসারে ৫,০০০,০০০-এর কিছু কম হলো যোগ্য ভোটার। তাহলে বলা যায়, সংস্কার আইনের দ্বারা সমগ্র প্রজাপুঞ্জের প্রায় শতকরা ২·২ ভাগ ভোটাধিকারসম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং কাউন্সিল খুব বেশী হলে এই সামান্য সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে।

শতকরা ৯৭·৮ ভাগ জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভোটাধিকারসম্পন্ন না হওয়ায় এই আইনসভাগুলির মধ্যে দিয়ে তারা তাদের বক্তব্য শুনতে বা শুনাতে পারে না।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কর্মসূচী ও কর্মনীতি যখন এই সব আইন-সভাগুলির মধ্যে অংশগ্রহণ ও তার মধ্য দিয়েই কাজ করার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে সংযুক্ত তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনটি কি খুব সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? যে জাতীয়তাবাদী দলগুলি কাউন্সিলে যথেষ্টসংখ্যক আসন দখলের মধ্য দিয়ে তাদের একমাত্র অস্তিত্ব বেঁধে রাখতে চায়, সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে নাড়া দেওয়া কি সেই দলগুলির কাছে প্রত্যাশা করা যায়। তবুও এইসব প্রতিনিধিত্বহীন আইনসভাগুলি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলতঃ, বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্যাপক জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার এর না আছে শক্তি আর না আছে ইচ্ছা। এর সাধারণ আকাঙ্ক্ষা হলো জনসাধারণের কাছে কোনো মতে মুখরক্ষা করে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমঝোতা করা। পরস্পর পালটা অভিযোগ ও দেশপ্রেমের সরব প্রকাশ পরিস্থিতির অপরিহার্যতাকে পরিবর্তন করতে পারে না।

জাতীয়তাবাদী দলগুলির মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই

কাউন্সিলের জাতীয়তাবাদী সমালোচনা তাদের অ-প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রকে কদাচিৎ সংশ্লিষ্ট করে। না জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস, না কোন বিশেষ দল—কেউই ভিতরে কিংবা বাইরে কখনও ভোটাধিকার বৃদ্ধির জন্য একটি প্রচার অভিযান সংগঠিত করেনি। শুরুতে জাতীয় কংগ্রেস সংশোধিত কাউন্সিলকে বয়কট করে তাদের অ-প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে নয়, বরং তাদের উপর সীমাবদ্ধ ক্ষমতা অর্পণ করার কারণে। সাধারণ জাতীয়তাবাদী স্লোগান হলো যে, জনসংখ্যার শতকরা ২·২ ভাগকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন আইনসভার নিকট সরকারকে দায়ী থাকতে হবে। এটি নিজেদের সরকার বলে বিবেচিত হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক জাতির রাজনৈতিক শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণকে সহজ দৃষ্টিতে চলনসই ও গ্রহণযোগ্য বলে এই শর্তে বিবেচিত হবে যে সেগুলি দেশীয় অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু ভোটাধিকারভোগী লোকের প্রতিনিধিত্বকারী আইনসভার অনুমোদনসহ চালিয়ে যাওয়া হবে।

১৯২৫ সালের বছরটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সম্পূর্ণ পচনের কাল হিসাবে বিশেষভাবে চিহ্নিত। জাতীয় কংগ্রেস সংঘর্ষোন্মুখ দলাদলিতে ভেঙে টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু এই দলগুলির মধ্যে মৌল বিরোধ ছিল কম। তারা সকলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরেই স্বকীয় স্বায়ত্ত শাসনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। এমন কি তাদের আশু দাবিও হলো অভিন্ন।

গোঁড়া স্বরাজবাদী নেতৃবৃন্দ ও বিরুদ্ধবাদীদের (Responsivist and Independents) মধ্যে তিক্ত বিরোধ পরিস্থিতিকে গুলিয়ে ফেলেছিল। স্বরাজ পার্টির নেতা ও কর্মী সভ্যেরা ও সমর্থকেরা তাদের তুচ্ছ অনুষ্ঠানগত বিষয়ে ঝগড়া করার কপট চরিত্রকে ধরতে পারেনি। বাহ্যতঃ পার্থক্যটি ছিল একটি বিষয়েই, তা হলো কোন্ অবস্থায় সরকারী ক্ষমতা জাতীয়তাবাদীদের গ্রহণ করা উচিত। যাই হোক, নীতিগতভাবে বর্তমান সংবিধানের মধ্যে, যা মাত্র তিন বছর আগে তারা বয়কট করেছিল, সরকারী ক্ষমতা গ্রহণ করায় তাদের আপত্তি ছিল না।

মালবিয়ার সঙ্গে আলোচনার সময়ে মতিলাল নেহরু ১৫ই সেপ্টেম্বর বলেন

যে, "কানপুর কংগ্রেসে উপস্থাপিত প্রস্তাবের সাধারণ আদর্শ ও কর্মনীতিকে সমর্থন করতে হবে।" কিন্তু দু'দিন বাদেই আলোচনা সভা ভেঙে যাবার পর স্বরাজ পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখল,

"যদি কানপুর কংগ্রেসে নির্মিত কর্মনীতিকে জনসাধারণ পরিবর্তিত করতে চায় তাহলে নির্বাচনের ফলাফল একটি মহান পথ দেখাতে পারবে।...জনসাধারণের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যদি প্রয়োজন হয়, স্বরাজ পার্টিও কংগ্রেসের নিকটে নতুন কর্মনীতি তৈরী করতে বলবে।" (ফরওয়ার্ড, ১৭ই সেপ্টেম্বর)।

তাহলে দুই দলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা কোথায়। জনসংখ্যার শতকরা ২·২ ভাগ লোককে প্রতিনিধিত্ব করে এমন নির্বাচকদের আদেশ অনুসারে উভয়েই তাদের আদর্শ ও কর্মনীতিকে পরিবর্তন করতে প্রস্তুত। উভয় দলই প্রস্তুত অতি ক্ষুদ্র কিছু সংখ্যালঘিষ্ঠ লোকের স্বার্থে ভোটাধিকারহীন অসংখ্য জনসাধারণের স্বার্থকে পদদলিত করতে। স্বতন্ত্ররা নির্বাচনের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চুক্তির নতুন 'আদর্শ ও কর্মনীতি' নির্ধারণ করল। অপরপক্ষে স্বরাজবাদীরা কেবল অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে চাইল। লেখার সময়ে নির্বাচনের ফলাফল পরিপূর্ণ ভাবে জানা যায়নি। কিন্তু পূর্বে অবধারিত ফল ছিল যে স্বরাজবাদীরা নির্বাচনে হারবে। তাদের পুরনো কৌশলের উপর নির্ভর করে তারা কোথাও স্ব-নির্ভর সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। সুতরাং গৌহাটি কংগ্রেসে তারা কানপুর কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে সংশোধন করার কথা রাখবে। চেষ্টা করা হবে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ কর্তৃক নির্দেশিত একটি আপসের নীতি অনুমোদন করিয়ে জাতীয় কংগ্রেসকে প্রতারণা করার।

কেবল যদি গৌহাটি কংগ্রেসে বুর্জোয়া নেতাদের শঠতাপূর্ণ রাজনীতি ব্যর্থ হয়, তাহলে জাতীয় কংগ্রেসের কর্তৃত্ব সমর্থিত হবে, ভারতীয় জনগণের সর্বোচ্চ সংগঠন হিসাবে তার পদমর্যাদা পুনরায় ফিরে পাবে। এ কাজ বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের একটি মঞ্চে নিম্নস্তরের কর্মীবাহিনীকে সংগঠিত করে করা যেতে পারে।

স্বরাজ দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব

একে একে সচেতন বুর্জোয়া ব্যক্তিরা স্বরাজ পার্টি ছেড়ে যেতে লাগলো ঃ কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পার্টির নেতৃত্ব তখনও পূর্ব কর্তৃত্বশালী বুর্জোয়াদের হাতেই রয়ে গেল। যে বামপন্থী বিরোধীরা বিশ্বাসঘাতী সবরমতী চুক্তি বর্জনের দ্বারা পার্টিকে রক্ষা করেছিল এবং যাকে বাংলাদেশ উপলব্ধি করেছিল, তারা বুর্জোয়া নেতাদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহ করতে তখনও অসমর্থ হয় কিংবা খোলাখুলি বিদ্রোহ করার ইচ্ছা তাদের ছিল না। কিন্তু স্বরাজ পার্টি জনগণের পার্টি, জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা হতে সমর্থ হবে না, যতক্ষণ না এবং যদি না তা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসকামী বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে।

স্বরাজপার্টির দুর্বলতাই পার্টির নেতৃত্ব ও কর্মীদের ভিতরে সর্বদা দ্বন্দ্ব জীইয়ে রেখেছে। পার্টির কর্মসূচী ও কর্মনীতি সর্বদাই ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ঃ কিন্তু পার্টির সভ্য ও সমর্থকেরা অধিকসংখ্যকভাবে এসেছে সমাজের অন্যান্য শ্রেণী থেকে। তবুও পার্টি সর্বদা অভিজাত ও বুর্জোয়াদের স্বার্থের জন্য লড়াই করেছে যদিও তার বিপ্লবী অনুবর্তীদের ধাপ্পা দেবার জন্য কতকগুলি অর্থহীন হাবভাব দেখায়। কিন্তু

যথা সময়ে এই অর্থহীন ভাঁওতাগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে চুক্তিতে কিছুটা ক্ষতিকর হয়েছিল। স্বরাজ পার্টি বিচ্ছিন্নতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। অবস্থা এমন হলো যে, হয় পার্টিতে তার পেটি-বুর্জোয়া অনুবর্তীদের পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে, কিংবা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থনকে বাতিল করে দিতে হবে। পরবর্তী ফল হবে পার্টির জন্য বিপজ্জনক যা সংসদীয় কর্মনীতির সাফল্যের উপর এর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে।

জনসাধারণের সংগে কাজ করার যোগসূত্র হিসাবে পেটি-বুর্জোয়ারা স্বরাজ পার্টিকে এক জাতীয় গুরুত্ব দান করে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই স্বরাজ পার্টিকে ভোট দিয়ে সমর্থন করতে পারে না। বিপ্লবী সংগ্রামের জয় লাভের জন্য যা প্রয়োজন, ব্যাপক জনগণের সংগে সেই যোগসূত্রই পার্টির পক্ষে অপরিহার্য হবে। সংসদীয় কাজের উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল পার্টির জন্য, যাই হোক, দেশবাসীর চাইতে নির্বাচকমণ্ডলীই অধিকতর প্রয়োজন। বর্তমান নির্বাচকমণ্ডলীর শ্রেণীচরিত্র দাবি করে যে, যে কোনো পার্টিকে ভোট পেতে হলে ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এই স্বার্থের সংগে জাতির স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে, জাতীয় স্বার্থের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে।

এই হলো মতপার্থক্যের প্রধান বিষয় যা নির্বাচনের ঠিক পূর্ববর্তী মুহূর্তে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল। যে সব বুর্জোয়া নেতারা তখনও পর্যন্ত স্বরাজ পার্টির নেতৃত্বে ছিল তাদেরকে এই বিষয়ে পরিষ্কার মতামত জানাতে বলা হলো। তাদের অনুসরণকারী বিশ্বস্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কি তারা দূরে ফেলে দেবে, জনগণের বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে কি তারা খোলাখুলিভাবে দাঁড়াবে? তারা সরল জবাব এড়িয়ে গেল। তারা বাক-চাতুরী ও চুলচেরা বিচারের দ্বারা পার্টিকে প্রতারণা করল। প্রকৃতপক্ষে তারা পার্টি ও জাতির সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করল। নির্বাচকের রায়কে ভিত্তি করে পার্টির ভবিষ্যতকে বিপন্ন করার উপর তাদের জেদ হলো জনসাধারণের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা। তারা শুধু স্বরাজ পার্টিকেই নয়, জাতীয় কংগ্রেসকেও করে তুললো ব্রিটিশের অনুগ্রহে ভোটাধিকারসম্পন্ন অতি সামান্য সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থে ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষ।

কর্মসূচী অবশ্যই পরিবর্তিত হওয়া দরকার

স্বরাজ পার্টি বুর্জোয়া প্রভাবের প্রাণঘাতী বাধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না যদি না একটি নতুন কর্মসূচী তৈরী করে। জনগণের স্বার্থকে প্রতিফলিত করে ও জাতীয় স্বাধীনতার উপলব্ধিতে জঙ্গী গণ-আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায় এমন একটি নতুন কর্মসূচীই নেতাদের পরীক্ষার সামনে ফেলবে। হয় তারা সেই কর্মসূচী সমর্থন করবে এবং তদ্দারা তারা সেই সেতু ধ্বংস করবে যার উপর দিয়ে তারা তাদের পার্টিকে পকেটে নিয়ে বুর্জোয়া শিবিরের মধ্যে গোপনে মিশে যেতে চায়, না হয় যারা তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল সেই আদর্শ কমরেডদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে তারা পার্টি পরিত্যাগ করবে।

স্বরাজ পার্টির কর্মসূচী অত্যাবশ্যকীয়রূপে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের কর্মসূচী। প্রকৃতরূপে এটি দ্ব্যর্থবোধক। দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখা যায় যখন গয়া কংগ্রেসে এর বিস্তৃত কর্মনীতি তৈরী হচ্ছিল তখন সি. আর. দাস বলেন:

"স্বরাজকে ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং একে কোনো বিশেষ সরকারী ব্যবস্থার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। স্বরাজ হলো জাতীয় ভাবনার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি এবং তা অপরিহার্যভাবে সমগ্র জাতীয় ইতিহাস জুড়ে রাখে।"

বক্তব্যটি যদি উদ্দেশ্যমূলক না হতো তাহলে তাকে উপহাস করা যেতো। দাস তার নিজের সঙ্গে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে টানতে পারেননি; তিনি সেই জটিল সময়ে স্বরাজের ব্যাখ্যা করেছিলেন যেমন তিনি করেছিলেন আড়াই বছর পরে ফরিদপুর সম্মেলনে। স্বরাজ, যা গয়া কংগ্রেসে সংজ্ঞানির্ধারণক্ষমহীন অমূর্ত অবস্থায় বিবৃত হয়েছিল, আড়াই বছর কালের মধ্যে ফরিদপুর কংগ্রেসে তা একটি সুনির্দিষ্ট বাস্তব রূপ—একটি বিশেষ ধরনের সরকারের রূপ গ্রহণ করল। স্বরাজবাদী নেতারা স্বরাজের ব্যাখ্যা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস (Dominion Status) হিসাবে। পার্টি বীর পূজা বিশ্বাসের দ্বারা মানসিকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ায় এমনকি নেতাদের জিজ্ঞাসা করতেও পারেনি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমানার ওপর এই ধরনের সীমিত স্থান কিভাবে "জাতির সমগ্র ইতিহাস জুড়ে জাতীয় ভাবনার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হবে।"

ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস জাতীয় মনোভাবের অভিব্যক্তি নয়। তা জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ডমিনিয়ন স্ট্যাটাসের পক্ষে সি. আর. দাসকে যা বলতে হয়েছিল তা হলো: (১) এটি বাস্তব সুযোগ-সুবিধা এনে দেয়; (২) পরিপূর্ণ সংরক্ষণ সৃষ্টি করে; (৩) স্বরাজের সমস্ত বিষয়কে এগিয়ে নিয়ে যায়। (ফরিদপুর কংগ্রেসের বক্তৃতা)

ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস বাস্তব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে কাদের? ভারতীয় বুর্জোয়াদেরই সুবিধা প্রদান করে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চুক্তি ভারতীয় ধনতন্ত্রের অগ্রগমনকে সুনিশ্চিত করে। যাদের সংরক্ষণ করার মতো কিছু আছে তারাই সংরক্ষণের কথা বলে। তারা আবার ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর লোক যারা এই ভয়ে ভীত যে শ্রমিক ও কৃষক জনসাধারণের দ্বারা সংগঠিত জাতীয় বিপ্লব তাদের রক্ষিত বস্তুকে ক্রমে দখল করে নিতে পারে। ভারতীয় সমাজের সেই সব শ্রেণী-গুলি, মেহনতী জনগণকে শোষণের মাধ্যমে যারা অস্তিত্ব বজায় রাখে ও সমৃদ্ধ হয়, এবং যাদের কাছে জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হলো এই শোষণকে বাড়িয়ে তোলার স্বাধীনতা, তারা জনগণের সম্ভাব্য বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংরক্ষণ চায়। এই হলো ডমিনিয়ন স্ট্যাটাসের অর্থ। ভারতীয় বুর্জোয়াদের বাস্তব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারের নিরাপত্তা এবং শ্রেণীগুলিকে শোষণ করার বিষয়ে ক্ষমতা—এগুলিই হলো স্বরাজের মূল উপাদান, যাকে স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতারা প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়।

গয়া কংগ্রেসে খসড়া করা কর্মসূচী যতক্ষণ স্বরাজ পার্টি মেনে চলে এবং ফরিদপুর কংগ্রেসে পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের দ্বারা সবিশেষ বর্ণনায় সেই কর্মসূচী ব্যাখ্যা করা হয়, ততক্ষণ স্বরাজ পার্টি অন্যান্য জাতীয়তাবাদী পার্টি থেকে বিশেষ ভাবে ভিন্ন হবার দাবি করতে পারে না। উচ্চ শ্রেণীর প্রতিরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ অন্যান্য পার্টি কর্তৃক যা প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ পার্টি সেই একই পথে যাবে। এমন কি ডমিনিয়ন স্ট্যাটাসও হলো দূরের কথা। অনুরোধ করা সত্ত্বেও তা সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক গ্রাহ্য হবে না। শিষ্য হিসাবে জ্ঞানলাভার্থে তাদের অবশ্যই একটি সুদীর্ঘ সময় কাটাতে হবে, যে সময়ে সংস্কার আইনের (Reform) উপর ভিত্তি করে সঙ্গে তাদের সহযোগিতার সেবা-কাজ করতে হবে। জাতীয়তাবাদী

বুর্জোয়ারা আরো দফায় দফায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কনসেসন্ পাবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য এই শিক্ষানবিশ হিসাবে সেবা-কাজে উদগ্রীব ছিল।

এই হলো পরিস্থিতি যখন কংগ্রেস গৌহাটিতে সম্মিলিত হয়। কংগ্রেস অবশ্যই জাতির ভোটাধিকারসম্পন্ন শতকরা ২·২ ভাগ এবং ভোটাধিকারবিহীন নিপীড়িত ও শোষিত শতকরা ৯৭·৮ ভাগ জনসংখ্যার মধ্যে এ দুটির একটিকে বেছে নেবে। "শতকরা ৯৮ ভাগের জন্য স্বরাজ" বলে চিৎকার করার শঠ কর্মনীতি এবং শতকরা ২ ভাগ জনসংখ্যার জন্য আদেশ প্রতিপালন করার মধ্যে আর বেশী দিন প্রকাশ্যে বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া জাতীয় কংগ্রেসের নাম ও সম্মান রক্ষা করা যাবে না।

"ফরওয়ার্ড" পত্রিকার মত উপরে উদ্ধৃত করা হলো, এবং স্বরাজবাদী নেতাদের এই একই রকম একাধিক বক্তৃতা পার্টির কর্মনীতি সম্পর্কে কোন সন্দেহ দূর করতে পারে না, যা নির্বাচনের ফলাফল জানার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসকে ধাক্কা দেবে। কাউন্সিলে স্বরাজবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি যা তাদের পক্ষে খুব অসম্ভব ঘটনা—তারা যদি তা করতেও পারে কিংবা তাদের বর্তমান শক্তি তারা যদি ধরেও রাখতে পারে তাহলেও তারা সরকারী ক্ষমতা গ্রহণ করবে। গত দু'বছরের অকৃতকার্যতাকে আবার সর্বত্র পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। নির্বাচনে তাদের পরাজয়ের সম্ভাব্য পরিণতিতে তারা অবশ্যই তাদের কর্মনীতি পরিবর্তন করবে এবং আত্মসমর্পণ ও আপসের এই দেউলিয়া কর্মনীতির কারণে তারা চেষ্টা করবে সেই পরিবর্তনের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন নিশ্চিত করতে।

জাতীয় কংগ্রেস এভাবেই নিজেকে কেবল একটি পথেই রক্ষা করতে পারে।

পার্টি কর্মসূচী ও কর্মনীতিকে সর্বত্রই প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে যা একে সামান্য সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থের খাতিরে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য পার্টির একটি যন্ত্র হিসাবে তৈরী করার চেষ্টা করে। বুর্জোয়া জাতীয়তা-বাদের দেউলিয়া কর্মনীতির প্রত্যাখ্যান গণতান্ত্রিক জাতীয় স্বাধীনতার এক কর্মসূচী নির্মাণ দ্বারা প্রতিপালন করা উচিত। মেকী সংসদীয়তন্ত্রের বদলে জঙ্গী গণ-আন্দোলন গ্রহণ করা উচিত। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ ও নিখাদ সংগ্রামী কর্মনীতির সমর্থনে আত্মসমর্পণ ও আপসের কর্মনীতিকে বাতিল করা উচিত। প্রতারক বুর্জোয়া নেতৃত্ব থেকে জাতীয় কংগ্রেসকে মুক্ত করা উচিত ও রিপাবলিকান পিপ্‌লস পার্টির (Republican People's Party) প্রেরণাময় প্রভাবের মধ্যে টেনে আনা উচিত।

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, যা বিগত বছরগুলিতে দেশকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে সে সম্পর্কে অনেকেই নিশ্চয় নিরুৎসাহিত হয়েছেন। এবং এখানেই জনগণের পার্টি সমাধান খুঁজে পাবে। যখন অভিজাত শ্রেণী তাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার জন্য লড়াই করে তখন উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি খুবই কার্যকরী জিনিসে ঐক্য থাকে। সেটা হলো শোষণ। একই কারখানায় হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকেরা পরিশ্রমে গলদঘর্ম হয়। হিন্দু ও মুসলমান কৃষকেরা পাশাপাশি জমিতে চাষ করে, একই ভাবে তারা উভয়েই জমিদার, সুদখোর ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। মুসলমান কর্মী তার সহধর্মী মালিকের কাছ থেকে বেশী মজুরি পায় না। অপরপক্ষে হিন্দু জমিদার তার হিন্দু প্রজার কাছ থেকে মুসলমান প্রজা অপেক্ষা কম খাজনা নেয় না।

শোষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, স্বল্পবিত্ত ব্যবসায়ী, কারিগর প্রভৃতি) ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। সমান শোষণের সুতোয় বাঁধা সমগ্র জনগণের শতকরা ৯৮ ভাগ লোকের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে লিপ্ত হবার কোন যুক্তি নেই। তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থবোধে সচেতন করা হোক, তাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের সাহসিক নেতৃত্ব দেওয়া হোক, তাহলে শোষণের শক্তিসমূহ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্ররোচনাকারী সুবিধাবাদী নীতির ভিত্তিভূমি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এটা সত্য কথা যে একাজ রাতারাতি করা সম্ভব হবে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার কর্কট ব্যাধি মুক্ত করার এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই—যে ব্যাধি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাণশক্তিকে বিনষ্ট করে দেয়।

নিঃশোষিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষকে মদত দিয়েছে। জঙ্গী গণ-আন্দোলনের কর্মসূচীর সাহায্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুনর্গঠন এই ধরনের উদ্দীপনাকে দূর করবে। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন রাজনৈতিক সচেতনতার বিনিময়ে ধর্মান্ধতাকে ত্বরান্বিত করেছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধর্মনিরপেক্ষতার সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে স্থাপন করে এই মারাত্মক ত্রুটি সংশোধন করতে হবে। তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে সংগঠিত করা উচিত। ভূমিস্বত্ব, ভূমির খাজনা, বন্ধকী মূল্য, দ্রব্য মূল্য, মজুরি, কাজের অবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা—এ সবই আন্দোলনের মূল বিষয় হওয়া উচিত। এগুলির প্রত্যেকটি বিষয়ই জনজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। তাদের স্বার্থচিহ্ন খুব সহজেই স্পষ্ট করে দেওয়া যায়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে পূর্বনির্দেশিত পথে আন্দে করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা নিরসনের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা যাবে।

গণতান্ত্রিক আদর্শ, যাই হোক, জাতীয় সংখ স্বার্থের বিরোধিতা করে না। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পারস্পরিক আবিশ্বাসের ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে জাতীয় সংখ্যালঘু সমস্যা হিসাবে বিচার করতে হবে। জাতীয়তাবাদী মঞ্চের কোনো একটি প্রধান স্তম্ভ হবে জাতীয় ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হলে সাম্রাজ্যবাদ সাম্প্রদায়িকতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ পায় এবং এভাবে জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে।

একাধিক জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতার আচরণ ও কথাবার্তা মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে কিছুসংখ্যক মুসলমান নেতার অন্তর্দেশীয় দেশাত্মবোধ প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুদের ক্ষতিকর প্রচারের হাতিয়ার তুলে দেয়। উভয়ের ক্ষেত্রেই আধিক্য বর্জনীয়। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সুনিশ্চিত গ্যারাণ্টি হলো জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে তাদের সংগঠিত করা। অস্পষ্ট ও কৃত্রিম সাম্প্রদায়িক কৌশলকে শ্রেণী কৌশল গভীরভাবে দ্বিখণ্ডিত করে।

জাতীয় স্বার্থ ও শ্রেণীস্বার্থ

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পুনঃপ্রকোপ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়েছে, কিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে শ্রেণী স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফলে বর্তমানে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে প্রাথমিকভাবে পচন ধরেছে। অন্যান্য দেশের পুঁজিবাদী সমাজের মতো ভারতীয় সমাজও শ্রেণীবিভক্ত।

ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক এক রকম নয়। বৈদেশিক শক্তি কর্তৃক জাতি নিপীড়িত ও শোষিত হচ্ছে। কিন্তু এই নিপীড়নের চাপ ভারতীয় জনসংখ্যার সর্বস্তরের উপর সমানভাবে পড়ে না। শোষণের লক্ষ্য সমস্ত জনসাধারণ নয়, নিজেদের শ্রমশক্তির সাহায্যে যে শ্রেণী ধন উৎপাদন করে কেবল সেই শ্রেণীই হলো শোষণের লক্ষ্য। এই শ্রেণী হলো জাতীয় জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ শ্রমিক ও কৃষক। ভারতীয় সমাজে অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিবাদ হলো লুটের লাভের কলহ। দেশীয় জমিদার ও ধনিকেরা ধন উৎপাদনকারী জনসাধারণকে মেরেই বেঁচে থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া নীতি শিল্পপতিদের নিরংকুশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ দেয় না, যা শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করার তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। ভারতের শ্রমিক ও কৃষকের উৎপন্ন মূল্যের অধিকাংশ যায় সাম্রাজ্যবাদের পকেট ফাঁপিয়ে তোলার জন্য। ভারতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যস্বত্বভোগী কিছুটা অংশ দেওয়া হয় মাত্র। পরবর্তীকালে তারা লুটের এই ক্ষুদ্র অংশে আর সন্তুষ্ট ছিল না। তারা চেয়েছিল একটি নিয়ত-বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশ এবং অবশেষে তারা ভারতীয় জনগণের শ্রমশক্তির সমগ্র উৎসের উপরই পূর্ণ অধিকার চেয়েছিল।

ভারতীয় বুর্জোয়ারা কিন্তু উপলব্ধি করতে পারেনি যে একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত না করে দেশের উপর তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করা যাবে না। শুধুমাত্র তাদের নিজেদের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। সমগ্র জনসাধারণের বৈপ্লবিক আন্দোলন ছাড়া বৈদেশিক শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা যাবে না। জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের অভাব-অভিযোগের জন্যই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিপ্লব ঘটল না। এ বিপ্লবের নিজস্ব নিয়ম আছে। এসব ক্ষেত্রে ব্যাপক জনসাধারণ শোষণের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে। সুতরাং জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ারা, যারা দেশের সর্বময় প্রভু ও শাসক হতে চায়, তারা সেই হাতিয়ার ব্যবহার করতে সাহস পায় না, যা এককভাবে দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যকে দৃঢ়ভাবে সন্ত্রস্ত করতে পারে। এইভাবে জাতীয় স্বার্থ—শতকরা ৯৮ ভাগ লোকের স্বার্থে, শ্রেণী স্বার্থের খাতিরে বলি দেওয়া হয়। দেশের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব বিস্তার প্রচেষ্টার মধ্যে এই ধরনের সাংঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে বলেই জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যৌথভাবে ভারতীয় জনসাধারণকে শোষণ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়।

সাম্রাজ্যবাদ কেন এই ধরনের একটি চুক্তির মধ্যে আসে? এর পিছনে অনেক কারণ আছে। প্রথমত, ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিভূমিকে এতো দুর্বল করে দিল যে, প্রাচীন সনাতনী ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় পণ্যের বাজার জাপান, আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী প্রভৃতি দেশের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এইসব অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে কেবল ভারতবর্ষে সস্তা শ্রমে তৈরী উৎপন্নের মাধ্যমেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করতে পারে। সুতরাং ব্রিটেন সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির ছায়ায় ভারতে শিল্পোন্নয়ন করার নীতি গ্রহণ করে। তৃতীয়ত, ব্রিটেনে মূলধন সঞ্চয়ের অবক্ষয় শুরু হওয়ায় তা ভারতবর্ষে শিল্পোন্নয়নের কর্মসূচীকে চালিয়ে যেতে যথেষ্ট মূলধন নিয়োগে ব্যর্থ হয়। সুতরাং এ কাজ করার জন্য ব্রিটেন অবশ্যই ভারত থেকে মূলধন সংগ্রহ করবে। চতুর্থত, যুদ্ধোত্তর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গণচরিত্র সাম্রাজ্যবাদকে বাধ্য করে দেশীয় সমাজের সর্বস্তরের ব্যাপক জনসংখ্যাকে নিজের পক্ষভুক্ত করতে।

দেশীয় কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সমর্থন ছাড়া কোনো বৈদেশিক শক্তি দীর্ঘকালের জন্য একটি দেশ শাসন করতে পারে না। একটি স্থায়ী সরকারের পক্ষে একটি সামাজিক ভিত্তিভূমি অবশ্যই দরকার। বিশ্বযুদ্ধকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারকে দুটি সামাজিক শক্তি সমর্থন করে। তারা হলো জমিদার শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণী। উভয়ে একত্রে জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের সুনিশ্চিত সামাজিক ভিত্তি ছিল। কিন্তু এই দুই সামাজিক শক্তি ব্রিটিশ সরকারকে একই পরিপ্রেক্ষিতে সমর্থন করেনি। ভূস্বামীশ্রেণী তাকে ইতিবাচক সচেতন সমর্থন জানিয়েছিল, অপরপক্ষে কৃষকশ্রেণী তাদেব স্বভাবজাত অন্ধ আনুগত্যের ফলে, শ্রেণী চেতনার অভাবে সমর্থন জানায়। যুদ্ধের পর থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তন এসেছে। কৃষকশ্রেণীর অন্ধ আনুগত্য ভেঙে গেছে। মাঝে মাঝে চাপা বিক্ষোভ বিদ্রোহ আকারে ফেটে পড়তো। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি এখন কেঁপে উঠে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে তার নতুন মিত্র চাই।

নতুন মিত্র হলো জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ারা (ব্যাংকার, ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী, উচ্চ কর্মচারী এবং এই সব শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পেশাদারী ব্যক্তিরা)। যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছিল। জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ারা অশুভ সম্ভাবনায় ভীষণভাবে ভীত হয়। তারা নিরাপদ পথে যাবার সিদ্ধান্ত করল, এবং ভারতীয় জনসাধারণকে শোষণ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ছোট অংশীদারিত্ব গ্রহণ করল।

বুর্জোয়াদের কর্তব্যচ্যুতি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তার দাগ রেখে গেল। তাদের কর্মনীতিই হলো আপস ও আত্মসমর্পণ। এই শ্রেণীস্বার্থের যূপকাষ্ঠে জনগণের আত্মবলিদান একের পর এক ১৯২২ সাল থেকে চলে এসেছে। অবশেষে যখন নতুন আইনসভা ও কাউন্সিলের অধিবেশন বসল তখন অবস্থা চরমে পৌঁছাল। অধিবেশনে কী রূপ পরিগ্রহ করবে সেটা বড় কথা নয়। সেখানে এক ধরনের সরকার বিরোধিতার (His Majesty's Opposition) প্রহসন হতে পারে। কিন্তু মূলত যে-সব পার্টিগুলি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করে তারা সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত বিরোধিতা পরিত্যাগ করবে এবং ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে সহযোগিতা করবে হয় "সম্মানের" ("honourably") সঙ্গে, অথবা তাদের "সুরে সুর মিলিয়ে" ("Responsively")।

কী করতে হবে?

সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য বিধান, আর যাই হোক, জাতীয় বিপ্লবের মূল কারণকে বিদূরিত করতে পারে না। ভারতীয় জনগণের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা কতিপয় জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের স্বার্থের

দ্বারা নিরূপিত হবে না। সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে চুক্তি ভারতীয় জনগণকে রাজনৈতিক শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি দিতে পারে না। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ লোকের কোন রাজনৈতিক অধিকার নেই। সাম্রাজ্যবাদের ভাগের অংশ কমিয়ে দিয়ে দেশীয় পুঁজিবাদকে অর্থনৈতিক কনসেসন্ দেওয়া যায় না এবং যাবে না। তাহলে সাম্রাজ্যবাদীরা মেহনতী জনগণের উপর শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে, তাদেরকে বাধ্য করবে সাম্রাজ্যবাদের জন্য তারা যে মূল্য তৈরী করে, দেশীয় পুঁজিবাদের জন্য তার চেয়েও অধিক মূল্য তৈরী করতে। অবস্থা এই হওয়ায় জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম অবশ্যই বেড়ে চলবে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হবে জনগণের এমন আন্দোলন যে আন্দোলনের কর্মসূচীতে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বার্থ প্রতিফলিত হয়। আন্দোলনের কর্মসূচী হবে সব রকমের অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থবোধকতা থেকে মুক্ত, যেমন হয়েছে স্বরাজবাদীদের কর্মসূচীর ক্ষেত্রে।

জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে, বিশেষত কৃষি সমস্যা বিষয়ে পরিষ্কার বক্তব্য রাখা উচিত। জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ হলো কৃষক। ভারতীয় সমাজের বর্তমান অবস্থায় অর্থনৈতিক বিষয়টি হলো খুবই প্রয়োজনীয়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অর্থনৈতিক বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কৃষকের জন্য লড়াই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি প্রধান কাজ হওয়া উচিত। সাম্রাজ্যবাদ তাদের প্রতি কৃষকের বিশ্বাসকে সুকৌশলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। গত কয়েক বছর ধরে তারা কয়েকটি প্রদেশে রায়তীস্বত্ব সংস্কার আইনের জন্য জমিদারশ্রেণীর উপর চাপ দিচ্ছে। এর ফলে ১৯১৯-২১ সালে তীব্র কৃষি গোলযোগ যে ভীতিপ্রদ অবস্থা সৃষ্টি করে তাতে তারা হস্তক্ষেপ করতে পেরেছে। কৃষকের বিশ্বাসকে ফিরে পাবার জন্য তাদের পরবর্তী প্রচেষ্টা হলো কৃষি বিষয়ে রয়াল কমিসন (Royal Commission) বসানো। বলা বাহুল্য যে, এসব প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য কৃষকদের সাহায্য করা নয়, বরং তাদের প্রতারিত করা। কৃষক জনসাধারণের নিষ্ঠুর শোষণই হলো ভারত থেকে সাম্রাজ্যবাদী মুনাফা অর্জনের মূল উৎস। সাম্রাজ্যবাদের অশুভ অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে, কৃষকের আস্থা পুনরায় ফিরে পেতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে একটি বৈপ্লবিক কৃষি কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কিংবা প্রস্তাবিত তথাকথিত সংস্কার আইনের মুখোশকে খুলে দিতে হবে।

১৯২৩ সালের নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে স্বরাজ পার্টি কর্তৃক প্রদত্ত নির্বাচনী ইশ্‌তিহারে এই লেখাটি উদ্ধৃত হয়ঃ

"এটা সত্য যে, পার্টি প্রজাদের জন্য ন্যায় বিচারের পক্ষে দাঁড়াবে, কিন্তু যদি প্রজারা জমিদারের প্রতি অন্যায্য বিচারে লিপ্ত হয় তাহলে ঐ ন্যায় বিচারের প্রকৃতি হবে আরো দুর্বল।"

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যদি কৃষক জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন পেতে চায় তাহলে উদ্ধৃতির মধ্যে বর্ণিত প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাকে নিজে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে। মধ্যবিত্ত জমিদারদের ভোট প্রার্থী পার্টির পক্ষে এই ধরনের কর্মসূচী প্রয়োজন। কিন্তু এই কর্মসূচী প্রত্যক্ষভাবে পার্টির পক্ষে ক্ষতিকর হবে যা ব্যাপক জনসাধারণকে স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রস্তাব আনে। যদি তুমি জমির মালিকদের পায়ে আঁচড় না দিতে এত যত্নবান হও, তাহলে তুমি কেবল কৃষকের উপরে অবিচারই করতে পারো। জমিদার শ্রেণী হলো সামাজিক পরগাছা যারা কৃষক শ্রেণীর রক্ত চুষে খায়। দেশের প্রায় অর্ধেকের বেশী

অংশে জমিদারই হলো গবর্নমেণ্ট। বিচারের নিক্তি সেদিকেই ঝুঁকবে।

কৃষকশ্রেণী সম্পর্কে স্বরাজবাদী কর্মসূচী এভাবে শুধু পরগাছা ভূস্বামীদের সংরক্ষণ করে না, এই কর্মসূচী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেও বেঁচে থাকার সীমাহীন মেয়াদ প্রদান করে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কৃষি বিষয়ক কর্মসূচীকে কৃষকের স্বার্থেই প্রতিরক্ষা করতে হবে। এই কর্মসূচীকে সবেগে চালিত হতে হবে কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করে এমন সমস্ত বিদেশী বিচারের নিক্তি সেদিকেই ঝুঁকবে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কর্মসূচী

জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে জয়লাভে নেতৃত্ব দিতে পারে একমাত্র জনগণের পার্টিই। পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষিত কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করে—এরকম একটি পার্টির স্বারা আন্দোলন পরিচালিত না হলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হালছাড়া জাহাজের মতোই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। একটি লক্ষণীয় বিষয় যে, কয়েক বছর ধরে নেতারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশবাসীকে স্পষ্ট করে কিছু বলল না। স্বরাজ বিষয়ে সর্বাঙ্গীণ ব্যাখ্যা করে বলা হলো যে, এ হলো একটি জাতীয় স্বাধীনতা। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য যদি জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন না হয় তাহলে আন্দোলন অর্থহীন হয়ে যায়। জাতীয় স্বাধীনতার বিষয়ে এই বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। এর জন্য আইনগত বা সাংবিধানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন লাগে না। এই স্বাধীনতার অর্থ হলো জনসাধারণের স্বকীয় সরকার প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা, যার কাজ হবে নিজেদের রাজনৈতিক অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়গুলি পরিচালনা করা। জাতীয়তাবাদী কর্মসূচীর এই মূল বিষয়টি এখনো পর্যন্ত স্পষ্টভাবে ও পূর্ণাঙ্গরূপে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা হয়নি। জাতীয়তাবাদ পুনর্গঠিত করার এইটিই হবে প্রথম কাজ। জাতীয়তাবাদীরা কোন্ শর্তে ক্ষমতা গ্রহণ করবে—এ বিতর্ক তুলে প্রধান বিষয়টিতে মতভেদ করা চলবে না। বর্তমান সমস্ত জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলি আজকাল ডমিনিয়ন স্ট্যাটাসের কর্মসূচীতে প্রতিশ্রুতিবন্ধ। এমনকি এ বিষয়েও খুব বেশী সরাসরি ভাবে দাবি তোলা হচ্ছে না। বর্তমান প্রতিনিধিত্ব-হীন আইনসভায় এরকম কিছু ব্যবস্থা চরম সংস্কারপন্থীদের কিছুটা শান্ত করবে। এ কোনো প্রকার জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়। এ হলো প্রহসন মাত্র। জাতির বিরুদ্ধে এ হলো পুরাদস্তুর বিশ্বাসঘাতকতা। **পূর্ণ ও নিঃশর্ত স্বাধীনতাই জনগণের স্বাধীনতা।** এই স্বাধীনতার দাবি ও সংগ্রামের জন্য দেশে একটি জনগণের পার্টি অবশ্যই থাকা চাই।

তখনও জাতীয় স্বাধীনতা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যে জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই করা হচ্ছে তার কোনো মূল্যই থাকবে না যদি না তা জনসাধারণের এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার উপস্থিত করে যে, জনসাধারণকে বর্তমান অবস্থায় বঞ্চিত করা হয়েছে। প্রাগ্রসর গণতান্ত্রিক নিয়মের উপর ভিত্তি করে একটি **প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র** (Republican State) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা সঠিক রূপ গ্রহণ করবে। **সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের (পুরুষ ও নারী) ভিত্তিতে নির্বাচিত একটি জাতীয় বিধানসভা** ভোটাধিকারের (পুরুষ ও নারী) ভিত্তিতে নির্বাচিত একটি জাতীয় বিধানসভা হবে জনগণের সর্বোচ্চ সংগঠন। সব রকমের বর্ণগত ও শ্রেণীগত সুবিধা দূরীভূত করতে হবে। দেশকে পরিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রীকরণ করা হবে।

জাতীয় স্বাধীনতা জনসাধারণকে আরো বেশী বাস্তব সুযোগ-সুবিধা প্রদান

করবে। জাতীয় স্বাধীনতা জনসাধারণের মূল অর্থনৈতিক অভাব-অভিযোগ দূর করবে এবং তাদের অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জীবনমানের গ্যারাণ্টি দেবে। জাতীয় স্বাধীনতা এই নীতি প্রতিষ্ঠা করবে যে, **চাষীই হবে জমির মালিক।** বিনা পরিশ্রমে জমির আয়ে যে-সব পরগাছা শ্রেণী বিলাস-ব্যসনে জীবনযাপন করে তাদের কায়েমী স্বার্থ থেকে ভোগবঞ্চিত করা হবে। যে অতিরিক্ত পরিমাণ টাকা জমিদারদের পকেট ফাঁপিয়ে তোলে সে-টাকা কৃষকদের আর্থিক ভার লাঘবের জন্য ব্যয় করা হবে। জমির খাজনা সর্বতোভাবে কমিয়ে দিতে হবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে মূল্যহীন ইজারার উপর নির্ভর করে যে সব কৃষক দুর্বিষহ জীবন কাটায় তাদের জমির খাজনা থেকে সম্পূর্ণভাবে রেহাই দিতে হবে। সুদখোরদের অমিতাচারের বিরুদ্ধে কৃষককে রক্ষা করতে হবে। জাতীয় সরকার ব্যাপক কৃষিঋণ দিয়ে কৃষককে সাহায্য করবে। কৃষিকাজে যন্ত্র ব্যবহার শুরু করে এবং সার্বিক প্রাইমারী শিক্ষা চালু করার মাধ্যমে কৃষকের সাংস্কৃতিক মানকে বাড়িয়ে তোলা হবে।

জাতীয় সরকার শিল্প-শ্রমিকদের **দিনে আট ঘণ্টা কাজ ও বেঁচে থাকার ন্যূনতম মজুরি** সুনিশ্চিত করবে। স্বাচ্ছন্দ্যকর শ্রম ব্যবস্থা ও বাসস্থানের বিষয়ে আইন করা হবে। রাষ্ট্র বেকার শ্রমিকদের ভার গ্রহণ করবে।

সাধারণের উপযোগী বিষয়গুলি, যেমন রেলপথ, জল সরবরাহ, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি হবে জাতীয় সম্পত্তি। সেগুলি ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য নয়, সাধারণের ব্যবহারের জন্য ফলপ্রসূ হবে।

শ্রমিকদের (কৃষকদেরও) সংঘবদ্ধ হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, এবং তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ধর্মঘটের অধিকার থাকবে।

ধর্মের ও পূজা-অর্চনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। জাতীয় ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করবে।

কর্মসূচীর এই মূল বিষয়গুলিই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে একত্রিত করবে এবং দুর্নিবার সংগ্রামে সংগঠিত করবে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের কর্মসূচী (ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিরক্ষা) জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জাতি তার অধিকার প্রয়োগ করবে এবং বুর্জোয়াদের জালিয়াতি ও ভীরুতা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাবে। ভণ্ড বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের প্রভাব থেকে জাতীয় কংগ্রেসকে মুক্ত করতে হবে। যারা সৎভাবে ও সাহসিকতার সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে আগ্রহী, তারাই হবে জনসাধারণের মুখপাত্র। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যে-পার্টি নেতৃত্ব দিতে চায় সে-পার্টি হবে জনগণের পার্টি। সে-পার্টি কতিপয় সৌভাগ্যবান নির্বাচককে প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং সে-পার্টি ভোটাধিকারবিহীন সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব করে। জনগণের পার্টির কাজের জন্য কাউন্সিল কক্ষের পথ অবরুদ্ধ, সুতরাং সে পার্টি আন্দোলনের জন্য অনেক বেশী প্রশস্ত ক্ষেত্র খুঁজে নেবে।

জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয় স্বাধীনতা ও পূর্ণ গণতান্ত্রিকতা—এগুলিই হলো জাতীয়তাবাদী মঞ্চের প্রধান স্তম্ভ। এই কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার লড়াই লড়তে হলে স্লোগান হবে : **জমি, জীবিকা এবং শিক্ষা।**[১]

ডিসেম্বর ১, ১৯২৬ ভারতের পার্টি

১ এই ইশ্‌তিহারটির বাংলা অনুবাদ ক'রে দিয়েছেন জিয়াদ আলি

বিপ্লব ও 'বিপ্লবী'

এই শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙলা দেশে ও মহারাষ্ট্রে একটা বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্যুদয় হয়েছিল, তবে আন্দোলনের বেশী জোর হয়েছিল বাঙলায়। বাঙলার 'ভদ্রলোকে'র ঘরের শিক্ষিত যুবকেরা এই আন্দোলনে অগ্রণী সৈনিক হয়ে শুরু হতেই অদ্ভুত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

বাঙলার 'ভদ্রলোক' শ্রেণী একটি বিশিষ্ট ব্যাপার। শুধু অ-ভারতীয়ের জন্যে নয়, ভারতের বহু প্রদেশের লোকেদের জন্যেও এই 'ভদ্রলোক' ব্যাপারটির সামান্য বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। এই 'ভদ্রলোক' শ্রেণী বাঙলার বাইরে নেই। আমরা শ্রেণী বলি বটে, কিন্তু অর্থনীতিক দৃষ্টিতে ভদ্রলোকেরা শ্রেণী নন। বাঙলা দেশে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের 'ভদ্রলোক' বলা হয়। তাঁদের লাঙল চালাতে নেই, কায়িক পরিশ্রম করাকেও তাঁরা নীচ কাজ মনে করতেন। তার মানে তাঁরা কায়িক পরিশ্রমের কাজ করতেন না। 'ভদ্রলোকে'র বিপরীত কথা 'ছোট লোক'। অন্য প্রদেশের লোকদের ভালো ক'রে বোঝানোর জন্যে 'ইতর' কথাটাও চালানো যায়। 'ভদ্রলোকে'রা অন্য সকলকে 'ছোটলোক' বলতেন। এই 'ছোটলোক' হওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে ওপরে লিখিত তিন বর্ণ ছাড়া নিম্নতর বর্ণের শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত লোকেরা পদবী বদল ক'রে, অর্থাৎ পদবী হতে বোঝা যায় না কোন্ বর্ণের লোক, এমন পদবী গ্রহণ ক'রে 'ভদ্রলোক' হয়ে যেতেন।

ভদ্রলোকদের শিক্ষিত হতে হতো। তাঁরা সুদের ওপরে টাকা লগ্নি করতেন। নিজ হাতে চাষ না করলেও জমি হতেও তাঁরা টাকা আয় করতেন। যে-ভদ্রলোকের নিকটে কালেকটরির তৌজিভুক্ত জমি থাকত তাঁরা নিজেদের ভূম্যভিজাত ভাবতেন। অর্থাৎ জমিদার হওয়ার দিকে তাঁদের আকর্ষণ ছিল। তথাকথিত ছোটলোকদের তাঁরা তুইতোকারি করতেন। তাঁদের ভিতরেও স্তর ভেদ ছিল। এই জন্য তাঁরা শোষণ করতেন, আবার শোষিতও হতেন। উকীল মুখ্‌তারের পেশা তাঁদের প্রায় একচেটিয়া ছিল। ব্যবসাও তাঁরা করতেন।

ইংরেজ আমল শুরু হওয়ার পরে দফ্‌তর ও আদালতের ভাষা ধীরে ধীরে ইংরেজি হয়ে যাবে এটা বুঝতে পেরেই বাঙালী ভদ্রলোকেরা সবার আগে ইংরেজি শেখা আরম্ভ করে দিলেন। ফলে, ভারতের বহু স্থানে আফিস-আদালতের চাকরী বাঙালী ভদ্রলোকদের প্রায় একচেটিয়া হয়ে গেল। সেই সময়ে তাঁরা অন্য প্রদেশের লোকদের সঙ্গে যারপরনাই দুর্ব্যবহার করেছেন এবং ঘৃণাও করেছেন তাঁদের। এই শতাব্দীর শুরুতে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চাকরী পেতে লাগলেন এবং আগেকার দুর্ব্যবহারের প্রতিদানে বাঙালী ভদ্রলোকেরাও তাঁদের নিকট হতে পেতে লাগলেন ঘৃণা ও দুর্ব্যবহার। তাই শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের ভিতরে হতাশা ছেয়ে গেল।

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পরে যে-'বঙ্গদেশ' থেকে গেল তাতে বাঙালীরা হয়ে পড়লেন সংখ্যাল্প সম্প্রদায়। "উড়িষ্যা বিহার বঙ্গ ত্রিদেশ ঈশ্বর" ছিলেন

আলীবর্দী খান। ইংরেজ আমলে এই তিনটি দেশই ছিল 'বঙ্গদেশ'। লর্ড কার্জন এই বঙ্গদেশকেই ভেঙেছিলেন। তাঁর সৃষ্টি 'পূর্ববঙ্গ ও আসামে' ছিল মুসলিম সংখ্যাধিক্য। কাজেই সে প্রদেশে মুসলিমরাই পেতে লাগলেন বেশী বেশী চাকরী। এটাও ছিল ভদ্রলোক শিক্ষিত যুবকদের হতাশার আরও একটি কারণ।

হতাশা হতেই সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হয়। শিক্ষিত বাঙালী 'ভদ্র' যুবকদের মন বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং তাঁরা পথ বেছে নিলেন সন্ত্রাসের। শুরু করলেন বোমা বানানো, জোগাড় করতে লাগলেন আগ্নেয়াস্ত্র (পিস্তল ও রিভলবার), তাঁদের উদ্দেশ্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ইংরেজ শাসকদের দেশ হতে তাড়াবেন। ইংরেজের ভারতীয় অনুচরদেরও উচিত শিক্ষা দিবেন।

এইভাবে আরম্ভ হলো 'ভদ্র' যুবকদের বিপ্লবান্দোলন। এই আন্দোলনের ফিলসফি হলো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অনন্দমঠ' এবং অন্যান্য লেখা। তাই এই বিপ্লব আন্দোলন হলো হিন্দু পুনরুত্থানের আন্দোলন।

ব্যারিস্টার মিস্টার পি· মিত্র প্রভৃতির উদ্যোগে 'অনুশীলন সমিতি' নামে বিপ্লবী সংগঠন স্থাপিত হয়েছিল। এই সমিতি পরে খণ্ডিত হয়েছিল। অখণ্ডিত সমিতির একটা নিয়ম ছিল ঃ

"No one is to be admitted who is a non-Hindu or who has any spite against the Hindus."

("হিন্দু নয় কিংবা যার ভিতরে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষ আছে এমন কোনো ব্যক্তিকে [সমিতিতে] ভর্তি করা হবে না।")

মুসলমানদের নামোল্লেখ করে 'অনুশীলন সমিতি'র একটি অনুশাসন ঃ

"Exclusion of Mahomedans"

*   *   *

"So far as can be foreseen, it is our firm belief that within a year or two the entire Mahomedan nation will become submissive to the Hindus. But if the Hindus then abandon their firmness and national glory, and sink so low as to court friendship with the Mahomedans by being hand in glove with them, the Mahomedans will be puffed up and no good but only evil will be brought about. That nation which cannot preserve its national glory, national greatness and dignity, and national firmness, steadfastness and pride, and on the contrary exhibits levity, baseness and waywardness can never be respected and worshipped by other nations. But in no circumstances would it be proper to show hostile feelings towards, to deal unjustly with Musalman as a nation."

"আমরা যতটা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারছি তা থেকে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় এই জন্মেছে যে এক বা দুই বৎসরের ভিতরে সমগ্র মুসলিম জাতি হিন্দুদের বশীভূত হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরে যদি হিন্দুরা তাঁদের দৃঢ়তা ও জাতীয় গৌরব পরিত্যাগ করে এবং মুসলমানদের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব করে তাদের বন্ধুত্ব যাচনা করার মতো অধঃপাতে যায় তাতে মুসলমানদের বাড় বেড়ে যাবে, আর তা থেকে ভালো কিছু তো বা'র হয়ে আসবেই না, শুধু মন্দই ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। যে জাতি তাদের জাতীয় গৌরব, জাতীয় মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, আর, জাতীয় দৃঢ়তা, অচল অটল ভাব ও অহঙ্কারেব সংরক্ষণ করতে পারে না, পক্ষান্তরে, চপলতা, হীনতা ও অবাধ্যতা প্রদর্শন ক'রে বেড়ায় সে জাতি কখনও অন্য জাতিদের দ্বারা সম্মানিত ও পূজিত হতে পারে না। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই জাতি হিসাবে মুসলমানদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব দেখানো ও লেনদেনে অবিচার করা উচিত হবে না।"

James Campbell Ker, I.C.S. : (Political Trouble in India 1907-17, Printed in Calcutta, 1917.)

এই অনুশীলন সমিতিতে পি· মিত্র তো ছিলেনই, আরও ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি। আরও কম বয়সের সভ্যদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরবর্তীকালের মানবেন্দ্রনাথ রায়) ও তাঁর বন্ধুরা ছিলেন। পুলিন-বিহারী দাস তাঁর 'আত্মকথা'য় উল্লিখিত অনুশাসনদ্বয়ের প্রথমটির কথা, অর্থাৎ সমিতিতে অ-হিন্দুর প্রবেশ নিষেধের কথা স্বীকার করেছেন। 'মুস্লিম বর্জন' সম্বন্ধে কিছু বলেননি। বোধ হয় বৃদ্ধ বয়সে কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ করেছিলেন।

আরও একজন 'বিপ্লবী' তাঁর 'স্মৃতিকথা' লিখেছেন। তাতে তিনি কথা তুলেছেন যে মুসলমানরাও আলাদা দল বা গ্রুপ গঠন করলেন না কেন? এ কথা আমার এই পুস্তকের বিষয়বস্তু নয় এবং প্রশ্নও তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেননি। তবু তাঁকে আমি অনুরোধ করব যে বর্তমান শতাব্দীর আগে সংঘটিত ঘটনাবলীর প্রতি তিনি কিঞ্চিৎ নজর দিন। যাঁদের হাত হতে ইংরেজ ক্ষমতা দখল করেছিলেন তার প্রতিদানে তাঁরা কি ইংরেজকে বুকে চেপে ধরেছিলেন? এটা কি কখনও সম্ভব? তবে, তাঁরা সন্ত্রাসের পন্থা অবলম্বন করেননি।

কী ভালোই না হতো যদি 'ভদ্রলোক' বিপ্লবীরা সেই প্রথম যুগ হতেই নিজেদের 'জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী' বলে পরিচয় দিয়ে যেতেন। তাহলে আজ আমায় এখানে তাঁদের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু লিখতে হতো না। আসলে তাঁরা তো জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীই ছিলেন। কাজ করার বৈধ সংগঠন ছিল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। উনিশ শ' বিশের দশকের মাঝামাঝিতে তাঁরা যে সংগঠন গড়েছিলেন তার নাম ছিল "কংগ্রেস কর্মী সঙ্ঘ"। এই সংগঠন আমাদের বিরুদ্ধে অনেক প্রচার করেছে।

১৯৩১ সালের জুন মাসে মীরাটের দায়রা আদালতে আসামীরূপে আমি যে বিবৃতি দিয়েছিলেম তাতে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সম্বন্ধেও কিছু বলেছিলেম। তারপরে ৩৮ বছর গত হয়েছে। অবস্থারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ে তার সমাপ্তিও হয়েছে। এই আন্দোলন এখন ঐতিহাসিক আলোচনার ও বিশ্লেষণের

বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এখন এর ওপরে থিসিস লিখে 'ডক্টরেট' লাভ করতে পারেন। হয়তো আমি জানি না, ইতোমধ্যে কেউ 'ডক্টরেট' পেয়েও থাকতে পারেন।

কিন্তু একটা বড় মুশকিল হয়েছে এই যে 'সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী'রা আজও মনে করেন তাঁরাই "একমাত্র বিপ্লবী", তাঁরা ছাড়া আর কেউ বিপ্লবী নন। তাঁরা যে পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তাতে তাঁদের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নামই দেওয়া যায়। আমার লেখায় আমি এই কথা ব্যবহার করি। অন্য শত শত লোক তাই লেখেন। নিজেদের 'একমাত্র বিপ্লবী' বলা গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন তাঁরা বৃদ্ধ হয়েছেন, একদিন তাঁদের সকলেই মরে যাবেন, তখন দেশে কি কোনো জীবিত বিপ্লবী থাকবেন না? "বিপ্লবী" কথাটি কি শুধু তাঁদের স্মৃতিতেই ব্যবহার করতে হবে? তাঁরা ভাবছেন, তাঁদের 'হেয়' প্রতিপন্ন করার জন্যেই তাঁদের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী বলা হচ্ছে। আসলে তাঁরা "বিপ্লবী"। ক'বছর আগে কমরেড আবদুর রজ্জাক খানের একটি লেখা পড়েছিলেম। তাঁর ভাষা আমার মনে নেই। আমার ভাষাতেই তাঁর কথা এখানে বলছি। তিনি বলেছেন, 'মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বিপ্লবী পার্টিতে ছিলেন না, অমনি কমিউনিস্ট হয়েছিলেন'। তার অর্থ কি এই নয় যে কমিউনিস্টরা বিপ্লবী নন।

বিপ্লবী কা'রা? যাঁরা কোনো শোষিত শ্রেণীর পক্ষ থেকে পুরানো শোষক সমাজকে ভেঙে দিয়ে তার জায়গায় সুন্দরতর, উন্নততর ও জটিলতর সমাজের প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সংগ্রাম করেন তাঁরাই বিপ্লবী। এই বিপ্লবের দ্বারা স্থাপিত সমাজে জনগণ ক্ষমতার অধিকারী হবেন, অতএব শোষণ থাকবে না। সামাজিক পরিবর্তন কিছু হলো না, অথচ কিছু সংখ্যক লোকের জায়গায় অন্য কিছু সংখ্যক লোক এসে ক্ষমতায় বসল, এটা বিপ্লব নয়। মুসোলিনী ও হিটলারের ক্ষমতা দখল বিপ্লব ছিল না, ছিল প্রতিবিপ্লব। ভারতবর্ষে বিপ্লব হয়নি। সমঝতার ভিতর দিয়ে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম ইন্‌ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও মুস্‌লিম লীগকে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করে গেছেন। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান এখনও ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ্‌ অফ নেশন্‌সের সদস্য।

অনুশীলন সমিতির অনুশাসন লিখিত হওয়ার পরে অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় কেটে গেছে। তাঁদের আন্দোলনও বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আন্দোলন চালু থাকার সময়েও তাতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৯৩০ সালের চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণের কার্যক্রম সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছিল না। একটি বড় ইলাকা দখল করার প্ল্যান ও প্রোগ্রাম তাঁদের ছিল। নিজেদের নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বালেশ্বরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সাথীরা সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে দেশের বিপ্লবীদের সম্মুখে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রোমাঞ্চ ছিল, দেশের জন্য একটা প্লাটোনিক প্রেমও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের ভিতরে বেড়ে উঠেছিল। তাঁরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক হওয়ার কারণে তাঁদের জন্যে বাইরে প্রচারও অনেক বেশী হয়েছিল। এইসব কারণে তাঁরা নির্ভীকভাবে ও অকাতরে প্রাণ বলি দিতে পেরেছেন। এই বলীদানকে কে শ্রদ্ধা না করে পারেন? এই বলিদানকে আমি বারবার শ্রদ্ধা করেছি এবং আজও করি।

পুরানো সন্ত্রাসবাদী 'বিপ্লবী'দের নিকটে আমার আবেদন এই যে তাঁরাই 'একমাত্র বিপ্লবী' এই ধারণা তাঁরা ত্যাগ করুন। আসলে তা হতে পারে না, একেবারে হাস্যকর ধারণা এটা। বহু দিন হতে লোকেরা তাঁদের 'বিপ্লবী' বলে

ব'লে একটি ধারণা বহু সংখ্যক লোকের মনে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছে। 'বিপ্লবী' শব্দটি বিপ্লবী মাত্রেরই ওপরে প্রযুক্ত হবে, কিছু সংখ্যক লোকের জন্যে একচেটিয়া মার্কা দিয়ে এই শব্দটিকে আলাদা ক'রে রাখা চলবে না। অভিধানে এমন ব্যবস্থা হয় না।

কোনো হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনো শিক্ষিত মুসলমানের দেখা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন 'আপনি ভদ্রলোক, না, মুসলমান'? এই রকম কোনো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীর সঙ্গে কোনো কমিউনিস্টদের দেখা হলে তিনি কি জিজ্ঞাসা করবেন যে "আপনি 'বিপ্লবী', না, কমিউনিস্ট"? একটি কথা আজকাল আমি ভাবছি। কারাগারে ও বন্দী-নিবাসে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অধ্যয়ন করে যে-সকল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন (সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের ভিতরে তাঁরাই শুধু আজ রাজনীতিতে সকর্মক) তাঁরা কি ভেবেছিলেন যে তাঁরা আর বিপ্লবী থাকলেন না? দেশ তাঁদের নিকট হতে এ কথার জওয়াব প্রত্যাশা করেন।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অর্থাৎ ন্যাশনালিস্ট রেভোলিউশনারীদের একটি কথা বলতে চাই। তাঁদের ত্যাগ ও বলিদানের স্বীকৃতি যখন তাঁরা দেশবাসীদের নিকট হতে পেয়েছেন এবং আজও প্রতিদিন পাচ্ছেন তখন তাঁদের মনে বিক্ষোভের আর কি থাকতে পারে। এর পরবর্তী ব্যাপার তাঁদের ইতিহাসের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। ইতিহাসই নির্ণয় করবে তাঁরা 'একমাত্র বিপ্লবী' কিনা।

তাঁদের ভিতরে অনেকে পুরানো দিনের 'স্মৃতিকথা' লিখছেন। 'স্মৃতিকথা' লেখা ভালো। এ সব 'স্মৃতিকথা' হতে ভবিষ্যতের ইতিহাস লেখকেরা ইতিহাসের অনেক মাল-মসলা পেয়ে যাবেন। তবে শুনেছি কিছু কিছু 'স্মৃতিকথা' নাকি অতিরঞ্জিত। ক'বছর আগে আমি একবার কলকাতার "কালীঘাটের তরুণ সংঘের" বার্ষিক সভায় যোগ দিয়েছিলেম। সেখানে কমরেড গণেশ ঘোষের সঙ্গে ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের কথাবার্তা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। ডক্টর সেন কমরেড গণেশ ঘোষকে বলছিলেন যে এই 'স্মৃতিকথা'গুলি এত অতিরঞ্জিত গল্পে ভরা যে কোনো ঐতিহাসিকই সে সব হতে সত্য ঘটনা বা'র করতে পারবেন না। তাঁর কথা শুনে আমি নিজের মনে বড় ভয় পেয়েছিলেম। কারণ, 'স্মৃতিকথা' লেখার জন্যে তখন আমার মনে বাসনা জেগেছিল। তারপরে অবশ্য আমি ভয়ে ভয়ে "কাজী নজরুল ইস্‌লাম ঃ ঃ স্মৃতিকথা" লিখেছি, আর এখন এই লেখায় ব্যাপৃত রয়েছি।

এম. এন. রায়ের বহিষ্কার

Muzaffar Ahmad,
64-A Lower Circular Road,
Calcutta-16.

Dear Comrade,

My brother has sent on to me your letter of March 1 and has told me what he has replied to you about M. N. Roy.

As regards Roy's expulsion, I do not think that your letter had anything to do with it. By the end of 1927, Roy had already come under heavy criticism for his policy and actions in China, during that year. Then came his discrediting in connection with India. Apart from the decolonisation theory, he was attacked, firstly, because he had given what were regarded as exaggerated reports about the strength of the Communist Party in India and his influence there and, secondly, because he was attempting to build a Workers and Peasants Party as a kind of alternative to the Communist Party. I saw him in Germany after the Sixth Congress, when he emphatically expressed his disagreement with the VI Congress decisions on India. Adhikary was present and should be able to tell you much more than I can. In particular, Roy answered the criticism that it was wrong to form a political party on a 2-class basis by saying that what was required in India was not merely a 2-class party but a multi-class Party.

প্রিয় কমরেড,

আমার ভাই আপনার ১লা মার্চ তারিখের পত্রখানি আমায় পাঠিয়েছে এবং একথাও সে আমাকে বলেছে যে এম· এন· রায় সম্বন্ধে সে আপনাকে কি উত্তর দিয়েছে।

*　　　　*　　　　*

রায়ের বহিষ্কার বিষয়ে,—আমি মনে করি না যে আপনার পত্রে কোনো সংস্রব সে ব্যাপারে আছে। ১৯২৭ সালে চীনে অবলম্বিত রায়ের নীতি এবং কাজ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সেই বছরেই শেষের দিকে সুতীব্র সমালোচনা হচ্ছিল। তারপরে তিনি হলেন ভারত সম্পর্কে অপমানের একশেষ। তাঁর ডিকলোনিজেশনের (অ-উপনিবেশিকরণের) থিয়োরির কথা বাদ দিলেও, তাঁর ওপরে আক্রমণ এসেছিল প্রথমত তিনি যে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি সম্বন্ধে এবং সে দেশে তাঁর প্রভাব সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন সেই জন্যে। দ্বিতীয়ত, কমিউনিস্ট পার্টির পরিবর্তন হিসাবে তিনি ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্ট্স পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ষষ্ঠ কংগ্রেসের১ অধিবেশনের পরে আমি রায়ের সঙ্গে জার্মানীতে দেখা করেছিলেম। তখন তিনি খুব জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন যে ষষ্ঠ কংগ্রেসের ভারত বিষয়ক সিদ্ধান্তে তিনি একমত নন। অধিকারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি যা বলতে পারি তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁর বলতে পারা উচিত। দু' শ্রেণীর ভিত্তিতে রাজনীতিক পার্টি গঠন করার ভুল কাজ করা নিয়ে রায়ের যে সমালোচনা হয়েছিল তার উত্তরে বলেছিলেন যে ভারতে শুধু দু'শ্রেণীর ভিত্তিতে নয়, বহু শ্রেণীর সমবায়ে রাজনীতিক পার্টি গঠন করা উচিত।

ওপরে উদ্ধৃত পত্রাংশ সি· পি· দত্তের (ক্লেমেন্স পাম দত্তের) আমাকে লেখা একখানি পত্র। তার শেষাংশ আমি এখানে দিইনি। সি· পি· দত্ত বিখ্যাত আর পি দত্তের অগ্রজ, তাঁর চেয়ে বয়সে দেড় কিংবা দু'বছরের বড়। তিনি বহুভাষাবিদ, মার্কসীয় পণ্ডিত এবং মস্কো হতে প্রকাশিত লেনিন-স্তালিনের গ্রন্থাবলীর এবং আরও বহু গ্রন্থের তিনিই সম্পাদন করেছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (প্রবাসী) ফরেন ব্যুরোর তিনি একজন সভ্য ছিলেন। একারণে এম· এন· রায়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল। রায়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি তাঁর পত্রে খুব সংক্ষেপে বিবৃত হলেও সমস্ত অভিযোগ তাতেই দেওয়া হয়েছে।

রায়ের ব্যাপারে আর· পাম দত্ত আমাকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন তাও আমি নীচে ছেপে দিচ্ছি ঃ

---

১ ১৯২৮ সালের ২৭শে জুলাই হতে ২৮শে আগস্ট পর্যন্ত মস্কোতে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল।

Muzaffar Ahmad,
64-A Lower Circular Road,
Calcutta-16, India.

Dear Comrade Muzaffar Ahmad,

I have received your letter of March Ist for Clemens and am sending it on to him. He will be very glad to hear from you. His present address is :

15, Highlands Avenue, Leatherhead, Surrey, England.

With regard to M. N. Roy and his break with the Communist International the facts known to me are as follows. At the Sixth Congress of the C. I., Roy was severely criticised for his theory of "de-colonisation", i. e., that imperialism voluntarily renounces power. Roy himself was absent during the Congress in Berlin for an operation on the inner ear. In this controversy and criticism I was partially involved, because in my book "Modern India" I had originated the theory that imperialism after the first world war was preparing to enter on a new stage of intensified exploitation and domination of India through a measure of industrialisation, as outlined in the Industrial Commission's Report, together with a corresponding political alliance with the Indian bourgeoisie as a junior partner, expressed in the system of dyarchy. This theory was incorrect insofar as it assumed the possibility of a measure of industrialisation under imperialism. It was this theory which was subsequently developed and distorted by Roy into his fantastic theory of de-colonisation to which I was from the outset strongly opposed.

I had been originally invited by the Executive of the C. I. to give the report on the colonial question at the 6th Congress, but was compelled by reasons of health to decline. It was then arranged that Comrade Kuusinen should give the report on the colonial question. After the Congress Roy visited me in Brussels. He was furious with the criticism he had received and stated that he had entered into an international fraction with the right-

wing Brandlerite opposition in Germany and Doriot in France to fight the C. I. leadership. He invited me to join this fraction. I informed him that I considered the criticism and line of the 6th Congress to be correct, and that if he had entered into such an anti-Communist fraction I wished to have no further dealings with him. This was the last time that I saw Roy, with whom I had previously worked closely.

On the other questions you raise Clemens will no doubt be able to help you.

It was a great pleasure to hear from you and to see such lively evidence from your letter that you are still full of life and political interest in the fight. You may be sure that I send you the warmest good wishes for your health and well-being.

With comradely greetings,

Your fraternally,
R. Palme Dutt.

বঙ্গানুবাদ

মুজফ্ফর আহ্মদ
৬৪-এ লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলকাতা-১৬
ইনডিয়া।

প্রিয় কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ,

ক্লেমেন্সকে লেখা আপনার ১লা মার্চের পত্র আমার হাতে পৌঁছেছে এবং আমি তাকে তা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তার বর্তমান ঠিকানা ঃ

১৫, হাইল্যান্ডস এভেনিউ
লেদারহেড, সারে, ইংল্যান্ড

এম· এন· রায় ও তাঁর কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির বিষয়ে আমি যে ঘটনাগুলি জানি সেগুলি হচ্ছে এই ঃ কমিউনিস্ট ইন্টার-ন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসে রায় কঠোর ভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। তিনি যে ডিকলোনিজেশনের (অ-উপনিবেশিকরণের) থিয়োরি উপস্থিত করেছিলেন, যার মানে ছিল সাম্রাজ্যবাদ স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দিবে, তার জন্যেই ছিল এই সমালোচনা। রায় নিজে কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন না, বার্লিনে ছিলেন তাঁর অন্তঃকর্ণে অপারেশনের উপলক্ষে। এই বিতর্ক ও সমালোচনার মধ্যে অংশত আমিও এসে পড়েছিলাম। কেননা, আমার পুস্তক "মর্ডান ইন্ডিয়া"তে আমি একটি থিয়োরি দাঁড় করিয়েছিলেম যে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে শিল্পায়নের ভিতর দিয়ে অত্যুগ্র শোষণ ও শাসনের একটি নূতন স্তরে পৌঁছানোর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। এটা শিল্প কমিশনের রিপোর্টে রেখায়িত হয়েছে, আর সঙ্গে আছে ভারতীয় বুর্জুআরা যে ছোট তরফ হবে তার রাজনীতিক সমঝোতা যা দ্বৈত শাসনের (ডায়ার্কির) মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই থিয়োরির ততটুকু ভুল

ছিল যতটুকুতে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদের অধীনেও শিল্পায়ন সম্ভব। এই থিয়োরিকেই পরে উন্নত ও বিকৃত করে রায় তাঁর ডি-কলোনিজেশন থিওরির আকাশ কুসুম রচনা করেছিলেন। শুরু হতেই আমি এই থিওরির বিরুদ্ধে ছিলাম।

গোড়ায় কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের কার্যনির্বাহক কমিটি আমাকেই ষষ্ঠ কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক প্রশ্নের ওপরে রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে আহ্বান করেছিলেন। আমার স্বাস্থ্য খারাপ ছিল ব'লে আমি অস্বীকার করি। তখন সিদ্ধান্ত হয় যে কমরেড কুশিনেন (Kuusinen) এই প্রশ্নের ওপরে রিপোর্ট দিবেন। কংগ্রেসের পরে রায় ব্রুসেল্‌স এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে যে সমালোচনা করা হয়েছে তার জন্যে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে বলেন যে তিনি জার্মানীর দক্ষিণপন্থী ব্রান্ডলারের ও ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থী ডরিওটের আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র দলে যোগ দিয়েছেন। উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করা। তিনি এই ক্ষুদ্র দলে যোগদানের জন্যে আমাকেও আহ্বান করেন। আমি তাকে বলি, ষষ্ঠ কংগ্রেসের সমালোচনা ও কার্যপ্রণালী (line) আমি সঠিক ব'লে মনে করি এবং আরও বলি যে তিনি যদি এই রকম একটি কমিউনিস্ট-বিরোধী আন্ত-র্জাতিক ক্ষুদ্র দলে যোগদান করে থাকেন তবে তাঁর সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ না থাকাই ভালো। সেই ছিল রায়ের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তার আগে তাঁর সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি।

অন্য যে-সকল প্রশ্ন আপনি তুলেছেন সে ব্যাপারে ক্লেমেন্স নিঃসন্দেহে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

আপনার খবর পেলে বড় আনন্দ হয়। আপনার পত্র হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে আপনি এখনও প্রাণপূর্ণ এবং জীবন সংগ্রামে আপনার রাজনীতিক আকর্ষণ এখনও অটুট। আপনার স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে আমি আমার গভীর শুভ কামনা জানাই।

কমরেডের অভিবাদন সহ
আর· পাম দত্ত

এম· এন· রায়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির মধ্যে একটি অভিযোগ এই ছিল যে তিনি ভারতবর্ষের কাজ সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত রিপোর্ট কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের নিকটে দাখিল করেছেন। কি রিপোর্ট তিনি দাখিল করেছিলেন তা আমরা জানিনে। এটা সত্য কথা যে তাঁর রিপোর্ট আমাদের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত হয়নি। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর মনঃকল্পিত রিপোর্ট দাখিল ক'রে থাকবেন। নিশ্চয়ই আমরা তখন বড় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে পারিনি। আমাদের ক্ষমতায় কুলায়নি। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন তাও তাঁর নিজের রিপোর্ট,—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কিংবা পেজান্‌ট্‌স এন্ড ওয়ার্কার্স পার্টি অফ বেঙ্গলের নয়। তিনি এদেশ থেকে কোনো রিপোর্ট নিয়ে যাননি, কোনো পার্টির সঙ্গে কোনো পরামর্শ করেও যাননি যে কি রিপোর্ট তিনি দিবেন। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টিতে মাত্র ডজনখানেক সভ্য ছিলেন এটা সৌম্যেন্দ্রনাথের মিথ্যা রিপোর্ট। তবে, আমাদের পার্টি ছোট পার্টি ছিল। সৌম্যেন্দ্রনাথও সেই পার্টির সভ্য ছিলেন। আমার তাঁকে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য করার বিশেষ উৎসাহ ছিল না। জানকীপ্রসাদ বাগেরহাট্টাই তাঁকে জোর করে মেম্বর করেছিল। বিদেশে যাওয়ার আগে তাঁকে কমিউনিস্ট পার্টির হেড কোয়ার্টার্স বোম্বেতে ডাকা হয়েছিল। তিনি যাননি। অতুলচন্দ্র গুপ্ত বেঙ্গল

পেজান্ট্স এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ছিলেন। তাঁর নামে একখানা পরিচয়পত্র জাল ক'রে তাই নিয়ে ইউরোপে চলে গিয়েছিলেন।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নলিনী গুপ্তের জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯২১ সালে নলিনী যখন এম· এন· রায়ের কুরিয়ের হয়ে এদেশে আসে তখন তার মনে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল যে রায়ের সিংহাসনে সে বসবে। নিজে লেখাপড়া তো তেমন জানত না, তাই রামচন্দ্র ভট্টাচার্য নামক একজনের ওপরে ভরোসা করে এসেছিল। ১৯২৭ সনে নলিনী যখন আবার ইউরোপে গেল তখন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনেক শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে গেল। সৌম্যেন্দ্রনাথ সুশিক্ষিত ও সুদর্শন যুবক ছিলেন। নলিনী ভেবেছিল যে তাঁর ওপর সে ভরোসা করতে পারবে। নলিনীর জালে জড়িয়ে পড়ে সৌম্যেন্দ্রনাথ একসঙ্গে অনেকগুলি ভুল করেছিলেন। যাক, এম· এন· রায় অনেক আগে হতেই প্রায় কাৎ হয়েছিলেন। তাঁর শূন্য সিংহাসনে অন্য কারুর বসার কোনো কথাই ওঠেনি। আর, নলিনীর উচ্চাকাঙ্ক্ষাও কোনো দিন কার্যে পরিণত হতে পারত না।

আসল কথা হতে আমি অনেক দূরে সরে এসেছি। চীনের ব্যাপার নিয়ে আমি এখানে কোন আলোচনা করব না। রায় যে সে দেশে ভুল করেছিলেন সেটা সর্বত্র স্বীকৃত। ভারতের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত অসাধুতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যত বাজে লোকেদের সঙ্গে তিনি চিঠি-পত্রের মারফতে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। সেই লোকেরা সৎ, না, অসৎ সে খবর তিনি নেওয়ার কোনো চেষ্টাই করেননি। তাই জানকীপ্রসাদ বাগেরহাট্টার মতো লোকেরা অনায়াসে আমাদের আন্দোলনে প্রবেশ লাভ করতে পেরেছিল।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনে যাঁরা এম· এন· রায়ের সহকর্মী ছিলেন তাঁদের বিশিষ্ট কয়েকজনের সঙ্গে আমার পরিচয় ও কথাবার্তা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন এম· এন· রায় জোরালো সহজ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে কাজে নামিয়েছিলেন তিনিই। যতীন্দ্রনাথ ঠিকাদারীর কাজ আরম্ভ করেছিলেন।

১৯২৩ সালে শ্রীসরস্বতী প্রেস থেকে 'সারথি' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বা'র হয়েছিল। তাতে শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনী লিখছিলেন। এই জীবনীতে লেখা হয়েছিল যে ১৯০৫ সালে মানবেন্দ্রনাথ রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন। বিশেষ অনুসন্ধান ক'রে জানা গেছে যে এনট্রান্স ফেলকরা নরেন্দ্রনাথ অন্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর শিক্ষা তিনি স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে স্থাপিত ন্যাশনাল কলেজে লাভ করেছিলেন। কিন্তু সে সব কলেজে তেমন বিদ্যার্জন কেউ করতেন না। বিদেশে গিয়ে তিনি কঠোর পরিশ্রম করে বিদ্যার্জন করেছিলেন, একজন নামকরা ইংরেজি লেখক হয়েছিলেন, এমন কি অঙ্কশাস্ত্রও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। আমার ভাবতে অবাক লাগে যে এত করে নিজেকে যিনি বিপ্লবের কাজের জন্যে প্রস্তুত করলেন সেই তিনি কি করে সেই বিপ্লবের টাকা আত্মসাৎ করলেন? মানবেন্দ্রনাথ রায় ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্যে এবং বিপ্লবের কাজ পরিচালনার উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের তহবিল হতে তুলেছেন। ১৯২২ সালের একবারের একটি অঙ্কের পরিমাণ ছিল ১২০,০০০ পাউণ্ড, আমাদের ভারতবর্ষে সে অঙ্কের তখনকার বিনিময় মূল্য ছিল আঠারো লক্ষ টাকা। এই সংবাদ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নিকটে পৌঁছানোর পরে সেক্রেটারি অফ্ স্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া কিছুটা ভয় পেয়ে ভারত গবর্নমেণ্টকে

লিখলেন। উত্তরে ভারত গবর্নমেণ্ট লিখলেন যে ভারতবর্ষ অত্যন্ত বড় দেশ, এত বড় দেশের পক্ষে আঠারো লক্ষ টাকা কিছুই নয়। দেখতে দেখতে তা খরচ হয়ে যাবে। আরও ক'বার তিনি মোটা টাকা পেয়েছেন। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে তিনি এভেলিনকে লিখেছিলেন যে "almost unlimited funds have become available" (প্রায় অসীম তহবীল পাওয়া গিয়েছে)। এই উদ্ধৃতি রায়ের নিজের লেখা হতে নেওয়া হয়েছে।

এত যে টাকা পেয়েছিলেন তা থেকে কি পরিমাণ টাকা তিনি ভারতে পাঠিয়েছিলেন? ১৯২৪ সালে আমি জেলে ছিলেম। আমার সঙ্গে লিপ্ত যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁদের তিনি এক পয়সাও পাঠাননি। যত সব বাজে লোকের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছেন, বাজে লোকদেরই তিনি টাকা-কড়িও পাঠিয়েছেন; তবুও সব মিলিয়ে দু'লক্ষ টাকাও কি তিনি ভারতে পাঠিয়েছিলেন? নিশ্চয় পাঠাননি। আমি জানি, বিদেশ হতে সাহিত্য প্রচার করতে অনেক খরচ হয়েছে এবং সে প্রচারের একান্ত প্রয়োজনও ছিল। বিদেশে তাঁর কর্মীদের খাওয়াতে-পরাতেও প্রচুর খরচ হয়েছে। শুনেছি বার্লিনে থাকার তাঁর অনুমতি ছিল না। এ জন্যে তিনি জুরিখে থাকতেন। কাজের জন্যে বার্লিনে আসলে খুব দামী হোটেলে তাঁকে থাকতে হতো। কিছু কিছু ভারতীয় ছাত্র তাঁকে এই জন্যে সমালোচনা করতেন। এই সব কিছু স্বীকার করেও আমাকে বলতে হচ্ছে যে পার্টির টাকা-কড়ির ব্যাপারে তিনি চরম অসাধুতার পরিচয় দিয়েছেন। একটি বিরাট দেশের আন্দোলনের নেতৃত্বে যিনি রয়েছেন তিনি যদি আর্থিক ব্যাপারে অসাধু হন তবে সে দেশে আন্দোলন কি কখনও গড়ে উঠতে পারে?

এম. এন. রায়ের সাহিত্য প্রচারের ভিতর দিয়ে আমাদের দেশে আন্দোলনের অনেক উপকার হয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর খ্যাতিও বেড়েছে। কিন্তু এম. এন. রায়ের অবিবেচনা ও অর্থলোভের জন্যেই দেশে বড় পার্টি গড়ে উঠতে পারল না। তিনি কাউকে চিনতেন না। তাঁর পক্ষে চেনার কোনো সুবিধাও ছিল না। তবুও বিদেশে বসে তিনি কর্মী নির্বাচন করতেন। অন্য অনেকের কথা ছেড়েই দিলাম, বড় বড় তিন জনের কথা আমি আগেই বলেছি। তাঁরা হলেন এস. এ. ডাঙ্গে, সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার ও রামচরণলাল শর্মা। গয়া কংগ্রেসে সিঙ্গারাভেলুর বক্তৃতা হতেই তাঁর সম্বন্ধে এম. এন. রায়ের মনে প্রশ্ন জাগা উচিত ছিল। সেই প্রশ্ন তো তাঁর মনে জাগলই না, সামান্য ব্যক্তি আমি যে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করলাম তাতেও তিনি আমায় লিখলেন যে, "আপনি ভুল করেছেন। সিঙ্গারাভেলু খুব ভালো লোক, ইত্যাদি।" কানপুর মোকদ্দমার এক্‌জিবিটে এই পত্র আছে। পরে তিনি এই সিঙ্গারাভেলুকেই বললেন, ভীরু কাপুরুষ।

ডাঙ্গেকে পেয়ে তাঁর সে কি আনন্দ। চার্লস্ আশলী বার্লিনে ফিরে গিয়ে ডাঙ্গের বিষয়ে এভেলিন রায়ের নিকটে রিপোর্ট করার পরে সঙ্গে সঙ্গেই সে খবর মস্কোতে পেয়ে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। মস্কো হতেই ডাঙ্গেকে পত্র লিখলেন, বললেন ডাঙ্গে ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা। সেই ডাঙ্গে যখন প্রতিনিধিদের রাহাখরচের মোটা টাকাটা মেরে দিলেন, কোনো ডেলিগেট গেলেন না মস্কোতে, তখন তিনি তো চিনলেন ডাঙ্গেকে। তারপরেও কেন তিনি যোগাযোগ রাখলেন ডাঙ্গের সঙ্গে, কেন তিনি জানিয়ে দিলেন না ডাঙ্গের কথা অন্য কমরেডদের?

রামচরণলালের কথা আগে আমি এই পুস্তকে লিখেছি। কেন তিনি তাঁর

সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করলেন, আর কেনই বা তিনি মুহম্মদ আলীকে তাঁর নিকটে পাঠালেন?

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কী ক্ষতিই না এম. এন. রায় ক'রে গেছেন!!

একজন আমেরিকান যুবতী, এভেলিন ট্রেণ্টকে রায় বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু এভেলিন শুধু তাঁর স্ত্রী ছিলেন না, কমিউনিস্ট আন্দোলনে তাঁর সহ-কর্মিণীও ছিলেন। ভারতের জন্য তিনিও অনেক লিখেছেন ও অনেক খেটেছেন। প্রথম যে-সাত জনকে নিয়ে ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে তাশকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল এভেলিনও তার একজন। জার্মানী ও প্যারিস হতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যে-সব সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে সে-সব এভেলিনের অবদানে ভরা। আমরা যতটা দেখতে পাচ্ছি তাতে ১৯২৫ সালের শেষ ভাগে (আগস্ট মাসে?) তাঁর সঙ্গে এম. এন. রায়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এভেলিন রায় তাঁর দেশ ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে চলে যান। তারপরে ১৯২৬ সালের কোনো সময়ে এভেলিন জার্মানীতে এসে এম. এন. রায়ের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ করেন এবং alimony (বিবাহ-বিচ্ছেদের টাকা) হিসাবে রায়ের নিকট হতে দশ হাজার ডলার গ্রহণ করেন।

এভেলিন ট্রেণ্ট আমেরিকায় ফিরে গিয়ে বিবাহ করেন। শুনেছি তিনি দু'সন্তানের মা হয়েছেন এবং এখনও বেঁচে আছেন। রায় আর এভেলিনের ভিতর কি ঘটেছিল তা জানিনে। কিন্তু রায় যে তাঁর স্মৃতিকথা লিখেছেন তার কোথাও উল্লেখ নেই যে এভেলিন নামের একজন নারী কোনো দিন তাঁর জীবনে এসেছিলেন। হতে পারে তাঁদের দু'জনের মধ্যে একজনের প্রতি অন্য জনের বিতৃষ্ণা এসেছিল। এ রকম যে ঘটে বিদেশী সাহিত্যে তা পড়েছি, এদেশেও এমন ব্যাপার দেখেছি। এমনও হতে পারে যে এভেলিন সন্তান কামনা করেছিলেন, রায় তাতে রাজী ছিলেন না। তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ যে ঘটেছে তাতে কারুর কিছু বলার থাকতে পারে না। কিন্তু ইতিহাসকে অস্বীকার করার কোনো অধিকার এম. এন. রায়ের নেই। স্মৃতিকথাই যখন তিনি লিখেছেন তখন এভেলিনের নাম তাতে লেখা তাঁর অপরিহার্য কর্তব্য ছিল। আবার শুনেছি এভেলিনও নাকি এম. এন. রায়ের নামোচ্চারণ করেন না। তিনি তাঁর স্মৃতিকথা লিখেছেন, এমন কথা কারুর নিকট হতে শুনিনি। হয় তো এজন্যে লেখেননি যে তাতে এম. এন. রায়ের কথা তাঁকে লিখতে হবে। এম. এন. রায় কমিউনিস্ট পার্টি হতে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এভেলিন পার্টি হতে বহিষ্কৃতা হয়েছিলেন বলে কখনও শুনিনি। তাঁর জীবন হতে রায় চলে গেলেন বটে, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি তো থাকল। আমেরিকা ফিরে গিয়ে তিনি কি কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন? না যদি দিয়ে থাকেন তবে লোকে ভাববেন তিনি এম. এম. রায়ের জন্যেই শুধু কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। এই যদি অবস্থা হয় তবে যে তাশকন্দে ও মস্কোতে মুহাজির নবযুবকেরা তাঁকে যে এত মাসী ডেকেছিলেন সে সবই বৃথা হয়ে গেছে।

ডক্টর ডেভিড এন. ড্রুহে (David N. Druhe) তাঁর 'সোভিয়েত রাশিয়া এণ্ড ইণ্ডিয়ান কমিউনিজম' পুস্তকের ১১৯ পৃষ্ঠায় জর্জি আগাবেকভের 'দি রাশিয়ান সেকরেট টেরর' নামক পুস্তকের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন যে ১৯২৭ সালে OGPU এজেণ্ট ভারতীয় ফারুকী কমিনটার্নের উচ্চপদস্থদের নিকটে রিপোর্ট করেছিলেন যে এভেলিন রায় সত্য সত্যই একজন ব্রিটিশ এজেণ্ট।

আগাবেকভ OGPU-র ইস্টার্ন সেক্‌শনের প্রধান ছিল। পরে পালিয়ে গিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'দি রাশিয়ান সেক্‌রেট টেরর' নাম দিয়ে বই লেখে। এই পুস্তকে সে ফারুকীর সম্বন্ধে লিখেছে। বলেছে ফারুকী একজন ভারতীয়। কখন, কিভাবে তাকে OGPU-তে নেওয়া হয়েছে সে কথা আগাবেকভ কিছু লেখেনি। সে লিখেছে, ফারুকী অতিরঞ্জিত রিপোর্ট পাঠাত। মস্কো তা প্রায়ই বিশ্বাস করত না। একবার ফারুকীর ওপরে চটে গিয়ে মস্কো তাকে আফ্‌গানিস্তানে বদলী করেছিলেন। কিন্তু বার্লিনের অত্যন্ত প্রভাবশালী OGPU প্রধান গোল্ডস্টিন (Goldstein) ফারুকীকে খুব পসন্দ করতেন। তিনি মস্কোকে এমন জোর লিখলেন যে তাতে ফারুকীর আফ্‌গানিস্তানের বদলী বন্ধ হয়ে গেল। ভারতীয় ফারুকী কোথাকার কে ছিল কিছুই জানি না। তবে সে নাকি আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচিত লোক ছিল। আগাবেকভ তার পুস্তকের ১৯২ পৃষ্ঠায় লিখেছে ঃ

"The first intimation of the bad faith of the Indian Communist Roy came through Farouki. He suggested that Roy's wife, being an English woman, might be an English spy. When the suspicion was confirmed, Roy was separated from all political activity."

বঙ্গানুবাদ

"ভারতীয় কমিউনিস্ট রায়ের বিশ্বাসঘাতকতার প্রথম খবর ফারুকীর মারফতে এসেছিল। সে-ই প্রথম ইশারা করেছিল যে রায়ের স্ত্রী যখন একজন ইংরেজ নারী তখন তাঁর পক্ষে ইংরেজের চর হওয়া সম্ভব। যখন এই সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হলো তখন রায়কে তার রাজনীতিক কাজ-কর্ম হতে আলাদা করে দেওয়া হলো।"

এতটুকুও সন্দেহ নেই যে ফারুকীর সঙ্গে ওই দেশে ভারতের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের দেখা হয়েছিল। তাঁরাই এই রিপোর্ট ফারুকীকে দিয়ে করিয়েছিলেন। তাঁরাই এই মিথ্যা কথাটা বরাবর প্রচার করতেন। এভেলিন ব্রিটিশ নারী ও ব্রিটিশের চর একথা ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মুখে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। তিনি ১৯২৫ সালে দেশে ফিরেছিলেন। তারও অনেক আগে হতে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা এই প্রচার করতেন। এভেলিন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের মেয়ে। সে দেশেই জন্মেছেন ও লালিত-পালিত হয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে এখনও আমেরিকাতেই বাস করছেন। আর, যদি তিনি ইংরেজ মেয়েই হতেন তাতেই বা কি দোষ হতো। ইংরেজ মেয়ে হলেই কি তাঁকে কমিউনিস্টদের ব্যাপারে ইংরেজদের চর হতে হবে? তাছাড়া আগেই বলেছি যে এভেলিনের সঙ্গে ১৯২৫ সালে রায়ের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সপ্তম প্লেনামে রায় কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের এক্‌জেকিউটিব প্রেসিডিয়ামের সভ্য নির্বাচিত হয়েছিল। চীনে গিয়েছিলেন তার পরে। কাজেই ফারুকীর রিপোর্ট মিথ্যা।

মেয়েদের সম্পর্কে এম· এন· রায়ের ব্যবহারটা আমি কখনও বুঝতে পারিনি। জীবনে তিনি এভেলিনের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছেন। কিন্তু এভেলিনের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ১৯২৬ সালের ক্রাইস্টমাসের সময়ে

কিংবা তার কিঞ্চিত আগে মস্কোর হোটেল লক্সে একজন সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী জার্মান মেয়ের সঙ্গে এম. এন. রায়ের পরিচয় হয়। তাঁর নাম মিস্ এল. গেইসলার (Miss L. Geissler)। রায় তখন চীনে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। মিস্ গেইসলার কেন মস্কো এসেছিলেন তা জানিনে। কেউ কেউ বলছেন, রায়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে মিস্ গেইসলার চীনেও গিয়েছিলেন। একথা সত্য কিনা তা আমি বলতে পারব না। তবে, মিস্ গেইসলার চীন ও জাপান ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি রায়ের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের একজন যে হয়েছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। জার্মানীতে রায়ের বন্ধুদের কেউ কেউ এবং কিছু কিছু পরিচিত লোকও মিস্ গেইসলারকে রায়ের দ্বিতীয় স্ত্রী বলে জানতেন।

কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের এক্‌জেকিউটিব কমিটির নবম প্লেনামে যোগদান করার জন্যে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রায় মস্কো গেলেন। ৪ঠা তারিখে তিনি মস্কো পৌঁছেছিলেন, আর প্লেনামের অধিবেশন আরম্ভ হয়েছিল ৯ই তারিখে। ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি তাঁর কানের বেদনায় শয্যাগত হয়ে পড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের অনেক অভিযোগ ছিল। এই জন্যে বার্লিনে তাঁর বন্ধুরা ভয়ে ভয়ে ছিলেন। এই বন্ধুদের ভিতরে আসল বন্ধু কিন্তু ছিলেন মিস্ গেইসলার। তিনিই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মস্কো গেলেন এবং রায়কে বার্লিনে নিয়ে এলেন। বার্লিনে রায়ের অন্তঃকর্ণে অস্ত্রো-পচার হয়েছিল এবং সে যাত্রা তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। রোগটি খুবই কঠিন ছিল।

১৯৩০ সালের নবেম্বর মাসে ভারতের পথে রওনা হওয়ার আগে আলপ্‌স পর্বতের কোনো এক স্টেশনে এম. এন. রায় মিস্ Gottschalk-এর সঙ্গে এক সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে এই মহিলা এম. এন. রায়ের জীবনে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গেই রায় তাঁর সব কিছুর ব্যবস্থা করে এসেছিলেন। ১৯৩৬ সালের ২০শে নভেম্বর তারিখে রায় জেল হতে মুক্তি পেয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে মিস্ Gottschalk ভারতে এসে রায়ের সঙ্গে মিলিত হন এবং এদেশে মিসেস এলেন রায় (Mrs. Ellen Roy) নামে পরিচিতা হন। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে এসে রায় আত্মগোপন করে কাজ করছিলেন। এই অবস্থায় ১৯৩১ সালের জুন মাসে মিস্ গেইসলারও ভারতে আসেন। জুলাই মাসের ২১শে তারিখে রায় বোম্বেতে গিরেফ্‌তার হন। সেদিন মিস্ গেইসলারও লখ্‌নউতে গিরেফ্‌তার হয়েছিলেন। ভারতের বৈদেশিক আইন অনুসারে তাঁকে ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কার করে জার্মানীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে ভারতের কাজের জন্যে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের নিকট হতে পাওয়া বহু টাকা এম. এন. রায় আত্মসাৎ করেছিলেন। আমরা কমিউনিস্টরা একথা জানতাম বটে, কিন্তু কোনো দিন তা বাইরে প্রকাশ করিনি। আমাদের পক্ষে প্রকাশ করার উপায় ছিল না। কিন্তু যাঁরা বিদেশে রায়ের বিরুদ্ধ পক্ষের লোক ছিলেন তাঁরা তো মুখে মুখে রায়ের টাকা আত্মসাতের কথা সকলকে বলে বেড়াতেন। তাই ১৯৩৭ সালে যখন মিস্ Gottschalk ভারতে এসে রায়ের সঙ্গে মিলিত হলেন তখন এই লোকেরাই বলাবলি করতে লাগলেন যে তিনি এম. এন. রায়ের আত্মসাৎ করা টাকা নিয়ে এসেছেন। সে কালে যাত্রীরা মোটা টাকা সঙ্গে আনতে পারতেন। পার্টি হতে রায়ের বহিষ্কারের পূর্বক্ষণে কিংবা পরে তাঁর দলে যাঁরা এসেছেন তাঁরা এসব কথা শুনলে দুঃখ পান এবং চটেও যান। তাঁরা এম. এন. রায়কে ভক্তিশ্রদ্ধা

করেন, চটে তাঁরা যেতে পারেন। কিন্তু তাঁরা আগেকার কথা কিছু জানেন না। নাটক শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তাঁরা মঞ্চে এসেছেন এবং বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন।

এখন আমি কিঞ্চিৎ নিজের কথা বলি। কেউ কেউ লিখেছেন এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল এবং আমি তাঁর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির সভ্য বা নেতা ছিলাম। আমি সভ্য বা নেতা কিছুই ছিলাম না। রায় যুক্ত অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। সে সমিতিতে অ-হিন্দুর প্রবেশ নিষেধ ছিল। কমিউনিস্ট আন্দোলনে এসেই রায় আমার নাম ও ঠিকানা ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম পেয়েছেন। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের তরফ হতে রায় ভারতের চার্জে ছিলেন। সেই বিশ্বসংগঠনের তরফ হতে তিনি যা করতে বলেছেন তা করার চেষ্টা আমি করেছি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার সেই যুগে কখনো দেখা হয়নি। আমি বন্ধন দশা হতে মুক্তি পেয়ে যতটা মনে পড়ে ১৯৩৬ সালের জুন মাসে ২৪শে তারিখে কলকাতা এসেছিলেম। সেই বছরেরই ২০শে নবেম্বর তারিখে রায় জেল হতে মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনি পার্টি হতে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। আমি তাঁর কলকাতা আসার পরেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। তিনি যদি দেখা করতে চাইতেন তবে হয়তো পার্টিকে জানিয়ে দেখা করতে যেতাম। তার পরে যখন তিনি কলকাতায় এলেন তখন তিনি সস্ত্রীক তাঁর পুরানো পার্টির সহকর্মী সুরেশচন্দ্র মজুমদারের অতিথি হয়েছিলেন। সেটা তাঁর কলকাতায় আসার দ্বিতীয় বার ছিল। ভেবেছিলেন সেবারে আমি তাঁর সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করতে যাব। কিন্তু আমি গেলাম না। তখন তিনি শ্রীমজুমদারকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি আমায় চিনেন কিনা এবং আমি কলকাতায় রয়েছি কিনা। শ্রীমজুমদার জানালেন তিনি আমায় চেনেন এবং আমাকে কলকাতার রাস্তায় তিনি দেখেছেন। তখন রায় রাগে ফেটে পড়লেন এবং বললেন যে আমায় তিনি দেখে নিবেন। তার স্ত্রী তাঁকে ঠাণ্ডা করলেন। এই অহঙ্কারী ব্যক্তিটি কিন্তু শ্রীমজুমদারের মারফতে আমায় খবর পাঠাতে পারতেন যে একবার এসে দেখা করুন। তাঁর অহঙ্কারে বেধেছিল বলে তিনি আমায় খবর পাঠাননি। আমিই বা নিজে থেকে তাঁর কাছে কেন যাব? তিনি বিখ্যাত ব্যক্তি হলেও পার্টি হতে বহিষ্কৃত, আর আমি অখ্যাত ব্যক্তি হলেও পার্টির সভ্য। আমার পার্টিই ছিল আমার গৌরব।

এম. এন. রায়ের সঙ্গে আমার একদিন দেখা অবশ্য হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের ১৮ই ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলকাতা টাউন হলের দোতলায় লেবর পার্টি, বেঙ্গলের সম্মেলন হচ্ছিল। আমি তার সভাপতি-মণ্ডলীর সভ্য ছিলাম। লেবর পার্টির প্রমোদ সেন (চট্টগ্রামের) এম. এন. রায়কে ও মিসেস রায়কে এই সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করে এসেছিলেন। এম. এন. রায় তখন বেহালার শ্রীবীরেন রায়ের বাড়ীতে ছিলেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীবীরেন রায় টাউন হলের দোতলায় এসে প্রমোদ সেনকে খুঁজছিলেন। কেন খুঁজছেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন প্রমোদ সেন মিস্টার ও মিসেস্ এম. এন. রায়কে নিমন্ত্রণ করে এসেছিলেন। তাঁরা নীচে গাড়ীতে রয়েছেন। আমি তখনই নীচে নেমে গেলাম। বললাম, "আমি মুজফ্ফর, মিসেস রায় আর আপনি ওপরে চলুন।" রায় মনে হলো খুশী হয়েছিলেন। স্ত্রীকে বললেন, "ইনিই কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ।" তারপরে তাঁরা ওপরে গেলেন। রায় ভাঙা হিন্দুস্তানীতে বক্তৃতা দিলেন এবং চলে গেলেন। শ্রীবীরেন রায়ই রায়-দম্পতিকে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এই হলো মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ।

১৯২৭ সালে চীন থেকে ফেরা মাত্রই অনেকগুলি অভিযোগ রায়ের ঘাড়ে হুড়মুড় করে এসে পড়ল। কোনো অভিযোগই হালকা নয়, কোনো অভিযোগ মিথ্যাও নয়। রায় হতভম্ব হয়ে বার্লিনে চলে গেলেন। বার্লিন ছিল তাঁর হেডকোয়ার্টার্স।

পার্টিতে রায়ের বিচার হলো। তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাথমিক সভ্য ছিলেন। এই পার্টিই তাঁর উদ্যোগে ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে তাশকন্দে স্থাপিত হয়েছিল। এই পার্টিরই হেড্ কোয়ার্টার্স ১৯২১ সালে মস্কোতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই পার্টিই ১৯২১ সালে রায়েরই উদ্যোগে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের সহিত সংযুক্ত (affiliated) হয়েছিল। কমিন্‌টার্নের পঞ্চম কংগ্রেসে রায় এই পার্টির তরফ হতে কমিন্‌টার্নের এক্‌জেকিউটিব কমিটির মেম্বর নির্বাচিত হয়েছিলেন। আবার, ১৯২৬ সালের ২২শে নবেম্বর হতে ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই এক্‌জেকিউটিব কমিটির ৭ম প্লেনামে রায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ হতে তার প্রেসিডিয়ামের সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কাজেই, রায়ের বিচার প্রথমে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে হয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতেই রায়কে পার্টি হতে বিতাড়িত (expel) করা হয়। এই বিতাড়নের তারিখটি আমি কোনো দলীলে পাইনি। তবে, নিশ্চিত-ভাবে এটা ঘটেছিল ১৯২৯ সালের জুলাই মাসের আগে। কারণ, এই জুলাই মাসেই কমিন্‌টার্নের এক্‌জেকিউটিব কমিটির দশম প্লেনামের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনেই রায়ের পার্টি হতে বহিষ্কার অনুমোদিত হয় এবং রায় কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের যত পদে ছিলেন সেইসব পদ হতে তাঁকে অপসারিত করা হয়। কমিন্‌টার্নের কোনো প্রাথমিক সভ্য ছিল না। বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির প্রাথমিক সভ্যরা ছিলেন কমিন্‌টার্নেরও প্রাথমিক সভ্য। স্তালিনের মতো পার্টি সভ্যদেরও নির্বাচিত হতে হতো।

কোনো গভীর কারণে এম. এন. রায়ের বহিষ্কারের কথা ১৯২৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল।

ইতোমধ্যে রায় কমিন্‌টার্নের বিরোধী দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। আর. পাম দত্তকে দলে টানার চেষ্টা করেছিলেন, এই বিরোধী দলের কাগজেও তিনি প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করেছিলেন। এটাকে উপলক্ষ করেই ১৯২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে এম. এন. রায়ের বহিষ্কারের কথা কমিন্‌টার্নের হেডকোয়ার্টার্স হতে ঘোষণা করা হলো।

পরিশিষ্ট

MANIFESTO TO THE DELEGATES OF THE XXXVI INDIAN NATIONAL CONGRESS

Fellow Countrymen !

You have met in a very critical moment of the history of our country to decide various questions affecting gravely the future of the national life and progress. The Indian nation today stands on the eve of a great revolution, not only political but economic and social as well. The vast masses of humanity, which inhabits the great peninsula, has begun to move towards a certain goal ; it is awakening after centuries of social stagnation resulting from economic and political oppression. The National Congress has placed itself at the head of this movement. Yours is a very difficult task, and the way before you is beset with obstacles almost insuperable and pitfalls treacherous and troublesome. The mission of leading the people of India onward to the goal of national liberation is great, and you have made this great mission your own. The National Congress is no longer a holiday gathering engaged in idle debates and futile resolution-making ; it has become a political body—the leader of the movement for national liberation.

The newly acquired political importance obliges the Congress to change its philosophical background ; it must cease to be a subjective body ; its deliberations and decisions should be determined by objective conditions prevailing and not according to the notions, desires and prejudices of its leaders. It was so when the Congress, national in name only, was the political organ which expressed the opinions and aspiration of a small group of men who ruled over it. If the old Congress dominated by the Mehta-Gokhale-Bose-Banerji combination is dead, and discarded from the field of pragmatic politics, it is because those men did not and could not take into consideration the material

they had to work with; they failed to feel the pulse of the people; they knew what *they* thought and wanted, but they did not know, neither did they care to know what the *people*,—the people which constituted that nation which their Congress also pretended to represent,—needed for its welfare, for its progress. *The old Congress landed in political bankruptcy because it could not make the necessities of the common people its own;* it took for granted that its demands for administrative and fiscal reforms reflected the interest of the man in the street; the "grand old men" of the Moderate Party believed that intellect and learning were their inviolable mandates for the leadership of the nation. This lamentable subjectivism, originating from defective or total absence of understanding of the social forces that underlie and give strength to all movements, made the venerable fathers of Indian Nationalism betray their own child; and it led them to their own ruin, disgrace and political death. You, leaders of the new Congress, should be careful not to make the same mistake; because the same mistake will lead to the same disaster.

The programme of the Congress under the leadership of the Non-co-operation Party, is to attain Swaraj within the shortest possible time. It has discarded the old impotent tactics of securing petty reforms by means of constitutional agitation. Proudly and determinedly, the Congress has raised the standard with "Swaraj within a Year" written on it. Under this banner, the people of India are invited to unite; holding this banner high you exhort them to march forward till the goal is reached. This is indeed a noble cause. It is but natural that the people of India should fight for the right of ruling itself. But the function of the Congress, as leader of the nation, is not only to point out the goal, but to lead the people step by step towards the goal. From its activities of the last year, it is apparent that the Congress understands its task and is trying to find the best way of executing it. The people must be infused with enthusiasm to fight for Swaraj; they must be united in this struggle, because without union the goal will not be attained.

Why was the old Congress discredited? *Because it could not make the national question a vital problem for the people.* Under the old leaders, the Congress was caught in the cesspool of political pedantry and petty reformism. Not much greater

results can be expected if these are to be replaced by abstract idealism and political confusion. In order to deserve the name and to be able to execute the difficult task set before it, the National Congress must not permit itself to be carried away by the sentiment and idealism of a handful of individuals however great and patriotic they may be ; it must take into consideration the cold material facts ; it must survey with keenness the every-day life of the people—their wants and sufferings. Ours is not a mere political game ; it is a great social struggle.

The greatest problem before the 36th Congress is how to enlist the full-hearted support of the people in the national cause,—how to make the ignorant masses follow the banner of Swaraj. In order to solve this problem the first thing necessary is to know what is it that ails the masses ? What do they want ? What is needed for improving the immediate environment of their material existence ? *Because only by including the redress of their immediate grievances in its programme will the Congress be able to assume the practical leadership of the masses of the people.*

Several thousands of noisy, irrresponsible students and a number of middle-class intellectuals followed by an ignorant mob momentarily incited by fanaticism, cannot be the social basis of the political organ of a nation. The toiling masses of the cities, the dumb millions in the villages must be brought into the ranks of the movement if it is to be potential. How to *realize this mass organization* is the vital problem before the Congress. How can the man working in the factories or labouring on the fields be convinced that national independence will put an end to his sufferings ? Is it not a fact that hundreds of thousands of workers employed in the mills and factories owned by rich Indians, not a few of whom are leaders of the national movement, live in a condition unbearable and are treated in a manner revolting ? Of course, by prudent people such discomforting questions would be hushed in the name of the national cause. The argument of these politicians is "let us get rid of the foreign domination first". Such cautious political acumen may be flattering to the upper classes ; *but the poor workers and peasants are hungry. If they are to be led on to fight, it must be for the betterment of their material condition.* The slogan which will

correspond to the interest of the majority of the population and consequently will electrify them with enthusiasm to fight consciously, is "*LAND TO THE PEASANT AND BREAD TO THE WORKER*". The abstract doctrine of national self-determination leaves them passive ; personal charms create enthusiasm loose and passing.

How can the Congress expect to arouse lasting popular enthusiasm in the name of the Khilafat and by demanding the revision of the treaty of Sévres ? The high politics behind such slogans may be easy for the learned intellectuals to understand ; but it is beyond the comperehension of the masses of Indian people who have been steeped in ignorance not only by the foreign ruler, but by our own religious and social institutions. Such propaganda based on the questionable doctrine of utilizing the ignorance of the masses in order to make them do the bidding of the Congress, cannot be expected to produce the desired result. If the masses of the Indian people are to be drawn into the struggle for national freedom, it will not be done by exploiting their ignorance. *Their consciousness must be aroused first of all. They must know what they are fighting for. And the cause for which they fight must include their immediate needs.* What does the man in the street need ? The only aspiration of his life is to get two meals a day, which he hardly achieves. And such are the people who constitute 90% of the nation. Therefore, it is evident that any movement not based on the interests of these masses cannot be of any lasting importance or of formidable power.

The programme of the Congress has to be denuded of all sentimental trimmings ; it should be dragged down from the height of abstract idealism ; it must talk of the things indispensable for mortal life of the common human being ; it must echo the modest aspirations of the toiling masses ; the object for which the Indian people will fight should not be looked for somewhere in the unknown regions of Mesopotamia or Arabia or Constantinople ; it should be found in their immediate surroundings,—in their huts, on the land, in the factory. Hungry mortals cannot be expected to fight indefinitely for an abstract ideal. The Congress must not always urge the people, which can be called the classical example of suffering and

sacrifice personified, to suffer and sacrifice only. *The first signs of the end of their age-long suffering should be brought within their vision. They should be helped in their economic fights. The Congress can no longer defer the formulation of a definite programme of economic and social reconstruction. The formulation of such a constructive programme advocating the redress of the immediate grievances of the suffering masses, demanding the improvement of their present miserable condition, is the principal task of the 36th Congress.*

Mr. Gandhi was right in declaring that "the Congress must cease to be a debating society of talented lawyers", but if it is to be, as he prescribes in the same breath, an organ of the "merchants and manufacturers", no change will have been made in its character, in so far as the interest of the majority of the people are concerned. It will not be any more national than its predecessor. It will not meet any more dignified end. If it is to represent and defend the interest of one class viz. the merchants and manufacturers, it cannot but fail to take care of that of the common people. *The inevitable consequence of this failure will be the divorce of the Congress from the majority of the nation.* The merchants and manufacturers alone cannot lead the national struggle to a successful end; neither will the intellectuals and petty shop-keepers add any appreciable strength to the movement. What is indispensable is the mass energy: *the country can be free, Swaraj can be realized, only with the conscious action of the masses of the people.* In order to be able to execute its task, *the Congress must know how to awaken the mass energy, how to lead the masses to the field of resolute action.* But the tactics of the Congress betray its lamentable indifference to and lack of understanding of the popular interest. The Congress proposes to exploit the ignorance of the people and expects them to follow its lead blindly. This cannot happen. If the leader remains indifferent to the interest of the follower, the two will soon fall asunder. The masses are awakening; they are showing signs of vigour; they are signifying their readiness to fight for their own interest; the programme of using them as mere instruments, which are to be

kept in the proper place, will soon prove ineffective. *If the Congress makes the mistake of becoming the political apparatus of the propertied class, it must forfeit the title to the leadership of the nation.* Unfailing social forces are constantly at work ; they will make the workers and peasants conscious of their economic and social interests, and ere long the latter will develop their own political party which will refuse to be led astray by the upper-class politicians.

Non-co-operation cannot unify the nation. If we dare to look the facts in the face, it has failed. *It is bound to fail because it does not take the economic laws into consideration. The only social class in whose hand non-co-operation can prove to be a powerful weapon, that is the working-class, has not only been left out of the programme, but the prophet of non-co-operation himself declared "it is dangerous to make political use of the factory workers".* So the only element, which on account of its socio-economic position, could make Non-co-operation a success is left out. The reason is not hard to find ; the defenders of the interests of the merchants and manufacturers betray unconsciously their apprehension lest wage-earners should be encouraged to question the right of exploitation conceded to the propertied class by all respectable society. *The other classes which are called upon to non-co-operate, being dependent economically on the present system, cannot separate themselves from it,* even if it is damned as "satanic" by the highest authorities.

Non-co-operation may prove to be a suitable weapon to fight, or better said, to embarrass the foreign bureaucracy, but at best, it is merely destructive. The possible end of foreign domination, in itself, is not sufficient inducement for the people at large. They should be told in clear terms what benefit would accrue to them from the establishment of Swaraj. They should be convinced that national autonomy will help them solve the problem of physical existence. Neither will empty phrases and vague promises serve the purpose ; *it has to be demonstrated by the acts of the Congress that proposes to achieve the amelioration of the people's suffering, and that it will not neglect the immediate needs of the workers in quest of abstract freedom to be realized at some future date.*

For the defence and furtherance of the interests of the native manufacturers, the programme of Swadeshi and boycott is plausible. It may succeed in harming the British capitalist class and thus bring an indirect pressure on the British Government, *though being based on wrong economics, the chances of its ultimate success are very problematical. But as a slogan for uniting the people under the banner of the Congress, the boycott is doomed to failure ; because it does not correspond, nay it is positively contrary, to the economic condition of the vast majority of the population.* If the congress chooses to base itself on the frantic enthusiasm for burning foreign cloth, it will be building castles on a bed of quicksand. Such enthusiasm cannot last ; the time will soon come when people will feel the scarcity of cloth and as long as there will be cheap foreign cloth in the market there can be no possibility of inducing the poor to go naked rather than buy it. The *charka* has been relegated to its well-deserved place in the museum ; to expect that in these days of machinery it can be revived and made to supply the need of 320 millions of human beings, is purely visionary. The boycott will enlist the support of the manufacturers, *but it will never receive a dependable response from the consumers.* Then, all the doctrines of purifying the soul may be good for the opulent intellectuals, but their charm for the starving millions cannot be permanent. Physical needs know no bounds, and a political movement cannot be sublimated beyond material reasons and necessities. They are mistaken who say that Indian civilization is purely spiritual, and that the Indian people are not subject to the same material laws that determine the destinies of the rest of humanity.

While for any serious or lasting purposes, the Non-co-operation programme cannot be said to have achieved a small part of what was expected, the 36th Congress intends to go a step further on the road of Non-co-operation. To their great discomfiture the leaders of the Congress observe the popular enthusiasm evoked by Khilafat agitation and Non-co-operation subsiding day by day. The enlisting of several lakhs of members and the raising of the Tilak-Swaraj Fund cannot be accepted as a clear reflection of the popular support behind the Congress. Pessimism about the solidity of ranks and tenacity of purpose of

the Non-co-operation demonstration has of late been repeatedly expressed by responsible Congress leaders both from the press and platform. To enlist his name in the Congress register and to contribute a rupee to the Swaraj Fund does not necessarily imply that a member will be ready to take active part in the struggle. In order to keep the artificially fomented popular enthusiam alive, the leaders of the Congress have been looking for new diversions of an exciting character. But either consciously or unconsciously, they would not lay their hands on the real cause of popular discontent and develop their discontent by helping the masses acquire consciousness. Instead, another irresponsible step has been taken. Without waiting for the annual Congress, the All-India Committee has sanctioned Civil Disobedience. But the very language of the resolution shows that *its authors themselves are in doubt as to whether it can be carried into practice any better than the other aspects of Non-co-operation. The resolution asks "those who could support themselves to leave the government services"*. Considering the fact that the proportion of the government employees unable to make both ends meet one day without their miserable salary, is almost 90%, it cannot be expected that the response to this ukase will be very imposing.

Civil Disobedience when carried into practice, will be some sort of a national strike. If everybody stops working, the government will be paralysed. But is the Congress certain that everybody will readily respond to its call ? If it is, then it betrays lamentable ignorance of the material condition of the people as well as of the economic laws that determine all social forces and political actions. On leaving their civil and military occupation thousands and thousands of people will be without any means of livelihood ; is the Congress in a position to find work for them ? And it should not be forgotten that the lower middle-class element employed in the government departments, will never stoop to manual work. The Congress leaders seem to appreciate the complexity of the situation ; because, in the words of Mr. Gandhi, "they are not prepared to provide employment to those soldiers who would leave the army". With the disastrous effects of the exodus of the Assam plantation workers still fresh in memory, how can it be expected that the same tactics would not be followed by the same result in the

future ? The political organ of a nation cannot execute its task only with popular demonstrations. Our object is not confined to bothering the government ; we are struggling for freedom. It cannot be realized unless the activities of the Congress are determined by a constructive programme ; unless the leadership of the Congress becomes more responsible and less demagogic.

Taken light-heartedly, the resolution of Civil Disobedience will end in making the Congress ridiculous. Because, in spite of all optimism, all enthusiasm, the Congress does not represent the interest of all the sections and classes of which the nation is composed. Much less does it advocate the material welfare of the workers and peasants who form the overwhelming majority of the nation. What is the use of speaking in high-sounding language when the speeches are not backed up by action, determined and permanent ? The spirit of the people cannot be raised by such impotent tactics ; nor is the government terrorised. They only discredit the speaker, sooner or later. The threat of declaring *jehad* unless the Khilafat is redeemed has become too hackneyed ; the deferring of the establishment of Swaraj month by month fails to inspire confidence in thinking people. Why do these bombastic resolutions of the Congress never come out of the airy realm of words ? Because the Congress does not determine its tactics in accordance with the play of social forces.

It is simply deluding oneself to think that the great ferment of popular energy expressed by the strikes in the cities and agrarian riots in the country, is the result of the Congress or, better said, of the Non-co-operation agitation. No, it is neither the phillippics against the "satanic western civilization", nor the abstract formula of Khilafat that have awakened the discontent of the wretched masses, who appear to have once and for all shaken off the spirit of passive resignation. The cause of this awakening, which is the only factor that has added real vigour and a show of majesty to the national struggle, is to be looked for in their age-long economic exploitation and social slavery. The mass revolt is directed against the propertied class, irrespective of nationality. This exploitation had become intense long since, but the economic crisis during the war-

period accentuated it. The seething discontent among the masses, which broke out in open revolt on the morrow of the war, was not, as the Congress would have it, because the Government betrayed all the promises,—but because the abnormal trade boom in the aftermath of the war intensified the economic exploitation to such an extent that the people were desperate, and all bonds of patience were broken.

Newly developed industries brought hundreds and thousands of workers to the crowded cities where they were thrown into a condition altogether revolting. Sudden prosperity of the merchants and manufacturers brought in its train increased poverty and suffering for the workers. City life opened new visions to the workers hitherto resigned to their miserable lot as ordained by Providence. The inequality of wealth and comfort became too glaring ; the worker got over the lethargic resignation typical of the Indian peasantry, and rebelled. His revolt, under such circumstances could not have been against this or that government, *it was against the brutal system that wanted to crush him to the dust.* Mass revolt is alarmingly contagious. The spirit was soon carried to the villages by various channels, and resulted in agrarian riots, which today are spreading like wild-fire all over the country. These are the developments of the social forces generated by objective conditions. *The political movement must give up the pretension of having created these forces, but must bend its head before their majestic strides and adopt itself to their action and reaction.* It is these social forces which lend potentiality and real strength to the political movement. In fact, every political movement is the outcome of the development of certain social forces.

What has the Congress done to lead the workers and peasants in their economic struggle ? It has tried so far only to exploit the mass movement for its political ends. In every strike or peasant revolt the non-co-operators have sacrificed the economic interest of the strikers for a political demonstration. The Congress from its intellectual, ideological and material aloofness, demands Swaraj and expects the masses of population to follow it through thick and thin. It does not hesitate to call upon the poverty-stricken workers and peasants to make all kinds

of sacrifices,—sacrifices which are to be made in the name of national welfare, but which contribute more to the benefit of the native wealthy than to harm the foreign ruler. The Congress claims the political leadership of the nation, but every act betrays its ignorance of or indifference to the material interest of the majority of the people. *So long the Congress does not show its capability and desire to make the everyday struggle of the masses its own, it will not be able to secure their steady and conscious support.* Of course, it should not be forgotten that with or without the leadership of the Congress, the workers and peasants will continue their own economic and social struggle and eventually conquer what they need. They don't need so much the leadership of the Congress but the latter's political success depends entirely on the conscious support of the masses. Let not the Congress believe that it has won the unconditional leadership of the masses without having done anything to defend their material interests.

His personal character may lead the masses to worship the Mahatmaji; strikers engaged in a struggle for securing a few pice increase of wages may shout "Mahatmaji-ki-Jai"; the first fury of rebellion may lead them to do many things without any conceivable connection with what they are really fighting for; their newly aroused enthusiasm choked for ages by starvation, may make them burn their last piece of loin-cloth; but in their sober moments what do they ask for? It is not political autonomy, nor is it the redemption of the Khilafat. It is the petty, but imperative necessity of everyday life that egg them on to the fight. The workers in the cities demand higher wages, shorter hours, better living conditions; and the poor peasantry fight for the possession of land, freedom from excessive rents and taxes, redress from the exorbitant exploitation by the landlord. They rebel against exploitation, social and economic; it does not make any difference to them to which nationality the exploiter belongs. *Such is the nature of the forces that are really and objectively revolutionary; and any change in the political administration of the country will be effected by these forces. The sooner the Congress understands this, the better.*

If the Congress aspires to assume the leadership of the masses without founding itself upon the awakening mass energy, it will

soon be relegated to the dead past in order to shaie the ignominy of its predecessor. To enlist the conscious support of the masses, it should approach them not with high politics and towering idealism, but with the readiness to help them secure their immediate wants, then gradually to lead them further ahead. It is neither the Khilafat cry, nor the Boycott resolution, nor the absurd doctrine of "back to the Vedas with charka in hand", nor the scheme of making the middle-class intellectuals and petty shop-keepers declare a national strike that will unite the majority of the nation behind the Congress. Words cannot make people fight ; they have to be impelled by irresistible objective forces. The oppressed, pauperized, miserable workers and peasants are bound to fight, because there is no hope left for them. *The Congress must have the workers and peasants behind it ; and it can win their lasting confidence only when it ceases to sacrifice them ostensibly for a higher cause, namely the so-called national interest, but really for the material prosperity of the merchants. If the Congress would lead the revolution which is shaking India to the very foundation, let it not put its faith in mere demonstrations and temporary wild enthusiasm. Let it make the immediate demands of the trade-unions, as summarised by the Cawnpur workers, its own demands ; let it make the programme of the Kisan Sabhas its own programme, and the time will soon come when the Congress will not stop before any obstacle ;* it will not have to lament that Swaraj cannot be declared on a fixed date because the people have not made enough sacrifice. It will be backed by the irresistible strength of the entire people consciously fighting for the material interest. *Failing to do so, with all its zeal for Non-co-operation for all its determination to have the Se´vres treaty revised, despite its doctrine of Soul-Force, the Congress will have to give in to another organization which will grow out of the ranks of the common people with the object of fighting for their interests.* If the Congress wants to have the nation behind it, let it not be blinded by the interest of a small class ; let it not be guided by the unseen hand of the "merchants and manufacturers" who have replaced the "talented lawyers" in the Congress, and whom the present tactics seek to install in the place of Satanic British.

While the Congress under the banner of Non-co-operation has been dissipating the revolutionary forces, a counter-revolutionary element has appeared in the field to mislead the latter. Look out! The revolutionary zeal of the workers is subsiding as shown by the slackening of the strike movement; the Trade Unions are falling in the hands of reformists, adventurers and government agents; the Aman Sabhas are captivating the attention of the poor peasants by administering to their immediate grievances. The government knows where lies the strength of the movement; it is trying to divorce the masses from the Congress. This clever policy directed by master hands, cannot be counteracted by windy phrases and sentimental appeals. Equally clever steps should be taken. *The consciousness of the masses must be awakened; that is the only way of keeping them steady in the fight.*

Fellow Countrymen, a few words about Hindu-Muslim unity, which has been given such a prominent place in the Congress programme. The people of India are divided by vertical lines, into innumerable sects, religions, creeds and castes. To seek to cement these cleavages by artificial and sentimental propaganda is a hopeless task. But fortunately, and perhaps to the great discomfiture of the orthodox patriots, who believe that India is a special creation of Providence, there is one mighty force that spontaneously divides all these innumerable sections horizontally into two homogeneous parts. This is the economic force; the exploitation of the disinherited by the propertied class. This force is in operation in India and is affecting the innumerable vertical lines of social cleavage, while divorcing the two great classes further apart. The inexorable working of this force is drawing the Hindu workers and peasants closer and closer to their Muslim comrades. *This is the only agency of Hindu-Muslim unity.* Whoever will be bold enough to depend on the ruthless march of this force of social-economics, will not have to search frantically for pleas by which the Mussulman can be induced to respect the cow, nor to make the ignorant Hindu peasants believe that the salvation of his soul and the end of his earthly misery lies in the redemption of the Khilafat or the subjugation of the Armenians by the Turks. Hindu-Muslim unity is not to be cemented by sentimentality; it is

being realised practically by the development of economic forces.

Fellow Countrymen, let the Congress reflect the needs of the nation and not the ambition of a small class. Let the Congress cease to engage in political gambling and vibrate in response to the social forces developing in the country. Let it prove by deeds that it wants to end foreign exploitation not to secure the monopoly to the native propertied class, but to liberate the Indian people from all exploitation, political, economic and social. Let it show that it really represents the people and can lead them in their struggle in every stage of it. Then the Congress will secure the leadership of the nation, and Swaraj will be won not on a particular day selected according to the caprice of some individuals, but by the conscious and concerted action of the masses.

Manabendranath Roy
Aboni Mukherji

December 1st, 1921.

A PROGRAMME
FOR THE INDIAN NATIONAL CONGRESS

Our movement has reached a stage when the adoption of a definite Programme of National Liberation as well as of Action can no longer be deferred. A programme of National Liberation must be formulated in order to state the position of those who do not believe in half-way and the so-called "evolutionary" methods advocated by the compromising Liberals. The ambiguous term Swaraj is open to many definitions and in fact it has been defined in various ways according to the interests and desires of the different elements participating in our movement. Such a vague objective is certainly not conducive to the strengthening of a movement, on the contrary, it makes for weakness. Then, a militant Programme of Action has become indispensable in order to mobilize under the banner of the National Congress all the available revolutionary forces. The nation is not a homogeneous whole : it is divided into classes with diverse and often conflicting interests. All the various social classes struggle for their respective interests. They all believe that National Liberation will remove their grievances. Therefore the Programme of the National Congress which is not a cohesive political party, but the traditional organ of our National Struggle, cannot be according to the interests of one certain class. The National Congress is a coalition of all the forces oppressed by foreign domination, therefore its programme must be a Coalition Programme.

First of all, we must define what form of National self-government is needed for the welfare of the majority of the nation ; then is to be formulated the methods of the struggle which will lead to the realisation of this National self-government.

Programme of National Liberation

It is a well known fact that the domination of foreign imperialism has led to the economic ruin, industrial stagnation, social degeneration and intellectual backwardness of the people

of India. The woeful tale of the unlimited exploitation and heartless suppression suffered by the Indian people at the hand of the British rulers has soiled the pages of history. The basis of our national movement is the necessity of the Indian people to free itself from this slavery. So long as the political State power is controlled by the foreign imperialist, no substantial economic and social progress will be permitted to the masses of the population. Therefore, the first and foremost objective of the national struggle is to secure the control of the National Government by the elected representatives of the people. But this cannot be achieved with the sanction and benevolent protection of the imperialist overlords, as the renegade patriots of the Liberal League think because any measure of self-government or Home Rule or Swaraj under the imperial hegemony of Britain will not amount to anything. Such steps are calculated only to deceive the people. They are camouflage. As the leader of the struggle for National Liberation, the Congress must boldly challenge such measures and declare in unmistakable terms that its goal is nothing short of a completely independent National Government based on the democratic principle of Universal Suffrage.

Theory of Equal Partnership a Myth

The theory of "equal partnership in the British Commonwealth" is but a guilded version of imperialism. Only the upper classes of our society can find any consolation in it, because the motive behind this theory is to secure the support of the native landowning and capitalist classes by means of economic and political concessions allowing them a junior partnership in the exploitation of the country. Such concessions will promote the interests though in a limited way of the upper classes leaving the vast majority of the people in political subjugation and economic servitude. The apostles of "peaceful and constitutional" means are nothing but accomplices of the British in keeping the Indian nation in perpetual enslavement. It is needless to point out that England did not conquer India in order to "civilise" us; so to believe that the Indian people will attain the state of complete political autonomy under the guidance of benign British rule is

simply to entertain an illusion. But those believing in co-operation with the British Government are too hard headed businessmen to be under any illusion. If they advocate the policy of "peaceful and constitutional" means, it is because such a policy is more conducive to the interests of their class than a sudden radical change in the political admintstration of the country.

Our Landlord and Capitalist Class

The landowners are interested in the security of their estates and preservation of their right to suck the blood of the peasantry by rack-renting and innumerable other forms of exploitation. Any Government offering them this security will win their loyal support. The nationality of the rulers will make little difference. The moneyed upper classes seek expansion in the industrial and commercial field. Any Government providing facilities for this expansion will have their support and co-operation. If the British Government will insist on the old policy of obstructing the industrial development of the country our capitalist classes will militate in the nationalist ranks. But convenience of exploitation, as well as exigencies resulting from the disastrous effects of the World War today demand a change in the method of Imperialist economics. Ever increasing popular discontent forces the British ruler to seek an alliance with some powerful native element, which will find it profitable to help maintain a Government preserving law and order. It offers economic concessions and political privilege in consideration for such help. Thus the landowning and capitalist classes find it possible to have their interests protected and aspirations satisfied within the framework of Imperialist suzerainty.

Their property rights protected, and the avenues of their economic development open under the British rule, the land-owning and capitalist classes have no reason to quarrel with the former. In fact, their economic interests demand peaceful conditions, which are enforced under Imperial coercion. They are afraid that a sudden change in the political status of the country will disturb the "peace and order" so indispensable for the security of property, and prosperity of commerce and

industry. A clear programme of National Liberation cannot be carried through without risking a revolutionary action of the masses, who may not be so willing to go back to their socio-economic slavery after conquering the political power for the native upper classes. In order to avoid these unwelcome possibilities, the landowning and capitalist classes prefer a peaceful gradual progress. They find it wise to take as much as can be got with the least danger to themselves.

This policy of caution and compromise, however, leaves interests of the Indian people out of consideration. It is calculated to secure and promote the interests of the thin upper strata of the people. Therefore, it goes without saying that the National Congress must declare that the realisation of the programme of the Liberal League, or any other programme fundamentally of a similar nature, does bring the Indian nation as a whole any nearer to freedom. Because under "equal partnership in the Commonwealth" or "Dominion Self-Government" or "Home Rule in British Empire", the Indian people will still continue to be under British domination which will function with the aid and connivance of the native capitalist class.

No Change of Heart

Those preaching the doctrine of "change of heart" on the part of the British rulers fail to disassociate themselves clearly from such half-way measures. Such a doctrine admits the possibility of reconciling the interests of the Indian people with those of Imperialism, consequently it is a dangerous doctrine and the Congress must be freed from it. This ambiguity of its position and the vagueness of its objects have contributed to the vacillation and weakness that characterised the activities of the Congress during the last twelve months. A determined fight, which is required to conquer National Independence for the Indian people, is conditional upon a clearly defined programme ; and only such a programme will draw the masses of the people into the national struggle as takes into consideration the vital factors affecting the lives of the people.

Therefore, the Indian National Congress declares the following to be its :

Programme of National Liberation and Reconstruction

1. Complete National Independence, separated from all Imperial connection and free from all foreign supervision.

2. Election of the National Assembly by Union Suffrage. The sovereignty of the people will be vested in the National Assembly, which will be the supreme authority.

3. Establishment of the Federated Republic of India. The principles which will guide the economic and social life of the liberated nation are as follows :

Social and economic programme

1. Abolition of Landlordism. All large estates will be confiscated without any compensation. Ultimate proprietorship of the land will be vested in the National State. Only those actually engaged in agricultural industry will be allowed to hold land. No tax farming will be allowed.

2. Land rent will be reduced to a fixed minimum with the object of improving the economic condition of the cultivator. State Agricultural Co-operative Banks will be established to provide credit to the peasant and to free him from the clutches of the money-lender and speculating trader.

3. State aid will be given to introduce modern methods in agriculture. Through the State Co-operative Banks agricultural machineries will be sold or lent to the cultivator on easy terms.

4. All indirect taxes will be abolished, and progressive income tax will be imposed exceeding 500 rupees a month.

5. Nationalisation of Public Utilities. Mines, Railways, Telegrams and inland waterways will be owned and operated by the State under the control of Workers Committees not for profit, but for the use and benefit of the nation.

6. Modern industries will be developed with the aid and under the supervision of the State.

7. Minimum wages in all the industries will be fixed by legislation.

8. Eight-hour day. Eight hours a day for five and a half

days a week will be fixed by law as the maximum duration of work for male adults. Special conditions will be laid down for woman and child labour.

9. Employers will be obliged by law to provide for a certain standard of comfort as regards housing, working conditions, medical aid, etc. for the workers.

10. Protective Legislation will be passed about Old Age, Sickness and Unemployment Insurance in all the industries.

11. Labour organisation will be given a legal status and the workers' right to strike to enforce their demands will be recognised.

12. Workers council will be formed in all the big industries to defend the right of labour. These councils will have the protection of the State in exercising their function.

13. Profit sharing will be introduced in all big industries.

14. Free and compulsory education. Education for both boys and girls will be free and compulsory in the Primary Grades and free as far as the Secondary. Technical and vocational schools will be established with State aid.

15. The State wlll be separated from all religious creeds, and the freedom of belief and worship will be guaranteed.

16. Full social, economic and political rights will be enjoyed by the women.

17. No standing Army will be maintained, but the entire people will be armed to defend the National Freedom. A National Militia will be organised and every citizen will be obliged to undergo a certain period of military training.

How to reach our Goal

The aims and aspirations of the great majority of the Indian people are embodied in this programme, the realisation of which will bring progress and prosperity resulting from National freedom within the reach of all the classes. Now the object before us is clear. Everybody knows what he is fighting for. Swaraj is no longer a vague abstraction open to any interpretation, nor is it "a mental state". Swaraj, National Independence which still continues to be the summary of our Programme represents a clear picture of the national life breathing in the healthy atmosphere of freedom.

The goal fixed, we must now find the ways and means for reaching it. It goes without saying that a bitter and protracted struggle separates us from the goal we are striving for. The "civilising" character of British Imperialism will be tested by the brutal resistance it will put up against the Indian people in its attempt to realise a programme which proposes to raise India to the status of any free, civilised nation. The patriotism of the Liberals will be measured by the adhesion they give to this programme of ours, a programme which does not injure them but requires of every sincere Indian nationalist the courage and determination to struggle against the foreign ruler, and which aims not at the economic development of and comfortable position for a few, but for freedom, progress and prosperity for all. We know, however, what to expect from both quarters ; British Imperialism will never "change its heart" and our upper classes will never risk a comfortable present and promising future assured to them, for real freedom to the nation. Our immediate task, therefore, is to involve in the struggle all those elements whose welfare demands the realisation of our programme.

Analysis of our Forces

Now, in a fight it is indispensable to make a correct estimate of the available and reliable forces and to mobilise them so as to have their fullest might brought to bear upon the situation. Great masses of our National Army are just on the point of awakening. Their understanding is still limited and their vision not far reaching. The abstract conception of national liberation leaves them indifferent nor does the picture of a happy and prosperous life far ahead appeal strongly to their imagination. They are wrapped up in more immediate affairs those affecting their everyday life. In order to lead them step by step in the greater struggle, we must take up their immediate problems. These, however, cannot be solved unless there is a radical politico-economic change ; but by standing shoulder to shoulder with them in their struggle against immediate grievances, we will help them develop their revolutionary consciousness. We will convince them in actual struggle how their everyday life is bound up with the destiny of the entire nation.

It is a known fact that intensified economic exploitation has at last exhausted the patience of the Indian masses and shaken their traditional resignation. During the last years they have repeatedly demonstrated their will and readiness to fight. This rebelliousness of the masses is the solid foundation on which the activities of the National Congress should be based.

To develop this spontaneous revolt against unbearable conditions therefore will be to strengthen the national struggle. With the purpose of developing all the forces oppressed and exploited under the present order and to lead them in the struggle for national liberation, the Indian National Congress adopts the following :

Action Programme

1. To lead the rebellious poor peasantry in their struggle against the excesses of landlordism and high rents. This task will be accomplished by organising militant Peasants' Union which will demand (a) Abolition of Feudal Rights and dues, repeal of the Permanent Settlement and Taluqdary System ; (b) Confiscation of large estates ; (c) Management of confiscated estates by councils of the cultivators ; (d) Reduction of land rent, Irrigation Tax, Road Cess, etc. ; (e) Fixed tenures ; (f) No Ejection ; (g) Abolition of indirect Taxation ; (h) Low prices ; (i) Annulment of all the mortgages held by moneylenders ; etc.

2. To back the demands of the peasantry by organising country-wide mass demonstrations with the slogan of "Non-payment of rent and taxes".

3. To organise mass resistance against high prices, increases of Railway fare, postage, salt tax, and other indirect taxation.

4. To struggle for the recognition of Labour Unions and the workers' right to strike in order to enforce their demands.

5. To secure an eight-hour day, minimum wage and better housing for the industrial workers.

6. To back up these demands by mass strikes to be developed into a general strike at every available opportunity.

7. To support all strikes politically and financially out of Congress Fund.

8. To agitate for the freedom of press, platform and assembly.

9. To organise tenants' strikes against high house rents in the cities.

10. To build up a country-wide organisation of National volunteers.

11. To organise strikes of the clerks and employees in the Government and commercial offices for higher salaries.

12. To enter the Councils with the object of wrecking them.

13. To organise mass demonstrations for the release of political prisoners.

The Final Step

The realisation of this programme of action, every clause of which corresponds to the immediate interests of one or another section of the people, will increase the fighting capacity of the nation as a whole. The National Army will be drilled, so to say, ready for action. Every class will find the Congress striving for its welfare. In face of a gigantic mass movement thus organized and involving larger and larger sections of the population, the authority of the Government will break down. Non-co-operation of the productive elements of society will paralyze the life of the country, thus dealing a death blow to the Government. Inauguration of the campaign of nationwide Civil Disobedience will precipitate the final stage of our struggle to be crowned inevitably by the conquest of Independent National Existence, in which the people of India will have the opportunity of progressing in social, economic, and intellectual realms, in connection with the principles contained in our Programme of National Reconstruction.

Freedom or Slavery—there is no Middle Course

The policy of liberal imperialism heralded in 1909 by the Morley-Minto Reforms and inaugurated in 1919 by the introduction of the Government of India Act, will culminate sooner or later in Home Rule or Dominion Status for India. The repetition of the fiasco of the Irish Free State and Egyptian "Independence" can be expected in India. Those who look upon any such eventuality as a solution of the national question are to be counted as the henchmen of imperialism. The movement led by the National Congress must rid itself of all such elements and be free from any illusion about a "change of heart" on the part of the British. The Indian people must be free or be crushed to death by British imperialism ; there is no middle course. And the people of India will never liberate themselves from the present slavery without a sanguinary revolutionary struggle.

The social basis of a revolutionary nationalist movement cannot be all inclusive, because economic reasons do not permit all the classes to participate in it. Only those sections of the people therefore whose economic interests cannot be reconciled with imperialist exploitation under any make-shift arrangement, constitute the backbone of your movement. These sections embrace the overwhelming majority of the nation, since they include the bankrupt middle classes, pauperised peasantry and the exploited workers. To the extent that these objectively revolutionary elements are led away from the influences of social reaction, and are freed from vacillating and compromising leadership, tied up spiritually and materially with the feudal aristocracy and capitalist upper classes, to that extent grows the strength of the nationalist movement.

The last two years were a period of mighty revolutionary upheaval in India. The awakening of the peasantry and of the proletariat struck terror in the heart of the British. But the leadership of the National Congress failed the movement in this intensely revolutionary situation.

Relation Between the Communist International and the Struggle of Oppressed Nationalities

The relation of the Communist International with the struggle of the oppressed peoples is inspired by revolutionary idealism and based upon mutual interests. Our sympathy and support are not confined to empty phrases couched in sweet words. We must stand shoulder to shoulder with the people of India in their struggle against imperialism; therefore we will fail in our revolutionary duty if we do not point out to you the mistakes that weaken the struggle and harm the cause of Indian independence.

In leading the struggle for national liberation the Indian National Congress should keep the following points always in view.

1. That the normal development of the people cannot be assured unless imperialist domination is completely destroyed. 2. That no compromise with the British rulers will improve the position of the majority of the nation. 3. That the Britlsh domination cannot be overthrown, without a violent revolution and 4. That the workers and peasants are alone capable of carrying the revolution to victory.

The Programme of Revolutionary Nationalism

Therefore, in order to declare its complete freedom from all connection with the reactionary upper classes, the National Congress should categorically declare that its political programme is the establishment of a Democratic Republic, completely independent of any foreign control. The vast majority of the nation that is the toiling masses, will rally round this programme, since their present condition cannot be improved without a radical change in the existing system. Tireless and courageous agitation has to be carried on to win the masses for the cause of national liberation. The present spontaneous mass upheaval provides a very fertile field of propaganda. The necessity of developing the revolutionary consciousness of the masses demands the adoption of an economic programme, in

addition to the political programme of a republic to be established through a revolution. By leading the rebellious poor peasantry against the reactionary and loyalist land aristocracy, the Congress will on the one hand strike its roots deeply into the masses, and on the other, will assail the very bedrock of British rule. The native army, which maintains British domination in India, is recruited from among the poor peasantry. So a programme of agrarian revolution will win the native troops to the cause of national freedom.

In conclusion we express our confidence in the ultimate success of your cause which is the destruction of British Imperialism by the revolutionary might of the masses.

Let us assure you again of the support and co-operation of the advanced proletariat of the world in this historic struggle of the Indian people.

Down with British Imperialism. Long Live the Free people of India.

With fraternal greetings,
Presidium of the
Fourth Congress of the Communist Internationa
Humbert Droz
Secretary

A MANIFESTO TO THE ALL-INDIA NATIONAL CONGRESS CALCUTTA, 1926

On the eve of the annual meeting of Indian National Congress, the Nationalist Movement presents a picture which is apparently very discouraging. What a change compared with the situation that prevailed in 1920-21 when the people were enthusiastically gathered around the National Congress and eagerly looked up to it for a courageous lead in the fight for freedom !

Today the National Congress exists but in name, a number of conflicting political groups contending for the possession of its prostrate frame. Nationalism—the courageous fight for real freedom—is drowned in the surging sea of communalism. Bickering over petty formalities is the outstanding feature of the political life of the country. More than half a dozen political constellations are vilifying each other. Each claims to represent the nation. But none of them touch the vital issues before the nation, their sole object being to secure a majority in the legislatures.

Even those who recognise the impotence of these pseudo-parliamentary bodies are nevertheless frantically trying to enter them. They have forgotten that road to freedom does not lie through the blind alley of those impotent and unrepresentative legislative bodies. They have forgotten that in the fight for national freedom these at best can only serve as auxiliaries to other more powerful and effective weapons.

The Legislatures do not Represent the People

The present legislative bodies, to capture which has become the beginning and end of the programme of the Nationalist Parties, are impotent. They are impotent because they do not represent the people. Being unrepresentative they cannot act as the vehicle through which popular energy can find adequate expression. The experience of the last two years should have made this abundantly clear. The Swaraj Party entered the

Where is the fundamental difference between the two parties then ? Both are ready to change principles and policies at the behest of the electorate representing 2.2 per cent of the population. Both are prepared to override the interest of the unfranchised masses in favour of an infinitesimal minority. The independents stated the new "Principle and Policy" of agreement with imperialism before the election ; whereas the Swarajists wanted only to temporise. At the moment of writing, the results of the election are not fully known. But it is a foregone conclusion that Swarajists will lose ground. Nowhere will they have an independent majority to carry on their old tactics. So they will approach the Gauhati Congress to revise the decision of the Cawnpur Congress. The endeavour will be made to trick the National Congress into sanctioning a policy of compromise dictated by the interests of the upper and middle class minority.

The authority of the National Congress will be asserted, it will regain its position as the supreme organ of the Indian people, only if at Gauhati the tricky politics of the bourgeois leaders are frustrated. This can be done by mobilising the rank and file on a platform of revolutionary Nationalism.

Contradictions Inside the Swaraj Party

One by one the consciously bourgeois elements have gone out of the Swaraj Party. But unfortunately the leadership of the Party still remains predominantly bourgeois. The Left opposition, which saved the party by repudiating the treacherous Sabarmati Pact, and which made itself felt in Bengal, is still incapable or unwilling to revolt openly against the bourgeois leaders. But the Swaraj Party will not be able to become a party of the people, leader of the fight for national freedom, until and unless it breaks away completely from the bourgeoisie seeking compromise with imperialism.

The weakness of the Swaraj Party has always been the contradiction between the leadership and the ranks. The programme and policy of the party have always been dictated by the interests of the capitalist and landowing classes ; but the members and adherents of the party largely hail from

other sections of society. The party has always defended aristocratic and bourgeois interests while making some meaningless gestures to hoodwink its revolutionary following. But in course of time even these meaningless gestures became somewhat harmful to the agreement between British Imperialism and the native upper classes. The Swaraj Party stood at the parting of ways. It must completely betray its petty bourgeois followers or forfeit the votes of the upper and middle classes. The latter eventuality would be fatal for a party which had staked its existence on the success of a parliamentary policy.

Serving as a connecting link with the people, the petty bourgeoisie give the Swaraj Party a national significance. But most of them cannot give it the vote. Connection with the popular masses would be vital for the party that wants to lead a revolutionary fight. For a party depending exclusively on parliamentary action, however, the electorate is more important than the nation. The class composition of the present electorate demands that any party seeking its vote must be committed to defending capitalist and landowning interests. Should these interests conflict with those of the nation, the latter must be betrayed.

This was the vital issue in the controversy that raged in the period immediately preceding the elections. The bourgeois leaders who still remained at the head of the Swaraj Party were called upon to speak clearly on this point. Would they throw overboard their trusting lower middle class following, betray the people and stand openly as the spokesmen of the capitalist and landowning classes? They evaded a straight answer. By means of sophistry and hair-splitting over formalities they deceived the party. Actually, however, they have betrayed the party and the nation. Their insistence upon staking the future of the party on the verdict of the electorate is a violation of the sovereignty of the people. They would make not only the Swaraj Party, but the National Congress, an instrument to be used in the interest of the small minority enfranchised by the grace of Britain.

The Programme must be Changed

The Swaraj Party cannot rescue itself from the deadening grip of bourgeois influence unless it adopts a new programme. A new programme reflecting the interests of the people and providing for militant mass action for the realisation of national freedom will put the leaders to the test. They must either accept that programme and thereby burn the bridge over which they want surreptitiously to sneak over to the camp of the bourgeoisie with the party in their pocket, or leave the party, following the example of their spiritual comrades who have preceded them.

The programme of the Swaraj Party is essentially a programme of bourgeois Nationalism. Literally, it is ambiguous. For example, while formulating its broad principles at Gaya, C. R. Das said :

"Swaraj is indefinable, and it is not to be confused with any particular system of government. Swaraj is the natural expression of the national mind and must necessarily cover the whole history of the nation."

The statement ought to be laughed at, were it not so tendentious. Das would not have been able to carry the best elements in the Nationalist movement with him had he at that critical period defined Swaraj as he did two and a half years later at Faridpur. Swaraj, which was enunciated as an undefinable metaphysical category at Gaya, in the course of two years and a half assumed a very definite material form—a particular system of government. At Faridpur, the Swarajist leader defined Swaraj as Dominion Status within the British Empire. The Party, intellectually paralysed by the cult of hero worship, could not even ask the leader how such a modest place on the outskirts of the British Empire would be "the natural expression of the national mind covering the whole history of the nation."

Dominion Status is not an expression of the national mind. It corresponds with the interests of the Nationalist bourgeoisie. Here is what C. R. Das had to say in favour of Dominion Status : (1) it brings material advantage ; (2) it affords

complete protection ; and (3) it provides all the elements of Swaraj. (Faridpur Speech.)

Dominion Status will bring material advantage to whom ? To the Indian bourgeoisie. An agreement with imperialism will assure the development of Indian capitalism. Protection is needed by those who have something to protect. They again, are the capitalist and landowning classes who are afraid that a national revolution involving the workers and peasant masses might encroach upon their preserves. The classes of Indian society that live and thrive by exploiting the toiling masses and to whom national freedom means the freedom to increase this exploitation, want the protection of British imperialism against the possible revolt of the people. This is the meaning of Dominion Status. Material advantages for the Indian bourgeoisie and protection of the rights and privileges of exploiting classes—these are the principal elements of the Swaraj, which the founder of the Swaraj Party desired to see established.

So long as the Swaraj Party stand by the programme outlined at Gaya and expounded in detail at Faridpur by its founder, it cannot claim to be essentially different from the other Nationalist parties. It must go the same way as that pursued by other parties committed to the defence of the upper classes. Even Dominion Status is a far cry. It won't be granted by imperialism just for the asking. There must be a long period of apprenticeship, which must be served by co-operating with imperialism on the basis of the Reforms. The Nationalist bourgeoisie are anxious to serve this apprenticeship to qualify for a further instalment of concessions—economic and political.

This is the situation in which the Congress meets at Gauhati. It must choose between the enfranchised 2·2 per cent and the unfranchised, oppressed and exploited 97.8 per cent of the nation. The hypocritical policy of shouting "Swaraj for the 98 per cent" and doing the bidding of the 2 per cent cannot be carried on any longer without prostituting the name and prestige of the National Congress.

The opinion of the "*Forward*" quoted above, and more than one pronouncement of the Swarajist leaders in a similar strain,

do not leave any doubt about the policy that will be pressed upon the Congress as soon as the results of the elections are known. In the very unlikely event of the Swarajists increasing their forces in the Councils or even retaining their present strength, they will accept office. The fiasco of the last two years cannot be repeated all over again. In the much more likely eventuality of their defeat in the polls, they will, of course, change their policy and try to secure the sanction of the Congress for this bankrupt policy of surrender and compromise.

The National Congress can save itself only in one way.

It is roundly repudiating the programme and policy that seek to make it an instrument of parties betraying national interests for the sake of a small minority. The repudiation of the bankrupt policy of bourgeois Nationalism should be followed by the adoption of a programme of democratic national freedom. Pseudo-parliamentarism should be replaced by militant mass action. The policy of surrender and compromise should be discarded in favour of a policy of courageous and genuine fight with imperialism. The National Congress should be liberated from the treacherous bourgeois leadership and brought under the inspiring influence of a Republican People's Party.

Communal Conflicts

Many must have been discouraged by the communal conflicts that have been devastating the country during the last years. It is certainly a discouraging phenomenon. But here again a party of the people will find the solution. While the upper classes fight for rights and privileges, the masses of both the communities have one very vital thing in common. It is exploitation. Hindu and Moslem workers are sweated in the same factory. Hindu and Moslem peasants toil on the land side by side, to be equally robbed by the landlord, the moneylender and the agents of imperialism. The Moslem worker is not better paid when the employer is his co-religionist. Nor does a Hindu landlord take less rent from a Hindu than from a Moslem tenant.

The same rule largely applies to the exploited middle classes (petty intellectuals, small traders, artisans, etc.). United by the common tie of exploitation, 98 per cent of the entire people have no reason to be involved in the communal conflicts. Help them to be conscious of their economic interests, give them a courageous lead to fight against their common enemy, the forces of exploitation, and the bottom will be knocked out of the insidious policy of provoking communal conflict. It is true this cannot be done overnight. But there is no other remedy for the cancer of communalism which eats into the vitals of the Nationalist Movement.

The collapse of the Nationalist Movement has given an impetus to the communal conflict. Re-organisation of the Nationalist Movement with a programme of militant mass action will remove this impetus. Non-co-operation and the Khilafat agitation quickened religious fanaticism at the expense of political consciousness. This grave error must be rectified by placing the Nationalist Movement on a solid secular basis. The masses should be mobilised under the banner of Nationalism with slogans of immediate economic demands. Land tenure, land rent, usurers' charges, prices, wages, working conditions, primary education—these should be the main topics of agitation. On every one of these points, vitally concerning the life of the people, the identity of interest can be made clear very easily. Agitation along these lines, therefore, will provide for the safest guarantee against communal tension, while building up a solid basis for the Nationalist Movement.

Democratic principles, however, do not operate against the interests of national minorities. The mutual distrust between the Hindus and Moslems in India has a historical background. The communal question, therefore, should be approached as the question of a national minority. One of the main planks in the Nationalist platform must be the protection for national and communal minorities. If the Nationalist Movement fails to guarantee this protection, imperialism gets the chance of offering it and thus drives a wedge straight through the nation.

The behaviour and pronouncements of more than one pro-

minent Hindu Nationalist leader give the Moslems sufficient reason for suspicion. The extra-territorial patriotism of a section of the Moslem leaders, on the other hand, gives a handle to the injurious propaganda of the Hindu reactionaries. Excesses on both sides should be avoided. The surest guarantee against communalism is the mobilisation of the masses on the basis of their economic interests. Class lines cut deeply across the superficial and often artificially drawn communal lines.

National Interest and Class Interest

The recrudescence of communal conflicts has been very harmful to the Nationalist Movement ; but the present decomposition of the movement is caused primarily by the conflict of class interests inside the Nationalist ranks. Indian society is as much divided into classes as capitalist society in any other country.

The relation of British imperialsm with the different classes of the Indian society is not uniform. The nation is oppressed and exploited by a foreign power. But the pressure of this oppression does not fall equally on all the strata of the Indian population. The object of exploitation is not the entire people, but only the classes that produce wealth by their labour power. These are the workers and peasants constituting over 90 per cent of the nation. The quarrel between imperialism and the upper classes of Indian society is a quarrel over the booty. Native landlords and capitalists also live at the expense of the producing masses. But the monopolist policy of imperialism did not permit them an unrestricted economic development which would increase their capacity to exploit the working class. The major portion of the values produced by the Indian workers and peasants go to swell the pockets of imperialism. The Indian bourgeoisie were allowed only a modest middlemen's share. In course of time they have become dissatisfied with this small portion of the booty. They wanted an ever-increasing share and finally the prior right over the entire resources of labour power of the Indian masses.

The Indian bourgeoisie, however, could not realise their

aspirations for the mastery of the country without challenging the monopoly of imperialism. This again they cannot do by themselves. India cannot become free from foreign domination except through the revolutionary action of the entire people. But the popular revolt against imperialism is not caused by the grievances of the Nationalist bourgeoisie. It has its own cause. The popular masses rise against exploitation as such. Consequently, the Nationalist bourgeoisie, who would like to be the sole masters and rulers of the country, do not dare to use the weapon which alone can seriously threaten the imperialist hold on the country. National interests—the interests of the 98 per cent—are thus sacrificed for class interests. The attempts to conquer sole mastery over the country being fraught with possible danger of immense gravity, the Nationalist bourgeoisie enter into an agreement with imperialism to exploit the Indian people jointly.

Why does imperialism enter into such an agreement ? There are several reasons. Firstly, the general crisis of capitalism has weakened the basis of imperialism so much that the policy of the old classical colonialism must be revised. Secondly, the Indian market is attacked by Japan, U.S.A., Germany, etc. ; only goods manufactured in India with cheap labour can compete with these intruders. Therefore Britain adopts the policy of industrialising India under the domination of imperialist finance. Thirdly, the decline of the accumulation of capital in Britain does not permit her to spare sufficient capital to carry on the programme of industrialising India. She must draw Indian Capital into operation. Fourthly, the mass character of the post-war Nationalist Movement forces imperialism to win over to its side ever wider strata of the native society.

A foreign power cannot rule a country for a long time unless supported by a certain native element. A government to be stable must have a social basis. Up to the world war, two social factors supported the British Government in India. They were the landowning class and the peasantry. These two together constitute a majority of the population. So imperialism had a sure social base. But these two social forces did not support the British Government in the same way. The

landowning class gave positive, conscious support, while the peasantry provided an unconscious support by virtue of its passive loyalty. Since the war, the situation has changed. The passive loyalty of the peasant masses has been disturbed. It has been replaced by a state of seething revolt which breaks out from time to time ; consequently the basis of imperialism is now seriously shaken. A new ally must be found to reinforce it.

The new ally is the Nationalist bourgeoisie (bankers, merchants, manufacturers, high officials and the professional people closely connected with these classes). In the years following the war, the Nationallst Movement was heading towards revolution. The ominous prospects were dreaded by the Nationalist bourgeoisie. They decided to travel the safer way, and accepted the junior partnership with imperialism in the exploitation of the Indian people.

The defection of the bourgeoisie left its mark on the Nationalist Movement. Compromise and surrender became the policy. This sacrifice of the people on the altar of class interests has been carried on by stages ever since 1922. The last stage will be reached when the new Legislative Assembly and Councils meet. It does not matter what form it will take. There may still be staged the farce of His Majesty's Opposition. But, essentially, the parties representing the bourgeoisie will give up all real resistance to imperialism and co-operate—either "honourably" or "responsively"—with the British Government.

What is to be done ?

The reconciliation of the antagonism between imperialism and the native bourgeoisie, however, does not remove the basic cause of national revolution. The necessity of freedom for the Indian people is not determined by the sectional interests of the Nationalist bourgeoisie. The agreement between imperialism and the native bourgeoisie does not free the Indian people from political domination and economic exploitation. Nearly 98 per cent of the population still remains without any political rights. Economic concessions to native capitalism are not and will not be made by reducing the share of imperialism. The latter will increase the exploitation of the labouring masses, who

will be forced to produce value for native capitalism over and above what they produce for imperialism. This being the case, the fight for national freedom must be continued. The Nationalist Movement must be a movement of the masses with a programme reflecting the interests of the majority of the people. The programme of the movement must be free from all haziness and ambiguity, such as has been the case with the Swarajist programme.

Particularly clear should be the position of the Nationalist Movement on the agrarian question. The peasantry constitute over 70 per cent of the population. It is the most important economic factor in the present state of Indian society. It will play a decisive role in the movement for National liberation. The fight for the peasantry should be one of the main task of the Nationalist Movement. Imperialism is endeavouring skilfully to regain the confidence of the peasantry. During the last years, it has forced upon the landowning class tenancy reform laws in several provinces. This has enabled it to take in hand the alarming situation created by the acute agraian disturbances in 1919-21. The next step in the attempt to regain the confidence of the peasantry is the Royal Commission on Agriculture. Needless to say that the motive behind all these moves is not to help the peasantry, but to deceive them. Brutal exploitation of the peasant masses is the main source of imperialist profit from India. To frustrate the sinister designs of imperialism, to regain the confidence of the peasantry, the Nationalist Movement must adopt a radical agrarian programme and expose the motive of the so-called reform measures passed or proposed by the Government.

The following occurred in the manifesto issued by the Swaraj Party on the eve of the 1923 elections :

"It is true that the party stands for justice to the tenant, but poor indeed will be the quality of that justice if it involves any injustice to the landlord."

If the Nationalist Movement wants to secure active support of the peasant masses, it must liberate itself from the reactionary point of view expressed in this quotation. Such a programme is necessary for a party fishing for the vote of the landlord gentry ; but it is positively harmful for a party that proposes to lead the

popular masses in the fight for freedom. If you are so careful as not to touch the privileged position of the landowners, you can only do injustice to the peasantry. The landowning class is social parasite that sucks the blood of the peasantry. Then, over nearly half the country, the government is the landlord. The maxim of justice should also apply there.

Thus the Swarajist programme about the peasantry not only protects the parasitic landowners, it gives British imperialism an unlimited lease of life. The agrarian programmes of the Nationalist Movement must be to defend the interests of the peasantry. It should be directed ruthlessly against all the agencies, foreign and native, that exploit the peasantry.

The Programme of the Nationalist Movement

The movement for national freedom can be led to victory only by a party of the people. Unless it is led by a party which acts according to a clearly defined programme, the Nationalist Movement will be floundering like a rudderless ship. It is remarkable that for years the leaders did not tell the country what exactly was the object of the Nationalist Movement. Swaraj was defined as everything but what it is—national independence. The Nationalist Movement loses all meaning if its object is not to secure national freedom National freedom —it is a very clear expression. It does not require any legal or constitutional commentary. It means freedom for the people to establish its own government—to manage its own affairs, political, economic, cultural and so forth. Up till now this fundamental point of the Nationalist programme has not been clearly and squarely placed before the country. This must be done as the first act in reorganising the Nationalist Movement. Let not the controversy over the conditions under which Nationalists should accept office confuse the main issue. All the existing Nationalist parties today are committed to the programme of Dominion Status. Even that much is not demanded immediately. Some measures of responsibility to the present unrepresentative legislature would placate the most radical element. This is no struggle for national

freedom. It is mockery. It is downright betrayal of the nation. **The people must have freedom, complete and unconditional.** There must be a people's party to demand and fight for this freedom.

Then, national freedom is not a thing in itself. National freedom would not be worth having and fighting for, if it did not bring the people political and economic rights that they are deprived of under the present conditions. The concrete form of a national freedom will be the establishment of a ***Republican State*** based on advanced democratic principles. **A national Assembly elected by the Universal adult (Man and Woman) suffrage** will be the supreme organ of the people. All caste and class privileges will be abolished. The country will be thoroughly democratised.

To the masses, National freedom must offer more concrete advantages. It must remove their immediate economic grievances and guarantee them a higher standard of life. National freedom must establish the principle : **The land belongs to the tiller.** Parasitic classes living in luxury on unearned income from land will be deprived of their vested interest. The enormous sums that swell the pockets of the landowning class will go to relieve the burden on the peasantry. Land rent will be reduced all round. Poor peasants, eking out a miserable existence on uneconomic holdings will be entirely exempt from rent. The peasantry will be protected against the excesses of the moneylenders.. The National Government will help the peasantry by means of extensive agrarian credits. The cultural level of the peasantry will be raised through the introduction of machinery in agriculture and through free primary education.

The National Government will guarantee the industrial workers ***an eight-hour day and minimum living wage.*** There will be legislation as regards decent working conditions and housing. Unemployed workers will be taken care of by the State.

Public utilities, such as railways, waterways, telegraphs etc. will be the property of the nation. They will be operated not for private profit but for the use of the public.

Workers (also peasants) will have full freedom to combine, and the right to strike to defend their interests.

There will be complete freedom of religion and worship. National and communal minorities will enjoy the right of autonomy.

These are the main points of the programme which will unite the overwhelming majority of the people and set them in irresistible action. The programme of bourgeois Nationalism (defence of the capitalist and landowning classes) has betrayed the nation. The nation must assert itself and move toward freedom in spite of the treachery and timidity of the bourgeoisie. The National Congress must be liberated from the influence of hypocritical bourgeois politicians. Those willing to fight honestly and courageously for freedom must become the spokesmen of the people. The party that wishes to lead the struggle for national liberation must become the party of the people, representing not the fortunate few of the electorate, but the unfranchised majority. Council chambers present too restricted a field of operation for the party of the people, which must find much wider spheres of action.

National Independence and complete Democratisation of national life in every respect—these are the main planks of the Nationalist platform. The battle to realise this programme must be fought with the slogan : **Land, Bread, Education.**

THE COMMUNIST PARTY OF INDIA.

Dec. 1st, 1926.

Dorrit Press Ltd. (T. U. throughout) 68 & 70 Lant Street, Borough, London, S. E. 1.

নিবেদন

কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের অত্যন্ত মূল্যবান রচনা "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" বইখানির প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১ সনে। তাঁর রচনা ও প্রকাশনা সম্বন্ধে তিনি নিজেই সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন।

পরে বইখানির দ্বিতীয় খণ্ডের রচনা তিনি শুরু করে-ছিলেন। তার প্রথম তিনটি ফর্মা তিনি জীবিত থাকতেই ছাপা হয়েছিল, তিনি তা দেখেও গেছেন। পরবর্তী অংশ ১৯৭৩ সনের মার্চ-এপ্রিল মাসে যেভাবে বলে গিয়েছিলেন তা লিখে নিয়েছিলেন সুমন্ত হীরা। সে লেখা তাঁকে পড়ে শোনানো হয়েছিল এবং তিনি তা অনুমোদন করেছিলেন। ঐ এপ্রিল মাসের ৩০শে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় নার্সিং হোমে নেবার পর সে রচনা আর অগ্রসর হয়নি, অসমাপ্তই থেকে গেছে। এখন সেই অংশও ছাপা হলো।

সুতরাং মুজফ্ফর আহ্মদের "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি"-র দ্বিতীয় খণ্ড এই অসমাপ্ত ও অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই প্রকাশ করা হচ্ছে।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আমি উনিশ শ' বিশ হ'তে উনিশ শ' উনত্রিশের ঘটনার কথা বলেছি। কিন্তু উনিশ শ' বিশের দশকে দেশে যে ব্যাপক মজুর আন্দোলন ও সংগ্রাম চলেছিল সে সবের কথা কিছুই বলা হয়নি। যে সব আন্দোলন ও সংগ্রামের সহিত আমাদের পার্টির (ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টির আর কমিউনিস্ট পার্টির) যোগাযোগ ছিল, সেগুলির কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। না বলায় অনেকে আশ্চর্যও হয়েছেন। বিশের দশক ভারতবর্ষে মজুর আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। দরখাস্ত লেখার আন্দোলন পরিণত হয়েছে সংগ্রামশীল আন্দোলনে। পুস্তকের এই খণ্ডে আমি সেই সব কথা কিছু কিছু বলব। বিশের দশকের আন্দোলন ও সংগ্রামের ভিতর হতেই মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কারণ উদ্ভূত হয়েছিল। তার পরে ১৯২৮ সালের ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে কলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মিটিং হয়েছিল। সমস্ত ভারতের পার্টি প্রতিনিধিরা তাতে যোগ দিয়েছিলেন। এই সভার গুরুত্ব একটা পার্টি কংগ্রেসের সমান। এই সভাতেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নূতন সেন্ট্রাল এক্জেকিউটিব কমিটি (পরবর্তী সময়ের সেন্ট্রাল কমিটি) নির্বাচিত হয়েছিল। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিন দিনের এই সভায় গৃহীত হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ এই পার্টি সভার কোনো উল্লেখ পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নেই। এই খণ্ডে তার বিবরণ দিতে হবে। ১৯২৯ সাল ঘটনাময়। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ১৯২৯ সালের ঘটনাগুলির মধ্যে শুধু এম. এন. রায়ের বহিষ্কারের কথাই বর্ণিত হয়েছে। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার গিরেফ্তার ও আরম্ভ এই ১৯২৯ সালেই হয়েছিল। আরও বহু ঘটনা ঘটেছে ১৯২৯ সালে। তাই, আমার পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের নামের সহিত "১৯২৯-১৯৩৪" জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভা ঃ ডিসেম্বর, ১৯২৮

সারা-ভারত ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টির সম্মেলন ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৪শে তারিখে শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপরে কলকাতাতেই বসেছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সারা ভারতীয় বৈঠক। ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর (১৯২৮) এই তিন দিন চলেছিল মিটিং। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় দাখিল-করা কাগজপত্র হতেও এই তারিখগুলি সমর্থিত। ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টির সম্মেলন চলার সময়ে অলবার্ট হলের কমিটি রুমে কমিউনিস্ট পার্টির যে মিটিং হয়েছিল তার কথা আমি এ পুস্তকের প্রথম খণ্ডে লিখেছি।

এর আগে আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মিটিং মাদ্রাজে ও দিল্লীতে করেছি এবং বোম্বেতে কয়েকবার করেছি। কোনো মিটিং কিন্তু তিন দিন ধরে' হয়নি। পার্টির অন্য কোনো বৈঠকে এত বেশী বিষয়ও আলোচিত হয়নি। ফিলিপ স্প্রাট ও বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস ব্রাডলি গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। ভারতবর্ষে আমাদের সঙ্গেই তাঁরা পার্টির কাজ করতেন। এই তিন দিনের বৈঠকে তাঁরা আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য জ্যাক রায়ানও (Jack Ryan) ভ্রাত্রীয় প্রতিনিধিরূপে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত বৈঠকগুলিতে উপস্থিত ছিলেন। প্যানপ্যাসেফিক ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েট যাতে অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করে তার জন্যেই জ্যাক রায়ান এদেশে এসেছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি সাফল্য লাভ করেননি। অল-ইনডিয়া ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টির সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত থেকেছেন। ১৯৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির জেনেরেল সেক্রেটারি কমরেড শার্কি (L. L. Sharkey) যখন ভ্রাত্রীয় প্রতিনিধিরূপে কলকাতায় আমাদের পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন তখন তাঁর মুখে শুনেছিলেম যে জ্যাক রায়ান কমিউনিস্ট পার্টির বাইরে চলে গেছেন।

কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির এই সভায় ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারীও যোগ দিয়েছিলেন। এদেশে পার্টির সভায় এটা ছিল তাঁর প্রথম যোগদান। তিনি জার্মানী হতে এসেছিলেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি ফিজিকাল কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট করেছিলেন। জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টিতেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন। বোম্বেতে জাহাজ হতে নামার পরে কাস্টম অফিসাররা যখন তাঁর মালপত্র পরীক্ষা করছিলেন তখন তাঁরা তাঁর জার্মান পার্টির পরিচয় পত্রখানি নিয়ে নিতে চাইছিলেন। একজন কাস্টম অফিসার ও ডক্টর অধিকারীর মধ্যে এই পরিচয় পত্রখানি নিয়ে টানাটানি শুরু হলে পত্রের অর্ধেক কাস্টম অফিসারের হাতে চলে গেল, আর বাকী অর্ধেক থেকে গেল ডক্টর অধিকারীর হাতে। তিনি তাঁর পরিচয়পত্ররূপে কাগজের এই ছেঁড়া অংশটুকু কমিউনিস্ট পার্টির সভায় পেশ

করলেন। আমরা মত দিলাম যে কাগজের ছেঁড়া টুকরোই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর সঙ্গে তাঁর মাসতুত ভাই ভালচন্দ্র ত্র্যম্বক রণদীবেও কলকাতায় এসেছিলেন। তবে, তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তিন দিনের সভাগুলিতে যোগ দেননি। বোম্বে ফিরে গিয়েই তিনি ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রথম যোগ দেন। আমরা পার্টির রেকর্ডে দেখতে পাচ্ছি যে বোম্বেতে কমিউনিস্ট পার্টির ১৭ই মার্চ ও ১৯শে মার্চ (১৯২৯) তারিখের সভায় তিনি যোগ দিয়েছেন। কমরেড বি· টি· রণদীবে এখন (১৯৭০) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদীর) পলিট ব্যুরোর সভ্য।

কলকাতায় পার্টির প্রথম দিনের বৈঠকে (২৭শে ডিসেম্বর) শান্তারাম এস· মিরাজকরকে পাকাপাকিভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আমার প্রস্তাবানুসারে সেদিন সোহন সিং জোশকেও পার্টিতে নেওয়া হয়। পূরণচন্দ্র জোশীর নামও আমি প্রস্তাব করি। সভায় তাকে পার্টিতে নিতে কারুর কোনো আপত্তি ছিল না। তবে, সকলে বললেন তার নামটি এখন মুলতুবী রাখা হোক। তার মানে অদূর ভবিষ্যতে পার্টির যে বিপদ আসার সম্ভাবনা আছে তা থেকে তাকে বাঁচানো। তার বয়স কম ছিল। কিন্তু জোশী কোনো বাধা মানল না। চারদিকে অকারণে চিঠিপত্র লিখে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। তখন আমি ফিলিপ স্প্রাট ও হালীমের সঙ্গে পরামর্শ করে বোম্বেতে পার্টির জেনেরেল সেক্রেটারি ঘাটেকে লিখেছিলেম যে পূরণচন্দ্র জোশীকে বিপদের হাত হতে বাঁচানো যাবে না। তার পার্টি সভ্যপদ মুলতুবী রেখে কোনো লাভ নেই। অন্যদের মতো তাকেও পার্টি সভ্যরূপে গণ্য করা হোক। এই পত্র হয়তো পুলিসের হাতে পড়েনি। কিন্তু পূরণচন্দ্রকে আমি যে সাবধান করে দিয়েছিলেম তা মীরাট মোকদ্দমার রেকর্ডে আছে। কমরেড ডি· বি· কুলকার্নিকেও কলকাতার সভায় পার্টির সভ্য ক'রে নেওয়া হয়েছিল।

কলকাতার সভায় শান্তারাম মিরাজকরকে যে পাকা পার্টি সভ্য করে নেওয়া হয়েছিল সেটা ছিল একটা ভুয়া ব্যাপার। মিরাজকর আসলে ১৯২৭ সালের আরম্ভেই পার্টি সভ্য হয়েছিল। ওই বছরের জানুয়ারী মাসে বোম্বেতে জর্জ এলিশনকে (তখনও তিনি আমাদের নিকটে ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল ছিলেন) আমি জিজ্ঞাসা করেছিলেম যে মিরাজকরকে কেন কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বর করা হচ্ছে না। তিনি আমায় বলেছিলেন, মিরাজকরকে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ দিয়ে বোম্বেতে যে নূতন ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টি হতে যাচ্ছে তার সেক্রেটারি করা হবে। কার্যত তাই হয়েছিল। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মিরাজকর আগে হতে কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতা ছিল। মাদ্রাজে সে যে দরখাস্ত করেছিল তার অন্য কারণ ছিল। আমরা সকলে ২২ নম্বর সাউথ বীচে সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের বাড়ীতে উঠেছিলেম। আমাদের পার্টির মিটিংও হয়েছিল সেই বাড়ীতেই। সিঙ্গারাভেলু তাঁর নবলব্ধ বন্ধু মুকুন্দলাল সরকারকে হঠাৎ সেই মিটিং-এ এনে বসিয়ে দিলেন এবং অনুরোধ করলেন যে সরকারের সভ্যপদ তখনই মঞ্জুর ক'রে তাঁকে সভায় যোগ দিতে দেওয়া হোক। আমরা সিঙ্গারাভেলুর ব্যবহারে স্তম্ভিত হয়ে তখনই মিরাজকরকে দিয়ে সভ্যপদের জন্যে দরখাস্ত করালাম। দু'খানি দরখাস্তের ওপরেই ওই মিটিং-এর সভাপতি (এস· এ· ডাঙ্গে) লিখে দিলেন যে পরে বিবেচিত হবে। মুকুন্দলাল সরকারকে কমিউনিস্ট পার্টি কোনো দিন বিশ্বাস করেনি। সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার বুঝেছিলেন যে মুকুন্দ সরকার কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ আর পাবেন না।

ঘাটের বহু পকেট বিশিষ্ট একটি কোট ছিল। সেই সকল পকেট কমিউনিস্ট পার্টির কাগজপত্রে ভর্তি থাকত। কলকাতার সভায় মিরাজকরের সেই দরখাস্ত-খানি সে পেশ করেছিল। আমরা জানিনে মুকুন্দলাল সরকারের দরখাস্ত কোথায় চলে গিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির এই্ রকম অবস্থা কখনও ছিল না যে সভ্যপদের জন্যে দরখাস্ত করে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। মাদ্রাজের পরে পার্টি মিটিং দিল্লীতে হয়েছে, বোম্বেতেও কয়েকবার হয়েছে। সোহন সিং জোশ সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার মিটিং-এ সভ্যপদ পেয়ে গেলেন। পূরণচন্দ্র জোশীও আসলে সভ্যপদ পেয়েই গিয়েছিলেন। সেটা মুলতুবী রাখা হয়েছিল একটা বিশেষ কারণে।

কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির সভায় মিরাজকর উপস্থিত থাকতে পারেনি। সেই সময়ে বোম্বেতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় বোম্বের কমরেডরা এক রকম জবরদস্তি মিরাজকরকে বোম্বে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের এক্‌জেকিউটিব কমিটিতে প্রতিনিধি প্রেরণ

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আমি শওকত উস্‌মানী সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছি। লিখেছি যে উস্‌মানীরা ক'জন জাল পরিচয়-পত্র নিয়ে এবং ব্রিটিশ স্পাই মস্‌উদ আলী শাহের সাহায্যে ইরানী পাসপোর্ট সংগ্রহ ক'রে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেস (১৭ই জুলাই হতে ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮) আরম্ভ হওয়ার পূর্বক্ষণে মস্কো পৌঁছেছিল। মস্‌উদ আলী শাহ্‌ তাদের নিয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষ হতে খবর আনানোর সময় হাতে না থাকায় তখন উস্‌মানীদের কংগ্রেসে যোগ দিতে দেওয়া হয়। তাদের দু'জন মস্‌উদ আলী শাহ্‌ ও হাবীব আহ্‌মদ, ইয়ং কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল। উস্‌মানী ও শফীক যথাক্রমে সিকান্দর সুর ও রেজা নামে ভারতের তরফ হতে পুরো ডেলিগেট হয়েছিল। উস্‌মানী কংগ্রেসের প্রেসিডিয়ামের একজন সভ্যও মনোনীত হয়েছিল। লন্‌ডনের মারফতে আমাদের নিকটে মস্কোর জিজ্ঞাসা পৌঁছাতে অনেক সময় লেগেছিল। কলকাতার আমরা সঙ্গে সঙ্গেই অপরিস্ফুট (Cryptic) ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেম যে তাদের ওপরে আমাদের আস্থা নেই এবং তাদের ভিতরে সন্দিগ্ধ লোকও রয়েছে। মনে হচ্ছে আমাদের খবর কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালে পৌঁছাবার পূর্বেই ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়ে যায়। উস্‌মানী ওদেশে থেকে যাওয়ার জন্যে গিয়েছিল। কংগ্রেস শেষ হওয়ার দিন যতই এগিয়ে আসছিল ততই সে অনুভব করছিল যে তার থেকে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। আমাদের রিপোর্ট পৌঁছালে সে গিরেফ্‌তারও হয়ে যেতে পারে। এই কারণে কংগ্রেস শেষ হওয়া মাত্রই সে ক্রিমিয়ায় চলে যায়। সেখানে কিঞ্চিৎ চিকিৎসিত হওয়ার পরে ইউরোপ হয়ে সে সোজা ভারতবর্ষে চলে আসে। সে জাহাজ হতে নেমেছিল বোম্বেতে। এ কথা তার জানা ছিল যে কলকাতায় তখন ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টির সারা-ভারত সম্মেলন হচ্ছে। তাই সে সোজা চলে এলো কলকাতায়। এসেই আমার সঙ্গে সন্ধ্যার পর দেখা করল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে হিন্দুস্তান বিল্ডিং-এর নীচের তলায় একটি রেস্তোরাঁয় আমার সঙ্গে গিয়ে সে বলল, "আমি তোমাদের নিকটে সম্পূর্ণরূপে

আত্মসমর্পণ করলাম। তোমরা এখন আমাকে নিয়ে যা খুশী করতে পার। আমাকে বরঞ্চ কোনো গ্রামেই পাঠিয়ে দাও। কিছু কাজ নিয়ে আমি গ্রামেই পড়ে থাকব।" একথা বলেই সে তার পকেট থেকে তার ইরানী পাসপোর্টখানি বা'র ক'রে আমার হাতে দিল। ইউরোপের কোনো কোনো দেশের দু' একটি ক'রে ধাতু মুদ্রা তার পকেটে ছিল। সেগুলিও বা'র ক'রে সে আমার হাতে দিল। অর্থাৎ, সে যদি তখনই গিরেফ্‌তার হয়ে যায় তবে তার নিকটে তার ইউরোপ ও মস্কো যাওয়ার কোনও চিহ্ন না থাকে এমন ব্যবস্থা সে করল।

উস্‌মানী আমার নিকটে তার জাল পরিচয়পত্রগুলির কথা সবই বলল এবং আরও বলল যে আজমীঢ়ের অর্জুনলাল শেঠীও তার একটিতে সই করেছিলেন। কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের ৬ষ্ঠ কংগ্রেসে অনেক আলোচনার কথাও সে আমায় তখন জানিয়েছিল। বলেছিল যে আলোচনার সময়ে আমার অনেক সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু মাজুত তার প্রতিবাদ করায় তা থেমে যায়। আমার সমালোচনা উস্‌মানীই করেছিল কিনা আমি তা জানিনে। আমি তার মস্কো যাওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেম। উস্‌মানী আরও বলেছিল যে কমিউনিস্ট ইন্‌টার-ন্যাশনালের হেড কোয়ার্টার্সে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের সোজাসুজে ভা হতে গিয়ে থাকতে হবে। "তোমার আর এস. ভি. ঘাটের নাম কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের এক্‌জেকিউটিব কমিটির অল্‌টারনেট মেম্বর হিসাবে প্রস্তাবিত হয়েছে, ইত্যাদি।" মাজুতের পরিচয় আমি পরে দেব।

কথাগুলি আমি আমাদের পার্টি কমিটির অন্যান্য মেম্বরদের নিকটে রিপোর্ট করেছিলেম। উস্‌মানী নিজেও তাঁদের বলে থাকতে পারে। জে. ডব্লিও. জনস্টোন (J. W. Johnstone) আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরূপে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। অল-ইনডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ঝরিয়া অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্যে তিনি ভারতে এসেছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লীগের অন্তর্ভুক্তকরণের প্রচেষ্টা তাঁর কাজ ছিল। আমার যতটা মনে পড়ে তিনি তাতে সফলও হয়েছিলেন অর্থাৎ অল-ইনডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লীগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়ন শেষ হওয়ার আগেই জনস্টোনকে ঝরিয়াতে গিরেফ্‌তার ক'রে ভারত হতে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। কলকাতাতে কয়েক দিন থাকার পরে তিনি ঝরিয়া গিয়েছিলেন। সেই ক'দিন তিনি মজুরদের নানান সভা-সমিতিতে, বিশেষ ক'রে বাউড়িয়ার ধর্মঘট-কারী মজুরদের মিটিং-এ বক্তৃতা দিয়েছেন। সুবক্তা ছিলেন তিনি। ভারতবর্ষ তাঁর নিকটে অচেনা জায়গা ছিল না। আগে তিনি জাতিতে ইংরেজ ছিলেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি ভারতে ইংরেজ সৈনিক ছিলেন। কলকাতার ফোর্টউইলিয়াম দুর্গে তিনি বাস করে গেছেন। তাঁর এদেশে থাকার সময়ে আমি আমাদের ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টি কনফারেন্সের কাজে অতি ব্যস্ত ছিলেম। তাই জনস্টোনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করার সময় পাইনি। ফিলিপ স্প্রাটের সঙ্গে তাঁর অনেক কথা হয়েছিল। কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের এক্‌জেকিউটিব কমিটিতে ভারতের পার্টির প্রতিনিধি পাঠানো সম্বন্ধে জনস্টোন স্প্রাটকে কিছু বলেছিলেন কিনা সে-খবর নেওয়ার সময় কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির মিটিং হওয়ার আগে আমি নিতে পারিনি।

উস্‌মানীরা যেভাবে মস্কো গিয়েছিল তাতে উস্‌মানীকে কলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মিটিং-এ বসতে দেওয়াটা আশ্চর্য ঠেকতে পারে। কিন্তু তার

আত্মসমর্পণের ফলে সকলের মন ভিজে গিয়েছিল। তাই তাকে সভায় বসতে দেওয়া হয়। সে সুদীর্ঘ রিপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করেনি। অত্যন্ত নিরীহের মতো সভায় বসেছিল। কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের এক্‌জেকিউটিব কমিটিতে যে সোজাসুজি ভারত হতে প্রতিনিধি গিয়ে মস্কোয় বাস করতে হবে এবং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘাটের নাম এই এক্‌জেকিউটিব কমিটির অল্‌টারনেট মেম্বররূপে প্রস্তাবিত হয়েছে, এই রিপোর্ট সে সভায় করে।

বিষয়টি সভায় আলোচিত হয়। দু'জন নয়,—**একজনই** কমিউনিস্ট ইন্‌টার-ন্যাশনালের এক্‌জেকিউটিব কমিটিতে যাবেন এটা আগে ধরে নিয়েই আলোচনা চলেছিল। উস্‌মানীর রিপোর্ট সত্ত্বেও ঘাটের নাম আলোচিত হয়নি। নিজের নাম সকলেব সামনে তুলে ধরবে এমন লোক ঘাটে ছিল না। মিরাজকর, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কেশব জোগলেকরের নাম সভায় আলোচিত হয়। জ্যাক রায়ান মিরাজকরের নাম সভায় প্রস্তাব করেছিলেন এবং অত্যন্ত জোরের সঙ্গে করেছিলেন। কলকাতা ছাড়ার আগে মিরাজকর তাঁকে খুব ভজিয়ে গিয়েছিল। নিজেকে সামনে তুলে ধরা ছিল মিরাজকরের সহজাত গুণ বা দোষের মতো। তবে তার প্রচেষ্টা হতে বুঝে নিতে হবে যে আগে হতে পার্টি মেম্বর না থাকলে সে কখনও জ্যাক রায়ানকে দিয়ে নিজের নাম প্রস্তাব করাত না। জোগলেকর অবশ্য নিজের নাম নিজেই প্রস্তাব করেছিল। এটা তার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। আমার নাম যতটা মনে পড়ে উস্‌মানীর রিপোর্ট হতে উঠেছিল। হতে পারে জেনেরেল সেক্রেটারি হিসাবে ঘাটে আমার নাম প্রস্তাব করেছিল। ব্যাপারটি আমার এখন ভালো মনে নেই। প্রথমে স্থির করা হয় যে মিরাজকর ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এই দু'জনের একজনকে মস্কো পাঠানো হবে। তার পরে ঠিক হয় যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকেই পাঠানো হবে। এই আলোচনাতে আমি একটি কথাও উচ্চারণ করিনি। আমি আমার মনে আনন্দ অনুভব যে করিনি তা নয়, কিন্তু পার্টির বাইরের লোকেরা ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টির কনফারেন্সের সময় যে ক্ষতি করেছিলেন তার আঘাত আমি তখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

কলকাতা হতে বোম্বে ফিরে যাওয়ার সময়ে বেন ব্রাডলি আমায় বারে বারে বলে গেলেন খুব শীঘ্রই যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেল। বোম্বে ফিরে গিয়েও আবার সেই কথাই বলে পাঠালেন। কিন্তু যাওয়ার ব্যবস্থা কি করে হবে যেতে যে টাকার প্রয়োজন সে কথা কেউ বলে গেলেন না। তাঁরা সব দায়িত্ব আমার ওপরে ন্যস্ত করে যে যার পথে চলে গেলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতার সভায় পার্টিতে নূতন মেম্বর গ্রহণ করা হয়েছিল সে কথা বলেছি। কয়েকজন পার্টি হতে বহিষ্কৃতও হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন (১) মাওলানা হস্‌রত মোহানী, (২) লাহোরের শাম্‌সুদ্দীন হাস্‌সান ও (৩) সি· কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার। হস্‌রত সাহেবের বহিষ্কারের কারণ এই ছিল যে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন। এখন যে-সব কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে কানপুরের কমিউনিস্ট পার্টি হতে বা'র হয়ে গিয়ে সত্যভক্ত তাঁর দ্বিতীয় ন্যাশনালিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছিল। তাতেও হস্‌রত সাহেব ছিলেন। সি· কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারের বহিষ্কারের কথা এই পুস্তকে প্রথম খণ্ডে লিখেছি।

কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতার এই সভায় পার্টির সেন্ট্রাল একজেকিউটিব কমিটিও নির্বাচিত হয়েছিল। তাতে সভ্য ছিলেন ঃ

(১)	এস· ভি· ঘাটে	বোম্বে
(২)	এস· এস· মিরাজকর	
(৩)	এস· এ· ডাঙ্গে	
(৪)	আর· এস· নিম্বকর	
(৫)	কে· এন· জোগলেকর	
(৬)	মুজফ্ফর আহ্মদ	কলকাতা
(৭)	আবদুল হালীম	
(৮)	শামসুল হুদা	
(৯)	মীর আবদুল মজীদ	পাঞ্জাব
(১০)	সোহন সিং জোশ	

এবারেও এস· ভি· ঘাটেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জেনেরেল সেক্রেটারি করা হয়। পার্টির এই সভার অতি সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পি ১২৯৫ নম্বর এক্‌জিবিটরূপে তার পেপার বুকে ছাপা হয়েছে।

*　　　　*　　　　*　　　　*

কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের একজেকিউটিব কমিটিতে কে যাবেন তা যেদিন স্থির হলো সেদিনই আমাদের সভায় উপস্থিত একজনের সহিত ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টির একজন সভ্য যিনি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন না দেখা করলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য তাঁকে বলে দিলেন যে কমিউনিস্ট ইন্‌টার-ন্যাশনালের একজেকিউটিব কমিটিতে যোগ দেওয়ার জন্য মুজফ্ফর আহ্মদ মস্কো যাচ্ছেন। ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টির সভ্যটি ছিলেন তাঁদেরই একজন যাঁরা পার্টির বন্ধু ও দরদী মহলে ব'লে বেড়াচ্ছিলেন যে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তীর ওপরেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার ভার কমিউনিস্ট ইন্‌টার-ন্যাশনাল দিয়েছিলেন, কিন্তু মুজফ্ফর আহ্মদ সেই অধিকার আত্মসাৎ করে নিয়েছে। তিনি কোনো সময় নষ্ট না করে এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে সঙ্গে সঙ্গেই খবরটি পুলিসের ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগে পৌঁছে যায়। এই ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগ বলতে আমি কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চকেও শামিল করে নিচ্ছি। কারণ, তাঁরাই সে যুগে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি বিশেষ নজর রাখছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিসও তাদের তৎপরতা দেখাল। যিনি আমার মস্কো যাওয়ার সিদ্ধান্তের খবর সংগ্রহ ক'রে নিয়েছিলেন তিনিই কয়েক দিন পরে টেলিফোনে আমায় খবর দিলেন। বললেন, তাঁর এক বন্ধু ব্যক্তিগত কাজে একজন ইন্‌টেলিজেন্স অফিসারের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে দেখা করতে গিয়েছিলেন। অফিসারটি বাড়ীতেও আফিসের কাজ করছিলেন। তাঁর টেবিলের ওপরে একখানি ছাপানো সার্কুলার পড়ে থাকতে তিনি দেখেন। সেই সার্কুলারে আমার ফটো মুদ্রিত হয়েছিল। তাতে নির্দেশ দেওয়া ছিল যে এই লোকটি যেন জল বা স্থল কোনো পথেই ভারতবর্ষ হতে বা'র হয়ে না যেতে পারে। অভিযুক্ত হয়ে মীরাটের আদালতে যাওয়ার পরে জুনিয়র পবলিক প্রসেকিউটর মিস্টার জে· পি· মিত্রও আমাদের এই খবর দিয়েছিলেন। টেলিফোনের খবর পাওয়ার পরে আমি বুঝেছিলেম যে আমার মস্কো যাওয়ার দফা রফা হয়ে গেল।

মজুরদের লড়াই ঃ ১৯২৭ ও ১৯২৮ সাল

১৯২৭ সালে আমরা কলকাতা-কাশীপুর অঞ্চলের জুট প্রেস মজুরদের ধর্মঘটে কিছু সাহায্য করেছিলেম। ইংরেজ মালিকের কাগজ "স্টেটস্‌ম্যান" আমাদের খোঁজ-খবর রাখার চেষ্টা করতেন। তাঁরা লিখলেন এবার পেজান্ট্‌স এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি মজুরদের লড়াইয়ে নামল।

১৯২৭ সালের মজুরদের আরও একটি লড়াইতে আমরা সাহায্য করেছিলেম। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট মজুরদের একটা বিশেষ অংশ (সেক্‌শন্‌) ধর্মঘট করেছিলেন। আমরা তার পরিচালনা করেছিলেম। এই পরিচালনায় আমাদের সঙ্গে গভীরভাবে লিপ্ত ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় যুবক গড্‌বোলে। তিনি পেজান্ট্‌স এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টির বা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন না, কলকাতার এজ্‌রা স্ট্রীটে কোনও সওদাগরী আফিসে চাকরী করতেন। হাইকোর্টের নিকটে একটি ছোট পার্কে প্রতিদিন ধর্মঘটী মজুরদের মিটিং হতো। এই পার্ক জুড়েই পরে বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিব এসেম্‌ব্লীর বাড়ী উঠেছে। এ সব মিটিঙেই গড্‌বোলের উদ্যোগে কাস্তে ও হাতুড়ী বাদ দিয়ে কলকাতায় প্রথম লাল ঝাণ্ডা ওড়ানো হয়েছিল। তিনি আমাদের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করতে এসেছিলেন। তাঁকে আমরা জোর করে বলিনি যে কাস্তে-হাতুড়ী খচিত লাল পতাকাই ওড়াতে হবে।

১৯২৭ সালের শেষ ভাগে নবেম্বর মাসে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের (এখনকার সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ে) খড়্গপুর কারখানায় মজুরদের ধর্মঘট হয়েছিল। মুকুন্দলাল সরকার অল্‌-ইন্‌ডিয়া রেলওয়ে মেন্‌স ফেডারেশনের নাম দিয়ে একটি কাগুজে সংগঠন খাড়া করেছিলেন। পরে তা সত্যকার শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। খড়্গপুর রেলওয়ে কারখানার মজুরদের ধর্মঘটে মুকুন্দলাল সরকার কি করে নেতৃত্বে বরিত হলেন তা আমার ভালো মনে নেই। খুব সম্ভবত অল-ইন্‌ডিয়া রেলওয়ে মেন্‌স ফেডারেশনের নেতা হিসাবে তিনি খড়্গপুর ধর্মঘটেরও নেতা হয়েছিলেন। কোন্‌ সময়ে সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার সহিত তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল তা জানিনে, কিন্তু তিনি খড়্গপুরে চেট্টিয়ারকে ডেকে এনে নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন। সেখানে তেলেগুভাষী মজুরদের বড় প্রাধান্য। তামিলভাষী চেট্টিয়ার তেলেগু বুঝতেন বটে, কিন্তু তাতে বক্তৃতা দিতে পারতেন না। প্রতিদিন তিনি ইংরেজি ভাষায় দীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন। অন্য কেউ তেলেগুতে তর্জমা করে তাঁর বক্তৃতা মজুরদের বুঝিয়ে দিতেন।

১৯২৭ সালের নবেম্বর মাসে আমরা ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্‌স পার্টির আফিস ৩৭, হ্যারিসন রোড (মহাত্মা গান্ধী রোড) হতে তুলে এনে সবে ২/১, ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে (আবদুল হালীম লেনে) ঘর গোছানোর চেষ্টা শুরু করেছি, মুকুন্দলাল সরকারের নিকট হতে আমার নামে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আসতে লাগল যে "খড়্গপুরে আসুন"। সব কাজ ফেলে রেখে আবদুল হালীমকে সঙ্গে নিয়ে আমি খড়্গপুরে গেলাম। আমাদের সঙ্গে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ

দত্তও গেলেন। তিনি অবশ্য ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টির সভ্য ছিলেন না। ওখানে পৌঁছে দেখলাম যে বোম্বে হতে এস. এ. ডাঙ্গে আর শান্তারাম মিরাজকরও পৌঁছে গেছে। আসলে অল-ইন্‌ডিয়া রেলওয়ে মেন্‌স ফেডারেশনের কন্‌ফারেন্স হচ্ছিল। ডাঙ্গে, মিরাজকর, হালীম ও আমি,—আমাদের কেউ কোনও রেলওয়ে ইউনিয়নের সঙ্গে সংসৃষ্ট ছিলেম না। তবুও প্রেসিডেণ্ট ভি. ভি. গিরি ডাঙ্গেকে বলতে দিলেন। হালীম আর আমি কলকাতা চলে এসেছিলেম। ডাঙ্গেরা এক দিন বেশী ছিল। নির্বাচনে মুকুন্দলাল সরকারের হাতে কোনো ক্ষমতা আর থাকল না, তাঁর নিকট হতে কাগজ-পত্র ও টাইপ-রাইটার ইত্যাদি কেড়ে নেওয়া হলো। ধর্মঘটও তুলে নেওয়া হলো। কিন্তু মুকুন্দলালও প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। সেকালে আমাদের দেশের পিছিয়েপড়া মজুরেরা দীর্ঘ দিন ধর্মঘট করে থাকলে বিদেশের মজুরেরা সাহায্য পাঠাতেন। খড়্গপুরের মজুরদের নামেও ধর্মঘট তুলে নেওয়ার পূর্বক্ষণে অনেক হাজার টাকা সোবিয়েৎ ইউনিয়নের মজুরেরা পাঠিয়েছিলেন। ঠিক অঙ্কটা আমার মনে নেই, তবে খুব মোটা টাকা। মুকুন্দলাল সরকার কর্তৃপক্ষকে লিখে জানালেন যে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়েছে। টাকার আর প্রয়োজন নেই। অতএব, টাকা ফেরৎ চলে গেল। তার পরে নানা মহলে এই টাকার জন্যে যে বুক চাপড়ানো দেখেছিলেম তা সত্যই উপভোগ করার মতো ছিল।

খড়্গপুরেই আমি প্রথম জটাজুটওয়ালা কিরণচন্দ্র মিত্রকে দেখেছিলেম। তিনি তখন আর কিরণচন্দ্র মিত্র ছিলেন না, হয়ে গিয়েছিলেন জটাধারী বাবা। ইস্ট ইন্‌ডিয়া রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তিনি তখন ছিলেন সেক্রেটারী।

লিলুয়ার ধর্মঘট

লিলুয়া হাওড়া শহরের একটি বড় শহরতলী। ওখানে ইস্ট ইন্‌ডিয়া রেলওয়ের একটি স্টেশন আছে, আর কাছে ওই রেলওয়েরই একটি খুব বড় কারখানা। ১৯২৮ সালে এই কারখানায় কত লোক কাজ করতেন তা ঠিক মনে নেই, হয়তো পনের হাজার মজুর তাতে কাজ করতেন। কিরণচন্দ্র মিত্র ওর্ফে জটাধারী বাবার এক জবানবন্দীতে আমরা পাচ্ছি যে প্রতি মাসে এগারো-বারো হাজার মজুর ইউনিয়নের চাঁদা দিতেন।

এখানে কিরণচন্দ্র মিত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। তিনি যশোহর জিলার লোক, চাকরী করতেন অবধ (Oudh) রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে (O. R. R.) স্টেশন মাস্টার ছিলেন। তাঁর নিজের কথায় (মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় আদালতে সাফাই সাক্ষীর জবানবন্দী) ১৯২০ সালে তিনি চাকরী হতে বরখাস্ত হন। কারণ, তিনি নন্‌-কোঅপারেশন (অসহযোগ) আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক সত্যের দিক হতে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল পরের বছর। তবে, ১৯২০ সালেও বড় বড় আন্দোলন হয়েছিল। তার কোনোটিতে কিরণ মিত্র যোগ দিয়ে থাকবেন। তাঁর চাকরী চলে যাওয়ার পরেও তিনি রেলওয়ে মজুরদের সংগঠন ছাড়েননি। ১৯২৫ সালে ও. আর. রেলওয়ে ইস্ট ইন্‌ডিয়া রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তার পরে তাঁর রেলওয়ে মজুর সংগঠনের নাম হয়ে গেল ইস্ট ইন্‌ডিয়া রেলওয়ে মেন্‌স এসোসিয়েশন। ১৯২৬ সালে এই এসোসিয়েশন লখনউ হতে দানাপুরে উঠে গেল। সে বছর ট্রেড ইউনিয়ন এক্ট অনুসারে ইউনিয়নকে রেজিস্ট্রী করা হলো এবং তার নাম হলো ইস্ট ইন্‌ডিয়া রেলওয়ে মেন্‌স ইউনিয়ন। 'এসোসিয়েশন' নাম আর থাকল না। ১৯২০ সাল হতে

১৯২৬ সালের ভিতরে কখন তা ঠিক বলতে পারব না, মিত্র মশায় ভেক গ্রহণ করলেন, অর্থাৎ মাথার চুল লম্বা ক'রে তাকে জটাতে পরিণত করলেন। সরলমনা মজুরেরা তাঁকে 'জটাধারী বাবা' ডাকতে লাগলেন। কিন্তু এতে দানাপুর ও খাগাউলে (সরকারী রেকর্ডে খাগাউল ছিল রেজিস্টার্ড হেড অফিস) ইউনিয়নের তেমন কোনো বাড়-বাড়ন্ত হলো না। কিন্তু এই রেলওয়ের সব চেয়ে বড় লিলুয়া কারখানায় মজুরদের নালিশের অন্ত ছিল না। তাঁরা কিরণচন্দ্র মিত্রকে ডেকে পাঠালেন এবং তিনি এলেনও। এসেই তিনি ইউনিয়নে একটি শাখা গঠন করে ফেললেন। সাফাই সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে প্রতি মাসে এগারো-বারো হাজার মজুর ইউনিয়নের চাঁদা দিতেন।

১৯২৮ সালের ৮ই মার্চ তারিখে লিলুয়া কারখানার মজুরেরা ধর্মঘট করলেন। এই ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়েছিল ওই বছরেরই ৯ই জুলাই তারিখে। সরকারী কাগজ-পত্রে তাই পাওয়া যায়। কিন্তু কিরণ মিত্র বলেছেন ১০ই জুলাই তারিখে তিনি ধর্মঘটের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন।

ভি. ভি. গিরির নেতৃত্বাধীন বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ইউনিয়ন যতটা শক্তিশালী ও প্রসারিত ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন তেমন কিছু ছিল না। কিরণ মিত্রের কি রাজনীতি ছিল তা ভালো ক'রে বোঝা যেত না, যদি কিছু রাজনীতি তাঁর থেকে থাকে তা ছিল কংগ্রেসের রাজনীতি। বড় বড় কংগ্রেস নেতাদের ডেকে এনে তিনি মজুরদের দেখাতেন। তিনি ছিলেন অতি বেশী নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রিয়। তাঁর মনে সর্বদা নেতৃত্ব হারানোর ভয় থাকত। তা সত্ত্বেও ধর্মঘট হওয়ার পরে তিনি অনেককে ডাকলেন এবং ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্ট্স পার্টির আমাদেরও ডাকলেন। সকলে এলেনও, কিন্তু তিনি চাইলেন যে তিনিই ধর্মঘটের সর্বময় কর্তা হবেন, অন্যরা পরিশ্রম ক'রে ধর্মঘটকে সফল করে দিবেন। কোনো স্ট্রাইক কমিটি গঠন করতে তিনি একেবারেই রাজী নন। তবুও তাঁর অনুরোধে আমরা ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্ট্স পার্টির তরফ হতে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে স্থায়িভাবে লিলুয়ার ধর্মঘটে কাজ করতে পাঠালেম। পার্টির অন্যরাও যাতায়াত করতেন। গোপেন রাতদিন ওখানেই থাকতে লাগলেন। মিত্র মশায় যা-ই করুন আমরা একটা মজুরের লড়াইকে ছেড়ে দিই কি করে?

শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিলুয়ার ধর্মঘটে কাজ করতে গিয়েছিলেন। তা করতে গিয়ে তাঁর কিন্তু উপকার হয়েছিল। তিনি আফগানিস্তানের শিক্ষা বিভাগে চাকরী করতে গিয়েছিলেন। ইংরেজের চাপে কাবুলে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদের যখন সে দেশ হতে বা'র হয়ে যেতে বলা হলো তখন তিনি মাওলানা ওবায়দুল্লার সঙ্গে মস্কো চলে গেলেন। তাঁর ওপরে অবশ্য আফগানিস্তান হতে চলে যাওয়ার কোনো অর্ডার ছিল না। তাই মস্কো যাওয়ার প্রয়োজনও তাঁর ছিল না। তবুও তিনি শুধু যে মস্কো গেলেন তা নয়, সেখানকার প্রাচ্য জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল শুধু আগে হতে যাঁরা কমিউনিস্ট হয়েছেন তাঁদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে। এক বছরের একটি কোর্স শেষ করার পরে তিনি বললেন যে কমিউনিজমে তাঁর বিশ্বাস হলো না। তার পরে জার্মানী হয়ে তিনি ইংলণ্ডে গেলেন। তাঁর নিকটে আফগান কর্মচারী হিসাবে ভ্রমণের দলিল ছিল। তাঁর সন্দেহ ছিল যে (হয়তো ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁকে এই কথা বলেও থাকতে পারেন) এই দলীল দেখিয়ে তিনি দেশে ফিরতে পারবেন না। তা ছাড়া, তাঁর কাছে রাহাখরচের টাকাও ছিল না। তিনি একজন ব্রিটিশ প্রজা, লন্ডনে এসে

আটকা (Stranded) পড়ে গেছেন, এই বলে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নিকট হতেই ভ্রমণের দলীল ও রাহা খরচের টাকা তিনি চাইলেন। প্রথমে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট কিছুই দিতে চাননি। পরে রাহাখরচের ব্যবস্থা ক'রে আফগান দলীলেই তাঁকে আসতে দিলেন। কিন্তু, কলকাতায় এসে কোনো কাগজে তিনি মস্কো বা রাশিয়ার অভিজ্ঞতা লিখতে আরম্ভ করলেন। লোকেরা ভাবলেন লোকটি রাশিয়া হতে ফিরে এলেন, তাঁর অভিজ্ঞতা কাগজে লিখছেন, অথচ পুলিস তাঁকে ধরল না, এটা কেমন কথা? লোকটি নিশ্চয় সরকারের গুপ্তচর হবেন। এটা বোধ হয় ১৯২৫ সালের কথা। প্রথম সাজার পরে আমি তখনও কলকাতা ফিরে আসিনি। সর্বত্র রটে গেল যে শিবনাথ বানার্জি গুপ্তচর। কাগজওয়ালারাও তাঁর লেখা ছাপানো বন্ধ করে দিলেন। সেকালে রাশিয়া সম্বন্ধে লোকেদের মনে দারুণ ভীতি ছিল। তাঁরা ভাবতেন রাশিয়া হতে ফিরে যিনি আসবেন পুলিস তাঁকে ধরবেই। আমাদের দলের লোকদের ওই রকম ধরা হতো। কিন্তু শিবনাথ বানার্জি তো আর আমাদের দলের লোক ছিলেন না।

মস্কোতে প্রাচ্য জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর পড়ার পরে তিনি বলে দিলেন যে কমিউনিজ্‌মে তাঁর বিশ্বাস জন্মায়নি। আমাদের সাধারণ মানুষেরা সে কথা কেউ হয় তো শুনেছেন, কেউ হয় তো তা শোনেনও নি। আর, পুলিসের লোকেরা ভাবল শিবনাথ ঝুট কথা বলছেন। লিলুয়ায় ধর্মঘটে কাজ করতে যাওয়ার ফলে শিবনাথের কংগ্রেসের লোকেদের মধ্যে যাতায়াত বেড়ে গেল। তাঁর আর কিরণ মিত্রের কংগ্রেসের ওপরেই বেশী বিশ্বাস ছিল। তা ছাড়া, কংগ্রেসওয়ালারাই তো ছিলেন কাগজগুলির মালিক। কাজেই, গুপ্তচর হওয়ার যে-বদনাম শিবনাথের রটেছিল লিলুয়ায় ধর্মঘটে কাজ করতে গিয়ে সেটা ধীরে ধীরে কেটে গেল। মজুরেরা কিছু না পেলেও ভারতের মজুরেরা দীর্ঘ দিনের একটি মজুরের লড়াই দেখতে পেলেন।

ধর্মঘটের কয়েকদিন কাটার পরে ধর্মঘটকে কারখানায় আবদ্ধ না রেখে রেলওয়ে লাইনে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব আমরা করলাম, কিন্তু কিরণ মিত্র কিছুতেই তা করতে রাজী হলেন না। কারণ, দূরে দূরে বিস্তৃত হলে তাঁর নেতৃত্ব চলে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি রাজী হলেন তখন লিলুয়ার মজুরেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। শুরু হতেই মজুরদের 'ডোল' দেওয়া হচ্ছিল। লাইনে ধর্মঘটের বিস্তার যখন করা হলো তখন লিলুয়ায় ডোল দেওয়ার সম্ভাবনা কমে এসেছিল। ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টির লোকেরাই লাইনে গেলেন। ফিলিপ স্প্রাট গেলেন, ধরণীকান্ত গোস্বামী গেলেন এবং আরও অনেকে গেলেন। নূতন কর্মীও অনেকে এলেন। অন্‌ডালে কারখানায় সাড়া পাওয়া গেল, আসানসোলের রেলওয়ে মজুরেরাও সাড়া দিলেন। সীতারামপুরেও মজুরদের ভিতরে মিটিং ও মুলাকাত চলছিল। কিন্তু এসব হলে কি হবে, লিলুয়া কারিখানার মজুরদের ভিতরে এসে গিয়েছিল ক্লান্তি, সেখানে দেখা দিয়েছিল অভাব আর অনটন। কিরণ মিত্র কংগ্রেসের বড় লোকদের কাছে ছোটাছুটি তো করছিলেনই, বড় লোক ধরে, যেমন কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ, গবর্নরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করলেন, ই. আই. রেলওয়ের এজেন্‌টের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বাধ্য হয়ে কিরণ মিত্র লিলুয়ার ধর্মঘট তুলে নিলেন। আর লিলুয়ার ধর্মঘটই যখন তুলে নেওয়া হলো তখন অন্‌ডাল-আসানসোলের ধর্মঘটও তুলে নিতে হলো।

এখন কিরণ মিত্রের কথা কিছু বলি। লিলুয়ার ধর্মঘট যখন চলেছিল তখন তাঁর বাবা মারা গেলেন। সেই উপলক্ষে তাঁকে মাথা ও মুখ কামাতে হলো।

অতএব তাঁর দাড়ি ও জটা গেল। উকুনের কামড় হতে বেঁচে গেলেন মিত্র মশায়। কিন্তু জটা ও দাড়ি কামানোর ফলে তাঁর একটা অসুবিধাও হয়েছিল। দাড়ি ও জটাহীন কিরণ মিত্রকে হঠাৎ দেখে মজুরেরা চিনতে পারছিলেন না। মজুরদের ভিতরে চলার সময়ে একজন মজুর তাই ঘোষণা করতে থাকতেন যে "ইনি জটাধারী বাবাই। তাঁর পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁকে দাড়ি ও জটা কামাতে হয়েছে।"

লিলুয়া ধর্মঘটের কথাই যখন আমি এখানে বলছি তখন তার সঙ্গে জড়িত একটি ঘটনার কথাও আমি এখানে বলব। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে "গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তীর কথা" শীর্ষক উপশিরোনামের ভিতরে আমি এই ঘটনাটার কথা একবার বলেছি। এখানে লিলুয়া ধর্মঘটের কথার সঙ্গে সেই ঘটনার উল্লেখ সংক্ষেপে হলেও করা দরকার। লিলুয়ায় ধর্মঘট চলার সময়ে একদিন শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কাছে এসে বললেন "স্ট্রাইকের সাহায্যের জন্যে ফিলিপ স্প্রাট ও আপনার নামে রেড্ ট্রেড্ ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনালের নিকটে মস্কোতে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে চাই।" আমি বললাম, "মিত্র মশায় (কিরণচন্দ্র মিত্র ওর্ফে জটাধারী বাবা) নিজে যা খুশী করছেন, একটি স্ট্রাইক কমিটি পর্যন্ত গঠন করলেন না, আমি এর সঙ্গে আমার নাম জড়াতে চাইনে।" তা সত্ত্বেও আমাদের না জানিয়ে তাঁরা নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাঠালেন ঃ

"SECRETARY, PROFINTERNS, MOSCOW
30,000 STRIKERS ARE OUT FOR 51 DAYS, RELIEF URGENTLY NEEDED. PLEASE SEND THROUGH BANK TO MITRA, SECRETARY, E. I. RAILWAY UNION, LILLOOAH, BENGAL.

MITRA, SPRATT, MUZAFFAR
(THE STATESMAN, TUESDAY, MAY 1, 1928)

সেক্রেটারি, প্রফিন্টার্নস্ (ট্রেড ইউনিয়নসমূহের আন্তর্জাতিক), মস্কো
৩০ হাজার মজুর ৫১ দিন ধ'রে ধর্মঘট করে আছেন। সাহায্য অত্যাবশ্যক। মিত্র, সেক্রেটারি, ই· আই· রেলওয়ে ইউনিয়ন, লিলুয়া, বেঙ্গল, ঠিকানায় দয়া ক'রে ব্যাঙ্কের মারফতে সাহায্য পাঠান।

মিত্র, স্প্রাট, মুজফ্ফর
(দি স্টেট্সম্যান, মঙ্গলবার, ১লা মে ১৯২৮)

পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের (ইন্টেলিজেন্স বিভাগের) লোকেরা হাওড়া হেড্ পোস্ট আফিসে এসে এই টেলিগ্রাম পাঠানো বন্ধ করে দিল।

পোস্ট আফিস হতে লিলুয়ার ইউনিয়ন আফিসে খবর পাঠানো হলো যে আপত্তিজনক হওয়ায় টেলিগ্রামটি পাঠানো হলো না। শ্রীকিরণ মিত্র মীরাটের আদালতে শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কিশোরীলাল ঘোষের পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন টেলিগ্রামটি ইউনিয়ন আফিসে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল। এটা ঠিক কথা নয়। এই জাতীয় টেলিগ্রামও ফাইলে রাখাই নিয়ম। তাই রাখা হয়েছিল।

মুখে মুখে কথাটা হাওড়া ও কলকাতায় রটে গেল। স্টেট্সম্যান পত্রিকায় তরুণ ইংরেজ রিপোর্টার মিস্টার প্লুটন হাওড়া হেড্ পোস্ট আফিসে গিয়ে

আটকানো টেলিগ্রামটির অবিকল নকল করে নিলেন। তিনি ২/১, ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে (এখনকার আবদুল হালীম লেন) এসে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন (স্প্রাট বোধ হয় সেদিন ছিলেন না) যে স্প্রাট ও আমি এই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম কিনা। টেলিগ্রামটি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিন্তু কোনো উপায় ছিল না, হাজার হাজার মজুর ধর্মঘট করে আছেন, টাকার দরকার। আমি তৎক্ষণাৎ মিস্টার প্লুটনকে বললাম, স্প্রাট আর আমি ই· আই· রেলওয়ে ইউনিয়নকে অধিকার দিয়ে রেখেছি যে আমাদের নাম ব্যবহার করার প্রয়োজন হলেই তাঁরা যেন তা করেন। মিস্টার প্লুটন নীরবে চলে গেলেন। পরের দিন ভোরের 'স্টেট্সম্যানে' দেখলাম পুরো টেলিগ্রামটি ছাপা হয়ে গেছে। ইংরেজের কাগজ ছিল স্টেট্সম্যান। মালিকেরা কারুর তোয়াক্কা করতেন না। রয়টারের নিউজ এজেন্সিই বা কাকে পরোয়া করতেন। তাঁরা এই টেলিগ্রামটিকে বিদেশে নিউজ করে দিলেন। আসল কার্জটি হয়ে গেল। খবরটা মস্কোতে পেঁছে গেল। টাকাও এসে গেল লয়ড্স ব্যাঙ্কের মারফতে। ভারত সরকারের রিপোর্ট অনুসারে বিশ হাজার টাকা। হাওড়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার গুরুসদয় দত্ত আই· সি· এস· কিরণ মিত্রকে শনাখ্ৎ করে দিলেন। তিনি টাকাটা সহজে পেয়ে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে কিরণ মিত্ররা আমাকে কিংবা স্প্রাটকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিলেন না যে মস্কো হতে টাকা এসেছে।

এ খবর এখানে পড়ে কেউ যেন মনে করবেন না যে এ পুস্তকের প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত "গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তীর কথা" শীর্ষক উপশিরোনামের ভিতরে বর্ণিত কথাগুলি খণ্ডিত হয়ে গেল। না, তা হলো না। এখানকার কথাগুলি অধিকন্তু। জ্ঞানী লোকেরা বলে থাকেন যে অধিকন্তুতে দোষ নেই। স্টেট্সম্যানে মুদ্রিত টেলিগ্রামটিও অতি কষ্টে সংগ্রহ করে এই সঙ্গে ছেপে দিলেম।

লিলুয়ার স্ট্রাইকের শেষ হওয়ার পরে রেলওয়ে মজুরদের ধ'রে কিরণ মিত্র আর পড়ে থাকলেন না। কেউ না কেউ লিলুয়ায় বাতি জ্বালিয়ে রাখছিলেন। দীনেশ রায় লিলুয়া ইউনিয়নে শেষ পর্যন্ত বাতি জ্বালিয়েছেন। ১৯৩৬ সালে আমার বন্দীদশা হতে মুক্তির কিছুকাল পরে একজন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী বন্ধু আমায় বলেছিলেন যে অবশেষে দীনেশ রায় লিলুয়ার ইউনিয়নটি টেরো-কমিউ-নিস্টদের নিকটে দু'শ টাকায় বিক্রয় করতে রাজী হয়েছিলেন। তার পরে বাতি বোধ হয় সব সময়ের জন্যে বুজে গিয়েছিল। যাঁরা একই সঙ্গে টেরোরিস্ট ও কমিউনিস্ট ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ টেরো-কমিউনিস্ট বলেছেন। সিংহলের ভিক্ষু শরণঙ্কর নাকি বানারসে টেরো-কমিউনিস্ট ছিলেন। অনেক পরে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। মনে পড়ে ১৯৩৭ সালে চট্টগ্রাম হতে কেউ বা কারা সূর্য সেন কমিউনিস্ট পার্টির তরফ হতে ছোট্ট ইশ্‌তিহার একখানি প্রচার করেছিলেন। আবদুস্ সত্তার তার উদ্যোক্তা ছিলেন? পরে কিরণচন্দ্র মিত্র অন্য শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন। পোর্ট ট্রাস্ট বা ডক্ মজুরদের ভিতরেও ট্রেড ইউনিয়ন করার চেষ্টা তিনি করেছেন। তাঁর পদ্ধতি একই ছিল। প্রথমে তিনি মজুরদের নিকট হতে এক সঙ্গে অনেক টাকা তুলে নিতেন।

কেশোরাম কটন মিলে

মাটিয়াবুর্জে, গার্ডেনরীচও বলা হয়, কেশোরাম কটন মিলে হঠাৎ একদিন ধর্মঘট হয়ে গেল। তখন লিলুয়ার ধর্মঘট চলেছে। জটাধারী বাবার খুব নাম। ধর্মঘটের নেতৃত্ব ছিল তাঁতিদের হাতে। তাঁদের বেশীর ভাগই ছিল আবার অযোধ্যা (অবধ) প্রদেশের মুসলমান। কমবেশী উর্দু লেখাপড়া তাঁরা জানতেন। কেশোরামে ধর্মঘট করে এই তাঁতিদেরই একজন লিলুয়ায় জটাধারী বাবাকে খুঁজতে গেলেন। ওখানে তখন আবদুল হালীম উপস্থিত ছিল। কিরণ মিত্র নিজে তখন মাটিয়াবুর্জ গেলেন না। আবদুল হালীম আর গোপেন চক্রবর্তীকে সেই তাঁতির সঙ্গে মাটিয়াবুর্জে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা ওখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন যে আলীপুর মহকুমার সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটও সেখানে পৌঁছে গেছেন। এই ধর্মঘটের কারণ ছিল অনেক দিন আগেকার একটা ঘটনা। তাঁতিদের চেষ্টায় তখনও ধর্মঘট হয়েছিল। মজুরেরা বেশী দিন লড়াই চালাতে পারলেন না। তাঁরা তাই কাজে ফিরে যেতে চাইলেন। তখন মিলের মালিকেরা বললেন, তোমরা সমস্ত মজুরকে উস্‌কিয়ে ধর্মঘট করিয়েছ। এখন তোমাদের প্রত্যেকে যদি কোম্পানীর নিকটে এক মাসের মজুরীর টাকা এই করারে জমা না রাখ যে ভবিষ্যতে আর ধর্মঘট করবে না, তবেই আমরা মিল খুলব। সুতাকলে-চটকলে তাঁতিরা কাজ বন্ধ করে দিলে সমস্ত কল বন্ধ হয়ে যায়। যাক, সেই জমারাখা টাকাটা ফেরৎ দিতে হবে এটাই ছিল এই ধর্মঘটের আসল দাবী। তার সঙ্গে আরও দু'চারটি দাবী জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। কেশোরাম পোদ্দারের ব্যবসায় তখন ফেল পড়েছিল। কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সি চলে গিয়েছিল আরেকটি মাড়োয়ারী কোম্পানী,—বিড়লা ব্রাদার্সের হাতে। সেই দিনের মিটিং হতে চলে যাওয়ার আগে সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল হালীমকে ডেকে বলে গেলেন, যেভাবে তাঁতিদের নিকট হতে টাকা জমা নেওয়া হয়েছে তা আইনসম্মত নয়। সেদিন রাত্রে আবদুল হালীম আমাদের সব কথা জানাল। পরের দিন হতে ফিলিপ স্প্রাট আর আমি প্রতিদিন ধর্মঘটের সভায় যেতে লাগলাম। স্প্রাট ইংরেজিতে বক্তৃতা দেন, আমি হিন্দুস্তানীতে তার তর্‌জমা করি, তার পরে নিজেও দু'চার কথা বলি।

আমরা যেদিন গেলাম সেদিন হতে মণীন্দ্রকুমার সিংহও (মণি সিং) সভায় আসতে লাগলেন। ঢুলেঢুলে বক্তৃতাও দিতে লাগলেন। এটা তাঁর অভ্যাস ছিল। সে দিনই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেম, 'আপনি যে বড় এখানে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'এখন হতে এ কাজই করব।' ধরণীকান্ত গোস্বামীর মারফতে তাঁর সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় হয়েছিল। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল, তবে আমার ধারণা যে তাঁদের কর্মরত সভ্য তিনি ছিলেন না। ময়মনসিংহ জিলার শুশুঙ্গের লোক ছিলেন তিনি। উপাধি সিংহ হলেও জাতে ছিলেন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁর সঙ্গে মেলা-মেশা ক'রে তাঁর ভিতরে বামনাই কখনও দেখিনি। ক্লাইব স্ট্রীটে আফিস ক'রে টেলিফোন নিয়ে তাঁকে বসতে দেখেছি, আবার তাঁকে সাপের ও বাঘের ব্যবসায় করতেও আমরা দেখেছি। সব কিছুতে ফেল করে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করতে এলেন। এখানে বরঞ্চ তিনি কিছু সাফল্য লাভ করলেন। আমরা তাঁকে কেশোরাম কটন মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারি করেছিলেম। তিনি সব সময়ের কর্মী হলেন।

কেশোরামের ধর্মঘটের কথা হতে অনেক দূরে সরে এসেছি। কেশোরামের একজন মজুর কিরণ মিত্রকে ডাকার জন্যে লিলুয়া পর্যন্ত ধাওয়া করলেন, পুরনো ফিয়াৎ গাড়ীও একখানি তিনি কিনেছিলেন, তবুও নিজে না গিয়ে আবদুল হালীম আর গোপেন চক্রবর্তীকে মাটিয়াবুর্জে পাঠালেন—এটা তিনি কেন করলেন? কারণ ছিল। সেই সময়ে বিড়লাদের সঙ্গে তাঁর একটা কথাবার্তা চলেছিল। লিলুয়ার মজুরদের ডোল দেওয়ার জন্যে তাঁদের নিকট হতে দু' হাজার টাকার চাল তিনি চাইছিলেন। তাঁরা প্রায় রাজীও হয়েছিলেন। এই জন্যেই তিনি মাটিয়াবুর্জে গেলেন না। বিড়লারা বললেন তুমি রেলওয়ে মজুরদের জন্যে আমাদের কাছে চাল চাইছ, আবার আমাদের সুতাকলে ধর্মঘটও চালাচ্ছ এটা কেমন করে হয়? বিড়লারা বে-আইনীভাবে মজুরদের নিকট হতে টাকা ডিপজিট রেখেছিলেন, সে টাকা তাঁদের ফেরৎ দিতে হবে একথাও বুঝতেন, তবুও তাঁদের সম্মানে বাধছিল। কিরণ মিত্র এতদিন মাটিয়াবুর্জের কোনো সভায় আসেননি। একদিন মরীয়া হয়ে ধর্মঘট ভাঙার জন্যে ফিয়াৎ গাড়ীতে চড়ে তিনি কেশোরামের সভায় এলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী। কিরণ মিত্র খুব জোরের সঙ্গে অবধী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। অনেক কাল তিনি সেদেশে থেকে এসেছেন। মোদ্দা কথা তিনি যা বললেন তা হচ্ছে এই। "তোমাদের টাকা তোমাদেরই থাকছে। বিড়লাদের নিকটে জমা আছে মাত্র। এর ভিতর দিয়ে বিড়লাদের সঙ্গে তোমাদের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। টাকা যদি ফেরৎ নাও তবে তোমাদের সম্পর্ক কেটে যাবে। কেন ফেরৎ নেবে তোমরা টাকা?" সম্পর্কচ্ছেদ হওয়া মানে মজুরদের কাজ চলে যাওয়া কিনা সেটা তিনি কিছু বললেন না। তিনি ফিলিপ স্প্রাট ও আমাকে বললেন, মিটিং তো হয়ে গেল, আপনারাও চলুন আমার সঙ্গে, এস্‌প্লানেডে নামিয়ে দিয়ে যাব। অনেক পীড়াপীড়ি তিনি করলেন। স্প্রাট আর আমি কিছুতেই নড়লাম না। আমরা মজুরদের বললাম, "দেখুন, জটাধারী বাবা কার্যতঃ আপনাদের ধর্মঘট ভেঙে দেওয়ার কথা বলে গেলেন। আপনারা আপনাদের মজুরী বেচেন, আর বিড়লারা তা কেনেন, সম্পর্ক-চ্ছেদের কথা আসে কোথা হতে।" মিত্র মশায় 'নাতা' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। আমরা বললাম মূল দাবীতে আপনারা জিতবেনই। তারপর ইউনিয়ন তৈয়ার করুন, লড়তে থাকুন। এই হলো মজুরের জীবন। টাকা ডিপজিট নিয়ে বিড়লারা তো বে-আইনী কাজই করেছেন। মিত্র মশায়ের কথায় ধর্মঘট যখন ভাঙল না তখন পরের দিন কোম্পানী টাকা ফেরৎ দিলেন। মজুরেরা আবার কাজে ফিরে গেলেন। মাটিয়াবুর্জ-গার্ডেনরীচ ইলাকায় এই ভাবেই ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্‌টস্ পার্টির ও সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিরও প্রবেশ লাভ ঘটেছিল। ৪৩ বছর আগেকার কথা। যে-সকল মজুরের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল, তাঁরা আর নেই। তখনকার দিনের পার্টি সংগঠকেরাও নেই। কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এখন দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থীতে দ্বিখণ্ডিত। দু' পক্ষই গার্ডেনরীচ ইলাকায় রয়েছেন। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের, অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদীর) প্রভাব দ্রুত বাড়ছে, প্রভাব বাড়ছে মাটিয়াবুর্জ-গার্ডেনরীচ ইলাকায়ও এবং বাড়ছে কলকাতার দক্ষিণের সমস্ত তল্লাটে।

মেথর ও ঝাড়ুদারের আন্দোলন

১৯২৮ সালে কলকাতা ও হাওড়ায় মেথর ও ঝাড়ুদারদের ধর্মঘট বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যাঁরা মানুষের পায়খানা পরিষ্কার করেন মানুষের সমাজ তাঁদের বড় নাম দিয়েছেন মেহ্‌তর। মেহ্‌তর পারসী ভাষার শব্দ, তার অর্থ সমাজের শিরোমণি। রাজকুমার বা শাহ্‌জাদাকেও মেহ্‌তর বলা হয়। হিন্দুকুশ পর্বতের শেষ সীমাস্থিত চিত্রল রাজ্যের অধিপতিকেও বলা হয় মেহ্‌তর। যাদের দ্বারা আমরা অতি ঘৃণ্য কাজ করাই তাদের নাম দিয়ে রেখেছি মেহ্‌তর। শোষণের এই এক অপরূপ ব্যবস্থা। মেহ্‌তর শব্দ ব্যবহারের ভিতর দিয়ে আমাদের নিকটে মেথর হয়ে গেছে। আমরা উর্দুতে এই শব্দ লিখলে মেহ্‌তরই লিখব।

১৯২৭ সালের নবেম্বর মাসে কলকাতায় ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্ট্‌স পার্টি হতে স্থির করা হয় যে আমরা মেথর ও ঝাড়ুদারদের নিয়ে আন্দোলন করব এবং তাদের ইউনিয়নও গড়ব। কাজ শুরু করার আগেই আমরা স্থির করলাম যে ইংরেজিতে এই ইউনিয়নের নাম দেওয়া হবে "দি স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অফ্‌ বেঙ্গল" (The Scavengers' Union of Bengal.) স্ক্যাভেঞ্জার্স মানে শহরের রাস্তা ও নর্দমা পরিষ্কারকরা। মিউনিসিপালিটিগুলিতে ঝাড়ুদার-মেথর এই দু' রকমের লোককেই এক ধরা হয়। আমরা আমাদের ইউনিয়নের নিয়মে এ-দুজনকে একই ধরতাম। আসল কাজ শুরু করার আগে আমরা কমিটি গঠন করলাম। তাতে ডক্টর প্রভাবতী দাসগুপ্তাকে করা হলো প্রেসিডেন্ট, আমি হলেম ভাইস-প্রেসিডেন্ট আর ধরণীকান্ত গোস্বামীকে করা হলো সেক্রেটারী। প্রথমে আমরা দেবনাগরী হরফে হিন্দী ভাষায় একখানি ইশ্‌তিহার ছাপালেম। ডক্টর মিস্‌ দাসগুপ্তা আমাদের ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্ট্‌স পার্টির সভ্য ছিলেন না। তিনি আমাদের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করতে এসেছিলেন। প্রথম ইশ্‌তিহারখানি ছাপানোর খরচ পঁয়তাল্লিশ টাকা তিনিই দিয়েছিলেন। ধরণীকান্ত গোস্বামীর অনুরোধে আমরা তাঁকে প্রেসিডেন্ট করেছিলেম। এই ইশ্‌তিহারখানি ছাপিয়ে রেখে আমরা অল-ইনডিয়া ট্রেড্‌ ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভায় যোগ দিতে কানপুরে গিয়েছিলেম। ১৯২৭ সালের নবেম্বর মাসের কথা। কানপুর হতে ফিরে এসে আমি কাজ শুরু করি। আমার কাজের পদ্ধতি ছিল এই রকম। আমি জানতাম কৃষ্টিগতভাবে মেথর ও ঝাড়ুদারেরা সমাজের অতি নিম্ন স্তরের লোক। অক্ষরজ্ঞান তাঁদের ছিল না। তবে কিঞ্চিৎ শ্রেণীচেতনা তাঁদের ভিতরেও ছিল। মেহনত যাঁরা বিক্রয় করেন তাঁদের কিঞ্চিৎ শ্রেণীচেতনার উন্মেষ না হয়ে পারে না। আমি ছাপানো ইশ্‌তিহারগুলি নিয়ে এই মজুরদের বস্তিতে, বেশীর ভাগ ঝাড়ুদারদের বস্তিতে যেতাম। কলকাতায় তাদের সংখ্যাই বেশী। গিয়ে মেয়ে মজুরদের দেওয়া পীড়াতে বসতাম। আর পুরো ইশ্‌তিহার-খানি তাদের পড়ে শোনাতাম। কিছু কিছু কথা নিজেও বলতাম। তার পরে পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট মিটিং হলো, সবাইকে নিয়ে বড় মিটিংও হলো অক্টারলোনি মনুমেন্টের, এখনকার শহীদ মিনারের তলায়।

এভাবে কাজ চলছিল। ১৯২৮ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে সকালে আমরা ক'জন ২/১, ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে আমাদের অফিসে বসে আছি এমন সময়ে ২/৩ জন ঝাড়ুদার এলো, বলল আমরা ধর্মঘট করে দিয়েছি। আমরা বললাম, কোনো দাবী পেশ করা হলো না, নোটিস দেওয়া হলো না, একেবারে

ধর্মঘট করে খবর দিতে এলে? উপায় ছিল না। আমরা সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছুটলাম, সবাইকে খবর দিতে হবে এবং যে-সব জায়গায় ধর্মঘট তখনও হয়নি সেই সব জায়গায় ধর্মঘট করাতে হবে। বলা বাহুল্য, কলকাতা কর্পোরেশনের ইলাকায় পরিপূর্ণ ধর্মঘট হয়েছিল।

কিশোরীলাল ঘোষ ও মৃণালকান্তি বসু বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের (পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নাম হয়) কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁরাই টেলিফোনে কথাবার্তা ব'লে মেয়র মিস্টার জে. এম. সেনগুপ্তের বাড়ীতে ৯ই মার্চ, সকাল বেলা আমাদের বৈঠক স্থির করলেন। স্ট্রাইকের দু'দিন কেটে যেতেই সমস্ত কলকাতাবাসী বুঝতে পেরেছিলেন যে কলকাতায় একটা খারাব কিছু ঘটছে। মিস্টার সেনগুপ্ত আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন। স্ট্রাইকের ৬ষ্ঠ দিবসে আমরা বৈঠকে মিলিত হলাম। কলকাতার অবস্থা তখন খুবই খারাব। যে-সব ইলাকায় খাটা পায়খানা রয়েছে সে-সব জায়গায় দুঃসহ দুর্গন্ধে মানুষের বাস করা কঠিন হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসীরা মিস্টার সেনগুপ্তকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি গাড়ীতে বা'র হ'য়ে প্রতি ইলাকায় মজুরদের কাজে ফিরে যেতে বললেই তারা সঙ্গে সঙ্গেই কাজে ফিরে যাবে। সেনগুপ্ত সে চেষ্টা ক'রে দেখেছিলেন, কিন্তু কোনো মজুরই কাজে ফিরে গেল না। সেজন্যই তিনি আমাদের বৈঠকে আগ্রহী হয়েছিলেন। ঠিক হলো কলকাতা কর্পোরেশন মেথর ও ঝাড়ুদারদের প্রত্যেককে মাসে দু' টাকা হিসাবে বেতন বাড়িয়ে দিবেন। ধর্মঘট করার জন্যে কারুর চাকরী যাবে না। এই শর্তগুলি কাগজে লেখা হলো, এবং কর্পোরেশনের তরফ হতে মেয়র সই দিলেন আর আমাদের তরফ হতে মিস দাসগুপ্তা, ধরণীকান্ত গোস্বামী ও আমি এই তিনজনই সই দিয়েছিলেম, না, আমাদের একজনই শুধু সই করেছিলেন তা আমার এখন ভালো মনে নেই। তবে, একটা আইনের ফাঁকি থেকে গেল। তখনকার আইন অনুসারে মেয়র ছিলেন কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের মাথা, আর চীফ একজেকিউটিব অফিসার ছিলেন কর্পোরেশনের প্রশাসনের কর্তা। কর্পোরেশনকে চুক্তি ভঙ্গ করার জন্যে দায়ী করতে হলে চুক্তিতে চীফ্ একজেকিউটিব অফিসারের সই থাকা উচিত ছিল। আমাদের সঙ্গে কিশোরীলাল ঘোষ, মৃণালকান্তি বসু ছিলেন। তাঁরা উকীল, এম, এ, এল্ এল. বি.। আইনের ব্যাপারগুলির ওপরে তাঁরাই নজর রাখবেন আমরা ভেবেছিলেম, কিন্তু তাঁরা এদিকে নজর দেননি। আমরা ভেবেছিলেম মেয়র যখন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন তখন কাউন্সিলারদের সভায় এটা পাস হয়েই যাবে। কিন্তু কাউন্সিলারদের সভায় (১৩ই মার্চ, ১৯২৮) কংগ্রেসের কাউন্সিলাররাই ভোট দিলেন না, অন্য কাউন্সিলাররাও অনেকে ভোট দিলেন না। স্ট্রাইক করার জন্যে মজুরদের বেতন কাটা হলো না, কারুর চাকরীও গেল না। কিন্তু কাউন্সিলারদের সভা মাসিক দু' টাকা মজুরী বৃদ্ধি নাকচ করে দিল। এ ব্যাপারে চুক্তি ভঙ্গের জন্যে কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করার কথা ভাবাই যেত না। কিন্তু চীফ্ একজেকিউটিব অফিসারের সই থাকলে সে-কথা হয় তো ভাবা যেত। কি ভাবে কি হয়েছে আমরা ধৈর্যের সঙ্গে মজুরদের বোঝাতে লাগলাম। সুযোগ বুঝে মজুরদের আবারও ধর্মঘট করতে হবে। সেকথাও বোঝাতে থাকলাম। ১৩ই মার্চ (১৯২৮) তারিখে কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের যে-সভা হয়েছিল সেই সভায় "স্ক্যাভেঞ্জার্স কনফারেন্স" নাম দিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। কেন যে তার নাম 'কন্ফারেন্স' হয়েছিল তা জানিনে। যতটা মনে হয় কাউন্সিলার ছাড়া অন্যদের নিয়ে কমিটি গঠন করার নিয়ম কর্পোরেশনের

আইনে নেই। তাই সম্ভবত কনফারেন্স নাম দেওয়া হয়ে থাকবে। তাতে কর্পোরেশনের মেয়র, চীফ্ একজেকিউটিব অফিসার ও আরও কে কে ছিলেন, ইউনিয়নের তরফ হতে মিস্ দাসগুপ্তা, ধরণীকান্ত গোস্বামী ও আমি ছিলেম। তা ছাড়া, মৃণালকান্তি বসু আর কিশোরীলাল ঘোষও বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের তরফ হতে ছিলেন।

কলকাতায় মেথর-ঝাড়ুদারদের দ্বিতীয় ধর্মঘট

আমরা মজুরদের দাবী সংবলিত এক মাসের নোটিস কর্পোরেশনের নামে পাঠালাম। এটা ছিল কর্পোরেশনের আইন। এই নোটিস পাঠানো হয়েছিল ১৩·৪·১৯২৮ তারিখে। তাতে আমরা বলে দিয়েছিলেম যে এক মাসের ভিতরে দাবী পূর্ণ না হলে মজুরেরা আবার ধর্মঘট করবেন। কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশন এই নোটিসের প্রাপ্তি পর্যন্ত স্বীকার করলেন না। আমাদের প্রথম ধর্মঘটের পরে কর্পোরেশনের অ-কংগ্রেসী কাউন্সিলাররা একটি দল গঠন করেছিলেন। তার নাম দেওয়া হয়েছিল কোয়ালিশন দল। প্রতি বৎসর মেয়র নূতন নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সনে মেয়রের নির্বাচনের তারিখ ছিল ২রা এপ্রিল। এবারে কংগ্রেসের তরফ হতে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পরিবর্তে প্রার্থী হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। কংগ্রেস সংখ্যাল্প দলে পরিণত হওয়ায় সুভাষ বসু হেরে গেলেন, জয়ী হলেন কোয়ালিশন দলের বিজয়কুমার বসু। তিনি পেশায় এটর্নি ছিলেন এবং কংগ্রেস নেতা নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের ফার্মের, অর্থাৎ গণেশচন্দ্র চন্দ্র এণ্ড কোম্পানীর মালিকদের একজন। নির্মলচন্দ্র ছিলেন গণেশচন্দ্রের পৌত্র আর বিজয়কুমার বসু ছিলেন তাঁর দৌহিত্র। কলকাতার কায়স্থ গোষ্ঠীতে মামাত-পিসতুত ভাইয়ের ব্যাপার আর কি।

১৯২৮ সালের ২৪শে জুন তারিখে কলকাতার মেথর আর ঝাড়ুদারেরা দ্বিতীয় বার ধর্মঘট করলেন। আগেই বলেছি, কর্পোরেশন মেথর-ঝাড়ুদারদের নোটিসের প্রাপ্তিও স্বীকার করেননি। কিন্তু তাঁরা চুপ করে বসেও থাকেননি। তাঁরা স্থির করেছিলেন যে তাঁরা শুরু হতেই প্রতিরোধ করবেন, ধরপাকড় চালাবেন এবং দরকার হলে আরও নানান রকম অত্যাচার করবেন।

স্ট্রাইক আরম্ভ হয়েছিল ২৪শে জুন তারিখে। ২৫শে জুন তারিখে প্রভাবতী দাসগুপ্তা ও আমি হাজরা পার্কে মেথর-ঝাড়ুদারদের একটা মিটিং শেষ করে সবে হাজরা রোড পার হয়ে তার দক্ষিণ ফুটপাথে গিয়েছি (মিস্ দাসগুপ্তা তাঁর ঘণ্টা হিসাবে ভাড়াকরা ট্যাক্সিটি খুঁজছিলেন আর তখন খুব জোরে বৃষ্টি আসায় ঝুল বারান্দার তলায় আমাদের দাঁড়াতেও হয়েছিল,) এমন সময়ে কর্পোরেশনের স্থানীয় গাওখানার এংলো ইণ্ডিয়ান কর্মচারীটি এসে ওখানে দাঁড়ানো হেড কনেস্টবলটিকে বলল, এঁদের দু'জনকে গিরেফ্তার কর। তখনই হেড্ কনস্টেবল ও অপর একটি কনস্টেবল "গিরেফতার করলাম" বলেই আমাদের দু'জনের হাত চেপে ধরল। নিকটেই কলকাতা পুলিসের টালিগঞ্জ থানা। আমাদের সেখানেই নিয়ে যাওয়া হলো। থানায় দেখলাম একজন এসিস্টান্ট কমিশনারও বসে আছেন। তিনি হেড্ কনস্টেবলকে জিজ্ঞাসা করলেন "এঁদের কেন গিরেফ্তাব করেছ?" "হুজুর, একজন সাহেব গিরেফ্তার করতে বললেন" জওয়াব দিল হেড্ কনস্টেবল। এসিস্টান্ট কমিশনার বললেন, "কোথাকার কোন্ সাহেব এসে

যাঁকে-তাঁকে গিরেফ্‌তার করতে বললে তুমি তাই করবে নাকি?" কনস্টেবল মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

এসিস্টান্‌ট কমিশনার বললেন, "এ সম্বন্ধে পরে অনুসন্ধান করা যাবে। এখন আপনারা ব্যক্তিগত বন্ড (personal recognizance bond) সই করে জামিনে চলে যান।" আমি তো মনে মনে খুব খুশী। কিন্তু নারীর সম্মানে ঘা লেগেছিল। তিনি অভিমান ভরে বললেন, "কেন আমাদের অকারণে ধরা হলো? যাব না আমি জামিনে!" এসিস্টান্‌ট কমিশনার বললেন, "দেখুন সকাল বেলা আমি ইউনিফর্ম পরেছি, এখন রাত্রি। বৃদ্ধ হয়েছি। বাসায় গিয়ে এসব আমায় ছাড়তে হবে"। এই বলেই তিনি বাসায় চলে গেলেন। যাওয়ার সময়ে অফিসার ইন্‌চার্জকে বলে গেলেন, "এঁরা personal recognizance bond সই করে জামিনে যেতে চাইলে এঁদের ছেড়ে দিবেন।" এর পরে যে মুহূর্তে আমি প্রভাবতীর সংগে আলাদাভাবে কথা বলবার সুযোগ পেলাম তখনই বললাম, "একি করলেন আপনি? স্ট্রাইক যে ভেঙে যাবে।" এবার তাঁর চৈতন্য হলো, তিনি অফিসার ইন্‌চার্জকে বললেন, "দেখুন, আমরা জামিনে যাব।" আমার মনে হয় ও· সি·কে অন্য নির্দেশ অন্য জায়গা থেকে দেওয়া ছিল। তিনি নিজে আমাদের জামিনে ছেড়ে না দিয়ে এসিস্টান্‌ট কমিশনারকে তাঁর বাসায় ফোন করলেন। এতক্ষণে তিনিও হয় তো অন্য রকম উপদেশ পেয়ে থাকবেন। পুলিস আমাদের তাঁর বাসায় নিয়ে গেল। হরিশ মুখার্জি রোড কিংবা তারই মতো একটি রাস্তায় তাঁর বাসা ছিল। আমরা ওখানে পৌঁছাতেই তিনি আমাদের বললেন,—"দেখুন, তখন তো আমার কথা শুনে আপনারা গেলেন না, এখন আপনাদের জামিন দাঁড়াবার লোক আনতে হবে।" প্রভাবতী দাসগুপ্তা তখনই ডক্টর সুবোধ মিত্রকে খবর দিলেন। তিনি প্রায় ছুটতে ছুটতে এলেন। নিকটেই চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে সম্ভবত তিনি ছিলেন। এসেই তিনি বললেন, "কি ব্যাপার? কি করতে হবে আমায়!" ডক্টর মিত্রের সংগে জার্মানীতে ডক্টর দাসগুপ্তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। খুব সম্ভব ওঁদের দু'জনাই যশোহর জিলার লোক। ডক্টর দাসগুপ্তা ডক্টর মিত্রকে বললেন, "তুই আমাদের জামিন দাঁড়াবি।" সই করার জন্যে কাগজপত্র সবে বের করা হয়েছে এমন সময়ে টেলিফোনের ঘন্‌টা বেজে উঠল। ফোন করছেন সাউথ ক্যালকাটা ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার মিস্টার এস· এন· ব্যানার্জি। এসিস্টান্‌ট কমিশনারকে তিনি জানালেন যে আমাদের জামিন তিনিই দিবেন। আবার টালিগঞ্জ থানায় ফিরে গেলাম আমরা। সেখান থেকে রাত্রিবাসের জন্যে আমায় পাঠানো হলো আলীপুরের পুলিস লক্‌আপে, আর ডক্টর দাসগুপ্তাকে পাঠানো হলো লালবাজারের পুলিস লক্‌আপে। মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা শুধু লালবাজারেই ছিল। গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে আমায় জানানো হলো যে আমার জামিন হয়ে গেছে। আমায় তখন নিয়ে যাওয়া হলো আবার টালিগঞ্জ থানায়। গিয়ে দেখলাম প্রভাবতীও এসে গেছেন, আর সেখানে উপস্থিত রয়েছেন তাঁর অগ্রজ, বিখ্যাত কেমিস্ট ও ক্যালকাটা কেমিক্যালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও তাঁদের পরিবারের বন্ধু মিস্টার আই· বি· সেন, ব্যারিস্টার। তাঁরাই সাউথের ডেপুটি কমিশনারের বাড়ীতে গিয়ে আমাদের জামিন করিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে কে সেখানে জামিন দাঁড়িয়েছিলেন সে খবর তখন নিইনি। টালিগঞ্জ থানায় তখন কলকাতার বটতলা থানার দারোগাকেও (সত্যই, দারোগা, অর্থাৎ ইন্‌স্পেক্টর নন) দেখলাম। তিনি বললেন, তাঁর ইলাকায় আমাদের বিরুদ্ধে ছয়টি মোকদ্দমা রয়েছে। অতএব, তিনি আমাদের গিরেফ্‌তার

করছেন। চললাম আমরা তাঁর সঙ্গে বটতলা থানায়। মিস্টার সেন ও মিস্টার দাসগুপ্তও আমাদের সঙ্গে গেলেন। বটতলার দারোগা লোহার সিন্দুক খুলে একখানা পত্র বা'র করে তা খুব মনোযোগ সহকারে পড়লেন। তাতে বোধ হয় নির্দেশ ছিল যে সে-রাত্রি আমাদের আটক করে রাখতেই হবে। মিস্টার সেন ও মিস্টার দাসগুপ্ত আমাদের জামিন দাঁড়াতে চাইলেন, কিন্তু দারোগাটি তাতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, "আমি আপনাদের চিনি না, আপনাদের কি আছে, না আছে, আমি জানিনে। আপনাদের জামিনে আমি আসামীদের ছেড়ে দিতে পারব না।" মিস্টার সেন ও মিস্টার দাসগুপ্ত নিজেদের পরিচয় ইত্যাদি সবই দিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। কর্তৃপক্ষের আশা ছিল, সারা রাত্রি আমাদের আটকে রাখলে এবং মেথর ও ঝাড়ুদারগণকে পুলিস ভয় দেখিয়ে সন্ত্রস্ত করে তুললে ভোরবেলা তাঁরা কাজে যোগ দিতে বাধ্য হবেন।

সে রাত্রি আমায় বটতলা থানা হতে জোড়াবাগান পুলিস কোর্টের লক্‌আপে ও প্রভাবতীকে আবার লালবাজার লক্‌আপে পাঠানো হলো। সকাল বেলা হতেই আমাকে ও অন্য বন্দীদের দোতলার লক্‌আপ হতে নীচের তলায় এডিশনাল চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি শুরু হলো। আমার হাতে হাতকড়াতো পরানো হলোই, তা ছাড়া অন্য বন্দীদের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে আমার কোমরেও দড়ি বাঁধা হলো। আদালতের দিকে পা বাড়াব ঠিক এমন সময়ে বটতলা থানার দারোগাটি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হলেন। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা হয়েছে দেখে তিনি কনস্টেবলদের গালি দিতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমার দড়ি খুলে দেওয়া হলো এবং হাতকড়িও। দারোগা নিজেই আমায় সঙ্গে ক'রে কোর্টে নিয়ে গেলেন। তখন প্রভাবতীও এসে গেছেন। সকালের কাগজে অনেক কিছু ছাপা হয়ে থাকবে। দেখলাম অনেক লোক কোর্টে উপস্থিত হয়েছেন। শুনলাম স্ট্রাইক খুব জোরদার হয়ে উঠেছে। কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। ভোরের বেলা কোনো মজুরই কাজে যোগ দেননি। আমাদের কমরেডরা যিনি যেখানে ছিলেন সকলেই সারা রাত্রি মজুরদের বিভিন্ন বস্তিতে ছোটাছুটি করেছেন। এমন কি ফিলিপ স্প্রাট যিনি অন্য একটি স্ট্রাইকের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন তিনিও এসে মেথর-ঝাড়ুদারদের বস্তিগুলিতে ঘুরেছেন।

এডিশনাল চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল লতীফ (এক সময়ে হোম ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন) আমাকে ও প্রভাবতীকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। তিনি বললেন, এ'রা তো নিজেদের ব্যক্তিগত জামিনে চলে যাওয়ার মতো নাগরিক, কিন্তু কাগজে লিখলেন প্রত্যেককে এক হাজার টাকার জামিনে ছেড়ে দেওয়া হোক। তার মানে অন্য লোককে এসে আমাদের জামিন দাঁড়াতে হলো। ২৬শে জুন (১৯২৮) অপরাহ্ন দেড়টার সময় কোর্ট হতে ছাড়া পেলাম।

মেয়রের নির্বাচনে সুভাষ বসু হেরে যাওয়ায় ও কংগ্রেস দল কর্পোরেশনে সংখ্যাল্প দল হয়ে পড়ায় কংগ্রেসীদের মতির কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। কংগ্রেসী কাগজগুলি আমাদের গিরেফ্‌তারের বিরুদ্ধে লিখতে লাগলেন। এমন কি যে-সুভাষ বসু বর্মার জেল হতে মুক্তি পেয়ে আসা অবধি স্থান-অস্থান বিবেচনা না করেই মার্কসবাদকে গালি বর্ষণ করে যাচ্ছিলেন যাঁর বক্তৃতা অসহ্য হয়ে ওঠায় একদিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় আমি তাঁকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান পর্যন্ত করেছিলেম,—(সকলে একবার ভাবুন যে-আমি বক্তৃতা তো দিতেই পারিনে, ভালো ক'রে গুছিয়ে কথাও বলতে পারিনে, সে কিনা করল সুভাষ

বসুকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান!) কিন্তু ঘৃণাভরে বা অহঙ্কারভরে কিংবা ঘৃণা ও অহঙ্কার দু' কারণেই যিনি আমার আহ্বানে সাড়া দেননি,—সেই সুভাষ বসু কিনা ময়দানে বের হয়ে আমাদের গিরেফ্‌তারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেন!!

মেথর-ঝাড়ুদারদের কথা বলছি। প্রভাবতী ও আমার গিরেফ্‌তারের পরেও তাঁদের ধর্মঘট না ভাঙায় তাঁদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার হতে লাগল। তাঁরা খাপরার ঘরের খুপরিতে বাস করতেন। সেগুলি ছিল তাঁদের ঠিকানা মাত্র। রাত্রে তাঁরা ফুটপাতে ঘুমুতেন। দিনে তাঁদের কাজ না থাকলে তাঁরা আশে-পাশের খালি জায়গায় কিংবা রাস্তার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কাটাতেন। এই অবস্থায় তাঁদের দলবদ্ধভাবে গিরেফ্‌তার করে পুলিস কোর্টে হাজির করতেন। মিথ্যা মোকদ্দমা। কোর্ট ছিল চার জায়গায়। আলীপুর, শিয়ালদা, বংশাল স্ট্রীট ও জোড়াবাগান। সঙ্গে সঙ্গে কোর্টে যেতে পারলে জামিনে কিংবা কিছু জরিমানা দিয়ে তাঁদের খালাস ক'রে আনা যেত। আলীপুরের দ্বিতীয় পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার নরম্যান বোস বলতেন "কিছু কিছু জরিমানা না করলে গবর্নমেণ্ট আমাদের মাইনে কোথা থেকে দেবেন?" চার কোর্টে ছোটাছুটি করা ছিল মুশকিলের কাজ। কখন কোথা হতে কোন্ দলকে ধরে নিয়ে যেত পুলিস তার খবর পাওয়াও যেত না। মেথর ও ঝাড়ুদারেরা জেলেও গেলেন বহু সংখ্যায়। তাঁদের ওপরে জুলুমের এখানেই শেষ ছিল না। রাস্তার কল হতে তাঁদের জল নেওয়ার ও পাবলিক পায়খানা তাঁদের ব্যবহার করায়ও তাঁদের বাধা দিচ্ছিলেন পুলিসের লোকেরা ও গরীব ভদ্রলোকেরা।

দিন দিন কলকাতা নগরের অবস্থা শোচনীয় হতে শোচনীয়তর হচ্ছিল। রাস্তায় জঞ্জাল স্তূপীকৃত হচ্ছিল, খোলা নর্দমাগুলি হতে দুর্গন্ধ বা'র হচ্ছিল আর কলকাতায় যে-সব ইলাকায় তখনও খাটা পায়খানা ছিল (অনেক ছিল) সে-সব ইলাকার দুরবস্থার কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পায়খানা উপচে পড়ছিল, আর পোকাগুলি কী রকম কিলবিল করছিল। বড় লোকদের নাকেও কিছু কিছু দুর্গন্ধ যে না ঢুকছিল তা নয়, কিন্তু তাঁদের সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটল বেশ দেরীতে।

অবশেষে ঘাবড়ে গেলেন মেয়র বিজয়কুমার বসু ও চীফ একজেকিউটিব অফিসার জে· সি· মুখার্জি। কই, স্ট্রাইক তো ভাঙল না। তাঁরা কচু রায়ের বংশধর (শুনেছি কচু রায় প্রতাপাদিত্যের পুত্রের নাম ছিল) ও ভারতে ব্রিটিশ সরকারের পোষ্যপুত্র কে· সি· (কৃষ্ণচন্দ্র) রায় চৌধুরীকে আমাদের নিকটে পাঠালেন। তিনি সরকার পক্ষীয় কাউন্সিলারও ছিলেন। সকালবেলা ন'টা-দশটার সময় আমরা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ময়দানে মনুমেন্টের ধারে মেথর-ঝাড়ুদারদের মিটিং করছিলাম। রায়চৌধুরী অনেক অনুরোধ-উপরোধ ক'রে আমাদের মেয়রের আফিসে নিয়ে গেলেন। আমরা (আমি, ধরণীকান্ত গোস্বামী ও প্রভাবতী দাসগুপ্তা) ভিজা পোশাকেই ওখানে গিয়েছিলাম। বিজয় বসু আমাদের বললেন, আগের বারে কংগ্রেসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। এবার একবার আমাদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন। বললেন, তাঁদের হিসাবে যে টাকা আছে তাতে কোনো রকমে মাসে একটাকা মজুরী বাড়ানো যায়। অন্য শর্তগুলির বেলায় তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা ভেবে দেখব বললাম। কিন্তু আমরা কাউন্সিলারদের মিটিং চলার সময়েই সিদ্ধান্ত নেব বললাম। যা স্থির হবে তা সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা পাস ক'রে দিবেন। তিনি বললেন তার পথে আইনগত অসুবিধা আছে। ৫ই জুলাই (১৯২৮) তারিখে 'স্ক্যাভেঞ্জার্স কনফারেন্সে'র

মিটিং ডাকবেন বললেন। কনফারেন্সের সভ্য ছাড়াও অন্য কাউন্সিলারদের নিমন্ত্রণ করবেন কথা দিলেন। আরও বললেন জে. এম. সেনগুপ্তকেও নিমন্ত্রণ করে আনবেন।

৫ই জুলাই (১৯২৮) তারিখে স্ক্যাভেঞ্জার্স কনফারেন্সে অনেকে এলেন। সকলে এই কনফারেন্সের সভ্য ছিলেন না। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন ঃ

(১) বিজয়কুমার বসু, মেয়র কলকাতা
(২) রায় রামতারণ বানার্জি বাহাদুর
(৩) সনৎকুমার রায় চৌধুরী
(৪) যতীন্দ্রনাথ বসু
(৫) ডাক্তার বি. সি. ঘোষ
(ইউনিভার্সিটি সায়ান্স কলেজের অধ্যাপক)
(৬) মদনমোহন বর্মন
(৭) রামপ্রসাদ মুখার্জি
(৮) এম. এম. হক
(৯) মুহম্মদ দাউদ
(১০) সন্তোষকুমার বসু
(১১) পি. এন. বানার্জি (এম. এল. সি., বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)
(১২) জে. এম. সেনগুপ্ত
(১৩) কে. সি. রায়চৌধুরী
(এক হতে তের নম্বর পর্যন্ত সকলেই কর্পোরেশনের কাউন্সিলার)
(১৪) ডক্টর মিস্ প্রভাবতী দাসগুপ্তা
(১৫) ধরণীকান্ত গোস্বামী
(১৬) মুজফ্ফর আহ্মদ
(১৪ হতে ১৬ নম্বরের সভ্যগণ স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অফ বেঙ্গলের প্রতিনিধি)
(১৭) মৃণালকান্তি বসু
(১৮) কিশোরীলাল ঘোষ
(১৭ ও ১৮ নম্বরের সভ্যগণ বেঙ্গল ট্রেড্ ইউনিয়ন ফেডারেশনের প্রতিনিধি)
(১৯) চীফ্ একজেকিউটিব অফিসার

এই উনিশজনের উপস্থিতিতে বিশেষ আলোচনার পরে স্থিরীকৃত হয় যে ঃ

"(১) মাসিক একটাকা হিসাবে ঐ মজুরদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হবে যে-মজুরেরা কর্পোরেশনের অধীনে একটি মাত্র চাকরী করে থাকে।

(২) গাওখানার লোকেরা যারা মাসে ১৮ টাকার বেশী রোজগার করতে পারে না তারাও মাসে একটাকা বেশী পাবে।

(৩) খোদ ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া আর কেউ মজুরদের কাজ থেকে বরখাস্ত করতে পারবেন না। ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের বরখাস্ত করার পরেও বিতাড়িত মজুর চীফ্ একজেকিউটিব অফিসারের নিকটে আপিল করতে পারবে।

(৪) (ক) ধর্মঘট করেছে বলে কোন মজুরকে কাজ হতে বরখাস্ত করা হবে না।

(খ) ধর্মঘটের সময়ের পূর্ণ বেতন মজুরগণকে দেওয়া হবে।

(গ) ধর্মঘটকারিগণ ও তাদের নেতৃগণের নামে যে সকল মোকদ্দমা করা হয়েছে সে সকল মোকদ্দমা তুলে নেওয়া হবে।

ডক্টর মিস্ প্রভাবতী দাসগুপ্তা ও মুজফ্ফর আহ্মদ জানান যে তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমা তুলে নেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছেন না। তাঁরা আদালতে মোকদ্দমা লড়তে চান।

শ্রমিক প্রতিনিধিগণের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও যে সকল মজুর ধর্মঘট করেনি তাদের দু'টাকা হিসাবে বখ্‌শিশ দেওয়া স্থির হয়।"

(১৯২৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখের 'গণবাণী'তে প্রকাশিত শোচনীয় "বিশ্বাসঘাতকতা" শীর্ষক প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃত।)

আমরা ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা আগেকার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম যে আগে এই শর্তগুলি কাউন্সিলারদের সভায় স্বীকৃত হলে তার পরে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হবে। তাতে সকলে ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ কলকাতা শহরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। আমরা ইউনিয়নের লোকেরাও এই শহরের বাশিন্দা ছিলেম। এই ভাবনা আমাদেরও মনে ছিল। কিন্তু কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ভদ্রলোকেরা যে প্রতিজ্ঞা পালন করেন না! জে· এম· সেনগুপ্ত সাহেব আমাদের বোঝালেন যে এবার তো আপনারা শুধু একটি দলের (কংগ্রেসের) প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলছেন না, আজ এখানে সকল দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত রয়েছেন, তাঁদের কথার ওপরে আপনারা নির্ভর করতে পারেন। কোয়ালিশন দলের তরফ হতে ও মেয়ররূপে বিজয়কুমার বসু জানালেন যে মেথর ও ঝাড়ুদারদের ব্যাপার নিয়ে এবারে কোনো দলাদলি হবে না। সকল দলের সভ্য এখানে উপস্থিত আছেন, মুসলিম প্রতিনিধিরাও উপস্থিত আছেন। আপনাদের সন্দেহের কি কারণ থাকতে পারে? এমন কি মৃণালকান্তি বসু ও কিশোরীলাল ঘোষও আমাদের অনুরোধ করছিলেন যে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হোক। নাগরিকদের দুরবস্থায় ভিতরে ভিতরে আমরাও কম পীড়িত হচ্ছিলাম না। আমরা রাজী হয়ে গেলাম। সেদিন তারিখ ছিল **১৯২৮ সালের ৫ই জুলাই**। ওই সভা হতে আমরা ইউনিয়নের লোকেরা গাড়ী চড়ে মজুরদের বস্তীগুলিতে ঘুরতে লাগলাম। দাবীগুলির কথা খুব সংক্ষেপে বোঝালাম। বললাম ভাইরা, বোনেরা, ধর্মঘট তুলে নিয়ে কাজে লেগে যাও। বড় মিটিং-এ সব কথা হবে। শেষ খবর যখন পৌঁছিয়ে দিলাম তখন রাত হয়ে গেছে। মজুরদের সব বস্তীই আমরা চিনেছিলাম। খবর সর্বত্রই পৌঁছে গেল। রাত যে হয়ে গেছে সে দিকে মজুরেরা কোনো নজরই দিলেন না। তাঁরাও শহরের নাগরিক ছিলেন, কষ্ট তাঁদেরও হচ্ছিল। মনে হলো যেন অসুরের শক্তি নিয়ে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ ক'রে দিলেন।

৫ই জুলাই (১৯২৮) কলকাতার মেথর ও ঝাড়ুদারদের দ্বিতীয় বার ধর্মঘটের দ্বাদশ দিবস ছিল। এই বারো দিনের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল ও ময়লা তাঁরা দু'দিনের ভিতরেই পরিষ্কার ক'রে ফেললেন। ৭ই জুলাই (১৯২৮) তারিখে ভোরের ইংরেজি দৈনিক "ফরওয়ার্ড" লিখল "কলকাতা নগরকে আর ময়লা দেখাচ্ছে না"।

কিন্তু এত করার পরেও মেথর ও ঝাড়ুদারদের পেছন থেকে ছুরি মারল কলকাতা কর্পোরেশনের কোয়ালিশন দল। ৫ই জুলাই তারিখে (১৯২৮) যে দাবীগুলিকে ভিত্তি করে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়েছিল সেগুলির স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যে ১৬ই জুলাই (১৯২৮) তারিখে কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের সভা ডাকা

হয়েছিল। কিন্তু তার আগে ইংরেজরা একটি ব্যাপারে বিরুদ্ধে গেলেন। ইংরেজদের ইংরেজী দৈনিক "স্টেটস্‌ম্যান" ধর্মঘটের সময়ের বেতন দেওয়ার বিরুদ্ধে লিখল। ধর্মঘটের সময়কার বেতন দেওয়া হোক, এটা ইংরেজদের মনোমত ছিল না। তাতে ভয় পেয়ে গেলেন কোয়ালিশন দলের কাউন্সিলাররা। তাঁদের মধ্যে অনেকের কাঁপুনি ধরে গেল। কিছু কিছু কংগ্রেসী কাউন্সিলারও ভয় পেয়েছিলেন। ১৬ই জুলাই তারিখের সভায় স্ট্রাইকের সময়কার বেতনের প্রশ্ন উঠতেই কোয়ালিশন দলের কাউন্সিলাররা বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। কংগ্রেস দলের সকল কাউন্সিলার সেদিন উপস্থিত থাকলেন না। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যেও দু'জন—রামকুমার গোয়েংকা ও ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। কংগ্রেসের উপস্থিত বাকী কাউন্সিলাররা অবশ্য স্ট্রাইকের সময়ের বেতন দেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। মেয়র বিজয়কুমার বসুকে কোনো পক্ষেই ভোট দিতে হয়নি। কে. সি. রায়চৌধুরী পেছন থেকে পালিয়ে গিয়ে ভোট দেওয়ার দায়িত্ব এড়িয়েছিলেন। কিন্তু রাত-দিন পরিশ্রম করে এবং কত অতিরিক্ত খেটে যে মজুরেরা জঞ্জাল ও ময়লা পরিষ্কার করে দিলেন তার জন্যে কোনো অতিরিক্ত বেতন তাঁদের দেওয়া হলো না, তাঁরা তা দাবীও করেননি।

কলকাতার প্রথম ধর্মঘটের পরে এবং দ্বিতীয় ধর্মঘটের আগে হাওড়ার মেথর ও ঝাড়ুদারেরা ৯ দিনের (৮ই এপ্রিল হতে ১৬ই এপ্রিল ১৯২৮ পর্যন্ত) ধর্মঘট করেছিলেন। তাঁদের কথা আমি পরে বলছি।

হাওড়ায় মেথর-ঝাড়ুদার ধর্মঘট

আমরা যখন কলকাতায় মেথর-ঝাড়ুদারদের প্রথম ধর্মঘটের পরিচালনা করছিলেম সেই সময়ে কিংবা তার কিছুদিন আগে আমরা হাওড়ায় স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অফ বেঙ্গলের শাখা স্থাপনের চেষ্টাও শুরু করি। এর প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় নামক একজন যুবক। এই শচীনন্দনের একটা ইতিহাস আছে। সে ১৯২১ সালে যশোহরের কোনো এক হাই স্কুলের ক্লাস সেভেন বা ক্লাস এইটের ছাত্র ছিল। এই সময়ে অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সে স্কুল ছেড়ে দেয়। তখন দেশে মিটিং-এর বান ডেকেছিল। এই ছোট ছেলেটিও সেই সকল সভায় বক্তৃতা দিতে লাগল। ফলে কিছু দিনের ভিতরে দেখা গেল যে সে একজন সুবক্তা হয়ে উঠেছে। লোকে তাকে বাহবা দিতে লাগল। কলকাতার দৈনিক কাগজে তার ফটোও ছাপা হলো। তার নীচে লেখা হলো "যশোহরের বালক বীর"। কিছু দিনের ভিতরেই অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলো। তখন অন্য অনেক ছেলের মতো শচীনন্দন আর স্কুলে ফিরে গেল না। তার পিতা স্কুল মাস্টার ছিলেন। তিনি নিশ্চয় তাকে স্কুলে ফিরে যেতে অনেক চেষ্টা করে থাকবেন।

শচীনন্দনের বয়স যত বাড়ছিল ততই সে নানান রকমের রাজনীতিক আড্ডায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ১৯২৬ সালে হিন্দু-মুস্‌লিম দাঙ্গার আবহাওয়ায় "অগ্রদূত" নাম দিয়ে সে একখানি সাপ্তাহিক কাগজও বা'র করেছিল। কবি নজরুল ইস্‌লাম এই কাগজে লিখেছিল :

"চারদিকে এই গুণ্ডা এবং বদমায়েশির আখড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত চলতে কি তুই পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে?"

১৯২৮ সালে আমরা যখন কলকাতায় মেথর-ঝাড়ুদারদের নিয়ে ব্যস্ত তখন

শচীনন্দন এলো আমার নিকটে। বলল, "আপনারা যদি অনুমতি দেন তবে আমি হাওড়ায় এই ইউনিয়নের একটি শাখা গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারি। সেখানে আমার কিছু চেনা লোক আছেন। তাঁদের সাহায্য আমি পাব।" আমি বললাম "বেশ তো দেখ না চেষ্টা ক'রে। যদি সেখানে আমাদের শাখা গঠন করতে পার ভালোই তো।" শচী তার চেনা লোকেদের মধ্যে তিনজনের নাম আমায় বলেছিল। তাঁরা হলেন শিবপুরের—জীবনকৃষ্ণ মাইতি, অগম দত্ত ও প্রমোদ বসু। খোলা-খুলিভাবে তাঁরা কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন, আর গোপনে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির সহিত তাঁদের সংস্রব ছিল। এই তিনজনের দু'জনের সহিত আমরা পরিচিত হয়েছিলেম। জীবনকৃষ্ণ মাইতি ও অগম দত্ত ২/১, আবদুল হালীম লেনে (তখন নাম ছিল ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন) আমাদের ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টির আফিসে এসে জানিয়ে গিয়েছিলেন যে সেই সময় হতে তাঁরা আমাদের পার্টির সহিত কাজ করবেন। শচীনন্দনকে তাঁরা বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। শচীর সঙ্গে গিয়ে প্রমোদ বসুর সঙ্গে আমি দেখা করেছিলেম। তিনি তখন প্রচুর উৎসাহ দেখিয়েছিলেন।

হাওড়ায় স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অফ বেঙ্গলের শাখা গঠিত হলো। আমরা তার একটি দু'টি মিটিংও হাওড়া ময়দানে করলাম। হাওড়ায় ঝাড়ুদারদের চেয়ে মেথরের সংখ্যা বেশী ছিল। সেখানকার সব পায়খানাই ছিল খাটা পায়খানা। মাটির তলায় কোনো ড্রেন তখন ছিল না। ১৯২৮ সালের তেতাল্লিশ বছর পরে আজ সবে মাত্র মাটির তলার ড্রেন প্রস্তুতের প্রচেষ্টা হাওড়ায় শুরু হয়েছে।

হাওড়া মিউনিসিপালিটির নিকটে ইউনিয়নের তরফ হতে নিম্নলিখিত দাবীগুলি পেশ করা হয়েছিল ঃ

মেথর ও ঝাড়ুদারদের মাসিক দুই টাকা হিসাবে বেতন বাড়িয়ে দিতে হবে।

বছরে সবেতনে ১৫ দিনের ক্যাজুয়েল ছুটি মঞ্জুর করতে হবে।

বছরে একমাস সবেতনে প্রিভিলেজ ছুটি দিতে হবে।

ঘুস নেওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ক'রে দিতে হবে।

কোনো মেথর বা ঝাড়ুদারকে বরখাস্ত করতে হলে এক মাস আগে নোটিস দিতে হবে।

মেথর ও ঝাড়ুদারদের সংগঠিত করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে তারা নিজেদের ভিতরে কথা ব'লে হঠাৎ কাজ বন্ধ করে দিয়ে ইউনিয়ন আফিসে খবর দেন। কলকাতার প্রথম ধর্মঘটে তাই হয়েছিল। কলকাতার দ্বিতীয় ধর্মঘটে অবশ্য, দিন আগে স্থির করে ধর্মঘট করা হয়েছিল।

হাওড়ার মেথর-ঝাড়ুদারেরাও হঠাৎ কাজ বন্ধ করে দিয়ে ইউনিয়ন আফিসে খবর পাঠালেন। ১৯২৮ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে তাঁরা কাজ বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। আট নম্বর ওয়ার্ডের শানাপাড়ার মজুরেরা ধর্মঘট ঘোষণা না করেই ৬ই এপ্রিল হতে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ৮ই এপ্রিল (১৯২৮) তারিখে ছয়, সাত, আট, নয় ও দশ নম্বর ওয়ার্ডের মেথর ও ঝাড়ুদারেরা ধর্মঘট করেছিলেন। পরের দিন বাকী ওয়ার্ডগুলির, অর্থাৎ এক হতে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের মজুরেরাও ধর্মঘটে যোগ দেন। তার মানে, হাওড়ার মোট তিন হাজার মেথর ও ঝাড়ুদারদের সকলেই ধর্মঘটে যোগ দিলেন।

প্রথম দিন ৮ই এপ্রিল তারিখে শিবপুর ট্রামওয়ে টার্মিনাসের নিকটবর্তী শীল বস্তীতে একটা বড় ঘটনা ঘটে যায়। পুলিসের এংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেন্টরা

ওখানে গিয়ে জোর-জবরদস্তী করে মেথরদের দিয়ে কাজ করাবার চেষ্টা করে। তাতে উত্যক্ত হয়ে মেথরানীরা পায়খানার বালতি সার্জেন্ট্‌দের গায়ে ঢেলে দেয়। সার্জেন্ট্‌রা ওখানেই তাদের পোশাক (ইউনিফর্ম) খুলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা বলতে বলতে গেল যে তাদের গুলি করার অনুমতি না দিলে তারা আর কখনও মেথরদের বস্তীতে যাবে না। খবর পেয়ে আমরা শীল বস্তীতে ছুটে গেলাম। দেখলাম পায়খানা মাখা পুলিস সার্জেন্ট্‌দের ইউনিফর্ম-গুলি ওখানেই পড়ে আছে। তার পরে আমরা মেথরদের ওই অঞ্চলের বস্তীগুলিতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করলাম।

এর পরে আমরা গেলাম প্রমোদ বসুর বাড়ীতে। গিয়ে দেখলাম তিনি মেথর-ঝাড়ুদারদের ওপরে চটে লাল হয়ে আছেন। যে-প্রমোদ বসু ইউনিয়ন গঠন করার শুরুতে আমাদের উৎসাহ জুগিয়েছিলেন এই প্রমোদ বসু তিনি নন। তাঁর পাল্টে যাওয়ার কারণ আছে। আমরা কাজ শুরু করার পরে হাওড়া মিউনিসিপালিটিতে নির্বাচন হয়ে গিয়েছিল। তাতে কংগ্রেসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়েছিলেন। মিউনিসিপালিটির পরিচালনা কংগ্রেসের হাতেই এসেছিল। প্রমোদ বসু বললেন যে তাঁদের মাথায় অনেক বড় বড় প্লান ছিল। মেথর-ঝাড়ুদারগুলি তাঁদের কিছুই করতে দিল না। আমরা বুঝলাম প্রমোদ বসু আর আমাদের সঙ্গে নেই। কিন্তু জীবন মাইতি আর অগম দত্তের সম্বন্ধে আমাদের সে-ধারণা হয়নি।

ধর্মঘটের পর হতে আমাদের কাজ হলো বস্তীতে বস্তীতে ঘোরা আর বিকাল বেলা হাওড়া ময়দানে মেথর-ঝাড়ুদারদের মিটিং করা। এই মিটিংগুলির কোনো কোনো মিটিং-এ বটুকেশ্বর দত্তও আসতেন এবং বক্তৃতাও দিতেন। তিনি হয়তো সব মিটিং-এ যোগ দিয়ে থাকবেন, তবে বক্তৃতা দিয়েছেন কোনো কোনো মিটিং-এ। কিছু দিন আগে বটুকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। কানপুরে মানুষ হয়েছিলেন বলে হিন্দী লেখাপড়া জানতেন। আমরা তাঁকে দিয়ে হিন্দী ট্রেড ইউনিয়ন ইশ্‌তিহার লিখিয়েছি। তিনি তখন কলকাতা-বড়বাজারের একটি দর্জি স্কুলে টেলরিং ও কাটিং-এর কাজ শিখতেন, থাকতেন হাওড়ার এক মেসে। এই বটুকেশ্বর দত্তই সেন্‌ট্রাল এসেম্‌ব্লীতে ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে ভগৎ সিং-এর সঙ্গে গিয়ে বোমা ছুঁড়েছিলেন।

১০ই এপ্রিল (১৯২৮) সকাল বেলা হাওড়া মিউনিসিপালিটি মেথর-ঝাড়ুদার ইউনিয়নের নেতাদের ডাকলেন। মিষ্টার সি. এফ. এন্‌ড্রুজকেও ডাকলেন। কমিশনারদের মিটিংও ডাকলেন। আমাদের নিয়ে গিয়ে সেই মিটিং-এ বসালেন। আমাদের হাতে মিউনিসিপালিটির ছাপানো বাজেট দিলেন। যা বললেন তা স্তোক বাক্য, মেথর-ঝাড়ুদারদের কোনো দাবী মেটানোর কথায় তাঁরা এলেন না। আমরা সভা থেকে বের হয়ে এলাম, কিন্তু চলে গেলাম না। আমাদের পরে এন্‌ড্রুজ সাহেবকে ডেকে নিলেন। তিনি কি বললেন, মজুরদের স্ট্রাইক ভেঙে দিতে বললেন কিনা তা জানিনে। তিনি ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করতেন বটে, তবে স্ট্রাইক ভঙ্গকারী বলে তাঁর দুর্নাম রটে যাচ্ছিল। তিনি তখন সতর্ক হচ্ছিলেন। যাওয়ার সময়ে তিনি আমাদের বলে গেলেন, "তোমরা খানিকটা শক্ত হয়ে থেকো"। হাওড়া টাউন হলটা মিউনিসিপালিটির বিল্ডিং ছিল। তার নীচের তলায় ছিল মিউনিসিপালিটির আফিস আর ওপরে হলে মিটিং হতো। ১০ই এপ্রিল (১৯২৮) তারিখে হাওড়া টাউন হলের হাতার ভিতরে বহু মেথর ও ঝাড়ুদার জড়ো হয়েছিলেন। হাওড়া মিউনিসিপালিটির সেক্রেটারি ছিলেন

শ্রীযোগেশ দাসগুপ্ত। সম্ভবত ফরিদপুর জিলার লোক। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিলেন। অতএব কংগ্রেসের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আমিও তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন সভ্য ছিলাম কিন্তু আমি যোগেশবাবুর মতো কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলাম না। কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটির সভায় আমি তাঁর উল্টো দিকে বসতাম। যোগেশ-বাবুই মিউনিসিপালিটির তরফ হতে এগিয়ে এসে সব কথা বলছিলেন, সব কিছু করতেন। এন্‌ড্রুজ সাহেব চলে যাওয়ার পরে যোগেশবাবু মোক্ষম দাওয়াই প্রয়োগ করলেন। জীবন মাইতি ও অগম দত্ত খোলাখুলিভাবে কংগ্রেসী-কর্মী ছিলেন। ইউনিয়ন গঠন করার শুরু হতেই তাঁরা তাতে ছিলেন। মেথর-ঝাড়ুদারেরা তাঁদের চিনতেন। কংগ্রেস শৃংখলার কথা বলে তিনি তাঁদের হাওড়া টাউন হলের হাতার ভিতরে মজুরদের সামনে এনে হাজির করলেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে টাউন হলের গেটের ভিতরে ঢোকার সময় তিনি আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, "এবারে মজুরদের আপন লোকেরা এসেছেন। তাঁদের কথায় তারা ধর্মঘট তুলে নেবে।" আমাদের সামনে দিয়ে জীবন মাইতি ও অগম দত্ত মাটির দিকে মুখ করে চলে গেলেন। তাঁরা বধ্যভূমিতে নীত হচ্ছেন এমন ছিল তাঁদের অবস্থা। তাঁদের দেখে সেদিন আমাদের রাগ হয়নি, মায়া হয়েছিল। আসল কথায় আসি। জীবন মাইতি ও অগম দত্তের কথায়ও সেদিন হাওড়ার মেথর-ঝাড়ুদারেরা তাঁদের ধর্মঘট তুলে নেননি। যোগেশবাবুকে হার মানতে হয়েছিল। এই যোগেশ দাসগুপ্ত বৃদ্ধ বয়সে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একজন সমর্থক হয়েছিলেন। তাঁর ছোট ভাই নরেশ দাসগুপ্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদীর) একজন বিশিষ্ট নেতা।

ধর্মঘট চলেছিল। মজুরদের জোট কেউ ভাঙতে পারেনি। বিকালবেলা রোজই হাওড়া ময়দানের মিটিং শেষ হওয়ার পরেও কিছু সংখ্যক মজুর দাঁড়িয়ে থাকতেন। আমরা তাঁদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে স্থান ত্যাগ করতাম। একদিন বিকালে মিটিং শেষ হওয়ার পরে আমি বড় ক্লান্তি বোধ করছিলেম। আমি ধরণীকান্ত গোস্বামীকে অনুরোধ করলেম যে তিনি যেন ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যেকটি মজুরকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তার পরে চলে যান। আমি তাঁকে বলে গেলাম যে তেলকল ঘাট রোডে কিরণ মিত্রদের ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন আফিসে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে আমি বিশ্রাম গ্রহণ করব। আমার চলে যাওয়ার পরেও ওখানে পনেরো-কুড়িজন মজুর দাঁড়িয়ে ছিলেন। ধরণী গোস্বামী তাঁদের চলে যেতে বলছিলেন। এমন সময়ে রোগা মতো একজন উকীল (তাঁর নাম মনে নেই) এসে মজুরদের সামনে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। এই উকীল আবার মিউনিসিপালিটির একজন কমিশনারও ছিলেন। তিনি প্রাণপণে আমাদের গালি দিয়ে যাচ্ছিলেন। ধরণী গোস্বামী সহ্য করতে না পেরে মজুরদের বললেন "তোমরা এই লোকটিকে মার।" হুকুম পেয়েই মজুরেরা উকীলবাবুকে মারতে লাগলেন, তাঁকে তাঁরা মাটিতে ফেলে দিলেন। উকীলবাবু কোনো রকমে ছুটে কোর্টে চলে গেলেন। খুব নিকটে ছিল কোর্ট। সেখানেই কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে পেয়েছিলেন, না, ম্যাজিস্ট্রেটের বাসায় গিয়ে দরখাস্ত করেছিলেন তা জানিনে. ধরণীকান্ত গোস্বামীর বিরুদ্ধে গিরেফ্‌তারী পরওয়ানা ইসু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়েই তিনি কলকাতা পালিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি ডক্টর প্রভাবতী দাসগুপ্তাকে খবর দিয়েছিলেন। তিনি ট্যাক্সী নিয়ে হাওড়ায় এলেন এবং আমাকে সেই ইউনিয়ন আফিস হতে খুঁজে বা'র করলেন। তাঁর কাছ থেকে

সব খবর পেলাম। কি আর করব। পরদিন সকালে নয়টার সময় হাওড়ার ময়দানে উপস্থিত হলাম। পৌঁছানো মাত্রই ওখানকার ক'জন লোক আমায় খবর দিলেন যে শচীনন্দনকে কয়েকজন যুবক খুব মেরেছে। শচীনন্দন কোথায় গেল সে খবর তাঁরা দিতে পারলেন না। আমি নিজেকে খুবই বিব্রত বোধ করছিলাম। কোথায় খুঁজে পাব এখন শচীনন্দনকে। কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম সে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে হেঁটে আসছে। এসেই বলল কালকের উকীল বাবুর ছোট ভাইরা তাকে রাস্তায় একা পেয়ে বেদম প্রহার করেছে।

তখন থেকে একটা নূতন খেলা আরম্ভ হলো। মেথর-ঝাড়ুদারদের দু'-চারজনকে রাস্তায় পেলে হিন্দু ভদ্রলোকের ছেলেরা তাদের ঘেরাও করে মারধর আরম্ভ করেছিলেন। এই জন্যই আমরা মিটিং শেষ হওয়া মাত্রই তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে চাইতাম। ক্রমেই মারধরের মাত্রা বাড়তে লাগল। খাটা পায়খানায় শহরে নাগরিকদের দুর্গতির কোনো শেষ ছিল না। আমরা নাগরিকদের নিকটে আবেদন জানাই যে তাঁরা দলবদ্ধভাবে মিউনিসিপালিটির আফিসে গিয়ে বলুন তাঁদের দুর্গতির কথা। তাতে তাঁরা রাজী নন। এই সময়ে আমরা খবর পেলাম যে টিকাপাড়ার মুসলমানেরাও দলবদ্ধভাবে মেথর ও ঝাড়ুদারদের আক্রমণ করবেন। তার প্রস্তুতি চলেছে। আমরা টিকাপাড়ায় গিয়ে মুস্‌লিম বাশিন্দাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলাম। তাঁরা বললেন আমরা মিটিং ডেকে দিচ্ছি। আপনারা সেই মিটিং-এর সামনে আপনাদের বক্তব্য বলুন। তাঁরা কথামতো মিটিং ডাকলেন। লোকও খুব জড়ো হয়েছিল সেই সভায়। সভাপতি হয়েছিলেন ওখানকার শরীফ সাহেব। তাঁর অল্প অল্প মদের নেশা হয়েছিল। তবে, কথাবার্তা ঠিকই বলছিলেন। টিকাপাড়ায় তখনকার দিনে এক 'পাগল কোম্পানী' ছিল। কেন যে তাঁদের পাগল কোম্পানী বলা হতো তা জানিনে। তাঁরা কয়েক ভাই ছিলেন, ব্যবসায় করতেন। বেশ কিছু সম্পত্তিরও মালিক ছিলেন তাঁরা। শরীফ সাহেব ছিলেন ভাইদের ভিতরে ছোট। বেশ লম্বা, সুপুরুষ চেহারা। সভায় দাঁড়িয়ে আমিই প্রথম বললাম। বললাম, স্ট্রাইকের ফলে শহরের বাশিন্দাদের চরম দুর্গতি হয়েছে। কিন্তু মেথর-ঝাড়ুদারদেরও স্ট্রাইক ছাড়া প্রতিবাদ জানানোর অন্য কোনো উপায় নেই। তাঁদের সকলে ঘৃণা করেন, তাঁদের নালিশের কোনো প্রতিকার নেই। হাওড়া মিউনিসিপালিটি ইচ্ছা করলেই ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনেই ধর্মঘট মিটিয়ে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তাঁরা ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টাই শুরু করেছেন। হাওড়ার বাশিন্দাদের নিকটে আমাদের একান্ত অনুরোধ ছিল যে তাঁরা দলবদ্ধভাবে মিউনিসিপালিটিতে গিয়ে তাঁদের দুর্দশার প্রতিকার দাবী করুন। শরীফ জানালেন যে তাঁরা মিউনিসিপালিটিতে যাবেন না। তাঁরা মারধর ক'রে মেথরদের দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করাবেন। তা না করলে তাঁদের শিশু সন্তানেরা কলেরা ও অন্য ব্যাধিতে মরে যাবে।

মেথর ও ঝাড়ুদারেরাও বুঝেছিলেন যে স্ট্রাইক তাঁরা আর চালাতে পারবেন না। মধ্যবিত্ত আর নিম্ন মধ্যবিত্ত নাগরিকেরা এটা সহজেই বুঝেছিলেন যে ট্যাক্স বাড়ালে তা তাঁদেরই বহন করতে হবে। তাঁদের বিচারে শ্রেণীস্বার্থই প্রবল হয়ে দেখা দিল। মেথরেরা আমাদের বললেন যে নাগরিকেরা তাঁদের ওপরে যে-ভাবে জুলুম আরম্ভ করেছেন তাতে ধর্মঘট ভেঙে যাবে। আপনাদের অনুরোধে নাগরিকদের একটি দলও মিউনিসিপাল আফিসে গেলেন না। তাঁরা ঠিক করেছেন আমাদের মারধর করে আমাদের দ্বারা কাজ করিয়ে নিবেন। এখন আপনারা যে-কোনো শর্তে ধর্মঘট মিটিয়ে নিন। আপনাদের সম্মানটা তবু বাঁচুক।

হাওড়ার মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের সহিত আমাদের কথাবার্তা তো চলছিলই। ১৬ই এপ্রিল (১৯২৮) তারিখে হাওড়া ময়দানে মজুরদের নিয়ে বড় সভা করলাম। তাঁদের জানালাম কি কি পাওয়া যেতে পারে। তাঁরা আমাদের বললেন যে তাইতেই আপনারা সমঝতা করে আসুন। ডক্টর মিস্ প্রভাবতী দাসগুপ্তা "স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অফ বেঙ্গলের" প্রেসিডেন্ট্ ছিলেন। তাঁকেই মিউনিসিপাল আফিসে সই করার জন্যে পাঠালাম। আমি মজুরদের সঙ্গে নিয়ে হাওড়া ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। হঠাৎ বৃষ্টি এসে আমাদের ভিজিয়ে দিয়ে গেল। তবুও আমরা ভিজা কাপড়েই দাঁড়িয়ে থাকলাম। রাত প্রায় দশটার সময় প্রভাবতী ময়দানে ফিরে এসে মজুরদের নিকটে মিটমাটের নিম্নলিখিত শর্তগুলি পড়ে শোনালেন ঃ

(১) জুন মাসের প্রথম হতে প্রত্যেক মজুরের মাসে আট আনা হিসাবে বেতন বাড়বে ;

(২) ধর্মঘট করার জন্যে কোনো মজুরের চাকরী যাবে না ;

(৩) যে-সময়টা মজুরেরা ধর্মঘট করে কাজ করেননি তাঁরা সেই সময়ের পুরো বেতন পাবেন ;

(৪) ১৭ই এপ্রিল (১৯২৮) ভোর বেলা হতে সমস্ত মজুরকে কাজে যোগ দিতে হবে ;

(৫) মজুরেরা যতটা সময় কাজ করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ আছে ততটা সময় তাদের কাজ করতে হবে ;

(৬) মিউনিসিপালিটির তরফ হতে ডাক্তার পি. কে. ব্যানার্জি ও মিস্টার কে. এন. গাঙ্গুলীকে এবং "স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অফ বেঙ্গলের" তরফ হতে ডক্টর মিস্ প্রভাবতী দাসগুপ্তা ও মিস্টার মুজফ্ফর আহ্মদকে নিয়ে একটি সালিসি বোর্ড গঠন করা হলো। এই বোর্ড মজুরদের বিরোধগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন। বলা বাহুল্য হাওড়া মিউনিসিপালিটির ভদ্রলোকেরা এই বোর্ডের সভা কখনও ডাকেননি।

এই ভাবে হাওড়ার মেথর ও ঝাড়ুদারদের ধর্মঘটের সমাপ্তি ঘটেছিল। জীবনকৃষ্ণ মাইতি উনিশ শ ত্রিশের দশকে বিনা বিচারে বন্দী হয়েছিলেন। এই দশকের শেষ ভাগে মুক্তি পেয়েই তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে পার্টি দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পরে তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিলেন। দুশমনদের ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার ফলে ১৯৭০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শুনেছি অগম দত্তও আমাদের পার্টির সঙ্গে ছিলেন। তিনি আর বেঁচে নেই। আশা করি শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় আজও বেঁচে আছে। সে কখনও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়নি। দীর্ঘকাল হতে সে বোধ হয় কোনো রাজনীতিতেই নেই। যখন আমি চলাফেরা করতে পারতাম তখন দু' একবার তার সঙ্গে পথে দেখা হয়েছে। সারের ব্যবসায় করছিল। ডক্টর মিস্ প্রভাবতী দাসগুপ্তা হায়দরাবাদের মির্জা বাকের আলীকে বিয়ে করে হায়দরাবাদে থাকেন, বেঁচে আছেন।

*   *   *   *

আমরা যখন স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অফ বেঙ্গল গঠন করেছিলেম তখন আমরা আশা করেছিলেম যে বাঙলা দেশের (যুক্ত বাঙলার) প্রত্যেক জিলা শহরে আমরা তার শাখাসমূহ গঠন করব। মেথর ও ঝাড়ুদারেরা অতি সহজে সংগঠিত হয়ে থাকেন, আর সংগ্রামে তাঁরা অটল। আমরা যদি বাঙলার প্রতি

শহরে এই ইউনিয়নের শাখা গড়তে পারতাম তবে বাঙলার প্রতি শহরের সহিত আমাদের পার্টির, কমিউনিস্ট পার্টির পরিচয় ঘটে যেত। মেথর ও ঝাড়ুদারেরা এমন মজুর যাঁদের কাজের সহিত শহরের প্রতিটি লোকের যোগ রয়েছে। কিন্তু আমরা যা চাইছিলাম তা আমরা করতে পারিনি। সারা বাঙলায় ছোটাছুটি করার মতো লোক আমাদের ছিল না, আর অর্থও ছিল না। সেই কালে মেথর ও ঝাড়ুদারের নিকট হতে টাকা যে তুলব সে রকম অবস্থা তাঁদের ছিল না। আমি আবার ছিলাম পুলিসের সর্বক্ষণের দৃষ্টি-জর্জরিত। যখন যাঁদের নিকটেই যেতাম তাঁরা আমাকে নিয়ে বিব্রত বোধ করবেন, এমন ছিল আমার অবস্থা।

চেঙ্গাইল ও বাউড়িয়ায় ধর্মঘট

১৯২৮ সালের কথা বলছি। তখন বাঙলা দেশের (যুক্ত বাঙলার) শিল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল চটকলের শিল্প। অন্য কোনো শিল্প তার কাছেও ঘেঁসতে পারত না। চটকলগুলিতে মজুরের সংখ্যা ছিল তখন তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার। কলগুলি ছিল হুগলী নদীর দু'ধারে বিস্তৃত। কলকাতার পারে দক্ষিণে তার বিস্তার ছিল বজবজ পর্যন্ত। এখন তারও দক্ষিণে বিড়লাপুর পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটেছে। উত্তরে হালিশহরের হুকুমচাঁদ জুট মিলে তার বিস্তার শেষ হয়েছে। হুগলী নদীর হাওড়ার পারে চটকল শুরু হয়েছে দক্ষিণে ফুলেশ্বরে, আর উত্তরে শেষ হয়েছে শাহ্‌গঞ্জ-বাঁশবাড়িয়ায়। হুগলী নদীর হাওড়ার পারের সব দক্ষিণের কলগুলির মধ্যে রয়েছে চেঙ্গাইল ও বাউড়িয়া। এ দু'টি জায়গা খুব কাছাকাছি। চেঙ্গাইলের কলটির নাম লাডলো জুট মিল। এর মালিকেরা একটি আমেরিকান কোম্পানী। বাউড়িয়ায় রয়েছে একসঙ্গে তিনটি চটকল ও একটি সুতোকল। এগুলির মালিক ফোর্ট গ্লস্‌টার নামক একটি ব্রিটিশ কোম্পানী। নদীর অপর পারে গারুলিয়ায়ও এই কোম্পানীর আরও চটকল ও সুতো কল ছিল।

বাঙলার চটকলগুলি এক শ' টাকা মূলধনের ওপরে ছয় শ' টাকা পর্যন্ত মুনাফা বিতরণ করেছে। কারণ, উৎপাদনের খরচ ছিল অত্যন্ত কম, মজুরদের খাওয়া-পরার মান ছিল যার পর নেই নীচু। এই কারণে স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডিতে পরিচালিত চটকলগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। তাঁরা কিছুতে বাঙলার চটকলের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছিলেন না। তাই, ১৯২৫ সালে ডাণ্ডির চটকল মজুরদের দু'জন প্রতিনিধি এলেন বাঙলায়। তাঁদের নাম ছিল মিস্টার জনস্টোন ও মিস্টার সাইম। তাঁরা চটকলের মজুরদের ভিতরে ঘোরাঘুরি করে তাঁদের বোঝাতে চাইলেন যে "তোমরা যদি সমিতিতে জমায়েত হয়ে নিজেদের খাওয়া-পরার মান উঁচু করার জন্যে লড়াই না কর তবে ডাণ্ডিতে আমরা বাঁচতে পারব না।" সে দিনের মজুর নেত্রী মিসেস সন্তোষকুমারী গুপ্তার সহিত তাঁদের পরিচয় হয়েছিল। তিনি বার্মায় মানুষ হলেও তাঁর বাপের বাড়ী ছিল গড়িফায়,—এক রকম চটকল ইলাকার ভিতরেই। তিনিই ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ কালিদাস ভট্টাচার্যের সহিত মিস্টার জনস্টোন ও মিস্টার সাইমের পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন। এক সময়ে কালিদাসের সহিত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কিছু যোগ থাকলেও তিনি গৌরীপুর জুট মিলে কাজ করতেন। এই কারণে তাঁকে সামনে খাড়া করে বঙ্গীয় চটকল মজুর সমিতি (The Bengal Jute Workers' Association) গঠিত হয়েছিল। কালিদাস বলেছিলেন জনস্টোন ও সাইম

কিঞ্চিৎ গরম 'ইউনিয়ন' নামের চেয়ে নরম 'এসোসিয়েশন' নামটি বেশী পসন্দ করেছিলেন। ডাণ্ডিওয়ালারা কিছুকাল ধরে কিছু কিছু টাকা দিতেন। টাকাটা কালিদাস ভট্টাচার্যের হাতে আসত। সন্তোষকুমারী গুপ্তা চটকলের সংগঠন ছেড়ে দিয়ে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের কাজে মেতে গিয়েছিলেন। ডাণ্ডির টাকা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'এসোসিয়েশন'-এর নাম 'ইউনিয়ন' হয়ে গিয়েছিল এবং বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের হেড আফিস ভাটপাড়া হতে উঠে কলকাতায় এসেছিল। তার পরের ইতিহাস দীর্ঘ।

১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কিংবা ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসের শুরুতে বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের আফিস অনেক ভোটাভুটির পরে মুকুন্দলাল সরকারদের হাত হতে (তাঁরাই প্রথমে এটা গড়েছিলেন) মৃণালকান্তি বসু ও কিশোরীলাল ঘোষদের হাতে আসে। এটা অল ইন্‌ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। বসু ও ঘোষ অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায় দু'জনই ছিলেন এম· এ·, এল· এল· বি·। মৃণালকান্তি বসু ছিলেন "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক, বঙ্গবাসী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌টার-ন্যাশনাল ল'-এর লেক্‌চারার। এ সব করার পরে তাঁর ট্রেড ইউনিয়নের কাজ ছিল। তিনি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন, ইত্যাদি।

কিশোরীলাল ঘোষ ছিলেন "অমৃতবাজার পত্রিকা"র এসিস্টান্‌ট এডিটর; খেলাতচন্দ্র ঘোষ ইস্টেটের বাঁধা উকীল, প্রত্যেক দিন তাঁকে কোর্টে যেতে হতো। তিনি বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সেক্রেটারীও ছিলেন। ইন্দুভূষণ সরকারের মারফতে মৃণালকান্তি বসু ও কিশোরীলাল ঘোষ প্রেস কর্মচারী সমিতির সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। এটাই ছিল তাঁদের নিজস্ব ইউনিয়ন। কিশোরীলাল ঘোষ অনর্গল কথা ব'লে যেতে পারতেন। তাতে তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করতেন না। আর এই কথা বলায় তাঁর দিনের একটা ভালো সময় খরচ হতো। তাঁর তুলনায় মৃণালকান্তি বসু অনেক কম কথা বলতেন।

অল ইন্‌ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে মৃণালকান্তি বসু ও কিশোরীলাল ঘোষ এন· এম· জোশীর পক্ষীয় লোক ছিলেন। অন্তত, কিশোরী ঘোষ আমাদের সেই কথাই বলতেন। এই জোশী চটকল মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্যে কিছু টাকা বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের হাতে, অর্থাৎ কিশোরীলাল ঘোষের হাতে দিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস মিস্টার জোশীও টাকাটা ডাণ্ডি হতেই পেয়েছিলেন। কিশোরীলাল এই কাজের জন্যে লোক খুঁজছিলেন। একদিন সকালে কোনো কাজের উপলক্ষে আমি বাগবাজারের কাঁটাপুকুর লেনে কিশোরীলাল ঘোষের বাড়ীতে গিয়েছিলেম। সেখানে তখন **বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রাধারমণ মিত্রও** এলেন। সময়টা ১৯২৮ সালের মার্চ কিংবা এপ্রিল মাস ছিল। সেই আমি প্রথম তাঁদের দেখলাম। তাঁরা কার মারফতে কিশোরীলালের নিকটে এসেছিলেন তা আমি জানিনে, তবে কথাবার্তায় বুঝেছিলেম যে বঙ্কিম মুখার্জি ও রাধারমণ মিত্র আগে কিশোরীলালের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তিন জনেরই পরিচয় অধ্যাপক অরুণ সেনের (ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র) সঙ্গে ছিল। তিনিই বঙ্কিম মুখার্জি ও রাধারমণ মিত্রকে কিশোরীলাল ঘোষের নিকটে পাঠিয়ে থাকতে পারেন। রাধারমণ মিত্র ও বঙ্কিম মুখার্জি আমার সামনে কিশোরীলাল ঘোষকে বললেন যে তাঁদের দু'জনই যুক্ত প্রদেশে (এখনকার উত্তর প্রদেশে) স্কুল মাস্টারী করেছেন, অসহযোগ আন্দোলন করেছেন ও সেই আন্দোলনে জেল খেটেছেন।

তাঁরা এখন মজুর আন্দোলন করতে চান। তাঁরা হিন্দুস্তানীতে বক্তৃতা দিতে পারেন। কিন্তু রাধারমণ মিত্র তখন বললেন না যে তিনি গান্ধীর সবরমতী আশ্রমেও ছিলেন। আর, বঙ্কিম মুখার্জি তখন অবশ্য উত্তর কলকাতা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বি· এস· সি· পাস করে অঙ্ক শাস্ত্রে এম· এস· সি· পড়ার সময়ে কলেজ ছেড়েছিলেন। আর, রাধারমণ মিত্র সেণ্ট পল্স কলেজ হতে বি· এ· পাস করেছিলেন। তিনি যখন মজুর আন্দোলন করার জন্যে কিশোরীলাল ঘোষের নিকটে এসেছিলেন তখন তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাইমারী স্কুলের হেড্ মাস্টার ছিলেন।

চেঙ্গাইল ও বাউড়িয়া অঞ্চলের চটকলগুলিতে মজুরদের ওপরে জুলুমের কোনো অন্ত ছিল না। ওই অঞ্চলে আগে কখনও মজুব আন্দোলন হয়নি। ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে চেঙ্গাইল লাডলো জুট মিলের মজুরেরা হঠাৎ ধর্মঘট করে বসেন। তিন দিন পরেই সেই ধর্মঘট ভেঙে যায়। তাতে অনেকেই ছাঁটাই হয়। মহাদেব মজুরদের ভিতর হতে এই তিন দিনের ধর্মঘটের নেতা হয়েছিলেন। তিনিও কাজ হতে বরখাস্ত হলেন। মজুরদের ভিতরে অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছিল। তাঁরাই বোধ হয় কলকাতা গিয়ে প্রথমে বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিশোরীলাল ঘোষও এই রকম একটি যোগাযোগের জন্যে উৎকণ্ঠিত ছিলেন। কারণ, এন· এম· জোশীর নিকট হতে এই বাবতে তিনি টাকা পেয়েছিলেন।

মোটের ওপরে, চেঙ্গাইলে চটকল মজুরদের একটি ইউনিয়ন গঠিত হলো· লাডলো জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। দশ হাজার মজুর কাজ করতেন এই কলে। বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হলেন প্রথম সেক্রেটারি। পাশেই বাউড়িয়া। ফোর্ট গ্লস্টার কোম্পানী সতর্ক হলেন। তাঁদের ওখানে তাঁরা কিছুতেই ইউনিয়ন হতে দেবেন না, এই ছিল তাঁদের দৃঢ় পণ। ১৯২৮ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখে লাডলো জুট মিলের মজুরেরা পুরোপুরি ধর্মঘট করলেন। আমেরিকান কোম্পানীর ম্যানেজার মিস্টার ওয়াশিংটন মজুরদের জন্যে নানান রকম অসুবিধা সৃষ্টি করতে লাগলেন। কোম্পানীর ইলাকায় তিনি মজুরদের ইউনিয়ন আফিস করতে দিবেন না, কোম্পানীর হাটে মজুরদের বেচাকেনা করতে দিবেন না। এ হাট সাধারণের জন্যে ছিল, নিকটে অন্য কোনো হাটও ছিল না। কোম্পানীর কোয়ার্টার্সেও তিনি মজুরদের থাকতে দিবেন না যদিও ঘরগুলি মজুরদের ভাড়া-করা। রেলওয়ে রাস্তার উল্টোদিকে গ্রামে মজুরদের মিটিং হতে লাগল। সেক্রেটারি বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় সেখানেই থাকতে লাগলেন। আমাদের পার্টি আফিস হতে ফিলিপ স্প্রাট গিয়ে সেখানেই প্রাইমারী স্কুলের বা মাদ্রাসার চার দিক খোলা খড়ের ঘরে পড়ে থাকলেন। তাঁর যে কত রকমের অসুবিধা হতে লাগল সে কথা কহতব্য নয়। ভাত-ডাল যেমনই জিনিস হো'ক না কেন, তা খাদ্য। কোনো রকমে পেটের ভিতরে পৌঁছিয়ে দিতে পারলে লোক মরবেন না· কিন্তু পায়খানা? ইংরেজের ছেলের হাঁটু তো ভাঙে না যে বঙ্কিম মুখার্জির মতো মাঠে বসে পায়খানা করবেন।

হাঁ, একটি কথা আমি এখানে বলে রাখি। আমার বিরুদ্ধে কিছু মাল-মসলা জোগাড় করার উদ্দেশ্যে স্প্রাটের মৃত্যুর বোধ হয় দু' তিন মাস আগে কেউ তাঁকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। ফুলস্কেপ ফলিও সাইজের টাইপ করা বারো পৃষ্ঠায় তিনি তার উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নকর্তা যে-পুস্তক রচনায় ব্যাপৃত আছেন তার জন্যে প্রচুর মাল-মসলা তিনি পেয়েছেন

কিনা তা আমি জানিনে। পত্র আসার খবর প্রাপক আমায় একদিন বলেছিলেন। তাই, যেদিন স্প্রাটের মৃত্যুর খবর কাগজে পড়লাম সেদিন আমি সে ভদ্রলোককে টেলিফোনে অনুরোধ করলাম যে তাঁর যদি কোনো আপত্তি না থাকে তবে তিনি যদি একবার স্প্রাটের পত্রখানি আমায় পড়ে শুনিয়ে যান তাতে আমি বাধিত হব। পরে ভেবেছি যে আমি ওই রকম অনুরোধ করে ভুল করেছি। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে পত্রের কিছু অংশ আমায় টাইপ করে দিয়ে গিয়েছিলেন, আবার তা ফেরৎ নিয়েও গেছেন। আমি তার কোনো কপি রাখিনি। পত্রে একটি ভুল সংবাদ আছে। স্প্রাট লিখেছেন বাউড়িয়ার স্ট্রাইস আগে হয়েছিল এবং চেঙ্গাইলের স্ট্রাইক তার পরে। প্রকৃতপক্ষে চেঙ্গাইলের স্ট্রাইকই প্রথম হয়েছিল, বাউড়িয়ায় হয়েছিল পরে। স্প্রাটের এই ভুল তথ্য ভদ্রলোক হয়তো নিজের পুস্তকে ব্যবহার করতে পারেন সেই জন্যে আমি প্রকৃত কথা এখানে লিখে দিলাম। চেঙ্গাইলের স্ট্রাইক উপলক্ষে কিশোরীলাল ঘোষ চেঙ্গাইলে যাতায়াত করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন এটা তাঁরই ব্যাপার। উত্তর কলকাতা কংগ্রেসের লোকেরা ভাবতেন স্ট্রাইকটা আসলে তাঁরাই চালাচ্ছেন। কেননা, তাঁদের কংগ্রেসের বঙ্কিম মুখার্জি ইউনিয়নের সেক্রেটারি ও স্ট্রাইকের নেতা। তাই, হেমন্ত বসু ও সুধীর ঘোষ হতে আরম্ভ করে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক দেবকুমার গুপ্ত পর্যন্ত সকলেই চেঙ্গাইলে যাতায়াত করছিলেন। আবার, আমাদের শুধু যে ফিলিপ স্প্রাট গিয়েই ওখানে থেকে গিয়েছিলেন তা নয়, আমাদের আফিসের সকলেই চেঙ্গাইলে যাওয়া-আসা করছিলেন। যেখানে মজুরেরা লড়াই করছিলেন সেখান থেকে আমরা কি ক'রে দূরে থাকতে পারি?

মজুরদের কোনো অনমনীয় মনোভাব ছিল না। তাঁরা সব সময়ে সমঝতার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। ওয়াশিংটন চাইছিলেন যে এই লড়াই-এর ভিতর দিয়ে মজুরদের কোমর চিরদিনের জন্যে ভেঙে পড়ুক। তাঁরা আর যেন কখনও সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারেন। কিন্তু মিস্টার ওয়াশিংটনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। উলুবেড়িয়া মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের মারফতে তাঁকে মজুর নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে হয়েছিল। যে-সব দাবীর ভিত্তিতে কিশোরীলাল ঘোষ, বঙ্কিম মুখার্জি ও ফিলিপ স্প্রাট কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন সেই দাবীগুলিই কিশোরীলাল কাগজে প্রকাশ করেছিলেন। কাগজে সব হেডিং দেওয়া হয়েছিল যে Workers gain Substantial Concessions (মজুরেরা বাস্তব সুযোগ-সুবিধা পেলেন।) এই দাবীগুলি যে-ভাবে প্রচার করা হয়েছিল তা থেকে মনে হবে যে মজুরেরা অনেক কিছু পেয়েছিলেন। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় কিশোরীলাল ঘোষের স্বপক্ষে দাখিল করা দলীল ডি-১৭৪(১) দ্রষ্টব্য।

আসলে ব্যাপার যা ঘটেছিল তা ছিল এই। ১৯২৮ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখে চেঙ্গাইলের লাডলো জুট মিলের দশ হাজার মজুর ধর্মঘট করেছিলেন। সতের দিন ধর্মঘটের পরে ১৯২৮ সালের ১০ই মে তারিখে মজুরেরা কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কী যে তাঁরা পেয়েছিলেন তা বোঝার উপায় নেই। কোম্পানী কিছু দিবেন বলে কথা দিলেও সে কথা তাঁরা রাখেননি। কারণ, কিছুদিন যেতে না যেতেই মজুরেরা আবার কয়েক দিনের জন্যে ধর্মঘট করেছিলেন।

ব্রিটিশ ধনিকের মুখপত্র "দি স্টেট্‌সম্যান" লিলুয়ার ধর্মঘটের সঙ্গে চেঙ্গাইলের চটকল মজুরদের ধর্মঘটকে একত্র করে হাওড়া জিলার ধর্মঘটরূপে দেখছিলেন। ১১ই মে (১৯২৮) তারিখের "দি স্টেট্‌সম্যান" লিখেছিল ঃ

"The conditions of the men's return were settled at a meeting of their leaders and the Mill authorities on Wednesday (i. e. 9th May, 1928). The terms were :

No increase in wages,
No strike pay,
No recognition of the union."

অর্থাৎ "মজুর নেতাদের সঙ্গে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তার ভিতর দিয়ে গত বুধবারে (৯ই মে, ১৯২৮) যে শর্তগুলি স্থির হয়েছিল সেগুলি ছিল এই ঃ

মজুরী বাড়বে না,
মজুরেরা ধর্মঘটের সময়ের মজুরী পাবে না,
ইউনিয়নকে মেনে নেওয়া হবে না।"

এটা লেখার সময়ে 'স্টেট্‌সম্যান' বোধ হয় একটা মানসিক আরাম বোধ করছিল।

লাডলো জুট মিলের ১৯২৮ সালের ম্যানেজার ওয়াশিংটন আর এ দেশে নেই, কিশোরীলাল ঘোষ, বঙ্কিম মুখার্জি ও ফিলিপ স্প্রাট মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, সে দিনের সে সব মজুরও আর নেই, কিন্তু চেঙ্গাইলে লাডলো জুট মিল আজও (১৯৭১ সাল) চলেছে। শোষণের অবসান যদিও হয়নি তবুও মজুরেরা শক্তিশালী ইউনিয়ন সেখানে গড়ে তুলেছে। আজকের মজুরদের সহিত মালিকেরা ১৯২৮ সালের ভাষায় আর কথা বলতে পারেন না। আজ মজুরদের অনেক সমীহ করে মালিকেরা কথা বলেন।

১৯২৮-২৯ **সালের বাউড়িয়া চটকল মজুর ধর্মঘটের কথা এখন কিছু বলি।** ফোর্ট গ্লস্টার কোথায় তা জানিনে, ভূগোল খুঁজে তার নাম পাওয়া গেল না। স্কটল্যাণ্ডের কোনো একটি ক্ষুদ্র দুর্গের নাম যদি ফোর্ট গ্লস্টার হয় তবে তা ভূগোলের নির্ঘণ্টে পাওয়া যাওয়ার কথাও নয়। তবে, যে-সব কোম্পানী কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে হুগলী নদীর দু' তীরে জুটের (পাটের) রোমাঞ্চক কাহিনী রচনা করেছিল ফোর্ট গ্লস্টার কোম্পানীও তার মধ্যে একটি। আগেই বলেছি যে বাউড়িয়া গ্রামে ফোর্ট গ্লস্টার কোম্পানীর তিনটি চটকল ও একটি সুতো কল ছিল। বাউড়িয়া হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন হতে ষোল মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এটা তখনকার দিনের বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের এবং এখনকার সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ের একটা স্টেশন। ফোর্ট গ্লস্টার কোম্পানী যখন চটকল তৈয়ার করছিলেন তখন তাঁরা শুধু কল তৈয়ার করার প্রয়োজনীয় জমি কিনেননি, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আশে-পাশের প্রায় বিশখানি গ্রামের জমীদারীও কিনে নিয়েছিলেন। বাউড়িয়ার কলগুলিতে যে-সব স্থানীয় মজুর কাজ করতে আসতেন তাঁরা শুধু কোম্পানীর কলের মজুর হতেন না, কোম্পানীর জমীদারীর প্রজাও তাঁরা ছিলেন। এই প্রজাদের মজুররূপে পেয়ে ফোর্ট গ্লস্টার কোম্পানীর দাপটের অন্ত ছিল না।

আগেই বলেছি ফোর্ট গ্লস্টার কোম্পানীর পণ ছিল যে তাঁরা কিছুতেই বাউড়িয়ায় মজুরদের ইউনিয়ন বানাতে দিবেন না। কিন্তু ইউনিয়ন না বানালে দুঃসহ অবস্থা হতে বের হয়ে আসার জন্যে মজুরেরা লড়াই করবেন কিসের ভিতর দিয়ে? ফোর্ট গ্লস্টার কোম্পানীর পেছনের গেট ছিল হুগলী নদীতে। তাঁদের

অনেক নৌকাও ছিল। অতএব নৌকার মাঝিরাও ছিলেন। কোম্পানীর অনেক দরওয়ানও ছিল। এই দরওয়ান ও মাঝিদের একত্র ক'রে সংখ্যা ছিল দু'শ। তারা যে কোনো সময়ে মারধর শুরু করে দিত। এত সব সত্ত্বেও ১৯২৮ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে বাউড়িয়া চটকল মজুর ইউনিয়ন গঠিত হলো। ইউনিয়ন গঠিত হলো এই ঘোষণা করার জন্যে যে-মাঠে মিটিং ডাকা হয়েছিল (বরাবর এ মাঠেই মিটিং হতো) সে মাঠে মিটিং হতে কোম্পানী দিল না। অজুহাত ছিল যে মাঠটি কোম্পানীর। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এসে মজুর নেতাদের ওপরে নোটিসও জারী করলেন। তবুও রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে ইউনিয়ন গঠনের ঘোষণা হলো। আর, সঙ্গে সঙ্গে ১৬ই জুলাই (১৯২৮) তারিখে শুরু হয়ে গেল বাউড়িয়ায় চটকল মজুরদের ধর্মঘট। উলুবেড়িয়া মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে আমরা চেঙ্গাইলেও দেখেছি। সেখানেও লোক গিরেফ্‌তার হয়েছেন, বঙ্কিম মুখার্জির নামে মোকদ্দমা চলেছে, তবুও মালিকেরা আমেরিকান হওয়ায়, অর্থাৎ ব্রিটিশ নাগরিক না হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট চাইতেন যে একটা মিটমাট হয়ে যাক। কিন্তু বাউড়িয়ায় এই ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট একটি জঘন্য চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। এখানে যে করেই হোক তাঁকে ব্রিটিশ মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে, এমন ভাব গ্রহণ করলেন তিনি।

১৯২৮ সালের ১৬ই জুলাই হতে ১৯২৯ সালের ১৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত পুরো ছয় মাস মজুরেরা ধর্মঘট চালিয়েছিলেন। ধর্মঘটের প্রথম দিনেই মজুরদের ওপরে গুলি চলল। তাতে ২৮ জন মজুর আহত হলেন, তার মধ্যে পাঁচজনের আঘাত আশঙ্কাজনক ছিল। তবুও মজুরেরা ধর্মঘট চালিয়ে গেলেন। এত দীর্ঘকাল চটকল মজুরের ধর্মঘট চালানোর কোনো ইতিহাস নেই। শুধু সেই সময়ের কথা নয়, আজ পর্যন্ত চটকলের মজুরেরা এমন ইতিহাস কোথাও সৃষ্টি করতে পারেননি।

কোম্পানীর অনুরোধে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বে-আইনীভাবে মজুরদের যখন তখন গিরেফ্‌তার করে ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়িয়ে দিত এবং সে মোকদ্দমা চলতেই থাকত। মজুরদের ওপরে এটাই ছিল জঘন্যতম জুলুম।

কোম্পানী কোনো রকম আলোচনায় আসতে চাইত না। দু' শিফ্‌টের জায়গায় এক শিফ্‌ট চালু করা নিয়ে যে বিরোধ আরম্ভ হয়েছিল তার বিষয়ে কোনো কথা বলতেও কোম্পানী রাজী হলো না। তাঁরা চেয়েছিলেন যে মজুরের মেরুদণ্ড তাঁরা ভেঙে দিবেন। এটা কখনও সম্ভব নয়। ধনিক কোম্পানীকে মুনাফা লুঠের জন্যে কারখানা চালাতে হবে। কারখানা চালানোর জন্যে মজুরের প্রয়োজন হবেই। ধর্মঘট ভাঙার জন্যে মালিকেরা যে সকল মজুর নিযুক্ত করেন সে সকল মজুরও পরে মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন এবং ধর্মঘটও করেন।

ফোর্ট গ্লস্টার কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সি কেটল্‌ওয়েল বুলেন এণ্ড কোম্পানী কেবলই ধর্মঘট ভঙ্গকারীদের ঢোকাবার চেষ্টা করতে থাকলেন, আর বাউড়িয়ার মজুরেরা বীরত্বের সহিত তার বিরুদ্ধে লড়াই করে চললেন। ছয় মাস পরে আলমবাজারের দু'জন লোক, যতটা মনে পড়ে তাদের নাম ছিল ধীরেন চট্টোপাধ্যায় ও তুলসী ঘোষ, কোম্পানীর নিকট হতে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক বেকার মজুর পেছনের দরজা দিয়ে বাউড়িয়ার কলে ঢুকিয়ে দিল। উপোসে কাহিল মজুরেরা তখনকার মতো আর বাধা দিতে পারলেন না। বাউড়িয়ার ধর্মঘট ১৯২৯ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে ভেঙে গেল।

এই ধর্মঘটে অ-মজুর নেতারা ছিলেন রাধারমণ মিত্র, বঙ্কিম মুখার্জি, ফিলিপ স্প্রাট ও গোপেন্দ্র চক্রবর্তী। পুরনো দিনের খবরের কাগজে দেখলাম চিরঞ্জীলাল সরফ (সর্‌রাফ)ও বাউড়িয়ায় গেছেন। চিরঞ্জীলাল আসানসোলে প্রথম আমাদের সংস্রবে এসেছিলেন। কিশোরীলাল ঘোষ বেঙ্গল ট্রেড্‌ ইউনিয়ন ফেডারেশনের তরফ হতে যাতায়াত করতেন।

বাউড়িয়ার একটি ব্যাপার নিয়ে কিশোরীলাল ঘোষের সঙ্গে আমার কিছু মনোমালিন্য হয়েছিল। বোম্বের গিরনী কামগার ইউনিয়নের জেনেরেল সেক্রেটারি এস· এ· ডাঙ্গে আমাকে বাউড়িয়া স্ট্রাইকের জন্যে পাঁচ শ' টাকা পাঠিয়েছিলেন। টাকা যখন পৌঁছেছিল তখন স্ট্রাইক ভেঙে গিয়েছিল। আমি ডাঙ্গেকে জানালাম যে বাউড়িয়ার স্ট্রাইক ভেঙে গেছে। বোম্বে হতে ডাঙ্গে যে টাকা পাঠিয়েছিল সে খবর এন· এম· জোশীর সহকারী বাখালে সঙ্গে সঙ্গেই কিশোরীলালকে জানিয়েছিলেন। আমাদের আফিস হতেও তিনি জেনেছিলেন। ডাঙ্গেব উত্তর আসার আগেই আমি নলপুরের (হাওড়া স্টেশন হতে যেতে বাউড়িয়ার আগেকার স্টেশনে) এক সভায় গিযে একশ' বা দেড়শ' টাকা দেওয়ার জন্যে বা'র করা মাত্রই কিশোরীলাল টাকাটা ছোঁ মেরে নিয়ে নিলেন। ফিরে আসাব সময়ে রাধারমণ মিত্র (এখনও বেঁচে আছেন) ও বঙ্কিম মুখার্জি আমায় একান্তে বললেন যে "আপনি কেন টাকাটা কিশোরীলাল ঘোষকে দিলেন? তিনি তো তা ট্যাক্‌সি চড়েই খরচ ক'রে দিবেন।" তখনকার দিনে পুরনো হাওড়া ব্রীজ পাব হয়ে হ্যারিসন রোডে এসে ট্রাম ধরতে হতো। আমরা যখন ট্রামে চড়লাম তখন দেখলাম যে কিশোরীলাল ঘোষ ট্যাক্‌সি নিয়ে চলে গেলেন। তাঁর ট্যাক্‌সিতে যাওয়ার ইচ্ছাই যখন ছিল তখন বঙ্কিম মুখার্জি ও রাধারমণ মিত্রকেও সঙ্গে ডাকতে পারতেন। তাঁরাও উত্তর কলকাতায় থাকতেন।

ডাঙ্গেব নিকট হতে জওয়াব পেলাম। সে লিখেছে বাউড়িয়ার স্ট্রাইক ভেঙে যাওয়ার জন্য সে দুঃখিত। আমি যাতে ভালো মনে কবি টাকাটা যেন তাতেই খরচ করি। তাই আমি করেছিলেম। সেই সময়ে আমাদের পার্টির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হযে উঠেছিল। স্প্রাটের পকেট হতে কিছু টাকা চুরি হওয়ায় বিপদ আবও বেড়েছিল। টাকাটা আমি আমাদের পার্টির কর্মীদের জন্যেই খরচ করেছিলেম। সেই কর্মীদের ভিতরে স্প্রাটও ছিলেন। তখন আমার নিকটে তাই ভালো মনে হযেছিল।

কিশোবীলাল ঘোষ প্রত্যেক দিন দৈনিক কাগজের জন্যে লিখতেন। লেখা তাঁর সহজেই আসত। তিনি এই টাকার জন্যে আমায় যা তা লিখতে লাগলেন। একদিন আমি কড়া ভাষায় জওয়াব দিলাম। আমাব নিকটে ডাঙ্গের পত্র ছিল। তাতে তিনি প্রায খেপে গেলেন। তাঁব খেপে যাওযার অন্য কারণও ছিল। বাউড়িয়ার ছয় মাসের ধর্মঘটের পরে কিশোরীলাল খতিয়ে দেখেছিলেন যে তাঁর পায়ের তলায় কোনো মাটি নেই,—পায়েব তলায় মাটি ছিল রাধারমণ মিত্র ও বঙ্কিম মুখার্জির। তাঁদের দু'জনের একজনও ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টির সভ্য ছিলেন না। কাজেই তিনি ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টির ওপরে চটতে পারলেন না। ফিলিপ স্প্রাটের পায়ের তলায় কিছু মাটি ছিল বলে আমাদের পায়ের তলায়ও ছিল। কিন্তু স্প্রাটের ওপরে তিনি রাগ করতে পারতেন না। তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে রাধারমণ মিত্র ও বঙ্কিম মুখার্জি কিশোরীলালকে টাকা দিতে আমায বারণ করে থাকবেন। এ সন্দেহ যে অমূলক ছিল না তা তো আগেই বলেছি। স্প্রাট কিন্তু এ কথা জানতেন না।

গিরনী কামগার ইউনিয়নের টাকার শোক কিশোরীলাল ঘোষ মীরাটের আদালতে গিয়েও ভুলতে পারেননি। সেখানে গিয়ে যখন তিনি ডাঙ্গের আমাকে দেওয়া উপদেশ পড়লেন তখন তিনি ডাঙ্গের ওপরে চটে গেলেন। সে কেন টাকা মুজফ্ফর আহ্মদকে পাঠাল? তার উচিত ছিল টাকাটা বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনকে, অর্থাৎ তাঁকে পাঠানো। কিন্তু গিরনী কামগার ইউনিয়ন তো অল-ইনডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত তখনও সংযুক্ত হয়নি। কেন তাঁরা টাকা পাঠাবেন কিশোরীলালকে? তা ছাড়া, এন. এম. জোশী তো ঠিকই করে রেখেছিলেন যে গিরনী কামগার ইউনিয়ন অল-ইনডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত সংযুক্ত হওয়া মাত্রই তিনি আলাদা হয়ে অল-ইনডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠন করবেন।

এ সব কথা এই পুস্তকে লেখার মতো নয়। কিন্তু কিশোরীলাল ঘোষ মীরাটের আদালতে এসব কথা রেকর্ডে ঢুকিয়ে জল ঘোলা করেছেন। কলকাতা হতে আরম্ভ করে মীরাটের আদালত পর্যন্ত সর্বত্র জল ঘোলা করাই ছিল তাঁর কাজ।

বাউড়িয়ার ছয় মাস স্হায়ী ধর্মঘট শেষ হওয়ার পরে তেতাল্লিশ বছর কেটে গেছে। পুরনো নেতাদের ভিতরে বঙ্কিম মুখার্জি আমাদের পার্টিতে (কমিউনিস্ট পার্টিতে) যোগ দিয়েছিলেন। এখন বেঁচে নেই। ফিলিপ স্প্রাট আমাদের পার্টি ত্যাগ করেছিলেন। এখন তিনিও বেঁচে নেই। রাধারমণ মিত্র বেঁচে আছেন, কোনো রাজনীতিতে নেই। গোপেন্দ্র চক্রবর্তী দক্ষিণপন্হী কমিউনিস্ট পার্টিতে আছেন এবং মস্কো রেডিওতে চাকরী করেন।

বাউড়িয়ার কলগুলি আজও চলেছে। ফোর্ট গ্লস্টার কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সি কেটল্‌ওয়েল বুলেন এণ্ড কোম্পানী নিজেদের মাড়োয়ারী ফার্ম বাঙ্গুর ব্রাদার্সের নিকটে বিক্রয় করে দিয়ে কয়েক কোটি টাকা নিয়ে তাঁদের স্বদেশ স্কটল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন। পুরানো দিনের মজুরেরা আর নেই। স্হানীয় মজুরদের বংশধরেরা এখন কাজ করছেন। কথায় কথায় মজুরদের সহিত আগেকার মতো দুর্ব্যবহার করা হয় না। মজুরেরা আজকাল খুবই রাজনীতি-সচেতন। পুরো অঞ্চল এখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদীর) দ্বারা প্রভাবিত। গত নির্বাচনে (ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১) ওই অঞ্চলের প্রাদেশিক আইন সভার আসনগুলিতে ও লোকসভার আসনে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) জিতেছে। সমগ্র হাওড়া জিলায় লোকসভার দু'টি আসনের মধ্যে দু'টিতেই, প্রাদেশিক আইনভার মোট ষোলটি আসনের মধ্যে তেরোটিতে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) জয়লাভ করেছে। একটি আসনে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে আর. সি. পি. আই. জিতেছেন। বাউড়িয়ার কথা এখানে শেষ করি।

বোম্বে সুতাকল মজুরদের ধর্মঘট, ১৯২৮

১৯২৮ সালের বোম্বে সুতাকল মজুরদের ধর্মঘট সম্বন্ধে এখানে বিশেষভাবে কিছু বলা দরকার। এই বছর এবং এর আগের বছরেও ভারতের নানা স্থানে মজুরেরা ধর্মঘট করেছেন। সে বিষয়ে আমি আগে লিখেছি। কিন্তু বোম্বের সুতাকলে মজুরেরা ১৯২৮ সালে যে সাধারণ ধর্মঘট করেছেন, তার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সুতাকলের তাঁতী অর্জুন আত্মারাম আলবের সভানেতৃত্বে যে ইউনিয়ন ছিল, তার নাম ছিল "গিরনি কামগর মহামণ্ডল"। মহারাষ্ট্রে ছোট ছোট অনেক দেশীয় রাজ্য ছিল। তার মধ্যে একটির নাম সামন্তওয়াড়ি। অর্জুন আলবে একজন কৃষক ছিলেন। গ্রাম্য শোষণে সর্বস্বান্ত হয়ে বোম্বে শহরে সুতাকলে কাজ করতে আসেন। পরিবার হতে তিনি একাই আসেননি, তাঁর ভাই ও বোনও সুতাকলে কাজ করতে এসেছিলেন। লেখাপড়ার দিক থেকে তিনি মারাঠী ভাষা জানতেন, ইংরেজী জানতেন না। সেকালে ট্রেড ইউনিয়নগুলির দপ্তরের খাতাপত্র ও হিসাব ইত্যাদি ইংরেজীতে রক্ষিত হতো ; আজও তাই হয়। মজুরদের এক ভাষা নয়। বোম্বেতে মারাঠা মজুরদের প্রাধান্য ছিল। তাদের ভাষা ছিল মারাঠী। যুক্তপ্রদেশ (এখনকার উত্তর প্রদেশ) হতে যে মজুররা এসেছিলেন, তাঁদের ভাষা ছিল উর্দু। তাছাড়া গুজরাতী-ভাষী মজুরও ছিলেন ; তাঁরা সংখ্যায় কম ছিলেন। গিরনি কামগর মহামণ্ডলেও ইংরেজী জানা মায়েকারকে সেক্রেটারী করা হয়েছিল। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। সেই থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত মায়েকারই ইউনিয়নের সেক্রেটারী ছিলেন। সেই থেকে তিনি হিসাব-নিকাশ যথাযথ রাখেননি। অনেক টাকারই কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। এটা যখন ধরা পড়ল, তখন মজুরেরা প্রস্তাব পাশ করে তাঁকে ইউনিয়ন হতে বার করে দেন। ইংরেজী জানা লোকের তো দরকার ছিলই। এই দিক থেকে আলবে যখন বিভিন্ন লোকের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন তখন তিনি ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টি-র সভ্য কে. এন. জোগলেকরের সংস্রবে আসেন। জোগলেকরও ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করতেন। তাঁর মারফতে আলবে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টি-র ও কমিউনিস্ট পার্টি-রও সভ্যদের সঙ্গে পরিচিত হন।

এন. এম. জোশী "সার্ভেণ্টস অব ইন্ডিয়া সোসাইটি"-র সভ্য ছিলেন। সেই হিসাবে মজুরদের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু খোঁজখবর নিতেন। তার সঙ্গে ঐ সোসাইটিরই সভ্য বাখলে ও পারুলেকার প্রভৃতিও ছিলেন। ভারত গবর্নমেণ্ট এই জন্যে জোশীকেই সেণ্ট্রাল অ্যাসেম্বলীর সভ্য মনোনীত করতেন। তিনি ও তাঁর দলের লোকেরা আলবের গিরনি কামগর মহামণ্ডলে প্রবেশ করতে চাইছিলেন। কিন্তু মহামণ্ডল এত বেশী শিক্ষিত লোককে ইউনিয়নে নিতে চাননি। আলবের এই মত। জোশীরা "বোম্বে টেক্সটাইল লেবর ইউনিয়ন" নাম দিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠন করলেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন আইন অনুসারে তা রেজিস্ট্রী করেও নিলেন। ১৯২৮ সালে যখন সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল, তখন

এই ইউনিয়নই ছিল একমাত্র রেজিস্ট্রী করা ইউনিয়ন। কিন্তু তার সভ্য সংখ্যা নগণ্য ছিল।

এস. এচ. ঝাবওয়ালার মিল-ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নামে একটি রেজিস্ট্রী না-করা ইউনিয়ন ছিল। তারও মেম্বর সংখ্যা সামান্যই ছিল। তিনিও আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্ট্স পার্টি-র সভ্যদের সঙ্গে ও কমিউনিস্ট-দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন আর, আলবে তো তখন আমাদের সঙ্গে পুরোপুরি কাজই করছিলেন। তাঁকে নিয়েই তখন আমরা বোম্বে গিরনি কামগর ইউনিয়ন গঠন করি। পরে এই নামের সঙ্গে (লাল বাওটা) [রক্ত পতাকা] নাম যোগ করা হয়েছিল। এই ইউনিয়নকেও রেজিস্ট্রী করা হয়েছিল। এন. এম. জোশী প্রথমে সাধারণ ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ছিলেন। পরে তাঁকেও এই ধর্মঘটের পেছনে এসে দাঁড়াতে হয়। তখন সব দলের অর্থাৎ জোশীর, ঝাবওয়ালার ও আমাদের দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় স্ট্রাইক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে খুব বেশী সংখ্যক মজুর ছিলেন। এবং আলবের মতো বুঝদার মজুরের সংখ্যাও কম ছিল না। এই ধর্মঘট ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। প্রতিদিন সকালবেলা নানা এলাকার ধর্মঘটী মজুরদের সভা হতো। এই সকল সভায় সব দলের লোকেরা বক্তৃতা দিতেন; মজুরেরাও বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু বক্তৃতায় আমাদের দলের লোকেরাই বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন। আমাদের নিম্বকর, মিরাজকর, জোগলেকর, এস. এ. ডাঙ্গে ও বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস ব্রাড্লি সুবক্তা ছিলেন। এই বক্তৃতা মজুরদের মনোরাজ্যে প্রবেশ করছিল। এইখানে কলকাতার আমাদের কমরেডদের সঙ্গে বোম্বের দারুণ পার্থক্য ছিল। বোম্বের মিলগুলো বোম্বের দ্বীপ সমষ্টির ভিতরে অবস্থিত ছিল। চার পয়সার একখানা ট্রামের টিকিট কিনে সমস্ত বোম্বে ঘুরে আসা যেত। কিন্তু কলকাতাকে কেন্দ্র করে আমাদের কল-কারখানাগুলি হুগলী নদীর দুই তীরে ৭০/৮০ মাইল বিস্তৃত ছিল। মজুরদের সঙ্গে বোম্বের মতো মেলামেশার সুযোগ আমাদের ছিল না। সর্বোপরি আমাদের বোম্বের কমরেডরা ছিলেন সত্যিকার বক্তা। কলকাতার আমরা তা ছিলেম না। বঙ্কিম চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রাধারমণ মিত্র দুজনে ছিলেন বিখ্যাত বক্তা। কিন্তু তাঁরা আমাদের সঙ্গে কাজ করতেন বটে, তবে আমাদের কোন পার্টির সভ্য তাঁরা ১৯২৮ সালে ছিলেন না।

দীর্ঘ ধর্মঘটের ফলে প্রতিদিনের প্রচারের ভিতর দিয়ে বোম্বের সুতাকল মজুরেরা সত্যিই শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। বক্তৃতাগুলো রাজনীতিতে ভরা থাকত। আমি নিজের চোখে দেখেছি কত দৃঢ়তার সহিত মেয়ে মজুরেরা পিকেটিং করছিলেন। ধর্মঘটী মজুরদের জন্য বিভিন্ন দেশের মজুরেরা আর্থিক সাহায্য পাঠাতেন। কখনো কখনো এই সাহায্য এন. এম. জোশীর নামে ও ঝাবওয়ালার ইউনিয়নের নামেও এসে যেত। কিন্তু সব টাকা জমা হতো স্ট্রাইক কমিটির নিকটে। স্ট্রাইক কমিটি মজুরদের ডোল বিতরণ করতেন। এইভাবে চলেছিল বোম্বের সুতাকল ধর্মঘট।

ধর্মঘটের মীমাংসা

"Several attempts were made by interested persons to try to end the strike, but it was not until October the 4th that representatives of the Joint Strike Committee met the representa-

tives of the mill-owners, and at this meeting it was agreed that work should be resumed on the following terms :—

"(1) That a Committee of three members be appointed by the Government of Bombay, with terms of reference to cover the question of the 17 demands of the workers, the standardisation scheme of the owners and their standing orders.

"(2) Work to be resumed on the basis that for the period between the calling off of the strike and the publication of the report of the Committee of Enquiry, the rates and wages of March 1927 should be paid provided that in those mills of the Sassoon group, the Findley group and the Kohinoor mill which now worked on the revised system, the rates and the wages of March 1928 shall be paid in the spinning department only, and in the following mills the rates of March 1928 be paid in the weaving department :

The Manchester, the Appollo and the Mayer Sassoon Mills. The question of muster-rolls shall not arise. Certain scales of advance were given on the workers resuming work. Work to be resumed on Saturday, October the 6th of 1928. This was in brief, the terms of the resumption of work and how one of the biggest strikes that Bombay City had ever seen came to an end."

(From the statement given by B. F. Bradley in the Meerut Sessions Court.)

বঙ্গানুবাদ

"যাঁরা কোন রকমে প্রয়োজন বোধ করেছেন এমন লোকেরা কয়েকবার চেষ্টা করেছিলেন যাতে ধর্মঘটের সমাপ্তি ঘটানো যায়। তবে ৪ঠা অক্টোবরের আগে যুক্ত স্ট্রাইক কমিটি ও মিলমালিকদের প্রতিনিধিরা এই সম্পর্কে কথাবার্তা বলার জন্য মিলিত হননি। ৪ঠা অক্টোবরের এই মিটিং-এ স্থির হয় যে ঃ

"(১) বোম্বে গবর্নমেণ্ট তিনজন সভ্যযুক্ত একটি কমিটি নিযুক্ত করবেন। এই কমিটি মজুরদের ১৭ দফা দাবী বিবেচনা করবে। মালিকদের স্টান্ডার্ডাই-জেশান পরিকল্পনা এবং তাদের চালু ব্যবস্থাগুলিও এই কমিটির দ্বারা বিবেচিত হবে।

"(২) মজুরেরা কাজে যোগ দেবেন এবং যোগ দেওয়ার ভিত্তি হবে এই যে ধর্মঘট প্রত্যাহার ও ইন্‌কোয়ারী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ে ১৯২৭ সালের মার্চ মাসের মজুরী ও হার মজুরদের দেওয়া হবে। এরই সঙ্গে আরো শর্ত হলো এই যে স্যাসুন গ্রুপের মিলে, ফিনড্‌লে গ্রুপের মিলে এবং

কোহিনুর মিলে, যেখানে পরিবর্তিত কায়দায় কাজ হচ্ছিল, সেখানে শুধু স্পিনিং ডিপার্টমেণ্টে ১৯২৮ সালের মার্চের হার ও মজুরী মজুরদের দেওয়া হবে, এবং নিম্নলিখিত মিলগুলির উইভিং ডিপার্টমেণ্টে ১৯২৮ সালের মার্চের হার দেওয়া হবে ঃ

ম্যাঞ্চেস্টার, অ্যাপেলো এবং মেয়ার স্যাসুন মিলগুলি। স্থির হলো হাজিরার প্রশ্ন উঠবে না। কাজে যোগ দিলে মজুরদের বিশেষ হারে অগ্রিম দেওয়া হবে। ১৯২৮ সালের ৬ই অক্টোবর (শনিবার) মজুরেরা কাজে যোগ দেবেন, ঠিক হলো। মজুরদের কাজে যোগদানের শর্তাবলী এবং বোম্বে শহরে অনুষ্ঠিত অন্যতম বৃহত্তম ধর্মঘটের সমাপ্তি কি ভাবে হলো, তা সংক্ষেপে বলা হলো। (বি· এফ· ব্রার্ডলির মীরাট দায়রা আদালতে দেওয়া বিবৃতি হতে উদ্ধৃত।)

১৯২৮ সালে বোম্বেতে সুতাকলে মজুরদের এই ধর্মঘট বোম্বের প্রাদেশিক সরকারী মহলে চাঞ্চল্য তো এনেছিলই, তাছাড়া দিল্লি ও সিমলাতে ভারত গবর্নমেণ্টকেও কিঞ্চিৎ নাড়িয়ে দিয়েছিল। ভারত গবর্নমেণ্টের তরফ হতেও নানাভাবে এই সাধারণ ধর্মঘটকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল। ভারত গবর্নমেণ্টের কমার্স ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী স্যার জর্জ রেনি ঐ গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ এইচ· জি· হেজ-কে যে ডেমি-অফিসিয়াল পত্র লিখেছিলেন তাতে এক জায়গায় আছে ঃ

"In several respects the strike itself had been remarkable. It was unprecedented in the length of time for which it lasted and in the discipline and cohesion of the strikers."

(Home Dept. F. No. 18/XVI/1928-Poll & K. W.)

বঙ্গানুবাদ

"নানা বিষয়ে এই ধর্মঘটটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সময়ের দীর্ঘতা, ধর্মঘটীদের শৃঙ্খলা ও তাদের সংহতি ছিল অভূতপূর্ব।"

এই শৃঙ্খলাবোধের কথাটি বোম্বের পুলিস ভালোভাবে নেয়নি। মিল-মালিকেরা তো এটা মেনে নিতেই চায়নি। কিন্তু দিল্লি-সিমলা হতে এসে স্যার জর্জ রেনি-র পর্যবেক্ষণে এটা ধরা পড়েছে। আমাদের মজুরেরা যে সুশৃঙ্খল সংগ্রাম চালিয়েছে এটা মস্ত বড় কথা।

যাঁর অধিনায়কত্বে কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল, তিনি ছিলেন বোম্বে হাইকোর্টের মিস্টার জাস্টিস ফসেট। তাঁরই সেশনস আদালত হতে চায়না-ইনডিয়া মোকদ্দমায় জুরাররা ফিলিপ স্প্রাট, মিরাজকর ও আরও একজনকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার উদ্ভব

ভারত গবর্নমেণ্টের দলিলপত্রে এই সম্বন্ধে তালাশ করতে গিয়ে আমরা চারটি ফাইলের সন্ধান পাচ্ছি। এই ফাইলগুলির নম্বর নীচে দিলাম ঃ

Home Dept. F. No. 18/XVI/1928 Poll. & K. W.
Home Dept. Poll. & K. W. No. 18-XVI/28 of 1928.
File No 10/IV/29 K. W. of 1929.
File No 10/IV/29-Poll.

এই ফাইলগুলির অন্তর্ভুক্ত কাগজপত্রগুলো হচ্ছে বড়লাট ও সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইন্ডিয়ার মধ্যে গোপন পত্রালাপ ও টেলিগ্রামে আলাপ; ভারত গবর্নমেণ্টের দপ্তরের সহিত স্টেট সেক্রেটারী দপ্তরের আলোচনা; বোম্বে গবর্নমেণ্ট ও ভারত গবর্নমেণ্টের সহিত বিশেষ আলোচনা; এবং ভারত গবর্নমেণ্ট ও ভারতের প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টগুলির মধ্যে মত বিনিময়।

১৯২৪ সালে কানপুরে "বলশেভিক ষড়যন্ত্র" মোকদ্দমা দায়ের করার জন্য ১৯২৩ সাল হতে সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া জিদ ধরেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতে "বলশেভিকদের" অংকুরে বিনষ্ট করা। এই মোকদ্দমার আসামীদের মধ্যে কেউ কেউ ১৯২৩ সালের মে মাসেই ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কথা মোকদ্দমা দায়ের করার কয়েকমাস আগে মাত্র উঠেছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৯২৮ সালের ২৪শে মে পর্যন্ত মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা সম্পর্কে ভারত গবর্নমেণ্ট বা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট কেউই কোন ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। বড়লাট আরউইন সেক্রেটারী অব স্টেটকে এক পত্রে ঐ তারিখে জানালেন ঃ

"I am in full agreement with you that the line of proscribing such movements does not hold out much hope of success........."
(Home Dept. F. No. 18/XVI/1928-Poll. [K. W.])

বঙ্গানুবাদ

"এইরূপ আন্দোলনকে বে-আইনী ঘোষণা করে খুব বেশী সাফল্য লাভ করা যাবে না বলে আপনার (সেক্রেটারী অব স্টেট্-এর) সঙ্গে আমার (আরউইন) পূর্ণ মতৈক্য আছে।"

কিন্তু ভারত গবর্নমেণ্ট চুপ করে বসে ছিলেন না। তাঁরা বিদেশের আর্থিক সাহায্য বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। রাশিয়া হতে কিছু অর্থ সাহায্য বোম্বে মিল ধর্মঘটীদের জন্য এসেছিল। আর কিছু আর্থিক সাহায্য এসেছিল ইস্ট ইনডিয়ান রেলওয়ের শ্রমিকদের জন্য। যাতে এই রকম সাহায্য আসা এবং আরো অনেক

কিছু বন্ধ হতে পারে তার জন্য ভারত গবর্নমেণ্ট কেন্দ্রীয় আইন সভায় উত্থাপন করার জন্য একটি আইনের খসড়া রচনা করেছিলেন। বিদেশী লোকদের ভারত হতে বহিষ্কৃত করার আইন আগে হতেই ছিল। কিন্তু ভারত গবর্নমেণ্ট চাইলেন যে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদেরও ভারত হতে বহিষ্কৃত করার ক্ষমতা আইনে সংযোজিত হোক। অর্থাৎ তাঁরা ফিলিপ স্প্রাট ও বি. এফ. ব্রাড্‌লির মতো লোকদেরও বহিষ্কার চেয়েছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে (১৯২৮) ভারত গবর্নমেণ্টের তরফ থেকে পাবলিক সেফ্‌টি বিল কেন্দ্রীয় আইন সভায় (লেজিসলেটিব অ্যাসেম্বলিতে) উত্থাপিত হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল।

এইভাবে আমাদের আন্দোলনকে দমন করার জন্য ভারত গবর্নমেণ্ট প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। কিন্তু ২৭শে জুলাই (১৯২৮) তারিখে বোম্বের গবর্নর এক তার পাঠিয়ে গোলমাল বাধালেন। তারে তাঁর বক্তব্য ছিল কমিউনিস্ট স্পর্শ-দুষ্ট যাবতীয় সভা-সমিতিকে বেআইনী ঘোষণা করা হোক। এই তারের বক্তব্য পরে ভারত গবর্নমেণ্টের হোম মেম্বর মিঃ ক্রেরার বড়লাটকে জানালেন যে "বোম্বের গবর্নরের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব নয় কেননা কমিউনিস্টরা আইন-সম্মতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তাঁরা আশ্রয় করেছেন। কিন্তু কোন ট্রেড ইউনিয়নকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা চলতে পারে না।" ২৯শে জুলাই (১৯২৮) তারিখে বোম্বের গবর্নর ভারত গবর্নমেণ্টের নামে আর একটি তার ছাড়লেন। তাতে বললেন কমিউনিস্ট সমস্যার একটা কিছু হেস্ত-নেস্ত অবিলম্বে করা প্রয়োজন। বোম্বে গবর্নমেণ্টের এই উত্তেজনার পেছনের কারণ ছিল বোম্বের পুলিস কমিশনার মিঃ কেলি। বোম্বের সুতাকল ধর্মঘট তাঁর ও তাঁর অধীন কর্মচারীদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। এখন আবার কথা উঠেছিল তাঁর অধীন এলাকা মাটুঙ্গার জি. আই. পি. রেলওয়ে কারখানায় পনের হাজার মজুরের ধর্মঘট হতে যাচ্ছে। কে. এন. জোগলেকর রেলওয়ের একটা সভায় এই কথা বলেছিলেন। এর পরে ফিলিপ স্প্রাটের একখানি চিঠি ধরা পড়ে। তাতে ছিল এই কথা যে ইস্ট ইনডিয়ান রেলওয়ের ধর্মঘটের অবস্থা খারাব; এখন জি. আই. পি. রেলওয়েতে ধর্মঘট প্রসারিত হওয়া উচিত। বোম্বে গবর্নমেণ্ট যখন এই কথা জানালেন, তখন তার উত্তরে ভারত গবর্নমেণ্ট বললেন যে ব্রাড্‌লি আর ঝাবওয়ালা বলেছেন যে ধর্মঘট করার সময় এখন নয়, এখন সংগঠনকে জোরদার করে গড়তে হবে।

এইভাবে জোর লেখালেখি চলতে থাকলো—একপক্ষে বোম্বে-পুনা আর একপক্ষে দিল্লি-সিমলা। ভারত গবর্নমেণ্ট কিঞ্চিৎ এগোলে বোম্বে গবর্নমেণ্ট আবার কিঞ্চিৎ পিছিয়ে যায়। মীরাট মোকদ্দমা কিন্তু ভারত গবর্নমেণ্টেরও মনে জন্ম নিল।

ভারত গবর্নমেণ্ট তাঁদের প্রতিনিধিকে এই ঘটনা উপলক্ষে নানান জায়গায় পাঠাতে আরম্ভ করলেন। ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের অধীন ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর এফ. আইসেমঙ্গারকে (F. Isemonger) রিপোর্ট সংগ্রহ করার জন্য প্রথমে বোম্বে-পুনাতে পাঠালেন; তারপরে পাঠালেন বেঙ্গলে। এই আইসেমঙ্গার যে প্রকৃতভাবে কে ছিলেন তা বুঝতে পারছি না। কারণ মিঃ ডেভিড পেট্রিই ছিলেন ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর প্রকৃত ডিরেক্টর। ১৯২৯ সালে মার্চ মাসে যখন মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা চালু হয়, তখনও তিনি ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর ছিলেন। আমার মনে হয় ডেভিড

পেট্রি ছুটিতে যাওয়ায়, কিংবা অন্য কোন কারণে মিঃ এফ্‌ আইসেমঙ্গার অস্থায়ীভাবে ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টরের কাজ করছিলেন। যাই হোক, পুনাতে তিনি বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে মিটিং করেছিলেন। অবশ্য সে মিটিং-এ বোম্বে পুলিস কমিশনার মিঃ কেলি ছিলেন না ; কারণ পুনা তাঁর এলাকার বাইরে। কলকাতায় মিঃ আইসেমঙ্গার অন্য অনেকের সঙ্গে ছাড়া গবর্নরের একজেকিউটিব কাউন্সিলের হোম মেম্বর মিঃ প্রেণ্টিসের (Prentice) সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। মিঃ প্রেণ্টিস তাঁকে অনেক তথ্য সরবরাহ করেছিলেন এবং তাতে তিনি আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি একথাও বলেছিলেন যে মজুরদের সত্যিকার অভিযোগ আছে। এই একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করছি যে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সরকারী কর্মচারীরা স্বীকার করেন যে মজুরদের প্রকৃত নালিশ আছে। স্থানীয় নিম্নতর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজ-কর্মচারীরা, পুলিসরা তো নয়ই, একথা মানেন না। যাক, মিঃ আইসেমঙ্গার ২৯শে আগস্ট (১৯২৮) তারিখে সম্ভবত সিমলায় ভারত গবর্নমেণ্টের নিকটে তাঁর রিপোর্ট দাখিল করেন। তাতে তিনি বলেছেন যে নানা রকম কাগজপত্র ও রিপোর্ট পরীক্ষা করে তিনি বুঝেছেন যে ভারতের নানা স্থানে কমিউনিস্টদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ প্রমাণিত হবে। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সাধারণ আইনে একটি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা চালানো সম্ভব। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে হোম সেক্রেটারী মিঃ হেগ মন্তব্য করেন ঃ

"... .....the practical action to be taken at the moment is to conduct a thorough preliminary examination into the available evidence, with a view to seeing whether there is sufficient material for instituting a comprehensive conspiracy case against the principal Communist leaders throughout India. We may request D. I. B. to push on with this action as rapidly as possible."

(Home Dept. F. No. 18/XVI/1928-Poll & K. W.)

বঙ্গানুবাদ

"সারা ভারতের বড় বড় কমিউনিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা দায়ের করার জন্য পর্যাপ্ত মাল-মসলা আছে কি না তা দেখার উদ্দেশ্যে, প্রাপ্ত দলিলপত্রের প্রাথমিক পরীক্ষা চালানোই এই মুহূর্তের আসল কাজ। আমরা এই কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালিয়ে যেতে ডি. আই. বি.-কে অনুরোধ করতে পারি।"

বড়লাট ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯২৮) এই কাজে অনুমোদন জানালেন। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রি ও লেবর ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ এ. জি. ক্লো (A. G. Clow) সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন কমিউনিস্ট নেতারা ধর্মঘটে যে জয়লাভ করেছেন, মোকদ্দমার ফলে সেটা মুছে যাবে না। মোকদ্দমা শুধু তাঁদের কর্মক্ষেত্র হতে কিছুকাল দূরে সরিয়ে রাখবে। ধর্মঘট অভিযুক্তদের বীরে পরিণত করেছে, মোকদ্দমার ফলে তাঁরা মার্টারে (শহীদে) পরিণত হবেন। অন্যদিক থেকে গবর্নমেণ্টকে মনে করা হবে মজুরশ্রেণীর শত্রু।

একটি কথা এখানে বলা উচিত। ১৮ই আগস্ট (১৯২৮) তারিখে ভারত গবর্নমেণ্ট প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টের নামে একটা সার্কুলার পাঠালেন। তাতে তাঁরা জানতে চাইলেন, কমিউনিস্টদের দমন করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। প্রথমেই বোম্বের কথাটা বলা উচিত। তাঁরাই প্রথমে কমিউনিস্ট স্পর্শ-দুষ্ট যাবতীয় সভা-সমিতিগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করার জন্য বড়লাটকে টেলিগ্রাম করেছিলেন। ভারত গবর্নমেণ্ট তাতে রাজী হননি। তারপরে উভয় গবর্নমেণ্টের মধ্যে অনেক কথাকাটাকাটি চলে। ৫ই সেপ্টেম্বর (১৯২৮) তারিখে ভারত গবর্নমেণ্ট বোম্বে গবর্নমেণ্টকে লিখেছিলেন যে মজুরদেরও যে অভিযোগ আছে সেদিকে বোম্বে গবর্নমেণ্ট নজর দিচ্ছেন না। এতে বোম্বে গবর্নমেণ্টের হৃদয়ে বড় আঘাত লাগে। এর উত্তরে ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯২৮) তারিখে বোম্বে গবর্নমেণ্ট ভারত গবর্নমেণ্টকে লিখলেন যে তাঁদের উপরে অবিচার করা হয়েছে। মজুরদের নালিশের ব্যাপারও তাঁরা উপলব্ধি করেন। তারপরে ভারত গবর্নমেণ্ট ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক পত্র লিখে বোম্বে গবর্নমেণ্টের বুকের ঘায়ের উপরে কিছু মলম প্রদান করলেন।

মোটের উপরে ভারত গবর্নমেণ্টের ১৮ই আগস্টের (১৯২৮) সার্কুলারের জবাবে অনেক কিছু বলে বোম্বে গবর্নমেণ্ট ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯২৮) তারিখে ভারত গবর্নমেণ্টকে লিখে জানালেন যে, ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে কমিউনিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা চালু করা হোক। এই কথা লেখার পরেও সেই পত্রেই বোম্বে গবর্নমেণ্ট লিখলেন যে কমিউনিস্টদের দ্বারা রেজিস্ট্রি করা ইউনিয়নগুলির রেজিস্ট্রিকরণ বাতিল করে দেওয়া হোক।

(Letter from the Secretary to the Government of Bombay, Home Department, to the Secretary to the Government of India, Home Department [Political] No. S. D.—1038 of 1928, dated the 10th September, 1928.)

ভারত গবর্নমেণ্টের ১৮ই আগস্ট তারিখের (১৯২৮) সার্কুলারের জবাবে বেঙ্গল গবর্নমেণ্ট অনেক কিছু বললেন। তাঁরা বললেন কমিউনিস্ট ও ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের মধ্যে রেষারেষি রয়েছে। এই রেষারেষি আসলে মতবাদের। কমিউনিস্টরা যে মতবাদের উপর তাঁদের আন্দোলন খাড়া করেন, ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীরা তা করতে চান না। আবার ন্যাশনালিস্টদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর পরস্পরের ভিতরে একটা রেষারেষির ভাব আছে। কংগ্রেস অধিবেশনের সমকালে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ছাত্রদের কনফারেন্স হয়েছিল। এই কনফারেন্সে সভাপতি হয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু এবং কনফারেন্সের কাজ ভালোয় ভালোয় সম্পন্ন হয়েছিল। এটা সুভাষচন্দ্র বসু মনে মনে পছন্দ করেননি। তাঁর মনোভাবটা ছিল এই যে ছাত্র কনফারেন্সের সভাপতি তাঁরই হওয়া উচিত ছিল। ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের ভিতরে যুগান্তর, অনুশীলনের কিছু লোক ও মাদারীপুর গ্রুপ পুরোপুরি গোপনে সুভাষ বসুকে সমর্থন করতেন। জওহরলালের পক্ষীয় লোকেরা জওহরলালের সৃষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগকে সমর্থন করতেন।

ভারত গবর্নমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টদের যে মতামত চেয়েছেন তাতে আইনের প্রয়োগের কথাও তাঁরা তুলেছেন। বেঙ্গল গবর্নমেণ্ট এ সম্বন্ধেও কথা বলেছেন। তাঁরা আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রচলিত আইনগুলিতে কিছু কিছু পরিবর্তনের কথাও বলেছেন। সে পরিবর্তন কি ধরনের হবে তারও মুসাবিদা

করে দিয়েছেন। বিশেষ করে তাঁরা ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডের ১০৮ ধারার, ইনডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪-এ ধারার ও ইনডিয়ান পেনাল কোডের ১২১-এ ধারার কথা বলেছেন। ১৯১০ সালের প্রেস অ্যাক্টকে আবার জীবিত করার সুপারিশও তাঁরা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ১৯২৫ সালের বেংগল ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট অনুসারে (পাঁচ বছরের জন্য পাশ হয়েছিল) কমিউনিস্টদের বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা উচিত হবে না। মোটের উপরে বেংগল গবর্নমেণ্টও মোকদ্দমা করার বিরুদ্ধে মত দেননি।

মীরাট মোকদ্দমা দায়ের করার কিছুদিন আগে কলকাতায় গুজব রটেছিল যে ভারত গবর্নমেণ্ট কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টসমূহের মত জানতে চেয়েছেন। তার উত্তরে বেংগল গবর্নমেণ্ট মত দিয়েছেন যে মোকদ্দমা করলে কমিউনিস্টদের অনেক বেশী প্রাধান্য দেওয়া হবে। কমিউনিস্ট নেতাদের ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখলেই আন্দোলন থেমে যাবে। এখন অনেক দলিলপত্র হাতে পেয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই গুজবের কোন ভিত্তি ছিল না। বেংগল গবর্নমেণ্টও মোকদ্দমা করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন।

১৯২৮-২৯ সালে বর্মা ভারতের একটি প্রদেশ ছিল। এই জন্যে বর্মার গবর্নমেণ্টও মত দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন এই মুহূর্তে কমিউনিস্টদের তরফ হতে বর্মার কোন আশংকা নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে আশংকার সম্ভাবনা রয়েছে। চীনে কমিউনিস্টদের খুব জোর বেড়েছে। সমস্ত বর্মায় প্রায় দেড় লক্ষ চীনা ছড়িয়ে আছে। ভবিষ্যতে তারা আরো আসবে। এবং তাদের মারফতে কমিউনিস্ট মতবাদও আসতে পারে। খাস বর্মাতেও অভ্যন্তরীণ কারণে কমিউনিজম মাথা তুলতে পারে। ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন আনার কথা উঠলে বৌদ্ধদের মনাস্ট্রির [মঠ] সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথা উঠবে। তাতে বিপদ আছে।

মোট কথা এই, ভারতে যখন কমিউনিস্ট আন্দোলন চালুই রয়েছে, তখন তাকে দমন করার জন্যে আমাদের মনে হয় ইনডিয়ান পেনাল কোডের ৫০৫-বি ধারার প্রয়োগ করা উচিত।

ভারত গবর্নমেণ্টের ১৮ই আগস্ট (১৯২৮) তারিখের সার্কুলারের জবাবে কোন প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টই এই মত দেননি যে কমিউনিস্টদের দমন করতে হবে না।

নানা প্রদেশ হতে মতামত আসার পর হোম মেম্বর মিঃ ক্রেরারের সংগে আলোচনা করে হোম সেক্রেটারী মিঃ হেগ দীর্ঘ মন্তব্য (Notes) লিপিবদ্ধ করলেন। এই মন্তব্যগুলো বড়লাটের একজেকিউটিব কাউন্সিলের একটি সাব-কমিটিতে আলোচিত হলো। এই সাব-কমিটিতে ছিলেন (১) বড়লাট নিজে, (২) ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, (৩) ক্রেরার, (৪) ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র। মিঃ রেন উপস্থিত থাকতে পারেননি। তিনি এক দীর্ঘ বক্তব্য লিখে পাঠিয়েছিলেন। তাতে বলেছিলেন যে বোম্বে ও কলকাতার অবস্থা শোচনীয়, সরকারের পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে আর বসে থাকা উচিত নয়। হোম ডিপার্টমেণ্ট যে ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সাব-কমিটির দ্বারা তা অনুমোদিত হলো। সাব-কমিটি দেশের সাধারণ অবস্থা বিবেচনা করে আরো অনুমোদন করলেন যে কেন্দ্রীয় আইন সভার আসন্ন অধিবেশনে পাবলিক সেফ্‌টি বিল পুনরায় উপস্থিত করা হোক। [পূর্বে একবার বিলটি উত্থাপিত হলেও পাস

হয়নি।] সেই বিলে বিদেশ থেকে টাকা আসা বন্ধ করার অধিকার দেওয়া হোক; তারপরে বিলটিকে পাঠানো হোক একটি সিলেক্ট কমিটিতে।

বোম্বে গবর্নমেণ্টকে যেমন অনুরোধ করা হয়েছে যে পুনার যুব সম্মেলনে দেওয়া জওহরলাল নেহরুর বক্তৃতার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে আইনগত মত যাচাই করা হোক, সেই রকম বেঙ্গল গবর্নমেণ্টকেও লেখা হোক সুভাষ চন্দ্র বসুকে কিংবা বেঙ্গলের অন্য কোন রাজনৈতিক নেতাকে আদালতে অভিযুক্ত করা যায় কিনা, আইনের দিক থেকে তা যাচাই করা হোক।

সাব-কমিটির সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপার আলোচনা করে লর্ড আরউইন কাউন্সিলের নিম্নলিখিত হুকুমনামা ১২ই জানুয়ারি (১৯২৯) তারিখে স্বাক্ষর করলেন ঃ

(১) কেন্দ্রীয় আইন সভার পরবর্তী অধিবেশনে পাবলিক সেফ্‌টি বিলকে তোলা হোক।

(২) ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা দায়ের করার জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি অনুমোদিত হলো।

(৩) পাবলিক সেফ্‌টি বিল ব্যতীত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নতুন কোন আইনের খসড়া উপস্থিত করা যেন না হয়।

মোকদ্দমার প্রস্তুতি

একটি কথা আমরা লক্ষ্য করছি যে যখনই ভারত গবর্নমেণ্ট এবং বোম্বে ও অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টের মধ্যে ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা চালাবার জন্যে ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের অধীন ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরো মোকদ্দমার মাল-মসলা সংগ্রহ করা আরম্ভ করেছিলেন, তখনই সেখান থেকে যা কিছু মালপত্র হাতে আসে তাঁরা তা গুছিয়ে রাখছিলেন। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় যখন সারা ভারত ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টি গঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশের ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্‌ট্‌স পার্টির প্রতিনিধিদের সম্মেলন চলছিল, তারই আগে হতে তাঁরা মালমসলা সংগ্রহের ব্যাপারে লেগেছিলেন। পুলিসের ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এবং তখন ডিরেক্টর, ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর বিশেষ কর্মরত অফিসার মিঃ খয়রাত নবী আদালতে তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে কলকাতায় কৃষক ও শ্রমিক কনফারেন্সের সময় তিনি কলকাতায় ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল এই মোকদ্দমার জন্য প্রমাণপত্র সংগ্রহ করা।

মিঃ আর· এ· হরটন ভারতীয় পুলিস সার্ভিসের একজন সভ্য ছিলেন। তিনি সংযুক্ত প্রদেশের (এখন উত্তর প্রদেশ) পুলিসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁকে ভারত গবর্নমেণ্টের হোম (ইন্‌টেলিজেন্স) ডিপার্টমেণ্টে পাঠানো হয়েছিল। তাঁকে ভবিষ্যৎ মীরাট মোকদ্দমার দলিলপত্র অধ্যয়ন করার ভার দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তিনি ছিলেন অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি (অর্থাৎ বিশেষ কর্মরত অফিসার)। মিঃ তসদ্দোক হোসেনও ভারতীয় পুলিস সার্ভিসের লোক ছিলেন এবং ইউ· পি·-র সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁকেও ভারত গবর্নমেণ্টের ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর অফিসে বিশেষ কর্মরত অফিসার হিসাবে পাঠানো হয়েছিল।

১৯২৯ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে মিঃ হরটন তাঁর রিপোর্ট দাখিল করলেন। তাতে তিনি বললেন যে কমিউনিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে খুব জোরালো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা চালানো যাবে। তাঁর প্রথম রিপোর্টে তিনি নিম্নলিখিত ২২টি নাম উল্লেখ করেছিলেন ঃ

Bengal : 1. Muzaffar Ahmad
2. D. K. Goswami
3. Shib Nath Banerji
4. Shamsul Huda
5. S. N. Tagore

Bombay : 6. Phillip Spratt
7. B. F. Bradley
8. S. A. Dange
9. S. V. Ghate

10. S. H. Jhabvala
11. D. R. Thengdi
12. K. N. Joglekar
13. S. S. Mirajkar
14. R. S. Nimbkar

U. P. : 15. Shaukat Usmani
16. Ayodhya Prashad
17. P. C. Joshi
18. Gouri Shankar
19. L. N. Kadam
20. Dr. V. N. Mukharji

Punjab : 21. Sohan Singh Josh
22. M. A. Majid

"নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাঁরা ভারতে বাস করেন না, তবে আমার মতে ভারতীয় আইনানুসারে তাঁরা মূল ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে রয়েছেন ঃ

England : 23. R. Page Arnot
24. C. P. Dutt
25. S. Saklatvala
26. H. Pollitt
27. George Allison alias D. Campbell
28. N. J. Upadhyaya
29. Graham Pollard

"উপরের তালিকা কিছুতেই শেষ তালিকা নয়, আরো বিশিষ্ট ষড়যন্ত্রকারীরা আছেন, যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা চালানো যায়।"

ডি· আই· বি·

স্বাঃ আর· এ· হরটন।
১৫-১-২৯

দিল্লী-লণ্ডন মত বিনিময়

১৯২৯ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে বড়লাট ভারতের স্টেট্ সেক্রেটারীকে তারে জানালেন ঃ

"We have recently considered carefully the replies of local Governments to our Home Department letter No. 1007 dated 18th August, 1928, copy forwarded to you with Home Dept. letter No. S. 138, dated 23rd idem, regarding possible action against Indian Communists. The conclusion we have definitely arrived at is that both on grounds of general policy and on practical considerations we should, in the first place, if convinced

that there is a strong case, by the effect of a comprehensive conspiracy case against the leading Indian Communists, before we consider taking any further legislative powers such as are suggested in Paragraph 8 of our Home Department letter referred to above. The existing organisations would be broken up and the more dangerous leaders removed by success in such a case. It would expose, by means of a judicial pronouncement which would not be questioned, the real aims and methods of the Communists. Thereafter it would possibly enable us to proceed to proclaim certain Communist associations, such as the Workers' and Peasants' Parties, under the Criminal Law Amendment Act as unlawful associations on the authority of the findings of the Court. In our view it would indeed deal the whole Communist movement a more serious blow than any that could be expected from the taking of new Special Powers.

"2. A Police Officer has been on special duty for several months collecting material for such a case, and he has now presented a report, suggesting that there in a good case against 22 leading Communists, among whom Spratt and Bradley are included. The case as outlined by him, would be a continuation of the successful Cawnpore conspiracy case of 1924, which for a time put an end to the serious Communist activities in India.

"It would be sought to prove that a Communist conspiracy exists to deprive the King of the sovereignty of British India. The case would start with the activities of the Communist International and the various agents and agencies through which it has worked against India, in particular in recent times the CPGB. It would further be sought to prove that this Party has sent to India as agents Allison, Spratt and Bradley and that these have combined with a number of Indians to conduct the Communist conspiracy against the sovereignty of the King.

"3. Steps are now about to be taken to obtain the best possible legal opinion on the material collected by the Special Officer, which is very voluminous, and we do not anticipate that we shall have a final legal opinion till about the middle of March. If an assurance of success is given by this

opinion, we should then proceed to launch the case as early as possible, probably about the beginning of April. The trial would take many months and would be costly; but in comparison with the advantages of success the time and money would be of little account. When once a case has been launched, the main activities of the Communists would, we think, be paralysed, for the number of Communist leaders in India is not large, and all those of any account would be included in the case.

"4. If it is said that there is a good case against Spratt and Bradley, we should proceed against them and not make use of the powers of deportation under the Public Safety Bill which we anticipate will become law about the end of March.

"5. It is hoped that if a case is instituted, we can depend on receiving all reasonable assistance from authorities in England, (see for instance DIB's letter No. B. C. C. General dated 24th December 1928, addressed to I. P. I.). It is not intended to indict anyone in England though reference to the activities of Communists in England will be important and inevitable."

[Telegram P. **No. P257-S.** Dated the 19th January, 1929.
From : Viceroy (Home Dept.), Delhi.
To : Secretary of State for India, London.

বঙ্গানুবাদ

ভারতীয় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মতামত চেয়ে ১৯২৮ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টের কাছে লেখা হোম ডিপার্টমেণ্টের ১০০৭নং পত্রের উত্তর আমরা সম্প্রতি সতর্কতার সংগে বিবেচনা করেছি। এই পত্রের একটি কপি হোম ডিপার্টমেণ্টের ১৩৮নং-এস পত্রের সংগে ২৩শে আগস্ট (১৯২৮) তারিখে আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে। আমরা যে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, তা সাধারণ নীতি এবং বাস্তব বিবেচনার ভিত্তিতেই করেছি। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, প্রথমে উপরে উল্লিখিত হোম ডিপার্টমেণ্টের পত্রের ৮নং প্যারায় প্রস্তাবিত অধিক আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগের আগে, যদি শক্তিশালী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কথা বোঝা যায়, তবে ভারতের প্রধান কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা করা হবে। এইরূপ মোকদ্দমার সাফল্যের দ্বারা বর্তমান সংগঠনগুলি ভেঙে পড়বে এবং বিপজ্জনক নেতাদের দূরে সরিয়ে দেওয়া যাবে। যে বিচার-বিভাগীয় ঘোষণা সম্পর্কে সন্দেহ জাগবে না, তার আশ্রয়ে এই মোকদ্দমা কমিউনিস্টদের আসল উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী প্রকাশ করে দেবে। অতঃপর আদালতের রায়ের ভিত্তিতে ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেণ্ড-

মেণ্ট অ্যাক্ট অনুসারে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টিসমূহের ন্যায় সংস্থাগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করতে এই মোকদ্দমা আমাদের সক্ষম করে তুলবে। আমাদের মতে নতুন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা যা আশা করা যায়, এই মোকদ্দমা সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর তার চেয়েও মারাত্মক আঘাত হানবে।

২। এই মোকদ্দমার জন্য মালমসলা সংগ্রহের কাজে একজন পুলিস অফিসার কয়েকমাস ধরে নিযুক্ত রয়েছেন। তিনি এখন একটি রিপোর্ট দাখিল করেছেন : তাতে স্প্রাট এবং ব্রাড্লি সহ ২২ জন বিশিষ্ট কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে একটি ভাল মোকদ্দমার সুপারিশ করেছেন। তিনি মোকদ্দমার যে রূপরেখা রচনা করেছেন তাতে ১৯২৪ সালে সফল কানপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সংগে এই মোকদ্দমাকে অবিচ্ছিন্ন করে দেখিয়েছেন। কানপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা কিছুকালের জন্য ভারতে বিপজ্জনক কমিউনিস্ট কার্যকলাপকে শেষ করে দিয়েছিল।

ব্রিটিশ-ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা হতে রাজাকে বঞ্চিত করার একটি কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র যে বর্তমান রয়েছে, তা এই মোকদ্দমায় প্রমাণের চেষ্টা হবে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং যে সকল দূত ও সংস্থা, বিশেষ করে বর্তমান কালে সি· পি· জি· বি·-র মাধ্যমে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ভারতের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, তাদের কার্যকলাপ দিয়ে মোকদ্দমা শুরু হবে। এই পার্টি ভারতে অ্যালিসন, স্প্রাট এবং ব্রাড্লিকে যে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, তা প্রমাণের চেষ্টা হবে। আরো প্রমাণ করবার চেষ্টা হবে যে এঁরা কিছু সংখ্যক ভারতীয়ের সংগে মিলিত হয়ে রাজাকে সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র চালিয়েছিল।

৩। স্পেশাল অফিসারের দ্বারা সংগৃহীত মালমসলার উপর যথাসম্ভব ভাল আইনগত মতামত জানার চেষ্টা এখন করা হচ্ছে। এই মালমসলার পরিমাণ বিশাল এবং আমরা মার্চের মাঝামাঝির আগে চূড়ান্ত আইনগত মতামতের আশা করতে পারি না। এই মতামতের দ্বারা যদি সাফল্যের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, তাহলে আমরা যত তাড়াতাড়ি, সম্ভবত এপ্রিলের শুরুতে মোকদ্দমা আরম্ভ করতে পারি। বিচারে অনেক মাস কেটে যাবে এবং খরচও হবে অনেক : কিন্তু মোকদ্দমায় জেতার সুবিধার তুলনায় এই সময় এবং অর্থ সামান্যই ধর্তব্যের বিষয়। একবার এই মোকদ্দমা শুরু হলে, আমরা মনে করি, কমিউনিস্টদের প্রধান কার্যকলাপ অচল হয়ে পড়বে ; কারণ ভারতে কমিউনিস্ট নেতার সংখ্যা খুব বেশী নয়, এবং যাঁরা কোন কাজের তাঁদের সকলকেই এই মোকদ্দমায় জড়ানো হবে।

৪। যদি এটা বলা হয় যে স্প্রাট এবং ব্রাড্লির বিরুদ্ধে ভাল মোকদ্দমা হবে, তাহলে পাবলিক সেফ্টি বিলের আশ্রয়ে বহিষ্কারের পরিবর্তে তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা মোকদ্দমা শুরু করবো। আমরা আশা করি মার্চের শেষাশেষিতে পাবলিক সেফ্টি বিল আইনে পরিণত হবে।

৫। মোকদ্দমা শুরু হলে ইংল্যাণ্ডে কর্তৃপক্ষের সমস্ত যুক্তিসংগত সাহায্যের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি বলে আশা করা যায়, (উদাহরণস্বরূপ আই-পি আই-কে লেখা ডি-আই-বি-র ১৯২৮ সালের ২৪শে ডিসেম্বরের পত্র নং B.C.C. General)। যদিও ইংল্যাণ্ডে কমিউনিস্ট কার্যকলাপের উল্লেখ করা বিশেষ দরকার এবং অপরিহার্য তবু সেখানে কাউকে অভিযুক্ত করা আমাদের লক্ষ্য নয়।

বড়লাটের এই টেলিগ্রামের জবাব স্টেট সেক্রেটারী ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯২৯) তারিখে দিয়েছিলেন। তিনি বড়লাটের সংগে একমত হয়েও কতকগুলি

অসুবিধার কথা তুলেছিলেন। বলেছিলেন মোকদ্দমায় দেরী হলে বোম্বের অবস্থা খারাপের দিকে যাবে। আরও বলেছিলেন যে পাবলিক সেফ্‌টি বিল পাশ হলে, দুজন ইংরেজ স্প্রাট ও ব্রাড্‌লিকে ভারত হতে বহিষ্কার করে দিয়ে মীরাটে শুধু ভারতীয় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানো যেতে পারে। সেক্রেটারী অব স্টেট্‌ বলেছিলেন যে তাঁর পয়েণ্টগুলি বিবেচনা করা হোক, কিন্তু প্রয়োজন বোধ করলে এসব বিবেচনা না করেই ভারত গবর্নমেণ্ট তাঁদের প্রস্তাব মত কাজে এগিয়ে যেতে পারেন (টেলিগ্রাম পি, নং ৬৪৮, তাং ২১শে [প্রাপ্ত ২২শে] ফেব্রুয়ারী ১৯২৯)।

মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য ব্যারিস্টার নিয়োগ

বড়লাট আগেই স্টেট্‌ সেক্রেটারীকে জানিয়েছিলেন যে মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার মিঃ ল্যাংফোর্ড জেম্‌স-এর পরামর্শ চেয়েছেন। মিঃ জেম্‌সের একজন জুনিয়র ফেব্রুয়ারী মাসের (১৯২৯) প্রথম সপ্তাহ হতে মোকদ্দমার কাগজপত্রগুলো অধ্যয়ন করছিলেন। কিন্তু ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্ট চাইছিলেন না যে এই ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যাক। এর জন্য অনেক গোপন দলিলপত্র পড়ার প্রয়োজন ছিল। সেইসব দলিলপত্র স্থানচ্যুত না করে হোম ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর তাঁর সহকারী খান বাহাদুর তসদ্দোক হোসেনকে দিয়ে একটা অদ্ভুত কাজ করিয়েছিলেন। তিনি ল্যাংফোর্ড জেম্‌সের জুনিয়র মিস্টার যশোপ্রকাশ মিত্রকে গাজিয়াবাদ স্টেশনে নামিয়ে নিয়ে প্রায় পর্দালেডির মত করে যে ঘরে ভারত গবর্নমেণ্টের গোপন দলিলপত্র ছিল, সেই ঘরের পেছনের দিককার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে তুলে নিয়েছিলেন। মিস্টার মিত্র দেখলেন সেখানে তাঁর থাকা, খাওয়া, স্নান ইত্যাদি সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওখানে বসেই তিনি গোপন দলিলপত্র পড়লেন এবং নোট করে নিলেন। হোম ইনটেলিজেন্সের করা এই কাজটির কথা আগে কেউ জানতে পারেনি। এখন সকলে জেনেছেন। মিস্টার মিত্র বলছেন যে তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভেবে তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন এবং মনে বল সঞ্চয় করার জন্য কিছু হুইস্কি খেয়ে নিয়েছিলেন। ল্যাংফোর্ড জেমসেরও দিল্লি যাওয়ার ব্যাপারটি ঘটেছিল সবার অজ্ঞাতে। তাঁকে ক'দিনের জন্য দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি যে কলকাতায় নেই এই কথা কলকাতার কেউ জানতে পারেনি। তখন হাওয়াই জাহাজে যাত্রী বহন করার নিয়ম চালু হয়নি। আমার মনে হয় ভারত গবর্নমেণ্ট মিঃ জেমসকে মোটরযোগে দিল্লি নিয়ে গিয়ে থাকবেন। তিনি দিল্লিতে বসে কাগজপত্র কিছু কিছু পড়লেন এবং তাঁর জুনিয়র মিঃ যশোপ্রকাশ মিত্রের নিকট হতে রিপোর্টও নিলেন। তারপরে মত দিলেন যে ভাল ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা চলবে।

মোটের উপরে ভারত গবর্নমেণ্ট ও সেক্রেটারী অব স্টেট-এর মধ্যে বিস্তর লেখালেখির পরে ধার্য হলো যে ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা মীরাটেই হবে। মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমসকে বাদীপক্ষের সিনিয়র কাউনসেল ও মিঃ যশোপ্রকাশ মিত্রকে জুনিয়র কাউনসেল নিযুক্ত করা হলো। মিঃ ল্যাংফোর্ড জেম্‌সের দৈনিক ফিস্‌ ধার্য হলো কলকাতা হাইকোর্টের আশি গিনি। মিঃ যশোপ্রকাশ মিত্রের দৈনিক ফিস্‌ ধার্য হ'ল কলকাতা হাইকোর্টের পাঁচ গিনি। কলকাতা হাইকোর্টের প্রতি গিনির স্থায়ী মূল্য সতের টাকা। এ ছাড়া তাঁরা আরো অনেক সুখসুবিধা পাবেন স্থির

হলো এবং সরকারী খরচে থাকার জায়গা তো পাবেনই। মোকদ্দমা হোক না হোক কিংবা ছুটি থাকুক, এই ফিস্ চলতেই থাকবে। ইউ-পি পুলিসের ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট মিঃ খয়রাত নবী ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের ইনটেলিজেন্স ব্যুরোতে স্পেশাল ডিউটি-তে বদলি হয়েছিলেন। তাঁকেও মিঃ জেম্স ও মিঃ মিত্রের সঙ্গে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত করা হল। প্রচলিত আইন অনুসারে মিঃ খয়রাত নবীর সে অধিকার ছিল।

কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সময় বাংলাদেশের অ্যাডভোকেট-জেনারেল ছিলেন ভারত গবর্নমেণ্টেরও আইনের উপদেষ্টা। তখন তাঁর অনুমতির প্রয়োজন ছিল। কানপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ফরিয়াদি পক্ষের আর্জিও তিনি মুসাবিদা করে দিয়েছিলেন। তখন অ্যাডভোকেট-জেনারেল ছিলেন মিঃ এস. আর. দাস। কিন্তু মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সময়ে এই নিয়মের বোধ হয় কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। বাংলাদেশের অ্যাডভোকেট-জেনারেলের অনুমতির আর বোধ হয় প্রয়োজন ছিল না। আমরা এখন কাগজপত্র ঘেঁটে দেখতে পাচ্ছি যে মোকদ্দমার আর্জির মুসাবিদা মিঃ ল্যাংফোর্ড জেম্সই তৈয়ার করে দিয়েছিলেন। অবশ্য তার আগে তিনি মিঃ এস. আর. দাসের মুসাবিদা পড়ে নিয়েছিলেন। মিঃ জেম্স তাঁর শেষ লিখিত অভিমত জানিয়েছিলেন ১৩ মার্চ (১৯২৯) তারিখে। স-কাউন্সিল বড়লাট ১৪ই মার্চ (১৯২৯) তারিখে ৩১ জনের বিরুদ্ধে মীরাটের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ইন্‌ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা রুজু করার জন্য ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত ইনটেলিজেন্স ব্যুরোতে বিশেষ কর্মরত অফিসার মিঃ আর. এ. হরটন-কে অনুমতি দিলেন। হোম সেক্রেটারি মিঃ এইচ. জি. হেগ ঐ তারিখেই স-কাউন্সিল বড়লাটের তরফ হতে ভারত গবর্নমেণ্টের এই মঞ্জুরীতে স্বাক্ষর দিলেন। নিম্নলিখিত আর্জি ১৯২৯ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে মীরাটের তদানীন্তন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ই. এইচ. এইচ. এডি (E. H. H. EDYE)-র আদালতে গোপনে দাখিল করলেন। আসামীদের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আগে হতে টাইপ হয়ে প্রস্তুত ছিল। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তখনই সেগুলোতে সই করলেন গোপনে। এবং এই সব নিয়ে গোপনে নানান লোক নানা প্রদেশে রওনা হলেন। তাঁরা স্থির করেছিলেন যে বিশে মার্চ (১৯২৯) তারিখে শেষ রাত্রে হঠাৎ হানা দিয়ে সব প্রদেশে সকলকে একই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হবে।

সর্বত্র গ্রেপ্তার

পরিকল্পনা মত ১৯শে মার্চ (১৯২৯) দিবাগত রাত্রি তিনটার সময় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে পুলিস ভারতের নানা স্থানে হানা দিয়েছিল। সময়টা ইউরোপীয় গণনায় ২০শে মার্চ (১৯২৯) পূর্বাহ্ন তিনটা ছিল। এখানে আমি শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারবো। কলকাতার ২/১ ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনে দোতলায় ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্স পার্টি অব বেঙ্গলের অফিস ছিল। এটা তিন রুমের একটি ফ্ল্যাট ছিল। তাতে অফিস তো ছিলই, আমরা কয়েকজন সে বাড়ীতে থাকতামও। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দরজা খুললেই একটা করিডর পাওয়া যেত। তার প্রথম ঘরটা ছিল বাথ-রুম। তারপরে

এক নম্বর ঘরে ছিল আফিস। সেই আফিসের চেয়ার সরিয়ে রাত্রে কমরেড আব্দুল হালীম সে ঘরেই শুতেন। দ্বিতীয় ঘরে সেদিন কমরেড শামসুল হুদা ও ধরণীকান্ত গোস্বামীর মামা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শুয়েছিলেন। তৃতীয় ঘরে সেদিন ফিলিপ স্প্রাট একখানি ক্যাম্পখাটে শুয়েছিলেন। তলায় মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়েছিলেম আমি ও অযোধ্যা প্রসাদ। দ্বিতীয় ঘরে আগে ধরণীকান্ত গোস্বামী ও তাঁর সঙ্গে আরো দু-একজন থাকতেন। গোস্বামী ইতোমধ্যে ওবাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর মামাকে রেখে গিয়েছিলেন। এই মামার থাকাটা আমাদের পক্ষে খুব সুখকর হয়নি। তিনি আমাদের পার্টির মেম্বরও ছিলেন না।

১৯শে মার্চ (১৯২৯). যতটা মনে পড়ে, আমি বাড়ীর বাইরে কোথাও যাইনি। আমরা সকলে হোটেল হতে খেয়ে এসেছিলেম। আমাদের আর্থিক অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাব ছিল। বিকাল বেলা নাবিক ইউনিয়নের নেতা আফতাব আলি টেলিফোনে জানালেন যে তিনি ঢাকা হতে ফিরে এসেছেন; তাঁর বড় ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে তিনি ঢাকা গিয়েছিলেন। সেই সময় আফতাব আলি ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্‌স পার্টির সভ্য ছিলেন। তিনি বল্‌লেন তিনি একবার আমাদের আফিসে আসবেন। সন্ধ্যার সময় তিনি এসেওছিলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হলো। তিনি বিদায় নিয়ে চলেও গেলেন। তারপরে রাস্তা হতে তিনি আবার ফিরে এলেন এবং আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের কাছে কিছু টাকাকড়ি আছে কি না। আমি বল্‌লাম খুব খারাব অবস্থা যাচ্ছে। তখন তিনি দশটি টাকা আমাদের দিয়ে গেলেন। এইখানে আফতাব আলির যে দরদী মনের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, তার কথা উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না। এরপরে আফতাব আলি বিরুদ্ধ ক্যাম্পে চলে গিয়েছিলেন। এখন বাংলাদেশে আছেন এবং আশা করি বেঁচেই আছেন। ১৯৭২ সালের জুন মাসে আমি যখন ঢাকা গিয়েছিলেম, তখন তিনি আমাকে দেখতে আসেননি। আমাদের বিরুদ্ধে পক্ষের অনেক লোক আমাকে আব্দুল কাদিরের বাড়ীতে এসে দেখে গেছেন। আফতাব আলি আব্দুল কাদিরের পরিচিত লোক।

সন্ধ্যার পরে যখন খেতে বার হয়েছিলেম, তখন পথে দেখলেম এখানে ওখানে দু-তিনজন করে লোক দাঁড়িয়ে আছে। জেল হতে বেরোবার পরে ১৯২৬ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখে যখন কলকাতায় ফিরে এসেছিলেম, তখন থেকেই পুলিসের লোকেরা আমাকে অনুসরণ করছিল। আমাদের অন্য কমরেডদের পেছনেও তারা লেগেছিল। এটা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যায় কিন্তু এই অনুসরণকারীদের সংখ্যায় বেশী বেশী দেখতে পেয়ে মনে কেমন যেন একটা ভাব হয়েছিল। ফিলিপ স্প্রাট বাইরে গিয়েছিলেন কিশোরীলাল ঘোষের বাড়ীতে। তিনি ফিরে আসছেন না দেখে মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেম। ফিরে তিনি এসেছিলেন রাত এগারটার সময়। আমি তাঁর জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি দেখে তিনি একটু হাসলেন। তাঁরও মনে একটা কিছু অশুভ অনুভূতি জেগেছিল।

আমরা তো সকলে শুয়ে পড়লাম। রাত তিনটার সময় "টেলিগ্রাম", "টেলিগ্রাম" ধ্বনি করতে করতে পুলিসের লোকেরা কড়া নাড়লেন। রাতে টেলিগ্রাম আসলে টেলিগ্রাম-পিয়নেরা ঐ রকমই করতেন। আব্দুল হালীম প্রথম ঘরেই শুয়েছিলেন, তিনি উঠে দরজা খুলে দিতেই কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার বনবিহারী মুখার্জীর নেতৃত্বে পুলিসদল ভিতরে ঢুকে পড়লেন এবং দ্রুত জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কোথায়? তখন সেই ঘর

থেকেই আব্দুল হালীম চেঁচিয়ে বললেন, "মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, আপনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিস এসেছে।" আমি ভাবলেম এখনই বোধ হয় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে। সে জন্য জামা গায়ে দেওয়ার জন্য স্যুটকেসের নিকটে গেলাম। সেই মুহূর্তে বনবিহারী মুখার্জী ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, "খবরদার, স্যুটকেশ ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু খুলবেন না। বলুন এ ঘরে কে কে আছেন? ফিলিপ স্প্রাট-কে তিনি তো চিনলেনই, আমি অযোধ্যা প্রসাদের নাম বলে দিলাম। মাঝের ঘরটাতে শামসুল হুদা ও নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শুয়েছিলেন, আর আফিস ঘরের আব্দুল হালীমকে তো তাঁরা চিনতেনই। স্প্রাট, অযোধ্যা প্রসাদ, শামসুল হুদা ও আমাকে পুলিস বল্‌লেন, "আপনারা গ্রেপ্তার হলেন। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে আপনাদের বিরুদ্ধে মীরাটে মোকদ্দমা হবে।" অল্পক্ষণ পরেই স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার হ্যানসেন ও ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন ইউরোপীয় সুপারিনটেণ্ডেণ্ট (তাঁর নাম ভুলে গেছি) সে ঘরে এসে ঢুকলেন। তার কিছুক্ষণ পরে কলকাতার পুলিস কমিশনার মিঃ টেগার্টও এসে গেলেন। আমাদের টেবিলের উপরে একটি টেলিফোন রয়েছে দেখতে পেয়ে তাঁরা খুবই খুশী হলেন, ভাবলেন, ওখানে বসেই সব জায়গার খবরা-খবর নিতে পারবেন। আরম্ভ হলো জোর তল্লাশি। এক টুকরো কাগজও তাঁরা ছেড়ে দিচ্ছেন না। পুঁথি-পুস্তক ও কাগজপত্র স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে বলে তাঁরা টেলিফোন করে আরো পুলিস আনালেন। প্রত্যেক জিনিসে নম্বর দেওয়া, তা সার্চ লিস্টে লিখে নেওয়া, এবং তাতে সার্চ উইটনেসদের দস্তখত করিয়ে নেওয়া যে সে কথা নয়। মিঃ টেগার্ট, তখন তিনি স্যার চার্লস টেগার্ট হয়েছেন কিনা মনে করতে পারছিনে, বেগতিক দেখে চলে গেলেন, আবার এলেন অপরাহ্নে। তালাশি চলছে তো চলছেই, শেষ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মিঃ হ্যানসেন সব কিছুর চার্জে ছিলেন; তিনি অন্য কিছু খাওয়ানো তো দূরের কথা আমাদের এক কাপ চাও খাওয়ালেন না। নিজে শুধু বাড়ী থেকে আনিয়ে কিঞ্চিৎ চিকেন-সুপ গলাধঃকরণ করলেন। এই পুলিস অফিসারগুলো কৃপণের একশেষ হয়ে থাকেন। গোপন খরচের টাকা হতে তাঁরা কত বাঁচাবেন, সেদিকেই তাঁদের দৃষ্টি। সারাদিন আমরা কিছু খেলাম না। পুলিস অফিসারদেরও কিছু খেতে দেখলাম না, শুধু মিঃ হ্যানসেনের চিকেন-সুপ ছাড়া।

সন্ধ্যার কিছু আগে ফিলিপ স্প্রাট-কে দিল্লি মেল ধরাবার জন্য পুলিস নিয়ে গেল। দিনের বেলা আমাদের ফ্ল্যাটের রাস্তার দিককার বারান্দা হতে দেখেছিলেম যে ইঞ্জিনিয়ার যতীন মুখার্জী তাঁর গাড়ী নিয়ে অনেকক্ষণ এবং বেশ দূরে ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনের ভিতরে ছিলেন। তাঁর গাড়ীতে সন্তোষকুমার মিত্রও ছিলেন। আমার মনে একটি দারুণ ভাবনা হয়েছিল কি করে আমি মীরাটে যাবো। মার্চ মাসের শেষার্ধ, আমি তুলো-মেশানো একটি উলের শার্ট পরছিলাম। একটি সুতী শার্ট কেনার পয়সা জোগাড় করতে পারিনি। এই শার্টের সঙ্গে আমি কোঁচা দেওয়া ধুতি পরতাম। অনেক ভাবলাম কি করে একটা রেডিমেড দোকান থেকে টুইলের সুতী শার্ট কেনা যায়। কিন্তু কোন উপায় করতে পারলাম না। কোঁচা দিয়ে ধুতি ও গরম শার্ট পরেই গরমের দিনে মীরাটে গেলাম। এরপরে ধুতি-পরার কায়দা যে বদলেছে, সে সব আমি আর শিখতে পারিনি। তাই কতকাল আগে ধুতি-পরা ছেড়ে দিয়েছি, তা আর এখন মনেই করতে পারছি না।

রাত্রে আটটার পরে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বনবিহারী মুখার্জী, সাব-ইন্‌সপেক্টর মুহম্মদ ইসমাইল ও সাব-ইন্‌সপেক্টর মুর্শেদী আমাদের সঙ্গে নিয়ে

১৪ নম্বর লর্ড সিংহ রোডে হাজির হলেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম সেই পুরানো ঝগড়া তখনো রয়েছে। সেখানে একজন মুসলিম হেড কনস্টেবল ছিলেন; তাঁর অভিযোগ এই ছিল যে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইন্‌সপেক্টরের পদ সৃষ্টি হওয়ার পরে, তাঁকে তা করা হয়নি, অথচ করা উচিত ছিল। এই নালিশ আমি ১৯২৩ সালেও স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে গিয়ে শুনেছিলাম। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে গিয়ে সেই একই নালিশ শুনলাম। তখনও তিনি সেখানেই ছিলেন। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য তাঁর উপরই হুকুম হলো। অত রাত্রে তিনি কি খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। ভবানীপুরে কোথায় একটি মুসলিম হোটেল ছিল। বাইকে চড়ে সেই হোটেলে গিয়ে তিনি তন্দুরী রুটি ও গরুর মাংসের কাবাব নিয়ে এলেন। আর নিকটে কোথাও হতে তিনি চায়ের জলের ব্যবস্থাও করলেন। আমরা যা-ই পেলাম তাই খেলাম। অযোধ্যা প্রসাদও আমাদের সঙ্গে খেলেন। আমরা তিনজন লোক ছিলাম, আমি, শামসুল হুদা ও অযোধ্যা প্রসাদ। বৃদ্ধ ইন্‌সপেক্টর কালীসদয় ঘোষাল এসে আমাকে বল্‌লেন, "আহ্‌মদ সাহেব, অযোধ্যা প্রসাদকে কলমাটি পড়িয়ে নেননি কেন?" খেয়ে যখন বেরিয়ে আসছিলাম, তখন রায়বাহাদুর নলিনী মজুমদার এলেন, বল্‌লেন, "আহ্‌মদ সাহেব, এই হুদাটিকে কোথায় পেলেন?" আমি বল্‌লাম কুড়িয়ে পেয়েছি। লালবাজার লক-আপে যাওয়ার পথে স্পেশাল ব্রাঞ্চের গেটে দেখলাম কিশোরীলাল ঘোষ ও রাধারমণ মিত্র দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আশ্চর্য হয়ে বল্‌লাম, আপনারা এখানে? তাঁরা বললেন "আমরাও তো এই মোকদ্দমার সংস্রবে গ্রেপ্তার হয়েছি। তারপরে আমরা একত্রে লালবাজারে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম লক-আপের ঘরগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে ও ধোওয়া হয়েছে। এক এক ঘরে এক একজনকে থাকতে হবে। শুধু উপরতলার ঘর নয়, নীচের তলার ঘরও পরিষ্কার করা হয়েছে। আমি ওখানে পুরনো বাসকরা লোক; তাই ওদের চারজনকে চারটি ঘরে যখন ঢুকিয়ে দিলাম, তখন দেখলাম আমার জন্য স্থানাভাব। আমাকে সে রাত্রি নীচের ঘরে শুয়ে কাটাতে হ'ল। অন্য আসামী হলে যে জায়গায় পঞ্চাশজন লোক থাকত, সে জায়গায় আমি একা থাকলাম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধোওয়ার পরে এ্যাংলো-ইনডিয়ান সার্জেণ্টটি আমাদের চা ও টোস্ট খাইয়ে আমাদের পাঁচজনকে কিড স্ট্রীটে কলকাতা চীফ্‌ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রকস্‌বরার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেদিন সম্ভবত ছুটি ছিল। তাই তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি আমাদের ওয়ারেণ্ট লিখলেন এবং মুখে বললেন যে তোমাদের বিচারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য মীরাটে যেতে হবে। দুপুর বেলা আমাদের মাংস কারী ও ভাত খাওয়ানো হলো। তার পরে নিয়ে যাওয়া হলো হাওড়া স্টেশনে। সেটা কোন দূরগামী নামকরা ট্রেনের যাওয়ার সময় ছিল না। লখনৌ পর্যন্ত যাবে এমন একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আমাদের চড়িয়ে দেওয়া হলো। আমরা থার্ড ক্লাসে যাচ্ছিলাম, একজন হাবিলদার আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল। হাওড়া স্টেশনে দেখলাম স্টেটসম্যানের চিফ রিপোর্টার মিঃ কিরণচন্দ্র ঘোষ ছাড়া সেখানে আমাদের পরিচিত আর কেউ নাই। তিনিও খুব কাছে ঘেঁষলেন না। মিঃ ঘোষ ছিলেন স্টেটস্‌ম্যানের প্রথম ভারতীয় চিফ রিপোর্টার। স্টেশনে একজন অল্পবয়স্ক রেলওয়ে কর্মচারী তাঁর নিজের পয়সায় আমাদের অনেকগুলো খবরের কাগজ কিনে দিলেন। ট্রেন যখন রওনা হলো তখন একমাত্র মিঃ ঘোষই দূরে থেকে হাত নাড়লেন, আর কেউ কোথাও ছিলেন না।

পরের দিন দুপুর বেলা আমরা লখনৌ স্টেশনে নামলাম। লখনৌয়ের নতুন

স্টেশন বাড়ীটি খুব চমৎকার হয়েছে। আমরা থার্ড ক্লাসের যাত্রী হলেও পুলিস আমাদের ইনটার ক্লাসের (ক'বছর আগে পর্যন্তও ছিল) ওয়েটিং রুমে নিয়ে গেলেন। সেখানে সব ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল। তার সঙ্গে লাগা স্নানের ঘর ছিল। আর এক পাশে ভাল খাওয়া-দাওয়ার রেস্তোরাঁও ছিল।

ওয়েটিং রুমে ঢোকা মাত্রই কিশোরীলাল ঘোষের মুখ খুলে গেল। তিনি বাংলা ও ইংরেজীতে অনর্গল কথা বলতে পারতেন। কি যে সব অনর্গল বললেন। 'আমাদের জবরদস্তি ধরে নিয়ে যাচ্ছে", একথাও বললেন। যাত্রীরাও সকলে উচ্চকিত হলেন, খবরের কাগজে তাঁরা আমাদের গ্রেপ্তারের কথা পড়েছেন। সেখানে একজন বাঙালী ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর বগলে একটি মদের বোতল ছিল। তিনি উঠে আমাদের খুব ভালভাবে গ্রহণ করলেন; আর বললেন রেস্তোরাঁ-তে আমরা তাঁর অতিথি। পুলিসওয়ালারা খুশীই হলেন, কারণ তাঁদের সব পয়সা বেঁচে যাবে। এই বাঙালী ভদ্রলোক একজন রেলওয়ে কর্মচারী ছিলেন। আগে লখনৌতে পোস্টেড ছিলেন। এখন অনেক দূরে বদলি হয়েছেন--লাকসারে কিংবা দেরাদুনে। লখনৌতে কেউ তার নামে পাওনা টাকার মোকদ্দমা করেছিল। তার মিটমাটের দিন ছিল লখনৌতে। সঙ্গে তিনি টাকাও এনেছিলেন এই ভেবে যে মোকদ্দমা মিটমাট হয়ে গেলে তিনি টাকাটা জমা দিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি বললেন তাঁর সৌভাগ্য যে টাকাটা তাঁকে সেদিন জমা দিতে হয়নি। সেই টাকা হতেই তিনি আমাদের খাওয়ালেন। পথে আর একবার কোথায় তিনি আমাদের খাইয়েছিলেন। মোরাদাবাদ স্টেশনে আমাদের গাড়ী বদলাতে হয়েছিল। সেখানে আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এমন দুর্ভাগ্য যে কতবার তো যুক্ত-প্রদেশে গেলাম, তার সঙ্গে আর দেখা হলো না।

মোরাদাবাদ থেকে গাড়ী ছাড়ার পরে আমরা দিল্লির গাড়ীতে চড়লাম। হাপুর জংশনে সেই গাড়ী থেকে নামলাম। সেখানে নিশ্চয় আমরা চা খেয়ে নিয়েছিলাম। পুলিসের সঙ্গে মীরাটের গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় জে. বি. কৃপালানীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গেল। আগেরবার যে মীরাটে গিয়েছিলাম, তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি মীরাটেই থাকতেন, সেখানে অল-ইনডিয়া খদ্দর ডিপোর চার্জে ছিলেন। আমরা গাড়ীতে চড়ার পর শ্রীকৃপালনী পুলিসকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি ঐ গাড়ীতে চড়তে পারেন কিনা। পুলিস বললেন, কেন পারবেন না! গাড়ী তো ফাঁকাই ছিল। তারপরে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে মীরাটে পৌঁছলাম। স্টেশনে কিছু খেয়ে নিয়েছিলাম বোধহয়; ভাল করে মনে নেই।

সেদিন মার্চ মাসের ২৩ তারিখ (১৯২৯) ছিল।

জানি না কি কারণে কোর্ট বন্ধ ছিল। আমাদের সোজা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে নিয়ে যাওয়া হলো। জেলে গিয়েই শুরু হলো গোলমাল।

আমাদের মোকদ্দমাটি পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা। এই মোকদ্দমায় শনাখ্‌তকরণের কোন প্রয়োজন নেই। এতে কারুর অ্যাপ্রুভার (রাজসাক্ষী) হওয়ার কথাও ওঠে না। এটা ওঁরা বুঝলেন না; মিঃ হরটনও বুঝলেন না। জেলে আমাদের প্রত্যেককে এক একজন করে সেলে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে চাইল। আসামীদের তরফ থেকে আপত্তি উঠল কেন তাঁরা আলাদাভাবে সেলে বন্ধ হবেন। এটা আসলে ইউ-পি পুলিসের বিচারের ভুল ছিল। তাঁরা এ ধরনের কোন মোকদ্দমা দেখেন নি। আর কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় সেলে বন্ধ করার কথাই ওঠেনি। মিঃ হরটন কাকোরী ষড়যন্ত্র

মোকদ্দমার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু সেটা ছিল ডাকাতির মামলা; শনাখ্‌ৎ-করণের দরকারও ছিল তাতে। হরটন মোকদ্দমার ফরিয়াদী ছিলেন বটে, কিন্তু মোকদ্দমার এদিকটা তিনি তখনও তলিয়ে বোঝেন নি।

আমার বিপদ বাধালো অযোধ্যা প্রসাদ। আমাকে যখন সেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তখন অযোধ্যা প্রসাদ আপত্তি করল, বলল, এঁর তো টিউবারকিউলোসিসের ইতিহাস আছে; এঁকে কি মনে করে সেলে ঢোকাতে চাচ্ছেন? সুপারিনটেনডেণ্ট মীরাট জেলের সিভিল সার্জনও ছিলেন। তিনি বললেন, আমরা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে হসপিটালে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাকী সকলকে সেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। যাঁরা স্বেচ্ছায় গেলেন না, তাঁদের জোর করে ঢোকানো হলো।

আমাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি গিয়ে দেখলাম একটি চৌহদ্দির ভিতরে আলাদা ঘরে ফিলিপ স্প্রাটকে রাখা হয়েছে। তিনি আমাদের আগে পৌঁছেছিলেন। তাঁর জন্য আলাদা রাঁধার ব্যবস্থাও হয়েছে। কিন্তু সে ব্যবস্থার চা পর্যন্ত বোঝা যায়, তার পরেরটা কিছুই বুঝতে পারা গেল না। আমি দেখলাম একজন কয়েদী ছোট ছোট আলু মসলাগোলা জলে সিদ্ধ করছে। আর বেচারা স্প্রাট কারুর কথা বোঝেন না; কয়েদীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন, "লাল সাহেব, লাল বিবি কহাঁ"? সেখানে থেকেও আমার স্প্রাটের সঙ্গে কথা বলার হুকুম নাই।

হসপিটালের ঘরটা বড়। তার সামনে বড় ময়দানের মতো জায়গা; দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, তবে গেট আছে। আর দুপাশে দুটো বড় বড় সেল—ব্যারাকের পেছনের দিক। এই সেলগুলোর সামনের দিকটা দরজা দিয়ে বন্ধ, আর মেঝে থেকে পেছনের দিক দিয়ে একটা ছোট জানালা বা বড় ভেণ্টিলেটার আছে। কাজেই ওই সেলে যারা আবদ্ধ থাকেন, তাঁরা পেছনের দিক হতে অনেক কিছু দেখতে পান। আমাদের বন্ধুরা এই সেলগুলোতেই আবদ্ধ ছিলেন। আমার কাছাকাছি সেলে আবদ্ধ ছিলেন ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী ও শওকত উস্‌মানী। তাঁদের সঙ্গে ইচ্ছে করলে আমি কথা বলতে পারতাম, তবে চারিদিকে নজর রেখে। প্রতিদিন অপরাহ্ণ চারটার সময় এই আবদ্ধ বন্দীদের কিছুক্ষণের জন্য বার করা হতো। সেই সময় ইচ্ছা করলে চারিদিকে নজর রেখে তাদের সঙ্গে কথাও বলে নেওয়া যেত। তখন ইউরোপীয় বন্দীদের জন্য ইউ পি-র জেল-রুল অনুসারে খাওয়ার আলাদা ব্যবস্থা ছিল। তাঁদের পাঁউরুটি দেওয়া হতো; নিম্ন কোয়ালিটির মাখন (মারগারিন) দেওয়া হতো, মাছ, মাংস দেওয়া হতো। আর চা-দুধ তো দেওয়া হতোই। কিন্তু স্প্রাটের বেলায় দেখলাম অনেক কিছুই বাদ পড়ে যাচ্ছে। মাছ-মাংস কে রাঁধবে, কোথায় রাঁধবে? হসপিটালে যদি অন্তত মাংস রান্নার ব্যবস্থা থাকত, সেখানে হয়তো স্প্রাটের জন্যও মাংস রেঁধে দেওয়া যেত।

আমি হসপিটালে ছাড়া অবস্থায় থাকলাম। তার বিরাট চৌহদ্দির ভিতরে ঘোরাফেরা করতে পারতাম। কখনও কখনও ডঃ অধিকারী ও শওকত উস্‌মানীর সঙ্গে কথা বলা যেত। ফিলিপ স্প্রাট নিকটেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বলা সম্ভব ছিল, অবশ্য জেল কর্তৃপক্ষের চোখ এড়িয়ে। ১৯২৪ সালের কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা এই ধরনেরই মোকদ্দমা ছিল। ভারত গবর্নমেণ্ট বলেছেন মীরাট মোকদ্দমা কানপুরের মোকদ্দমারই অনুবৃত্তি, একই ধারা বহন করে চলেছে। কিন্তু আমরা যারা কানপুর মোকদ্দমায় আসামী হয়েছিলাম, আমাদের আসামীর অধিকার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না। ঐ মোকদ্দমা হতে আমাদের মতবাদ যে প্রচারিত হতে পারত সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বুঝিনি। তা

সত্ত্বেও মোকদ্দমায় দাখিল করা চিঠিপত্রগুলির অংশবিশেষ খবরের কাগজে মুদ্রিত হয়েছে। তাতে আমাদের মতবাদের কিঞ্চিৎ যে প্রচার হয়নি তা নয়। মোকদ্দমার ফরিয়াদি ছিলেন কর্নেল সি· কে। তিনি পেশায় আর্মি অফিসার ছিলেন। তখন ছিলেন ভারত গবর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের অন্তর্গত ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর। তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের বলে দিয়েছিলেন আমাদের মোকদ্দমার নাম যেন "কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা (১৯২৪)" বলা হয়। তাই হয়েছিল। কর্নেল ভেবেছিলেন এদেশের লোকের নিকটে বলশেভিকরা ঘৃণ্য। কাজেই এই নাম থেকে সাধারণ মানুষের আমাদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হবে। কিন্তু আমার মনে হয় এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়েও আমাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ প্রচার হয়েছিল। আমাদের পরে আফসোস হয়েছে যে আমরা কিছু প্রচার করতে পারিনি। আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনার কিছু উন্নতি হওয়ার পরে বুঝেছিলাম যে চেষ্টা করলেও আমাদের পক্ষে প্রচার করা সম্ভব হতো না। এই সম্বন্ধে এম· এন· রায় ১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসে আমাদের সম্বন্ধে কি মন্তব্য করেছিলেন তা স্যার ডেভিড পেট্রির পুস্তক (Communism in India : 1924-1927) পড়ার আগে আমি অন্তত জানতে পারিনি। তিনি বলেছিলেন ঃ

"The news about the result of the Cawnpore case reached us yesterday. We had not expected any better, Poor fellows. If they could only have put up a better defence, four years in jail would have been worth while. We must have better Communists than this lot ; and the defending Councils (sic). By God, what fools !......With a better lot in the dock and less stupid heads at the Bar, the Cawnpore case could have been made an epoch-making even in our political history ....."

বঙ্গানুবাদ

"গতকাল কানপুর মোকদ্দমার ফলাফল সম্পর্কিত সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। হতভাগ্যরা! তাঁদের কাছ থেকে এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করিনি। তারা যদি শুধু আরো ভালোভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারতেন, তাহলে চার বছর জেল খাটা সার্থক হ'ত। এঁদের চেয়ে আরও ভালো কমিউনিস্ট এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আইনবিদ আমাদের দরকার। হায় ভগবান, কী বোকা এরা!......আদালতের কাঠগড়ায় যদি আরও যোগ্য ব্যক্তিরা উঠতেন এবং আইনজীবীরা যদি আরও কম নির্বোধ হতেন তা'হলে কানপুর মোকদ্দমাকে আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা করে তোলা যেত।......"

আদালতে প্রচারের প্রশ্ন

অবশ্য মীরাট জেলে প্রবেশ করার আগে আমি এম. এন. রায়ের এই পত্রাংশ পড়িনি। পত্র যে কাকে লেখা হয়েছিল তাও জানি না। সম্ভবত স্যার ডেভিড পেট্রির এজেন্ট জানকীপ্রসাদ বাগেরহাট্টার সঙ্গে তাঁর তখন নতুন যোগাযোগ হয়েছিল। এই বাগেরহাট্টা সম্বন্ধে আগে আমরা কিছুই জানতাম না। ঘাটে বলেছেন যে ১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেসে যাওয়ার সময় জানকীপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়েছিল।

ডঃ অধিকারীর সেল খুলে একদিন অপরাহ্ণে যখন তাঁকে বাইরে আনা হলো, তখন আমি তাঁকে বললাম যে ভারত গবর্নমেণ্টের যে রকম ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে যে আমরা দীর্ঘ দণ্ডে দণ্ডিত হব। তাই যদি হয় তবে আমরা আদালতের কাঠগড়াকে কেন আমাদের প্রচারের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করে যাব না? এই আদালত হতেই সরকারী খরচে আমাদের মতবাদ প্রচারিত হবে। তাতে আমাদের যা হবার তা হবে, কিন্তু কমিউনিস্ট মতবাদ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবে। ডঃ অধিকারী বললেন, কথাটা ঠিকই। আমরা সকলে যখন একত্র হব তখন এই বিষয়ই প্রথম আলোচনা করব। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা (মীরাট বন্দীরা) দীর্ঘ ন' মাস যে বিবৃতি দিয়েছিলাম, ডঃ অধিকারীর সঙ্গে আমার কথার ভিতর দিয়ে তার সূত্রপাত হয়েছিল। আমরা যখন সেই বড় ব্যারাকে একত্র হয়েছিলাম, তখন আমরা এই বিবৃতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, যদিও জানতাম এই বিবৃতি দিতে হবে সেশন্স আদালতে, ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নয়। আমরা আলোচনা করেছিলাম কিন্তু সে আলোচনার ভিতরে কোন শাঁস ছিল না; সকলেই বললেন যে তাঁরা বিবৃতি দেবেন এবং স্বীকার করবেন যে তাঁরা কমিউনিস্ট। কমিউনিজম তাঁদের জীবনের ব্রত এবং সারা জীবন তাঁরা কমিউনিজম প্রচার করে যাবেন। পরে অবশ্য এই ব্যাপারটি অন্য পথ নিয়েছিল। নানান লোক নানান ভাবে কথার জাল বুনে বিবৃতি তৈয়ার করেছিলেন। আমরা ১৯২৯ সালের কথা বলছি। সেশন্স আদালতে আমাদের বিবৃতি আরম্ভ হয়েছিল ১৯৩১ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে। প্রথম বিবৃতি দিয়েছিলেন রাধারমণ মিত্র।

মীরাট জেলে কলেরা

তখনও নব-নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর. মিলনার হোয়াইট আসেননি। তিনি মুজফ্ফরনগরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। মীরাট মোকদ্দমার প্রাথমিক অনুসন্ধানের কাজ করার জন্যে গবর্নমেণ্ট তাঁকেই নিযুক্ত করেছিলেন। আমাদের মোকদ্দমা শুরু করার আগে যখন ভারতের বড়লাট (লর্ড আরউইন) ও গ্রেট ব্রিটেনের স্টেট সেক্রেটারী ফর ইন্ডিয়া (লর্ড বার্কেনহেড)-র সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছিল তখন ৮৩৯ নম্বর পার্সোন্যাল ও প্রাইভেট টেলিগ্রামে স্টেট সেক্রেটারী ভারতের বড়লাটকে বলেছিলেন, আশা করি তোমরা সেশনে সোপর্দ করার জন্য মনোমত ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও সেশনের বিচার করার জন্য মনোমত

ইউরোপীয় জজ খুঁজে পেয়েছ (Important 839, p8p. dt London, the 7th March 1929)। ভারতীয় জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের উপরে তাঁদের বিশ্বাস ছিল না। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায়ও তাঁরা এইরূপ করেছিলেন। দু'জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ এই নিয়ে যে নির্লজ্জের মতো আলোচনা করলেন, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

যাক, ম্যাজিস্ট্রেট তখনও নিযুক্ত হয়ে আসেননি। ১৫ দিন পরে পরে মিঃ এডি এসে মোকদ্দমার তারিখ বদলে দিয়ে যান। একদিন ম্যাজিস্ট্রেট এই রকমই তারিখ বদলাতে জেলের ভিতরেই এসেছিলেন। আমরা জড়ো হয়েছিলাম সেই ব্যারাকের সামনে যে ব্যারাকে আমরা পরে থাকব। মিঃ এডি তারিখ বদলে দিয়ে আমাদের বললেন, আজ তোমরা দেরাদুনে যাচ্ছ। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, দেরাদুনে কেন? উনি বললেন মীরাট জেলে কলেরা হয়েছে। ভারত গবর্নমেণ্ট তাতে বড় ঘাবড়ে গেছেন। তোমাদের কিছু হোক এটা তাঁরা কিছুতেই চান না। কাজেই নিরাপত্তার জন্যে তোমাদের পাঠানো হচ্ছে দেরাদুন জেলে। সেদিনই আমরা মোটর বাসে চড়ে দেরাদুনে গেলাম। দেরাদুনে পৌঁছতে আমাদের রাত হয়ে গিয়েছিল, পথের ধুলায় আমরা এমন সাদা হয়ে গিয়েছিলাম যে আমরা পরস্পরকে চিনতে পারছিলাম না।

দেরাদুন জেল হতে আমরা দু'বার মীরাট ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ১৫ দিন পরের হাজিরা দিয়েছিলাম। সেই দু'বারই আমরা গার্ডেন হাউসে এসেছিলাম। সকলেই জানেন মীরাট একটি বড় সেনা-নিবাস। গার্ডেন হাউসটি ছিল ইস্টার্ন কমাণ্ডের প্রধান অফিসারের বাড়ী। তাতে ফুলের বাগান ছিল, আরো অনেক কিছু ছিল। গার্ডেন হাউসে কমাণ্ডারের বাড়ী ছাড়া একাধিক আউট-হাউসও ছিল। আমাদের কোর্টের জন্য এই বাড়ীটিই নেওয়া হয়েছিল। দেরাদুন হতে দু'বার আমরা এ বাড়ীতেই এসেছিলাম। তখনও কোর্টের মঞ্চ ইত্যাদি নির্মিত হয়নি। ১৯২৯ সালের ১২ই জুন তারিখে আমরা কোর্টে এসেছিলাম মীরাট জেলের বড় ব্যারাক হতে। আমাদের কোর্টে আসা যাওয়ার জন্যে গবর্নমেণ্ট দুখানা বাস ভাড়া করেছিলেন। ১২ই জুন (১৯২৯) তারিখে আমরা উচ্চ রণধ্বনি তুলতে তুলতে কোর্টে প্রবেশ করেছিলাম।

Down with Imperialism
Up with Revolution
Onward Revolution
Labour's Victory
Peasant's Victory

প্রভৃতি রণধ্বনি দ্বারা আমরা কোর্টকে মুখর করে তুলেছিলাম। আগেও গার্ডেন হাউসে এলেই আমরা শ্লোগান দিয়েছি।

আমরা দেরাদুন ডিস্ট্রিক্ট জেলে থাকার সময় একটি ব্যাপার ঘটেছিল। এলাহাবাদের দৈনিক পাইওনিয়ার (ব্রিটিশ মালিকের কাগজ) "Red Letters—A Deplorable Double Dumbness" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ ছেপেছিলেন। তার উত্তরে পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু একখানা পত্র লেখেন। তাতে আমাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। আমরা সেই পত্রের উত্তরে পাইওনিয়ারকে

নিম্নলিখিত পত্র লিখেছিলাম (২৪শে মে ১৯২৯) যা ঐ কাগজের ৩০ মে ১৯২৯ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

Sir,

Mr. Motilal Nehru, in his letter published in your issue of the 23rd instant, makes the following statement :

"The question whether there is in India a widespread secret movement to murder Government officials and those who help them, will soon come up for judicial decision in the Meerut conspiracy case."

It appears to us that such remarks, especially from one who is both an eminent political leader and a legal authority, may seriously prejudice our defence.

We wish to make clear that we are not even charged with attempting or conspiring to assassinate Government officials or others. Our alleged crime is purely political.

Further, it should surely be known by this time to all who are concerned with Political matters that Communists are strongly opposed to individual terrorism, and never practise it. Mr. Nehru admits his doubts as to the existence of the alleged terrorist conspiracy, and as to the authorship of the "Red Letters". The phrase "God and the Soviet" which occurs in one of them should be enough to make clear that whatever their origin, it is not Communist.

Those propagandists and organs which are concerned to prejudice us with the public and before the court, have of course seized the opportunity provided by the bomb-cases and "Red-Letters" to impute these things to the Communists. But it should be the part of Congressmen, who know the real situation, to make the public mind clear on the matter.

P. Spratt
S. V. Ghate
Muzaffar Ahmad
K. N. Joglekar
Shaukat Usmani
S. S. Mirajkar
B. F. Bradley.

মহাশয়

আপনার গত ২৩ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত এক পত্রে মিঃ মোতিলাল নেহরু নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন ঃ

"ভারতে সরকারী কর্মচারী ও যাঁরা তাঁদের সাহায্য করেন তাঁদের হত্যা করবার জন্য বহুবিস্তৃত গোপন আন্দোলন আছে কিনা সে প্রশ্নটি বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্তের জন্য শীঘ্রই মীরাট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় উঠবে।"

এই মন্তব্য এমন ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছে, যিনি একাধারে বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও আইনবিশারদ ; কাজেই তাঁর এই মন্তব্য আমাদের মোকদ্দমাকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বলে আমাদের মনে হয়।

আমরা একথা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে কোন সরকারী কর্মচারী বা অপর কাউকে হত্যার চেষ্টা বা ষড়যন্ত্র করার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়নি। আমাদের কথিত অপরাধ পুরোপুরি রাজনৈতিক।

আরো, যাঁরাই রাজনীতিক বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁরা সকলে এতদিনে অবশ্যই জেনে গেছেন যে কমিউনিস্টরা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের অত্যন্ত বিরোধী এবং কখনও তার চর্চা করেন না। সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব এবং "লাল পত্রগুলির" লেখক কে সে সম্পর্কে মিঃ নেহরু তাঁর সন্দেহের কথা স্বীকার করেছেন। "ঈশ্বর ও সোবিয়েত" কথাটি যে ঐ চিঠিগুলির মধ্যে একটিতে আছে তাই থেকে যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে যায় যে চিঠিগুলির উৎস আর যা-ই হোক, কমিউনিস্ট নয়।

যে প্রচারকরা এবং কাগজগুলি জনসাধারণের নিকট ও আদালতের সামনে আমাদের হেয় করতে চায়, তারাই বোমার মামলাগুলি ও "লাল পত্রগুলির" সুযোগ নিয়ে সেগুলিকে কমিউনিস্টদের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। কিন্তু যে কংগ্রেসীরা প্রকৃত অবস্থা জানেন, জনসাধারণের মন যাতে নিঃসংশয় হয়ে যায় সেজন্য তাঁদের তা দেখা উচিত।

পি. স্প্রাট
এস. ভি. ঘাটে
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
কে. এন. জোগলেকর
শওকত উসমানী
এস. এস. মিরাজকর
বি. এফ. ব্রাডলি

পাইওনিয়ার আমাদের পত্র ছেপেছিলেন। এর পরে এ বিষয় নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য হয়নি। দেরাদুন হতে আমরা মীরাট জেলে ফিরে এসে সেই বড় ব্যারাকে বাস করতে থাকলাম। আমাদের বিশেষ ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট এসে গিয়েছিলেন। পাইপ মুখে দিয়ে তিনি কোর্টে এসে বসতেন। তাঁর পাশে বসতেন তাঁর স্ত্রী। মিঃ মিলনার-হোয়াইটকে দেখলে মনে হ'ত কেমন যেন লাজুক লোক। কিন্তু আসলে প্রভুদের হুকুম তামিল করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

এই রণধ্বনির একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। ১৯২৯ সালে ২৩শে মার্চ তারিখে আমরা মীরাট জেলে এসেছিলাম। ৮ই এপ্রিল তারিখে কেন্দ্রীয় আইন-সভার (লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির) দর্শক গ্যালারী হতে দু'জন যুবক দু'টি বোমা নিক্ষেপ করলেন। বোমাতে একজন সামান্য আহত হয়েছিলেন, তেমন কিছু বড় ক্ষতি হয়নি। বোমা ফেলার সময় ট্রেড ডিসপিউট্স বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। দু'জন যুবকই গ্রেপ্তার হলেন। তাঁদের ছবি যখন কাগজে বের হল, তখন দেখলাম যে তাঁরা আমার পূর্বপরিচিত লোক। প্রথম ব্যক্তি ছিলেন ভগৎ সিং, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন বটুকেশ্বর দত্ত। শিখের ছেলে হয়েও ভগৎ সিং গোঁপ-দাড়ি কামিয়েছিলেন। মাথার চুল ছোট করে কেটেছিলেন। দু'জনেই শার্ট ও শর্টস পরে ছিলেন; এবং তাঁদের মাথায় হ্যাটও ছিল। বোমা ফেলার সময় তাঁরা "Down Down with Imperialism", "Up Up with Revolution" ধ্বনি দিতে দিতে দু'টি বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন।

ঐতিহাসিক দিক থেকে অনেকে ধরে নিয়েছেন যে "Up Up with Revolution" যার ফার্সী অনুবাদ হয়েছে "ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ" ভগৎ সিংয়েরা প্রথম দিয়েছিলেন। আমি সবিনয়ে জানাতে চাই যে ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে একথা সত্য নয়। ১৯২৯ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলকাতায় একটি সাইমন কমিশন-বিরোধী মিছিল বার হয়েছিল। এই মিছিলে কংগ্রেসের লোকেরা ছিলেন, আমরা ছিলাম এবং বহু মজুরশ্রেণীর লোকেরাও ছিলেন, যাঁরা রাস্তার পাশ থেকে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছিল যে মিছিলে আমরা লিখিত রণধ্বনি প্রদর্শন করবো। তিনি তাতে আপত্তি করেননি, এর দু'টি শ্লোগানে উত্তর কলকাতার পুলিসের ডেপুটি কমিশনার মিঃ গর্ডন আপত্তি তুলেছিলেন। এর প্রথম শ্লোগানটি হ'ল Long live Revolution (বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক) দ্বিতীয় শ্লোগানটি ছিল Long live Workers' and Peasants' Soviet Republic (মজুর-কৃষক সোবিয়েত রিপাবলিক দীর্ঘজীবী হোক)। এই দ্বিতীয় শ্লোগানটি কিন্তু যেদিন আমাদের সারাভারত শ্রমিক ও কৃষক কনফারেন্স শেষ হয়েছিল, সেদিনও আমরা প্রদর্শন করেছিলাম। সেদিন কেউ কোন আপত্তি তোলেনি। খুব ভাল পোশাক পরে আফতাব আলি আগে আগে যাচ্ছিলেন। মিঃ গর্ডন মনে করলেন তিনি মিছিলের পরিচালক। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল এই দু'টি শ্লোগান নামিয়ে নিতে। আফতাব আলি সত্যই শ্লোগান দু'টি নামিয়ে নিতে এসেছিলেন কিনা জানি না, তবে তিনি কিঞ্চিৎ পিছিয়ে এসে আমার হাত থেকে Long live Revolution শ্লোগানটি নিয়ে নিলেন। আর একজনের হাতে ছিল Long live Workers' and Peasants' Soviet Republic; সেটাও তিনি নিয়ে নিলেন। তখন বোধ হয় আর নামিয়ে রাখতে তাঁর সাহসে কুলাল না। তিনি দু'হাতে দু'টি শ্লোগান ধরেই এগোতে লাগলেন। এর পরে নৃপেন মজুমদার আফতাব আলির হাত থেকে Long live Workers' and Peasants' Soviet Republic; শ্লোগানটি নিয়ে এগোতে লাগলেন। পুলিস এ দু'জনকেই রাস্তায় গ্রেপ্তার করলেন। চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১০৮ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা চলল। ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিলেন তাঁদের দু'জন এক বছরের জন্য মুচলিকা সই করবেন।

না করলে, তাঁদের প্রত্যেকের এক বছরের জন্য বিনাশ্রম সাজা হবে। আফতাব আলি ও নৃপেন মজুমদার মুচলিকায় সই করেছিলেন। কাজেই Long live Revolution, যেটা পরে ইনকিলাব জিন্দাবাদে পরিণত হয়, প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল কলকাতায়। ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে এটা আমি এখানে লিখে রাখলাম।

আর্জি

রাজা-সম্রাট

বনাম

১। ফিলিপ স্প্রাট, ২/১ ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন, কলকাতা।
২। বেনজামিন ফ্রান্সিস ব্রাডলি, বোম্বে।
৩। অযোধ্যা প্রসাদ, পিতা রাম প্রসাদ, মৌরানীপুর, ঝাঁসী, এবং ২/১ ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন, কলিকাতা।
৪। শওকত উসমানী, পিতা গোলাম বাহাউদ্দীন, মহল্লা উস্তান, বিকানীর, এবং রুম নং ২, ৫-তলা, ব্লক নং ৪, আগাখান বিল্ডিং, হাইনেস রোড, জাউব সার্কেলের নিকট, বোম্বে।
৫। পূরন চাঁদ জোশী, হল্যান্ড হল, এলাহাবাদ।
৬। গৌরী শংকর, আনন্দমঠ, মীরাট।
৭। এল· আর· কদম, গুডরি বাজার, ঝাঁসী।
৮। ভি· এন· মুখার্জী, পিতা ডাঃ হরিশচন্দ্র মুখার্জী, জাফরা বাজার, থানা কোতোয়ালী, জেলা গোরখপুর।
৯। চৌধুরী ধরমবীর সিং, এম· এল· সি· (সহ-সভাপতি, ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্ট্স পার্টি), মীরাট।
১০। ধরনী গোস্বামী, পিতা রমণী মোহন, যশোদল, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
১১। শিবনাথ ব্যানার্জী, পিতা দ্বারকানাথ, রাঙাদিয়া, খুলনা।
১২। মুজফ্ফর আহ্মদ, পিতা মনসুর আলী সরকার, মুসাপুর, থানা সন্দীপ, নোয়াখালী, এবং নং ২/১ ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন, কলিকাতা।
১৩। গোপাল বসাক, পিতা বৃন্দাবন, নবাবপুর, ঢাকা।
১৪। শামসুল হুদা, ২/১ ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন, কলিকাতা।
১৫। কিশোরীলাল ঘোষ, পিতা মৃত নন্দলাল, ১ কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা।
১৬। গোপেন্দ্র চক্রবর্তী, পিতা হরেন্দ্রলাল, ওয়াড়ী, লোহজং ঢাকা।
১৭। রাধারমণ মিত্র, পিতা বিপিন বিহারী, বামনপুরা, বর্ধমান।
১৮। শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, নুলজী হরিদাস চাওল, ৪-তলা নগুসয়াজীর বাড়ী,পর্বদেবী রোড, বোম্বে।
১৯। সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘাটে, ১৭ দ্বারকাদাস ম্যানসনস, স্যান্ডহার্স্ট রোড, বোম্বে।
২০। এস· এইচ· ঝাবওয়ালা, খার বান্দ্রা, বোম্বে সুবার্বন জেলা।

২১। ধান্ডিরাজ থেংড়ি, পিতা গুণবন্ত ওরফে আর্কোবা থেংড়ি, ২২৯নং সদাশিব পেট, পুনা সিটি।

২২। কেশব নীলকান্ত জোগলেকর, ১১৪ ফানাসবাড়ী, বোম্বে।

২৩। শান্তারাম সাভ্‌লারাম মিরাজকর, ২/৩নং খন্ডকে বিল্ডিং, লেডি জামশেদজী রোড, দাদার, বোম্বে।

২৪। রঘুনাথ শিবরাম নিম্বকর, কন্ট্রাক্টর বিল্ডিং নং ২, ৩-তলা, চার্নি রোড, প্রার্থনা সমাজের উল্টো দিকে, বোম্বে।

২৫। গঙ্গাধর মোরেশ্বর অধিকারী, ভীমরাও আত্মারামের বাড়ী, ব্লক নং ৩, ৪-তলা, ঠাকুরদ্বার রোড, বোম্বে। ,

২৬। মোতিরাম গজানন দেশাই, জরিওয়ালা বিল্ডিং, ৩-তলা, স্যান্ডহার্স্ট রোড, ডঃ পারেখের হসপিটালের নিকটে, বোম্বে।

২৭। অর্জুন আত্মারাম আলবে, শিবরাম অপ্রর চাওল, ২-তলা এলফিন-স্টোন মিলের পাশে, বোম্বে।

২৮। গোবিন্দ রামচন্দ্র কাস্‌লে, বোম্বে উন্নয়ন ডিপার্টমেন্টের চাওল, ১-তলা, ডিলাইল রোড থানার নিকট, বোম্বে।

২৯। সোহন সিং জোশ, পিতা লাল সিং জাঠ, গ্রাম চেতনপুরা, থানা—আজনালা, জেলা অমৃতসর, বাস ইসলামাবাদ, অমৃতসরের উপকণ্ঠে।

৩০। এম· এ· মজিদ ওরফে আব্দুল মজিদ, পিতা মীর ফৈয়াজ বখ্‌শ কাশ্মীরী, ধল মহল্লা, মোচি গেটের ভিতরে, লাহোর সিটি।

৩১। কেদারনাথ সেহ্‌গল, পিতা ভাগমল, কুচা মৈয়াসিয়ান পেপার মান্ড, লাহোর সিটি।

ভারত গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের অন্তর্গত ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডাইরেক্টরের অধীন বিশেষ কর্মরত অফিসার মিঃ আর· এ· হরটনের নিবেদন এই যে ঃ

১। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক নামে একটি সংগঠন আছে। সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে সারা বিশ্বে বর্তমান ধরনের সরকারগুলির উচ্ছেদ সাধন এবং তাদের জায়গায় মস্কোস্থিত কেন্দ্রীয় সোবিয়েত প্রশাসনের প্রতি অনুগত এবং তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সোবিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এই সংগঠনের লক্ষ্য।

২। উক্ত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কমিটি, শাখা এবং সংগঠনের মাধ্যমে তার কাজ ও প্রচার পরিচালনা করে। এই সংগঠনগুলি আবার কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অর্থাৎ তার একজেকিউটিব কমিটির (E.C.C.I) এবং একজেকিউটিব কমিটির বিভিন্ন সাব-কমিটির প্রতি অনুগত এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাচ্য ও ঔপনিবেশিক বিষয় সংক্রান্ত একটি সাব-কমিটি (ঔপনিবেশিক ব্যুরো), কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শাখা গ্রেট-ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি (C.P.G.B), রেড ইনটারন্যাশনাল অব লেবর ইউনিয়নস্‌ (R.I.L.U), প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েট, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লীগ, ইয়ং লীগ (Y.C.L.) এবং অন্যান্য নানা সংস্থা এর মধ্যে রয়েছে।

৩। সাধারণ ধর্মঘট এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে প্রত্যেক দেশের (ভারত সহ) বর্তমান সরকারগুলিকে সম্পূর্ণ অচল করা এবং উচ্ছেদ সাধন করা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে তা একটি কর্মসূচী ও প্রচার পরিকল্পনা রচনা করেছে। এই সকল নির্ধারিত পদ্ধতির মধ্যে আছে ঃ

ক) মালিক ও মজুরের মধ্যে শত্রুতা জাগিয়ে তোলা;

খ) ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্টস পার্টি, ইউথ লীগ, ইউনিয়নস ইত্যাদি গঠন; আপাতত এই ইউনিয়ন বা সংগঠন গড়াকে তার সদস্যদের পক্ষে কল্যাণকর মনে হলেও. আসলে তা করা হয় প্রচারের উদ্দেশ্যে। এই সকল সংগঠনে কমিউনিস্টদের প্রভুত্ব থাকায়, সংগঠনগুলি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের লক্ষ্য সমর্থন করতে প্রতিশ্রুত এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অধীনে একই নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়।

গ) বর্তমান ট্রেড ইউনিয়নগুলি, জাতীয়তাবাদী সংস্থা এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য সংগঠনে কমিউনিস্টদের পূর্বোক্ত বে-আইনী উদ্দেশ্যের কোন অংশ বা বীজ চালু করা; এইরূপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ সংগঠন-গুলিকে দখল করা অথবা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের স্বার্থে তাদের সমর্থন আদায় করা।

ঘ) ধর্মঘট, হরতাল এবং আন্দোলনে উৎসাহ দেওয়া।

ঙ) বক্তৃতা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, রুশ-বিপ্লব সংক্রান্ত বার্ষিকী উদ্‌যাপন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার চালানো।

চ) সরকার বিরোধী যে কোন আন্দোলনকে উৎসাহ দেওয়া এবং তাকে ব্যবহার করা।

৪। ১৯২১ সালে উক্ত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ব্রিটিশ ভারতে একটি শাখা সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত করে। অভিযুক্ত শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, শওকত উসমানী এবং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আরো কয়েকজনের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে এইরূপ একটি শাখা সংগঠন গঠন করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রিটিশ ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা হতে রাজা-সম্রাটকে বঞ্চিত করা।

৫। অতঃপর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক তার শাখা অথবা সংগঠনের মাধ্যমে ফিলিপ স্প্রাট এবং বেন্‌জামিন ফ্রান্সিস ব্রাড্‌লি সহ নানা ব্যক্তিকে ভারতে পাঠিয়েছিল; তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের উদ্দেশ্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

৬। এই নির্জিতে যে সকল অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম করা হয়েছে, তাঁরা ব্রিটিশ-ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে বাস করছেন। ব্রিটিশ-ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে রাজা-সম্রাটকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে এবং ব্রিটিশ ভারতের ভিতরে ও বাইরে বহু পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের রচিত ও নির্ধারিত কর্মসূচী এবং প্রচার পরিকল্পনা ব্যবহারের ষড়যন্ত্রও তাঁরা করেছেন। বস্তুত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সাহায্য ও আর্থিক সমর্থনের দ্বারা এই পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করেছেন এবং প্রচার অভিযান চালিয়েছেন।

৭। ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে এবং বাইরে পূর্বোক্ত বিভিন্ন স্থানে অভিযুক্তরা মিলিত হয়েছেন এবং একত্রে ষড়যন্ত্র করেছেন। অন্যান্য জায়গার মধ্যে মীরাটে পূর্বোক্ত ষড়যন্ত্র অনুসারে তাঁরা একটি ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্ট্স পার্টি গঠন করেছেন এবং সেখানে তার একটি সম্মেলনও হয়েছিল।

৮। উপরোক্ত নামের অভিযুক্তরা এই আদালতের বিচারাধীনে ভারতীয় দন্ডবিধির ১২১-এ ধারা মতে অপরাধ করেছেন।

সুতরাং এই প্রার্থনা করা হচ্ছে যে আদালত উপরোক্ত অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন।

স্বাক্ষর ঃ আর. এ. হরটন
ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডাইরেক্টরের অধীন
বিশেষ কর্মরত অফিসার,
হোম ডিপার্টমেণ্ট, ভারত সরকার
১৫ই মার্চ, ১৯২৯।

মিঃ আর. এ. হরটন এই অভিযোগ আজ দায়ের করেছেন এবং একে তিনি নির্ভুল বলে ঘোষণা করেছেন।

স্বাঃ ই. এইচ. এইচ. এডি,
(E. H. H. Edye)
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট,
মীরাট,
১৫-৩-২৯

অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা জারী করা হোক।

স্বাঃ ই. এইচ. এইচ. এডি
১৫-৩-২৯

নির্ঘণ্ট

আলোচ্য ব্যক্তি, সংস্থা, পত্র-পত্রিকা গ্রন্থ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দের বর্ণানুক্রমিক সূচি

* গ্রন্থমধ্যে মূল পাঠে তারকাচিহ্নিত শব্দগুলির বানান কোথাও কোথাও মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে। এখানে অনুসৃত বানান সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

উ

এ

ও

ক

খ

গ

চ

জ

ঝ

ট

ড

ঢ

ত

থ

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

য

র

হ